# কলিকাতার

# রাজপথ

## সমাজে ও সংস্কৃতিতে

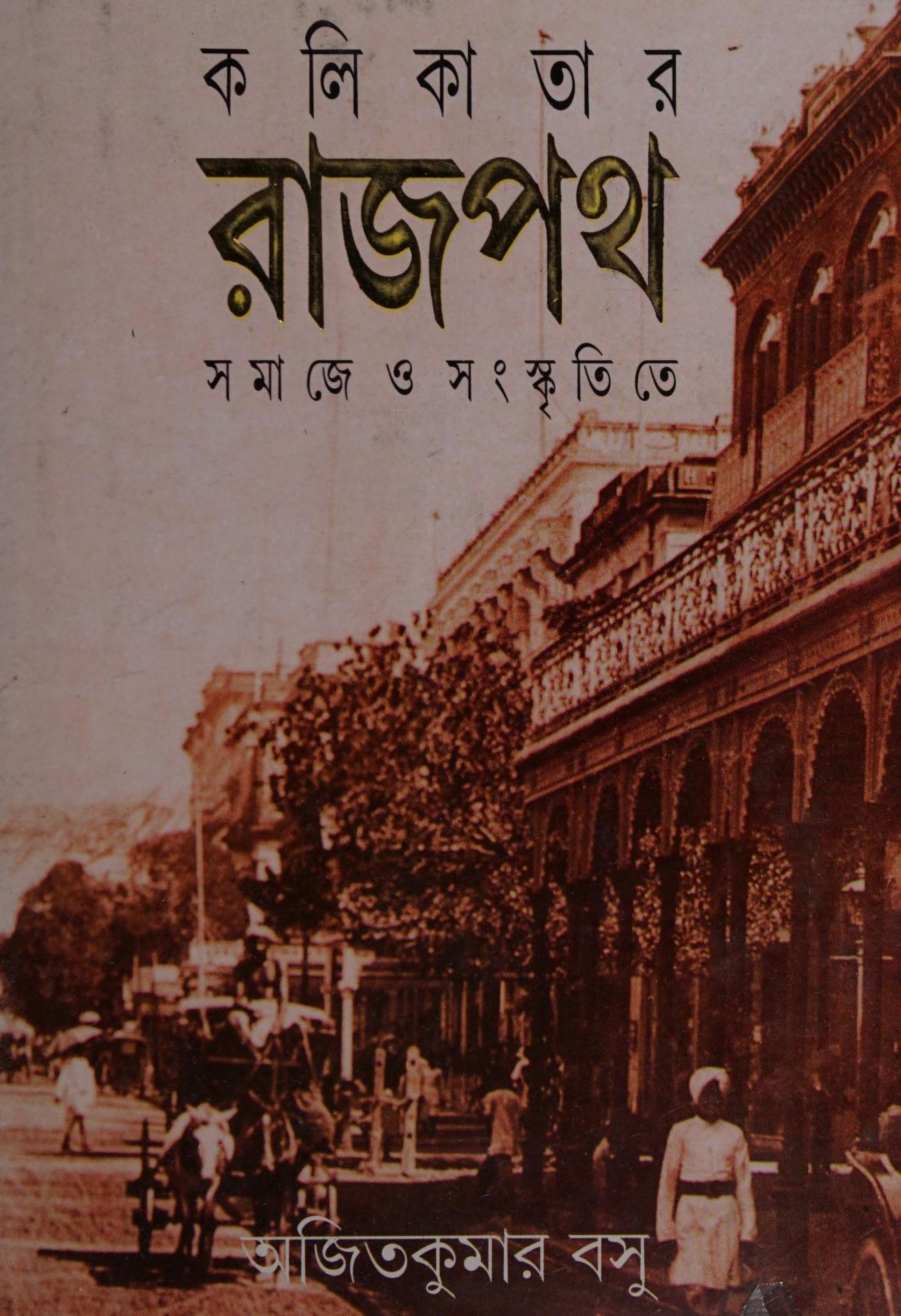

অজিতকুমার বসু

SHOUT
SHARE
IT

যেমন রোম নগরী, কলকাতাও তেমনই এক দিনে কি এক বছরে গড়ে ওঠেনি। বরং কোন্ ঐতিহাসিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সুতানুটি-কলিকাতা-গোবিন্দপুর নামের অখ্যাত তিন গ্রাম ধীরে-ধীরে এবং ধাপে-ধাপে রূপান্তরিত হল আজকের এই কলকাতায়, এই ঐতিহ্যমণ্ডিত তথা ঐতিহ্যবিস্মৃত মহানগরীতে, কীভাবে তার গলি আর রাজপথ, প্রাসাদ আর উদ্যানের সঙ্গে একদা মিশেছে সমাজ-সংস্কৃতির নানান সজীব উপাদান, আবার সেইসব উপাদানের অনেকটাই ক্রমশ মিশতে শুরু করেছে ধুলায়—তা আজ দারুণ কৌতূহলকর এক কাহিনী। সে-কাহিনী যতটা জানা, ততটাই অজানা। জানা-অজানা সেই কাহিনীই এই দীর্ঘ পরিশ্রমজাত বইতে শুনিয়েছেন অজিতকুমার বসু।

পুরসভার পথ-নামকরণ উপদেষ্টা পরিষদের সঙ্গে দীর্ঘকালীন যোগাযোগ লেখকের। একদিকে যেমন কলকাতা বিষয়ক বহু দুর্লভ নথিপত্র দেখার সুযোগ ঘটেছে তাঁর, অন্যদিকে তাঁকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছে এই সত্যও যে, কলকাতার পথঘাটের ঘন ঘন নাম পরিবর্তনের জোয়ারে এবং আধুনিক নগরসভ্যতার দম্ভের প্রতীক বহুগ্রাসী আর বহুতল কংক্রিটের স্তূপের আড়ালে ক্রমশ হারিয়ে যেতে বসেছে ইতিহাসের বহু অমূল্য ও অন্তরঙ্গ সাক্ষ্য। মুখ্যত, এ-দুইয়ের ভিত্তিতেই তিনি উদ্যোগী হন লুপ্তপ্রায় এই ইতিহাসকে গ্রন্থাকারে ধরে রাখতে। অবশেষে, প্রায় বারো বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে-গবেষণায় তিনি উপহার দিয়েছেন এই বই। কলকাতার রাজপথের নামকরণের সূত্রে কলকাতার পত্তন ও উন্নয়নের, তার সমাজ ও সংস্কৃতির যে-ইতিহাস এই বইতে তুলে ধরেছেন লেখক তা শুধুই নীরস নথিপত্রে ছড়ানো বহিরঙ্গ বিবরণ নয়। একইসঙ্গে অন্তরঙ্গ বহু উপাদানও সংগ্রহ করতে চেয়েছেন তিনি, আর সেই কারণে দ্বারস্থ হয়েছেন কলকাতার নানান অঞ্চলের প্রবীণ বাসিন্দাদের। এই দ্বিবিধ সূত্রে সংগৃহীত তথ্যের এক অনন্য সমাহার এই গ্রন্থকে দিয়েছে এক স্বতন্ত্র মর্যাদা।

আশা করা যায়, কলকাতাকে যাঁরা ভালবাসেন, কলকাতাকে যাঁরা জানতে চান, তাঁদের সানন্দসঙ্গী হবে এই বই।

ISBN 81-7215-393-7

কলিকাতার রাজপথ : সমাজে ও সংস্কৃতিতে

# কলিকাতার রাজপথ

## সমাজে ও সংস্কৃতিতে

অজিতকুমার বসু

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

কলকাতা ৯

প্রথম সংস্করণ আগস্ট ১৯৯৬

ISBN 81-7215-393-7

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
পি ২৪৮ সি আই টি স্কিম নং ৬ এম কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে
তৎকর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য ১৭৫·০০

কলিকাতাকে যাঁরা ভালোবাসতেন,
কলিকাতাকে যাঁরা ভালোবাসেন,
কলিকাতাকে যাঁরা ভালোবাসবেন
সেইসব কলিকাতা-প্রেমীদের উদ্দেশে সমর্পিত ।

# নিবেদন

কলিকাতা পুরসভার সড়ক নামকরণ উপদেষ্টা পরিষদের (Road Renaming Advisory Committee) সঙ্গে দীর্ঘদিন সম্পৃক্ত থাকার সুবাদে কলিকাতার রাজপথের ক্রমবিকাশের ইতিহাস এবং তাদের নামকরণ প্রসঙ্গের নথিপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হয়েছিল। সে সময়ে ক্রমে এটি সুস্পষ্ট হয় যে কলিকাতার গলি থেকে রাজপথ এবং তাদের নামকরণের মধ্যে কলিকাতার সমাজ-সংস্কৃতির এক নিবিড় যোগসূত্র আছে। অথচ এ বিষয় নির্ভরযোগ্য সেরকম তথ্যসমৃদ্ধ পুস্তক নেই যা পাঠ করে জিজ্ঞাসুমনের এই কৌতূহল চরিতার্থ হতে পারে। বিষয়টি আমাকে ভাবিয়ে তোলে। অবশেষে দীর্ঘ অনুসন্ধান এবং কলিকাতা পুরসভার গ্রন্থাগার ও মহাফেজখানায় সংরক্ষিত বহু পুরানো নথিপত্র পর্যবেক্ষণে প্রতিভাত হয়—সুতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর ওই তিন প্রাচীন গণ্ডগ্রামের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের স্রোতে এক ঐতিহ্যমণ্ডিত শহরে রূপান্তরের কাহিনী।

ধাপে ধাপে গড়ে ওঠা এই নতুন শহর কলিকাতায় পর্যায়ক্রমে উপস্থাপিত আইনের শাসন (Rule of Law), স্ব-স্ব ধর্মপালনের স্বাধীনতার এবং বেনিয়া-অর্থনীতিকেন্দ্রিক কর্মপ্রবাহ সৃষ্টির ফলে বিবিধ পেশার জনগোষ্ঠীকে কর্মের সন্ধানে নতুন শহর কলিকাতা হাতছানি দিয়ে এনেছিল, তাদেরই সমবায়ে গড়ে উঠল বর্ণাশ্রমবিহীন এক নতুন সমাজ। এ সমাজ ছিল ধনসম্পদ ক্ষমতার পরিণামী অর্থকৌলীন্যে প্রতিষ্ঠিত, ইংরেজদের আনুকূল্যেই এ সমাজ পরিপুষ্ট, ব্যবসা-বাণিজ্যের কর্মযজ্ঞে এ সমাজের প্রাণ। এদের উত্তরপুরুষ বুদ্ধির সঙ্গে বিদ্যার, রুচির সঙ্গে মননের সহযোগে গড়ে তুললো বহতা এক নতুন সংস্কৃতি যা কিনা সাবেক গ্রামীণ কলিকাতার সংস্কৃতি থেকে নতুনতর বা সম্পূর্ণ পৃথক।

নতুন সমাজ-সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি সেদিনের শহর কলিকাতার ক্রমবর্দ্ধমান জনস্ফীতি ও তার প্রসারতার কারণে প্রয়োজন হয় সুষ্ঠু নগর পরিষেবার। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নগর পরিষেবার ভাবনাচিন্তার আদল ভাঙতে ভাঙতে জন্ম নেয় সরকার-নির্বাচিত ও স্বল্পসংখ্যক জনপ্রতিনিধি সমাহার গঠিত ক্ষুদ্র সংস্করণের পৌরসভা—কালক্রমে যা বর্তমান পুরসভার আকার, বিন্যাস ও অবয়ব প্রাপ্ত হয়েছে। ঘটনা পরম্পরায় বিষয়গুলি আমার মনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। শহর কলিকাতার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস উদ্ভাসিত হয় নিত্য নতুন রূপে। স্তব্ধ বিস্ময়ে দেখেছি, এই শহর কালে কালে যা মহানগরী আখ্যায় ভূষিত তার পথে-প্রান্তরে, উদ্যানে ইতিহাসের সজীব উপাদান ছড়ানো। এই ইতিহাসের অন্তরঙ্গ সাক্ষীরা রাস্তাঘাটের ঘন ঘন নাম পরিবর্তনের প্রবাহে এবং আধুনিক নগরসভ্যতার দ্যোতক সুউচ্চ কংক্রিট স্তূপের দম্ভের অন্তরালে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। গ্রামীণ অবস্থা থেকে শহরের এই রূপান্তরের সাথে নতুন সমাজব্যবস্থার উদ্ভব ও নব নব চেতনার উন্মেষে কলিকাতার সাংস্কৃতিক ধারা ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে কীভাবে কলিকাতার সমাজজীবনকে প্রভাবিত করে সজীব রেখেছে, তারই এক খণ্ডচিত্র বর্তমান প্রজন্মের কাছে উপস্থাপিত করাও এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

কলিকাতার রাজপথের ইতিবৃত্তের বহিরঙ্গের তথ্য ও উপকরণের জন্য প্রধানত নির্ভর করতে হয়েছে কলিকাতা পুরসভায় রক্ষিত নথিপত্রের উপর। যেমন, কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের টাউন কাউন্সিলের ও কলিকাতা পৌরসভার সাপ্তাহিক অধিবেশনের প্রতিবেদন, লটারি কমিটির রিপোর্ট, পৌরসভার বাৎসরিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রিপোর্ট, অ্যাসেস্‌মেন্ট রেজিস্টার প্রভৃতি। এছাড়াও কলিকাতার বিভিন্ন সময়ের মানচিত্র, বিভিন্ন জনগণনার প্রতিবেদন, প্রাচীন পত্র-পত্রিকা, তথ্যনির্ভর পুস্তকাদি বহিরঙ্গ উপাদান হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। এইসব সাক্ষ্য প্রমাণ সম্বন্ধে অবাস্তবতার আপত্তি তোলার হেতু নেই। এর মধ্যে যতটুকু পাওয়া যায়, ততটুকুই মূল্যবান ও নির্ভরযোগ্য। আর অন্তরঙ্গ উপকরণের জন্য পথ পরিক্রমা কালে বিভিন্ন অঞ্চলের প্রবীণ বাসিন্দাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগে এবং তাঁদের কাছে রাখা ব্যক্তিগত নথিপত্রকেই মূল উপাদান হিসাবে ব্যবহার করেছি। আক্ষেপের কথা, অনেক পরিবারই তাঁদের পারিবারিক ইতিহাস প্রদানে অনীহা প্রকাশ করেছেন, যা পেলে গ্রন্থ আরও তথ্যবহুল হতে পারত। কলিকাতার নামী পরিবারগুলি যেমন

কলিকাতার সাংস্কৃতিক আঙিনায় প্রধান দীপশিখাটি প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন, অন্য দিকে স্বল্পখ্যাত বা অনামী পরিবারগুলিও আপন আপন বর্তিকা জ্বালিয়ে সেই আলোকের রেখাবৃত্তকে উজ্জ্বলতর করেছেন। এইসব পরিবারের অবদানের কথাও লিখে রাখা প্রয়োজন। এঁদেরই সম্মিলিত মহাদানে পরিপুষ্ট হয়েছে কলিকাতার সমাজ সংস্কৃতির জীবনধারা। অন্তরঙ্গ উপাদানের এইসব উপচারই বিভিন্ন আঞ্চলিক ইতিবৃত্তের তৃণমূল স্তরের উপকরণরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

এ তো গেল কলিকাতার সমাজজীবনে এ-দেশীয় পরিবারগুলির কথা। গ্রামীণ কলিকাতাকে শহরে রূপান্তরের মধ্যে বিদেশি ইংরেজদেরও একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। তাঁরা প্রথমদিকে কলিকাতাকে কেন্দ্র করে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারে যত্নবান হয়েছিলেন, পরে দেশীয় শাসকগোষ্ঠীর ও ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এ-দেশের রাজ্যপাট অতি সহজেই হস্তগত করেছিলেন। পরবর্তীস্তরে, রাজ্যবিস্তারের সহায়ক হিসাবে কলিকাতাকে কেন্দ্র করে শাসন-শোষণের মাধ্যমে লব্ধ সম্পদে ইংল্যান্ডকে সমৃদ্ধশালী করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু কলিকাতার নগরায়ণে ও তার বহিরঙ্গ রূপায়ণে তাঁদের ইতিবাচক ভূমিকাও স্মরণযোগ্য। তাঁরা চেয়েছিলেন এই কলিকাতা শহর প্রাচ্যের লন্ডন হয়ে উঠুক। আপন ইচ্ছাকে রূপায়িত করার জন্য নিজ দেশের উন্নত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও প্রযুক্তির ভাণ্ডার এ-দেশে আমদানি করে কলিকাতার নবরূপায়ণে তৎপর হয়েছিলেন। আধুনিক রাস্তাঘাট নির্মাণে নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা, ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী নির্মাণ, মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মাধ্যমে নলবাহিত পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা, শহরকে জঞ্জালমুক্ত রাখা, নগরবাসীর সুস্বাস্থ্যের প্রয়াস, রাস্তায় তেলের আলো থেকে গ্যাসবাতি, পরে বৈদ্যুতিক আলোয় উত্তরণ প্রভৃতির মাধ্যমে পাশ্চাত্যের নগরায়ণ ব্যবস্থা প্রবর্তনের একটা সচেতন প্রয়াস ছিল।

অন্যদিকে কলিকাতার সংস্কৃতিতেও ওই বিদেশি শাসকদের অবদান স্মরণীয়। রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এ-দেশে শিক্ষা বিস্তারের প্রসঙ্গটিও তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথমে তাঁরা এ-দেশে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা প্রসারেই আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ যুগদ্রষ্টাদের আগ্রহে এবং অনুরোধে ইংরেজি ভাষা শিক্ষাদানে তৎপর হয়েছিলেন। তাঁরা বুঝেছিলেন শাসনকার্য পরিচালনা ও খ্রিস্টধর্ম প্রচারের স্বার্থে ইংরেজি ভাষা শিক্ষাদান বিশেষ প্রয়োজন। সাম্রাজ্যের ভিতকে শক্ত বনিয়াদের উপর গড়ে তোলার জন্য তাঁরা ইংল্যান্ড থেকে এ-দেশে এনেছিলেন একদল উচ্চশিক্ষিত শিক্ষাবিদ ও খ্রিস্টান ধর্মযাজক। পরবর্তীকালে দেখা যায় খ্রিস্টধর্ম প্রচার বিশিষ্ট মিশনারিদের কাছে গৌণ হয়ে যায়। শিক্ষাবিস্তার বিশেষ করে এ-দেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে তাঁরা পথিকৃতের ভূমিকা গ্রহণ করেন। এইসব বিদেশি শিক্ষাবিদদের সংস্পর্শে এসে তাঁদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সর্বোপরি গতিশীল ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি লাভ করে কলিকাতায় সৃষ্ট হয়েছিল একদল বাঙালি বিদ্রোহী তরুণ। বিদ্যা, সত্যনিষ্ঠা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধাচরণই ছিল এঁদের প্রধান হাতিয়ার। তাঁরা এ-দেশের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। উজ্জীবিত হয়েছিলেন প্রচলিত প্রথাকে বিচার করতে, প্রশ্ন তুলেছিলেন বিভিন্ন সামাজিক মূল্যবোধ সম্পর্কে। নারীজাতির কল্যাণের প্রতি ছিল তাঁদের গভীর আগ্রহ ও মমতা। এইভাবে বর্তমান যুগের অভ্যুদয় ঘটল। বাঙালির জীবনধারা নতুন মোড় নিল। ফলে এক সম্পূর্ণ নতুন ধরনের বাঙালি সমাজ আস্তে আস্তে গড়ে উঠতে থাকে। এই সামাজিক বিবর্তনের ওপর ইংরেজদের প্রত্যক্ষ কোনও হাত ছিল না। কিন্তু তাঁদের সংস্পর্শেই যে নতুন সমাজ গড়ে ওঠে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এককথায় বলা যায় এই নতুন সমাজ কলিকাতাকেই কেন্দ্র করে সারা ভারতবর্ষে বিদ্যা, বুদ্ধি ও জ্ঞানের আলো দিয়ে এক নবচেতনার জোয়ার এনেছিল।

মোটামুটি এইসব উপকরণ গ্রন্থের উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। পুস্তকে আরও অনেক তথ্য সংযোজনার অবকাশ ছিল, কিন্তু সময় ও সুযোগের অভাবে সে সংকল্প ত্যাগ করতে হয়েছে। তবে আশা রাখি ভবিষ্যতের কলিকাতা-গবেষকগণ এ বিষয়ে আরও অনুসন্ধান করে নতুন নতুন তথ্য উদ্ঘাটন করে প্রকাশ করবেন।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখা ভালো, এই গ্রন্থ পাঠের সময় পাঠক-পাঠিকারা কিছুটা ধন্দে পড়বেন—এক অঞ্চলের পথের বিবরণের পরেই অন্য অঞ্চলের পথঘাটের বিষয় বর্ণিত হতে দেখে।

তাঁদের মনে স্বতঃই প্রশ্ন জাগতে পারে একই অঞ্চলের রাস্তাঘাটের বিবরণ পর পর গ্রথিত হল না কেন ? এর প্রধান কারণ, সেই সময় অঞ্চলভিত্তিক সার্বিক উন্নতির কোনও বৃহৎ আকারের সামগ্রিক প্রকল্প রচনায় হাত দেওয়া হয়নি। যতটুকু করা হয়েছিল সবই বিক্ষিপ্ত আকারে। তা ছাড়া আঞ্চলিক সমস্যা নিরসনে ইতস্তত ছড়ানো-ছিটানো বস্তিবাড়ি উচ্ছেদ করে পথঘাট নির্মাণ-এর দ্বিতীয় কারণ বলে চিহ্নিত হতে পারে। এই কর্মযজ্ঞের মধ্যে সময়ের পরম্পরা রক্ষার জন্য এবং একটি পৌর আইন থেকে অন্য একটি পৌর আইন প্রণীত হবার মধ্যে যেসব এলাকায় বিচ্ছিন্নভাবে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছাড়াই পথঘাট তৈরি হয়েছে, তারই একটা রূপরেখা দেবার চেষ্টা হয়েছে এই গ্রন্থে। এতে করে একদিকে যেমন পথঘাটের ইতিহাসের কালানুক্রমিক পরম্পরাকে চিহ্নিত করা হয়েছে, অন্য দিকে একটি নির্দিষ্ট পৌর আইন অথবা নির্দিষ্টকালের প্রেক্ষাপটে শহর কলিকাতার বিবর্তনের আঞ্চলিক চিত্র পাঠক পাঠিকার কাছে সুস্পষ্টরূপে ধরা পড়বে।

দীর্ঘ ১২ বছরের বেশি সময় লেগেছে তথ্য সংগ্রহ করতে,—তারই অংশবিশেষ এই পুস্তকে প্রকাশিত হল। এর দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে কুড়িটি প্রধান রাজপথের উল্লেখ আছে, ভবিষ্যতে সুযোগ-সুবিধা হলে এগুলির বিস্তারিত বিবরণ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার ইচ্ছা রইল। এছাড়া আরও অনেক তথ্য নাগালের বাইরে থেকে গেছে। বলাবাহুল্য, এই ধরনের কাজে বহুজনের সহযোগিতা আবশ্যক হয়। সাহায্যপ্রার্থী হয়েছি অনেকের কাছেই, কেউ দিয়েছেন, কেউ দিতে পারেননি, অনেকে উৎসাহিত করেছেন, আবার অনেকে 'ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে' নিষেধ করেছেন। এঁরা সবাই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উদ্দেশ্যসিদ্ধির সহায়ক হওয়ায় আমার কৃতজ্ঞতাভাজন।

প্রথমেই কৃতজ্ঞতা জানাই কলিকাতার শ্রীশচন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ সৌম্যেন্দ্রনাথ সরকারকে। প্রবন্ধের পরিকাঠামো তৈরিতে সাহায্য করেছেন, লেখা পড়ে উৎসাহ দিয়েছেন, প্রয়োজনে পাণ্ডুলিপির প্রারম্ভিক কাজে সাহায্য করেছেন। গ্রন্থের নামকরণও তাঁরই।

কলিকাতা পৌরসভার অ্যাসেসর (অবসরপ্রাপ্ত) বন্ধুবর শ্রীভাস্কর চৌধুরী তথ্য সংগ্রহে প্রথম থেকেই নানাভাবে সাহায্য ও উৎসাহ দিয়েছেন। তাঁর সহায়তা না পেলে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের গ্রন্থাগারে রাখা লটারি কমিটির প্রতিবেদন পাঠ ও লেখা সম্ভব হতো না। অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি অ্যাসেসর শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র চক্রবর্তী রাস্তাঘাটের নানা উপকরণ ও মূল্যবান উপদেশ দিয়ে সাহায্য করেছেন। কলিকাতা পৌরসভার মহাফেজখানার তৎকালীন আধিকারিক শ্রীরবীন্দ্রকুমার চক্রবর্তী মহাফেজখানার প্রাচীন নথিপত্র, মানচিত্র, বিভিন্ন সময়ের জনগণনার প্রতিবেদন প্রভৃতি পাঠ ও পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। পবরর্তীকালে ওই পদে আসীন শ্রীদেবেন্দ্রনাথ হালদারও নানাভাবে সাহায্য করেছেন। পৌরসভার গ্রন্থাগারিক শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ পাল গ্রন্থাগারের প্রাচীন পুস্তক, নথিপত্র, প্রতিবেদন প্রভৃতি দেখার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। পৌরসভার হিসাব বিভাগের আধিকারিক শ্রীনীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতার অনেক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন এবং কলিকাতার পথ পরিক্রমায় সহযাত্রী হয়েছিলেন। শিশু সাহিত্যিক শ্রীজয়ন্তকুমার ভাদুড়ী লেখার ব্যাপারে সর্বদাই উৎসাহ দিয়েছেন। প্রবন্ধের কিছু কিছু অংশ "গন্ধবণিক মাসিক পত্রিকা"-তে প্রকাশের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। আমেরিকান লাইব্রেরি ও তথ্যকেন্দ্রের শ্রীসুনীল চক্রবর্তী বিদেশি রাস্তাঘাটের প্রয়োজনীয় তথ্যসংগ্রহে অকৃপণভাবে সাহায্য করেছিলেন। ক্যানিং কলেজের অধ্যক্ষ ও সুতানুটি পরিষদের সম্পাদক শ্রদ্ধেয় ডঃ সুধীন ভট্টাচার্য শ্যামপুকুর অঞ্চলের ইতিবৃত্ত সংগ্রহে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাঁরই উৎসাহ এবং আগ্রহে সুতানুটি পরিষদের শ্যামপুকুর আঞ্চলিক সমিতি সুতানুটির সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের সঙ্গে আমার লেখা "শ্যামপুকুর অঞ্চলের ইতিবৃত্ত" পুস্তক আকারে প্রকাশ করেন। এই প্রসঙ্গে কবিরাজ শ্রীকৃষ্ণানন্দ গুপ্ত, শ্রীঅশোক ভদ্র ও শ্রীপূর্ণেন্দু সেনগুপ্তের (প্রাঃ ডেপুটি মেয়র) আন্তরিক সহযোগিতার কথা মনে পড়ে। কুমার আশুতোষ ইনস্টিটিউশনের শিক্ষক শ্রীঅরুণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর সংগৃহীত মূল্যবান পুস্তক পাঠের সুযোগ করে দিয়েছিলেন। মূলত তাঁরই আগ্রহে বৃহৎ আকারের এই ভূমিকার অবতারণা, যা সংক্ষেপে লেখার ইচ্ছা ছিল। তিনি অদম্য উৎসাহ নিয়ে প্রুফ-কপি দেখায়ও সাহায্য করেছেন। হিরণ লাইব্রেরি, বয়েজ ওন লাইব্রেরি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ ও আমেরিকান

ইনফরমেশন সেন্টারের কর্তৃপক্ষ তাঁদের গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ করে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। বয়েজ ওন লাইব্রেরির বর্ষীয়ান সভাপতি শ্রীসনৎকুমার মিত্র কলিকাতার বহু নামী পরিবারের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ করে দেওয়ায় ওইসব পরিবারের পারিবারিক ইতিহাস সংগ্রহ সহজসাধ্য হয়েছিল। নানা তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছিলেন দর্জিপাড়ার মিত্র পরিবারের বর্ষীয়ান ঁ মন্মথ (সুধীর) কৃষ্ণ মিত্র ও প্রখ্যাত প্রকাশক ইউ এন ধর অ্যান্ড সন্সের বর্ষীয়ান কর্ণধার শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ধর। বৃদ্ধবয়সে এঁদের স্মৃতিশক্তির প্রখরতা দেখে চমৎকৃত হতে হয়।

আর যাঁরা নানাভাবে সাহায্য করেছেন তাঁরা হলেন সর্বশ্রী হিমাংশুকৃষ্ণ মিত্র, শৈবাল মিত্র (দুর্গাপুর), অনিলকৃষ্ণ রায় (প্রাক্তন মিউনিসিপ্যাল কমিশনার, কলিকাতা পুরসভা), আব্দুল রউফ গোলাম মুস্তাফা, ঁ নিমাই সরকার (খড়্গপুর), সুনীলানন্দ বসাক, দেবাশীষ ভাদুড়ী, সুশান্তকুমার মিত্র, রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের তারাপদ মহারাজ, অপর্ণা দত্ত (দে), সমীর বসাক, শান্তি ভড়, প্রশান্ত ঘোষ, সুমিত শীল, মঞ্জু মিত্র (নয়াদিল্লি), ধীমান বসু, অসীমকুমার জানা, শুভ্র চৌধুরী, সৌম্য চৌধুরী, রাধাশ্যাম প্রামাণিক, ডঃ রবীন্দু গুপ্ত, বিশ্ববরণ মুখোপাধ্যায়, সোমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, অচিন্ত্য সরকার, অনিরুদ্ধ মুখার্জি, মলয় ভাদুড়ি, শৌরি বন্দ্যোপাধ্যায়, অরিজিত ঘোষ, সলিলকৃষ্ণ দে, কমলকুমার বসু (প্রাঃ মেয়র), সুমিতকৃষ্ণ দেব (শোভাবাজার), প্রভাতকুমার রায়, শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

আমার দুই ভাইঝি কল্যাণীয়া অঞ্জনা বসু (মিত্র) ও অনিন্দিতা বসু (ভট্টাচার্য) এবং আমার দুই সহকর্মী শ্রীমিহিরকুমার সিকদার ও শ্রীশঙ্কর চক্রবর্তী বস্তুত প্রধান সহায়করূপে আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছে। এদের আন্তরিক সহায়তা আমার লেখনীকে গতিশীল করেছিল। আমার ছোট ভাই শ্রীরঞ্জিতকুমার বসু দৈনন্দিন সংসারের "তেল নুন লক্ড়ি" সংগ্রহের ঝামেলা থেকে রেহাই দিয়ে একনিষ্ঠভাবে লেখার সুযোগ করে দিয়েছিল। আমার স্ত্রী শ্রীমতী নমিতা বসু অগোছাল কাগজপত্র গুছিয়ে প্রয়োজনে হাতের কাছে জুগিয়ে দিয়ে, প্রুফ দেখায় সাহায্য করে লেখায় গতি এনে দিয়েছিল। আমার কন্যা কল্যাণীয়া শর্মিষ্ঠা বসু ও আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান অভিজিত বসুও প্রয়োজনীয় স্কেচ ও রেখাচিত্র অঙ্কন করে দিয়ে পুস্তকের অঙ্গ-সৌষ্ঠব বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে। তাদের জন্য রইল আমার আশীর্বাদ।

এই দীর্ঘ নিবন্ধ গ্রন্থে বর্ণানুক্রমিক বাংলা ও ইংরেজি "নির্দেশিকা" ও ''Index'' তৈরিতে অকুণ্ঠ সহযোগিতা দান করেছেন সর্বশ্রী শর্মিলা শীল (বুবুন), দীপান্বিতা ব্যানার্জি, অনিন্দিতা ভট্টাচার্য, সুপর্ণা সেন, সিক্তা সেন, শর্মিষ্ঠা বসু, অজয় ভট্টাচার্য, অরুণ মুখোপাধ্যায়, শচীন বন্দ্যোপাধ্যায় (ননী), রাধারমণ মুখোপাধ্যায়, শ্রেয়া বসু ও শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়।

এঁদের সকলের কাছে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ। এঁদের অকৃপণ সাহায্য ও সহযোগিতা না পেলে এ লেখা সম্ভব হত না।

সর্বশেষে আনন্দবাজার পত্রিকার শ্রীবিজয় চক্রবর্তী ও আনন্দ পাবলিশার্সের শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু ওরফে বাদল বসু এবং আনন্দ পাবলিশার্সের কর্তৃপক্ষকে জানাই আমার হার্দিক কৃতজ্ঞতা, যাঁদের সক্রিয় সহযোগিতা না পেলে এই দীর্ঘ নিবন্ধ দুই মলাটের মধ্যে মুদ্রিত করে প্রকাশ করা সম্ভব হত না। এই প্রসঙ্গে আনন্দ পাবলিশার্সের, শ্রীরাতুল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীদেবব্রত সাউ, শ্রীসমীর চৌধুরী এবং আরও অনেকেরই সাহায্য স্মরণীয়।

আর পাঠক-পাঠিকাদের কাছে আমার নিবেদন গ্রন্থের ত্রুটি-বিচ্যুতি তাঁরা যেন ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখেন।

অজিতকুমার বসু

# সূচিপত্র


১ কলিকাতার রাজপথ : পথঘাটের ইতিবৃত্তের ভূমিকা ..... ১
২ নগরপত্তন ও রাস্তাঘাট নির্মাণ ..... ৩
৩ কলিকাতা ও বিদেশের অন্যান্য নগরীর জনপদ—তুলনামূলক আলোচনা ..... ৭
৪ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যবিস্তার সূত্রে কলিকাতার ক্রমবিকাশ ..... ১১
৫ সুতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিবর্তনের ইতিকথা, ১৬৯০-১৭০৪ ..... ১৩
৬ কলিকাতার জমি জরিপ ব্যবস্থা ..... ১৬
৭ কলিকাতায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গ্রাম ক্রয় ..... ২০
৮ মারাঠা আক্রমণ ও শহর কলিকাতা ..... ২৩
৯ কলিকাতার পথঘাট ও ঘরবাড়ির সমীক্ষা, ১৭০৬-১৭৫৬ ..... ২৫
১০ ১৭৫৭—পলাশীর যুদ্ধকালীন কলিকাতা ..... ২৮
১১ পলাশী যুদ্ধোত্তরকালের কলিকাতা ..... ৩৩
১২ বিদেশি পর্যটকদের ভ্রমণবৃত্তান্তে সেকালের কলিকাতা ..... ৪১
১৩ লটারি কমিটি ও কলিকাতার উন্নয়ন ..... ৪৭
১৪ ফিভার হসপিটাল কমিটি ..... ৬১
১৫ ফিভার হসপিটাল কমিটির প্রতিবেদন ও কলিকাতার উন্নয়ন ..... ৬৮
১৬ প্রথম পুরসভার সূচনা ..... ৭৪
১৭ শহর কলিকাতাকে জঞ্জালমুক্ত করার প্রয়াস ..... ৭৮
১৮ ১৮৬৬—কলিকাতার প্রথম জনগণনা ..... ৮২
১৯ বস্তি গড়ে ওঠার পটভূমি ..... ৮৪
২০ কলিকাতার জনগণনা ও বিভার্লির প্রতিবেদন ..... ৮৮
২১ বিভার্লির প্রতিবেদন—ওয়ার্ডগুলির বৈশিষ্ট্য ও নামের তাৎপর্য ..... ৯১
২২ ১৮৮১—বিভার্লির পুনর্বার জনগণনা ..... ৯৬
২৩ শহর কলিকাতার ওয়ার্ডভিত্তিক পথ-উন্নয়নের রূপরেখা ১৮৮১-১৮৮৮ ১০০
২৪ ১৮৮৮-এর নতুন পৌর আইন ও কলিকাতার সীমানা ..... ১৪৪
২৫ ১৮৮৮-এর পৌর আইনে কলিকাতার নতুন রাস্তা ও উদ্যান ..... ১৪৮
২৬ ১৮৮৮—পৌর আইন রূপায়ণে পৌরসভার কার্যাবলী ..... ১৯০
২৭ ঊনবিংশ শতাব্দীতে নগরায়ণের প্রভাবে কলিকাতার সমাজ-সংস্কৃতির বিবর্তন ..... ১৯২
২৮ ১৮৯৯-এর নতুন পৌর আইন—প্রতিক্রিয়া ..... ১৯৫
২৯ ১৮৯৯—পৌর আইন ও বৈদ্যুতিক আলো ..... ১৯৮
৩০ কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা ..... ২০২
৩১ ১৮৯৯—পৌর আইনে রাস্তা নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও সাজসজ্জা ..... ২৪১
৩২ ১৮৯৯—পৌর আইনে নতুন নতুন পথের উদ্ভব ও তার ইতিবৃত্ত ..... ২৪৮
৩৩ ১৯২৩— পৌর আইন—পটভূমি ও বৈশিষ্ট্য ..... ৩৩০
৩৪ ১৯২৩—পৌর আইনে নতুন নতুন জনপথ ..... ৩৩৩
৩৫ উপসংহার ..... ৪৩৫

# পরিশিষ্ট

## সারণি


পরিশিষ্ট—ক বস্তি বাড়ির সারণি ..... ৪৪১
পরিশিষ্ট—খ হাট-বাজারের সারণি ..... ৪৪৫
পরিশিষ্ট—গ গ্যাসবাতির সারণি ..... ৪৪৭
পরিশিষ্ট—ঘ তেলের বাতির সারণি ..... ৪৫০


## মানচিত্র


পরিশিষ্ট—১ ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের কলিকাতা পুর আইন অনুসারে প্রস্তুত কলিকাতার মানচিত্র ৪৫৬
পরিশিষ্ট—২ আপজন সাহেবের মানচিত্র (১৭৪২) (Plan of the Territory of Calcutta as marked out in the year 1742—by A. Upjohn) ৪৫৭
পরিশিষ্ট—৩ মেজর হার্স্ট (Major F. C. Hirst)-এর পুস্তকে (A Brief History of the Large Scale Survey of Calcutta and its neighbourhood, 1903-14) বর্ণিত কলিকাতার মানচিত্র (১৭৫৬-৫৭) ৪৫৮
পরিশিষ্ট—৪ মার্ক উডের কলিকাতার মানচিত্র (১৭৮৪-৮৫) (Plan of Calcutta—by Lt. Col. Mark Wood—Published by William Baillie) ৪৫৯
পরিশিষ্ট—৫ ১৭৯২-৯৩ এর জরিপের ভিত্তিতে কলিকাতা ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের আপজন সাহেবের মানচিত্র (Map of Calcutta and its Environs, 1792-93—by A. Upjhon) ৪৬০
পরিশিষ্ট—৬ ফিভার হসপিটাল কমিটির অনুরোধে লেঃ অ্যাবারক্রম্বি ও ক্যাপ্টেন ফরবেস অঙ্কিত কলিকাতার মানচিত্র (১৮৩৬) (Plan of Calcutta by Lt. H. Abercrombie & Capt. H. N. Forbes showing suggested layout of roads) ৪৬১
পরিশিষ্ট—৭ ১৮৭৬ খ্রিঃ বিভার্লি সাহেবের কলিকাতার জনগণনার বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত প্রতিবেদনে সংযোজিত কলিকাতার মানচিত্র (Report on the Census of the town of Calcutta taken on 6th April 1876 by H. Beverley) ৪৬২
পরিশিষ্ট—৮ ১৮৮৮ খ্রিঃ কলিকাতা পৌর আইনে বর্ণিত সীমানার মধ্যে ওয়ার্ডভিত্তিক কলিকাতার মানচিত্র ৪৬৩
পরিশিষ্ট—৯ প্রস্তাবিত আদর্শ পথঘাটের বিন্যাসজ্ঞাপক কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা (Calcutta Improvement Trust)-র প্রস্তুত কলিকাতার মানচিত্র (A Key plan of Calcutta prepared by C.I.T. showing a suggested ideal layout of roads) ৪৬৪

নির্দেশিকা ..... ৪৬৫

# চিত্র ও আঞ্চলিক রেখাচিত্রের সূচি


১ ব্রিটিশ আগমনের সময় কলিকাতার আনুমানিক মানচিত্র (Conjectural Map of Calcutta at the time of British Advent) ..... ১৭
২ কলিকাতার অন্তর্গত বিভিন্ন মৌজার আনুমানিক রেখাচিত্র (১৭৫০-১৮৫০) ..... ৩০
৩ লটারি কমিটির প্রতিবেদন ..... ৫০
৪ ক্ষুদ্র স্তম্ভশ্রেণীর (Balustrade) চিত্র ..... ৫৬
৫ কার্ব ও চ্যানেল স্টোনের চিত্র ..... ৭৩
৬ বাদুড়বাগান অঞ্চলের রেখাচিত্র ..... ১২৯
৭ পার্ক সার্কাস অঞ্চলের রেখাচিত্র ..... ২০৮
৮ বড়বাজার অঞ্চলের রেখাচিত্র ..... ২২৭
৯ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ ও বৌবাজার অঞ্চলের রেখাচিত্র ..... ২৩১
১০ বালিগঞ্জ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ এবং লেক অঞ্চলের রেখাচিত্র ..... ২৩৮
১১ পূর্ব-কলিকাতা অঞ্চল উন্নয়নের রেখাচিত্র ..... ২৩৯
১২ চড়কডাঙা, জোড়াবাগান ও পাথুরিয়াঘাটা অঞ্চলের রেখাচিত্র ..... ৩২৬
১৩ শ্যামপুকুর অঞ্চলের রেখাচিত্র ..... ৩৪৯

কলিকাতার রাজপথ : সমাজে ও সংস্কৃতিতে

# ১

# কলিকাতার রাজপথ : পথঘাটের ইতিবৃত্তের ভূমিকা

কলিকাতার পথঘাটের ইতিবৃত্তের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস। কলিকাতার রাজপথ সংলগ্ন ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় যে সাংস্কৃতিক ধারা ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছিল তা একদিন কলিকাতার সীমানা ছাড়িয়ে বাংলাদেশ তথা সারা ভারতে ব্যাপ্ত হয়েছিল। তাই কলিকাতার পথঘাটের ক্রমবিকাশ অন্যান্য জনবহুল নগরীর পথঘাট নির্মাণের পটভূমিকার সঙ্গে তুলনীয় নয়। এক সম্পূর্ণ পৃথক সত্তায়, এক নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে এগুলি ধীরে ধীরে গড়ে উঠে স্বমহিমায় বাঙালির জাতীয় ইতিহাসে নিজস্ব ঠাঁই করে নিয়েছে। ভারতের অন্য কোনও শহরের রাজপথ কিন্তু এই বিরল বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নয়। তাই গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে কলিকাতার পথঘাটের সজীব আত্মাকে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করলে দেখা যায় সে আত্মা তার আবির্ভাব লগ্নের কাল থেকে বহু ভালবাসায় আর বিরোধিতায়, বহু অনুকূল আর প্রতিকূল অবস্থায়, বহু হতাশা ও উদ্যমের টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গিয়ে রচনা করেছে তিন শতকের এক দীর্ঘ সমৃদ্ধ ইতিহাস।

কলিকাতার পথঘাটের ইতিহাস যেমন প্রাচীন ঐতিহ্যসমৃদ্ধ তেমনি বিচিত্র ঘটনাবহুল। কলিকাতার ক্রমবিকাশ ও উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তার পথের বিবর্তনের ধারাটিও স্পষ্ট। একদিন যে রাস্তা ছিল কেবলমাত্র পায়ে চলার উপযোগী, যার দু'দিকে ছিল কেবল ঝোপ, জঙ্গল, পুকুর ও ডোবা—প্রয়োজনের তাগিদে কালে কালে তাই হল দীর্ঘ ও বিস্তৃত। যেমন, আজকের চিৎপুর রোড তথা রবীন্দ্র সরণি। এই পথটি বাগবাজার খালধার থেকে শুরু করে বিভিন্ন নামে নামাঙ্কিত হয়ে সোজা দক্ষিণে অগ্রসর হয়েছে। পরে সারকুলার রোড অতিক্রম করে কালিঘাট ছাড়িয়ে আরও দক্ষিণে চলে গেছে। জোব চার্নকের কলিকাতায় আগমনের বহু পূর্ব থেকেই চিৎপুর রোডের অস্তিত্ব ছিল। সেকালের কলিকাতায় এইটিই ছিল একমাত্র রাস্তা পদবাচ্য—উত্তর থেকে দক্ষিণে কলিতীর্থ কালিঘাটে যাবার একমাত্র পথ। ইংরেজরা এই পথটিকে কখনও বলেছে "Road to Pilgrimage" কখনও বা "Road to Chitpore", আবার কখনও "Road to Kalighat"। সেদিনকার এই রাস্তার যা অবস্থা ছিল তাতে আজকের চিৎপুর রোডের পথচারীও সে পথে হাঁটতে ভয় পেত। গ্রামীণ কলিকাতা শহরে রূপায়িত হবার সঙ্গে সঙ্গে এই চিৎপুর রোডেও আধুনিকতার ছোঁয়াচ লাগে। সে তার গ্রাম্য বহির্বাস ফেলে দিয়ে তুলে নেয় আধুনিক নগরের রূপসজ্জা। এতে যে কেবলমাত্র তার বহিরাবরণের চাক্ষুষ পরিবর্তনটুকুই দৃষ্টিগোচর হল তাই নয়, আর্থসামাজিক রূপান্তরের রূপরেখাটিও স্পষ্টরূপে ধরা পড়ল। অপ্রশস্ত সেই পথটি কালক্রমে হয়ে উঠল এক বিশাল রাজপথ। কলিকাতার ধনিক, শ্রেষ্ঠী ও ব্যবসায়ীরা এই রাজপথেরই দু' ধারে বসবাস শুরু করল। গড়ে উঠল এক এক করে শিল্প ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। প্রতিষ্ঠিত হল নামী অনামী শিক্ষাকেন্দ্র। ক্রমে ক্রমে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠল এককালের অখ্যাত আর দুর্গম চিৎপুর রোড।

বহু বৈচিত্র্যে ভরা চিৎপুর রোডের পরই নাম করতে হয়—পুরানো কলিকাতার সীমানা ঘিরে পড়ে আছে যে দীর্ঘ রাজপথটি—সেই সারকুলার রোডের। এই পথটিও বাগবাজারের কাছ থেকে আরম্ভ হয়ে সোজা দক্ষিণে এগিয়েছে। পরে বেকবাগানের মুখে বাঁক নিয়ে পশ্চিমদিকে এগোবার সময়

চিৎপুর রোডের দক্ষিণে প্রসারিত অংশ চৌরঙ্গী রোডকে ভেদ করে খিদিরপুর রোডে এসে মিশেছে। বর্তমানে এই সুদীর্ঘ পথটি দুই ভারতবিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের নামে নামাঙ্কিত—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড ও আচার্য জগদীশ বসু রোড। মারাঠা আক্রমণ রুখতে একদিন সৃষ্টি হয়েছিল মারাঠা খালের। উদ্দেশ্য ছিল আদি কলিকাতার চারদিকে এক বেষ্টনী সৃষ্টির। বাগবাজার থেকে বর্তমান এন্টালি বাজার পর্যন্ত খননের পর—নবাব আলিবর্দী মারাঠা আক্রমণ প্রতিহত করায় এই খাল কাটা বন্ধ হয়ে যায়। পরে দীর্ঘ খাল বুজিয়ে তৈরি হয় এক দীর্ঘ ও বিস্তৃত রাজপথ। নাম দেওয়া হয় সারকুলার রোড। অগ্নিযুগের বিপ্লবী আন্দোলনের সময় এই পথের ধারেই গড়ে উঠেছিল বোমা তৈরির কারখানা আর ব্যায়ামকেন্দ্র। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের দিনে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান, তারই পরিপ্রেক্ষিতে মিলন মন্দির (Federation Hall) প্রতিষ্ঠা। উচ্চ-বিজ্ঞান-শিক্ষার জন্য স্থাপিত হয়েছিল বিজ্ঞান কলেজ, বসু বিজ্ঞান মন্দির, চিকিৎসা কেন্দ্ররূপে—প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতাল, ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুল, পরে কলেজ, ক্যালকাটা হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ, ডানহাম মেডিকেল কলেজ প্রভৃতি। দরিদ্র, অনাথ, আতুরের জন্য অনেকগুলি আশ্রয় ও সেবাকেন্দ্রও গড়ে উঠেছিল এই রাজপথটির ধারে। স্থাপিত হয়েছিল অনেক পাঠশালা, ইংরেজী স্কুল আর বেশ কয়েকটি নামী-দামি গ্রন্থাগার। ফলে কলিকাতার সমাজ-সংস্কৃতির ইতিহাসে এই রাজপথটিও একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

ভাগীরথী নদীর পূর্ব তীরবর্তী এই দুই বিশিষ্ট রাজপথের মধ্যবর্তী ভূভাগই হল আদি কলিকাতা। প্রথম যুগে সুতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর নামে তিনটি গ্রাম ও পরবর্তীকালে আরও কয়েকটি গ্রাম নিয়ে যে প্রাচীন কলিকাতা গড়ে উঠেছিল তার ইতিহাস প্রায় সকলেরই জানা। মারাঠা আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য ১৭৪২ খ্রিস্টাব্দে যে সুদীর্ঘ খাল খননের ব্যবস্থা হয়, হুগলি নদীর তীর পর্যন্ত প্রসারিত সেই খালের পশ্চিম দিকের অঞ্চলই আদি কলিকাতা। পরবর্তীকালে এই আদি কলিকাতার সঙ্গে ধীরে ধীরে পার্শ্ববর্তী বহু অঞ্চল যুক্ত হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু আদি কলিকাতার মত সাংস্কৃতিক বীজ অঙ্কুরিত করার কোনও নতুন উপাদান সেই সমস্ত অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করা যায়নি। এই সংযুক্তির ফলে প্রাচীন কলিকাতার আয়তন ফুলে ফেঁপে উঠলেও কলিকাতার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের আঙ্গিনায় মূল্যবান কোনও সংযোজনা ঘটেনি। তাই শহর কলিকাতার আদি সংস্করণের অবদানই আজও স্বকীয় মহিমায় ভাস্বর হয়ে সমগ্র কলিকাতা নগরীকে আধুনিক ভারতের ইতিহাসে এক বিরল বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল করে তুলেছে।

স্ট্র্যান্ড রোড (পরবর্তীকালের সৃষ্টি), প্রাচীন চিৎপুর রোড ও সারকুলার রোডের মধ্যবর্তী ভূভাগেই পুরানো কলিকাতার প্রায় সব কটি প্রধান রাস্তাই বিস্তৃত ছিল। কলিকাতার এই প্রধান রাজপথগুলির ক্রমবিকাশ, উন্নতি ও তার আনুষঙ্গিক পরিবর্তনের মধ্যেই লুকিয়ে আছে আধুনিক বাঙালিজাতির সাংস্কৃতিক ও সামাজিক নবজাগরণের ইতিহাস।

## ২

# নগরপত্তন ও রাস্তাঘাট নির্মাণ

মারাঠা আক্রমণের সময় আদি কলিকাতা কিন্তু সম্পূর্ণ ইংরেজ অধিকারে ছিল না। ইংরেজদের সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় জমিদারদেরও অধিকারে ছিল এই অঞ্চলের অনেক জমিজমা। পলাশী যুদ্ধের পর মীরজাফরের সনদের বলে ওই অঞ্চলটি সর্বপ্রথম ইংরেজদের পূর্ণ কর্তৃত্বাধীনে আসে। ১৭৫৭ থেকে ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই নগরীর আয়তনের বিশেষ কোনও হেরফের হয়নি। এরই সংলগ্ন ছিল বিস্তৃত শহরতলি। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে ২১নং আইনে আরও ৫৫টি গ্রামকে এই শহরতলির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে "রেগুলেটিং অ্যাক্ট" (Regulating Act) অনুসারে ইংরেজ কোম্পানি কলিকাতাকে রাজধানীর গৌরবে ভূষিত করে। ইংরেজ কোম্পানি এই নতুন শহরকে লন্ডনের ধাঁচে গড়ে তুলতে চেয়েছিল। নাগরিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য বলতে যা বোঝায় ধীরে ধীরে তার প্রবর্তন করেছিল। রাস্তাঘাট ও পয়ঃপ্রণালী নির্মাণ, পানীয় জলের জন্য পুষ্করিণী খনন, পরবর্তীকালে নলবাহিত পরিশুদ্ধ পানীয় জলের সরবরাহ ও তেলের বাতি থেকে গ্যাসের আলোর মধ্য দিয়ে বৈদ্যুতিক আলোতে উত্তরণের ব্যবস্থা করেছিল। নিজেদের হাতে গড়া এই নগরকে আদর করে তারা বলত "The Second City of the British Empire."।

নগরপত্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাস্তাঘাটের বিষয়টি প্রাধান্য পায় অঙ্গাঙ্গিভাবে। সাম্রাজ্য বিস্তারে রাস্তাঘাটের অবদান কম নয়। সৈন্য চলাচলের ও রসদ সরবরাহের জন্য ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের সঙ্গে ব্যারাকপুরের ও দমদমের সেনা ছাউনির উন্নততর যোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। কাজেই সামরিক প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে ইংরেজ কোম্পানি নতুন নগরীর মধ্যে ধীরে ধীরে অনেকগুলি প্রশস্ত রাস্তা নির্মাণ করে। কালের বিবর্তনে সেই সব রাজপথের বাহ্যিক আঙ্গিকের সামান্য কিছু পরিবর্তন ঘটলেও মোটামুটি আজও তারা একই চেহারায় অবস্থান করছে।

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা পৌরসভা পরিচালনার জন্য একটি নতুন আইন বিধিবদ্ধ হয়। এই আইনের এক নম্বর তফসিলি কলিকাতার সীমানার একটি বিবরণ দেওয়া আছে। সেই বিবরণকে ভিত্তি করে যে কলিকাতার মানচিত্রটি প্রস্তুত করা হয়েছে, তার মধ্যে কেবলমাত্র ভাগীরথীর পূর্ব থেকে শুরু করে সমগ্র সারকুলার রোডের (আজকের আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড ও আচার্য জগদীশ বসু রোড) মধ্যবর্তী ভূভাগের অন্তর্গত গুরুত্বপূর্ণ রাজপথগুলিকেই এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নির্বাচন করা হয়েছে। এই অঞ্চলই 'আদি কলিকাতা' নামে পরিচিত। আদি কলিকাতার সীমানার বহির্ভাগ আলোচনার বাইরে রাখা হয়েছে।

এই মানচিত্রে (পরিশিষ্ট ১ দ্রষ্টব্য) রাস্তাগুলি সম্বন্ধে সম্যক অবগতির জন্য এদের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। প্রথমে উত্তর থেকে দক্ষিণের রাজপথগুলির কথা। মানচিত্রে প্রদর্শিত রাজপথগুলিকে নম্বর অনুসারে এইভাবে সাজানো যেতে পারে :

| পথের সংখ্যা | প্রতি সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত পথগুলি | পথের প্রস্থ | বর্তমানে নতুন নামে নামাঙ্কিত |
|---|---|---|---|
| ১ নং রাজপথ | স্ট্র্যান্ড রোড | ৬৫ ফুট | |
| | স্ট্র্যান্ড রোড, সাউথ | ৪০ থেকে ৫২ ফুট | |
| | সেন্ট জর্জেস গেট রোড | ১০০ ফুট | প্রেমচাঁদ সরণি |
| ২ নং রাজপথ | দরমাহাটা স্ট্রিট | ৩০ থেকে ৫০ ফুট | মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড |
| | ক্লাইভ স্ট্রিট | ৪০ থেকে ৫০ ফুট | নেতাজী সুভাষ রোড |
| | চার্নক প্লেস | ৯৫ ফুট | |
| | ডালহাউসি স্কোয়ার (ওয়েস্ট) | ৯৫ ফুট | |
| | কাউন্সিল হাউস স্ট্রিট | ৫০ ফুট | |
| | গভর্নমেন্ট প্লেস ওয়েস্ট | ৫০ ফুট | |
| ৩ নং রাজপথ | রাজা উদ্‌মন্ত স্ট্রিট | ৫০ ফুট | |
| | সি.আই.টি. রোড | ১০০ ফুট | |
| | ব্রেবোর্ন রোড | ৮০ থেকে ৮৫ ফুট | বিপ্লবী ত্রৈলোক্য মহারাজ সরণি |
| | ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার | ৩০ ফুট | |
| | লায়ন্স রেঞ্জ (আংশিক) | ৪০ ফুট | |
| | ডালহাউসি স্কোয়ার ইস্ট | ১০০ ফুট | |
| | ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট | ১০৫ ফুট | হেমন্ত বসু সরণি |
| | গভর্নমেন্ট প্লেস ইস্ট (আংশিক) | ৯৫ ফুট | |
| | গভর্নমেন্ট প্লেস ইস্ট (আংশিক) | ৯৫ ফুট | মার্কস্ এঙ্গেলস্ বীথি |
| | রেড রোড | ১৫০ ফুট | ইন্দিরা গান্ধী সরণি |
| | এরপর রাজপথটি দু'ভাগে বিভক্ত :— | | |
| | খিদিরপুর রোড | ৪০ ফুট থেকে ৮০ ফুট, আবার কোথাও বা ১১০ ফুট | |
| | ক্যাসুরিনা অ্যাভেনিউ | ৪০ ফুট | প্রণবানন্দ সরণি |
| ৪ নং রাজপথ | চিৎপুর ব্রিজ অ্যাপ্রোচ | ৫২ ফুট | মোহিত মৈত্র সরণি |
| | চিৎপুর রোড (আপার ও লোয়ার) | ৪০ ফুট থেকে ৫২ ফুট | রবীন্দ্র সরণি |
| | কসাইটোলা স্ট্রিট | ৫০ ফুট | বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট |
| | চৌরঙ্গী রোড | ১০০ ফুট থেকে ১০৫ ফুট | জওহরলাল নেহরু রোড (চৌরঙ্গী রোডের আংশিক—ধর্মতলা স্ট্রিট থেকে পার্ক স্ট্রিটের মোড় পর্যন্ত) |
| ৫ নং রাজপথ | ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ অ্যাভিনিউ | ১০০ ফুট | |
| | গিরিশ অ্যাভিনিউ | ১০০ ফুট | |
| | যতীন্দ্রমোহন অ্যাভিনিউ | ১০০ ফুট | |
| | (উত্তর-পূর্ব দিক থেকে আরেকটি চওড়া রাজপথ গিরিশ অ্যাভিনিউ ও যতীন্দ্রমোহন অ্যাভিনিউ-এর সংযোগস্থলে এসে মিশেছে)—নাম | | |
| | ভূপেন্দ্র বসু অ্যাভিনিউ | ১০০ ফুট | |
| | চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ | ১০০ ফুট | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ভূপেন্দ্র বসু অ্যাভেনিউ | ১০০ ফুট | |
| | চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ | ১০০ ফুট | |
| ৬ নং | কর্নওয়ালিস স্ট্রিট | ৬৫ ফুট | বিধান সরণি |
| রাজপথ | কলেজ স্ট্রিট | ৫০ ফুট | |
| | ওয়েলিংটন স্ট্রিট | ৬৫ ফুট | নির্মল চন্দ্র স্ট্রিট |
| | ওয়েলেসলি স্ট্রিট | ৬৫ ফুট | রফি আহমেদ কিদওয়াই রোড |
| | উড স্ট্রিট | ৪০ ফুট | |
| | আপার উড স্ট্রিট | ৪০ ফুট | ডঃ মার্টিন লুথার কিং সরণি |
| ৭ নং | আমহার্স্ট স্ট্রিট | ৫০ ফুট | রাজা রামমোহন সরণি |
| রাজপথ | শশীভূষণ দে স্ট্রিট | ৪০ ফুট থেকে ৬০ ফুট | |
| ৮ নং | সারকুলার রোড আপার | ১৩০ ফুট | আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড |
| রাজপথ | সারকুলার রোড লোয়ার | ১৩২ ফুট থেকে ১৪০ ফুট | আচার্য জগদীশ বসু রোড |

এবার সারকুলার রোডের সীমানার মধ্যে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকের রাজপথগুলির দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক। এই রাজপথগুলি :

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৯ নং | বাগবাজার স্ট্রিট | ৫০ ফুট | |
| রাজপথ | | | |
| ১০ নং | শোভাবাজার স্ট্রিট | ৫০ ফুট | |
| রাজপথ | গ্রে স্ট্রিট | ৪৭ ফুট থেকে ৫০ ফুট | শ্রীঅরবিন্দ সরণি |
| ১১ নং | নিমতলাঘাট স্ট্রিট | ৬৫ ফুট | |
| রাজপথ | বিডন স্ট্রিট | ৫০ ফুট থেকে ৬৫ ফুট | অভেদানন্দ রোড (বিডন স্ট্রিটের পূর্বাংশ) |
| ১২ নং | কালীকৃষ্ণ ঠাকুর স্ট্রিট | ৮৫ ফুট থেকে ৯০ ফুট | |
| রাজপথ | বিবেকানন্দ রোড | ৮৫ ফুট | |
| ১৩ নং | কটন স্ট্রিট | ১৫ ফুট থেকে ২০ ফুট | উৎকলমণি গোপবন্ধু সরণি |
| রাজপথ | মেছুয়াবাজার স্ট্রিট | ৫০ ফুট | মদনমোহন বর্মন স্ট্রিট ও কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট |
| ১৪ নং | হ্যারিসন রোড | ৭০ ফুট | মহাত্মা গান্ধী রোড |
| রাজপথ | | | |
| ১৫ নং | ক্যানিং স্ট্রিট | ৪০ ফুট | বিপ্লবী রাসবিহারী বোস রোড |
| রাজপথ | | | |
| | কলুটোলা স্ট্রিট | ৪০ ফুট | অনাগরিক ধর্মপাল স্ট্রিট (আংশিক)। বাকি অংশ কলুটোলা স্ট্রিট |
| | মির্জাপুর স্ট্রিট | ৪০ ফুট | সূর্য সেন স্ট্রিট |
| ১৬নং | ডালহাউসি স্কোয়ার নর্থ | ১০০ ফুট | |
| রাজপথ | লালবাজার স্ট্রিট | ৬৫ থেকে ৭০ ফুট | |
| | বৌবাজার স্ট্রিট | ৬০ ফুট | বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিট |
| ১৭নং | এসপ্ল্যানেড রো ইস্ট | ৯৫ ফুট | সিধু কানু ডহর |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৭নং | এসপ্ল্যানেড রো ইস্ট | ৯৫ ফুট | সিধু কানু ডহর |
| রাজপথ | ধর্মতলা স্ট্রিট | ৪০ ফুট থেকে ৬৫ ফুট | লেনিন সরণি |
| ১৮ নং | অকল্যান্ড রোড | ১০০ ফুট | ক্ষুদিরাম বোস রোড |
| রাজপথ | লরেন্স রোড | ১০০ ফুট | |
| | অক্টারলোনী রোড | ১০০ ফুট | রাসমণি অ্যাভেনিউ |
| | জানবাজার রোড | ৪০ ফুট থেকে ৫০ ফুট | সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোড |
| ১৯নং | আউটরাম রোড | ৬০ ফুট | |
| রাজপথ | পার্ক স্ট্রিট | ৬০ ফুট থেকে ৮০ ফুট | |
| ২০নং | কুইন্স ওয়ে | ৫০ ফুট | |
| রাজপথ | থিয়েটার রোড | ৬০ ফুট | শেক্সপিয়ার সরণি |

এই রাজপথগুলি ছাড়াও সারা কলিকাতা জুড়ে অনেক অপ্রধান রাস্তা আর গলিপথ ছড়িয়ে আছে। বর্তমানে কলিকাতার সেই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা ও গলিপথগুলির আলোচনাই আমাদের উদ্দেশ্য। ভবিষ্যতে প্রধান রাজপথগুলির সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার ইচ্ছা রইল।

## ৩

# কলিকাতা ও বিদেশের অন্যান্য নগরীর জনপদ—তুলনামূলক আলোচনা

পূর্বের অধ্যায়ে রাস্তার যে তালিকা দেওয়া হয়েছে তা থেকে দেখা যাচ্ছে যে উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রসারিত রাজপথগুলি পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে প্রসারিত রাজপথের থেকে অধিকতর প্রশস্ত। সারকুলার রোড ও চৌরঙ্গী রোডের প্রসার যেখানে যথাক্রমে ১৩২ ফুট ও ১০৫ ফুট সে তুলনায় হ্যারিসন রোড বা ধর্মতলা স্ট্রিটের প্রসার যথাক্রমে ৭০ ফুট ও ৪০ থেকে ৬৫ ফুট। এর প্রধান কারণ, গ্রামীণ কলিকাতা ধীরে ধীরে শহরে রূপান্তরিত হওয়ায় ঘরবাড়ি নির্মাণের সুষ্ঠু নিয়মাবলী (The Adequate Building Laws) সর্বত্র যথাযথ প্রযুক্ত হয়নি। ফলে আধুনিক প্রথা অনুযায়ী রাজপথের দুইধারের প্রয়োজনীয় জমি ছাড় দিয়ে ঘরবাড়ি নির্মাণের নিয়মরীতি সর্বত্র সমানভাবে মানা হয়নি। আধুনিক নগর হিসাবে এইখানেই একদিকে যেমন কলিকাতার সংকীর্ণতা ও সীমাবদ্ধতা, আর একদিকে তেমনি কলিকাতার একান্ত নিজস্ব বিশিষ্টতা। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে ওঠা কয়েকটি প্রধান নগরের সঙ্গে তুলনা করলে শহর কলিকাতার এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সম্যক ধারণা লাভ করা যায়।

লন্ডনের রূপকারেরা শহর পরিকল্পনার বিষয় নিয়ে অনেক মাথা ঘামিয়েছেন। এ বিষয়ে ''The Royal Commission on London Traffic, 1905'' যে তথ্যপূর্ণ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন, তারই প্রথম খণ্ড থেকে কিছু অংশ তুলে দেওয়া হল : ''The Projects put forward by the Advisory Board of Engineers are based upon the view that those entrusted with the duty of providing for the wants of London in years to come, ought to have before them a carefully thoughtout plan and definite principles upon which they should work. They instance the case of Paris, important Sections of which city were gradually remodelled and new parts laid out, between the year 1793 and 1889, in general accordance with Schemes elaborated in 1793 and again in 1854. It stands to reason that any plan, however, skilfully devised, which aim at taking effect over a long period of time, may in some degree require modification, in the light of experience, or owing to change of condition : the point is to secure that, in future, new streets shall be constructed, and improvements in old streets shall be effected, not haphazard and peace-meal as hitherto, but in relation to the general needs of London, and in pursuance, so far as possible, of a fixed policy, which should be followed with persistent effort over a great length of time. Property could be acquired under advantageous conditions and other preparatory steps taken, as opportunity might offer, if this course were adopted.''

লন্ডন শহরের ভবিষ্যৎ রূপরেখার প্রতি সযত্ন লক্ষ্য রেখে এবং নির্দিষ্ট মৌলিক তথ্যের ওপর ভিত্তি করে অ্যাডভাইসরি বোর্ড অফ ইঞ্জিনিয়ারস্ এখানে কতকগুলি প্রকল্প পেশ করেছেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে তাঁরা প্যারিস নগরীর পুনর্গঠনের পরিকল্পনাটির কথা উল্লেখ করেছেন। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে

ওই নগরীর পুনর্গঠনের জন্য একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে এটি সংশোধিত হয়। এর ভিত্তিতে ১৭৯৩ থেকে ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্যারিস শহরে কতকগুলি বিশেষ অঞ্চলের ধীরে ধীরে পুনর্গঠন ও নতুন অংশের বিন্যাস করা হয়। একথা অস্বীকার করা যায় না যে কোনও পরিকল্পনা নৈপুণ্যের সঙ্গে রচিত এবং দীর্ঘদিন ধরে রূপায়িত হলেও অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে অথবা প্রয়োজনের তাগিদে তার মধ্যেও পরিবর্তন আবশ্যক হয়ে পড়ে। একটা বিষয়ের প্রতি সব সময় খেয়াল রাখা দরকার যে ভবিষ্যতে নতুন রাস্তা নির্মাণের সময় অথবা পুরানো রাস্তার উন্নতিবিধানের সময় এলোমেলো অথবা আংশিক উন্নতির ব্যবস্থা না করা। বরং লন্ডন শহরের সার্বিক প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রেখে একটি নির্দিষ্ট প্রকল্পকে দীর্ঘ সময় ধরে অবিশ্রান্ত উদ্যোগে রূপায়ণের সময় সুবিধাজনক শর্তে জমি অধিগ্রহণ এবং সুযোগমতো অন্যান্য প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

এই প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে অ্যাডভাইসরি বোর্ড অফ ইঞ্জিনিয়ারস্ দুটি সুপারিশ করেন :

"(1) That new streets or widened streets should be laid out according to the following standard of widths from house to house, depending upon their importance and the degree to which they are likely to attract traffic :—

| | | |
|---|---|---|
| Main Avenue | ... | 140 feet |
| First class Arterial Streets | ... | 100 " |
| Second-class Streets | ... | 80 " |
| Third-class Streets | ... | 60 " |
| Fourth-class Streets | ... | 40 or 50 feet |

"The Width in each case includes footways on either side and no street should be less than 40 feet wide.

"This standard of width is intended to be applied within London and also in the suburbs.

"We agree in this conclusion, and are further of opinion that as land comes into use for building in any part of "Greater London" provision should be made for an adequate width of streets, especially in connection with through traffic, and that the necessary powers should be given by Act of Parliament.

"(2) That street improvements should be undertaken in conformity with a carefully considered plan, designed to meet the requirements of through-traffic, which may be carried out over a long series of years : we agree in this conclusion also."

উপরের এই সুপারিশগুলির সঙ্গে লন্ডনের নতুন গৃহ নির্মাণ ও রাস্তা নির্মাণের উপবিধিগুলি (Bye laws) সুষ্ঠুভাবে কার্যকরী করা হতে থাকে। একই সঙ্গে সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়। এর ফলে লন্ডনের বিশাল পরিবহন ব্যবস্থা সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হতে থাকে।[১]

এবার আমেরিকার দিকে তাকানো যাক। আমেরিকায় সর্বত্র রাস্তার স্থিরীকৃত প্রস্থ হল এইরূপ :[২]

| | | |
|---|---|---|
| দু'জোড়া ট্রাম লাইন | ... .... | ২০ ফুট। |
| (For double Track Tramways) | | |
| প্রত্যেক সারি গাড়ির জন্য | .... | ৪ ফুট। |
| (For each line of vehicles) | | |
| প্রত্যেক সারি পথচারীর জন্য | .... | ২ ফুট। |
| (For each line of pedestrians) | | |

প্রতিটি রাস্তার প্রস্থ যা হবে তার $\frac{১}{৩}$ অংশ চওড়া হবে ফুটপাথ। সুতরাং ১০০ ফুট চওড়া রাস্তার অন্তত দুটি ১৬ ফুট চওড়া ফুটপাথ থাকবে। রাস্তার মাঝখান দিয়ে ২০ ফুট চওড়া ট্রাম চলাচলের রাস্তা থাকবে। বাকি ৪৮ ফুট রাস্তায় ৬টি গাড়ি (6 Traffic-widths) চলাচল করবে। এতে দেখা যায়

মাঝখানের ট্রাম চলাচলের রাস্তার দু'পাশে ৩ সারি করে গাড়ি সহজেই চলাচল করতে পারে। আমেরিকার কয়েকটি শহরে ফুটপাথের পরিধি বাড়িয়ে ৪০ শতাংশ ও তার অধিক করার ব্যবস্থা হয়েছে। পরে ট্রাম তুলে দেওয়ায় রাজপথের পরিবাহী ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটনে প্রতিটি রাস্তার প্রস্থ ন্যূনপক্ষে ৫০ ফুট করার ব্যবস্থা রয়েছে। কোথাও বা তা বাড়িয়ে ৬০ ফুট করার ব্যবস্থা আছে। বিল্ডিং লাইনকে রাস্তা থেকে ৯০ ফুট দূরে রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। প্রয়োজনবোধে এই ছাড়া জমিকে রাস্তার অন্তর্গত করা যেতে পারে। বিল্ডিং লাইন আইনকে নিউইয়র্ক নগরীতেও প্রয়োগের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ফিফথ অ্যাভিনিউ-এর মতো প্রশস্ত রাজপথের বিল্ডিং লাইনকে স্থায়ীভাবে আরও সরিয়ে ১০০ ফুট করা হয়েছে।

ওয়াশিংটন শহরের রাস্তা নির্মাণের আইন (Road and Street Regulations) অনুসারে রাজপথগুলি এইভাবে চিহ্নিত হয়েছে :

| | |
|---|---|
| প্রধান রাজপথ (Main thoroughfares) | —১৬০ ফুট প্রশস্ত |
| অপ্রধান রাজপথ (Secondary thoroughfares) | —১২০ ফুট প্রশস্ত |
| স্থানীয় পথ (Local Streets) | —৮০ থেকে ৯০ ফুট প্রশস্ত |

ওয়াশিংটন শহরের মতো নিউইয়র্কেও একটি আইন বলবৎ আছে। সেই আইনের বলে রাজপথের চরিত্র অনুসারে প্রস্থ হবে যথাক্রমে ১০০, ৮০ ও ৬০ ফুট। কিন্তু নিউইয়র্ক নগরীর সারি সারি অসংখ্য বহুতল বিশিষ্ট অট্টালিকা তৈরি হওয়ায় ১০০ ফুট চওড়া রাস্তাতেও সূর্যের আলো প্রবেশ করতে পারে না। রাস্তাগুলি যানজটে আক্রান্ত, পথচারীদের পক্ষে বিপদজনক। এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে রাস্তার প্রশস্ততার সঙ্গে বাড়ির উচ্চতারও একটা বিধিবদ্ধ সামঞ্জস্য থাকা বিশেষ প্রয়োজন।

১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে ক্যালিফোরনিয়ার রাস্তাঘাট সম্বন্ধে প্রথম ব্যাপক অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করা হয় যার তত্ত্বাবধানে ছিলেন "Legislative Joint Fact Finding Committee"। সমগ্র ক্যালিফোরনিয়াতে রাস্তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদার রূপরেখা স্থির করা এই কমিটির উদ্দেশ্য ছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আমেরিকায় রাস্তাঘাটের পরিকল্পনার আমূল পরিবর্তন করা হয়। এর জন্য এক বিশেষ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় ১৯৫০ থেকে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। "The First Federal and Road Act" ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে গৃহীত হয়। এই আইনটি কার্যকরী করার জন্য ৫ বছরের জন্য ৭৫ মিলিয়ন ডলারের এক বিশেষ তহবিল গঠন করা হয়।

আরেকটি চমকপ্রদ ঘটনা, ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে রাজপথ পরিকল্পনার ব্যাপারে আমেরিকা সরকার একটি আইন প্রণয়ন করেন। এই আইনে আমেরিকার অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক রাষ্ট্রকে তার ৫০ হাজার অধিবাসী অধ্যুষিত প্রত্যেকটি শহরের জন্য রাস্তাঘাট নির্মাণের ব্যাপারে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করার কথা বলা হয়।[৩]

এই সব আইন যথাযথ রূপায়ণের মাধ্যমে আমেরিকা তার রাস্তাঘাট নির্মাণে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। শুধু তাই নয়, রাস্তাঘাট নির্মাণের পরিকল্পনা রূপায়ণের সময় তারা "continuous process"-কে গ্রহণ করেছে। প্রয়োজন বোধে তার পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিবর্জন করেছে।

ইউরোপীয় ভূখণ্ডের অন্তর্গত দেশগুলি বিশেষত ফ্রান্স, জার্মানি, অস্ট্রিয়া, ইটালি প্রভৃতি দেশ সড়ক নির্মাণের ব্যাপারে অনেক দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে বার্লিনে যে জার্মান আইন প্রয়োগ করা হয়েছিল সেই আইনে পথের বিন্যাস এইভাবে নির্ধারিত হয়েছিল :

| | |
|---|---|
| প্রধান সড়ক পথ (Main Thoroughfares) | ৩০ মিটার থেকে শুরু অর্থাৎ ৯৮ ফুটের উপর। |
| সহায়ক সড়ক পথ (Secondary Thoroughfares) | ২০ মিটার থেকে ৩০ মিটার-এর মধ্যে অর্থাৎ ৬৫ থেকে ৯৮ ফুটের মধ্যে। |
| স্থানীয় পথ | ১২½ মিটার থেকে ২০ মিটার-এর মধ্যে, অর্থাৎ |

(Local Streets) ৪০ থেকে ৬৫ ফুটের মধ্যে।

এই আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে যান চলাচলের সুবিধার জন্য ও স্বাস্থ্যসম্মত বিবিধ দিক থেকে রাজপথের প্রশস্ততার ব্যাপারে আমেরিকার স্থিরীকৃত আইনই (Standard Law) সর্বত্র গ্রাহ্য হওয়া উচিত। যুদ্ধের পরবর্তীকালে আমেরিকায় যান চলাচলের জন্য রাস্তাঘাটের অবস্থা অনেক উন্নত হয়েছে। বিল্ডিং ল'কে (Building Law) কঠোরভাবে প্রয়োগ করে, পথের মধ্যে মধ্যে উড়ালপুল প্রভৃতি তৈরি করে, একদিকে যেমন রাস্তার প্রশস্ততা বৃদ্ধি করা হয়েছে অন্যদিকে যানবাহন চলাচলের গতি (mobility) দ্রুততর হয়েছে। প্রতিটি পাশ্চাত্য দেশেই এই ব্যবস্থা ফলপ্রসূ হয়েছে।

এবার বলি কলিকাতার কথা। কলিকাতাকে এক সময় বলা হত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় নগরী (The Second City of the British Empire) অর্থাৎ ইংরেজদের লন্ডন নগরীর পরেই স্থান ছিল কলিকাতার। এই শহরের ব্যবসাবাণিজ্যে তখন ছিল রমরমা। রাজপথগুলি ছিল বিচিত্র হর্ম্যমালায় সুসজ্জিত, যা কিনা বিদেশি পর্যটকদের বিস্ময় সৃষ্টি করত। ইংরেজরা তাই আদর করে কলিকাতাকে বলত প্রাসাদনগরী (The City of Palaces)। ইংরেজ আমলে এই শহরের ঐশ্বর্য বৈভবের কথা ছিল প্রবাদস্বরূপ। ইংরেজদের স্নেহধন্য হয়েও কলিকাতার সড়ক, গলি ও রাজপথ কেন লন্ডনের মতো প্রশস্ত ও ঋজু হল না ! অথবা ওয়াশিংটন নগরীর মতো জাল-সদৃশ (Grille system) হল না কেন ? এগুলিকে তো আধুনিক নগরের রাস্তাঘাট পত্তনের প্রধান দিশারী বলা যেতে পারে। এর উত্তর পেতে হলে ওলটাতে হবে ৩০০ বছরের কলিকাতার ইতিহাসের পাতা। সুতানুটি, কলিকাতা, গোবিন্দপুর নামে যে তিনখানা গ্রাম নিয়ে ইংরেজ কোম্পানির জমিদারি শুরু, তারই সঙ্গে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নতুন নতুন গ্রাম সংযোজিত করে ধীরে ধীরে গ্রামীণ কলিকাতার যে নগরায়ন শুরু হয়েছিল, সেই ইতিহাসের কাহিনী এখানে বলা হবে। বিচ্ছিন্ন ভাবে, বিভিন্ন সময়ে পরিকল্পনাহীন ভাবে এই সংযুক্তি না ঘটলে কলিকাতার রাস্তাঘাটের বিন্যাস হয়তো আরও আধুনিক, আরও প্রশস্তরূপে দেখা যেত।

তথ্যসূত্র :


১ Joint Report on City and Suburban, Main Road Projects—James Maden & Albert de Bois Shrosbree.

২ The Classification made by Mr. John Nolns (Cambridge, Massachusetts, U.S.A.) was put forward at the National Congress of City Planning, 1911.

৩ Highway Planning & Programming—James O Granumm & S.F. Cofman (U.S.I.S. Library-র সৌজন্যে)

# ৪

# ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যবিস্তার সূত্রে কলিকাতার ক্রমবিকাশ

আধুনিক কলিকাতা গড়ে ওঠার মূলে ইংরেজ কুঠিয়াল জোব চার্নকের ভূমিকাই প্রধান। এই জোব চার্নক কোন সময় যে ভারতে আসেন তা ঠিক জানা যায় না। কেউ বলেন ১৬৫৫ খ্রিস্টাব্দে, আবার কেউ বা বলেন তারও পরে। ১২-১৩ জানুয়ারি ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দের কোম্পানির নথিপত্র থেকে জানা যায় যে তিনি প্রথমে কোম্পানির কাশিমবাজার কাউন্সিলের কনিষ্ঠ সদস্য ছিলেন (Junior Member of the Council of Cossimbazar), পরে ১৬৮০ খ্রিস্টাব্দে কাশিমবাজার কুঠির অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছিলেন (Chief of the Cossimbazar factory and Second in the Council of the Bay)।[১] পরবর্তীকালে তিনি বাংলাদেশে কোম্পানির প্রধান অধ্যক্ষও হয়েছিলেন (The Company's principal agent in Bengal)[২]।

জোব চার্নক তিনবার কলিকাতার অন্তর্গত সুতানুটি গ্রামে আসেন। প্রথমে এসেছিলেন হুগলি থেকে পালিয়ে। নবাবের আদেশ অমান্য করে জোব চার্নক গোপনে হুগলির কুঠিতে উপস্থিত হলে (এপ্রিল, ১৬৮৬ খ্রিস্টাব্দ) হুগলির মোগল ফৌজদার আবদুল গনির সঙ্গে স্থানীয় ইংরেজ কুঠির সৈন্যদের সশস্ত্র সংঘর্ষ বাধে। সংঘর্ষে জয়ী হলেও জোব চার্নক নবাব শায়েস্তা খাঁর ভয়ে অল্প দিনের মধ্যে হুগলি ত্যাগ করে বালেশ্বর যাবার পথে সুতানুটিতে আশ্রয় গ্রহণ করেন (২০ শে ডিসেম্বর, ১৬৮৬ খ্রিস্টাব্দ) এবং কিছুদিন এখানে বসবাসও করেন।

১৬৮৭ খ্রিস্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে চার্নক হিজলীতে উপস্থিত হয়ে হিজলী অধিকার করেন। মোগল সৈন্যের প্রতিআক্রমণের ভয় ও ম্যালেরিয়া জ্বরে পর্যুদস্ত হয়ে অবশেষে শায়েস্তা খাঁর অনুমতি নিয়ে চার্নক প্রথমে উলুবেড়িয়া ও পরে সুতানুটিতে ফিরে আসেন। তারিখটা ছিল ২০ শে সেপ্টেম্বর ১৬৮৭ খ্রিস্টাব্দ।

বাংলাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তারের জন্য মোগল শাসকদের সঙ্গে জোব চার্নকের বিরোধিতা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিলেতি কর্মকর্তারা ভালো চোখে দেখেননি। তাঁরা ক্যাপ্টেন হীথকে (Captain Heath) বিলেত থেকে পাঠিয়েছিলেন প্রয়োজনীয় নির্দেশ ও কর্তৃত্ব দিয়ে। এই ক্ষমতার বলে ক্যাপ্টেন হীথ জোব চার্নক ও তাঁর সঙ্গীদের ৫ই মার্চ ১৬৮৯ খ্রিস্টাব্দে জোর করে জাহাজে তুলে প্রথমে চট্টগ্রাম, পরে সেকালের কোম্পানির সদর দপ্তর মাদ্রাজে নিয়ে আসেন। এদিকে সুরাটের কুঠির অধ্যক্ষ স্যার জন চাইল্ডের (Sir John Child) প্রচেষ্টায় মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেব ইংরেজদের প্রতি প্রসন্ন হন। ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দের ২৭ শে ফেব্রুয়ারি সম্রাট ইংরেজদের বাণিজ্যের জন্য নতুন এক ফরমান প্রদান করেন।[৩] ইতিমধ্যে বাংলার শাসনকর্তা ইব্রাহিম খাঁর আহ্বান পেয়ে জোব চার্নক কালবিলম্ব না করে মাদ্রাজ থেকে সপরিবারে কাউন্সিলের সদস্যবর্গ ও ফ্যাকটরদের সঙ্গে ৩০ জনের এক সৈন্যদল নিয়ে তৃতীয় ও শেষবারের মতো সুতানুটিতে আগমন করেন ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দের ২৪ শে আগস্ট।

চার্নক অতঃপর কলিকাতার অন্তর্গত সুতানুটি গ্রামে কুঠি স্থাপনে তৎপর হন। এর আগে তিনি উলুবেড়িয়া, হুগলি ও হিজলীতে কুঠি স্থাপন করে নির্বিবাদে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তিনটি স্থানই তাঁর উদ্যোগের প্রতিকূল ছিল। হুগলিতে মোগলের দোর্দণ্ড

প্রতাপ, উলুবেড়িয়াতে আন্তঃবাণিজ্যের অসুবিধা আর হিজলীতে প্রচণ্ড ম্যালেরিয়া—কাজেই এই তিনটি স্থানই তাঁকে পরিত্যাগ করতে হয়। সুতানুটিকে নির্বাচন করার কারণ—এর উপকণ্ঠে ছিল বাদা অঞ্চল ও খাল বিল, ধারেই ছিল প্রচণ্ড বেগবতী হুগলি নদী। এখানে কুঠি স্থাপন করলে মোগল বা মারাঠা কেউই তরঙ্গসংকুল হুগলি নদী অতিক্রম করে ইংরেজ কুঠির উপর আক্রমণ করতে পারবে না। তা ছাড়া জায়গাটি বনজঙ্গলে ভরা ও অস্বাস্থ্যকর হওয়ায় সহসা মোগলদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে না। সুতানুটির অভ্যন্তরে একটি চওড়া রাস্তা উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে প্রসারিত হওয়াতে দেশের মধ্যে যোগাযোগের সুবিধা করে দিয়েছিল। সুতানুটি ও তার চারধারের গ্রাম এক ব্রাহ্মণ জমিদারের (সাবর্ণ চৌধুরী) জমিদারির অন্তর্ভুক্ত। প্রয়োজন হলে গ্রামগুলি বা অংশবিশেষ সুবিধামত দরে জমা-বন্দোবস্ত করা যেতে পারে। সে সময় সুতানুটিতে একটি মাত্র কোঠা বাড়ি ছিল। এই বাড়িতে প্রয়োজনমত কোম্পানির কর্মচারীদের রেখে কাজ চালানো সুবিধাজনক। সুতানুটির ধারে হুগলি নদী ছিল অতি গভীর। এখানে বড় বড় জাহাজ সহজে এসে নোঙর করতে ও মাল ওঠানো-নামানোতে সক্ষম হবে। মোগল শাসনকর্তারা সহসা কোনও হাঙ্গামা বাধালে সাবধান হওয়ার ও আত্মরক্ষার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে। হুগলির তুলনায় সুতানুটি সমুদ্রের অনেক নিকটে। তা ছাড়া সুতানুটি থেকে সমুদ্রসঙ্গম ও হুগলির কুঠিগুলি বেশি দূরে নয়। এখান থেকে হুগলির সংবাদও দ্রুত পাওয়া যাবে। বিপদ এলে জাহাজে চড়ে সাগরসঙ্গমে উপস্থিত হওয়ারও খুব সুবিধে। শেঠ ও বসুকেরা (বসাক) অনেক পূর্ব থেকেই সুতানুটিতে হাট-বাজার স্থাপন করেছিলেন। তাঁদের কাছ থেকে রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যাদি সহজেই সংগ্রহ করা যেতে পারে। তা ছাড়া হাট-বাজারে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য ও জিনিসপত্র পাওয়া যায়। কুঠি স্থাপন করলে খরচও অনেক কম হবে।[৪] এইসব সাত-পাঁচ ভেবে চার্নক শেষমেশ সুতানুটি গ্রামকেই ইংরেজের কুঠি নির্মাণের স্থান নির্বাচন করলেন। তিনি যখন এই গ্রামে পা রাখলেন, তখন "The resorted merchants were received with respect by the Commander of the Thana Fort and the Governor of Hugli."[৫]

১০ই ফেব্রুয়ারি ১৬৯১ খ্রিস্টাব্দে চার্নককে আসাদ খাঁর মোহরযুক্ত সম্রাটের যে ফরমান প্রদান করা হয় তাতে শর্ত ছিল যে সর্বপ্রকার শুল্কের পরিবর্তে কেবলমাত্র বার্ষিক ৩০০০ টাকা জমা দিলে ইংরেজ কোম্পানি বাংলাদেশে নির্বিঘ্নে ব্যবসা-বাণিজ্য নির্বাহ করতে পারবে।[৬]

**তথ্যসূত্র :**


১ Calcutta Old and New—Cotton, P-435
২ Calcutta Past and Present—Blechynden, P-6
৩ Stewart's Bengal (App. VII), Bruce Annals II (639-640)
৪ কলিকাতা সেকালের ও একালের—হরিসাধন মুখোপাধ্যায়
৫ Hedge's Diary, II, 86-87
৬ Stewart's Bengal, Appendix P-VI

## ৫

# সুতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিবর্তনের ইতিকথা, ১৬৯০-১৭০৪

কলিকাতায় ইংরেজ কোম্পানির অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়ে জোব চার্নক কোম্পানির কর্মচারীদের বাসস্থান ও কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে স্থানীয় জমিদার সাবর্ণ চৌধুরীদের পাকা কাছারি বাড়িটি ক্রয় করেন। আর তার সঙ্গে সঙ্গে কর্মচারীদের ধর্মীয় প্রয়োজন মেটানোর জন্য পর্তুগীজদের একটি Mass-house বা প্রার্থনাগৃহও ক্রয় করেন। কিন্তু ইংরেজ কোম্পানির বাণিজ্যকুঠিকে সুদৃঢ় করে তোলার আগেই জোব চার্নক কলিকাতার মাটিতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (১৬৯৩ খ্রিস্টাব্দ, ১০ই জানুয়ারি)।

মৃত্যুর পূর্বে জোব চার্নক কলিকাতা কুঠির কর্তৃত্ব প্রদান করে যান ফ্রান্সিস এলিসকে। কিন্তু এলিসের তত্ত্বাবধানে কলিকাতা কুঠির অবস্থা ক্রমান্বয়ে খারাপ হতে থাকায় এদেশে কোম্পানির তৎকালীন সর্বময় প্রধান (Commissary General and Chief Governor of the Company's Settlement) স্যার জন গোল্ডস্বরো মাদ্রাজ থেকে কলিকাতায় এসে উপস্থিত হন। এখানে বাণিজ্য কুঠির হাল ফেরানোর জন্য তিনি কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। পর্তুগীজদের প্রার্থনাগৃহটি ভেঙ্গে ফেলা হয় আর কুঠিবাড়ির চতুষ্পার্শ্বে মাটির প্রাচীর গড়ে তোলার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু কুঠিবাড়ির রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে পাকাপাকি কোনও সামরিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার আগেই গোল্ডস্বরোও কলিকাতাতেই পরলোক গমন করেন ১৬৯৩ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে। কলিকাতা কুঠির ভার অর্পণের জন্য তিনি ঢাকা থেকে চার্নকের জামাতা চার্লস আয়ারকে তলব করলেও আয়ার তাঁর মৃত্যুর পূর্বে কলিকাতায় এসে পৌঁছতে পারেননি।

গোল্ডস্বরোর মৃত্যুর দু'মাস পরে ক্যাপ্টেন রবার্ট ডোরিল (Captain Robert Dorill) কোম্পানির একটি হুকুমনামা সঙ্গে নিয়ে কলিকাতায় আসেন এবং ২৫ শে জানুয়ারি ১৬৯৪ খ্রিস্টাব্দে সর্বসমক্ষে তা পাঠ করেন। ওই আদেশের বলে ফ্রান্সিস এলিসের কাছ থেকে সুতানুটি কুঠির ভার কেড়ে নিয়ে তাঁর স্থানে চার্লস আয়ারকে নিযুক্ত করা হয়। তাঁর এক কীর্তি সেন্ট জন চার্চের অভ্যন্তরে জোব চার্নকের সমাধির উপর একটি দর্শনীয় স্মৃতিসৌধ নির্মাণ। ১৬৯৪-৯৫ খ্রিস্টাব্দে কোর্ট অফ ডিরেক্টরস নির্দেশ দেন যে বাংলার প্রধান অধ্যক্ষ (Chief Agent)-এর বাসস্থান হবে সুতানুটি। তাঁদের নির্দেশে আরও বলা হয় যে কোম্পানির ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তারের জন্য আরও দুই তিনটি গ্রাম অধিকারের ব্যবস্থা করা হোক। [১]ওই নির্দেশ পাবার পর চার্লস আয়ার স্থানীয় জমিদারের কাছ থেকে অতিরিক্ত স্থান সংগ্রহের ও তার আইনগত স্বত্ত্ব (legal right) অধিকারের চেষ্টা করতে থাকেন। কিন্তু তাঁর সে চেষ্টা সফল হয়নি। পরবর্তীকালে শোভা সিংহের বিদ্রোহ ইংরেজদের কাছে এক সুবর্ণ সুযোগ এনে দেয়।

দক্ষিণ রাঢ়ের শক্তিশালী ভূইঞাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শোভা সিংহ। তাঁর পিতা রঘুনাথ সিংহ সরকার মান্দারণের অন্তর্গত মেদিনীপুর জেলার চেতুয়া পরগনা ক্রয় করে শাসন করতে থাকেন। শোভা সিংহ জমিদার হবার পর বরদা পরগনার বাগদী রাজাদের পরাজিত করে তাঁদের রাজ্য অধিকার করেন। মোগল শাসনের বিরুদ্ধে তাঁর নেতৃত্বে বিদ্রোহ প্রকাশ পায়। চন্দ্রকোনার রাজা রঘুনাথ সিংহ, বিষ্ণুপুরের দ্বিতীয় গোপাল সিংহ এবং উড়িষ্যার পাঠান দলপতি রহিম খাঁর সহিত

মিলিত হয়ে তিনি ১৬৯৬ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমানের রাজা কৃষ্ণ রায়কে পরাজিত ও নিহত করেন।

বিদ্রোহী নায়ক শোভা সিংহ ও আফগান দলপতি রহিম খাঁর অত্যাচারে দেশের শান্তি বিঘ্নিত হয়। বিদ্রোহীরা দ্রুত হুগলি ও থানা দুর্গের নিকটে চলে আসে। এই দুই জায়গায় ফৌজদার ও হুগলি নদীর ধারের জমিদারবৃন্দ আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য ইংরেজ, দিনেমার ও ফরাসিদের সাহায্যপ্রার্থী হন। এই সুযোগে ইংরেজ বণিকেরা তাঁদের বাণিজ্য কুঠিগুলিকে সুরক্ষিত করার জন্য ঢাকার নবাব ইব্রাহিম খাঁর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করলেন। লিখিত কোনও অনুমতি দেওয়া হল না কারণ পূর্ববর্তী রাজকীয় ফরমানে নির্দেশ ছিল যে সুতানুটিতে ইংরেজ বণিক কোনও পাথর বা ইটের বাড়ি বা দেওয়াল নির্মাণ করতে পারবে না।[২] নবাব তখন আজ্ঞা দিলেন যে ইউরোপীয় বণিকগণ তাদের নিজস্ব কুঠি রক্ষার ব্যবস্থা নিজেরাই করতে পারবে।

ইউরোপীয় বণিকদল কালবিলম্ব না করে এ সুযোগের সদ্ব্যবহারে অগ্রসর হলেন। ইংরেজ, ফরাসি ও ওলন্দাজগণ যথাক্রমে সুতানুটি, চন্দননগর ও চুঁচুড়ায় দুর্গ নির্মাণে তৎপর হলেন। শোভা সিংহের বিদ্রোহই ইংরেজ সৌভাগ্যের সূচনা করে। এর ফলেই ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল।

দুর্গ নির্মাণের কাজ দ্রুতভাবে চললেও ইংরেজরা সব সময় চিন্তিত ছিল যে জমির উপর তাদের কোনও কায়েমি-স্বত্ব নেই। এই জন্য তাঁরা ভাগীরথীর তীরবর্তী সুতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর নামে তিনখানি গ্রাম কিনতে মনস্থ করলেন। এই গ্রামগুলি কেনার ব্যাপারে হুগলির ভূতপূর্ব ফৌজদার জৈনুদ্দীন খাঁ ইংরেজ কোম্পানিকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন। তিনি রাজকুমার ফারুকশিয়ারকে রাজি করিয়ে ১৬ হাজার টাকা নজরানা প্রদানে এই অনুমতিপত্র আদায় করেন। খোজা সারহাদ নামে এক আর্মানিও এই বিষয়ে ইংরেজদের যথেষ্ট সহায়তা করেন। অবশেষে সুতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর গ্রামগুলি কেনার অনুমতি পেয়ে ইংরেজ কোম্পানি সাবর্ণ জমিদার রামচাঁদ রায়, মনোহর রায় প্রমুখের কাছ থেকে ১৩০০ টাকায় ওই তিনখানি গ্রামের প্রজাস্বত্ব ক্রয় করেন। দলিল সম্পাদনের তারিখ ছিল ১০ই নভেম্বর ১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দ।[৩]

সুতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর এই তিনখানি গ্রাম ক্রয়ের খবর ১৬৯৯ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনে পৌঁছালে কোর্ট অফ ডিরেক্টরস নির্দেশ দিলেন, ''Calcutta should be advanced to the dignity of a presidency that the President should draw a salary of Rs. 200/- per month with an additional gratuity of Rs. 100/-; that he should be assisted by a Council of 4 members ; of whom the first should be the Accountant, and the second the Warehouse Keeper, the third the Marine Purser ; and the fourth the Receiver of the Revenues.''।[৪] ১৭০০ খ্রিস্টাব্দের ২৬ শে মে প্রথম প্রেসিডেন্ট পদে নিযুক্ত হলেন স্যার চার্লস আয়ার।[৫] এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে ১৬৯৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি লন্ডনে ফিরে যান। পুনরায় ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে ফিরে এসে প্রেসিডেন্ট হন। স্বাস্থ্যভঙ্গের অজুহাতে চার্লস সাত মাস বাদে পরিশেষে ইংল্যান্ডে ফিরে যান। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন জন বেয়ার্ড (John Beard)।[৬]

স্যার জন গোল্ডস্বরো ১৬৯৩ খ্রিস্টাব্দে যে স্থানটি দুর্গ নির্মাণের উপযুক্ত বলে স্থির করেছিলেন তা ডিহি কলিকাতার মধ্যে অবস্থিত। সেই সময় কলিকাতা প্রভৃতি গ্রাম সাধারণভাবে সুতানুটি বলেই পরিচিত ছিল। জোব চার্নকের কলিকাতা আগমনের দু'বছর পূর্বে ও পরে সুতানুটি ডায়রি (১৬৮৮ খ্রি.) ও সুতানুটি কন্সালটেসনস্ (১৬৯০ খ্রি.)-এ কলিকাতার বদলে সুতানুটির উল্লেখ করা হয়েছে।[৭]

প্রথম ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের নির্মাণকার্য ১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দে সমাপ্ত হয়। কোর্ট অফ ডিরেক্টরস ২৪ ডিসেম্বর ১৬৯৯ খ্রিস্টাব্দে লেখা পত্রে তাঁদের মনোভাব এইভাবে প্রকাশ করেছিলেন : ''We approved of the fortification, you have made, and wish you to strengthen it by degrees as you can without any public offence to the Country or the great men.'' কলিকাতার কর্মচারীদের প্রতি কোর্ট অফ ডিরেক্টরের প্রচ্ছন্ন সাবধানবাণী লক্ষ করার মতো। ওই চিঠিতে দুর্গের নাম ফোর্ট উইলিয়াম রাখার নির্দেশও দেওয়া হয়।[৮]

দুর্গের মধ্যে একটি ভালো হাসপাতাল, সৈন্যদের বাসস্থান প্রভৃতি নির্মাণের ব্যবস্থা করা হয়।

কোম্পানির অনুদানে ও জনসাধারণের চাঁদায় একটি গির্জাও নির্মাণ করা হয়। সেন্ট অ্যান নামে গির্জাটি নামাঙ্কিত হয়েছিল। ৯ই মে ১৭০৯ খ্রিস্টাব্দে বিশপ অ্যান্ডারসন এটির উদ্বোধন করেন।[৯]

ইতিমধ্যে ১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দে বিলাতে আরেকটি নতুন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠিত হয়। এর নামকরণ হয় ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং পুরনো কোম্পানিটির নাম হয় লন্ডন কোম্পানি। নতুন কোম্পানির কর্তারা ইংল্যান্ডের রাজকীয় সনদ নিয়ে ভারতে বাণিজ্যের জন্য এলেন, একজন রাজদূত পাঠালেন দিল্লির দরবারে। বাণিজ্য-স্বত্ব লাভের জন্য নানা চেষ্টা চালাতে লাগলেন। ফলে নতুন ও পুরাতন উভয় ইংরেজ কোম্পানির মধ্যে প্রচণ্ড বিরোধ বাধে। এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক স্টুয়ার্ট লিখেছেন, "It was during this period that the great contest between two English Companies took place in Bengal. The prince (Azim-Us-Shan) did not understand the subject, but took bribes from both parties. From the old Company he got Rs. 16,000 and from the new Rs. 14,000"। অবশেষে অনেক বিচার-বিবেচনার পর ১৭০২ খ্রিস্টাব্দে দুটি কোম্পানিকে সংযুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ১৭০৪ খ্রিস্টাব্দে এটি কার্যকর হয়।[১০]

**তথ্যসূত্র :**


১ Hedge's Diary II, p-94./Hydes Parochial Annals p. 35
২ The Good Old Days of Hon'ble John Company, Vol-I—W.H. Carey, p. 42
৩ Wilson's Early Annals, p. 117
৪ A Short History of Calcutta—A. K. Roy, p. 39
৫ The Good Old Day's of Hon'ble John Company, Vol. I—W. H. Carey, p. 42, p. 44
৬ Wilson's Early Annals p. 117
৭ Wilson's Early Annals p. 160
৮ Burnell & Yules's Glossary of Anglo Indian Terms, p. 329,
Wilson's Early Annals p. 320
৯ Wilson's Early Annals, p. 215
১০ A Short History of Calcutta—A. K. Roy, p. 43

# ৬

# কলিকাতার জমি জরিপ ব্যবস্থা

১৭০৬ খ্রিস্টাব্দে আদি কলিকাতার জমি জরিপের ব্যবস্থা হয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, সুতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর গ্রাম তিনটির সম্পূর্ণ স্বত্ব ইংরেজ কোম্পানির ছিল না। তাঁদের কেবলমাত্র রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা ছিল, যদিও তাঁরা জমি বিক্রয়, বণ্টন অথবা লীজ দিতে পারতেন। কোনও প্রজা জমির রাজস্ব দিতে অপারগ হলে তাঁরা সেই জমি বিক্রয় বা পুনরায় দখল নিতে পারতেন না। কেবলমাত্র বাকি খাজনার জন্য প্রজার অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক বা বিক্রয় করাতে পারতেন। এদিকে কোম্পানির জমির ওপর যত্রতত্র বিনা অনুমতিতে গৃহনির্মাণ হতে থাকে। বেআইনি গৃহনির্মাণ বন্ধ করার জন্য ২৭ মার্চ ১৭০৪ খ্রিস্টাব্দে কাউন্সিলের আদেশে একটি নতুন নথি প্রচলনের ব্যবস্থা হয়। "Lease, bills of sale, and agreements made by the free men inhabitants of Calcutta should be entered, the Secretary's fee to be two rupees for the registering the same."[১] কাউন্সিলের এই নির্দেশ সত্ত্বেও উপযুক্ত তদারকির অভাবে বেআইনি গৃহ নির্মাণ অব্যাহত থাকে। তাছাড়া যে অনুপাতে প্রজাবিলি হয়েছিল সেই অনুপাতে খাজনা আদায় হত না। অনেকে প্রতারণা করে বেশি জমি দখল করে ছিল। দখলি জমির পরিমাণের তুলনায় খাজনা কম দিত। ফলে আদায়ীকৃত রাজস্ব কম হত। কোম্পানিকে মোগল সরকারের কোষাগারে খাজনা দিতে বেগ পেতে হত। অতএব জমির পরিমাণ, জমি বণ্টন ও খাজনার পরিমাণ নির্ণয় করার জন্য কাউন্সিলের আদেশে ১৭০৬ খ্রিস্টাব্দে তিনটি গ্রামের জমি জরিপের ব্যবস্থা হয়।[২] তাতে দেখা যায় যে কলিকাতা নামে গ্রামটি দুটি ভাগে দেখানো আছে—প্রথমটি বাজার কলিকাতা, অন্যটি টাউন কলিকাতা। সুতানুটি ও গোবিন্দপুরকে পৃথক গ্রাম হিসাবে দেখানো হয়েছে। ওই গ্রামগুলিতে মোট জমির পরিমাণ, তাতে ঘর-বাড়ি নির্মাণের জন্য কত জমির ব্যবহার হয়েছে তার একটা চিত্র পাওয়া যায় :—

| | মোট জমির পরিমাণ | ঘরবাড়ির জমি |
|---|---|---|
| বাজার কলিকাতা | ৪৮৮ বিঘা ৯$\frac{৩}{৪}$ কাঠা | ৪০০ বিঘার মতো |
| টাউন কলিকাতা | ১৭১৭ বিঘা ১০ কাঠা | ২৪৮ বিঘার মতো |
| সুতানুটি | ১৬৯২ বিঘা ১২ কাঠা | ১৩৪ বিঘার মতো |
| গোবিন্দপুর | ১১৭৮ বিঘা ৭ কাঠা | ৪৭ বিঘার মতো |
| | মোট ৫০৭৬ বিঘা ১৮$\frac{৩}{৪}$ কাঠা | ৮২৯ বিঘার মতো |

সে সময় গোবিন্দপুরে লোকবসতি কম হওয়ার কারণে গোবিন্দপুরের অধিকাংশ স্থানই ছিল জঙ্গলে পরিপূর্ণ।[৩]

এই জরিপের ফলে যে সব অধিবাসী অতিরিক্ত জমি দখল করে কম খাজনা দিত, তারা ধরা পড়ে গেল। কোম্পানি সেইসব অতিরিক্ত জমি বাজেয়াপ্ত করে পুনরায় প্রজাবিলি করলেন। এই ব্যবস্থায় জমিদারির আয় বৃদ্ধি হয়েছিল। সে সময়ের কলিকাতার কালেক্টার ছিলেন আর্থার কিং (Arthur

King)। কলিকাতার প্রথম কালেক্টার হলেন রালফ্ শেলডন (Ralph Sheldon)। তিনি ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে ওই পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। জমি সংক্রান্ত ইংরেজি আইন কালেক্টরগণ প্রবর্তন করেন, যা পরবর্তীকালে বিশেষ ফলপ্রসূ হয়েছিল। সে সময় অনাদায়ী খাজনার জন্য প্রজাপীড়নের অনেক দৃষ্টান্ত আছে—প্রজাকে কাছারি বাড়িতে ডেকে এনে তাকে আটকে রেখে শাস্তি দেওয়া হত। এমনকি বেত্রাঘাতেরও ব্যবস্থা ছিল।[৪]

সে সময় অনুমানের উপর ভিত্তি করে অঙ্কিত আদি কলিকাতার একটি মানচিত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই মানচিত্রটি যে কে তৈরি করেছিলেন জানা যায়নি। এই মানচিত্রে সুতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর গ্রাম তিনখানির অবস্থিতি দেখানো আছে। বড়বাজারের অস্তিত্ব চিহ্নিত রয়েছে। কালীঘাট যাবার আগে চৌরঙ্গী গ্রামের পরিচিতিও দেওয়া আছে। এ ছাড়া দুটি খাল চিহ্নিত আছে—চিৎপুর খাল ও চাঁদনী খাল। কালীঘাটের কাছে আদি গঙ্গা সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত। হুগলি নদীর পশ্চিম তীরে সালকিয়া দুর্গ, থানা দুর্গ ও বেতোরের অবস্থিতি মানচিত্রে পরিস্ফুট করা হয়েছে। পাঠের সুবিধার জন্য মানচিত্রটি দেওয়া হল—

ব্রিটিশ আগমনের সময় কলিকাতার আনুমানিক মানচিত্র

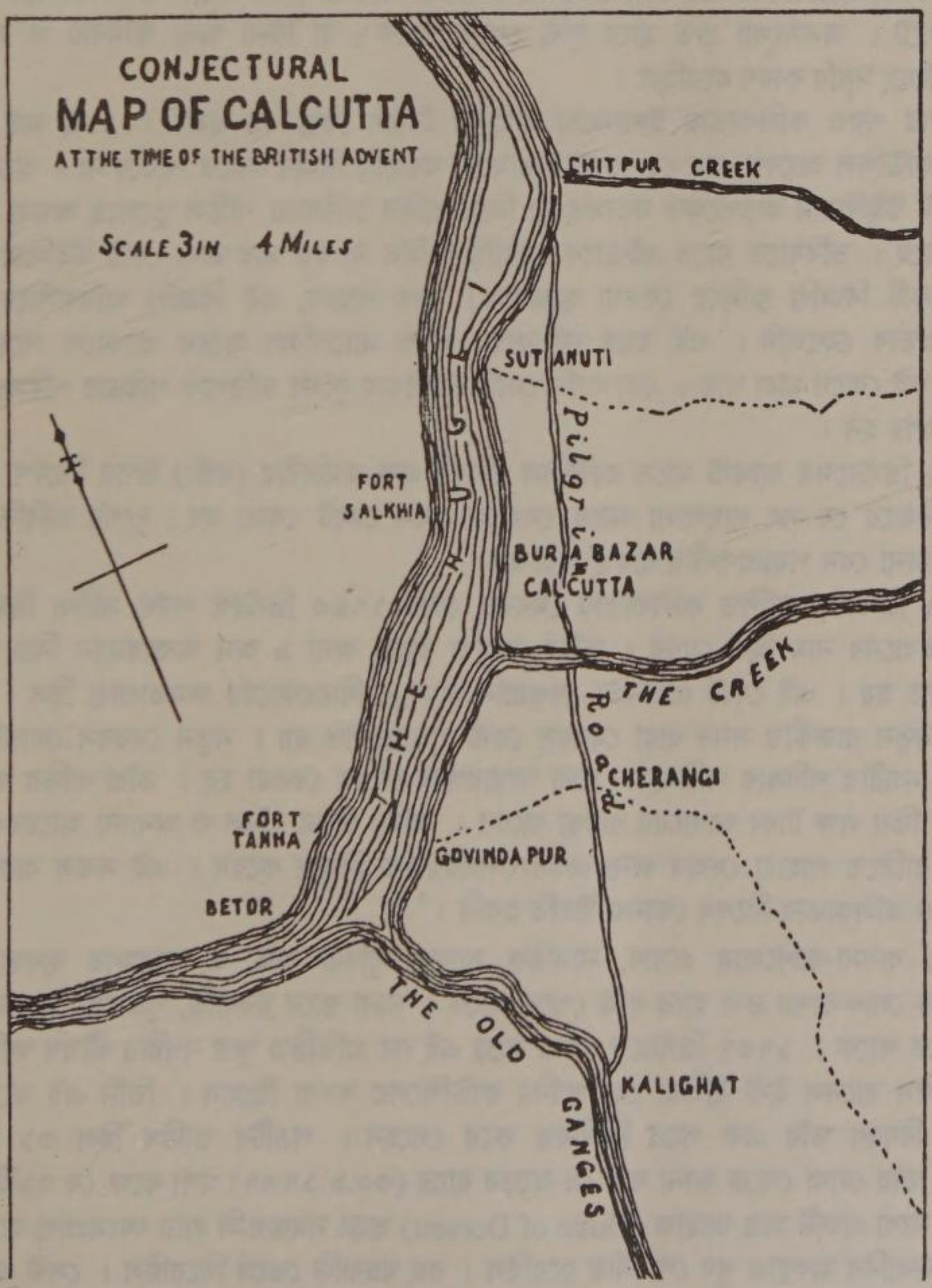

এই মানচিত্রে একটি মাত্র পথ দেখানো আছে। সেটি চিৎপুর খালের কাছ থেকে শুরু হয়ে সোজা দক্ষিণে কালীঘাট পর্যন্ত প্রসারিত। পথটি সুতানুটি গ্রাম, বড়বাজারের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে চাঁদনীর খালকে অতিক্রম করে চৌরঙ্গীর মধ্য দিয়ে আদি গঙ্গার ধারে এসে শেষ হয়েছে। এই পথটিই সে সময়ের কলিকাতার একমাত্র পথ ছিল। এটিকেই বলা হত কালীঘাট যাবার পথ। ইংরেজরা বলত "Pilgrim Road"। এর দু'ধারে ছিল ঘন ঝোপ জঙ্গল, ছিল ডাকাতের উৎপাত। এই রাস্তাটি পরে চিৎপুর রোড, (অধুনা রবীন্দ্র সরণি), কসাইটোলা (বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট), চৌরঙ্গী রোড নামে আখ্যাত হয়েছে।

১৭০৬ খ্রিঃ এই তিনটি গ্রামের জমি, বাড়িঘর ও রাস্তা কোম্পানির তরফ থেকে জরিপ করা হয়। জমি ও বাড়িঘর সম্বন্ধে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এবারে রাস্তার তালিকাটি দেওয়া হল—

| | বড় রাস্তা (স্ট্রিট) | গলি (লেন) | ছোট গলি (বাই লেন) |
|---|---|---|---|
| ১৭০৬ | ২ | ২ | ০ |

উপরের এই তালিকা থেকে প্রথম যুগের আদি কলিকাতার রাস্তাঘাটের চিত্রটি খুবই স্পষ্ট। এর আরেকটা দিক, ইংরেজদের এই জমিদারির মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির ফলে বিভিন্ন পেশার লোকের আগমন ঘটে। জনসংখ্যা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে ; যা কিনা অন্য জমিদার ও মুসলমান শাসনকর্তাদের ঈর্ষার কারণ হয়েছিল।

জরিপের পরও কলিকাতায় ইচ্ছামতো বাড়িঘর নির্মাণ কিন্তু বন্ধ হয়নি। ১০ই মার্চ ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে কাউন্সিল আদেশ দেন যে কেহই ইচ্ছামতো ঘরবাড়ি নির্মাণ করতে পারবে না। অনেকে সে সময় ফোর্ট উইলিয়াম কর্তৃপক্ষের মতামত না নিয়ে বাড়ির চারিধারে পাঁচিল তুলেছে অথবা পুষ্করিণী খনন করেছে। ভবিষ্যতে যাতে এইভাবে ঘরবাড়ি নির্মিত না হয় তার জন্য ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের ফটকে একটি বিজ্ঞপ্তি ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বলা বাহুল্য, এই বিজ্ঞপ্তি অধিবাসীদের উপর কোনও প্রভাব ফেলেনি। ওই বছর কলিকাতা প্রবল ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রকোপে পড়ে। বহু অধিবাসী ওই রোগে মারা যায়। কোম্পানি ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের চারিপাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়ে তৎপর হন।

১৭১০ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে কাউন্সিল তাঁদের এক কর্মচারীর (বক্সী) উপর নির্দেশ দেন যে দুর্গের চারিধারে যে সব গাছপালা আছে সেগুলো যেন কেটে ফেলা হয় ; দুর্গের চারিদিকে জল নিকাশের জন্য যেন পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা করা হয়।

১৭২৭ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত কলিকাতার মেয়রস্ কোর্ট ১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সক্রিয় ছিল। এই কোর্টের প্রধানের নাম ছিল মেয়র। তাঁকে সাহায্য করার জন্য ৯ জন অল্ডারম্যান নিয়ে মেয়রস্ কোর্ট গঠিত হয়। এই কোর্ট প্রধানতঃ দেওয়ানি মামলার বিচারকার্যের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ছিল। ১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দে নতুন রাজকীয় সনদ দ্বারা মেয়রস্ কোর্ট পুনঃস্থাপিত হয়। নতুন মেয়রস্ কোর্টের উপর কলিকাতা নগরীর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা তথা স্বাস্থ্যরক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়। তাঁরা বাড়ির কর বাবদ দুই থেকে তিন লক্ষ টাকা আদায়ের ব্যবস্থা করেন। জমির ভাড়া, টোল ও অন্যান্য আয়েরও ব্যবস্থা করেন। রাত্রিতে পাহারা দেবার জন্য একদল নগররক্ষক নিযুক্ত করেন। এই সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলেও কলিকাতার বিশেষ কোনও উন্নতি হয়নি।[৫]

অবশ্য, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, নাগরিক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি ও আরক্ষার ব্যবস্থার ফলে কলিকাতার লোকসংখ্যা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। নানা স্থানে ঘরবাড়ি, পুষ্করিণী, বাগান প্রভৃতি নির্মিত হতে থাকে। ১৭৩৭ খ্রিস্টাব্দে প্রচণ্ড ঝড়ে এই নব প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র নগরীর ভীষণ ক্ষতি হয়। স্যার ফ্রান্সিস রাসেল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। তিনি এই ঝড়ের এক বিস্তারিত বিবরণ তাঁর এক পত্রে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। পত্রটির তারিখ ছিল ৩১ ডিসেম্বর ১৭৩৭। তাঁর লেখা থেকে জানা যায় যে ঝড়ের রাত্রে (৩০.৯.১৭৩৭) গঙ্গা বক্ষে যে ২৯টি জাহাজ ছিল তার মধ্যে একটি মাত্র জাহাজ (Duke of Dorsett) ছাড়া সমস্তগুলি প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। ওই জাহাজখানির অবস্থাও খুব শোচনীয় হয়েছিল। বহু ঘরবাড়ি ভেঙ্গে গিয়েছিল। সেন্ট এ্যান (St.

Anne's Church) গির্জার চুড়ো ভেঙ্গে মাটিতে পড়েছিল। রাস্তার ধারে ধারে যে সব বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছিল সেগুলি উপড়ে মাটির উপর শোয়ানো ছিল। প্রচণ্ড ঝড়ের সঙ্গে ছিল প্রবল বর্ষণ ; সঙ্গে ভূমিকম্পও ছিল। চার্নকের কলিকাতা আগমনের প্রায় ৪৭ বছর পরে এই ঝড় হয়। এই দীর্ঘকাল ধরে যে সমস্ত ঘরবাড়ি নির্মিত হয়েছিল তার অধিকাংশই ঝড়ে ভেঙে পড়ে।[৬]

## তথ্যসূত্র


১ Early Annals of the English in Bengal—C.R.Wilson, V-1, p.194
২ —Do—Page-209/217
৩ —Do—Page-286 (207 Survey)
৪ Sterndale's Report.
৫ কলিকাতা ও উহার কর্পোরেশন—উপেন্দ্রনাথ বসু।
৬ Calcutta Old & New—Cotton, p-27

৭

# কলিকাতায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গ্রাম ক্রয়

আবার ফিরে আসা যাক কলিকাতার ইতিবৃত্তের দিকে। ইংরেজদের এই সমৃদ্ধি ও প্রতিপত্তি বঙ্গের সুবেদার সুলতান নবাবজাদা আজিম-উস-সান ও মুর্শিদকুলি খাঁ ভাল চোখে দেখেননি। তাঁরা নানা ছল-ছুতায় ইংরেজ বণিকদের কাছে অর্থ আদায় করতে লাগলেন। শুধু তাই নয়, এমন কি সামান্য সরকারি কর্মচারীও বাদ গেল না। ইতিমধ্যে ৩ মার্চ ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেব দেহ রাখলেন। দেশের সর্বত্র একটা অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়েছিল। উত্তরাধিকার নিয়ে বিরোধ বেধে গেল। ঔরঙ্গজেবের তিন ছেলের মধ্যে বড় মুয়াজ্জুম তাঁর দুই ভাই মহম্মদ আজম ও মহম্মদ কামবক্সকে হত্যা করে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি বাহাদুর শাহ উপাধি গ্রহণ করেন। শাহ আলম তাঁর আর একটি নাম। ৪/৫ বছর রাজত্ব করার পর ১৭১২ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট বাহাদুর শাহ পরলোক গমন করেন। আবার শুরু হয় ভ্রাতৃঘাতী সংঘাত। বাহাদুর শাহের চার ছেলে—জাহান্দার শাহ, আজিম-উস-সান, রফি-উস-সান ও জাহান শাহ—সকলেই সিংহাসনের জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হন, শেষ পর্যন্ত তিন ভাইকে হত্যা করে ইরানি নেতা জুলফিকার খানের সাহায্যে বড় ভাই জাহান্দার শাহ দিল্লির সিংহাসন অধিকার করেন। ১৭১৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে ও জুলফিকার খানকে হত্যা করে আজিম-উস-সানের ছেলে ফারুকশিয়ার মুঘল সিংহাসন অধিকার করেন।

মোগল সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের গতি দ্রুত থেকে দ্রুততর লয়ে চলতে শুরু করে। ফলে দেশের চারিদিকে চরম বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দিল। বাংলাদেশের শাসনকর্তা তখন মুর্শিদকুলি খাঁ। তিনি ১৭১০ থেকে ১৭২৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আমৃত্যু বাংলার শাসন পরিচালনা করেন। জীবনের শেষ ১০ বছর (১৭১৭-২৭ খ্রি.) সুবেদার দেওয়ান হিসেবে মুর্শিদকুলি খাঁ বাংলায় প্রায় স্বাধীন এক রাজ্য স্থাপন করেন এবং নবাব হিসেবে পরিচিত হন। নিজের পরাক্রমকে সুদৃঢ় করার জন্য ইংরেজ কোম্পানির কাছে অনবরত নানা অজুহাতে অর্থ আদায় করতে থাকেন। তা ছাড়া মুর্শিদকুলি খাঁ যেভাবে ইংরেজ কোম্পানির উপর শুল্ক ধার্য করলেন তাতে অন্যান্য বণিকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয় ইংরেজ কোম্পানিকে। এই সময় ইংরেজ কোম্পানির কাছে এক মহাসুযোগ এসে যায়।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন জানলেন যে ফারুকশিয়ার দিল্লির সম্রাট হয়েছেন, তখনই কাউন্সিল দিল্লির দরবারে দূত পাঠাতে মনস্থ করেন। কারণ তাঁরা জানতেন, "Farrukshiyar like his father, Azumh-Us-Shan, was the traditional friend of the English in Bengal, who had sent him toys and presents as a boy, who had secured from his father the grant of the three villages of Sutanuti, Calcutta and Govindapur, and who now hoped to secure from the son still larger concession of territory and trade privilege."[১] দিল্লির সিংহাসনে বর্তমানে যিনি আসীন, এক সময় তাঁরই সহায়তায় ইংরেজ কোম্পানি তিনটি গ্রাম ক্রয়ের অনুমতি পেয়েছিলেন। কোম্পানি এই সুযোগকে কাজে লাগাতে তৎপর হলেন, দৌত্যকার্যের প্রধান হলেন জন সারমন (John Surmon)। সঙ্গে ছিলেন ডাক্তার উইলিয়াম হ্যামিলটন। পূর্বের আরমানি খোজা সারহাদ (Khojah Surhaud)-কে সঙ্গে নিলেন। এঁরই সহায়তায় ১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দে

তিনটি গ্রাম ক্রয়ের নবাবী ফরমান কোম্পানি লাভ করেছিলেন। সারহাদের সঙ্গে এক চুক্তি হয়েছিল এই মর্মে যে তিনি যদি বিনা শুল্কে বাণিজ্য ও জমিদারি শর্ত ক্রয়ের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন তবে কোম্পানি তাঁকে উপঢৌকন দেবেন ৫০,০০০ টাকা।

দিল্লির দরবারে দৌত্যকার্যের ব্যবস্থা করা হয় পাটনা থেকে। ১লা জানুয়ারি ১৭১৪ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ প্রতিনিধিরা পাটনায় উপস্থিত হয়েছিলেন। এখান থেকেই তারা ৭ই এপ্রিল দিল্লি যাত্রা করেন। দৌত্যকার্য সম্পন্ন হতে প্রায় ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত গড়ায়।

মোগল সম্রাট ফারুকশিয়ারের কাছে ইংরেজ কোম্পানি তাঁদের আবেদন পত্রে জানিয়েছিলেন যে কোম্পানি ইতিমধ্যে সুতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর গ্রামগুলির প্রজাস্বত্ব ক্রয় করেছেন। এগুলি ছাড়া পার্শ্ববর্তী আরও কয়েকটি গ্রাম ক্রয়ের অনুমতি ওই আবেদন পত্রে চাওয়া হয়েছিল। অতিরিক্ত গ্রামগুলি ক্রয়ের প্রয়োজন হয়েছিল নানা কারণে। এ বিষয়ে এ. কে. রায়ের মন্তব্য উল্লেখের দাবি রাখে—"The English with their shops, shipping servants and dependents, their banians, brokers and traders who were most rapidly increasing in number, lay scattered, in spite of concentration of the factors and soldiers in and around Fort William, over the whole of this area in straggling houses and boats ; and without the rights and powers of a Zamindar, it was becoming more and more difficult to deal with them in the best interests of the Company."[২] অবশেষে সারহাদের প্রচেষ্টায় ও উদ্যোগে কোম্পানির প্রার্থনা মঞ্জুর হয়েছিল। এতে করে কোম্পানিকে হুগলি নদীর উভয় তীরে ৩৮টি গ্রাম কেনার অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। এ ছাড়াও কোম্পানির পূর্বের ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা পুনর্নবীকরণ করা হয়।

মোগল সম্রাট ফারুকশিয়ার ১৭১৭ খ্রিঃ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে যে ৩৮খানি গ্রাম ক্রয়ের অনুমতি দিয়েছিলেন তার মধ্যে ৫টি গ্রাম হাওড়ার অন্তর্গত আর বাকি ৩৩টি হুগলি নদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত। হাওড়ার দিকের গ্রামগুলি—সালকিয়া, হাওড়া, কাসুন্দিয়া, রামকৃষ্ণপুর ও ব্যাঁটরা।

আর কলিকাতার দিকে ৩৩টি গ্রাম—(১) দক্ষিণ পাইকপাড়া, (২) বেলগাছিয়া, (৩) দক্ষিণদ্বারী, (৪) হোগলকুড়িয়া, (৫) উল্টাডিঙ্গি, (৬) সিমুলিয়া, (৭) মাকন্দা, (৮) কামারপাড়া, (৯) কাঁকুড়গাছি, (১০) বাঘমারি, (১১) আরকুলি, (১২) মির্জাপুর, (১৩) শিয়ালদহ, (১৪) কুলিয়া, (১৫) ট্যাংরা, (১৬) শুঁড়া, (১৭) বাহিরশুঁড়া, (১৮) শেখপাড়া, (১৯) দলান্দা, (২০) বির্জ্জি, (২১) তিলজলা, (২২) তোপসিয়া, (২৩) সাপগাছি, (২৪) চৌবাঘা, (২৫) চৌরঙ্গী, (২৬) কলিঙ্গ, (২৭) গোবরা, (২৮) বাহির দক্ষিণদ্বারী, (২৯) শ্রীরামপুর (ইটিলি), (৩০) জলা কলিঙ্গ, (৩১) গোঁদলপাড়া, (৩২) ইটিলি, (৩৩) চিৎপুর।

উপরের এই ৩৮টি গ্রাম ক্রয়ের অনুমতি পাওয়া গেলেও নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ গ্রামগুলি ক্রয়ে নানা প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে লাগলেন। তিনি গোপনে ওই গ্রামগুলির জমিদারদের হুঁশিয়ার করে দিলেন যে তারা যেন গ্রামগুলিকে ইংরেজদের কাছে বিক্রি না করে। কাজেই গ্রামগুলি ক্রয়ের ফরমান পেয়েও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কার্যত কিছুই করতে পারলেন না।

অবশেষে ইংরেজ কোম্পানি শঠতার আশ্রয় গ্রহণ করলেন। তাঁরা তাঁদের আশ্রিতের দ্বারা পার্শ্ববর্তী জমিদারদের জমির অংশ ধীরে ধীরে অধিকার করতে শুরু করেন, "Thus some of the brokers and servants of the Company or their dependents managed to take possession of several of the villages adjoining the settlement."[৩] বোল্টস্ সাহেব (Bolts) এ বিষয়ে আরও খোলাখুলি মন্তব্য করেছেন : "The 38 villages were not given to the English by the Emperor, but it was only allowed them to purchase the same. However, the Zamindars in Jafir Khan's time would not part with them, and they were at least mostly wrested from them by fraud and violence." কাজেই কোম্পানি জমিদারি না কিনেই জমির ভোগদখলের স্বত্ত্ব পেয়ে গেলেন। সেই সঙ্গে জমিদারের অধিকার ও ক্ষমতা ব্যবহার করতে লাগলেন। প্রথমে এই ৩৮টি গ্রামের রাজস্ব নির্ধারিত ছিল ১১৯৫ সিক্কা

টাকা। মুর্শিদকুলি খাঁর নতুন রাজস্ব নীতির ফলে ১৭২২ খ্রিস্টাব্দে বেড়ে দাঁড়াল ৮৮৩৬ সিক্কা টাকা।[৪]

## তথ্যসূত্র


১ Early Annals of the English in Bengal, Vol. II, C.R. Wilson, p. IX

২ A Short History of Calcuuta—A. K. Roy, p. 50

৩ A Short History of Calcutta—A. K. Roy, p. 51

৪ Beverley's Report, p. 33

৮

# মারাঠা আক্রমণ ও শহর কলিকাতা

ফারুকশিয়ারের ফরমান অনুযায়ী ৩৮টি গ্রামের অধিকার পাবার আগেই ১৭৪২ খ্রিস্টাব্দে ভাস্কর পণ্ডিতের নেতৃত্বে মারাঠা বর্গিরা বাংলাদেশের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তখন বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব ছিলেন আলিবর্দি খাঁ। নাগপুরের মারাঠা ঘাঁটির সর্দার ছিলেন রঘুজী ভোঁসলে। তাঁর রাজস্বমন্ত্রী ছিলেন ভাস্কররাম কোলহাতকর, লোকে তাঁকে ভাস্কর পণ্ডিত বলত। এই ভাস্কর পণ্ডিতকে রঘুজী ভোঁসলে বাংলা লুণ্ঠন করার জন্য মারাঠা সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি করে পাঠান। বাংলাদেশ আক্রমণের সময় বাংলার ভূতপূর্ব নবাব সরফরাজ খাঁর কর্মচারী মীর হাবিবের সক্রিয় সহযোগিতা লাভ করেন ভাস্কর পণ্ডিত।

মারাঠা বর্গিরা এগিয়ে এসে থানা দুর্গের দিকে যখন নজর দিলেন, কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তখন ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন। তাঁরা বুঝলেন শীঘ্রই কিছু একটা না করলে রক্ষা নেই। ওদিকে নবাব বর্গিদের আক্রমণ রুখতে ব্যতিব্যস্ত। তাঁর কাছ থেকে কোনও সাহায্য পাওয়ার আশা নেই। ইংরেজ ঐতিহাসিক Stewart-এর লেখা থেকে সে সময়ের কলিকাতার একটা স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন, ''Crowds of inhabitants of the Country on the western side of the river crossed over to Calcutta and implored the protection of the English, who in consequence of the general alarm, obtained permission from Aliverdi Khan to dig an entrenchment round the territory.''

অবশেষে ইংরেজ কোম্পানি কলিকাতাকে রক্ষা করতে নিজেরাই সচেষ্ট হলেন। অনেক আলোচনা ও বিচার-বিবেচনার পর ঠিক হল, উত্তর দিকের বাগবাজার থেকে দক্ষিণ দিকের কুলিবাজার (হেস্টিংস) পর্যন্ত এই ৭ মাইল জুড়ে একটা পরিখা কাটানো হোক। এর ফলে শত্রুপক্ষ সহজে শহরের মধ্যে ঢুকতে পারবে না। এইভাবে তাদের আটকানো যাবে।

হিসেব করে দেখা গেল ২১ হাত চওড়া ও ৭ মাইল লম্বা এক পরিখা খুঁড়তে ২৫,০০০ টাকা লাগবে। প্রস্তাবিত পরিখাটি সোজাসুজি গোল হয়ে শহরটাকে ঘিরবে। এ কথাই ঠিক ছিল। তিন মাসের মধ্যে অর্ধেকটা খোঁড়া হবার পর কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। এদিকে নবাব আলিবর্দি, মুস্তাফা খান নামক জনৈক আফগান সৈনিককে দিয়ে ভাস্কর পণ্ডিত সহ উচ্চপদস্থ কয়েকজন মারাঠা সেনানায়ককে হত্যা করে বর্গি হাঙ্গামাকে নিয়ন্ত্রণ করতে অনেকটা সমর্থ হয়েছিলেন। ফলে পরিখা বর্তমান এন্টালি মার্কেটের কাছ বরাবর গিয়ে থেমে গিয়েছিল। এরই নাম মারাঠা ডিচ। পরে এক সময় এই ডিচটাকে এন্টালি মার্কেট থেকে বেকবাগান পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। দক্ষিণ দিকের মারাঠা ডিচের অংশটির উত্তর ও পূর্বদিকের সম্প্রসারিত অংশের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ ছিল না। সম্ভবত নেটিভ অধিবাসীরা ১৭৪৭ খ্রিঃ দ্বিতীয়বার মারাঠা আক্রমণের সময় দক্ষিণের মারাঠা ডিচের অংশ খনন করে থাকতে পারে। কাজটি যখন বন্ধ করে দেওয়া হয় তখনও দুটি অংশের মধ্যে কোনও সংযোগ ছিল না। অনেকে বলেন টালির নালা আগেকার কালের মারাঠা ডিচের একটা অংশ। পরে এই মারাঠা ডিচ ভরাট করে সারকুলার রোড তৈরি হয়।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মারাঠা আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য কেবলমাত্র মারাঠা খালই খনন করে

ক্ষান্ত থাকেননি ; তাঁরা ইংরেজ, আর্মেনিয়ান, পর্তুগীজ ও অন্যান্য খ্রিস্টান অধিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে কাঠের বেড়ার (Palisade) বন্দোবস্তও করেছিলেন। মারাঠা খাল যেখানে নেটিভ অধিবাসীদের একমাত্র রক্ষাকবচ ছিল, কাঠের বেড়ায় খ্রিস্টানদের দ্বিগুণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা হয়েছিল। ''Parochial Annals'' ও ''Parish of Bengal'' প্রণেতা Hyde সাহেবের মতে বেড়াটি যে যে রাস্তা ঘিরে অগ্রসর হয়েছিল তার তালিকাটি এইরূপ—"ফ্যান্সী লেন, লারকিন লেন, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান স্ট্রিট, ম্যাঙ্গো লেন, মিশন রো, লালবাজার, রাধাবাজার, এজরা স্ট্রিট, আমড়াতলা স্ট্রিট, আগা মহম্মদ লেন, পর্তুগীজ চার্চ লেন, আর্মেনিয়ান স্ট্রিট এবং বনফিল্ড লেন।"

এখানে একটি বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখা দরকার, যদিও মারাঠা খালকেই কয়েকটি ক্ষেত্রে আদি কলিকাতার সীমানা বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে, এর অন্তর্ভুক্ত সমস্ত জমিজমা ইংরেজ কোম্পানির অধিকারে ছিল না। সে সময় যে ১৫,০০০ বিঘা জমি কলিকাতার এলাকার অন্তর্ভুক্ত ছিল তা থেকে দুর্গ ও এসপ্লানেড এলাকা বাদ দিলে কলিকাতার এলাকা হয় ১১,০০০ বিঘা। ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দে হলওয়েল সাহেবের মতে ইংরেজ অধিকৃত জমির পরিমাণ ছিল কেবলমাত্র ৫২৪৪ বিঘা। জাননগরকে এই এলাকার বাইরে রাখা হয়েছিল যেহেতু এটা মারাঠা খালের বাহিরে অবস্থিত ছিল। দু'বছর পূর্বে ২২৪৫ বিঘা জমি ক্রয় করায় কোম্পানি অধিকৃত এলাকার পরিমাণ দাঁড়ায় আদি কলিকাতার $\frac{১}{৩}$ অংশ। এ থেকে বোঝা যায় যে ওই সময় শহরের অর্ধেকের কম অংশ কোম্পানির অধিকারে ছিল। সুতরাং এটা অনুমান করা ভুল হবে যে মারাঠা খালের বেষ্টনীর (a sort of ring fence) মধ্যে সমস্ত ভূভাগই কোম্পানির তত্ত্বাবধানে ছিল এবং অন্য জমিদারের এলাকা থেকে পৃথক করে দেখাবার জন্য ওই ব্যবস্থা হয়েছিল।

পলাশী যুদ্ধের পর ইংরেজ কোম্পানির সঙ্গে জাফর আলি খানের কলিকাতা অধিকারের ক্ষতিপূরণ বাবদ ওই বছরের জুন মাসে যে চুক্তি হয়েছিল, সেই চুক্তির ৮ ও ৯ নম্বর ধারায় বিষয়টি স্পষ্ট করে বলা হয়েছে :—

''Within the ditch which surrounds the borders of Calcutta are tracts of land belonging to several Zamindars ; besides this, I will grant the English Company 600 yards without the ditch. All the land lying south of Calcutta as far as Culpee shall be under the Zamindarry of the English Company, and all the officers of those parts shall be under their jurisdiction ; the revenues to be paid by them in the same manner with other Zamindars.''[১]

এই চুক্তির বলে ইংরেজ কোম্পানি মারাঠা খালের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত জমিজমার একচ্ছত্র মালিক হলেন। তাঁদের জমিদারি সুদূর দক্ষিণে কুলপী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল।

তথ্যসূত্র

১ Report on the Census of the Town of Calcutta, 1876—Beverley, C. S. p. 33

## ৯

# কলিকাতার পথঘাট ও ঘরবাড়ির সমীক্ষা, ১৭০৬-১৭৫৬

নবাব সিরাজদ্দৌলার কলিকাতা আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত সে সময়ের পথঘাটের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সুতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুরের জমিদারি গ্রহণের পর ১৭০৬ থেকে ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে চারবার সমগ্র কলিকাতা জরিপের ব্যবস্থা করেন। তারই একটি সারণি নীচে দেওয়া হলো—[১]

| বছর | একরের (Acre) মাপে শহরের বিস্তৃতি | ঘরবাড়ি | | রাস্তা | গলি | ছোটগলি | পুকুর |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | পাকা | কাঁচা | | | | |
| ১৭০৬ | ১৬৯২ | ৮ | ৮০০০ | ২ | ২ | × | ১৭ |
| ১৭২৬ | ২৩৫০ | ৪০ | ১৩৩০০ | ৪ | ৮ | × | ২৭ |
| ১৭৪২ | ৩২২৯ | ১২১ | ১৪৭৪৭ | ১৬ | ৪৬ | ৭৪ | ২৭ |
| ১৭৫৬ | ৩২২৯ | ৪৯৮ | ১৪৪৫০ | ২৭ | ৫২ | ৭৪ | ১৩ |

উপরের এই তালিকাটি থেকে দেখা যাচ্ছে যে ১৭০৬ থেকে ১৭২৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে অর্থাৎ ২০ বছরে ৬৫৮ একরের মতো নতুন জমি শহরে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অন্যদিকে পূর্বের তুলনায় রাস্তা বেড়েছে মাত্র ২টি আর গলি ৬টি। ১৭২৬ থেকে ১৭৩৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে চৌরঙ্গী ইংরেজ উপনিবেশের অন্তর্গত করা হয়। এই অঞ্চলটি পশ্চিমদিকে গোবিন্দপুরের ব্যাঘ্র অধ্যুষিত জঙ্গলের দ্বারা পৃথক ছিল। বর্তমানে কলিকাতার বুকে বৃহৎ ময়দানটি ছিল গোবিন্দপুরের গভীর জঙ্গল।[২]

১৭২৬ খ্রিস্টাব্দের তুলনায় ১৭৪২ খ্রিস্টাব্দে রাস্তার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৪ গুণ, গলির সংখ্যা প্রায় ৬ গুণ। ৭৪টি ছোট গলির খোঁজ পাওয়া যায় ওই সময়। এর কারণ সম্ভবত ফারুকশিয়ারের ফরমান অনুসারে ভাগীরথীর পূর্ব দিকে যে ৩৩টি গ্রাম কেনার কথা ছিল তারই কিছু কিছু অংশ অধিগ্রহণ করে একদিকে যেমন একরের মাপে শহরের বিস্তৃতি ঘটেছে, অন্য দিকে প্রয়োজনের তাগিদে নতুন নতুন রাস্তা ও গলি নির্মিত হয়েছে। তবে ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দের চিত্রটি খুব উজ্জ্বল নয়। ওই সময় রাস্তার সংখ্যা বেড়েছে ১১টি, আর গলির সংখ্যা মাত্র ৬টি। আরেকটি বিষয় এখানে সুস্পষ্ট এই যে জনবসতি দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় পাকা ও কাঁচা বাড়ির আধিক্যও চোখে পড়ার মতো। শহরের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য পুষ্করিণীগুলি ক্রমশ ভরাট করা হয়।

উপরের এই জরিপের নির্ঘণ্ট থেকে এটাও সুস্পষ্ট যে নবাব সিরাজদ্দৌলার কলিকাতা অবরোধের প্রাক্কালে বেশ কয়েকটি রাস্তা নির্মিত হয়েছিল। এই রাস্তাগুলি সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা পেতে হলে সেকালের কলিকাতার মানচিত্রগুলি পরীক্ষা করা দরকার। কলিকাতার সবচেয়ে প্রাচীন মানচিত্র ক্যাপ্টেন ক্যামেরন সাহেবের। মানচিত্রটির শিরোনামায় ছিল—"Map of Company's lands and lakes by Captain Cameron." দুঃখের বিষয় এটিতে কোনও তারিখের উল্লেখ নেই।[৩]

কলিকাতার পরের মানচিত্রটি তৈরি হয় ১৭৪২ খ্রিস্টাব্দে। ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দের ২ এপ্রিল তারিখে আপজন (A. Upjohn) সাহেব একটি বৃহত্তর মানচিত্রের অংশ রূপে এই মানচিত্রটি প্রকাশ করেন। ওই তারিখে আপজন সাহেব নিজের আঁকা বৃহত্তর কলিকাতার আরেকটি মানচিত্র প্রকাশ করেন।

আপজন সাহেবের প্রকাশিত প্রথম মানচিত্রটির পুরো নাম—Plan of the territory of Calcutta as marked out in the year 1742, exhibiting likewise the Military operations at Calcutta when attacked and taken by Serajud-Dowlah on the 18th of June 1756. Printed and published according to the Act of Parliament, by A. Upjohn, 2nd April 1794. অর্থাৎ এই মানচিত্রে দুটি মানচিত্র আছে—১৭৪২ খ্রিস্টাব্দের আদি কলিকাতা ও ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দের বৃহত্তর কলিকাতা। এই মানচিত্রে একটি মাত্র রাস্তার নাম দেওয়া আছে—Avenue leading to the Eastward। এটি বৌবাজার স্ট্রিট (অধুনা বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিট)[৪]। আর কোনও রাস্তার নাম দেওয়া নেই, যদিও অনেকগুলি রাস্তা ওই মানচিত্রে দেখানো আছে। এই মানচিত্রে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে নবাব সিরাজদ্দৌলার দ্বিতীয়বার কলিকাতা আক্রমণের সময় ইংরেজ সৈন্য চলাচলের পথের রূপরেখাটি দেখানো আছে। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সমস্ত রাস্তাঘাটের চিহ্ন এই মানচিত্রে (পরিশিষ্ট ২ দ্রষ্টব্য) আছে, যদিও ঐ মানচিত্রে লেখা আছে ''Work made in 1742''। আপজন সাহেবের এই মানচিত্র প্রসঙ্গে বিভার্লি সাহেবের মন্তব্য উল্লেখ্য : ''In one corner of Upjohn's Map is given a 'Plan of the Territory of Calcutta as marked out in the year 1742, exhibiting likewise the military operations at Calcutta when attacked and taken by Suraj-ud-dowlah on the 18th of June 1756.' This is merely Orme's map, but it refers to the military operations of 1757, not 1756.''[৫]

এরপর কলিকাতার আরও তিনটি মানচিত্র তৈরি হয়েছিল। ১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দে প্রথম মানচিত্রটি তৈরি করেন লেফঃ ওয়েলস্ (Lt. Wells) নামে এক ইংরেজ সৈনিক। মানচিত্রটির নাম—''Plan of Fort William and part of the city of Calcutta, surveyed by W. Wells, Lieutenant of the Artillery Company in Bengal, 1753.'' এই মানচিত্রে কেবলমাত্র পুরানো ফোর্ট উইলিয়াম ও ডালহৌসি স্কোয়ার অঞ্চলটুকু দেখানো হয়েছে। রাস্তার কোনও নাম নেই।[৬]

দ্বিতীয় মানচিত্রটির উল্লেখ আছে Major F. C. Hirst, Director of Surveys, Bengal and Assam, এর লেখা ''A Brief History of the Large Scale Survey of Calcutta and its neighbourhood 1903-1914'' নামক পুস্তকে। তাঁর লেখা থেকে জানা যায় যে ১৭৫৬-৫৭ খ্রিস্টাব্দে কোনও এক অফিসার কলিকাতার এই মানচিত্রটি প্রস্তুত করেন। তাঁর নাম জানা যায়নি। এতে ৩$^{৫''}/_{১২}$ -কে এক মাইল ধরে মানচিত্রটি তৈরি করা হয়। মানচিত্রটির গুরুত্ব বিবেচনা করে এটি পুস্তকে সংযোজিত হল (পরিশিষ্ট ৩ দ্রষ্টব্য)। এতেও রাস্তার কোনও নাম দেওয়া নেই।

তৃতীয় মানচিত্র তৈরি করেছিলেন পদাতিক বাহিনীর এক ক্যাপ্টেন—নাম ক্লড মার্টিন (Claud Martin)। তিনি কলিকাতা ও লক্ষ্ণৌর "লা মার্টিনিয়ারস" স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা। মানচিত্রটি সার্ভেয়ার জেনারেলের অফিসে আছে। কোনও তারিখের উল্লেখ নেই। তবে ১৭৬০-৬৪ এর কথা উল্লেখ আছে। এই মানচিত্রে হুগলির দু'ধারের জমিজমা দেখানো আছে। কিন্তু এটি এত ছোট মাপের তৈরি যা নগরের কোনও কাজে আসে না।[৭]

এরপর কলিকাতার যে মানচিত্রটির খোঁজ পাওয়া যায় সেটি তৈরি করেছিলেন মার্ক উড (Lt. Col. Mark Wood)। ইনি ছিলেন Surveyor General of India। এঁর নামে কলিকাতায় একটি রাস্তা আছে। উড স্ট্রিট। ১৭৮৪-৮৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলিকাতার পুলিশ কমিশনারের ব্যবহারের জন্য একটি বড় আকারের কলিকাতার মানচিত্র তৈরি করেন। মূল মানচিত্রটি পুলিশ কমিশনারের অফিসে ছিল। সাধারণে এই মানচিত্রের কথা জানত না। ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়াম বেইলি (William Baillie) পুলিশ কমিশনারের অনুমতি নিয়ে মানচিত্রটিকে ছোট আকারে প্রকাশ করেন। মানচিত্রটির নাম—Plan of Calcutta reduced by permission of Commissioners of Police from the original one executed by Lieutenant Colonel Mark Wood in the year 1784 and 1785, Published in October 1792 by William Baillie। মার্ক উডের মানচিত্রে

সর্বপ্রথম কলিকাতার রাস্তার নাম পাওয়া যায়। এই মানচিত্রটিও পরিশিষ্ট ৪-এ সন্নিবেশিত হল।

মার্ক উডের পরের মানচিত্রটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার কর্নেল টি. কলের (Colonel T. Call, Chief Engineer)। এটি ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে তৈরি হয়েছিল। এই মানচিত্রে কলিঙ্গ অঞ্চলে কয়েকটি মাত্র বাড়ি দেখানো আছে। চৌরঙ্গীতে ৪টি, সেগুলি পার্ক স্ট্রিটের দক্ষিণে। টাউনের মধ্যে জঙ্গলের আধিক্য। ধর্মতলার উত্তরে খাল। শিয়ালডাঙ্গা (Sealdanga), আলিপুর ও গার্ডেনরীচ অঞ্চলে অসংখ্য বাগানবাড়ি দেখানো আছে। খিদিরপুরে প্রস্তাবিত জাহাজ সংস্কারের স্থানটি (Dock) নির্দেশ করা আছে।[৮]

বেইলি সাহেবের মানচিত্র প্রকাশিত হবার দেড় বছর পরে আপজন সাহেবের এই বিখ্যাত মানচিত্রটি প্রকাশিত হয়। এটিই অষ্টাদশ শতাব্দীর কলিকাতার শেষ মানচিত্র। এতে শুধু কলিকাতাই নয়, মারাঠা খালের বাইরের অঞ্চল ও গঙ্গার ওপারের হাওড়া ও তার লাগোয়া অনেকখানি অঞ্চল দেখানো আছে। এই মানচিত্রের নাম—Calcutta and its environs from an accurate survey taken in the year 1792 and 1793 by A. Upjohn, 2nd April, 1794। মার্ক উডের মানচিত্রটির চেয়ে এই মানচিত্রে রাস্তার সংখ্যা অনেক বেশি লক্ষ করা যায়।[৯]

পরবর্তী এক অধ্যায়ে ওই মানচিত্রগুলি নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করে সেকালের কলিকাতার পথঘাটের একটা সর্বাঙ্গীণ চিত্র তুলে ধরতে চেষ্টা করব।

**তথ্যসূত্র**


১ কলিকাতা সেকালের ও একালের—হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, পৃ. ৪৫৮
২ A Short History of Calcutta, A. K. Roy.
৩ Beverley's Report, p. 37.
৪ কলিকাতা দর্পণ—রাধারমণ মিত্র, পৃ. ২৬
৫ Beverley's Report, p. 38 (footnote)
৬ কলিকাতা দর্পণ—রাধারমণ মিত্র, পৃ. ২৬
৭ Beverley's Report, p. 38
৮ Beverley's Report, p. 38
৯ কলিকাতা দর্পণ—রাধারমণ মিত্র, পৃ. ২৮

## ১০

# ১৭৫৭—পলাশীর যুদ্ধকালীন কলিকাতা

১৭৫৭ খ্রিঃ-এ পলাশীর যুদ্ধে অধীনস্থ সেনানায়কদের ও সভাসদবর্গের চরম বিশ্বাসঘাতকতায় নবাব সিরাজদ্দৌলার পরাজয় ও ইংরেজদের জয়লাভের ঘটনার পরম্পরাগুলি সকলেরই প্রায় জানা। ১৭৫৮ খ্রিস্টাব্দে নতুন সুবেদার জাফর আলি খাঁনের সঙ্গে ইংরেজদের এক চুক্তি হয়। এই চুক্তির বলে মারাঠা ডিচের অন্তর্গত সমস্ত জমি ছাড়াও কলিকাতার দক্ষিণে কুলপি (Kulpi) পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চল ইংরেজ কোম্পানির জমিদারির আওতায় এসেছিল। এ ছাড়াও ২০½টি মৌজার অধিকার ও ২৪ পরগনার জমিদারির অধিকার প্রদত্ত হয়েছিল। এই সমস্ত জমিদারি ইংরেজদের শুল্কবিহীন অধিকার (Revenue free grant) হয়ে গেল। এই মৌজাগুলি—(১) সুতানুটি (বাজার সমেত), (২) ডিহি কলিকাতা, (৩) গোবিন্দপুর (বাজার সমেত), (৪) মির্জাপুর, (৫) হোগলকুড়িয়া, (৬) সিমলা, (৭) চৌরঙ্গী, (৮) বিরজি, (৯) জলাকলিঙ্গ (১০) মারাঠা ডিচের বাইরের অংশ, (১১) আমহাটি, (১২) কিশপুর পাড়া (Kishpoor Para), (১৩) মাকন্দা (সেকালের মারাঠা ডিচের অন্তর্গত), (১৪) বাহির বিরজি, (১৫) বাহির শ্রীরামপুর, (১৬) শ্রীরামপুর, (১৭) দলন্দা, (১৮) ধলডাঙ্গা (Dhaldanga), (১৯) শিয়ালদহ, (২০) দক্ষিণ পাইকপাড়া (এগুলি সব মারাঠা ডিচের বাহিরের অংশ) ও (২০½) গণেশপুর (মারাঠা ডিচের মধ্যে মলাঙ্গার অন্তর্গত)। নবাব মীরজাফর ইংরেজ কোম্পানিকে কলিকাতা ও শহরতলির জমি বিনা শুল্কে দেওয়া ছাড়াও কলিকাতা অবরোধের ক্ষতিপূরণ হিসাবে ১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা দেবার ব্যবস্থা করেন। ওই অর্থের দ্বারা শহরের পুনর্গঠনের কাজ ত্বরান্বিত হয়। ইংরেজ কোম্পানি গোবিন্দপুরের জঙ্গল পরিষ্কার করে বৃহৎ আকারে দুর্গ নির্মাণে তৎপর হলেন।[১]

১৭৫৮ খ্রিঃ লর্ড ক্লাইভের প্রস্তাব অনুসারে গোবিন্দপুরে নতুন কেল্লা নির্মাণের সূচনা হয়। এটি ১৭৭৩ খ্রিঃ শেষ হয়। গোবিন্দপুর তখন বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল। অনেক বিত্তশালী বাঙালি ওখানে বাস করতেন। গোবিন্দপুরে দুর্গ নির্মাণ উপলক্ষে এখানকার পুরানো অধিবাসীদের অনেকে গোবিন্দপুর থেকে পাততাড়ি গোটাতে বাধ্য হন। তাঁদের পুনর্বাসনের জন্য কোম্পানি থেকে অর্থ মঞ্জুর করা হয়। এই সময় তালতলা, কুমারটুলি, শোভাবাজার, চিৎপুর রোডের দুধারে ওই বাস্তুচ্যুত অবস্থাপন্ন বাঙালিরা বসবাস করতে আরম্ভ করেন। ক্লাইভের মুন্‌শি মহারাজা নবকৃষ্ণ সুতানুটি অঞ্চলের শোভাবাজারে, রাজা রাজবল্লভ সুতানুটিতে, আন্দুল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গভর্নর ভ্যান্সিটার্টের দেওয়ান রামচরণ পাথুরিয়াঘাটায়, পাইকপাড়া রাজবংশের আদিপুরুষ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ জোড়াসাঁকোতে, কাশিমবাজারের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা হেস্টিংসের বেনিয়ান কান্তবাবুর জোড়াসাঁকোতে আবাস ভবন ছিল। হুইলারের দেওয়ান দর্পনারায়ণ ঠাকুর পাথুরিয়াঘাটায়, মদনমোহন দত্ত নিমতলায়, পাটনার কমার্শিয়াল রেসিডেন্টের দেওয়ান বনমালী সরকার কুমারটুলিতে, হেস্টিংস ও বারওয়েলের পার্শী মুন্‌শি মেছুয়াবাজার অঞ্চলে, ব্ল্যাক জমিদার গোবিন্দরাম মিত্র কুমারটুলিতে, হালসীবাগানে উমিচাঁদ প্রমুখেরা বাস করতেন। এই সকল বিত্তশালীরা গোবিন্দপুর ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে এসে কলিকাতায় বসবাস শুরু করেন। শুধু এঁরাই নয়, আরও বহু খ্যাত-অখ্যাত, বিত্তশালী ও বিত্তহীন কোম্পানির জমিদারির মধ্যে আবাসন ও জীবিকা নির্বাহের জন্য

সমবেত হলেন। লোকবসতির চাপে শহরের সীমানা মারাঠা খালের পরিসীমা ছাড়িয়ে বিস্তৃত হল। কলিকাতা অবরোধের আগেই জমিজমার খাজনা সংগ্রহের জন্য শহরতলিকে কলিকাতা শহরের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। হলওয়েল সাহেব বিষয়টি আরও স্পষ্ট করে বলেছেন, "To annex a considerable tract of land taken from the 24 Parganas adjoining to Calcutta in order to extend its bounds"। ১৫টি ডিহি "a considerable tract of land" এর অন্তর্ভুক্ত যা কিনা মারাঠা খালের সীমানার বাইরে অবস্থিত ছিল। এই ১৫টি ডিহির মধ্যে ৫৫টি গ্রাম ছিল যাকে এক কথায় বলা হত "পঞ্চান্ন গ্রাম।" এই "পঞ্চান্ন গ্রামই" ছিল কলিকাতার শহরতলি। ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দের ঘোষণায় কলিকাতা শহরের সীমানা মারাঠা খালের পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২১নং আইনে শহরতলির মধ্যেই পঞ্চান্ন গ্রামকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

যতদূর জানা যায়, ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ অর্থাৎ ১০০ বছর পর্যন্ত কলিকাতা ও তার শহরতলি একই জায়গায় দাঁড়িয়েছিল। কোন কোন মৌজা শহর ও শহরতলির অন্তর্ভুক্ত ছিল তার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক।

শহরের অন্তর্গত মৌজা

১। ডিহি কলিকাতার অন্তর্গত ইংরেজ বসতি (Settlement)
২। বাজার কলিকাতা
৩। ডিহি কলিকাতা
৪। সুতানুটি (বটতলাসহ)
৫। গোবিন্দপুর (বাজারসহ)
৬। চৌরঙ্গী
৭। সিমলা (আংশিক)
৮। মলাঙ্গা (গণেশপুরসহ)
৯। হোগলকুড়িয়া
১০। উল্টাডিঙ্গি (আংশিক)
১১। ঠনঠনিয়া (ডিহি কলিকাতার অন্তর্ভুক্ত)
১২। আরকুলি
১৩। মির্জাপুর
১৪। ডিঙ্গাভাঙ্গা (জলা কলিঙ্গ)
১৫। কলিঙ্গ
১৬। তালপুকুর (কলিঙ্গের অন্তর্ভুক্ত)
১৭। ডিহি বিরজি (আংশিক)
১৮। মাকন্দা
১৯। কিশপুর পাড়া
২০। আমহাটি

পাঠকের সুবিধার জন্য উপরের এই মৌজাগুলি (১৮, ১৯, ২০ নম্বর বাদে) চিহ্নিত করে আনুমানিক রেখাচিত্র দেওয়া হল।

## কলিকাতার অন্তর্গত বিভিন্ন মৌজার আনুমানিক রেখাচিত্র (১৭৫০-১৮৫০)

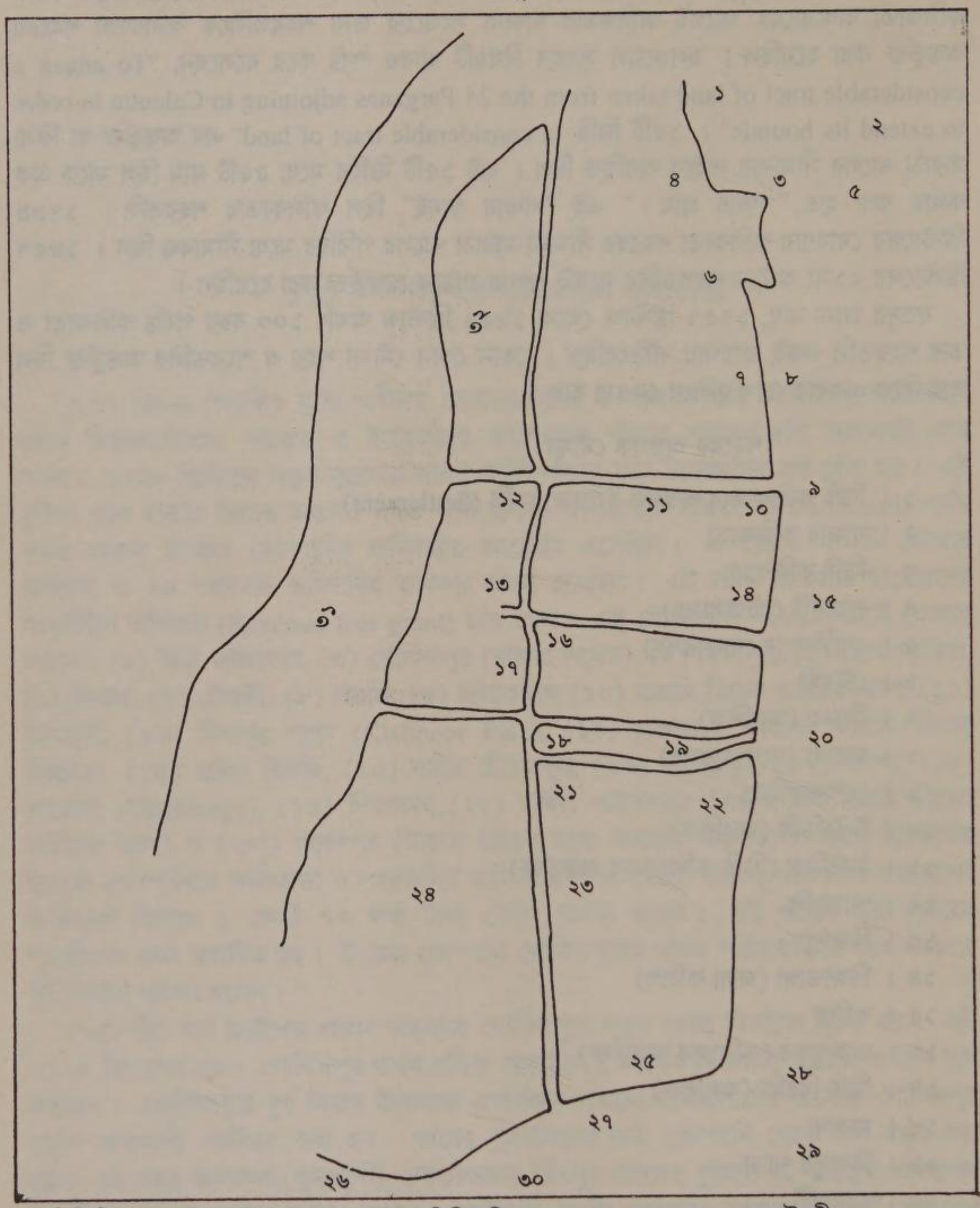

১ ডিহি চিৎপুর
২ বেলগাছিয়া
৩ ডিহি দক্ষিণ পাইকপাড়া
৪ ডিহি উল্টাডিঙ্গি (আংশিক)
৫ উল্টাডিঙ্গি
৬ হোগলকুড়িয়া
৭ সিমলা
৮ ডিহি বাহির সিমলা
৯ ডিহি শুঁড়া
১০ আরকুলি
১১ ঠনঠনিয়া
১২ ডিহি কলিকাতা
১৩ বাজার কলিকাতা
১৪ মির্জাপুর
১৫ ডিহি শিয়ালদহ
১৬ মলাঙ্গা
১৭ ডিহি কলিকাতা
১৮ জোলা কলিঙ্গ
১৯ ডিঙ্গাভাঙ্গা
২০ ডিহি ইটিলি
২১ কলিঙ্গ
২২ তালপুকুর
২৩ চৌরঙ্গী
২৪ গোবিন্দপুর
২৫ ডিহি বিরজী (আংশিক)
২৬ দালান্দা
২৭ ডিহি বিরজী
২৮ ডিহি শ্রীরামপুর
২৯ ডিহি চক্রবেড়িয়া
৩০ ডিহি ভবানীপুর
৩১ হুগলি নদী
৩২ ডিহি সুতানুটি

শহরতলির অন্তর্গত ১৫টি ডিহি ও ৫৫টি গ্রামের তালিকা

| ডিহি | গ্রাম |
|---|---|
| ১। ডিহি সিঁথি | ১। সিঁথি |
| | ২। কাশীপুর |
| | ৩। পাইকপাড়া |
| ২। ডিহি চিৎপুর | ৪। চিৎপুর |
| | ৫। টালা |
| | ৬। বীরপাড়া |
| | ৭। কালীদহ |
| ৩। ডিহি বাগজলা | ৮। দক্ষিণদ্বারী |
| | ৯। কাঁকুরিয়া |
| | ১০। নোয়াবাদ |
| ৪। ডিহি দক্ষিণ পাইকপাড়া | ১১। বেলগেছিয়া |
| ৫। ডিহি উল্টাডিঙ্গি | ১২। উল্টাডিঙ্গি (আংশিক) |
| | ১৩। বাঘমারী |
| | ১৪। গৌরীবেড়ে |
| ৬। ডিহি সিমলা | ১৫। বাহির সিমলা |
| | ১৬। নারিকেলডাঙ্গা |
| ৭। ডিহি শুঁড়া | ১৭। শুঁড়া |
| | ১৮। কাঁকুড়গাছি |
| | ১৯। কুচনান |
| | ২০। দত্তাবাদ |
| ৮। ডিহি কুলিয়া | ২১। মল্লিকবাদ |
| | ২২। কুলিয়া |
| ৯। ডিহি শিয়ালদহ | ২৩। শিয়ালদহ |
| | ২৪। বেলিয়াঘাটা |
| ১০। ডিহি এন্টালি | ২৫। এন্টালি |
| | ২৬। পাগলাডাঙ্গা |
| | ২৭। নিমকপোতা |
| | ২৮। কামারডাঙ্গা |
| | ২৯। গোব্‌রা |
| | ৩০। ট্যাংরা |
| ১১। ডিহি তোপসিয়া | ৩১। তোপসিয়া |
| | ৩২। তিলজলা |
| | ৩৩। বেনিয়াপুকুর (কড়েয়াসহ) |
| ১২। ডিহি শ্রীরামপুর | ৩৪। চৌভাগা |
| | ৩৫। দলন্দা |

| | |
|---|---|
| | ৩৬। সাপগাছিয়া |
| | ৩৭। আনতোবাদ |
| | ৩৮। নোনাডাঙ্গা |
| | ৩৯। বন্ডেল উলুবেড়িয়া |
| | ৪০। বেদিয়াডাঙ্গা |
| | ৪১। কুষ্টিয়া |
| | ৪২। পুরানগড় |
| | ৪৩। ঘুঘুডাঙ্গা |
| | ৪৪। শ্রীরামপুর |
| ১৩। ডিহি চক্রবেড়ে | ৪৫। বালিগঞ্জ |
| | ৪৬। গুদসা |
| | ৪৭। চক্রবেড়ে |
| ১৪। ডিহি ভবানীপুর | ৪৮। ভবানীপুর |
| | ৪৯। নিজগ্রাম |
| ১৫। ডিহি মনোহরপুর | ৫০। বেলতলা |
| | ৫১। কালীঘাট |
| | ৫২। মনোহরপুর |
| | ৫৩। মুদিয়ালী |
| | ৫৪। শাহানগর |
| | ৫৫। কৈখালি |

কলিকাতা ও তার শহরতলিকে দুটি পৃথক মিউনিসিপাল টাউন হিসাবে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দেখানো ছিল। এর সামান্য কিছু হেরফের করে এই চেহারা ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বজায় ছিল।[২]

**তথ্যসূত্র**


১ A Short Histroy of Calcutta—A.K. Roy, p. 60

২ A Short Histroy of Calcutta—A.K. Roy, pp. 110-112.

## ১১

# পলাশী যুদ্ধোত্তরকালের কলিকাতা

আবার কলিকাতার রাস্তাঘাটের প্রসঙ্গে ফিরে আসা যায়। পলাশী যুদ্ধে জয়লাভ, বিনা খাজনায় জমিদারি লাভ ও ক্ষতিপূরণ বাবদ ১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা পাওয়ায় ইংরেজ কোম্পানি নতুন নতুন ভবন নির্মাণ ও চলাচলের সুবিধার জন্য রাস্তাঘাট নির্মাণে তৎপর হলেও প্রথম দিকে এই তৎপরতা ব্যাহত হতে থাকে। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতার অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হয়ে উঠে। যুদ্ধ বিগ্রহ প্রভৃতির জন্য কলিকাতায় ওই সময় ভীষণ মড়ক দেখা দিল। বহু লোক মহামারীর কবলে প্রাণ হারায়। নবাব সিরাজদ্দৌলার আক্রমণে কলিকাতার যে ক্ষতি হয়েছিল মহামারীর প্রকোপে তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতি হল। মহামারীর এই ভয়ঙ্কর রূপ দেখে মেজর কারন্যাক (Major Carnac) সৈন্যবাহিনীর উপর এর ক্ষতিকর প্রভাবের বিষয় উল্লেখ করে ক্লাইভের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ক্লাইভের নির্দেশে কলিকাতায় সৈন্য অবতরণ নিষিদ্ধ হয়।[১] ওই বছর অর্থাৎ ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতার বাড়িঘরের উপর ট্যাক্সের হার বাড়িয়ে ২ থেকে ৩ লক্ষ টাকা সংগ্রহের এক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল ওই অর্থে "to defray the expense of cleansing and ornamenting the place internally।"[২] কিন্তু কোম্পানির এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।[৩]

এইখানেই শেষ নয়। পলাশীর যুদ্ধের ৫ বছর পরে অর্থাৎ ১৭৬২ খ্রিঃ আর একবার মহামারীর প্রাদুর্ভাব কলিকাতায় দেখা দেয়। সেই সময় প্রায় পঞ্চাশ হাজার নেটিভ অধিবাসী ও আটশো জন সাহেব মহামারীর কবলে প্রাণ হারায়। কলিকাতার এই অস্বাস্থ্যকর অবস্থা দূর করার জন্য ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির আদেশে শহরের জঞ্জাল পরিষ্কার ও বনজঙ্গল কাটার নির্দেশ দেওয়া হয়। ওই সময় শহরে কতকগুলি নতুন রাস্তাও তৈরি হয়। এই সব কাজের তত্ত্বাবধানের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত সারভেয়রগণ (Surveyors) নতুন তৈরি রাস্তার ধারে ইট বাঁধান নালা তৈরির সুপারিশ করেছিল। অত্যধিক খরচের ভয়ে কোম্পানি সে-প্রস্তাব নাকচ করে বিকল্প হিসাবে রাস্তার দু'ধার ঢালু করে দেওয়ার নির্দেশ দেন।[৪] পুরাতন ফোর্ট উইলিয়ামের পূর্বদিকে দুর্গের রক্ষা-কবচ হিসাবে যে পরিখা ছিল তাতে অন্ধকূপ-হত্যাজনিত মৃতদেহগুলি নিক্ষেপ করা হয়। পরে মারাঠা খালের মতো এর মধ্যে ওই অঞ্চলের জঞ্জালও ফেলা হতে থাকে। ফলে ভয়ঙ্কর এক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ১৭৬৬ খ্রিস্টাব্দে ওই পরিখা বুজিয়ে ফেলা হয়।[৫] ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে সমগ্র বঙ্গদেশে মহাদুর্ভিক্ষের সূচনা হয়। দুর্ভিক্ষের পরে আসে মহামারী। এটি "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" নামে আখ্যাত। হিকির বিবরণ থেকে জানা যায় যে কেবলমাত্র কলিকাতা শহরে ওই বছরে ১৫ জুলাই থেকে ১০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ছিয়াত্তর হাজার লোক তিন মাসে প্রাণ হারিয়েছিল, তার মধ্যে বিদেশির সংখ্যা ছিল ১৫ শতের মতো (Editor of a scurrilous paper called Hickey's Gazette)[৬]।

১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতায় এক প্রকার জ্বরের প্রাদুর্ভাব ঘটে। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিও এই জ্বরের শিকার হয়েছিলেন। বিচারক হাইডের (Mr. Justice Hyde)-এর কোর্ট ডায়েরিতেএর উল্লেখ আছে।[৭]

পলাশী যুদ্ধের পর থেকে ১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ এই ২০ বছর কলিকাতাকে নানা সময়

দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও মন্বন্তরের কবলে পড়তে হয়েছিল। এ ছাড়া তো যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই ছিল। কাজেই শহর কলিকাতার দ্রুত রূপায়ণ কার্যত ব্যাহত হয়েছিল। কিন্তু দ্রুত হারে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি, যত্রতত্র বাড়িঘর, বস্তি, বাজার নির্মাণের ফলে কলিকাতা ক্রমশ ঘিঞ্জি ও অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠতে থাকে। এই সময় কিছু রাস্তা তৈরি হয় কলিকাতায়। তার নিদর্শন মেলে মার্ক উডের কলিকাতার মানচিত্রে (১৭৮৪-৮৫)। এই মানচিত্রেই সর্বপ্রথম কলিকাতার পথঘাটের নামের রূপরেখার সঙ্গে পরিচয় মেলে। মার্ক উডের মানচিত্রের সঙ্গে ১৭৪২ খ্রিস্টাব্দের আপজন সাহেবের মানচিত্রের পথঘাটের তুলনা করে সেকালের কলিকাতার রাস্তাঘাটের একটা সামগ্রিক ছবি পাওয়া যায়। উভয় মানচিত্রে যে রাস্তাগুলির মিল আছে সেগুলি আমরা এখানে গ্রহণ করব। এ থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে আধুনিক কলিকাতার বেশ কিছু সংখ্যক রাস্তা ১৭৪২ খ্রিস্টাব্দের অথবা তারও পূর্বে নির্মিত হয়েছিল। অবশ্য সেগুলি আজকের চেহারায় ছিল না। দুটি মানচিত্রের পর্যালোচনা উত্তর দিক থেকে শুরু করা যাক।

| | মার্ক উডের মানচিত্রে প্রদর্শিত পথ | ১৭৪২ খ্রিস্টাব্দের মানচিত্রে প্রদর্শিত পথ | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| ১। | ওল্ড পাউডার মিল রোড (Old Powder Mill Road) | ” | বর্তমানে এটির নাম বাগবাজার স্ট্রিট। |
| ২। | শ্যাম বাজার (Saum Bazar) | ” | বর্তমানে শ্যামবাজার স্ট্রিট। |
| ৩। | বলরাম ঘোষ স্ট্রিট | ” | ওই নাম আছে, তবে ওই রাস্তার অর্ধেক হয়েছে ফড়িয়াপুকুর স্ট্রিট (অধুনা শিবদাস ভাদুড়ী স্ট্রিট)। |
| ৪। | দৈবতলার (Daibatoolah) ধারে যে পথ চিহ্নিত আছে। | ” | এখন এটির এক অংশের নাম শ্যামপুকুর স্ট্রিট, অন্য অংশের নাম সিকদার বাগান স্ট্রিট। |
| ৫। | শোভাবাজার/শ্যাম-বাজার (Sobah Bazar/ Sham Bazar) | কেবলমাত্র শ্যামবাজার অংশটুকু দেখানো আছে। | পরবর্তীকালে শ্যামবাজার অংশটুকু গ্রে স্ট্রিট হয়েছিল (অধুনা শ্রীঅরবিন্দ সরণি)। |
| ৬। | কেতুয়া স্ট্রিট (Ketooah Street No. 81) | ১৭৪২-এর মানচিত্রে প্রদর্শিত | বর্তমান নাম শোভাবাজার স্ট্রিট। |
| ৭। | আহিরিটোলা স্ট্রিট (নং ৮২) | ” | ওই নামই বহাল আছে। |
| ৮। | জোড়াবাগান রোড (Jura Bagan Road. No. 78) | ” | বর্তমানে নিমতলা ঘাট স্ট্রিট। |
| ৯। | নীলু দালাল স্ট্রিট, গরানহাটা, মদন দত্ত স্ট্রিট (Neeloo Dalal Str., Goranhatta, Madden Dutta Str.) | ” | এই রাস্তাগুলির কিছু অংশ নিয়ে বিডন স্ট্রিট তৈরি হয়। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১০। | জোড়াসাঁকো স্ট্রিট (Jura Sakoo Str.) | ১৭৪২-এর মানচিত্রে প্রদর্শিত | পরে এটি মানিকতলা স্ট্রিট হয়। এখন অনেকগুলি অংশে বিভক্ত—রমেশ দত্ত স্ট্রিট, রামদুলাল সরকার স্ট্রিট, শিশির ভাদুড়ী সরণি। |
| ১১। | নারায়ণ চ্যাটার্জির রোড (Narain Chattergeer Rd.) | ” | সম্ভবত এই রাস্তাটি পরে মেছুয়া-বাজার স্ট্রিট হয়। এখনকার নাম কেশব সেন স্ট্রিট। |
| ১২। | বটতলা (নং ৭৪) | ” | ওই নামই বহাল আছে। |
| ১৩। | রুইহাটা (নং ৭৩) | ” | কটন স্ট্রিট। সম্প্রতি গোপবন্ধু দাস সরণি। |
| ১৪। | আমড়াতলা (নং ৭০) | ” | ওই নামই বহাল আছে। |
| ১৫। | আর্মেনিয়ান স্ট্রিট (নং ৬৮) | ” | —ওই— |
| ১৬। | মুর্গীহাটা স্ট্রিট (নং ৬৩) | ” | পরে ক্যানিং স্ট্রিট হয়, অধুনা বিপ্লবী রাসবিহারী বোস রোড। |
| ১৭। | ডুমতলা (নং ২৫) | ” | বর্তমানে এজরা স্ট্রিট |
| ১৮। | পোলক স্ট্রিট (নং ২৪) | ” | ওই নাম আজও বহাল আছে। |
| ১৯। | কোর্ট হাউস লেন (নং ২০) | ” | বর্তমানে ওল্ড কোর্ট হাউস কর্নার। |
| ২০। | ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট (Old Court House Str.) | অর্ধেকটা পথ দেখানো আছে | বর্তমানে হেমন্ত বসু সরণি। |
| ২১। | ওল্ড ফোর্ট স্ট্রিট (নং ১৫) | ১৭৪২-এর মানচিত্রে প্রদর্শিত | চার্নক প্লেস, ডালহৌসি স্কোয়ার ওয়েষ্ট, বর্তমানে নেতাজী সুভাষ রোডের অংশ বিশেষ। |
| ২২। | ম্যাঙ্গো লেন (নং ২৮) (Mangoe Lane) | ” | ওই নামই বহাল ছিল, সম্প্রতি নামকরণ হয়েছে সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ সরণি। |
| ২৩। | ক্রশ স্ট্রিট (নং ৩৩) (Cross Street) | ” | বর্তমানে ব্যারেটো লেন (Baretto Lane)। |
| ২৪। | বনফিল্ড লেন (নং ৬৫) (Bonfield Lane) | ” | ওই নামই বহাল আছে। |
| ২৫। | চায়না বাজার লেন (নং ৬৬) | ” | বর্তমানে ওল্ড চায়না বাজার স্ট্রিট। |
| ২৬। | ক্লাইভ স্ট্রিট (নং ১৬) | ” (আংশিক) | রোড টু দি গ্রেট বাজার, অধুনা নেতাজী সুভাষ রোড। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২৭। | টাঁকশাল স্ট্রিট (নং ১৩) (Tankshall Str.) | ১৭৪২-এর মানচিত্রে প্রদর্শিত | কয়লাঘাট স্ট্রিট, (কিল্লাঘাটের অপভ্রংশ কয়লাঘাট), পরে বাবু তারাপদ মুখার্জি সরণি। |
| ২৮। | মিশন রো (নং ২৬) | ,, | রোপ ওয়াক (Rope Walk), মিশন রো, বর্তমানে রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জি রোড। |
| ২৯। | রানীমুদি গলি (নং ২৯) | ,, | প্রথমে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান স্ট্রিট, পরে আবদুল হামিদ স্ট্রিট। |

১৭৪২ খ্রিস্টাব্দের মানচিত্রে এমন কতকগুলি রাস্তা চিহ্নিত আছে, উডের মানচিত্রে যার কোনও অস্তিত্বই নেই। সম্ভবত শহরের চেহারা বদলের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলির অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে। যে খালটি ভরাট করে বর্তমান হেস্টিংস স্ট্রিট তৈরি হয়েছে, সেটি স্পষ্টরূপে চিহ্নিত করা আছে এই মানচিত্রে।

এরপর আমরা মার্ক উডের মানচিত্রে প্রদর্শিত পথগুলির বিশেষত্ব নিয়ে আলোচনা করব। উডের মানচিত্র পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে উত্তর থেকে দক্ষিণে যাবার সরাসরি কোনও নতুন রাস্তাই তৈরি হয়নি। পূর্বের চিৎপুর রোড দীর্ঘ হয়ে চৌরঙ্গী অঞ্চল ছাড়িয়ে "Road to Rusapugla" হয়েছে। ক্লাইভ স্ট্রিট বড়বাজারের মধ্য দিয়ে আরও উত্তরে প্রসারিত হয়েছে। কোর্ট হাউস স্ট্রিট (ওল্ড) দক্ষিণ দিকে প্রসারিত হয়ে এসপ্লানেড রো-তে এসে মিশেছে। ওই পথের সম্প্রসারিত অংশ পরবর্তীকালে "দি ওল্ড কোর্স (The Old Course) নামে চিহ্নিত হয়েছে। পথটি ১৭৮১ খ্রিঃ নির্মিত হয়। বিভার্লির রিপোর্টের (১৮৭৬) সঙ্গে যে মানচিত্র আছে তাতে এটি "দি ওল্ড কোর্স" নামে দেখানো আছে। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতার শহরতলি (মানিকতলা, ভবানীপুর অঞ্চল) কলিকাতা শহরের অঙ্গীভূত হলে পর যে মানচিত্র তৈরি হয় তাতে রাস্তাটি প্রথমে রেড রোড, পরে দক্ষিণ-পশ্চিমের অংশটুকু খিদিরপুর রোড নামে নামাঙ্কিত হতে দেখা যায়।

মার্ক উডের মানচিত্রে নামাঙ্কিত কয়েকটি বড় রাস্তা ছাড়া ছোট ছোট রাস্তার তালিকা ওই মানচিত্রের একধারে লিপিবদ্ধ করা আছে। সে-তালিকায় সেকালের কলিকাতার কয়েকটি বাজার, কয়েকটি অঞ্চলের নাম রাস্তাগুলির সঙ্গে দেওয়া আছে। শুধু রাস্তাগুলির তালিকা ধরলে দেখা যায় ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় ৬৩টি রাস্তা এর অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে অনেকগুলি রাস্তার কথা ১৭৪২ খ্রিস্টাব্দের মানচিত্রের তুলনামূলক আলোচনার সময় বলা হয়েছে। এগুলি ছাড়া আরও কয়েকটি প্রধান রাস্তা নিয়ে এখানে আলোচনা করা যেতে পারে। এই রাস্তাগুলি আপজন সাহেবের (১৭৪২) মানচিত্রে অথবা F.C. Hirst সাহেবের পুস্তকে বর্ণিত ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের মানচিত্রে দেখানো নেই।

প্রথমেই ধরা যাক ধর্মতলা স্ট্রিটের কথা। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে এই অঞ্চলটি বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। পলাশীর যুদ্ধের পর এই এলাকার জঙ্গল পরিষ্কার করা হয়। সম্ভবত ১৭৬২ খ্রিঃ ধর্মতলা স্ট্রিট তৈরি হয়ে থাকবে। মার্ক উডের মানচিত্রে এটি দেখানো আছে। ডিঙ্গাভাঙ্গা অঞ্চলের জানবাজার রোড—সেকালের এক বিখ্যাত রাস্তা। এটিও ১৭৬২ খ্রিস্টাব্দে তৈরি হয়। এ রাস্তাটিও আজ আর ওই নামে পরিচিত নয়। এর নতুন নাম সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড।

ফেনিক বাজার স্ট্রিট জানবাজার অঞ্চলের আরেকটি রাস্তা। এটিও ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের পর নির্মিত হয়েছে। আজও ওই নাম বহাল আছে। বর্তমানে যেখানে হগ্ মার্কেট অবস্থিত, সেখানে ছিল ফেনিক বাজার। ওই রাস্তার কিছু অংশ হগ্ মার্কেটের সব্জি বাজার দখল করে নিয়েছে।

আমেদ জমাদার স্ট্রিট বলে যে রাস্তাটি উড সাহেবের মানচিত্রে দেখানো আছে, পরবর্তীকালে সম্ভবত এটি সাউথ কলিঙ্গ স্ট্রিট নামে নামাঙ্কিত হয়। বিভার্লি সাহেবের মানচিত্রে ওই নামই আছে। মারকুইস অফ রিপন (Marquis of Ripon) ১৮৮০ থেকে ১৮৮৪ খ্রিঃ পর্যন্ত ভারতের গভর্নর জেনারেল ছিলেন। তাঁর ভারত ত্যাগের পর এই রাস্তাটির নাম রিপন স্ট্রিট হয়।

এখন যে পথটি ইলিয়ট রোড নামে পরিচিত, উডের মানচিত্রে পথটি দেখানো আছে, তখনও কোনও নামকরণ হয়নি।

বর্তমানে পার্ক স্ট্রিট, উডের মানচিত্রে বিনা নামে দেখানো আছে। এই পথটিও ১৭৬২ খ্রিস্টাব্দে তৈরি হয়। আপজন সাহেবের ১৭৯৪ খ্রিঃ মানচিত্রে নামহীন এই পথটি বেরিয়াল গ্রাউন্ড রোড নামে নামাঙ্কিত করা আছে। এই রাস্তাটির পূর্ব প্রান্তে ১৭৬৭ খ্রিঃ ইংরেজদের এক নতুন কবরখানা নির্মিত হয়। শবদেহ এই পথ দিয়ে কবরখানায় নিয়ে যাওয়া হত বলে লোকে এই পথটিকে বারিং গ্রাউন্ড রোড (Burying Ground Road) বলত। এই পথটি ৭½ ফার্লং লম্বা। সে সময় এটি চৌরঙ্গী রোড থেকে শুরু করে সারকুলার রোডে এসে পড়েছিল।

মার্ক উডের মানচিত্রে চৌরঙ্গী গ্রামের লোকবসতি, রাস্তাঘাট সুস্পষ্টরূপে চিহ্নিত করা আছে। কিন্তু নামাঙ্কিত কোনও রাস্তাই তখন সেখানে ছিল না। পার্ক স্ট্রিট সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হয়েছে। ওই রাস্তাটি ছাড়া আরও কয়েকটি রাস্তার খোঁজ মেলে। তারই একটা মোটামুটি তালিকা দেওয়া হল।

| রাস্তাগুলি আজকে যে নামে পরিচিত | মার্ক উডের মানচিত্রে প্রদর্শিত পথ |
|---|---|
| ১। রাসেল স্ট্রিট | বিনা নামে দেখানো আছে। |
| ২। মিডলটন্ স্ট্রিট | বিনা নামে বর্তমান দৈর্ঘ্যের অর্ধেক দেখানো আছে। |
| ৩। হ্যারিংটন স্ট্রিট | বিনা নামে দেখানো আছে। |
| ৪। ক্যামাক স্ট্রিট | ,, |
| ৫। উড স্ট্রিট | ,, |
| ৬। ভিক্টোরিয়া স্কোয়ার | ,, |
| ৭। হাঙ্গার ফোর্ড স্ট্রিট | ,, |
| ৮। লাউডন স্ট্রিট | বিনা নামে দেখানো আছে, তবে বর্তমানের মতো পার্ক স্ট্রিট পর্যন্ত প্রসারিত ছিল না। |
| ৯। থিয়েটার রোড | দেখানো আছে মারাঠা ডিচের সীমানা পর্যন্ত। |

মার্ক উডের মানচিত্রে চৌরঙ্গী অঞ্চলের রাস্তাগুলির চেহারা কলিকাতার অন্যান্য রাস্তাগুলির থেকে পৃথক সেটা এক নজরে ধরা পড়ে। তার কারণও আছে।

পলাশী যুদ্ধের পর গোবিন্দপুরের জঙ্গল পরিষ্কার করে ইংরেজ কোম্পানি নতুন দুর্গ নির্মাণে তৎপর হন। স্থান সংগ্রহের জন্য গোবিন্দপুরের স্থায়ী বাসিন্দাদের উচ্ছেদের ব্যবস্থা হল। এ সম্পর্কে কলিকাতা কাউন্সিল বিলাতের কর্তৃপক্ষকে ১৭৫৮ খ্রিঃ ১০ জানুয়ারি লিখে জানান যে যাদের গোবিন্দপুরে পাকা বাড়ি আছে, তাদের মূল্য দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। যারা খুবই দরিদ্র তাদের গোবিন্দপুরের কাছাকাছি অর্থাৎ চৌরঙ্গী অঞ্চলে জমি দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। চৌরঙ্গী অঞ্চলটি হিংস্র জন্তু অধ্যুষিত গোবিন্দপুরের জঙ্গলের দ্বারা পৃথক ছিল। তাই প্রথম দিকে ইংরেজ বসতি গড়ে না ওঠায় ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের মানচিত্রে কোনও বসতি চিহ্নিত নেই। পলাশী যুদ্ধের পর এই সব অঞ্চলের জঙ্গল পরিষ্কার করে রাস্তাঘাটের পত্তন হয়। ক্যামাক ও কলভিন সাহেব এই সব জমির মালিক ছিলেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ক্যামাক ও কলভিন সাহেবের জমিতে বস্তিবাড়ি তৈরি করে গোবিন্দপুরের উৎখাত হওয়া দরিদ্র বাসিন্দাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন। বামুনেরা যে বস্তিতে বসবাস শুরু করে তার নাম হয় বামুন বস্তি, অন্যান্যরা কলভিন বস্তিতে থাকার জায়গা করে নেয়।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তত্ত্বাবধানে এই বস্তিগুলি নির্মিত হয়েছিল বলে এখানকার রাস্তাগুলি সোজা সোজা, উত্তর বা মধ্য কলিকাতার মত আঁকা বাঁকা নয়।

১৮১৭ খ্রিঃ যে স্থায়ী লটারি কমিটি কলিকাতার উন্নয়নের জন্য স্থাপিত হয়েছিল তাঁরা পার্ক স্ট্রিটের দক্ষিণে বামুন বস্তি ও কলভিন বস্তি উচ্ছেদ করে ইংরেজদের বসবাসের জন্য অভিজাত সাহেবপাড়া

তৈরি করেছিলেন। এইভাবে রাসেল স্ট্রিট, মিডলটন স্ট্রিট, ক্যামাক স্ট্রিট, উড স্ট্রিট প্রভৃতি নির্মিত হয়। উত্তর কলিকাতায় বসবাসকারী ইংরেজগণ ওখানকার বসবাস উঠিয়ে দিয়ে চৌরঙ্গীতে পাড়ি জমায়। নতুন গড়ে ওঠা অঞ্চলে আধুনিক নগর-পরিকল্পনার ছোঁয়া লাগে।

মার্ক উডের মানচিত্রে একদিকে যেমন রাস্তাগুলি স্পষ্টরূপে চিহ্নিত ও নামাঙ্কিত হয়েছে অন্যদিকে অঞ্চল-ভিত্তিক লোকবসতির চিত্রটিও ওই মানচিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। এতে দেখা যায় মলাঙ্গা, শাঁখারীটোলা, ডিঙ্গাভাঙ্গা, কলিঙ্গ, তালপুকুর, চৌরঙ্গী গ্রামে ঘন বসতি গড়ে উঠেছিল, যা কিনা ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের মানচিত্রে কেবলমাত্র বনজঙ্গল, ঘন অরণ্য, মাঝে মাঝে কৃষিক্ষেত্র, তার মাঝে সরু সরু রাস্তা ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

মার্ক উডের মানচিত্রে রাস্তাঘাটের বিবরণ ছাড়াও অনেকগুলি বাজারের নাম পাওয়া যায়। সেগুলি—বাগবাজার, শ্যামবাজার, শোভাবাজার, সিমলাবাজার, পুরাতন সিমলাবাজার, বড়বাজার, শেরবার্ণ বাজার, সর্ট বাজার, টিরেটা বাজার, রাধাবাজার, চীনেবাজার, বৌবাজার, কলিঙ্গ বাজার, ফেনিক বাজার, মেছুয়াবাজার, তালপুকুর বাজার। এদের কয়েকটির বর্তমানে কোনও অস্তিত্ব নেই।

বাজারগুলি ছাড়া হুগলি নদীর তীরে সেকালের কলিকাতার ঘাটের একটি রেখাচিত্র মার্ক উডের মানচিত্রে প্রথম পাওয়া যায়। সংখ্যায় হবে ৩৪টি ঘাট।

মার্ক উডের মানচিত্রের পর আপজন সাহেব কলিকাতা ও তার শহরতলি নিয়ে আরেকটি মানচিত্র ১৭৯৪ খ্রিঃ প্রকাশ করেন। তিনি ১৭৯২ ও ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতাকে সম্পূর্ণ জরিপ করার পর এই মানচিত্রটি তৈরি করেন, সে কথা পূর্বে বলা হয়েছে। আপজন সাহেবের এই মানচিত্র অষ্টাদশ শতাব্দীর কলিকাতার শেষ মানচিত্র। আপজন সাহেবের মানচিত্র সম্বন্ধে দু'চার কথা বলা যেতে পারে।

কোর্ট হাউস স্ট্রিটের বর্ধিতাংশ একটি নতুন পথের রূপরেখা তৈরি করেছে, যেটি এসপ্লানেড রো এর সংযোগস্থল থেকে আরম্ভ হয়ে সোজা দক্ষিণে এগিয়ে পরে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে মোড় ঘুরে খিদিরপুর ব্রিজ পর্যন্ত প্রসরিত হয়েছে। এটির কোনও নামাঙ্কন করা নেই। মার্ক উডের মানচিত্র আলোচনার সময় এ সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র। আপজন মানচিত্রে নতুন ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ, এসপ্লানেড ও ময়দান স্পষ্টভাবে দেখানো আছে। এই অংশটুকু পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যাবে এর অনেকখানি বর্তমানের কলিকাতা গ্রাস করে নিয়েছে। ফোর্ট উইলিয়াম থেকে একটি রাস্তা বার হয়ে দক্ষিণে প্রসারিত—আপজনের মানচিত্রে এটি বিনা নামে চিহ্নিত আছে। এই পথটির বর্ধিতাংশ দু ভাগে বিভক্ত হয়েছে—একটি শাখা দক্ষিণ-পূর্বে এগিয়ে ওল্ড কোর্সের সঙ্গে মিশেছে। অন্যটি দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রসারিত হয়ে আদি গঙ্গার ধারে এসে শেষ হয়েছে। ফোর্ট এলাকা ও এসপ্লানেড আদি কলিকাতার চৌহদ্দির মধ্যে ছিল না। এই কারণে মার্ক উডের মানচিত্রে এই অংশ দেখানো হয়নি।

চৌরঙ্গী ও ডিহি বিরজি (কলিকাতার অংশ)-তে রাস্তার বিন্যাস দেখানো আছে। দু' চারটি ছাড়া আর কোনও রাস্তা নামাঙ্কিত নয়। বিশেষত বেরিয়াল গ্রাউন্ড রোডের পরবর্তী পর্যায়ে যে-অঞ্চল চিহ্নিত তাতে ইউরোপীয়দের বসতি চিহ্ন স্পষ্ট করে দেখানো হয়েছে। কিন্তু কোনও রাস্তারই নাম নেই। বর্তমানে ওই রাস্তাগুলি কী নামে নামাঙ্কিত তা মার্ক উডের মানচিত্রে আলোচিত হয়েছে।

যে গ্রামগুলি নিয়ে আজকের শহর কলিকাতা গড়ে উঠেছে সেগুলি পরিস্ফুট করা হয়েছে আপজন সাহেবের এই মানচিত্রে। মারাঠা ডিচ ভরাট করে যে রাস্তা তৈরি হয়েছিল সেটিও স্পষ্ট অঙ্কিত আছে। তখনও তাকে নামের মালা পরানো হয়নি। মানচিত্রের একধারে আপজন সাহেবের মন্তব্য লিপিবদ্ধ আছে। তাতে বলা হয় চওড়া রাস্তাগুলির নাম মানচিত্রে লেখা আছে। ক্ষুদ্রগুলির তালিকা—সংখ্যায় ৫৮টি, পৃথকভাবে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন, প্রত্যেক ইউরোপীয় বাড়ি ও বাগান মানচিত্রে দেখানো হলেও নেটিভ অধিবাসীদের ঘর বাড়ি পৃথক ভাবে জরিপ করা হয়নি। পাঠকের সুবিধার জন্য মানচিত্রটি পরিশিষ্ট ৫-এ দেওয়া হল।

আপজন সাহেব তাঁর মানচিত্রে সেকালের কলিকাতা শহরতলির এক সুন্দর চিত্র উপহার

দিয়েছেন। কোন্ কোন্ গ্রাম এই শহরতলির অন্তর্ভুক্ত, সে গ্রামগুলির অবস্থান ও প্রেক্ষাপট এই মানচিত্রে নির্দিষ্ট করা আছে। উত্তর দিক থেকে শুরু করা যাক—দক্ষিণ পাইকপাড়া, হালসীবাগান, ডিহি উল্টাডিঙ্গি, ডিহি বাহির-সিমলা, ডিহি শুঁড়া, ডিহি শিয়ালদহ, ডিহি এন্টালি, জানবাজার, ডিহি চক্রবেড়িয়া, বালিগঞ্জ, ডিহি বিরজি (শহরতলির অংশ), ডিহি ভবানীপুর, খিদিরপুর, আলিপুর। এই গ্রামগুলির মধ্যে কয়েকটিতে লোকবসতি ও রাস্তাঘাটের চিত্র উত্তমরূপে প্রতিফলিত হয়েছে। বিশেষ করে ডিহি শিয়ালদহ, ডিহি এন্টালি, জানবাজার, ডিহি চক্রবেড়িয়া প্রভৃতি এ প্রসঙ্গে উল্লেখের দাবি রাখে।

মার্ক উডের মানচিত্রের মতো আপজন সাহেবের মানচিত্রে হুগলিনদীর ধারে সেকালের কলিকাতার ঘাটের নামগুলি দেওয়া আছে। তুলনামূলক বিচারে আপজন সাহেবের মানচিত্রে পাঁচটি নতুন ঘাটের খোঁজ পাওয়া যায়। সেগুলি—(১) বোষ্টম দাসের ঘাট, (২) কাশীনাথ ঘাট, (৩) হুজুরীমলের ঘাট, (৪) বলরাম চন্দ্রের ঘাট ও (৫) ফোরম্যানের ঘাট।

১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে আপজন সাহেবের সম্পাদিত কলিকাতার জরিপে সে সময়ের কলিকাতার একটা সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যায়—

| বছর | একরের (Acre) মাপে শহরের বিস্তৃতি | ঘরবাড়ি | | রাস্তা | গলি | ছোট গলি | পুকুর |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | পাকা | কাঁচা | | | | |
| ১৭৯৪ | ৪৯৯৭ | ১১১৪ | ১৩,৬৫৭ | ১৬৩ | ৫২০ | ৫১৭ | ৬১ |

উপরের এই সারণি থেকে এটা স্পষ্ট যে ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৯৪ অর্থাৎ ৩৮ বছরের মধ্যে কলিকাতার রাস্তাঘাটের সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতায় রাস্তা ছিল যেখানে মাত্র ২৭টি, ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে তা বেড়ে হয়েছে ১৬৩টি। ওই একই সময় গলি ও ছোট গলির সংখ্যা যেখানে ছিল ৫২ ও ৭৪ তাদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৫২০ ও ৫১৭টি। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবাসনের সংখ্যা দ্রুত হারে বেড়েছে। ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে পাকা বাড়ির সংখ্যা ছিল ৪৯৮, ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১১১৪টি। অন্যদিকে কাঁচা বাড়ির সংখ্যা হ্রাসের চিহ্ন স্পষ্ট। ১৪,৪৫০টি থেকে কমে ১৩,৬৫৭টিতে। অনুমান করা যেতে পারে কাঁচা বাড়ি ভেঙে পাকা বাড়ি তৈরি হয়েছে, অথবা কাঁচা বাড়ির উপর দিয়ে নতুন নতুন রাস্তা তৈরি হয়েছে।

এখানে একটা কথা বলে রাখা ভালো যে অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়া থেকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (Permanent Settlement) বছর অর্থাৎ ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কলিকাতার রক্ষণাবেক্ষণ মায় শান্তিরক্ষা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এক কর্মচারীর (Civil Servant) উপর ন্যস্ত ছিল। তাঁকে কলিকাতার জমিদার বলা হত। তিনি শহরে স্বাস্থ্যরক্ষা ও রাস্তাঘাটের বিষয়টিও দেখাশোনা করতেন। শহরে দ্রুত হারে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের ফলে তিনি তাঁর দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনে সমর্থ হননি। ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দের এক নতুন আইনের বলে (A Statute of George III) জমিদারের হাত থেকে ক্ষমতা ফিরিয়ে নেওয়া হয়। জাস্টিসেস অফ পিস (Justices of Peace) নামে কতকগুলি পদ সৃষ্টি করা হয়। ওইগুলি পূরণ করে শহর কলিকাতার সেবার দায়িত্ব জাস্টিসেস অফ পিস-এর হাতে তুলে দেওয়া হয়। ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দের নতুন আইনের একটি ধারায় বলা হয়েছে যে, জাস্টিসেস অফ পিস নগরের ট্যাক্স আদায় ছাড়াও "principally repairing, watching and cleaning the streets" প্রভৃতির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন।[৮]

অষ্টাদশ শতাব্দীতে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নব নিযুক্ত জাস্টিসেস অফ পিস ওই শতাব্দীর অন্তিম বছরে সারকুলার রোডটি পাকা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ২৪ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার, ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে ক্যালকাটা গেজেটে এই মর্মে একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় :

"Notice is hereby given that His Majesty's Justices of the Peace will receive proposals of contract, which must be delivered sealed to their First Clerk, Mr. John

Miller, within one week from this date, for levelling, dressing and making in pucker, within the least possible time, the road forming the eastern boundary of the town, commonly called the BytockKhana Road, and commencing from the Russapugla Road at the corner of Chowringhee and terminating at Chitepore Bridge."[৯]

অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্তিম লগ্নে ফোর্ট উইলিয়ামের গভর্নর জেনারেল হয়ে এলেন লর্ড ওয়েলেসলি। সদ্য লন্ডন থেকে আগত লর্ড ওয়েলেসলিকে কলিকাতার ভয়ঙ্কর অস্বাস্থ্যকর অবস্থা, রাস্তাঘাটের শোচনীয় অব্যবস্থা বিশেষ চিন্তিত করে তুলেছিল। যুদ্ধ বিগ্রহের অবস্থা সামলে ওঠার পরই তিনি কলিকাতার উন্নয়নে তৎপর হলেন। বিভার্লি সাহেব তাঁর সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, "Few Governor Generals have done as much for Calcutta as Lord Wellesley effected during his tenure of office from 1798 to 1805."। কলিকাতার বিষয়ে তাঁর সুচিন্তিত পরিকল্পনা নিয়ে পরের অধ্যায়ে আলোচনা করব।

তিনটি গণ্ডগ্রাম নিয়ে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পাদে যে শহর কলিকাতার পত্তন হয়েছিল, অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে ব্রিটিশ শাসিত ভারতের রাজধানীর গৌরবের জয়টীকায় ধন্য হয়েছিল সেই কলিকাতা। কটন সাহেব লিখেছেন, "In the year 1773 Calcutta became for the first time the Official Capital of British India."[১০]

## তথ্যসূত্র


১ Proceedings of the Court, Aug., 1757.
২ Mr. Grant's view of the Revenue of Bengal.
৩ Beverley's Report, p. 41.
৪ Proceedings of the Court, 1762/1764 : Long's selection from the unpublished Records of Govt.
৫ Proceedings of the Court, 1766.
৬ Calcutta Review—Vol XXXV, p. 168.
৭ A Short History of Calcutta.—A.K. Roy, p. 152.
৮ Beverley's Report, P.41
৯ Saton Carr's Selection from Calcutta Gazette. Vol. III, p. 37.
১০ Calcutta Old & New—Cotton, p. 82

## ১২

# বিদেশি পর্যটকদের ভ্রমণবৃত্তান্তে সেকালের কলিকাতা

ওয়েলেসলি রিপোর্ট সম্বন্ধে কিছু বলার আগে সে সময়ের কলিকাতার অবস্থার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া যায়। যে দেশে যখনই ইউরোপীয়রা তাদের উপনিবেশ পত্তন করেছে সেখানেই পাশাপাশি তৈরি হয়েছে হোয়াইট টাউন (White Town) আর ব্ল্যাক টাউন (Black Town)। গায়ে গায়ে গড়ে ওঠা দুই শহরের বৈষম্য চোখে লাগার মতো—শহরের ইউরোপীয় অধ্যুষিত অংশটি যেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সাজানো গোছানো, দেশীয় অধিবাসীদের অঞ্চলটি তেমনি নোংরা ও ঘিঞ্জি। পুরাতন কলিকাতার চিত্রটি একই রকম। আদি কলিকাতার ইংরেজ অধ্যুষিত অঞ্চল সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে প্রাইস্ সাহেব (Price's Observations) বলেছেন : "Round their little fort and close to it, by degrees they built themselves very neat, useful, if not elegant houses, a church, a court house, &c., laid out walks, planted trees, and made their own little district neat, clean and convenient.'' ইউরোপীয়দের বাড়িতে পাখা ছিল না, জানলায় কোনও কাঁচের সার্সিও ছিল না। দরজা-জানলা বাঁশের কঞ্চি দিয়ে তৈরি হত। সেকালের কলিকাতার রাস্তাঘাট প্রসঙ্গে প্রাইস সাহেবের মন্তব্য : ''Carriages they had none, for there were no carriage roads then in the Country, nor for many years after." এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কলিকাতায় গাড়ি চলার মতো কোনও রাস্তাই ছিল না। হ্যামিলটন সাহেবের লেখা থেকে সেকালের কলিকাতার দেশীয় অধিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলের একটি চালচিত্র পাওয়া যায় : "The then town was built without order, as the builders thought most convenient for their own affairs, everyone taking in what ground best pleased them for gardening, so that in most houses you must pass through a garden into a house ; the English building near the river side and the natives within land."

প্রাইস সাহেব সেকালের কলিকাতার স্থানীয় অধিবাসীদের গৃহনির্মাণের বিষয়টির উপরও আলোকপাত করেছেন : "The Universal custom of the natives, when they obtain a small spot on which to build a hut, is to dig a hole, raise one part of the ground with the earth from the other, and make the walls of their house of the same materials from the same place, and then cover it with straw tied on reeds or split bamboos ; the hole in the ground is made smooth, and as deep as they can, and when the periodical rains set in, it becomes a little pond or tank, in which they wash their bodies and clothes, as directed by their religion. Vegetation is so quick and powerful, and shade so necessary, that in six months' time the little hut is absolutely hid from the eyes, and almost from the knowledge of everybody but the inhabitants of neighbouring huts. A little path of a foot or two broad is all those harmless people want to go from home into the common highway leading to the public market. Thousands of these huts are run up wherever they are permitted to build near European

settlements."[১]

প্রাইস সাহেবের এই লেখা থেকে জানা যায় সে সময়ের কলিকাতায় এলোমেলো অগোছালো ভাবে যত্রতত্র কাঁচা ঘরবাড়ি নির্মাণ, পায়ে হাঁটার জন্য সরু সরু গলির পত্তন, যেখানে সেখানে পুকুর ও ডোবা খনন করে এক বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছিল। আগস্ট, সেপ্টেম্বর মাসের প্রবল বর্ষণ পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলত। পুরাতন ফোর্ট উইলিয়াম অঞ্চল বাদে কলিকাতার সমস্ত নিচু এলাকা জলে ডুবে যেত।

১৭৮০ খ্রিস্টাব্দের কলিকাতার এক ভয়াবহ চিত্র উপহার দিয়েছেন ম্যাকিনটস্ সাহেব তাঁর 'Tracts in Europe, Asia and Africa' পুস্তকে। তিনি লিখেছেন, ''It is truth that, from the western extremity of California to the eastern coast of Japan, there is not a spot where judgement, taste, decency and convenience are so grossly insulted as in that scattered and confused chaos of houses, huts, sheds, streets, lanes, alleys, windings, gutters, sinks and tanks, which, jumbled into an undistinguished mass of filth and corruption, equally offensive to human sense and health, compose the capital of the English Company's Govt. in India. The very small portion of cleanliness which it enjoys is owing to the familiar intercourse of hungry jackals by night, and ravenous vultures, kites and crows by day. In like manner it is indebted to the smoke raised in public streets, in temporary huts and sheds, for any respite it enjoys from mosquitos, the natural production of stagnated and putrid waters.''[২]

ফরাসি পর্যটক গ্রাঁপ্রে (M.L. Grandpre) ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা ভ্রমণে আসেন। তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ "Voyage in the Indian Ocean and to Bengal undertaken in 1781-90"। একদিকে যেমন লালদিঘির সৌন্দর্য তাঁকে মুগ্ধ করেছিল অন্যদিকে চিৎপুর রোডের চরম অস্বাস্থ্যকর, অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ দেখে চমকে উঠেছিলেন তিনি। তাঁর লেখা থেকে জানা যায় যে, সে সময় লালদিঘির জল পানীয় হিসাবে ব্যবহৃত হত। লালদিঘির চারদিকে ছিল ঘাসের সমারোহ। জল যাতে দূষিত না হয় তার জন্য বুক সমান উঁচু প্রাচীর দিয়ে লালদিঘিকে ঘিরে দেওয়া হয়েছিল। প্রাচীরের উপর রেলিংএর ব্যবস্থা ছিল। লালদিঘির চারদিকে ছিল চমৎকার সব প্রাসাদ। এই সব প্রাসাদে কোম্পানির কর্মচারীরা বাস করত। নদীর ধারে ছিল পুরাতন দুর্গ। কলিকাতার এই অঞ্চলের সৌন্দর্য গ্রাঁপ্রেকে মুগ্ধ করেছিল। তাঁর মতে সে সময়ের কলিকাতা কেবলমাত্র এশিয়ার মধ্যেই নয়, পৃথিবীর সকল সুন্দর নগরীর মধ্যে একটি বলে গণ্য হতে পারে। গ্রাঁপ্রের এই ভ্রমণ কাহিনী থেকে তৎকালীন ইউরোপীয় অধ্যুষিত শহরের (White Town) এক রূপরেখাও পাওয়া যায়।

এক সান্ধ্য বিবরণের মাধ্যমে গ্রাঁপ্রের সেকালের কলিকাতার এক কর্মব্যস্ত পথের চিত্র উপহার দিয়েছেন : ''Calcutta, exclusively of this mode, abounds with all sorts of carriages, chariots, whiskies and phaetons, which occasion in the evening as great a bustle as in one of the principal towns in Europe.''

এখানেই শেষ নয়। ফরাসি পর্যটক গ্রাঁপ্রে চিৎপুর রোডের ওপর টিরেটা বাজার (Tiretta Bazar)-এর বিপরীত দিকে বাস করতেন। তিনি ওই এলাকার যে ভয়াবহ অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন তা থেকে আমরা সেকালের দেশীয় অধিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল (Black Town)-এর এক সামগ্রিক অবস্থার পরিচয় পাই। ওই অঞ্চলের রাস্তাগুলি ছিল কাঁচা। বাড়ি ও সদর রাস্তার মধ্যবর্তী স্থানে নালা (ditch) দিয়ে গৃহের নোংরা জল পরিবাহিত হত। তাই নালাগুলি সব সময় আবর্জনায় ভরে থাকত। এই প্রসঙ্গে গ্রাঁপ্রে লিখেছেন : ''Such animals as die in the streets or in the houses, are thrown into the drains, and they lie there and putrefy. From want, sickness or accident, many a poor wretch of the human species also expires in the street. ... ... I have seen the body of a poor creature lying dead at my door serve two

nights for food to some of these hungry animals (Jackals).''

১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে লিখিত লর্ড ভ্যালেনশিয়া (Lord Valentia)-র বিবরণ থেকে সেকালের কলিকাতার হোয়াইট ও ব্ল্যাক টাউনের একটা তুলনামূলক স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন, ''The town of Calcutta is at present well worthy of being the seat of our Indian Government, both from its size and from the magnificent buildings which decorate the part of it inhabited by Europeans. Chowringhee is an entire village of palaces, and altogether forms the finest view I ever beheld in any city. The Black Town, however, is as complete a contrast to this as can well be conceived. Its streets are narrow and dirty, but the houses of two stories, occasionally brick, but generally mud and thatched perfectly resembling the cabins of the poorest class in Ireland.''[৩]

কলিকাতার এই শোচনীয় অবস্থার প্রতিকারের জন্য গভর্নর ভ্যান্সিটার্ট, ক্লাইভ, ভেরেলস্ট (Verelst), কার্টিয়ার (Cartier) ও হেস্টিংস বিশেষভাবে তৎপর হয়েছিলেন। তাঁরা শহরটিকে বসবাসের উপযোগী করার জন্য বন-জঙ্গল পরিষ্কারের ব্যবস্থা করেছিলেন। হেস্টিংসের আমলে নতুন কতকগুলো নিয়মকানুন (New Regulations) প্রণয়ন করা হয় : সেগুলি — পুলিশ অফিসারের হাতে অধিক ক্ষমতা অর্পণ, শহরটিকে ইউরোপীয় অধ্যুষিত অঞ্চল ও স্থানীয় অধিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে (White & Black Town) ভাগ করার ব্যবস্থা, শহরটিকে ৩৫টি ওয়ার্ডে বিভক্তীকরণ, স্থানীয় অধিবাসীদের সম্মতি নিয়ে কিছু দূরে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা ইত্যাদি।

রাস্তাঘাট নির্মাণের ব্যাপারেও তাঁরা বিশেষ সচেষ্ট হয়েছিলেন। রাস্তা নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় পাথর, নুড়ি ও অন্যান্য কঠিন পদার্থ শহরের ১৫০ মাইলের মধ্যে পাওয়া দুর্লভ ছিল। পোড়া ও ভাঙ্গা ইটই একমাত্র রাস্তা নির্মাণের উপাদান ছিল। সেকালে তাও ছিল মূল্যবান। কিন্তু এই উপাদানেও রাস্তা নির্মাণ করে দেখা গিয়েছিল যে যত পুরু করেই রাস্তা তৈরি হোক না কেন, ২/১ বছরের মধ্যেই রাস্তায় পাঁচ, ছয় ফুট গভীর গর্ত দেখা যেত।

এমনই এক পরিস্থিতিতে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হয়ে এলেন মিঃ ফ্রান্সিস (Mr. Francis)। তিনি এদেশে ইংল্যান্ডের উদার আইন প্রবর্তনের সমর্থক ছিলেন বলে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে ঘোষণা করে দিলেন যে তারা শহরের যে কোনও স্থানে পছন্দমত গৃহ (Thatched hut) নির্মাণ করতে পারবে। এই উদার-নীতির ফলে শহর এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হল। Price লিখেছেন, "Every man permitted his own servants to erect straw huts against the outside of his house but without digging holes, to prevent more disagreeable neighbours from occupying the spot. All distinction of character and order was thrown down as much as if there had been a civil war in the town.''

শহরের পরিস্থিতি যখন এমনি জটিল হয়ে উঠেছে, সেই সময় আবার শুরু হয়ে গেল কাউন্সিল জেনারেল আর সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতার লড়াই, আর সেই অবস্থার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে স্বদেশি, বিদেশি—কলকাতার সর্বশ্রেণীর অধিবাসীরাই ইচ্ছামত গৃহনির্মাণ কাজে মেতে উঠল। Price এ বিষয়ে মন্তব্য করেছেন, ''...every inhabitant in the town, black and white, did that which seemed best to be done in his own eyes.'' এই স্বেচ্ছাচারিতার মাশুল গুণতে হল কলিকাতাকে। তার উন্নয়নের গতির পথ হল রুদ্ধ।

কেবলমাত্র আন্তরিক প্রচেষ্টাতেই একটা শহর গড়ে তোলা যায় না ; তার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থানও একান্ত আবশ্যক। ডঃ মার্টিন (Dr. Martin) কলিকাতার উপর তাঁর ঐতিহাসিক প্রতিবেদনে মন্তব্য করেছিলেন, ''In Hickey's Gazette for 1781, I find notice of a proposal submitted to the 'Board' (meaning, I suppose, the Council Board) by a Colonel Campbell for cleaning and draining the town on an estimate of two lakhs of rupees per annum ; but it would seem that Board, 'for certain reasons best known to the parties themselves', declined the Colonel's plan, and actually imposed or intended

to impose a 'stupendous tax' of from 7 to 14 per cent on landed property for the same object; whether this latter measure was found impracticable in itself, or whether it gave way to measures of external political importance, I cannot say, as there is no further notice regarding it.'' [৪] উপরের এই মন্তব্য থেকে জানা যায় যে কর্নেল ক্যামবেলের শহর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও তার পয়ঃপ্রণালীর উন্নতির প্রকল্প অর্থের অভাবে নামঞ্জুর হয়ে গেল।

এদিকে কলিকাতার অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হয়ে ওঠায় কোম্পানির কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু করতে বাধ্য হন। অবশেষে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে একটি আইন বিধিবদ্ধ হয়। এই আইনের বলে (Act of Parliament—33 George III) প্রথমে কলিকাতার জমিদারের (Collector of Calcutta) হাত থেকে কলিকাতার রক্ষণাবেক্ষণের ভার অধিগ্রহণ করা হয়। এই আইনের ১৫১ ধারায় গভর্নর জেনারেলকে কলিকাতার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জাস্টিসেস্ অফ পিস নিযুক্ত করার ক্ষমতা দেওয়া হয়। সেকালের জাস্টিসেস্ অফ পিস ছিলেন গভর্নর জেনারেল, কাউন্সিলের সদস্যগণ ও সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিগণ। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ২৪ পরগনার ম্যাজিস্ট্রেটদের কলিকাতার জাস্টিসেস্ অফ পিসের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, কারণ সেই সময় কলিকাতার পার্শ্ববর্তী ২০ মাইল ব্যাসার্ধের অঞ্চল অসামরিক শাসন ব্যবস্থার (Civil Jurisdiction) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। কলিকাতার জাস্টিসেস্ অফ পিসের উপর অর্পিত ক্ষমতার বলে তাঁরা শহরের প্রত্যেক ঘরবাড়ির উপর সমহারে কর ধার্য করে তা আদায়েরও সুব্যবস্থা করেছিলেন। ওই অর্থ দিয়ে তাঁরা শহরের আবর্জনা পরিষ্কারের ব্যবস্থা করেছিলেন। নতুন রাস্তা নির্মাণেরও ব্যবস্থা হয়। এই সময়ই সারকুলার রোড পাকা করা হয়। এই আইনে গভর্নর জেনারেলকে কলিকাতার সীমা নির্ধারণের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। কিছু পরেই জাস্টিসেস্ অফ পিস তাঁদের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে অবহিত হন। তাঁরা বুঝলেন কলিকাতার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি করতে হলে প্রশস্ত রাস্তা নির্মাণ ও উপযুক্ত পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থার আশু প্রয়োজন। নতুবা শহরের কোনও স্থায়ী উন্নতি সম্ভব নয়। কিন্তু কলিকাতার জাস্টিসেস্ অফ পিস তাঁদের সীমিত সামর্থ্যে এই ব্যয়সাপেক্ষ কর্মপ্রণালী রূপায়িত করতে পারেননি।

এমন এক পরিস্থিতিতে ভারতের গভর্নর জেনারেল হয়ে এলেন লর্ড ওয়েলেসলি। কলিকাতার এই ভয়াবহ অস্বাস্থ্যকর অবস্থার প্রতিবিধানে তিনি তৎপর হলেন। সেকালের কলিকাতার সমস্ত সমস্যা পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুধাবন করে তিনি একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ (Minute) প্রস্তুত করলেন। এটিই 'ওয়েলেসলির মিনিট' নামে পরিচিত। ১৬ জুন ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে এটি লিপিবদ্ধ করা হয়। কলিকাতার উন্নয়নে সরকারি প্রচেষ্টার এটিই প্রথম পদক্ষেপ বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। [৫]

ওয়েলেসলির মিনিটেই সর্বপ্রথম কলিকাতার ভৌগোলিক বিশেষত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। সাধারণত নদীর তীরে গড়ে ওঠা শহর বা জনপদের ঢাল নদীর দিকেই হয়ে থাকে। এর ফলে ওই অঞ্চলের বৃষ্টিবাহিত জল বা পয়ঃপ্রণালীর জল গড়িয়ে নদীর দিকে যায়। তাই কোম্পানির কর্তৃপক্ষ নতুন গড়ে ওঠা কলিকাতা শহরের পয়ঃপ্রণালীর ও বর্ষণের জল হুগলি নদীতে নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু কলিকাতা অঞ্চলের মাটির ঢাল পশ্চিম দিকে হুগলি নদীর দিকে না হয়ে পূর্বদিকে লবণ হ্রদের দিকে হওয়ায় কোম্পানির সব পরিকল্পনা ব্যর্থ করে বৃষ্টির জল অথবা পয়ঃপ্রণালীর জল হুগলি নদীতে না পড়ে শহরের জনবসতির মধ্যেই দিনের পর দিন আবদ্ধ হয়ে থাকত।

ওয়েলেসলির মিনিটেই সর্বপ্রথম সমকালীন কলিকাতার প্রতিটি সমস্যার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল—রাস্তাঘাট সংস্কার বা নির্মাণ থেকে শবদেহ সৎকারের ব্যবস্থা অবধি।

এই মিনিট প্রকাশিত হবার পর ওয়েলেসলি ৩০ জন সদস্য নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেন। তাদের মধ্যে কলিকাতার ৪ জন ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। কমিটির কাজ সুষ্ঠুভাবে নির্বাহ করার জন্য ওয়েলেসলি কতকগুলি নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় ওই কমিটির কোনও প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। লটারি কমিটির প্রতিবেদন পরীক্ষার সময় Mr. H. J. Shakespeare-এর

১৩ জানুয়ারি ১৮২০ খ্রিস্টাব্দের বিবরণী (Minute) বিভার্লি সাহেবের নজরে আসে। তিনি লিখেছেন, ''I find the following reference to this Committee :—'The improvements then contemplated, although sanctioned by Government and intended to be defrayed from its funds, were never carried into effect. Why they were relinquished, or where the records of that Committee are to be found, I have not been able to discover; but if they were necessary then, they are greatly more so now, when the population of the town, and particularly the European portion of it, has so much increased.' The records of the Committee from 1807 to 1814 were transferred to the Lottery Committee, of which Mr. Shakespeare was himself a member, in 1817.'' তিনি আরও মন্তব্য করেছেন, ''The Committee appears to have become defunct about the year 1814 : there is no reference to it in the Government order of 1817 appointing the new Lottery Committee.''[৬]

বিভার্লি সাহেবের এই মন্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে ওয়েলেসলি কমিটির প্রতিবেদন লটারি কমিটির কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু Mr. H. J. Shakespeare লটারি কমিটির সদস্য হয়েও কমিটির সেই প্রতিবেদনের কোনও হদিশ পাননি। ফলে কলিকাতার সার্বিক উন্নয়নের এই প্রথম প্রয়াসের প্রকৃতি ও পরিণতি চিরদিনের জন্য রহস্যাবৃতই থেকে গেল।

**তথ্যসূত্র**


১ Beverley's Report, p. 39
২ —ঐ— p. 40
৩ Beverley's Report, p. 40
৪ Medical Topography of Calcutta—Dr. Martin.


৫ ওয়েলেস্‌লির এই মিনিট-এ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্বের কলিকাতার একটি সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া যায় :

''The increasing extent and population of Calcutta, the Capital of the British Empire in India and the seat of the supreme authority, require the serious attention of Govt. It has now become absolutely necessary to provide permanent means of promoting the health, the comfort, and the convenience of the numerous inhabitants of this great Town.

''The construction of the public drains and water courses of the Town is extremely defective. The drains and water-courses in their present state neither answer the purpose of cleansing the town, nor of discharging the annual inundations occasioned by the rise of the river, or by the excessive fall of rain during the south-west monsoon. During the last week a great part of this Town has remained under water, and the drains have been so offensive that unless early measures be adopted for the purpose of improving their construction, the health of the inhabitants of Calcutta, both European and Native, must be seriously affected.

''The defects of the climate of Calcutta during the latter part of the rainy season may indeed be ascribed in a great measure to the state of the drains and water-courses & to the stagnant water remaining in the town and its vicinity.

''The health of the town would certainly be considerably improved by an improvement in the mode of draining and cleansing the streets, roads and esplanade. An opinion is generally entertaind that an original error has been committed in draining the town towards the river Hoogly, and it is believed that the level of the Country inclines towards the Salt Water Lake, and consequently that the principal channels of the public drains and water-courses ought to be conducted in that direction.

''Experience has manifested that during the rainy season, when the river has attained its utmost height, the present drains become useless: at that season the rain continues to stagnate for many weeks in every part of the Town, and the result necessarily endangers the lives of all Europeans residing in the Town, and greatly affects our native subjects.

''Other points connected with the preservation of the health of the inhabitants of this Capital appear also to require immediate notice. No general regulations at present exist with respect to the situation of the public markets, or of the places appropriated to the slaughter of cattle, the exposure of meat, or the burial of the dead. Places destined to these purposes must necessarily increase in number with the increasing population of Calcutta. They must be nuisances wherever they are situated, and it becomes an important branch of the Police to confine all such nuisances to the situations wherein they may prove least offensive. It must, however, have been generally remarked that places of burial have been established in situations wherin they must prove both injurious and offensive; and bazars, slaughtr houses and markets of meat now exist in the most frequented parts of the Town.

''In those quarters of the Town occupied principally by the native inhabitants, the houses have been built without order or regularity, and the streets and lanes have been formed without attention to the health,

convenience or safety of the inhabitants. The frequency of fires (by which many valuable lives have been annually lost and property to a great extent has been destroyed) must be chiefly ascribed to this cause.

"It is a primary duty of the Govt. to provide for the health, safety and convenience of the inhabitants of this great Town by establishing a comprehensive system for the improvement of the roads, streets, paths, drains and water-courses and by fixing permanent rules for the construction and distribution of the houses and public edifices and for the regulation of nuisances of every description.

"The appearence and beauty of the Town are inseparably connected with the health, safety and convenience of the inhabitants ; and every improvement which shall introduce a greater degree of order, symmetry and magnificence in the streets, roads, ghats, and wharfs, public edifices and private habitations, will tend to ameliorate the climate, and to promote and secure every object of a just and salutary system of police."

*—Beverley's Report, p. 46*

Beverley's Report, p. 47

## ১৩
# লটারি কমিটি ও কলিকাতার উন্নয়ন

জনকল্যাণমূলক কর্মপ্রণালী রূপায়ণের জন্য লটারির মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহের প্রচেষ্টার সূত্রপাত হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে। কলিকাতায় লটারির মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহের পরিকল্পনা প্রথম রূপায়িত হয় ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে। এই উদ্দেশ্যে ৯ জন সদস্য নিয়ে একটি বিশেষ লটারি কমিটি (Special Lottery Committee) স্থাপিত হয়। এই কমিটির তত্ত্বাবধানেই সেন্ট জন চার্চ নির্মিত হয়।[১] ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতার "এক্সচেঞ্জ গৃহ" (Calcutta Exchange) নির্মিত হয়। এই ভবনটির নির্মাণ খরচ লটারির মাধ্যমে সংগৃহীত হয়। এই লটারির টিকিট ছোট বড় সকলেই কিনতেন। এমনকি পাদরি সাহেবরা পর্যন্তও বাদ যেতেন না।[২] বিশেষভাবে কলিকাতার উন্নতি ত্বরান্বিত করার জন্য লটারির মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহের পরিকল্পনা রূপায়িত হতে শুরু হয় ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে। ওই বছরে বেঙ্গল লটারির কমিশনারগণ (The Commissioners for the Bengal Lottery) লটারির মাধ্যমে যে অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন তা নেটিভ হসপিটাল কমিটিকে (The Committee of the Native Hospital) দান করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। চিৎপুর রোড ও কলুটোলার সংযোগ স্থলে ফৌজদারি বালাখানা ভবনেই ছিল নেটিভ হাসপাতাল। এই ফৌজদারি বালাখানায় মুর্শিদাবাদের নবাবের হুগলির প্রতিনিধির দপ্তরখানা ছিল। নেটিভ হাসপাতাল লটারি কমিটির অর্থ প্রত্যাখ্যান করায় সেই অর্থ দেউলিয়া ব্যক্তিদের ঋণ পরিশোধের জন্য দান করা হয়।[৩]

সে সময় লটারি কলিকাতার অন্যান্য জিনিসপত্র বিক্রির ক্ষেত্রেও জনপ্রিয় হয়েছিল। নামজাদা চিত্রকরগণের নানাবিধ বহুমূল্য তৈলচিত্র, কাঁচের জিনিস, উৎকৃষ্ট মদ, শৌখিন দ্রব্য, পুস্তকাদি বিলেত থেকে জাহাজে করে এদেশে আসত। লটারিতে এই সমস্ত জিনিস টিকিট করে বিক্রির ব্যবস্থা করা হত। যাদের ভাগ্যে জিনিস উঠত তারা টিকিটের দামের অপেক্ষা মূল্যবান জিনিস লাভ করত। অনেক ইংরেজ ব্যবসায়ী এবং কলিকাতার ধনী অধিবাসীরা তাদের বাড়ি, বাংলো ও নানান মূল্যবান দ্রব্য লটারির সহায়তায় নীলাম করত। টেরিটি বাজারের প্রতিষ্ঠা ও বিক্রয় এই লটারির মাধ্যমে করা হয়েছিল। অনেক বহুমূল্য পুস্তকাদিও লটারিতে বিক্রি হত। সে সময়ের ইংরেজি পুস্তকের ন্যূনতম মূল্য ছিল এক মোহর। সেকালের কলিকাতার প্রসিদ্ধ গাড়ি বিক্রেতা স্টুয়ার্ট কোম্পানি বিলাত থেকে আমদানি করা কোচ গাড়ি লটারি করে বিক্রি করতেন। এইভাবে কলিকাতায় লটারি ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে।

কলিকাতা টাউন হলের বিশাল অট্টালিকাটি লটারির মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থে নির্মিত হয়েছিল। ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে গভর্নর জেনারেলের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে এই লটারির উদ্বোধন হয়। ওই বছরেই লটারির কথা সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপিত হয়। বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছিল ৫ লক্ষ টাকার লটারি হবে। প্রতিটি টিকিটের মূল্য ১০০০ টাকা, এইরূপ ৫০০০ টিকিটের ব্যবস্থা হয়েছিল। তার মধ্যে ১০০০টি টিকিটে উপহারের ব্যবস্থা ছিল। প্রাইজের মোট মূল্য থেকে শতকরা ১০ ভাগ টাউন হল ফান্ডের (Town Hall Fund) জন্য বরাদ্দের ব্যবস্থা ছিল। এ ছাড়া শতকরা ২ ভাগ লটারির খরচাদি বাবদ বাদ যেত। ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে ৭$\frac{১}{২}$ লক্ষ টাকার লটারি হয়েছিল। লটারির জনপ্রিয়তা বেড়ে ওঠায় ২০ জানুয়ারি ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে সপার্ষদ গভর্নর জেনারেল (লর্ড মিন্টো) কলিকাতার উন্নয়নে লটারির

মাধ্যমে অর্থের সংস্থানকে সরকারি অনুমোদন দিলেন। এর ফলে ৬ জন কমিশনার, একজন সুপারিন্টেডেন্ট ও একজন রেজিস্ট্রার নিয়ে শহর কলিকাতার উন্নয়নের জন্য লটারির মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহের একটি পর্ষদও গঠিত হয়। এই লটারি থেকে প্রাপ্ত অর্থ ওয়েলেসলি কর্তৃক নিয়োজিত উন্নয়ন কমিটিই প্রথম খরচ করে থাকবেন বলে অনুমান করা হয়। কিন্তু কী ভাবে ওই অর্থ খরচ হয়েছিল তার কোনও সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ১৮০৫ থেকে ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এই লটারির অর্থ দিয়ে শহরের অনেকগুলি উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছিল। এগুলি গভর্নর জেনারেলের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে রূপায়িত হয়েছিল—বড় বড় পুষ্করিণী খনন, টাউন হল নির্মাণ, বেলেঘাটা খাল খনন, অনেকগুলি রাস্তা তৈরি, তার মধ্যে একটি পুলিশ ও জঞ্জাল অপসারণ পর্ষদের সভাপতি (The President of the Boards of Police and Conservancy) জন ইলিয়টের নামে নামাঙ্কিত ইলিয়ট রোড। কলিকাতার দুর্বৃত্ত ও ডাকাতদের কঠোর হাতে দমন করেছিলেন এই ইলিয়ট সাহেব।

১৮০৯ থেকে ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে টাউন হলের লটারিকে বাদ দিলে কলিকাতার উন্নয়নের জন্য ১৭টি লটারি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অনুমান করা হয়ে থাকে এ থেকে আনুমানিক ১২ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়েছিল। তা থেকে ৭$\frac{১}{২}$ লক্ষ টাকা কলিকাতার উন্নয়নে ব্যয় করা হয়েছিল। বাকি অর্থ অর্থাৎ ৪$\frac{১}{২}$ লক্ষ টাকা ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত লটারি কমিটির হাতে অর্পণ করা হয়।

এরপর বিখ্যাত লটারি কমিটির প্রতিষ্ঠার কথা। কলিকাতার উন্নয়নে এই কমিটির অবদান প্রশংসনীয়। ২১ অক্টোবর ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির কাউন্সিলের সহ-সভাপতি (The Vice President in Council) বিখ্যাত লটারি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির উপর পূর্বের লটারি কমিশনারদের ও ওয়েলেসলি কমিটির ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পিত হয়। এই নতুন লটারি কমিটি গঠনের সময় সরকার কমিটির কর্মপ্রণালী সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন—নতুন পুষ্করিণী খনন, প্রয়োজন মতো পুরানো পুষ্করিণী ভরাটের ব্যবস্থা, নতুন বড় রাস্তা ও গলি নির্মাণ, জল পরিবহনের নালা (aquaduct) স্থাপন, সেতু ও ঘাট নির্মাণ এবং নাগরিকদের সুস্বাস্থ্য, আরাম ও নাগরিক জীবনের সুযোগ সুবিধা প্রদানার্থে অন্যান্য নির্মাণ কার্য। এককথায় বলা যেতে পারে এই লটারি কমিটির তহবিলের অর্থ কেবলমাত্র নতুন উন্নয়ন প্রকল্পে ব্যবহার হবে।

কোর্ট অফ রিকোয়েস্টের (Court of Requests) কমিশনার মিঃ গর্ডন (Mr. G.J. Gordon) লটারি কমিটির প্রথম দিকের একটি প্রতিবেদন তৈরি করেছিলেন। কোন বিষয়গুলির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে কমিটির কাজ শুরু হবে তার একটি তালিকা এই প্রতিবেদনে দেওয়া আছে। তাতে দেখা যায় যে কলিকাতার অধিবাসীদের স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় বিষয়ের উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল এই প্রতিবেদনে। পরের বিষয়গুলি এইভাবে প্রাধান্য পেয়েছে :—

> "1. To filling up, deepening or cleansing miry tanks or Jheels.
> 2. To preventing the accumulation of filth by the construction of new drains, and
> 3. To promoting ventilation by cutting down trees and increasing the number and size of streets running north & south ; that, next to the health of the inhabitants the Committee should consider the personal safety of passengers in the streets by widening narrow streets, rounding off sharp angles, and forming footpaths where possible ; that convenience and ornament should be also kept in view but postponed to the foregoing objects ; and that a preference should be given to such plans of improvements as combined the greatest number of important objects at the smallest expense." [৪]

উপরের এই প্রতিবেদন থেকে লটারি কমিটির কর্মধারার একটা সুস্পষ্ট রূপরেখা আমাদের কাছে উদ্ভাসিত হয়েছে। লটারি কমিটির সম্পূর্ণ রিপোর্ট প্রকাশিত হলে কলিকাতার প্রাচীন ইতিহাসের এক অজ্ঞাত অধ্যায় আমাদের কাছে প্রকাশিত হতে পারত। কিন্তু বিভার্লি সাহেব অনেক অনুসন্ধান করেও সম্পূর্ণ রিপোর্টের খোঁজ পাননি। ১৮১৭ থেকে ১৮২১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিরাট আকারের হাতে

লেখা তিনটি খণ্ড তৎকালীন মিউনিসিপ্যাল অফিসে দেখতে পেয়েছিলেন। বাকি রিপোর্টের কোনও হদিশ করতে পারেননি। পরবর্তীকালে এই তিন খণ্ড কলিকাতা পুরসভা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল-এর গ্রন্থাগারকে দান করেন।

কলিকাতার প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু কোনও গবেষক যদি ওই তিন খণ্ড প্রতিবেদনের পাঠ উদ্ধার করতে পারেন তবে কলিকাতার অনেক চমকপ্রদ বিবরণ উদ্‌ঘাটিত হবে, সেই সঙ্গে কলিকাতা শহরের ক্রমবিকাশের ধারাটিরও যথার্থ পরিচয় লাভ করা যাবে।

কলিকাতা পুরসভার রেকর্ডরুমে ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দের লটারি কমিটি প্রতিবেদনের কিছু ছিন্ন অংশ খুঁজে পাওয়া গেছে। এখানে তারই কয়েকটি প্রতিলিপি তুলে দেওয়া হল।

২৬ মার্চ ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে হাতে লেখা এই প্রতিবেদনে আমরা লটারি কমিটির সদস্যদের একটা তালিকা পাই। লটারি কমিটির সেক্রেটারি Mr. G. A. Bushley-র কাছে লেখা চিঠিতে রাজভবনের (Government House) উত্তর-পূর্ব দিকে একটি নতুন রাস্তা নির্মাণের প্রস্তাব দেওয়া হয়। প্রস্তাবিত পথটি পূর্বে কসাইটোলা স্ট্রিট (বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট)-এর সঙ্গে পশ্চিম দিকে নদীর তীরের সংযোগ রক্ষা করবে। যদিও কসাইটোলা স্ট্রিটের সঙ্গে রানীমুদি গলি (ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান স্ট্রিট, পরবর্তীকালে আবদুল হামিদ স্ট্রিট) ও ম্যাঙ্গো লেন (সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ সরণি) যুক্ত আছে, কিন্তু রাস্তা দুটি এত সঙ্কীর্ণ যে কদাচিৎ দুখানি গাড়ি পাশাপাশি যেতে পারে। রাস্তা দুটি চওড়া করতে গেলে প্রচুর অর্থের সংস্থান প্রয়োজন। তাই কমিটি এই রাস্তা দুটি চওড়া করা থেকে বিরত থাকছেন।

প্রস্তাবিত নতুন রাস্তাটি নির্মাণের জন্য কমিটির কাছে এক বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। যে জায়গার উপর দিয়ে নতুন পথ তৈরি হবে ; সেই জায়গায় "ওয়াটারলু হোটেল" নামে একটি বিরাট হোটেল বাড়ি আছে, হোটেলের মালিক ভবনটি ভেঙে ফেলে সেই জায়গায় ছোট ছোট খণ্ডে বাড়ি তৈরি করার এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। হোটেল বাড়ি ছাড়া আরও কয়েক ব্যক্তির জমি ও বাড়ি আছে। কমিটির সদস্যদের অবগতির জন্য জমির মালিকের নাম, জমির পরিমাপ ও মূল্যের একটা তালিকা দেওয়া হয়েছে। রাস্তার জন্য সমস্ত জমি অধিগ্রহণের খরচ পড়বে টা. ৬১,২১৯। ৯। ১০ পাই। প্রস্তাবটি রূপায়ণের জন্য আনুষঙ্গিক খরচ ধরে মোট ৬৫,০০০ টাকা ঋণ মঞ্জুরের আবেদন করা হয়েছে।

প্রস্তাবের শেষে বলা হয়েছে, যদি সরকার তাঁদের সাধারণ তহবিল (General Treasury) থেকে ওই অর্থ মঞ্জুর করেন, তা হলে এই বছরের আগস্ট অথবা সেপ্টেম্বর মাসে যে লটারি খেলা হবে তা থেকে সরকারের অর্থ পরিশোধের ব্যবস্থা হবে। যদি সরকার এই প্রস্তাব অনুমোদন না করেন, তা হলে কমিটিকে অনুমতি দেওয়া হোক তারা যেন জমির মালিকদের সঙ্গে এক চুক্তিপত্রে আবদ্ধ হয়ে যতদিন না অর্থ পরিশোধ হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত প্রদেয় অর্থের উপর শতকরা ৬ ভাগ সুদ দিয়ে জমি অধিগ্রহণ করতে পারেন।

লটারি কমিটি তাঁদের ২৬ মে ১৮২৬ তারিখের সভায় প্রস্তাবিত রাস্তা তৈরির পরিকল্পনা অনুমোদন করেন এবং এই মর্মে সরকারকে একটি পত্র পাঠান। এই পত্রে রাস্তা নির্মাণের যৌক্তিকতা বর্ণনা করা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে যে প্রস্তাবিত রাস্তাটি ৪০ ফুট চওড়া হবে।

লটারি কমিটি সরকারের কাছে প্রস্তাব রেখেছেন যে সরকার যেন ৬৫,০০০ টাকা দাদন হিসাবে মঞ্জুর করেন। লটারি কমিটি যথাসময়ে তা' পরিশোধের আশ্বাস দিচ্ছেন।

জমির মালিকদের তালিকায় দেখা যায় লালমোহন সেন ছিলেন ওয়াটারলু হোটেলের মালিক। তাঁর জমির পরিমাণ ছিল ১ বিঘা ২ কাঠা। প্রতি কাঠা জমির মূল্য ধরা হয়েছে ১০০০ টাকা। বৌবাজারের বাসিন্দা ধনাঢ্য বিশ্বনাথ মতিলালেরও জমি ছিল ১২ ছটাক। এই তালিকায় প্রকাশ পায় যে ওই অঞ্চলে উনবিংশ শতাব্দীতে জমির মূল্য ছিল ৮০০ থেকে ১০০০ টাকা প্রতি কাঠা। সে সময়ে ওই অঞ্চলে হিন্দুরা অনেক জমিজমার মালিক ছিলেন। লটারি কমিটি এই সব জমি অধিগ্রহণ করে যে ৪০ ফুট রাস্তা নির্মাণ করেছিলেন তার নাম হয়েছিল ওয়াটারলু স্ট্রিট। বর্তমান নাম নবাব সিরাজদ্দৌলা সরণি। লটারি কমিটির এই প্রতিবেদনের প্রতিলিপি থেকে পাঠকগণ সেকালের কলিকাতার এক খণ্ড-চিত্রের সঙ্গে পরিচিত হতে পারবেন।

At a Lottery Committie the 26th May 1826

At a Meeting Present

C. Trower . . .
H. Shakespear.
C. R. Barwell. } Esquires.
J. . Nasler. . .
A. Colvin.

Read and Approved the Proceedings of the 17th Instant

Mess^rs Trower and Shakespear

To

G. A. Bushby Esq^r

Secretary to the Lottery Committee

Sir,

We have felt some hesitation from the low State of the funds at the disposal of the Committee in bringing forward the subject of these Addresses, but as we consider the improvement involved in it to be one of essential importance to the convenience of the Public; we trust the Committee will concur with us in the expediency of submitting it to the favourable consideration of Government.—

2. The Committee have long considered it desirable that a more convenient communication should be opened between that part of the Town or lying East of Bazitollah Street, and the Western part

towards

Lottery Committee the 26th May 1826.

No 1.
Continued. towards the Avenue, where the Houses of Business and Public Offices are chiefly Situated.—

3. The Ramsmoody Gully and Mangrove Lane, both of them narrow passages, in which two Carriages can scarcely pass, afford the only means of communication at present. The Committee have turned their attention to widening these Lanes, but have been detained by the heavy expense from proposing either of these plans.—

4. The demolition of the large building known by the name of the Waterloo Hotel has presented an opportunity of accomplishing the object we have in view, which is not likely to occur again, and which we are very desirous to take advantage of.—

5. It will be observed from the accompanying plan that these premises extend more than two thirds of the whole distance of the proposed Road, the Proprietor intends to erect several Houses upon them, and unless an arrangement is made with him for the purchase of the portion required for the Road before his plans are matured it will not afterwards be procurable.—

6. The annexed Statement shows

that—

Lottery Committee the 26th May 1826.

Ld. V. Stuart

That the probable expence of purchasing the whole of the ground and buildings required for the Road will be £6,319. 9. 16 and we would recommend that a Credit of £5,000. Pd be applied for to cover the additional expence of clearing and paving the Road to which the proceeds of the sale of the Old Buildings will likewise be applicable. The charge for draining the Street may be defrayed hereafter either from the Lottery Funds or by the Magistrates. the Estimate for that purpose will be more accurately ascertained when the levels of the ground and of the intersecting drains can be taken after the Road may shall have been cleared.

7. Should Government be pleased to allow us to draw the amount of the above mentioned Estimate from the Spring Treasury, the same advanced will be repaid in August or September next from the proceeds of the second Lottery of the current year, but should this be deemed objectionable we trust to be permitted to make such arrangements with the several Proprietors of the premises required for the payment of the purchase money with interest at 6 per cent. per annum, for such period as the sums due to them respectively may remain unpaid.

We are &c.
(Signed) G. Thomson
H. Shakespear

Calcutta.
the 27th April 1826 &c.

Estimate

Schedule referred to in the 26th Section of the Act 1st & 2nd Geo. IV. Cap. 74.

Value of Ground and Buildings Acquired for Opening a New Road between Dacres Lane & Kennington Turnpike Road.

| Names of Proprietors. | Quantity of Ground Acquired | | | | Rate & Value of Freehold Ground | | | Value of Buildings | | | Total | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | R. | C. | C. | K. | | R. | P. | | R. | P. | | R. | P. |
| Sell Mahuna Esq. (Proprietor of the Victoria Hotel) | 1 | 2 | - | - | 1000 | 2200 | - | - | - | - | 2200 | - | - |
| Mr. Snyder | | | | | | | | | | | | | |
| Bisbrooke Mattlock | - | 2 | 13 | - | 900 | 2250 | - | 1274 | 9 | 11 | 3524 | 9 | 11 |
| Mrs. Eades | - | - | 12 | - | 700 | 600 | - | 335 | - | - | 935 | - | - |
| Mr. Townley | - | - | 7 | 5 | - | 900 | 5150 | - | 1947 | 7 | - | 7097 | 7 |
| Mr. Williams | - | - | 2 | 3 | - | - | 1750 | - | 5200 | - | - | 6750 | - |
| Mr. Nelson | - | - | 2 | 7 | - | - | 1950 | - | 7000 | - | - | 8950 | - |
| Mr. Yeates | - | - | 3 | 5 | - | - | 2650 | - | 250 | - | - | 2900 | - |
| Stonehouse Mackenzie | - | - | 3 | 1 | 2 | 1000 | 3093 | 13 | 1000 | - | - | 4093 | 13 | - |
| | - | - | 2 | 11 | 2 | 1000 | 2718 | 13 | 1500 | - | - | 4218 | 13 | - |
| Total | 1 | 6 | 10 | - | | | 42542 | 7 | 17357 | 1 | 11 | 61219 | 9 | 11 |

Signed H. Shakespear

D

96

Lottery Committee the 26th May 16.

Ordered that the following Letter be written to the Judicial Secretary to Government.

No. 6

H. Shakespear Esqr.

Secretary to Government in the Judicial Department.

Sir,

No. 3 Lottery Committee to Govt. dated 26th May

I am directed by the Lottery Committee to request that you will submit for the consideration and Order of Government the accompanying Copy of a letter from Messrs. Fraser and Shakespear dated the 21st Inst with Copy of its inclosure and the original Map which accompanied it.—

The Committee have long been of opinion that a more open Communication between that part of the Town Laying to the East of Colo= =utollah Street and the Western part towards the River would be an improvement of essential importance to the convenience of the Public. The only means of Communication in that direction be= =tween Esplanade Row and the Soll Bazar are the two confined passages called Planing mens Gully and Mango Lane, both so narrow as to scarcely to admit of two Carriages passing each

other

Lotting Committee the 26th May 1826.—

N.S. continued.. other, but they contain so many valuable Houses the attempt to widen them to any sufficient extent would involve a very heavy expence—

The demolition of the large old building known by the name of the Waterloo Hotel and lying in a direct line with the Street which runs eastward from the North East corner of the Government Place (and which is a continuation of the Lane of Road from Colonies Square thro' Hastings Street) has presented an opportunity for accomplishing the object in view on terms which may never again occur, and which the Committee are very desirous to avail themselves of by making the necessary arrangements with the Proprietors so as to admit of making a good Street 66 feet wide into Bentinck Street.—

The Committee observe that the profits of the Letting now in progress will be more than adequate to repay the expence of this improvement and the accompanying request that you will submit to Government their recommendation that they may be authorized to carry it into effect at the estimated expense being £ Stg 6,000 and that the Sub Treasurer may be directed to make the necessary advances on that Account.—

Calcutta
the 26th May 1826 &

I am &c.
(Signed) G. A. Bradby,
Secretary to the Lotting Committee

নতুন লটারি কমিটির উদ্যোগে কলিকাতা শহরের উত্তর ভাগ, মধ্যাঞ্চল ও পূর্বদিকের কাজ হয় বেশি। সে তুলনায় চৌরঙ্গী অঞ্চলের উন্নতি হলেও তার দক্ষিণে বলা যায় কোনও কাজই হয়নি। সে সময় চৌরঙ্গীর দক্ষিণ অঞ্চল ছিল কলিকাতার সীমানার বাইরে। লটারি কমিটিও সেই দূরদৃষ্টি দিয়ে বিচার করেননি যে দক্ষিণের এই শহরতলির গ্রামগুলি কোনও একদিন কলিকাতা শহরের অন্তর্ভুক্ত হয়ে শহরের কলেবর বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে। তা যদি তাঁরা করতেন তা হলে কলিকাতার চেহারা হয়তো অন্যরূপে প্রতিভাত হত। তবুও তাঁরা এই ঘিঞ্জি, অস্বাস্থ্যকর, পূতিগন্ধে ভরা নোংরা শহরকে আধুনিক করার জন্য যে সব পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন তা দেখে বিভার্লি সাহেব মন্তব্য করেছিলেন, ''....the Committee appears to have either executed or had in contemplation such a formidable list of improvements as eventually to have startled even the Court of Directors.''

প্রথম যে প্রকল্প তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন সেটি হল ওয়েলিংটন স্ট্রিট ও ওয়েলিংটন স্কোয়ার নির্মাণ। এই অঞ্চলটিকে ব্যাপারীটোলা বলা হত। আজও এই অঞ্চলে ব্যাপারীটোলা স্ট্রিট নামে একটি রাস্তা অতীত দিনের স্মৃতি নিয়ে অবস্থান করছে। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মধ্যে অনেকগুলি অন্তর্মুখী প্রস্রবণ থাকায় পুষ্করিণী খননে অনেক বিলম্ব হয়েছিল। ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে জলাশয় খনন সম্পূর্ণ হয়। খরচ হয়েছিল ২,৭৬,০০০ টাকা। সীম সাহেবের (Mr. Simms) প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পুষ্করিণীতে এই অসুবিধা দেখা দিতে থাকে। পরে এর উপর একটি আচ্ছাদনের ব্যবস্থা করা হয়। ১৮১৭ থেকে ১৮২১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত লটারি কমিটির প্রতিবেদনে জানা যায় যে ওই সময়ের মধ্যে হেস্টিংস ও হেয়ার স্ট্রিটকে নদীর ধার পর্যন্ত প্রসারিত করা হয়েছে। ম্যাঙ্গো লেন ও কসাইটোলাকে চওড়া করা হয়েছে। ডিঙ্গাভাঙ্গা খাল বুজিয়ে ক্রিক রো নির্মাণ করা হয়েছে। ফ্রী স্কুল স্ট্রিটকে খুলে দেওয়া হয়েছে। কিড স্ট্রিটের উন্নতি সাধন করা হয়েছে। ওয়েলিংটন স্ট্রিটকে উত্তর দিকে প্রসারিত করে কলেজ স্কোয়ার পর্যন্ত নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হয়েছিল। দক্ষিণে পার্ক স্ট্রিট পূর্বদিকে বিস্তৃত হয়েছিল। চৌরঙ্গীর ধারে 'সেক্রেটারিস্ ওয়াক' (Secretary's Walk) ও 'চিল্ড্রেন্স ওয়াক' (Children's Walk) তৈরি হয়েছিল। সেক্রেটারিস্ ওয়াক সম্বন্ধে কটন সাহেব লিখেছেন ''The broad gravelled walk on the west side of that portion of it which is known as the Red Road, is called Secretary's Walk and was constructed in 1820.'' [৫] Children's Walk-এর কোনও খোঁজ পাইনি। চৌরঙ্গী রোডের পশ্চিম দিকে ও রেড রোডের ধারে ''balustrades'' নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছিল। Balustrades-এর চেহারা অনেকটা এই রকম—

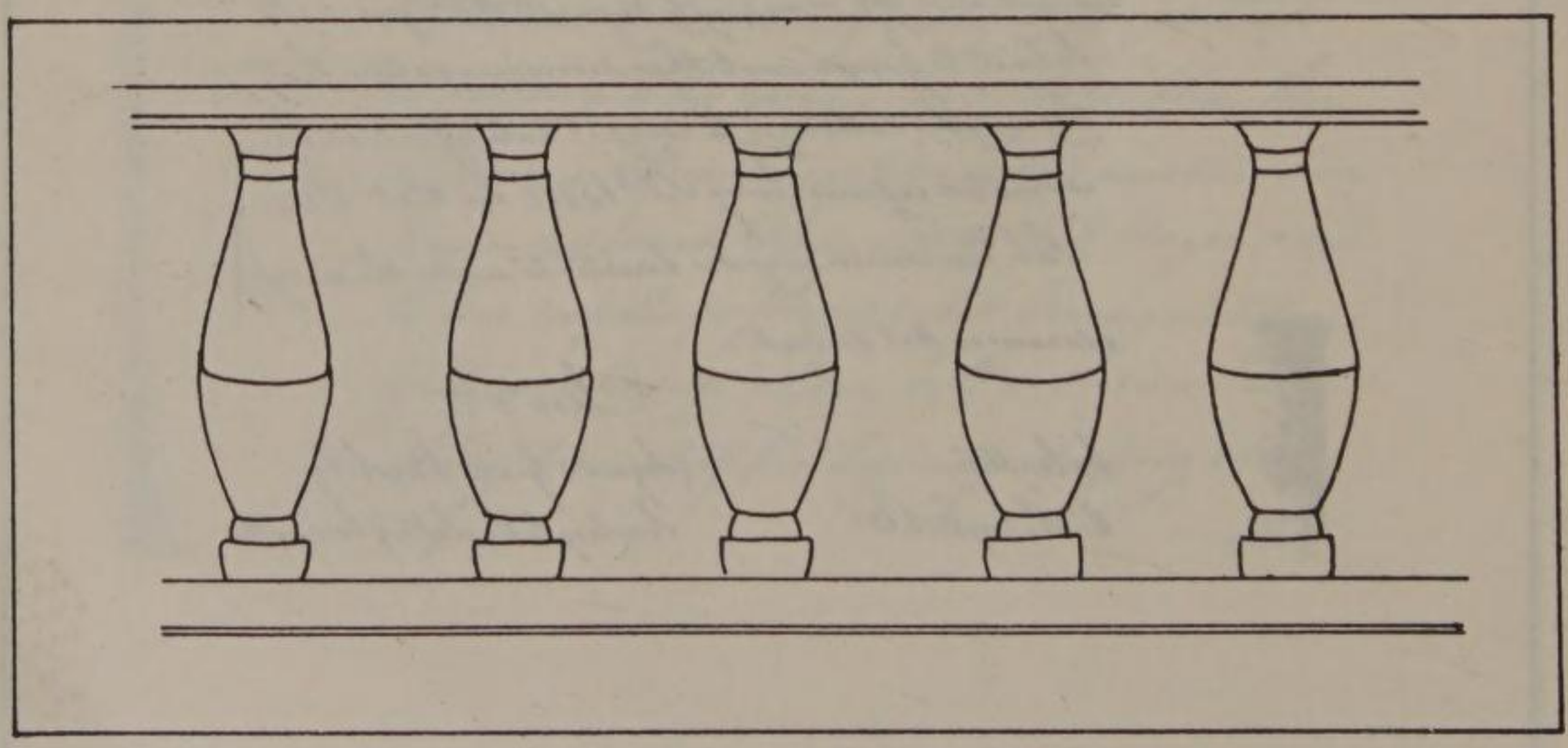

ক্ষুদ্রস্তম্ভ (Balustrade) শ্রেণীর চিত্র

চৌরঙ্গী ও রেড রোড দিয়ে যাবার সময় যে কোনও পথচারীর চোখে balustrade ধরা পড়বে। এটা অনেকটা পাকা গাঁথুনির উঁচু বেড়ার মত। রাজপথের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য লটারি কমিটি balustrade নির্মাণের ব্যবস্থা করেছিলেন। লেঃ শক সাহেব (Lieutenant Schalch) কলিকাতা শহরের নতুন জরিপের ব্যবস্থা করেন। লটারি কমিটির তত্ত্বাবধানে কলিকাতার রাস্তায় প্রথম জল দিয়ে ধোয়ার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা গেজেটে (The Calcutta Gazette) এই মর্মে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল : ''We observe with much satisfaction the great improvement to the convenience and comforts of the residents in Chowringhee, by the road being watered from the corner of the Dharamtallaha upto the Chowringhee Theatre.''[৬]। পরবর্তীকালে রাস্তা জল দিয়ে ধোয়ার কাজটি সারা শহরে পরিব্যাপ্ত হয়। হুগলি নদী থেকে জল তোলার জন্য ইঞ্জিনের ব্যবস্থা হয়েছিল।

লটারি কমিটির তত্ত্বাবধানে শহরের জলকষ্ট নিবারণের জন্য অনেক পুষ্করিণী খনন করা হয়েছিল। সেগুলি—কর্নওয়ালিস স্কোয়ার (আজাদ হিন্দ বাগ), কলেজ স্কোয়ার (বিদ্যাসাগর উদ্যান), ওয়েলিংটন স্কোয়ার (রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার) ও ওয়েলেসলি স্কোয়ার। সর্ট বাজারে ক্যামাকের যে সম্পত্তি ছিল লটারি কমিটি তা কিনে নেন। সেটির উন্নয়নের ব্যবস্থা করে তার মধ্যে কতকগুলি বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করা হয়। এগুলি ছাড়া সুর্তি বাগান ও মির্জাপুরেও পুষ্করিণীর ব্যবস্থা হয়েছিল।

পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে কলেজ স্ট্রিট, কর্নওয়ালিস স্ট্রিট, ওয়েলেসলি স্ট্রিট তৈরি হয়ে যায়। স্ট্র্যান্ড রোডকে নিমতলা ঘাট থেকে হেস্টিংস পর্যন্ত প্রসারের ব্যবস্থা হয়। এর পর কলুটোলা স্ট্রিট, আমহার্স্ট স্ট্রিট ও মির্জাপুর স্ট্রিটের পত্তন হয়।

১৮২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কলিকাতার রাস্তাঘাট সমস্তই প্রধানত কাঁচা ছিল। ওই সময় রাস্তা পাকা করার ব্যবস্থা হয়। তার জন্য বছরে ২৫,০০০ টাকা খরচের সংস্থান করা হয়। ২৮ ডিসেম্বর ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা গেজেটে লটারি কমিটির একটি টেন্ডার প্রকাশিত হয়। তাতে বলা হয়েছিল, ''...to supply them with shingles, gravel or stones to be employed in the construction of a quarry and road, along the banks of the river Hooghly.''[৭]

এবারে লটারি কমিটির আয়-ব্যয়ের দিকে নজর দেওয়া যাক। ১৮২৫ থেকে ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই ১২ বছরে মোট মুনাফা হয়েছিল ১০,১৯,৩৪৯ টাকা। গড়ে বাৎসরিক আয়ের পরিমাণ ছিল ৮৪,৯৪৫ টাকা। শেষের দিকে লটারি কমিটির ক্ষতি হতে দেখা যায়। ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দের একটা লটারিতে ক্ষতির পরিমাণ ছিল ৯১৩৫ টাকা। ১লা নভেম্বর ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে দেখা যায় যে লটারি কমিটি সরকারের কাছে ৪ লক্ষ টাকা ধার করেন। লটারি কমিটির তত্ত্বাবধানে যে জমি ন্যস্ত ছিল তার মূল্য বাদ দিলে সরকারের পাওনা সুদ বাদ দিয়ে দাঁড়ায় ১,৭১,০০০ টাকা।[৮] শেষের দিকে লটারি কমিটি ক্রমশ ক্ষতির সম্মুখীন হতে থাকেন। লটারি কমিটি উঠে যাবার এটিও একটা কারণ বলে অনুমিত হতে পারে। সমস্ত আয়ব্যয় খতিয়ে দেখা যাচ্ছে যে ১৮০৫ থেকে ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কলিকাতার উন্নয়নে সম্ভবত মোট ২৫ লক্ষ টাকার মতো খরচ করা হয়েছিল।[৯]

কবে লটারি কমিটির বিলুপ্তি ঘটে বিভার্লি সাহেব তা নির্ণয় করতে পারেননি। তিনি লিখেছেন, ''When the Committee was formally dissolved I have not been able to ascertain.''[১০] কিন্তু কটন সাহেবের লেখা থেকে জানা যায়—''The Lottery Committee succumbed in 1836 to the force of public opinion in England which condemned the method of raising money for municipal purpose. In its place sprang up the Fever Hospital Committee, appointed by Lord Auckland, who reigned as Governor General from 1836 to 1842....''[১১]

লটারি কমিটির আর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান, সেকালের নোংরা জঞ্জাল অপসারণ ও পয়ঃপ্রণালীর প্রতি তাঁদের সতর্ক দৃষ্টিদান। ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে মিঃ হেনরি উড (Mr. Henry Wood) লটারি কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করে লিখেছেন—''...the inadequate manner in which the establishment entertained for the purpose performed its duty in removing

the filth, which, except in the vicinity of Government House and Chowringhee is allowed to accumulate to the great annoyance of the inhabitants and causing much unhealthiness.'' সে সময় পয়ঃপ্রণালী ছিল রাস্তার ধারে মাটি দিয়ে তৈরি খানার মত, ''not intended in theory to do more than carry off rain water'' । এই পয়ঃপ্রণালী যখন পরিষ্কার করা হত, অনেক পরিমাণে মাটিও জঞ্জালের সঙ্গে উঠে আসত । ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে যখন রাস্তা ও গলি পাকা করার ব্যবস্থা হল তখন এই পয়ঃপ্রণালীর উন্নয়নে লটারি কমিটি তৎপর হলেন । এই বিষয়ে কলিকাতা শহরের ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ শেক্সপীয়ারের (Mr. H. J. Shakespeare) উদ্যম ও অধ্যবসায় উল্লেখ্য । তিনি শহরের এই শোচনীয় অস্বাস্থ্যকর অবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে লটারি কমিটির কাছে যে আবেদন করেছিলেন তাতে একটা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার সঙ্গে উপযুক্ত অর্থ সংস্থান করে এই সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন । তিনি তাঁর পত্রে উল্লেখ করেছিলেন, ''Unless therefore, the Government comes forward to rescue the inhabitants of its capital from the baneful effect of flying in swamps and breathing a polluted atmosphere, the conclusion of each rainy season must bring with it a return of disease and mortality that has, particularly of late years, committed such ravages amongst the inhabitants of the town.''[১২]

শেক্সপীয়ারের এই আবেদন তৎকালীন কর্তৃপক্ষের উপর গভীর রেখাপাত করেছিল । পয়ঃপ্রণালী সংস্কারের উপর Mr. D. M'Farlan একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন । তিনি ছিলেন সেকালের কলিকাতার প্রধান ম্যাজিস্ট্রেট (Chief Magistrate of the Town) । তিনি ১লা ডিসেম্বর ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর পরিকল্পনাটি সরকারের বিবেচনার জন্য প্রেরণ করেন । ফারলন (Farlan) সাহেব এই পরিকল্পনাটি সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন, ''The introduction of such a system was to me 'an object of the highest ambition' and that, even should the efforts then made be premature, some similar arrangement would sooner or later be adopted.'' সরকার এই পরিকল্পনাটি বিচার-বিবেচনার জন্য পরীক্ষামূলকভাবে শহরের একটি অংশের জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করেন । প্রধান শর্ত ছিল ওই এলাকার অধিবাসীরা কমিটির সদস্যদের নির্বাচিত করবে । কিন্তু দু'বছর পরে Mr. M'Farlan-এর প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে ওই এলাকার বাসিন্দারা প্রতিনিধি নির্বাচন না করায় পরিকল্পনাটি পরিত্যক্ত হয় ।[১৩] কলিকাতাবাসীর উদাসীনতায় পয়ঃপ্রণালী উন্নয়নের পরিকল্পনা এইভাবে বাতিল হয়ে গেল ।

লটারি কমিটি সেকালের কলিকাতার বাহ্যিক কলেবরের একটা সার্বিক পরিবর্তন এনে দিয়েছিলেন । ঘন বনজঙ্গল, খানা, ডোবা, চাষের ক্ষেতে পরিপূর্ণ গ্রামগুলি ধীরে ধীরে নগরের রূপ ধারণ করল । নতুন পুষ্করিণী খনন, যানবাহন চলাচলের জন্য সরু সরু গলির বদলে চওড়া ও একটানা রাস্তা নির্মাণের ফলে নতুন গড়ে ওঠা নগরে আধুনিকতার ছাপ লাগে । সেকালের কলিকাতার অবিন্যস্ত জমিজমাকে আধুনিক নগর পরিকল্পনার আঙ্গিকে সুবিন্যস্ত করার যে প্রচেষ্টা লটারি কমিটি করেছিলেন তার মধ্যে থেকে নতুন শহরকে গতিশীল করার স্বচ্ছ মনোভাব ফুটে ওঠে । মধ্যযুগীয় জনবসতির অলিগলির আবর্ত, সঙ্কীর্ণতা ও আবিলতা থেকে মুক্ত করে বাসিন্দাদের চলাচলের স্বাচ্ছন্দ্য দান করেছিলেন লটারি কমিটি । ফলে গ্রামীণ কলিকাতার শহরে রূপান্তর প্রক্রিয়ায় নতুন ঐতিহাসিক-সামাজিক গতিশীলতার প্রকাশ তার পথঘাট ও ঘরবাড়ির বিন্যাসের মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হতে থাকে ।

গ্রামীণ কলিকাতার উন্নয়নে লটারি কমিটি যে পরিকল্পনা করেছিলেন তার মধ্যে যানবাহন চলাচলের জন্য দীর্ঘ রাস্তা নির্মাণই প্রাধান্য পেয়েছিল । সামরিক তৎপরতা বৃদ্ধিই এর একমাত্র কারণ বলা যেতে পারে । ব্যারাকপুর ও দমদমের সেনা ছাউনির সঙ্গে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের যোগাযোগের ব্যবস্থা, উত্তর ভারতে ইংরেজদের সাম্রাজ্য বিস্তারের মনোভাব, দেশ জুড়ে যুদ্ধ বিগ্রহ, অশান্তি দমনে সামরিক শক্তি বৃদ্ধির প্রশ্নেই রাস্তা নির্মাণের গুরুত্ব প্রাধান্য পেয়েছিল সর্বাধিক । তখন চিৎপুর রোডই ছিল উত্তর-দক্ষিণে চলাচলের একমাত্র পথ, আর সে পথও ছিল খুবই অপরিসর । ফলে ফোর্ট

উইলিয়াম থেকে ব্যারাকপুর ও দমদমে সৈন্য ও রসদ চলাচলের জন্য সুষ্ঠু রাজপথের প্রয়োজন তীব্র হয়ে ওঠে। তাই লটারি কমিটি সর্বপ্রথম রাস্তা নির্মাণে তৎপর হলেন, যদিও শহর উন্নয়নে পয়ঃপ্রণালী পরিকল্পনাই সর্বাধিক গুরুত্ব পাওয়া উচিত ছিল। প্রথম যে রাজপথ নির্মাণে হাত দেওয়া হয়, সেটি ওয়েলিংটন স্ট্রিট (আজকের নির্মল চন্দ্র স্ট্রিট)। এরই পরম্পরায় তৈরি হয়ে গেল কলেজ স্ট্রিট ও কর্নওয়ালিস স্ট্রিট (বিধান সরণি)। এই রাস্তা ধরেই যে সামরিক বাহিনী চলাচল করত, তার সাক্ষ্য মেলে রসরাজ অমৃতলাল বসুর আত্মজীবনীতে।

লটারি কমিটির উন্নয়ন পরিকল্পনায় কলিকাতার আদি বাসিন্দাদের কিন্তু কোনও উপকার হয়নি। দরিদ্র হিন্দু মুসলমানই ছিল কলিকাতার আদি বাসিন্দা। চাষবাসের জমি রাস্তা নির্মাণের প্রয়োজনে অধিগ্রহণ করায় তারা শহরের নানা স্থান থেকে উৎখাত হতে থাকে। লটারি কমিটির কোনও পরিকল্পনা ছিল না এই সব দরিদ্র অধিবাসীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার। ফলে এরা প্রায় সকলেই নতুন গড়ে ওঠা শহর থেকে নির্বাসিত হয়ে গেল। এরা চলে গেলেও আরেক শ্রেণীর কাজের লোক শহরে ভিড় বাড়াল। তারা হল শহরের কুলি মজুর, গৃহভৃত্য, সাধারণ কারিগর, পালকি বেহারা, গাড়োয়ান প্রমুখ নতুন এক দরিদ্র শ্রেণী। এদের মধ্যে অল্প বেতনের চাকুরিজীবী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীও ছিল। এদের বসবাসের সুষ্ঠু ব্যবস্থা না থাকায় শহরের যত্রতত্র গজিয়ে উঠল শ্রেণীবদ্ধ বস্তিবাড়ি। এইসব সারিবদ্ধ বস্তি শহরের কী ভয়াবহ অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল তার ভুরি ভুরি নিদর্শন মিলবে ''Fever Hospital Committee''-র প্রতিবেদনে। উনিশ শতকের মধ্যভাগে প্রাসাদনগরী কলিকাতা এইভাবে ঘিঞ্জি বস্তির জালে জড়িয়ে পড়েছিল।

লটারি কমিটির উন্নয়নের ফলে গ্রামীণ কলিকাতা ধীরে ধীরে মহানগরের রূপ ধারণ করতে থাকল। কলিকাতা লটারি কমিটির পরিকল্পনার রূপায়ণ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেই সম্ভবত ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে "কলিকাতা কমলালয়"-এর লেখক একে মহানগর আখ্যায় ভূষিত করেন। লটারি কমিটির উদ্যোগে একদিকে যেমন এই শহর ইংরেজদের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র হয়ে গড়ে উঠল, অন্য দিকে বাইরের লোকের কাছে অর্থ উপার্জনের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ক্ষেত্র হয়ে উঠল এই মহানগর। কলিকাতার নাগরিক সমাজে বংশগত ও জাতিগত বৃত্তির বন্ধন ক্রমেই শিথিল হয়ে গেল। কুলগত পেশার ও কর্মের সামাজিক কোনও বাধ্যবাধকতা বিশেষ থাকল না। এখানে কুলের চেয়ে ব্যক্তি বড় হয়ে উঠল। বৃত্তি, পেশা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ায় শহর কলিকাতায় নানা ধরনের লোক এসে ভিড় জমাল। এদের মধ্যে যারা সুযোগ-সন্ধানী, তারা দেওয়ান, বেনিয়ান, দাদনী ব্যবসায়ী, দালালি ও জমিদারি কিনে প্রচুর বিত্তশালী হয়ে নতুন নাগরিক সমাজে উচ্চশ্রেণীতে অধিষ্ঠিত হবার সুযোগ করে নিয়েছিল। সমাজবিজ্ঞানী বিনয় ঘোষের মতে, "কলিকাতা শহরে সমাজের বিকাশের আদিপর্বে অর্থাৎ আঠার শতক থেকে উনিশ শতকের প্রথম পর্ব পর্যন্ত এরাই আমাদের দেশের নতুন বড়লোক বা ধনিকশ্রেণী রূপে গড়ে উঠেছিল।"

কলিকাতার এই উঠতি ধনিকশ্রেণী গতিশীল ইংরেজ জাতির সংস্পর্শে এসেও তাঁদের গ্রামীণ রক্ষণশীলতা ত্যাগ করতে পারেননি। সামাজিক কুসংস্কার ও কূপমণ্ডুকতার কথা বাদ দিলেও, অর্থনীতির ক্ষেত্রেও তাঁদের গোঁড়ামির মনোভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। অর্থাৎ এই বিত্তশালী পরিবারেরা জমিদারি ও সুদের কারবারে তাঁদের সঞ্চিত মূলধন খাটিয়ে অনেক বেশি লাভবান হবেন এই তাঁদের ধারণা ছিল। ফলে তাঁরা কোম্পানির Public Credit-এর ক্ষেত্রে মূলধন বিনিয়োগে রাজি হননি। তারা তাঁদের সঞ্চিত বিত্ত চিরাচরিত বন্ধকী ও মহাজনী কারবারে বিনিয়োগ শুরু করেন। ফলে তাঁদের সঞ্চিত অর্থ শিল্প-বাণিজ্যের প্রয়োজনে সক্রিয় মূলধন রূপে গড়ে উঠতে পারেনি। অর্থের প্রতি সনাতনী মনোভাব বাঙালি ধনীদের নতুন যুগের সামাজিক পরিবেশে বিশেষ বদলায়নি। অথচ নতুন মহানগর পত্তনের সময় এই মানসিকতা পরিবর্তনের সুযোগ ঐতিহাসিক কারণে তাঁরাই বেশি পেয়েছিলেন। কিন্তু গ্রামীণ চরিত্রের পরিবর্তন-বিমুখতার জন্য এই আধুনিক ভাবধারা গ্রহণে অক্ষম ছিলেন তাঁরা। ব্রিটিশ অর্থনৈতিক স্বার্থ এর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলেও এই সব অর্থশালীরা যথেষ্ট সক্রিয় ও সচেষ্ট হলে তার কিছুটা অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে পারতেন।[১৪]

কলিকাতার এই নব্য ধনস্বামীদের এক অংশ অবসর সময়ে সমকালীন সমাজ-সংস্কৃতি-ধর্ম-শিক্ষা

প্রভৃতি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছিলেন। উনিশ শতকের সূচনায় বাংলার নব জাগরণের সূত্রপাত তারই মূর্ত প্রতীক। এই নবচেতনাকে একটা সংঘাতের মধ্য দিয়ে পথ করে নিতে হয়েছিল—একদিকে গ্রামীণ কুসংস্কার ও রক্ষণশীল বিশ্বাসের প্রতি আস্থা অন্যদিকে আধুনিক যুক্তিবাদের প্রতি আকর্ষণ—ফলে সেদিনকার চিন্তাশীল ধনীদের আচার আচরণে বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্তির বিরোধ দেখা দিয়েছিল। ঠিক সেই সময় বাংলার নব জিজ্ঞাসার উষালগ্নে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদয় বাংলার সামাজিক ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। উচ্চবিত্তেরা যখন শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার প্রয়াস চালিয়েছিলেন, মধ্যবিত্ত কিছু মানুষ গতানুগতিকতার পথ পরিত্যাগ করে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বাঙালি সমাজকে আধুনিক ভাবধারায় প্রভাবিত করেছিলেন। গতানুগতিক পথ পরিহার করার জন্য তাঁদের অনেককে নানা প্রতিবন্ধকতা ও নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল। তাঁদের আধিপত্য ও প্রভাব কলিকাতা শহরের সীমানায় কেবলমাত্র শিক্ষিত সমাজের মধ্যেই আবদ্ধ রইল। বাংলার গ্রাম্য সমাজজীবনকে তা স্পর্শ করতে পারেনি।

এই প্রেক্ষাপটে মনে হয় লটারি কমিটির সামগ্রিক কর্মধারা কেবলমাত্র কলিকাতার বাহ্যিক চেহারার রূপান্তর ঘটায়নি, তার প্রভাব কলিকাতার সমাজজীবনেও প্রতিফলিত হয়েছিল।

**তথ্যসূত্র :**


১ Calcutta Old & New—Cotton, p. 133
২ কলিকাতা সেকালের ও একালের—হরিসাধন মুখোপাধ্যায়
৩ Beverley's Report, p. 48
৪ Beverley's Report, p. 48-49
৫ Calcutta Old and New—Cotton, p. 221
৬ Sandeman's Selection from the Calcutta Gazette, Vol. V, p. 245 .
৭ Sandeman's selection from the Calcutta Gazette, Vol V, p. 58
৮ Beverley's Report, p. 49
৯ Municipal Calcutta—Goody, p. 238
১০ Beverley's Report, p. 49
১১ Calcutta Old and new—Cotton, p. 137
১২ Beverley's Report, p. 49
১৩ Beverley's Report, p. 50
১৪ টাউন কলিকাতার কড়চা—বিনয় ঘোষ, পৃ. ৪৮৯

## ১৪
# ফিভার হসপিটাল কমিটি

লটারি কমিটির বিলুপ্তির কিছু পূর্বে কলিকাতার উন্নয়নের সমস্যাগুলির প্রতি আলোকপাত করেন ফিভার হসপিটাল অ্যান্ড মিউনিসিপ্যাল এনকোয়ারি কমিটি (The Fever Hospital and Municipal Enquiry Committee)। এঁদের কথায় এবারে আসছি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে শহর কলিকাতা বিশেষত দেশীয় বাসিন্দাদের আবাসিক অঞ্চলে প্রবল জ্বরের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। এই সমস্যা সমাধানের জন্য টাউন হলে এক সভা আহ্বান করা হয়। এই সভা ফিভার হসপিটাল কমিটি স্থাপন করেন।[১] কমিটির সভ্যবৃন্দ হলেন—

স্যার ই. রায়ান (Sir E. Ryan)
স্যার জে.পি. গ্রান্ট (Sir J.P. Grant)
সি. ডব্লিউ. স্মিথ (C.W. Smith)
বাবু রামকমল সেন
এস. নিকলসন (S. Nicolson)
জে. আর. মার্টিন (J.R.Martin)
ডঃ এ. আর. জ্যাকসন (Dr. A.R. Jackson)
রুস্তমজী কাওয়াসজী
দ্বারকানাথ ঠাকুর
রসময় দত্ত
আর. এইচ. ককরেল (R.H. Cockerell)
এ. রজারস্ (A. Rogers)

প্রথমে স্মিথ সাহেব ছিলেন কমিটির চেয়ারম্যান, তারপর চেয়ারম্যান হন স্যার জন পিটার গ্রান্ট। তিনি ১৮৩৩ থেকে ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কলিকাতা সুপ্রিম কোর্টের বিচারক ছিলেন। তাঁর পুত্রও হলেন স্যার জন পিটার গ্রান্ট। স্যার ফ্রেডরিক হ্যালিডের পর (Sir Frederick Halliday) বাংলার দ্বিতীয় ছোটলাট (লেফটেন্যান্ট গভর্নর) হয়েছিলেন এই স্যার জন পিটার গ্রান্ট। উপরের এই সদস্যগণ ছাড়াও আরও তিনজনকে এই কমিটির সদস্য করা হয়েছিল—কলিকাতার লর্ড বিশপ, বাবু রাজচন্দ্র দাস ও বাবু রাধাকান্ত দেব। এই তিনজনের মধ্যে বাবু রাজচন্দ্র দাস ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে মারা যান। অন্য দু'জন তাঁদের নিজ নিজ কাজের চাপের জন্য কমিটির কর্মকাণ্ডে সহায়তা করতে অপারগ হন।

ফিভার হসপিটাল কমিটি মিঃ মার্টিনকে দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরি করতে বলেন—(১) জ্বরের চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় একটি হাসপাতাল স্থাপন, (২) কলিকাতার দেশীয় অধিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলের প্রতি চরম অবহেলার ফলে যে ভয়াবহ অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তা নিরসনের জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ। ১৩ জুলাই ১৮৩৬ খ্রিঃ কমিটির প্রথম অধিবেশনে তিনটি সাবকমিটি গঠন করা হয়। প্রথমটি কলিকাতা শহরের ঘরবাড়ি এবং আবগারি

কর-কাঠামো পরীক্ষা করবে। দ্বিতীয় সাবকমিটি প্রচলিত জঞ্জাল অপসারণ ব্যবস্থার পর্যালোচনা করবে এবং তৃতীয়টি প্রস্তাবিত জ্বরের হাসপাতাল স্থাপনের বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করবে।

ফিভার হসপিটাল কমিটির নির্দেশমত প্রেসিডেন্সি সার্জন ও ধর্মতলার নেটিভ হাসপাতালের ডাক্তার জেমস রেনল্ড মার্টিন একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, নাম—"Notes on the Medical Topography of Calcutta and its suburbs"। প্রবন্ধের মুখবন্ধে দেশীয় অধিবাসীদের প্রতি সরকারের সীমাহীন অবহেলার ফলে যে ভয়ানক অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে লেখেন,—"It is surprising how much the condition of the native portion of the town has been neglected in this great city and its suburbs, in which are to be found all the faults of all the cities of India." প্রবন্ধটি গভর্নর জেনারেল লর্ড অকল্যান্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করে। তিনি ১৮৩৬ খ্রিঃ "Fever Hospital and Municipal Enquiry Committee" নামে একটি কমিটি স্থাপন করেন।

ফিভার হসপিটাল কমিটির চেয়ারম্যান গ্রান্ট সাহেবের নেতৃত্বে কমিটির সদস্যবৃন্দ ব্যাপক অনুসন্ধান ও সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে কলিকাতা শহরের পরিচালনা, উন্নয়ন, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে বিপুল তথ্য সংগ্রহ করে এক বিরাট প্রতিবেদন তৈরি করেছিলেন। তিন খণ্ডে এটি সম্পূর্ণ হয়েছিল। প্রথম প্রতিবেদন ৭ জানুয়ারি ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে, দ্বিতীয়টি ৭ আগস্ট ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে, তৃতীয়টি ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দের কোনও এক সময় সরকারের কাছে দাখিল করা হয়। প্রথম দুটি প্রতিবেদনের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩১৫, ফুলস্কেপ পাতায় ছাপা, পরিশিষ্ট অনেকগুলি।

প্রথম প্রতিবেদনের মূল বক্তব্য—"...the result of very extensive inquiries into the drainage, cleansing, ventilation and communications of the city of Calcutta and the supplying it with water ; the establishment of an hospital or hospitals and of additional dispensaries for the treatment of diseases among the native poor ; the causes of disease and obstacles to convenience and improvement which abound in it ; the state of the suburbs ; the system of collecting and appropriating the taxes of the town ; and the state of the police as well in the town as on the river which forms its harbour."

কমিটির দ্বিতীয় প্রতিবেদনে পয়ঃপ্রণালী ও লবণ হ্রদের (Salt Water Lake) বিষয় নিয়ে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেছিলেন। তাঁরা মন্তব্য করেছিলেন, "that the salubrity of the City and Suburbs was not wholly dependent upon the removal of this marsh, but was immediately dependent upon that which it was in the immediate power of the Government to effect without incurring the dangers of a partial and progressive drainage of a large extent of water and moist ground."

আর তৃতীয় প্রতিবেদনটিতে একটি নতুন হাসপাতাল (a new clinical hospital) স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।[২]

লটারি কমিটি আদি কলিকাতার রাস্তাঘাট নির্মাণ করে, পানীয় জলের পুষ্করিণী খনন করে গ্রামীণ চেহারার বাহ্যিক রূপান্তরে তৎপর হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁদের এত বৃহৎ কর্মযজ্ঞের পরও যে শহরের বিশেষত এদেশীয় অধিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলের অবস্থার বিশেষ কোনও হেরফের হয়নি তারই এক যথাযথ বিবরণ পাওয়া যায় "Fever Hospital Committee"র প্রথম প্রতিবেদনের তিনটি তথ্যপূর্ণ অনুচ্ছেদে :—

১। বিজ্ঞানের যথাযথ ব্যবহার ও অর্থসংস্থানের ব্যবস্থাদি থাকলে শহর ও শহরতলিতে ময়লা নিষ্কাশন, নালাদি পরিষ্করণ, স্বাস্থ্যপ্রদ বায়ু ও পরিশ্রুত জল সরবরাহের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক বাধা বিপত্তি কোনই অসুবিধা বা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারবে না।

২। শহরের স্থানীয় বাসিন্দাদের তুলনায় ব্রিটিশ নাগরিকদের সংখ্যা অতি নগণ্য। অথচ স্থানীয় জনসাধারণ শহরতলির যে অংশে বসবাস করে সেখানকার অবস্থা অতি জঘন্য।

তাদের আবাসভূমি নানা দুরারোগ্য রোগের পীঠস্থান। নৈতিক ও রাজনৈতিক—সবদিক থেকেই তারা অতি অবহেলিত। কিন্তু সামান্য সংখ্যক ব্রিটিশ নাগরিক যে স্বল্প পরিমিত স্থানে বাস করে স্থানীয় বাসিন্দাদের তুলনায় তা কত সুন্দর ও স্বাস্থ্যোপযোগী; অন্যদিকে চারিদিকের লবণাক্ত জলাভূমি, ঝোপঝাড়, কর্দমাক্ত পথঘাট সুস্থ নাগরিক জীবনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

৩। এই সব মারাত্মক ভীতিপ্রদ রোগের আবাসস্থল দূরীভূত করতে হলে চাই ময়লা নিষ্কাশন ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি বিধান, লবণ হ্রদ অঞ্চলজনিত কলুষিত পরিবেশ দূষণমুক্ত করা, পথঘাট নিয়মিত জলে ধোয়ার ব্যবস্থা করা, শহরে নানা স্থানে পরিষ্কার জীবাণুমুক্ত পানীয় জলের ব্যবস্থার জন্য পুষ্করিণী খনন—এইভাবে স্থানীয় লোকদের জন্য একটা স্বাস্থ্যপ্রদ পরিবেশ সৃষ্টি করা আশু প্রয়োজন। তা না হলে যে স্বল্পসংখ্যক ব্রিটিশ নাগরিকরা এখানে বসবাস করে তাদের জীবন বিপদসঙ্কুল ও ভয়াবহ হয়ে উঠবে। শহরের বেশির ভাগ সময় গ্রীষ্মমণ্ডলের শুষ্ক আবহাওয়া পরিব্যাপ্ত থাকলেও ভেজা স্যাঁতসেঁতে মাটি প্রভৃতি থেকে উত্থিত জলীয় বাষ্প আবহাওয়াকে কলুষিত ও অস্বাস্থ্যকর করে তোলে।[৩]

এই তথ্য থেকে একটা বিষয় সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে যে কলিকাতার উন্নয়নে ইংরেজ অধ্যুষিত এলাকার প্রতি যতটা যত্নের সঙ্গে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছিল, তার কণামাত্রও নেটিভ অধিবাসীদের ভাগ্যে জোটেনি। সেকথা ইংরেজ চেয়ারম্যান সার জন পিটার গ্রান্ট স্বীকার করতে দ্বিধা করেননি। তা ছাড়া ওই মন্তব্য থেকে সেকালের শহর কলিকাতার অস্বাস্থ্যকর অবস্থার এক ভয়াবহ চিত্রেরও পরিচয় পাওয়া যায়।

ফিভার হসপিটাল কমিটি লটারি কমিটির দ্বারা নির্মিত রাজপথগুলি সম্বন্ধে বিশেষ সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তাই দ্বিতীয় সাব কমিটি (যার কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে) এ বিষয়ে আরও কিছু করা যায় কিনা তা খতিয়ে দেখার জন্য আবর্জনা নিষ্কাশন সংস্থার প্রধান (Superintendent of Conservancy) লেফটেন্যান্ট অ্যাবারক্রম্বির ওপর ভার অর্পণ করেন। ফিভার হসপিটাল কমিটির অনুরোধে তিনি ও ক্যাপ্টেন ফরবেস (Capt. H.N. Forbes) রাস্তার উন্নতি ও সংস্কারের বিষয়ে এক বিস্তৃত পরিকল্পনা ও একটি মানচিত্র ১৮৩৬ খ্রিঃ তৈরি করেন। এটি লটারি কমিটির সম্পূরক পরিকল্পনা বিবেচনা করা যেতে পারে। তাঁদের এই পরিকল্পনায় সুপারিশ ছিল উত্তর-দক্ষিণ বরাবর কতগুলি চওড়া রাস্তা নির্মাণ। এই প্রস্তাব তৎকালীন চিকিৎসকমণ্ডলীর ও অনুসন্ধান কমিটির (Fever Hospital Enquiry Committee) সমর্থন লাভ করেছিল। প্রস্তাবিত রাস্তাগুলি হবে ৬০ অথবা ৭০ ফুট চওড়া। অ্যাবারক্রম্বির সুপারিশ ছিল :

১। লাউডন স্ট্রিট থেকে শুরু করে সোজা উত্তরে এগিয়ে ধর্মতলা স্ট্রিট পার হয়ে সেন্ট জেমস স্ট্রিটের শেষ পর্যন্ত এবং সেখান থেকে আমহার্স্ট স্ট্রিট ধরে আপার সারকুলার রোড পর্যন্ত।

২। পার্ক স্ট্রিট ও ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের সংযোগস্থল থেকে সোজা উত্তর দিকে এগিয়ে সারকুলার ক্যানেলের উপরে ব্রিজ পার হয়ে রাজা রাজকৃষ্ণ ঘাটের নিকটবর্তী গঙ্গার তীর পর্যন্ত।

৩। চৌরঙ্গী রোড ও ধর্মতলা স্ট্রিটের সঙ্গমস্থল থেকে রাস্তাটিকে সোজা উত্তরে বাগবাজারের কালোরাম পালের ঘাটের নিকট গঙ্গাতীর পর্যন্ত। অর্থাৎ কসাইটোলা স্ট্রিট ও চিৎপুর রোডকে সোজা করে গঙ্গাতীর পর্যন্ত প্রসারিত করা।

৪। স্ট্র্যান্ড রোড ও ধর্মতলা ঘাটের সংযোগস্থল থেকে প্রস্তাবিত রাস্তাটি নদীর তীর বরাবর এগিয়ে নতুন রাস্তায় মিলিত হয়ে সুরের বাজারের কাছ বরাবর হয়ে গঙ্গাতীরে চিৎপুর ব্রিজ পর্যন্ত।

৫। শোভাবাজার স্ট্রিট যেখানে চিৎপুর রোডে এসে শেষ হয়েছে, সেখান থেকে সরলরেখায় শোভাবাজার স্ট্রিটকে বর্ধিত করে সোজা আপার সারকুলার রোড পর্যন্ত প্রসারিত করা—যেখানে এটি প্রস্তাবিত আমহার্স্ট স্ট্রিটের বর্ধিতাংশের সাথে মিলিত হবে।

৬। ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিটের উত্তরের বর্ধিতাংশ ট্যাঙ্ক স্কোয়ার। যেখান থেকে সোজা শোভাবাজার পর্যন্ত প্রস্তাবিত চিৎপুর রোডের প্রায় সমান্তরাল নতুন রাস্তা।

৭। মানিকতলা রোডের যে অংশ আপার সারকুলার রোডে এসে শেষ হয়েছে সেই মানিকতলা রোডকে পশ্চিমদিকে বর্ধিত করে উপরের ৬ নম্বর প্রস্তাবিত রাস্তা যেখানে নিমতলা স্ট্রিট পার হয়ে গেছে সেই পর্যন্ত।

৮। নতুন টাঁকশালের পিছন দিক থেকে সোজা ক্লাইভ স্ট্রিটের গা দিয়ে সমকোণে মেছুয়াবাজার স্ট্রিটের পুরাতন পেটিকোর্ট জেলখানার কোণ পর্যন্ত।

লেফটেন্যান্ট অ্যাবারক্রম্বির পরিকল্পনার দুটি উদ্দেশ্য ছিল—(১) যানবাহন চলাচলের জন্য উপযুক্ত রাস্তার ব্যবস্থা। (২) নগরীর মধ্যে নির্বাধায় বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা করা। শীতকালে উত্তর থেকে এবং গ্রীষ্মকালে ও বর্ষাকালে দক্ষিণ থেকে বাতাস চলাচল করে শহর কলিকাতায়। ফলে উত্তর থেকে দক্ষিণমুখী রাস্তাগুলো সারা শহর জুড়ে নির্মল বায়ু প্রবাহের সহায়ক হয়ে উঠতে পারবে।[৪]

প্রস্তাবিত রাস্তাগুলি সম্বন্ধে সম্যক উপলব্ধির জন্য অ্যাবারক্রম্বির মানচিত্রটি দেওয়া হলো (পরিশিষ্ট ৬ দ্রষ্টব্য)।

অ্যাবারক্রম্বির পরিকল্পনা অর্থাভাবের অজুহাতে পরিত্যক্ত হয়। কয়েক দশক পরে অবশ্য পরিকল্পনার অন্তর্গত বিডন স্ট্রিট, গ্রে স্ট্রিট ও আপার স্ট্র্যান্ড রোড নামে তিনটি রাস্তা তৈরি হয়েছিল।[৫]

১৮৮৮-৮৯ খ্রিঃ কলিকাতা পুরসভা পুনর্বার অ্যাবারক্রম্বির পরিকল্পনা রূপায়ণে তৎপর হয়েছিলেন। উপরের তিনটি রাস্তা বাদ দিয়ে বাকি ৫টি রাস্তা তৈরি করতে সেসময় খরচ ধরা হয়েছিল দেড় কোটি টাকা। আর্থিক কৃচ্ছ্রতার অজুহাতে সেবারেও কলিকাতা পুরসভা চিরকালের জন্য এমন একটি মূল্যবান পরিকল্পনা বাতিল করে দিলেন।[৬]

অ্যাবারক্রম্বির প্রস্তুত করা কলিকাতার মানচিত্রটি নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায়, আপজন সাহেবের বৃহৎ কলিকাতার মানচিত্রের মতো অ্যাবারক্রম্বির কলিকাতার মানচিত্রেও সেকালের কলিকাতার শহর, শহরতলি ও হাওড়ার অংশবিশেষ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। লটারি কমিটির কর্মযজ্ঞের সমাপ্তির পর এই মানচিত্রটি তৈরি হয়েছিল। তাই এই মানচিত্রের গুরুত্ব অসীম। এতে লটারি কমিটির তৈরি রাজপথগুলি দেখানো আছে। কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটের কিয়দংশ—হেদো পুষ্করিণী (আজাদ হিন্দ বাগ) থেকে মেছুয়াবাজার স্ট্রিটের মুখ পর্যন্ত রাস্তার নাম ছিল ঠনঠনিয়া বাজার স্ট্রিট। অ্যাবারক্রম্বি যে রাজপথগুলি তৈরির প্রস্তাব দিয়েছিলেন সেগুলি হলুদ রঙে চিত্রিত করা আছে।

বাগবাজার স্ট্রিটের উত্তরে খালের ধারে ছিল সুরবাজার। সে সময় বাগবাজার স্ট্রিট সারকুলার রোড পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। ঘোষ স্ট্রিট বলে যে রাস্তাটি দেখানো আছে সেইটি সম্ভবত আজকের বলরাম ঘোষ স্ট্রিট। এই পথটি সে-সময় সারকুলার রোড পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। শ্যামবাজার এলাকা বর্তমানের হাতিবাগান ছাড়িয়ে আরও দক্ষিণ পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিট চিৎপুর রোড থেকে শুরু হয়ে কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট অতিক্রম করে উত্তর-পূর্ব দিকে এগিয়ে সারকুলার রোডে এসে পড়েছিল। পরবর্তীকালে গ্রে স্ট্রিট তৈরি হলে পর রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিটের দৈর্ঘ্য খর্ব হয়ে যায়। নিমতলা ঘাট স্ট্রিট স্ট্র্যান্ড রোড থেকে শুরু হয়ে যৎসামান্য উত্তর-পূর্ব দিকে হেলে চিৎপুর রোডে এসে পড়েছিল। তখনও বিডন স্ট্রিট তৈরি হয়নি। মানিকতলা স্ট্রিট চিৎপুর রোড ও কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের মাঝ বরাবর থেকে শুরু হয়ে সারকুলার রোডে এসে পড়েছিল। সুকিয়া স্ট্রিট ঠনঠনিয়া বাজার স্ট্রিট (কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট) থেকে শুরু হয়ে সোজা পূর্ব দিকে এগিয়ে সারকুলার রোডে এসে মিশেছে। কটন স্ট্রিটের পূর্ব দিকে প্রসারিত অংশের নাম মেছুয়াবাজার স্ট্রিট। এটি সারকুলার রোড পর্যন্ত প্রসারিত। সারকুলার রোড অতিক্রম করার পর মেছুয়াবাজার স্ট্রিটের পরবর্তী অংশের নাম ছিল রাজা রামলোচন রোড। পরে এর নাম গ্যাস স্ট্রিট (এখন ডাঃ এম এন চ্যাটার্জি সরণি) এবং নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড (অধুনা আবুল কালাম আজাদ সরণি) হয়। নিমতলা ঘাট স্ট্রিট ও মেছুয়াবাজার স্ট্রিটের মধ্যবর্তী ভূভাগে কয়েকটি অঞ্চল পড়ে—পশ্চিম দিকে জোড়াসাঁকো, মধ্যে সিমলা ও পূর্বে কারবালা।

মেছুয়াবাজার স্ট্রিট থেকে লালবাজার-বৌবাজার-বৈঠকখানা এর মধ্যবর্তী ভূভাগ পটলডাঙ্গা ও

মির্জাপুর অঞ্চলে অবস্থিত। সে সময় লালদিঘির উত্তর অংশ এখন যাকে ডালহৌসি স্কোয়ার নর্থ বলা হয়, এই রাস্তা লালবাজার রোডের অন্তর্ভুক্ত ছিল। লালবাজার রোড তখন প্রসারিত ছিল পশ্চিম দিকে ক্লাইভ স্ট্রিট ও রাইটার্স বিল্ডিং-এর সংযোগস্থল থেকে আজকের চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ-এর সংযোগস্থল পর্যন্ত। পরবর্তীকালে লালবাজার রোডের দৈর্ঘ্য হ্রাস করে চিৎপুর রোড পর্যন্ত রাখা হয়। আর পশ্চিম দিকের অংশের নাম রাখা হয় ডালহৌসি স্কোয়ার নর্থ। লালবাজার রোড হয় লালবাজার স্ট্রিট।

বৌবাজার স্ট্রিটের ব্যাপ্তি ছিল আমহার্স্ট স্ট্রিট ও সেন্ট জেমস স্ট্রিটের সংযোগস্থল পর্যন্ত। আমহার্স্ট স্ট্রিট থেকে সারকুলার রোড পর্যন্ত বৌবাজারের প্রসারিত অংশের নাম ছিল বৈঠকখানা।

লালবাজার রোড-বৌবাজার-বৈঠকখানা রোড এবং ধর্মতলা স্ট্রিটের মধ্যবর্তী অঞ্চলকে ব্যাপারীটোলা বলা হত।

লালদিঘির তিন দিকের রাস্তা—পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণকে ট্যাঙ্ক স্কোয়ার বলা হত। পরবর্তীকালে এই রাজপথগুলির নাম রাখা হয় ডালহৌসি স্কোয়ার ইস্ট, ওয়েস্ট ও সাউথ।

কাউন্সিল হাউস স্ট্রিট, ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, ক্লাইভ স্ট্রিট, হেয়ার স্ট্রিট, হেস্টিংস স্ট্রিট, স্ট্র্যান্ড রোড প্রভৃতি রাজপথগুলি সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা আছে অ্যাবারক্রম্বির মানচিত্রে।

বর্তমানে স্ট্র্যান্ড রোড সাউথের পরবর্তী যে অংশ ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের পশ্চিম পাশ দিয়ে হুগলি নদীর পূর্ব তীরের গা ঘেঁষে দক্ষিণে প্রসারিত হয়েছে সেই সুদৃশ্য রাজপথটির নাম ছিল "Respondentia Road"। লটারি কমিটির তৈরি এই রাস্তাটি চাঁদপাল ঘাট থেকে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সেকালের সাহেব মেমদের এটি ছিল প্রমোদ ভ্রমণের স্থান (কুকুর সঙ্গে নিয়ে ভ্রমণের ওপর নিষেধাজ্ঞা ছিল এই প্রমোদ ভ্রমণের রাস্তায়)।

ধর্মতলা স্ট্রিটের দক্ষিণে ছিল জানবাজার স্ট্রিট, এখনকার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড।

জানবাজার স্ট্রিট ও সাউথ কলিঙ্গের মধ্যে ছিল কলিঙ্গ অঞ্চল।

পার্ক স্ট্রিট থেকে দক্ষিণে লোয়ার সারকুলার রোডের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অনেকগুলি প্রশস্ত রাস্তা দেখানো আছে। রডন স্ট্রিট, লাউডন স্ট্রিট, উড স্ট্রিট, ক্যামাক স্ট্রিট, মিডলটন স্ট্রিট, এলিসিয়াম রো, থিয়েটার রোড প্রভৃতি কয়েকটি রাস্তা ছাড়া বহু রাজপথেরই তখনও নামকরণ হয়নি। বামুন বস্তি, কলভিন বস্তি প্রভৃতি ভেঙ্গে এইসব রাস্তা তৈরি হয়েছিল লটারি কমিটির আমলে।

এবার ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ এলাকার দিকে চোখ ফেরানো যাক। "The Course" এ অঞ্চলের প্রধান রাস্তা। তখনও এই পথটি "Red Road" ও খিদিরপুর রোড নামে নামাঙ্কিত হয়নি। ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের অনেকগুলি প্রবেশপথ দেখানো আছে অ্যাবারক্রম্বির মানচিত্রে—

১। ক্যালকাটা গেট (Calcutta Gate)
২। পলাশী গেট (Plassey Gate)
৩। চৌরঙ্গী গেট (Chowringhee Gate)
৪। হসপিটাল গেট (Hospital Gate)

ফোর্ট উইলিয়ামের উত্তর ও পূর্ব দিকের বিস্তীর্ণ প্রান্তরকে এসপ্লানেড বলে চিহ্নিত করা আছে। আর আছে দক্ষিণ-পূর্ব কোণে ঘোড়-দৌড়ের মাঠ ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে কুলিবাজার।

কলিকাতা শহরতলির অন্তর্ভুক্ত গ্রামগুলির অবস্থানও চিহ্নিত করা হয়েছে এই মানচিত্রে—উত্তরে চিৎপুর, পাইকপাড়া, উত্তর-পূর্বদিকে বেলগাছিয়া, পূর্বদিকে নন্দনবাগান, উল্টাডিঙ্গি, বাগমারী, বাহির সিমলা, কুমারপাড়া, নারিকেলডাঙ্গা, কাঁকুড়গাছি, শিয়ালদহ, শুঁড়া, এন্টালি, কামারডাঙ্গা, ট্যাংরা, গোবরা, জাননগর আর শ্রীরামপুর। দক্ষিণ-পূর্ব কোণে কারিয়া (Karria) ও ঘুঘুডাঙ্গা। আরও দক্ষিণে বালিগঞ্জ, কুষ্টিয়া, পণ্ডিতিয়া, চক্রবেড়ে, ভবানীপুর, আলিপুর, খিদিরপুর প্রভৃতি।

অ্যাবারক্রম্বি তাঁর কলিকাতার মানচিত্রে সে-সময়ের কলিকাতার গঙ্গার ঘাটগুলির অবস্থান স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন। উত্তর দিক থেকে শুরু করা যাক—(১) রাজা রাজকৃষ্ণ ঘাট, (২) কালোরাম পাল ঘাট, (৩) গুরুপ্রসাদ ঘোষের ঘাট, (৪) গোলাবাড়ি ঘাট, (৫) বনমালী সরকারের ঘাট, (৬)

গোপীমোহনের ঘাট, (৭) চাঁপাতলা ঘাট, (৮) জগন্নাথ ঘাট, (৯) রথ ঘাট,(১০) মোহনটনির ঘাট, (১১) ধর্মতলা ঘাট, (১২) আহিরীটোলা ঘাট, (১৩) মানিক বোসের ঘাট, (১৪) নিমতলা ঘাট, (১৫) জোড়াবাগান ঘাট, (১৬) পাটোয়ারী ঘাট, (১৭) শিবতলা ঘাট, (১৮) নবাব ঘাট, (১৯) মীরবহর ঘাট, (২০) কাশীনাথ ঘাট, (২১) মল্লিক ঘাট, (২২) বিবিহাস ঘাট (Bee Bee Hoss Ghat), (২৩) ময়লা ঘাট, (২৪) ক্লাইভ স্ট্রিট ঘাট, (২৫) ওল্ড ফোর্ট ঘাট, (২৬) কয়লা ঘাট, (২৭) পুলিশ ঘাট, (২৮) কলভিন ঘাট, (২৯) চাঁদপাল ঘাট, (৩০) ওল্ড বাবু ঘাট।

মার্ক উড ও আপজনের কলিকাতার মানচিত্রের মত অ্যাবারক্রম্বির মানচিত্রেও গঙ্গার তীরবর্তী ঘাটগুলির নাম দেওয়া আছে। মার্ক উডের মানচিত্রে ঘাটের সংখ্যা ছিল ৩৪, আপজন সাহেবের ছিল ৩৯টি। আর অ্যাবারক্রম্বির মানচিত্রে তা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৩০টি। তুলনামূলক পরিক্রমায় দেখা যাচ্ছে সেকালে বহু ঘাটের অবলুপ্তি ঘটেছে। তৈরি হয়েছে নতুন ঘাট। নামাঙ্কিত হয়েছে নতুন নামে। উদাহরণ স্বরূপ ওল্ড পাউডার মিল ঘাটের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এই ঘাট মার্ক উড ও আপজনের কলিকাতা মানচিত্রে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু অ্যাবারক্রম্বির মানচিত্রে ওই ঘাটের কোনও উল্লেখ নেই। ওল্ড পাউডার মিল ঘাটের কাছেই ছিল ওল্ড পাউডার মিল রোড। ওখানে ছিল একটি বারুদখানা। পরে বারুদখানা উঠে যায়। রাস্তাটির নাম পরবর্তীকালে হয় বাগবাজার স্ট্রিট। আর ঘাটটিও তার পুরানো প্রতিপত্তি হারিয়ে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যায়। ওই ঘাটেরই কাছাকাছি নতুন ঘাট তৈরি করে দেন রাজা রাজকৃষ্ণ দেব। তাঁরই নামে ঘাটটি নামাঙ্কিত হয়েছিল রাজা রাজকৃষ্ণ ঘাট।

আপজন সাহেবের ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের কলিকাতার মানচিত্রের সঙ্গে অ্যাবারক্রম্বির কলিকাতার মানচিত্রের বৈসাদৃশ্য চোখে লাগার মতো। আপজন মানচিত্রে যেখানে সরু সরু রাস্তা চিহ্নিত আছে, অ্যাবারক্রম্বির মানচিত্রে সেখানে অনেকগুলি চওড়া রাস্তার খোঁজ মেলে। কর্নওয়ালিস স্ট্রিট, ঠনঠনিয়া বাজার স্ট্রিট, কলেজ স্ট্রিট, আমহার্স্ট স্ট্রিট প্রভৃতি রাজপথ তৈরি হওয়াতে শহরের বাহ্যিক বিন্যাসের বিশেষ পরিবর্তন ঘটেছিল। আপজন মানচিত্রে ধর্মতলার দক্ষিণের অংশ অর্থাৎ কলিঙ্গ, তালতলা, চৌরঙ্গী অঞ্চলে লোকবসতির চিহ্ন ছিল খুবই কম। অধিকাংশ স্থানেই চাষবাস ও বাগান ছিল। অ্যাবারক্রম্বির মানচিত্রে এই সব অঞ্চলেও নাগরিক বৈশিষ্ট্যগুলি প্রতিফলিত হয়েছে। চাষের জায়গায় গড়ে উঠেছে বাড়িঘর, তৈরি হয়েছে অনেকগুলি রাজপথ, তাদের মধ্যে কয়েকটি বেশ প্রশস্ত। কয়েকটি ছাড়া তখনও কিন্তু অনেক রাস্তা নামাঙ্কিত হয়নি। অ্যাবারক্রম্বির মানচিত্রে তাই শহর কলকাতার বিবর্তনের রূপটি খুবই স্পষ্ট।

ফিভার হসপিটাল কমিটির তথ্যবহুল বিশাল প্রতিবেদনের সুপারিশ অবিলম্বে কার্যকরী হয়নি বটে, তবে তার প্রভাব পরবর্তী পুরসভার গঠনের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল। প্রথম প্রতিবেদনটি পাবার পরই লর্ড অকল্যান্ড কলিকাতা শহরকে ৪টি ভাগে বিভক্ত করার এক উদ্যোগ গ্রহণ করে ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে একটি আইন প্রণয়ন করেন (Act XXIV of 1840)। এই আইনে কলিকাতা শহরকে ৪টি বিভাগে (Division) ভাগ করে কলিকাতাবাসীদের কিছুটা স্বায়ত্বশাসনের ভার দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল। ব্যবস্থাটি ছিল এইরূপ, "The Governor of Fort Willam was empowered on the application of two-thirds of the rate payers of Calcutta to authorise them to undertake for themselves the assessment, collection and management of the rates upto a limit not exceeding 5% on the assessable value of property in Calcutta."[৭] অর্থাৎ এই আইনে ফোর্ট উইলিয়ামের গভর্নরকে এই মর্মে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল যে কলিকাতার যে-কোনও বিভাগের $\frac{২}{৩}$ অংশ অধিবাসীদের দাখিল করা আবেদনপত্রের উপর ভিত্তি করে ওই অঞ্চলের সম্পত্তির মূল্যের অনধিক ৫ শতাংশ কর নির্ধারণ, আদায় ও তার পরিচালনার ভার ওই এলাকার অধিবাসীদের দেওয়া হবে। দুঃখের বিষয় এই সুযোগের সদ্ব্যবহারের একটি আবেদনপত্রও করদাতাদের পক্ষ থেকে জমা পড়েনি। সরকারের এই প্রচেষ্টা নিষ্ফল হলেও এই ব্যবস্থাকে আধুনিক পৌর স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থার প্রথম পদক্ষেপ বলা যেতে পারে।

## তথ্যসূত্র

১ সমাচার দর্পণ, ২০শে জুন ১৮৩৫। ('সংবাদপত্রে সেকালের কথা' থেকে সংকলিত)

২ Beverley's Report, p. 50.

৩ Fever Hospital Committee's Report—reproduced from Beverley's Report on the Census of Calcutta —1876, p. 50-51.

"I. That there is no natural impediment nor any difficulty which a due application of science and capital cannot readily overcome to the thoroughly draining, cleansing, and ventilating, and supplying with wholesome water, the whole city and suburbs of Calcutta.

"II. That the parts of the city inhabited by the natives, forming a great population, to whose numbers the British inhabitants bear a very small proportion, and the whole of the suburbs, are in all these respects in a condition of such total neglect as to render them necessarily the seats of diseases destructive of individual happiness and of life, and inconsistent with moral improvement and political prosperity, and that the still imperfect, though improved, condition in these respects of those parts of the city inhabited by the British, and the noxious exhalations produced all round them by the state of the native town and the suburbs and the marshes called the Salt Water Lake, produce in these parts effects inconsistent with salubrity.

"III. That the removal of the causes which now generate the pestilential seeds of disease to so frightful a degree would be effected by the thoroughly draining, cleansing and ventilating the city and suburbs, and draining the Salt Water Lake, and that an ample supply of water for watering the roads and for all purposes of cleanliness, and of good and wholesome water for drinking and preparing food, would be afforded to every part of the city by the formation of a sufficient head of water within it, and the excavating a sufficient number of tanks, and thus the city would be rendered a healthy residence for the natives of the climate, and not otherwise injurious to European constitutions than through the operation during the greater part of the year of tropical heat in a climate no doubt naturally damp but unassisted by unwholesome exhalations from the soil or miasmata."

৪ অ্যাবারক্রম্বি পরিকল্পনার রূপরেখাটি ১৮৮৭-৮৮ সালের কলিকাতা পৌরসভার Administration Report থেকে গৃহীত।

৫ Municipal Calcutta—Goode, p. 238-239.

৬ Calcutta Mpl. Corpn. Administration Report, 1888-89.

৭ Mcleod's Lecture on the Sanitation of Calcutta, past & present, 1884.

## ১৫

# ফিভার হসপিটাল কমিটির প্রতিবেদন ও কলিকাতার উন্নয়ন

ফিভার হসপিটাল কমিটির দ্বিতীয় প্রতিবেদন ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে সরকারের কাছে দাখিল করা হয়। প্রতিবেদনটি পাবার পর সরকার আরেকবার পৌর স্বায়ত্বশাসন প্রবর্তনে সচেষ্ট হন। এই মর্মে ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে ১৬ নম্বর আইন প্রণয়ন (The Act XVI of 1847) করা হয়। এই আইনের বলে শহর কলিকাতার উন্নয়নের জন্য ৭ জন কমিশনারকে নিয়ে একটি পর্ষদ (Board) গঠন করা হয়েছিল। এঁদের মধ্যে ৩ জন সরকার মনোনীত, অপর ৪ জন করদাতাদের দ্বারা নির্বাচিত। এই আইনের বলে কলিকাতার জাস্টিসদের হাত থেকে শহরের জঞ্জাল অপসারণের ভার তুলে নিয়ে ১ জানুয়ারি ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে শহর উন্নয়ন পর্ষদের উপর অর্পণ করা হয়। এই আইনে সর্বপ্রথম রাস্তা নির্মাণের বিষয়টি প্রাধান্য পায়।[১] এরই ১৫ নম্বর ধারায় নির্দেশ ছিল যে শহরের জনাকীর্ণ অংশে নতুন রাজপথ, উদ্যান সৃজন ও শহরের মধ্যে মুক্ত বায়ুচলাচলের প্রতিবন্ধকতা অপসারণে পৌর তহবিল থেকে অর্থ ব্যয় করা যাবে। উন্নয়ন ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য কী কী ব্যবস্থার প্রয়োজন, সে সম্বন্ধে আইনে কোনও উল্লেখ ছিল না।

উপরিউক্ত আইন প্রণয়নের কয়েকমাস পরেই আরেকটি সহকারী আইন (A Subsidiary Act) বিধিবদ্ধ হয়। এটি ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দের ২ নম্বর আইন নামে খ্যাত (The Act II of 1848)। এই আইনে ঠিক হয় কলিকাতার শহর উন্নয়ন পর্ষদের কমিশনারগণ কলিকাতার উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে স্থাবর ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি ক্রয় করতে পারবেন। ভবিষ্যতে রাজপথগুলির পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ কমিশনারগণের উপর বর্তাবে। আইনে আরও নির্দেশ ছিল যে সরু সরু বাঁকাচোরা গলিকে সোজা করতে হবে। পয়ঃপ্রণালী ও বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে হবে। কলিকাতা সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হওয়ার জন্য শহর কলিকাতার যথাযথ জরিপের নির্দেশও এই আইনে ছিল। সেই মত সীম সাহেব (Mr. Simms) কলিকাতা জরিপ করে একটি প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং সেই সঙ্গে কলিকাতার একটি মানচিত্র প্রকাশ করেন ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে। এই মানচিত্রটি সীম সাহেবের মানচিত্র নামে পরিচিত।

এরপর কলিকাতার উন্নতি বিধানের জন্য আরও অনেকগুলি আইন বিধিবদ্ধ করা হয়—

১। ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দের ৩৯ নম্বর আইন (The Act XXXIX of 1850)

২। ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দের ১০ নম্বর আইন (The Act X of 1852)। লর্ড অকল্যান্ড ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতাকে যে ৪টি অঞ্চলে ভাগ করেছিলেন, এই আইনে তা বাতিল করে কলিকাতাকে ২টি অঞ্চলে ভাগ করতে চাওয়া হয়েছিল—উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চল। শহর কলিকাতাকে ১৮টি ওয়ার্ডে ভাগ করা হয়েছিল। এই আইনে ৭জন কমিশনার কমিয়ে ৪ জন বেতনভোগী কমিশনার রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল।

৩। ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দের ১২ নম্বর আইনে (The Act XII of 1852) অস্বাস্থ্যকর পুষ্করিণীগুলি বুজিয়ে ফেলার, কলিকাতার বাজারগুলি নথিভুক্ত করার ক্ষমতা কমিশনারদের দেওয়া হয়েছিল।

৪। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের ২৮ নম্বর আইন (The Short Act XXVIII of 1854) —এটির

কোনও বিশেষত্ব ছিল না।

৫। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১৪ নম্বর আইন (The Act XIV of 1856)—এটি একটি সুসম্পন্ন আইন। পূর্বের আইনগুলি থেকে এটির বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ার মত। এই আইনটির সম্পূরক হিসাবে এ বছরই আরও দুটি আইন বিধিবদ্ধ করা হয়, সেগুলি—

৬। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২৫ নম্বর আইন (The Act XXV of 1856)।

৭। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২৮ নম্বর আইন (The Act XXVIII of 1856)।

শেষোক্ত তিনটি আইনের মাধ্যমে বাংলার ছোটলাটকে শহরের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য ৩ জন কমিশনার নিয়োগের ক্ষমতা দেওয়া হয়। এদের পৌরসভার কমিশনার বলা হত। এই কমিশনারগণ পৌর তহবিল নিয়ন্ত্রণ করবেন ও কলিকাতার স্থাবর সম্পত্তির উপর কর নির্ধারণ করতে পারবেন। আইনের ২৫ নম্বর ধারায় নির্দেশ ছিল যে কমিশনারগণ যত শীঘ্র সম্ভব কলিকাতার জল নিষ্কাশন ও পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা প্রবর্তন করবেন। তার জন্য ১$\frac{১}{২}$ লক্ষ টাকা পৃথক করে রাখার ব্যবস্থা থাকবে। ৩০,০০০ টাকা পানীয় জলের জন্য রাখা হবে। যে ৩ জন কমিশনার এই নতুন আইনে নিযুক্ত হয়েছিলেন, তাঁরা হলেন, Messrs Wanchope, Thuillier ও Dowleans। এই সময় পৌরসচিব নিযুক্ত হন মিঃ ডব্লু ক্লার্ক (Mr. W. Clark)। এই বিচক্ষণ ইঞ্জিনিয়ারের পরিকল্পনায় ও তত্ত্বাবধানে কলিকাতা শহরের ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালীর কাজ শুরু হয়।

১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের আইন কলিকাতার উন্নতিকে গতিশীল করেছিল। ওই বছরই নতুন রাজপথ হ্যালিডে স্ট্রিট (Halliday Street) ২৮,৪১২ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়। রাস্তাটি মেছুয়াবাজার স্ট্রিট থেকে কলুটোলা স্ট্রিট পর্যন্ত প্রসারিত ছিল।[২] ওই বছরই রাস্তার আলোর জন্য খরচ হয়েছিল ১৮,২৬৩ টাকা। রাস্তা ও পয়ঃপ্রণালী নির্মাণে ব্যয় হয়েছিল ৩,২৪,৮৬১ টাকা। ওই আইনের ৫৪ নম্বর ধারায় সিদ্ধান্ত হয় গৃহনির্মাণের পূর্বে গৃহস্বামীকে প্রস্তাবিত গৃহের নক্সা কমিশনারগণের কাছে দাখিল করতে হবে। বিনা নোটিশে যদি গৃহ নির্মিত হয়, কমিশনারগণ ১৪ দিনের নোটিশে তা ভেঙ্গে দিতে পারবেন। এই আইনে কমিশনারদের এই মর্মে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল যে "to enforce the creation of huts in regular lines, with proper passages for ventilation and scavenging, and at such level as would admit of sufficient drainage."[৩]

রাস্তা পরিকল্পনা ও নির্মাণের বিষয়ে ওই আইনে একটি বিশেষ নির্দেশ ছিল যে ১৮৫২ থেকে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কমিশনারদের দ্বারা অথবা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় যে সব রাজপথ যান চলাচলের জন্য নির্মিত হবে তা অবশ্য ৫০ ফুট চওড়া হওয়া আবশ্যক। যে পথে যানবাহন চলাচল করবে না সে রাস্তার প্রস্থ অবশ্যই ২০ ফুট হতে হবে। রাস্তার ধারে পয়ঃপ্রণালীর অংশ নির্মিত রাস্তার অন্তর্ভুক্ত থাকবে না। অর্থাৎ রাস্তার প্রস্থ ৫০ ফুট বা ২০ ফুট কোনওভাবেই ব্যাহত করা চলবে না। রাজপথ নির্মাণের বিষয়ে এইরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান পরবর্তীকালে বাতিল হয়ে যায়।[৪] ইতিমধ্যে সিপাহি বিদ্রোহ শুরু হওয়াতে কলিকাতার অগ্রগতিও বাধাপ্রাপ্ত হয়।

১৮৫৭-৫৮ খ্রিঃ সিপাহি বিদ্রোহের কাল। বাংলাদেশে এই বিদ্রোহের প্রথম সূত্রপাত হলেও বাংলাদেশে তথা শহর কলিকাতায় এর তেমন কোনও প্রভাব পড়েনি। সে সময় বাঙালিরা ব্রিটিশের সঙ্গে ব্যবসা সূত্রে তাদের বিপুল আর্থিক উন্নতি ঘটিয়েছিল। ব্রিটিশের দাক্ষিণ্যে তাদের ভাগ্যের অভাবনীয় উন্নতির কারণে তারা সিপাহি বিদ্রোহের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে চায়নি। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে যাঁরা এই সিপাহি বিদ্রোহে অংশ নিয়েছিলেন, তাঁরা সকলেই ব্রিটিশের আগমনের বহু পূর্ব থেকেই ভূমি সম্পদে ধনী ও প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। ইংরেজ শাসনে তাঁদের সম্পদ ও প্রতিপত্তি ধ্বংস হওয়ার আশঙ্কায় তাঁরা প্রায় সকলেই ব্রিটিশের প্রাধান্যের অবসানের জন্য সিপাহি বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিলেন। কলিকাতার বাঙালি সমাজ ভারতের ওই ধনী ও প্রতিপত্তিশালী সমাজ থেকে পৃথক ছিল। ব্রিটিশের সহযোগিতায় সদ্য গড়ে ওঠা বাঙালি ব্যবসায়ী সমাজ অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তার কারণে সিপাহি বিদ্রোহে অংশগ্রহণ থেকে নিজেদের নিবৃত্ত করেছিল। সেকালের কলিকাতার কোনও কোনও বুদ্ধিজীবী সিপাহি বিদ্রোহকে তীব্রভাবে নিন্দাও করেছিলেন। এর

কারণও ছিল—নবাবী আমলে ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর কঠোর বিধিনিষেধ থাকায় কোনও প্রজা নিজের ইচ্ছামতো ঘরবাড়ি নির্মাণ, পালকি আরোহণ বা স্বাধীন মতামত প্রকাশ করতে পারত না। জগন্নাথ তর্ক পঞ্চাননের (১৬৯৪-১৮০৭) জীবনী গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে মুর্শিদাবাদের নবাব নানা শাস্ত্রীয় সুচিন্তিত বহুতর দুরূহ প্রশ্নের অম্লানবদনে সদুত্তর শুনে অত্যন্ত প্রীত হয়ে "তৎকালের অত্যুচ্চ পুরস্কার ২২ শিরোপা প্রদান করায় তর্ক পঞ্চানন মহাশয় সসম্ভ্রমে রাজপ্রসাদ অঙ্গীকার পুরঃসর ঘোটক, কুঞ্জরাদি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র প্রকাশ করিয়া তন্মন্ধ্যে ঘড়িনেসান, ডঙ্কা এবং পারসীক ভাষায় নিজ নামাঙ্কিত মোহর একটি গ্রহণান্তর দ্বিতল হর্ম্ম্য নির্মাণের, শিবিকাদি আরোহণের এবং ইচ্ছামতে নিজ নিকেতনে "নওবৎ" বসাইতে পারিবার অনুমতি পত্র লইয়া সানন্দে স্বভবনে প্রত্যাগমনপূর্বক বহু-প্রকোষ্ঠ-ইষ্টকালয় নির্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন।"[৫] এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে নবাবী আমলে দ্বিতল হর্ম্যমালা অথবা বহু প্রকোষ্ঠযুক্ত ইষ্টক নির্মিত ভবন নির্মাণ করতে গেলে নবাবের অনুমতি প্রয়োজন হত। প্রজাপুঞ্জের উপর এই সব বিধিনিষেধ আরোপিত হওয়াতে অবস্থাপন্ন প্রজারা সুযোগ সন্ধান পেলেই সেকালের কলিকাতায় চলে আসত। এখানে নিজের পছন্দমতো ঘরবাড়ি নির্মাণ করতে পারত। কলিকাতায় জনবসতি গড়ে তোলার জন্য ইংরেজরাও প্রথম দিকে এই প্রকার নির্মাণকার্যকে প্রশ্রয় দিত। তা ছাড়া পলাশী যুদ্ধের পর কলিকাতায় চাকুরির সুযোগসুবিধা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। ইংরেজ শাসনে সামাজিক নিরাপত্তা ও ব্যক্তি স্বাধীনতার আস্বাদনই কলিকাতার বাঙালি সমাজকে পুনরায় নবাবী শাসনের প্রবর্তনে উৎসাহ যোগায়নি। এই বিষয়টি সম্পূর্ণ নিরাসক্তভাবে বিচার করে দেখার পর বাঙালিদের সিপাহি বিদ্রোহে অংশগ্রহণের অনীহার চিত্রটি উজ্জ্বলরূপে ধরা পড়ে।

১৮৫৮ খ্রিঃ নভেম্বর মাসে মহারানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণায় বিদ্রোহের আনুষ্ঠানিক অবসান সূচিত হয়। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের এক আইনের দ্বারা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট তথা মহারানী ভিক্টোরিয়া স্বয়ং ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করেন।

সিপাহি বিদ্রোহ অবসানের পর কলিকাতার উন্নতির গতি ত্বরান্বিত হয়েছিল। বিশাল কর্মকাণ্ড শুরু হয়ে গেল—ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী নির্মাণ, নল সহযোগে পলতা থেকে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের প্রকল্প গ্রহণ, নতুন রাস্তা নির্মাণ প্রভৃতি।

প্রথমে ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালীর কথা। ফিভার হসপিটাল কমিটির প্রতিবেদনে কলিকাতার জনস্বাস্থ্যের উন্নতির বিষয়ে দুটি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল।—(১) ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী, (২) বিশুদ্ধ পানীয় জলসরবরাহ। অবশ্য এ বিষয়ে পথিকৃৎ লর্ড ওয়েলেসলির ১৮০৩ খ্রিঃ-এর মিনিট। এটিতে প্রথম বলা হয়েছিল কলিকাতার ঢাল লবণ হ্রদের দিকে, হুগলি নদীর দিকে নয়। সে সময় কলিকাতার পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থার ঢাল ছিল হুগলি নদীর দিকে। ফলে অধিক বর্ষণ হলে শহরের বুকে জমা বৃষ্টির জল হুগলি নদীতে না পড়ে শহরের মধ্যেই জমে থাকত। এর ফলে অস্বাস্থ্যকর অবস্থার সৃষ্টি হত। নানা আধি-ব্যাধি দেখা দিত শহরে। প্রাণ হারাত বহু লোক। অর্থের অপ্রতুলতার অজুহাতে পয়ঃপ্রণালীর বিষয়টি প্রথম দিকে উপেক্ষিত হলেও ফিভার হসপিটাল কমিটির তীক্ষ্ণ মন্তব্যের জন্য সরকার ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী নির্মাণে তৎপর হন। ১৮৫৪ খ্রিঃ মিঃ ক্লার্ক (Mr. William Clark) পৌর কমিশনারদের সচিব পদে (Secretary of the Commissioners) নিযুক্ত হলেন। ওই বছরই তিনি কলিকাতার ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী নির্মাণের একটি প্রকল্প প্রস্তুত করেন। পরের বছর প্রকল্পটি সরকারের অনুমোদনের জন্য পাঠালে পর এটির কার্যকারিতা পরীক্ষার জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করা হয়। ওই কমিটি সামান্য কিছু অদল-বদল করে ক্লার্কের পরিকল্পনাটি অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করেন। লেফটেন্যান্ট গভর্নর ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকল্পটি অনুমোদন করেন। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালীর কাজ শুরু হলেও জোর কদমে কাজ আরম্ভ হয় ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে, সিপাহি বিদ্রোহ অবসানের পর।

ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী রূপায়ণের জন্য ৩২$\frac{১}{২}$লক্ষ টাকা এবং নল বাহিত বিশুদ্ধ জল সরবরাহের জন্য ১১$\frac{১}{২}$লক্ষ টাকা, সর্বসাকুল্যে ব্যয় ধরা হয়েছিল ৪৪ লক্ষ টাকা। আরেকটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল

যে প্রতি বছর এই দুই প্রকল্পের জন্য ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবে, যার ফলে সমগ্র পরিকল্পনা দুটি ১০ বছরের মধ্যে বাস্তবায়িত হতে পারে। শহরের দক্ষিণ দিকেই ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালীর কাজ প্রথম শুরু হয় ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে। ঘিঞ্জি ও অস্বাস্থ্যকর উত্তর শহরাঞ্চলের পয়ঃপ্রণালীর কাজ শুরু না করে দক্ষিণ দিকে কাজ আরম্ভ করায় সে সময় দেশের সর্বত্র সমালোচনার ঝড় উঠেছিল। এই প্রসঙ্গে বিভার্লি সাহেব লিখেছেন : "It has been hinted that the European acted somewhat selfishly in commencing these works in their own quarter of the town. But it was pointed out by Mr. W.B. Bayley, Chief Secretary to Government, so long ago as 1818 that the prevailing winds being from the South, every improvement in the European quarter benefits the whole Town, whereas the same cannot be said of improvements in the Northern division."

ক্লার্ক সাহেবের পরিকল্পনার মূল রূপরেখাটি হল—শহরের সমস্ত আবর্জনা মিশ্রিত দূষিত জল ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালীর মারফত লবণ হ্রদে বয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। এর জন্য হুগলি নদী থেকে চারটি প্রধান ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী নির্মিত হবে—এগুলি গ্রে স্ট্রিট, বিডন স্ট্রিট (প্রস্তাবিত), কলুটোলা স্ট্রিট ও ধর্মতলা স্ট্রিটের মধ্য দিয়ে প্রসারিত হয়ে পূর্বদিকে সারকুলার রোডে এসে পড়বে। পঞ্চম পয়ঃপ্রণালী টালি নালা থেকে আরম্ভ হয়ে শহরের দক্ষিণ সীমা পর্যন্ত প্রসারিত হবে। এই ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালীগুলি সারকুলার রোডের অভ্যন্তরে অবস্থিত আরেকটি প্রধান পয়ঃপ্রণালীর সঙ্গে যুক্ত হবে। পরে পাম্পের সাহায্যে সারকুলার রোডের ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালীর ময়লা লবণ হ্রদে নিয়ে যাওয়া হবে। এটি কলিকাতার পূর্বদিকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত। নদীর জল দিয়ে মাঝে মাঝে ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী ধুয়ে দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল এই পরিকল্পনায়। বড় বড় সড়কের মধ্যের পয়ঃপ্রণালীগুলি ইট দিয়ে নির্মিত হয়েছিল। ছোট রাস্তাগুলিতে পাইপ বসিয়ে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। প্রকল্প রূপায়ণের অগ্রগতি পরীক্ষা করার জন্য ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে সরকার কর্নেল হাইড (Colonel Hyde)-কে নির্দেশ দেন। তিনি তাঁর প্রতিবেদনে পরিকল্পনা রূপায়ণের গতি প্রকৃতি দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। সম্পূর্ণ পরিকল্পনায় ৩৯ মাইল ইটের ও ১৩৬$\frac{১}{২}$ মাইল পাইপের তৈরি ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী নির্মাণের সংস্থান রাখা হয়েছিল। পরিকল্পনাটি রূপায়ণে সম্পূর্ণ ব্যয় ধরা হয়েছিল ৮১,৫৭,৫১৬ টাকা। তার মধ্যে গ্রে স্ট্রিট নির্মাণের খরচও ধরা হয়েছিল। পরবর্তীকালে ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালীর প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়।

এই প্রকল্প রূপায়ণের ফলে নতুন গড়ে ওঠা শহর কলিকাতা শুষ্ক ও পরিচ্ছন্ন হয়েছিল। শহরের জনস্বাস্থ্যের পরিবেশ ধীরে ধীরে উন্নত হয়েছিল। সেই সময় প্রতিদিন শহরের ১৫ মিলিয়ন গ্যালন নর্দমার ময়লা জল পয়ঃপ্রণালীর মাধ্যমে পরিবাহিত হত।[৬]

ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী নির্মাণের ফলে কলিকাতায় নতুন দুটি বড় রাস্তা নির্মিত হয়েছিল—একটি বিডন স্ট্রিট, অন্যটি গ্রে স্ট্রিট। সেকালে কলিকাতা শহরে বাড়ির পিছন দিকে জল নিষ্কাশনের জন্য খোলা পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা ছিল। ক্লার্ক সাহেবের পরিকল্পনা মতো এই সব পয়ঃপ্রণালীতে পাইপ বসিয়ে ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী করার ব্যবস্থা হয়। এইগুলিই পরবর্তীকালে সরু সরু গলিতে রূপান্তরিত হয়। উত্তর কলিকাতায় যেসব অসংখ্য গলি দেখতে পাওয়া যায় সেগুলির অধিকাংশই ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী নির্মাণের পরে গলিতে রূপান্তরিত হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর ছয়ের দশকে কলিকাতায় রাস্তার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার এটাই মূল কারণ। ১৮৭৫-৭৬ খ্রিস্টাব্দের কলিকাতা পৌরসভার Administration Report-এ দেখা যায় যে ৩৭$\frac{৩}{৪}$ মাইল ইটের তৈরি ও ৩৭ মাইল পাইপের তৈরি ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী ইতিমধ্যেই কলিকাতা শহরে সম্পূর্ণ হয়েছে।

ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী রূপায়ণের সঙ্গে জড়িয়ে আছে কলিকাতা শহরের ফুটপাত তৈরির ইতিহাস। ক্লার্ক সাহেব তাঁর ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী প্রকল্প প্রস্তুতির সময় ফুটপাতের প্রয়োজনীয়তার কথা উপলব্ধি করেছিলেন। যে সব বড় বড় সড়ক পথে ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী নির্মিত হবে, সেই সব রাজপথে ফুটপাত নির্মাণের সুপারিশ করেছিলেন। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে প্রণীত আইনের ৯ নম্বর ধারায় (The

Act XIV of 1856) কমিশনারগণকে এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, "Shall make and keep in repair footways for the use of passengers." । সেই সঙ্গে এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয় যে তহবিলে অর্থ থাকলে তবেই ফুটপাত নির্মাণকার্য হাতে নেওয়া যেতে পারে। এই সব বাধ্যবাধকতা থাকার ফলে ফুটপাত নির্মাণের গতি প্রথম দিকে ব্যাহত হয়েছিল।

১৮৫৬ খ্রিঃ কলিকাতা শহরে প্রথম ফুটপাত নির্মাণের কাজ শুরু হয় চৌরঙ্গী রোডে। অর্থের অভাবে তার নির্মাণের গতি ছিল অতি শ্লথ। প্রথম দিকে খোলা পয়ঃপ্রণালীর উপর ধনুকের আকারে লোহার বেড় বসানো হয়েছিল। এগুলি ইংল্যান্ড থেকে আমদানি করা হয়। পরে লোহার বেড়ের উপর পাথর দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছিল। এতে চৌরঙ্গী এলাকার বাসিন্দাদের বিশেষ উপকার হয়। যে দুর্গন্ধ খোলা পয়ঃপ্রণালী থেকে নির্গত হত, তা বন্ধ হয়। অন্ধকার রাতে পথ-চলতি পথিকদের খোলা পয়ঃপ্রণালীতে পড়ে যাবার সম্ভাবনাও রহিত হয়েছিল।

শহরের ইউরোপীয় ব্যবসায়ী সমিতি ফুটপাত নির্মাণের ব্যাপারে প্রবল বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকে। তাদের বক্তব্য হল যে ফুটপাত থাকার দরুণ ক্রেতাদের একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে গাড়ি রেখে পায়ে হেঁটে দোকানে সওদা করতে আসতে হবে। অনেক ক্রেতাই এই ব্যবস্থা পছন্দ করবে না। ফলে তাদের ব্যবসায়ে বিশেষ ক্ষতি হবার সম্ভাবনা আছে। ব্যবসায়ীদের এই আবেদনে পৌর কমিশনারগণ কর্ণপাত করেননি। তাঁদের বক্তব্য ছিল কলিকাতার সব প্রধান সড়কপথে ফুটপাত নির্মিত হবে। ক্রেতারা যেখান থেকেই সওদা করুক না কেন, ফুটপাতটুকু হেঁটে আসতেই হবে। তা ছাড়া গতিশীল শহরে পথচারীর নিরাপত্তার প্রশ্নটি ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের অহেতুক ক্ষতির সম্ভাবনার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেছিলেন সেকালের পৌর কমিশনারবৃন্দ। পথচারীদের নিরাপত্তার প্রতি পৌর কমিশনারদের বিবেচনা প্রশংসার দাবি রাখে।

সেকালে শহর কলিকাতায় বড় বড় রাস্তার ধারে বাড়ির দেওয়াল থেকে ২০ ফুট দূরে রাস্তার উপর গ্যাস বাতির থাম বসানো হয়েছিল। ফুটপাত হওয়াতে এই থামগুলি গাড়ির সম্ভাব্য ধাক্কা থেকে অব্যাহতি পায়।

১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের পৌরসভার Administration Report থেকে জানা যায় যে ফুটপাত পথচারীদের কাছে ক্রমশ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। দশ ভাগের মধ্যে নয় ভাগ পথচারী ফুটপাত ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে।

১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে ফুটপাতের জন্য ৪০০০ টাকা ব্যয় হয়েছিল। ১৮৬০, ১৮৬১ ও ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে পৌরসভা ফুটপাত নির্মাণে যথাক্রমে ৬০০০, ১৬,৭১১ ও ১৩,৩১৮ টাকা ব্যয় করেছিলেন।[৭]

১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দের Administration Report-এ নীচে বর্ণিত রাজপথগুলিতে ফুটপাত তৈরির কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার কথা বলা হয়েছিল : ধর্মতলা স্ট্রিট, চৌরঙ্গী রোড, ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, ফ্রী স্কুল স্ট্রিট, জানবাজার ফোর্থ লেন, সদর স্ট্রিট, ওয়েলিংটন স্কোয়ার ইষ্ট, কিড স্ট্রিট, গোয়ালটুলি লেন, গ্রান্ট স্ট্রিট, আউটরাম স্ট্রিট।

আরও ফুটপাত তৈরির খবর পাওয়া যায় ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের Administration Report-এ। সেই রাজপথগুলি হল—পার্ক স্ট্রিট, লাউডন স্ট্রিট, নর্থ সারকুলার রোড, সাউথ সারকুলার রোড, থিয়েটার রোড, ক্যামাক স্ট্রিট, রাসেল স্ট্রিট, রবিনসন স্ট্রিট, রডন স্ট্রিট, শর্টবাজার স্ট্রিট।

শহর কলিকাতার ফুটপাত তৈরির এক সংক্ষিপ্তসার পাওয়া যায় ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দের পৌর Administration Report-এ। তাতে বলা হয়েছিল ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী রূপায়ণের সঙ্গে সঙ্গে গত ১৪ বছরে প্রায় ৭১ মাইল ফুটপাত তৈরি হয়। সারা শহরের প্রায় সব প্রধান সড়কে ফুটপাত করা হয়েছে, শহরের দক্ষিণ অংশের ছোট ছোট রাস্তাও বাদ যায়নি। কিন্তু শহরের উত্তর অংশের ছোট রাস্তাগুলি এত সঙ্কীর্ণ যে ফুটপাত নির্মাণ মোটেই সম্ভব নয়।

ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালীর কাজ সমাপ্ত হলে পর লোহার বেড় দিয়ে ঢাকা পয়ঃপ্রণালীগুলি মুক্ত করা হয়। পরে খোলা পয়ঃপ্রণালী ভরাট করে ফুটপাতের সঙ্গে সমান করে দেওয়া হয়। এর ফলে

ফুটপাতের প্রসারতা বৃদ্ধি পায়।

সড়কের বাঁকের মুখে রাস্তা ও ফুটপাতের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য প্রথম কার্ব স্টোন (Kerb stone) ব্যবহার করা হয় চৌরঙ্গীর ফুটপাতে। এর উদ্দেশ্য ছিল "for the sake of guiding drivers of vehicles and protection of lamp posts." পরবর্তীকালে রাজপথ ও ফুটপাতের সন্ধিস্থলে চ্যানেল স্টোন (Channel stone) ব্যবহার করা হয়।[৮] এর ফলে রাস্তা ধোয়া জল ও বর্ষার জল চ্যানেল স্টোন দিয়ে নর্দমায় পড়ত। সে সময় কার্ব স্টোন ও চ্যানেল স্টোন একটা পাথর কেটে তৈরি হত। তার আকার অনেকটা এইভাবে ছিল—

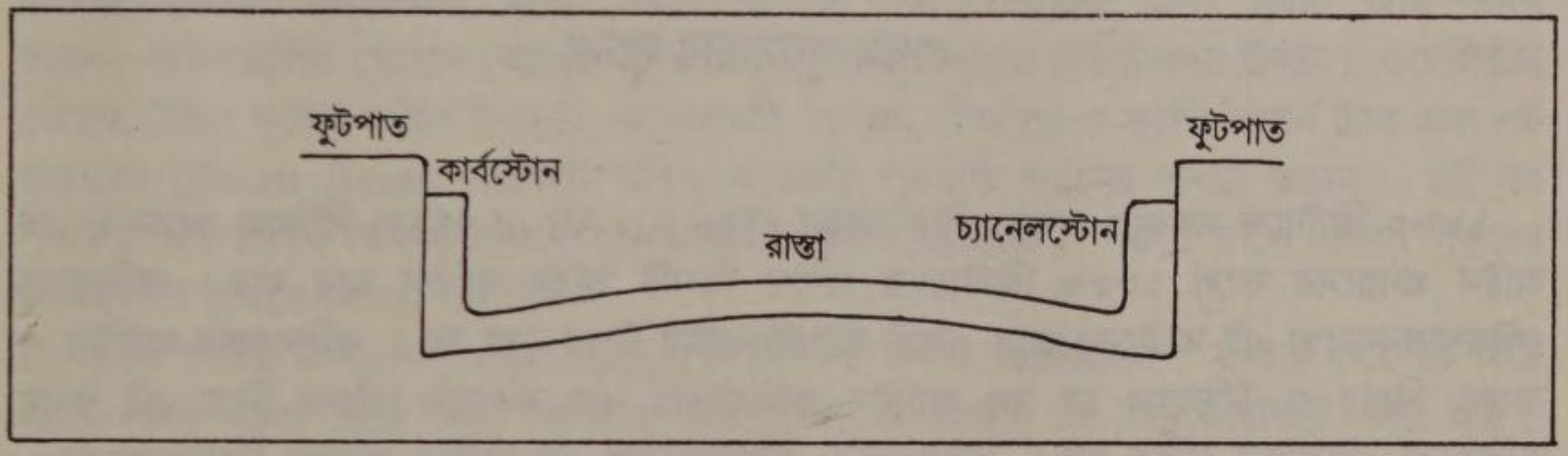


শহর কলিকাতার সর্বত্র রাস্তা ও ফুটপাতের মধ্যে একই সমতা রাখার জন্য কার্ব ও চ্যানেল স্টোন একটা পাথরে এক নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক মাপে তৈরি করা হয়। এই ব্যবস্থায় সুবিধা হল পথচারী এক পথ অতিক্রম করে অন্য পথে যখন পা রাখবে, রাস্তা ও ফুটপাতের উচ্চতার একই সমতা থাকায় চলার কোনও অসুবিধা হবে না। বর্তমানে এ ব্যবস্থা রহিত করা হয়েছে, অর্থাৎ কার্ব স্টোন ও চ্যানেল স্টোন পৃথক দুটি পাথরে তৈরি হওয়ায় রাস্তা ও ফুটপাতের মধ্যে একই সমতা থাকছে না। ফলে পথচারী এক ফুটপাত থেকে অন্য ফুটপাতে ওঠার সময় একটু অসাবধানে যে কোনও দুর্ঘটনার শিকার হতে পারে। সেকালের এই বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা, আজকের আধুনিক যুগে কেন যে বাতিল হল তার যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা আজও পাওয়া যায়নি। সে যাই হোক, ১৯১০-১১ খ্রিস্টাব্দের Administration Report-এ দেখা যায় যে ফুটপাতের কার্ব ও চ্যানেল স্টোন বসানোর জন্য কলিকাতা পৌরসভার ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছিল।

**তথ্যসূত্র**

১ The Report of the Calcutta Building Commission, p. 81.
২ 13th Report of the Commissioners for the Improvement of the town of Calcutta for 1856.
৩ The Report of the Calcutta Building Commission, p. 311 & 313.
৪ —Do,— p. 313.
৫ জগন্নাথ তর্ক পঞ্চানন জীবনবৃত্ত—উমাচরণ ভট্টাচার্য, প্রকাশকাল ১৮৮০, পৃ. ১৯।
৬ Beverley's Report, p. 51-55.
৭ Municipal Calcutta—Goode, p. 254.
৮ Municipal Calcutta—Goode, p. 225.

## ১৬
# প্রথম পুরসভার সূচনা

১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে সরকার প্রথম পৌর আইন (The Act VI of 1863) বিধিবদ্ধ করেন। এই আইন প্রণয়নের ফলে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের প্রণীত তিনটি আইন বাতিল হয়ে যায়। কলিকাতা পৌরশাসনব্যবস্থা এই আইনের বলে একটি কর্পোরেশনের উপর ন্যস্ত হয়। কলিকাতার জাস্টিস ও বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার যে সব জাস্টিস কলিকাতায় বাস করতেন তাঁদের নিয়ে এই প্রথম কলিকাতা পৌরসভা গঠিত হয়। পৌরসভার চেয়ারম্যানকে এই আইনে সরকার নিযুক্ত করেন। জাস্টিসগণ সরকারের অনুমতি নিয়ে ভাইস-চেয়ারম্যান নিযুক্ত করতে পারবেন। এ ছাড়া তাঁরা কলিকাতা পৌরসভার হেলথ অফিসার, সার্ভেয়ার, ইঞ্জিনিয়ার, কালেক্টর ও অ্যাসেসর প্রভৃতি উচ্চপদস্থ কর্মচারীও নিযুক্ত করতে পারবেন। এই আইনে কলিকাতার পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা ও ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী সম্পাদনের নির্দেশ ছিল। জল সরবরাহ রূপায়ণের ব্যয়ভার বহনের জন্য জলকর আরোপের ক্ষমতা কলিকাতা পৌরসভাকে এই আইনে দেওয়া হয়েছিল। এ ছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের উপর কর বসাবার ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছিল।

১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের পৌর আইন ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে সংশোধন করা হয়। পরের বছর অর্থাৎ ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের ৯ নম্বর আইনে (The Act IX of 1867) পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা রূপায়ণের জন্য পৌরসভাকে ঋণগ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া হল। এ ছাড়াও বাড়ির বার্ষিক মূল্যায়নের উপর (Annual value of premises) শতকরা ৪ টাকা হারে জলকর নির্ধারণের ক্ষমতা পৌরসভাকে দেওয়া হয়েছিল। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের ১ নম্বর আইনে (The Act I of 1870) জলকরের হার বাড়িয়ে ৫ শতাংশ করা হয়।[১]

ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী প্রকল্পটি রূপায়ণের সঙ্গে শহরে বিশুদ্ধ পানীয় জলের সরবরাহের বিষয়টি প্রাধান্য পেতে থাকে। সরকারও বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করে পানীয় জল সরবরাহের প্রকল্পটি ত্বরান্বিত করতে তৎপর হয়েছিলেন। এই প্রকল্প সম্বন্ধে কিছু বলার আগে সেকালের কলিকাতায় পানীয় জল সরবরাহের উৎস সম্বন্ধে অবহিত হওয়া দরকার।

অষ্টাদশ শতাব্দীর গ্রামীণ কলিকাতায় পানীয় জলের জন্য এক লালদিঘি ছাড়া আর কোনও সরকারি দিঘি ছিল না। এই দিঘিকে বলা হত গ্রেট ট্যাঙ্ক (Great Tank)। ১৭০৯ খ্রিস্টাব্দে এটি গভীর করে খনন করা হয়। এই দিঘির জল ফোর্ট উইলিয়ামের সৈন্যদল এবং ওই অঞ্চলের ইংরেজ অধিবাসীরা পানীয় হিসাবে ব্যবহার করত। পরবর্তীকালে বর্তমান টেলিগ্রাফ অফিস বিল্ডিং যেখানে তারই নিকটে আরেকটি পুষ্করিণী খনন করা হয়। এরই আশেপাশে ছিল কতকগুলি ছোট ছোট মেটে ও কোঠাবাড়ি। এই বাড়িতে কোম্পানির ক্যালিকো প্রিন্টারগণ (Kalico printers) বাস করত।

কলিকাতার সাধারণ নাগরিকবৃন্দ ইংরেজরা যাদের নেটিভ বলত, ব্যক্তিগত উদ্যোগে খনন করা পুকুর বা পাতকুয়ার জল পানীয় রূপে ব্যবহার করত। এই সব পুকুরের জল নানা কারণে দূষিত হত। পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত তথা শহরের সুস্বাস্থ্যের জন্য সরকারের আদেশে ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে ৭ জানুয়ারি ধর্মতলার এক অংশের (এখন যেখানে ট্রাম কোম্পানির ধর্মতলার গুমটি ও কার্জন পার্ক, অধুনা সুরেন্দ্র উদ্যান) জঙ্গল পরিষ্কার করে পানীয় জলের পুকুর খননের ঠিকাদারি দেওয়া হয়।

কেবলমাত্র ধর্মতলার এই পুষ্করিণী নয়, হরিণবাড়ি জেলের নিকট আরও দুটি পুষ্করিণী খননের আদেশও ওই সময় দেওয়া হয়েছিল। এই তিনটি পুকুরের মধ্যে দুটি কেবল ইংরেজ ও সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর পানীয় জলের জন্য ব্যবহৃত হত—অপরটি ঘোড়া ধোয়ার ও সাধারণের ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। ধর্মতলার পুষ্করিণী পরবর্তীকালে ভরাট করে কার্জন পার্ক (সুরেন্দ্র উদ্যান) তৈরি হয়। আরও পরে উদ্যানের কিছু অংশ নিয়ে ট্রাম কোম্পানির ধর্মতলার গুমটি হয়েছে।[২]

উত্তর ও মধ্য কলিকাতায় এই জাতীয় পানীয় জলের দিঘি বা পুষ্করিণী ছিল না। লটারি কমিটি দীর্ঘ রাজপথ নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে পানীয় জলের জন্য দিঘি খননের প্রকল্পও গ্রহণ করেন। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৩৬-এর মধ্যে লটারি কমিটি পানীয় জলের জন্য নয়টি দিঘি খনন করেন—কর্নওয়ালিস স্কোয়ার (আজাদ হিন্দ বাগ), কলেজ স্কোয়ার (বিদ্যাসাগর উদ্যান), ওয়েলিংটন স্কোয়ার (রাজা সুবোধ মল্লিক উদ্যান), ওয়েলেসলি স্কোয়ার, মির্জাপুর ও সুরতি বাগান ট্যাঙ্ক এবং শর্ট বাজারের (Shorts Bazar) সন্নিকটে আরও কয়েকটি পুষ্করিণী খননের ব্যবস্থা করেন। এই সব পুষ্করিণী কলিকাতার অধিবাসীদের কাছে আশীর্বাদ স্বরূপ হয়েছিল। পরবর্তীকালে এইসব পুকুরের অনেকগুলি বুজিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

লটারি কমিটি জলপ্রণালী (aquaducts) নির্মাণেরও ব্যবস্থা করেছিলেন। রাস্তার ধারে ইট দিয়ে গাঁথা পাকা নালা দিয়ে জল সরবরাহ ব্যবস্থাকেই জলপ্রণালী বা অ্যাকোয়াডাক্ট বলা হত। জলপ্রণালীতে জল সরবরাহের জন্য ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে চাঁদপাল ঘাটে একটি পাম্প স্থাপনের ব্যবস্থা হয়। এই পাম্পের সাহায্যে নদী থেকে জল তুলে জলপ্রণালীতে ছাড়া হত। সেই জল মাধ্যাকর্ষণের টানে জলপ্রণালীর মাধ্যমে শহরের কিছু কিছু অংশে সরবরাহ করা হয়েছিল। ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, ধর্মতলা স্ট্রিট, চৌরঙ্গী, পার্ক স্ট্রিট, চিৎপুর রোডের অংশ বিশেষ, লালবাজার, বৌবাজার প্রভৃতি অঞ্চলে জলপ্রণালীর প্রবর্তন করা হয়। জেসপ কোম্পানি মাসিক ৪০০ টাকার পারিশ্রমিকে প্রতিদিন ৭ ঘণ্টা করে পাম্পটি চালাত। জলপ্রণালী থেকে বালতি ডুবিয়ে জল সংগ্রহ করে ওই জল রাস্তা ধোয়ার কাজেও ব্যবহার হত। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে জলপ্রণালী ব্যবস্থা ওয়েলিংটন স্ট্রিট, ওয়েলেসলি প্লেস ও কলেজ স্ট্রিটে প্রবর্তন করা হয়েছিল। এর নির্মাণ ব্যয়ের অর্ধেক জনসাধারণ ও অর্ধেক সরকার বহন করেছিলেন।

সেকালের হিন্দুরা গঙ্গার জল পানীয় হিসাবে ব্যবহার করত। ফেব্রুয়ারি মাসে গঙ্গার জল বড় বড় জালাতে ধরে রাখা হত। রবীন্দ্রনাথের "ছেলেবেলা"তে এর উল্লেখ আছে। অনেক সময় ওই জলে ফটকিরি দিয়ে পরিশুদ্ধ করা হত। ধনী ব্যক্তিরা হুগলি বা খুলনা থেকে নদীর জল পানের জন্য নিয়ে আসত। দরিদ্র হিন্দু মুসলমান সাধারণত স্থানীয় পুকুরের জল ব্যবহার করত। ইউরোপীয়রা বৃষ্টির জল বড় বড় পেগু জারে (Pegu Jar) ধরে রাখত। অনেক ইউরোপীয় স্কট থমসনের (Mr. Scott Thomson) সোডার জল পানীয় হিসাবে ব্যবহার করত। থমসনের দোকান ছিল লালদিঘির ধারে ট্যাঙ্ক স্কোয়ারে।[৩]

ফোয়ারার মাধ্যমে শহর কলিকাতায় জল সরবরাহের ব্যবস্থা চালু হয়েছিল ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে। Mr. E. D. Kilburn তাঁর একটি প্রস্তাবে সুপারিশ করেন যে কলিকাতার প্রধান প্রধান রাস্তার সংযোগস্থলে যদি একটি করে ফোয়ারা স্থাপন করা যায় তবে কলিকাতার সাধারণ অধিবাসীদের জলকষ্ট অনেকাংশে দূর করা সম্ভব। Mr. Kilburn ছিলেন Messrs Schoene Kilburn & Co-র একজন কর্ণধার। তিনি শুধু প্রস্তাব দিয়েই ক্ষান্ত হননি, প্রস্তাবটি রূপায়ণের জন্য ১০০০ টাকা দানও করেছিলেন।

Mr. Kilburn-এর প্রস্তাব অনুসারে বৌবাজার স্ট্রিট ও কলেজ স্ট্রিটের সংযোগস্থলে এইরূপ একটি ফোয়ারা স্থাপন করা হয়। জলাধার রাখা হয়েছিল ফোয়ারার মাথায়, ভিস্তিরা নিকটবর্তী পুষ্করিণী থেকে জল বয়ে এনে জলাধারটি পূর্ণ করে রাখত। জলাধারের জলে ফোয়ারাটি চালু থাকত। এই ফোয়ারা চালু রাখার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করতেন Mr. Kilburn.[৪]

মহাভারতের অনুবাদক কালীপ্রসন্ন সিংহ এইরূপ চারটি ঢালাই লোহার সুদৃশ্য ফোয়ারা ইংল্যান্ড থেকে আমদানি করে কলিকাতা পৌরসভাকে উপহার দিয়েছিলেন। এগুলিতে আলো দিয়ে

সাজানোর ব্যবস্থা ছিল। সিংহ মশাইয়ের নির্দেশ ছিল যে উত্তর কলিকাতার জনবহুল রাজপথে এগুলি স্থাপন করলে একদিকে যেমন পল্লীবাসীর জলকষ্ট দূর হবে, অন্যদিকে রাত্রিতে ফোয়ারার আলোয় পথটি আলোকিত হবে।

১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে একটি ফোয়ারা ডালহৌসি স্কোয়ারের উত্তর-পশ্চিম কোণে স্থাপন করা হয়েছিল। আরেকটি স্থাপিত হয়েছিল বিডন স্ট্রিট ও গুরুদাস স্ট্রিটের সংযোগস্থলে (বর্তমান মিনার্ভা থিয়েটারের কাছে)। দুটি ফোয়ারাই উঁচু বেদীর উপর স্থাপিত হয়েছিল। তার চারদিকে ছিল সিঁড়ির ধাপ।[৫]

কয়েক বছর পরে কালীপ্রসন্ন সিংহের বিধবা পত্নী শরৎকুমারীর অনুরোধে আরেকটি ফোয়ারা তাঁর বারাণসী ঘোষ স্ট্রিটের বাড়ির সামনে পৌর কর্তৃপক্ষ স্থাপন করেছিলেন। সে ফোয়ারাটি আজও সেখানে আছে।[৬]

পানীয় জল সরবরাহের নানা প্রকার প্রকল্প গ্রহণ করা সত্ত্বেও শহর কলিকাতায় জলকষ্টের সুরাহা হয়নি। সমস্যাটির সুষ্ঠু সমাধানের জন্য সরকারও চিন্তাভাবনা শুরু করেন। ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দের ২ নম্বর আইনে (The Act II of 1848) সর্বপ্রথম বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের বিষয়টি প্রাধান্য পায়। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে পৌর কমিশনারগণ ৫৬৩১ টাকা খরচ করে সরকারি পুষ্করিণীগুলি সংস্কারের ব্যবস্থা করেন। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে মিঃ ক্লার্ক (Mr. W. Clark, M. I. C. E) পৌর কমিশনারদের সচিব (Secretary) নিযুক্ত হন, ওই বছরই কমিশনারগণ ২৫,০০০ টাকা ব্যয় করে নিমতলা ঘাটের সন্নিকটে নদী থেকে জল তোলার জন্য দ্বিতীয় একটি পাম্প বসাতে মনস্থ করেছিলেন। এর দ্বারা "জলপ্রণালী" ব্যবস্থা আরও ব্যাপকভাবে উত্তর কলিকাতায় বিস্তারের ব্যবস্থা করতে চাওয়া হয়েছিল। ক্লার্ক সাহেব জলপ্রণালী ব্যবস্থার ত্রুটিগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং কমিশনারদের বিবেচনার জন্য লোহার পাইপের মারফত জল সরবরাহের সুপারিশ করেন। যেহেতু সে সময় ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী ক্লার্ক সাহেবের পরিকল্পনা অনুসারে রূপায়িত হচ্ছিল, নতুন জল সরবরাহ পরিকল্পনা গ্রহণ করলে পয়ঃপ্রণালীর কাজে ব্যাঘাত ঘটতে পারে এই আশঙ্কায় কমিশনারগণ জল সরবরাহ পরিকল্পনাটি সে-সময় গ্রহণ করেননি।

ইতিমধ্যে ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে সরকার জল সরবরাহের জন্য ঋণের প্রস্তাব অনুমোদন করেছিলেন। প্রাথমিক কাজ শুরু করেন ডাঃ ম্যাকনামারা (Dr. Macnamara)। তিনি ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাস থেকে ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত হুগলি নদীর জল বিশ্লেষণ করে একটি প্রতিবেদন দাখিল করেন। তাতে ব্যারাকপুরের দুই মাইল উত্তরে পলতা থেকে জল গ্রহণের সুপারিশ ছিল। এখানকার নদীর জল বিশুদ্ধ ও লবণমুক্ত। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে ক্লার্ক সাহেবকে ইংল্যান্ডে পাঠানো হয়। তিনি সেখানকার আধুনিক জল সরবরাহ প্রযুক্তি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হন। পলতা জল সরবরাহ সম্বন্ধে এক প্রতিবেদন পেশ করেন ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে। ক্লার্ক সাহেবের এই পরিকল্পনাটি গ্রহণ করা হয়।[৭]

পরিকল্পনাটির মূলে ছিল—পলতার জল পাম্পের সাহায্যে তুলে একটি বিরাট পুষ্করিণীতে রাখা হবে। পরে সেই জল বিশুদ্ধ করে বৃহৎ লৌহ পাইপের মধ্যে দিয়ে কলিকাতার টালায় এনে এক প্রকাণ্ড জলাধারে রাখার ব্যবস্থা করা হবে। পরে টালার জলাধার থেকে ছোট ছোট পাইপের মাধ্যমে (৩০, ২৪, ১৮ ইঞ্চি পাইপ) সারা কলিকাতায় সরবরাহের ব্যবস্থা হবে। জল সরবরাহের প্রকল্পটি রূপায়ণের ভার দেওয়া হয় Messrs Brassy, Wythes, Aird & Sons-কে। তাঁরা কাজটি সুসম্পন্ন করে পৌরসভার হাতে তুলে দেন ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের গোড়ার দিকে। প্রকল্পটি রূপায়িত হতে খরচ পড়েছিল ৬২ লক্ষ টাকা। কলিকাতা শহরের সকল প্রধান সড়ক ও গলি পথে সংখ্যায় প্রায় ৩৮৫টি পানীয় জলের পাইপ বসান হয়েছিল। মোট পাইপের দৈর্ঘ্য ছিল ১১১$\frac{৩}{৪}$ মাইল। পরিকল্পনা অনুসারে প্রতিদিন ৬০,০০,০০০ গ্যালন জল ৪ লক্ষ অধিবাসীকে যোগানের ব্যবস্থা হয়েছিল।

পরিশ্রুত জল সরবরাহ ছাড়াও অপরিশ্রুত জল সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল শহর কলিকাতায়। চাঁদপাল ঘাট থেকে গঙ্গার জল পাম্পের সাহায্যে উত্তোলন করে পাইপের মাধ্যমে ৪১৮টি রাস্তায় সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে ; ৫১১টি হাইড্রেন্টের মাধ্যমে (চলতি কথায় যাকে চাপা কল

বলা হয়) ওই জল রাস্তা ধোয়ার ও অগ্নি নির্বাপণের কাজে ব্যবহার হত।[৮] চাঁদপাল ঘাটের পাম্পটি ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত হয়েছিল।

শহর কলিকাতায় প্রথম রাস্তা ধোয়ার কাজ শুরু হয় ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে। ভিস্তিরা সরকারি, বেসরকারি পুষ্করিণী ও জলপ্রণালী থেকে জল সংগ্রহ করে রাস্তা ধোয়ার কাজ করত। যে সব রাস্তার অধিবাসীরা রাস্তা ধোয়ার অর্ধেক খরচ বহন করত, সেই সব রাস্তাই ধোয়ার ব্যবস্থা ছিল। ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে চিৎপুর রোড ধোয়ার জন্য সাধারণের চাঁদায় একটি তহবিল গঠিত হয়। ৩১,৮৫০ টাকায় তহবিলটি পরিপুষ্ট হয়। ওই তহবিল থেকে ১১,৮৫০ টাকা নিয়ে রাস্তা ধোয়ার জল সরবরাহের জন্য একটি পুষ্করিণী খনন করা হয়।

পরবর্তীকালে রাস্তা ধোয়ার কাজে জলবাহী গোশকট ব্যবহার হতে থাকে। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে ৪৬টি রাস্তা ধোয়ার ব্যবস্থা হয়। ওই রাস্তাগুলির মোট দৈর্ঘ্য ছিল ১৬½ মাইল। ওই রাস্তা ধোয়ার কাজে মাসিক ব্যয় হত ১৮৬৬ টাকা। এই ব্যবস্থা ব্যাপক আকারে শহরে সম্প্রসারণের জন্য ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে নিমতলা ঘাটে নতুন পাম্পিং স্টেশন স্থাপনের যন্ত্রপাতি সরবরাহের আদেশ দেওয়া হয়। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে জলবাহী গো-শকটের নব-রূপায়ণ করা হয়। সেই সঙ্গে গো-শকটের সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হয়েছিল। ১৮৭০ থেকে ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে অনেকগুলি রাস্তা ধোয়ার কাজ শুরু হয়। হিসাব করে দেখা গেছে যে ৬ মিলিয়ন স্কোয়ার ফুট থেকে বৃদ্ধি পেয়ে রাস্তা ধোয়া ১০ মিলিয়ন স্কোয়ার ফুটে দাঁড়ায়। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে মল্লিকঘাট পাম্পিং স্টেশনের উদ্বোধন হওয়ায় রাস্তা ধোয়ার কাজে অপরিশ্রুত জল সরবরাহের পরিমাণ বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। চাঁদপাল ঘাটের পাম্প বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে ওয়াটগঞ্জ পাম্পিং স্টেশন স্থাপিত হওয়ায় কলিকাতা শহরতলিতে অপরিশ্রুত জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়, এর ফলে অপরিশ্রুত জল সরবরাহের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৫ মিলিয়ন গ্যালনে। সে সময় শহর কলিকাতার প্রতিটি প্রধান রাজপথ তিনবার করে ধোয়াবার ব্যবস্থা ছিল। গলি ও সরু গলি দিনে দু'বার এবং ফুটপাত দিনে একবার করে ধোয়া হত।[৯] বর্তমানে রাস্তা ধোয়ার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ রহিত হয়েছে। শোনা যায়, বিশেষজ্ঞদের মতে রাস্তা ধুলে রাস্তার পরমায়ু কমে যায়।

এই শতাব্দীর ষাটের দশকে শহরে কলেরার প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ায় আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংস্থার (World Health Organisation)-এর সুপারিশক্রমে ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে অপরিশ্রুত জলে ক্লোরিন মিশ্রণের ব্যবস্থা হয়। ক্লোরিন মিশ্রণের (Chlorinator) তিনটি যন্ত্র মল্লিকঘাট পাম্পিং স্টেশনে এবং দুটি ওয়াটগঞ্জ পাম্পিং স্টেশনে স্থাপন করা হয়। মল্লিকঘাট উত্তর কলিকাতায় এবং ওয়াটগঞ্জ ময়দান অঞ্চলে ও দক্ষিণ কলিকাতায় অপরিশ্রুত জল সরবরাহ করে।

তথ্যসূত্র


১ Lecture delivered by Mr. W. J. Simmons on Municipal Govt.
২ কলিকাতা সেকালের ও একালের—হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, পৃ. ৫৫৭ ও ৬৭৬
৩ Municipal Calcutta—Goode, pp. 181-182
৪ Administration Report of Municipal Calcutta, 1861
৫ Do 1868
৬ Do 1882-83
৭ Municipal Calcutta—Goode, p. 183
৮ A Short History of Calcutta—A. K. Roy, p. 171
৯ Municipal Calcutta—Goode, pp. 250-252

## ১৭

# শহর কলিকাতাকে জঞ্জালমুক্ত করার প্রয়াস

ফিভার হসপিটাল কমিটি কলিকাতার জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য একদিকে যেমন উত্তম জলনিকাশী ব্যবস্থা প্রবর্তন ও বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের প্রতি দৃষ্টি দেবার জন্য সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন, অন্যদিকে কলিকাতার জঞ্জাল অপসারণের প্রশ্নটির যে সুষ্ঠু সমাধান হওয়া প্রয়োজন সেদিকেও তাঁরা অবহিত ছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আবর্জনা অপসারণের প্রশ্নটিকে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়নি। সে সময় পৌর কর্তৃপক্ষ রাস্তা পরিষ্কারের দিকেই দৃষ্টি দিতেন। জঞ্জাল অপসারণ বিভাগের কর্মচারীদের বেতন ছিল অতি নগণ্য। ২১ এপ্রিল ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দের কাউন্সিলের প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে মিঃ হ্যান্ডেল (Mr. Handle)-কে জঞ্জাল অপসারণের কাজে নিযুক্ত করার জন্য অতিরিক্ত ২০ টাকা বেতন বরাদ্দ করা হয়েছিল।[১]

সে সময় পুরাতন ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের ধারে গভীর পরিখা ছিল। ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে নবাব সিরাজদ্দৌলার কলিকাতা আক্রমণের কালে ফোর্টের মধ্যে ও তার চারপাশে যে সব ইংরেজ সৈন্য নিহত হয় তাদের শবদেহগুলি ওই পরিখায় নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। পরবর্তীকালে ওই অঞ্চলের যত আবর্জনা ও জঞ্জাল ওই খাদে ফেলা হতে থাকে। ফলে স্থানটিতে এমন এক অস্বাস্থ্যকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যার ফলে ১৭৬৬ খ্রিস্টাব্দে পরিখাটি ভরাট করে দেওয়া হয়। ঠিক একই অবস্থা ঘটেছিল মারাঠা খালের (Marhatta Ditch)। শহরের সমস্ত জঞ্জাল আর আবর্জনা ফেলার কেন্দ্রভূমি হয়েছিল এই মারাঠা খাল। স্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়োজনে এটিকে বুজিয়ে দিয়ে তৈরি হয়েছিল সারকুলার রোড।[২] স্ট্র্যান্ড ব্যাঙ্ক রোডও ঠিক একই ভাবে সৃষ্টি হয়েছিল। গঙ্গার ধারে পলি জমে প্রথমে নতুন পাড় তৈরি হয়। পরে আবর্জনা দিয়ে ভরাট করে তৈরি হয় স্ট্র্যান্ড ব্যাঙ্ক রোড।

শুধু মারাঠা খালই নয়, সেকালের কলিকাতায় আর যে সব জলনিকাশী পয়ঃপ্রণালী অস্বাস্থ্যকর হয়েছিল, সেগুলি ভরাট করে দেবার জন্য তৎকালীন সৈন্যাধ্যক্ষ একটি পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তা অনুমোদন করেছিলেন।[৩] এই সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা সত্ত্বেও শহরের স্বাস্থ্যবিধির বিশেষ কোনও উন্নতি হয়নি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরু থেকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (Permanent Settlement) প্রচলনের বছর পর্যন্ত (১৭৯৩) কলিকাতাকে পরিচ্ছন্ন রাখা ও জঞ্জাল অপসারণের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল কলিকাতার-জমিদারের উপর, সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।[৪] কিন্তু কলিকাতার আয়তন, লোকসংখ্যা, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি দ্রুতহারে বৃদ্ধি পেতে থাকায় নতুন গড়ে ওঠা শহরে পৌরস্বাচ্ছন্দ্য বিধান কলিকাতা জমিদারের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে করে ওঠা সম্ভব হয়নি। তাই ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে প্রণীত এক আইনের বলে (A Statute of George III) জমিদারের হাত থেকে পৌর শাসনব্যবস্থা ফিরিয়ে নিয়ে নতুন নিযুক্ত জাস্টিসেস অফ পিস্‌দের হাতে অর্পণ করা হয়। শহরের জঞ্জাল অপসারণ, রাস্তাঘাট নির্মাণ, কর নির্ধারণ প্রভৃতি ব্যবস্থার চাবিকাঠি জাস্টিসদের দেওয়া হয়।[৫] শহরের আবর্জনা অপসারণের ব্যাপারে তাঁরা অনেকগুলি কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। সেকালের শহর কলিকাতার জঞ্জাল পরিষ্কার ও অপসারণের জন্য ৮৫ জোড়া সতেজ বলদ ও ওই সংখ্যক গাড়ি ও গাড়োয়ান সরবরাহ করার জন্য ১৭ ডিসেম্বর ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে ক্যালকাটা গেজেটে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছিল।[৬] পরবর্তীকালে লর্ড ওয়েলেসলির Town

Improvement Committee ও লটারি কমিটি (১৮১৭) কলিকাতার উন্নয়নে যথেষ্ট অবদান রাখলেও আবর্জনা অপসারণ বিভাগটি প্রধান ম্যাজিস্ট্রেটের (Chief Magistrate) নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিল। এই বিভাগের কর্মপ্রণালী যে অতি ন্যক্কারজনক ছিল, তার ভূরি ভূরি নিদর্শন মিলবে ফিভার হসপিটাল কমিটির প্রতিবেদনে।

পৌর কর্তৃপক্ষ যখন নানা প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে শহরকে জঞ্জালমুক্ত তথা জনস্বাস্থ্যের উন্নতি বিধানে তৎপর হলেন, তখন কিন্তু শহরবাসীর কাছ থেকে বিশেষ কোনও সহযোগিতা পাওয়া যায়নি। তারা যখন তখন বাড়ির আবর্জনা রাস্তায় নিক্ষেপ করে রাস্তা নোংরা করত। এর প্রতিবিধানের জন্য ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে লেফটেন্যান্ট অ্যাবারক্রম্বি একটি বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেছিলেন—জঞ্জাল সংগ্রহকারী গাড়ি একটা নির্দিষ্ট সময়ে ঘণ্টাধ্বনি দিতে দিতে রাস্তা দিয়ে যাবে, রাস্তার দু'ধারের গৃহের অধিবাসীরা ঘণ্টাধ্বনি শুনে তাদের গৃহের জমা আবর্জনা ওই গাড়িতে নিক্ষেপ করবে। অ্যাবারক্রম্বির এই প্রয়াস কার্যকর হয়নি।[৭]

শহর কলিকাতার অধিবাসীদের পৌর বিধি মেনে চলায় অভ্যস্ত করার জন্য সরকার আইন প্রণয়নে উদ্যোগী হন। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের আইনের (The Act XIV of 1856) ১২ ও ১৫ নম্বর ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতার বলে কমিশনারগণ একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাড়ির আবর্জনা রাস্তায় ফেলার জন্য নগরবাসীদের উপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করতে পারতেন। নগরবাসীদের জঞ্জাল ফেলার জন্য নির্দিষ্ট স্থান করে দেবার বিধান ছিল পরবর্তী আরেক আইনে (Sections 119 & 122 of Act VI of 1863)।

১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দের পৌরসভার প্রতিবেদনে (The Municipal Report for 1877) পর্যালোচনা করে "দি আর্মি স্যানিটারি কমিশন" (The Army Sanitary Commision) রাস্তায় জঞ্জাল ফেলার জন্য ডাস্টবিন (Dustbin) রাখার সুপারিশ করেছিলেন। শহর কলিকাতার দক্ষিণ দিকে এই সুপারিশ কার্যকর করা গেলেও উত্তরাঞ্চলে এই ব্যবস্থার প্রবর্তন খুবই দুঃসাধ্য ছিল। এই এলাকা ঘন জনবসতিপূর্ণ হওয়াতে আবর্জনা ফেলার জন্য উপযুক্ত স্থানের সংস্থান কঠিন কাজ ছিল। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে ইউরোপীয় অধ্যুষিত এলাকায় বাড়ি থেকে জঞ্জাল সংগ্রহের কাজ (house collection) শুরু হয়। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে রাস্তায় জঞ্জাল নিক্ষেপের নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছিল—সারারাত থেকে সকাল ৭টার মধ্যে। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের আইনে (The Act III of 1899) প্রত্যেক গৃহস্বামীকে নিজস্ব জঞ্জাল ফেলার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেবার ক্ষমতা পৌর চেয়ারম্যানকে দেওয়া হয়েছিল, যদিও এই ক্ষমতা তিনি কদাচিৎ ব্যবহার করতেন। সে যাই হোক, সে সময়ে রাস্তায় জঞ্জাল ফেলার একটা সময়-সারণি দেওয়া হয়েছিল—

**১ নম্বর ডিস্ট্রিক্ট**— সকাল দশটা থেকে দুপুর দুটো পর্যন্ত।

**২ নম্বর ডিস্ট্রিক্ট**—

(অ) বাণিজ্যিক এলাকা— ভোর ৬.৩০ মিনিট থেকে রাত্রি ৮.৩০ মিনিট পর্যন্ত।

**(আ) আবাসিক এলাকা**— সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত ; দুপুর ৩টা থেকে রাত্রি ৭টা পর্যন্ত।

**৩ নম্বর ডিস্ট্রিক্ট**—

(অ) ইউরোপীয় অধ্যুষিত এলাকা— ভোর ৬.৩০ মিনিট থেকে সকাল ৮.৩০ মিনিট পর্যন্ত।

**(আ) দেশীয় অধ্যুষিত এলাকা**— সকাল ৮টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত।

**৪ নম্বর ডিস্ট্রিক্ট**—

(অ) ওয়ার্ড ১৮, ২১, ২৩— সকাল ৮টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত।

(আ) ওয়ার্ড ২৪, ২৫— সকাল ৭.৩০ মিনিট থেকে রাত্রি ৮.৩০ মিনিট পর্যন্ত।

বর্তমানে জঞ্জাল ফেলার সময়-সারণি আর চালু নেই।[৮]

যে কোনও বড় শহরে জঞ্জাল অপসারণ পর্ব তিনটি ধারায় সম্পাদিত হয়—(১) জঞ্জাল সংগ্রহ, (২) জঞ্জাল অপসারণ ও (৩) একটি নির্দিষ্ট স্থানে তা জমা রেখে ব্যবহার উপযোগী করা। শহর

কলিকাতায় জঞ্জাল অপসারণের জন্য তিনটি সংস্থা গড়ে উঠেছিল : গোখানা, জঞ্জাল রেল ও ধাপা স্কোয়ার মাইল। কলিকাতার রাজপথের জঞ্জাল অপসারণ ব্যবস্থার বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা পেতে গেলে ওই তিনটি সংস্থা সম্বন্ধে জানা দরকার।

আবর্জনা অপসারণের জন্য যে প্রতিষ্ঠানটি কলিকাতায় সর্বপ্রথম স্থাপিত হয়েছিল সেটি গোখানা। শহরের রাস্তার আবর্জনা অপসারণের জন্য যে সব গাড়ি, ঘোড়া ও বলদ ব্যবহার হত, সেগুলিকে যেখানে রাখা হত, তাকেই বলা হত গোখানা। ফিভার হসপিটাল কমিটির প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে সে সময় শহর কলিকাতায় দুটি মাত্র গোখানা ছিল। একটি ছিল বৈঠকখানা রোডে যাকে উত্তরের গোখানা বলা হত, আর দক্ষিণেরটি ছিল এন্টালি পুলিশ হসপিটাল রোডে। তারও পূর্বে শহরের জঞ্জাল অপসারণের কাজটি ঠিকাদার দিয়ে সম্পন্ন করানো হত। লেফটেন্যান্ট অ্যাবারক্রম্বির সুপারিশে পৌর কর্তৃপক্ষ জঞ্জাল অপসারণের ভার নিজের হাতে তুলে নেন। ফলে ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম গোখানা স্থাপিত হয়। শহর বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে আবর্জনা অপসারণের কাজও বৃদ্ধি পায়। গোখানা তখন এক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণের গোখানাটি আরও উন্নত ও সম্প্রসারিত করা হয়। তার সঙ্গে একটি কারখানাও স্থাপিত হয়েছিল। এখানে জঞ্জালবাহী গাড়ি মেরামত ও সংস্কার, রাস্তার নামের ফলক, বাড়ির নম্বর তৈরি, রাস্তার বাতিস্তম্ভ মেরামতের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ১৯০১-০২ খ্রিস্টাব্দে সুষ্ঠু পৌরসেবার জন্য কলিকাতাকে ৪টি ডিস্ট্রিক্টে ভাগ করা হয়, সেই সঙ্গে অতিরিক্ত দুটি গোখানা স্থাপন করা হয়—একটি গ্রে স্ট্রিটে অন্যটি আলিপুরে। এদের নির্মাণ কার্য শেষ হয় ১৯০৬-০৭ খ্রিস্টাব্দে। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে শহরতলির অংশবিশেষ কলিকাতার সঙ্গে সংযুক্ত হওয়াতে জঞ্জাল অপসারণের কাজও বৃদ্ধি পায়। ফলে নতুন গোখানা স্থাপনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে গোখানায় মোট ৫৫৫টি গবাদি পশু ছিল। জঞ্জালবাহী গোযান ছিল ৪০৪টি। ১৯০৬-০৭ খ্রিস্টাব্দে ওই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় :

৪টি ডিস্ট্রিক্ট মিলিয়ে আবর্জনাবাহী গাড়ির সংখ্যা—১৬৩৩টি
৪টি ডিস্ট্রিক্ট মিলিয়ে মোট ভারবাহী পশুর সংখ্যা—১৭১৬টি
৪টি ডিস্ট্রিক্ট মিলিয়ে মোট গাড়োয়ানের সংখ্যা—১৫৪৫ জন

১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শহর কলিকাতার জঞ্জাল অপসারণের প্রধান দায়িত্বে ছিল গোখানা। ওই বছর শহরের আবর্জনা অপসারণের জন্য স্থাপিত হল মিউনিসিপ্যাল রেল, লোকে যাকে 'জঞ্জাল রেল' বলত। ফলে গোখানার আধিপত্য কিছুটা খর্ব হয়।

গোযানের সাহায্যে শহরের পথে জমা জঞ্জাল অপসারণ সহজসাধ্য হলেও সেই জঞ্জালের সদগতি এক বিরাট সমস্যা হিসাবে দেখা দেয়। প্রথম দিকে চুল্লির সাহায্যে আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলার ব্যবস্থা হয়েছিল, কিন্তু কার্যকর হয়নি। অবশেষে "জঞ্জাল রেল" (A refuse railway) নির্মাণের বিষয়টি প্রাধান্য পেতে থাকে। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে মিউনিসিপ্যাল রেল প্রকল্পটি অনুমোদন পায়। ওই বছরই লবণহ্রদের এক বর্গমাইল এলাকা পৌরসভার জাস্টিসদের জন্য সরকার অধিগ্রহণের ব্যবস্থা করেন। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে ৯৩,২২৫ টাকার বিনিময়ে ওই জমিটি হস্তান্তরিত হয়। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে রেলপথ নির্মাণের কাজ আরম্ভ হয়। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে মিউনিসিপ্যাল রেল জঞ্জাল অপসারণের কাজ আরম্ভ করে।[৯]

রেলপথটি দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল—প্রথমটি থিয়েটার রোড থেকে আরম্ভ হয়ে সারকুলার রোডের মধ্য দিয়ে বাগবাজার পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। আর দ্বিতীয় পথটি পূর্বদিকে প্রসারিত হয়ে ধাপা স্কোয়ার মাইল পর্যন্ত চলে যায়। প্রথম রেলপথে সারা শহরের জঞ্জাল বোঝাই হয়ে শিয়ালদায় আসত, আর দ্বিতীয় রেলপথ দিয়ে ওই জঞ্জাল খালাস হবার জন্য স্কোয়ার মাইলে যেত। প্রথমে ৮ মাইল দীর্ঘ রেললাইন পাতা হয়। এর জন্য ব্যয় হয়েছিল সাড়ে পাঁচ লাখ টাকা। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে রেললাইনের দৈর্ঘ্য বাড়িয়ে ১২ মাইল করা হয়। ১৯১০-১১ খ্রিস্টাব্দে আরও তিন মাইল বৃদ্ধি করা হয়। প্রথম দিকে ক্রেনের সাহায্যে রেলের বগিতে জঞ্জাল তোলার ব্যবস্থা হয়েছিল। এই ব্যবস্থা ফলপ্রসূ না হওয়াতে প্ল্যাটফর্ম নির্মাণ করা হয়। জঞ্জাল রেল প্রতিদিন ১০০০ টন জঞ্জাল ধাপায়

নিয়ে যেত। প্রতিটি রেল বগি ১০ টন করে জঞ্জাল অপসারণ করত। ১৯১৩-১৪ খ্রিস্টাব্দে ৩৬,০০০ রেল বগি ভর্তি জঞ্জাল ধাপায় পাঠানো হয়।

জঞ্জাল রেলে আবর্জনা অপসারণের ব্যবস্থায় সারকুলার রোডের পরিবেশ ক্রমশ পূতিগন্ধময় হয়ে উঠতে থাকে। বাংলাদেশের স্যানিটারি কমিশনার ডাঃ ডি বি স্মিথ (Dr. D. B. Smith, Sanitary Commissioner for Bengal) ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে জঞ্জাল রেল সম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য করেন : ''a great sanitary abuse and an ill-considered and reckless system of conservancy.'' তিনি আরও বলেছিলেন যে এই ব্যবস্থা যদি চলতে থাকে তবে শহর কলিকাতার জনস্বাস্থ্য ভীষণভাবে বিঘ্নিত হবে। ডঃ স্মিথের এই মন্তব্য পাঠ করে সে সময়ের ছোটলাট স্বয়ং জঞ্জাল পরিদর্শন করে কিছু ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়ে যান। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে (১৯০৬ খ্রি.) জঞ্জাল রেলের একটি প্ল্যাটফর্মের জমি ক্যামবেল হাসপাতালের সম্প্রসারণের জন্য গ্রহণ করা হয়। শহর কলিকাতার দক্ষিণ দিকের আরও দুটি প্ল্যাটফর্ম বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে লোয়ার সারকুলার রোডের জঞ্জাল রেল তুলে দেওয়া হয়। তার পরিবর্তে দুটি মোটর লরি কিনে তাই দিয়ে জঞ্জাল অপসারণের কাজ চালু রাখা হয়।[১০]

এদিকে শহরের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ক্রমশ কলুষিত হতে থাকায় নানা দিক থেকে তীব্র সমালোচনার ঝড় ওঠে। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে সুভাষচন্দ্র বসু (পরে নেতাজি) যখন কলিকাতা পৌরসভার প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন (Chief Executive Officer), তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে দু' বছরের মধ্যে জঞ্জাল রেল তুলে দেওয়া হবে। প্রায় ২০ বছর বাদে সেই আশ্বাস কার্যকর হয়। জঞ্জাল রেলের জায়গায় স্থান করে নিল মোটর লরি। গোখানা তার গৌরব হারিয়ে মোটর লরি গ্যারেজ হয়। বর্তমান কলিকাতার জঞ্জাল অপসারণের প্রধান দায়িত্বে আছে কলিকাতা পৌরসভার বিশাল মোটর লরি বাহিনী।

## তথ্যসূত্র


১ Long's Selection from Unpublished Records of Govt, Proceedings of the Court, 1762.
২ Do 1766
৩ Seton Carr's Selection from the Calcutta Gazette, Vol I, p. 159
৪ Beverley's Report on the Census of Calcutta, p. 41
৫ Beverley's Report on the Census of Calcutta, p. 42
৬ Seton Carr's Selection from the Calcutta Gazette, Vol III, p. 84
৭ Municipal Calcutta—Goode, p. 166
৮ Municipal Calcutta—Goode, p. 167
৯ Municipal Calcutta—Goode, p. 157
১০ Municipal Calcutta—Goode, p. 159

## ১৮

# ১৮৬৬—কলিকাতার প্রথম জনগণনা

ফিভার হসপিটাল কমিটির সুপারিশগুলি অবিলম্বে কার্যকরী না হলেও এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। সরকার একাধিক আইন প্রণয়ন করে ওই সুপারিশগুলি রূপায়ণে তৎপর হন। এর ফলে শহর কলিকাতায় ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী, বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা, আবর্জনা অপসারণ, ফুটপাত নির্মাণ প্রভৃতি বিবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের পৌর আইনে (The Act VI of 1863) এই সব পরিকল্পনা রূপায়ণের নির্দেশ ছিল। শুধু তাই নয়, ওই আইনের ১০১ থেকে ১০৮ নম্বর ধারায় শহর কলিকাতায় জনগণনার নির্দেশ ছিল। পুরসভা এটি কার্যকর করার জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটির সদস্যবৃন্দ হলেন—

মিঃ ভি. এইচ. শক (Mr. V. H. Schalch), চেয়ারম্যান
মিঃ এ. এম. ডাউলিনস্ (Mr. A. M. Dowleans), ভাইস-চেয়ারম্যান
ডাঃ নরম্যান শীভার্স (Dr. Narman Chevers), সদস্য
মিঃ মানেকজী রুস্তমজী ঐ
মিঃ মৌলভী আবদুল লতিফ খান বাহাদুর ঐ
মিঃ রমানাথ ঠাকুর। ঐ

শক সাহেব ছিলেন কলিকাতা পুরসভার প্রথম চেয়ারম্যান। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতার জনগণনার উপর ভিত্তি করে এই কমিটি একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। তার নাম "Report on the Census of Calcutta for the year 1866"। এই প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে শহর কলিকাতা প্রধানত সারকুলার রোডের পরিসীমার মধ্যে অবস্থিত ছিল। শহরের সর্বমোট এলাকা ছিল ১৫,১১৫ বিঘা ৮ কাঠা ১০ ছটাক ২৭ ফুট। মাইলের হিসাবে এর পরিমাণ ছিল ৭·৮ বর্গ মাইল। ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ, ময়দান ও তার আশপাশ অঞ্চল, কুলিবাজার ও টালি নালা এর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

শহর কলিকাতার মোট জমির যে পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে তা থেকে ফোর্ট উইলিয়াম অধিকৃত এলাকা, ময়দান প্রভৃতি বাদ দিলে শহরের অধিকারভুক্ত মোট এলাকা ছিল ১০,৯৫৩ বিঘা ৯ কাঠা ৮ ছটাক ৪৪ ফুট। ওই জমি থেকে শহরের প্রয়োজনে যে জমি গ্রহণ করা হয়েছিল তার তালিকা দেওয়া হল—

| | বিঘা | কাঠা | ছটাক | ফুট |
|---|---|---|---|---|
| সরকারি পুষ্করিণী উদ্যান ও ব্যক্তিগত মালিকানায় অধিকৃত পুষ্করিণী | ৫৪৯ | ১ | ৮ | ৩০ |
| রাস্তা ও গলির জন্য | ১৪৬৩ | ১৩ | ৮ | ৪০ |
| ভজন, পূজন ও আরাধনা স্থানের জন্য | ৯৩ | ৫ | ১ | ১৫ |
| শ্মশান ও গোরস্থানের জন্য | ৩২ | ১২ | ২ | ২৫ |
| মোট | ২১৩৮ | ১২ | ৫ | ১৯ |

| | বিঘা | কাঠা | ছটাক | ফুট |
|---|---|---|---|---|
| শহর কলিকাতার অধিকৃত এলাকা | ১০,৯৫৩ | ৯ | ৮ | ৪৪ |
| শহরের প্রয়োজনে ব্যবহার্য এলাকা | ২,১৩৮ | ১২ | ৫ | ১৯ |
| প্রাপ্ত জমি বাড়িঘর প্রভৃতির জন্য ব্যবহার হয়েছিল : | ৮,৮১৪ | ১৭ | ৩ | ২৫ |

প্রাপ্ত জমিতে বাড়িঘর নির্মাণের একটি তালিকাও পাওয়া যায় এই প্রতিবেদনে—

| | |
|---|---|
| ৫ তলা বাড়ি ছিল— | ১টি |
| ৪ তলা বাড়ি ছিল— | ২৬টি |
| ৩ তলা বাড়ি ছিল— | ৯৯৯টি |
| ২ তলা বাড়ি ছিল— | ৭৬৭৭টি |
| ১ তলা বাড়ি ছিল— | ৭২৭২টি |
| কুঁড়ে ঘর বা মাটির ঘর ছিল— | ৪২,৯১৪টি |

শক সাহেব এই সেন্সাস রিপোর্টে কেবলমাত্র শহর কলিকাতার জমিজমা ও বাড়িঘরের তালিকাই দেননি, সেই সঙ্গে শহর কলিকাতার রাস্তার নাম সংযুক্ত একটি তালিকাও প্রকাশ করেছিলেন। ওই তালিকা থেকে জানা যায় যে সেসময়ে শহরের রাস্তা ও গলির সংখ্যা সর্বসমেত ৪৩৮টি ছিল। তার মধ্যে শহরের দক্ষিণাঞ্চলে ছিল ১৮৫টি, আর উত্তরে ছিল ২৫৩টি, দক্ষিণের রাস্তার মোট দৈর্ঘ্য ছিল ২,২৮,৬৯৫ ফুট। আর উত্তরে ৩,৫০,০৮৩ ফুট। দক্ষিণের রাস্তার জন্য জমির প্রয়োজন হয়েছিল ৭০৫ বিঘা ৪ কাঠা ৯ ছটাক ৬ ফুট, আর উত্তরের জন্য ৭৭৮ বিঘা ৮ কাঠা ১৫ ছটাক ৩৬ ফুট। সে সময় দক্ষিণ দিকের রাস্তার গড় দৈর্ঘ্য ছিল ৪৪·৪০৫ ফুট, উত্তরে ছিল ৩২·০২ ফুট। শক সাহেবের প্রতিবেদনে ৯৩ নম্বর অনুচ্ছেদে শহর কলিকাতার রাস্তা ও গলির একটা সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপ :—

মোট রাস্তা ও গলির সংখ্যা—৪৩৮টি
উত্তর ও দক্ষিণ মিলিয়ে মোট রাস্তার দৈর্ঘ্য—৫,৭৮,৭৭৮ ফুট
মাইলের অনুপাতে রাস্তার দৈর্ঘ্য—১০৮ মাইল ৩২ পোল ১৩ ফুট
গড়পড়তা প্রস্থ—৩৮·২১২ ফুট

শক সাহেবের প্রতিবেদনে সেকালের শহর কলিকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের একটি সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। গার্ডেনরীচ, খিদিরপুর, আলিপুর, ভবানীপুর, এন্টালি, শিয়ালদহ, কাশীপুর প্রভৃতি শহরতলির অন্তর্ভুক্ত ছিল। ওই সব অঞ্চল থেকে প্রতিদিন প্রায় ৩০,০০০ লোক কাজের জন্য কলিকাতায় আসত। এ ছাড়া রেলগাড়িতে করে হাওড়ার দিক থেকে প্রায় ২০,০০০ হাজার লোক নানা কাজের ধান্দায় এই শহরে আসত। সেই সময় শহর কলিকাতায় মোট আগন্তুকের সংখ্যা ছিল ৫০,০০০ হাজারের মতো।

শহর কলিকাতার রাস্তাঘাটের সঙ্কীর্ণতার কারণে যানজটের ঝামেলার প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন শক সাহেব। তিনি তাঁর প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করেছেন যে শহরে সরু সরু রাস্তার ধারে পাটের কারখানা, রং-এর দোকান, তেলের কল, সাবান কারখানা প্রভৃতির মতো বিপদজনক ও অনিষ্টকারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থাকলে যে কোনও সময় অগ্নিকাণ্ড ঘটতে পারে। কিন্তু তা ঘটলে নির্বাপিত করার জন্য কোনও দমকল সেই পথে ঢুকতে পারবে না। শুধু তাই নয়, কলেজ স্ট্রিটের আগে পর্যন্ত কোনও সরকারি পুষ্করিণী নেই। যদিও এই অঞ্চলে ব্যক্তিগত মালিকানায় অনেক পুকুর আছে, কিন্তু সেগুলি নোংরা ডোবা ছাড়া কিছুই নয়, তা ছাড়া সেই ডোবার জলও অস্বাস্থ্যকর ও রোগ-জীবাণুতে ভর্তি।

শক সাহেবের প্রতিবেদন থেকে সেকালের শহর কলিকাতার এক সর্বাঙ্গীণ চিত্র পাওয়া যায়। পৌরসভার তত্ত্বাবধানে এইটি কলিকাতার প্রথম সেন্সাস রিপোর্ট। তাঁর এই প্রতিবেদনে কলিকাতার রাস্তাঘাটের সম্পূর্ণ নামেঝ তালিকা এই প্রথম প্রকাশিত হল। বর্তমান কলিকাতার রাস্তার নামের তালিকার সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে এই তালিকার মূল্য অপরিসীম।

# ১৯
# বস্তি গড়ে ওঠার পটভূমি

শক সাহেবের কলিকাতার প্রথম জনগণনার প্রতিবেদন প্রকাশিত হবার পর সরকার কলিকাতার উন্নতি ত্বরান্বিত করার জন্য আরও কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে পর পর কয়েকটি আইনও প্রণীত হয়। এই আইনের মাধ্যমে জাস্টিসদের হাতে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের জন্য অধিক ক্ষমতা দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের আইনে (The Act IX of 1867) প্রকল্প রূপায়ণের জন্য ৫৫ লক্ষ টাকা ঋণগ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া হয়। এই আইনে কলিকাতা শহরের বাড়িঘরের বার্ষিক মূল্যায়নের উপর শতকরা ৪% হিসাবে জলকর আরোপের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। ওই বছরের আরেকটি আইনে (The Act XI of 1867) শতকরা ৩% হিসাবে পুলিশকর বসাবার ক্ষমতা দেওয়া হয়।[১] ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের আরেকটি আইনে (The Act I of 1870) জলকরের হার বাড়িয়ে শতকরা ৫% করা হয়েছিল। ওই বছরে পৃথক একটি আইনে (The Act VIII of 1870) পৌরবাজার স্থাপনের জন্য ৬ লক্ষ টাকা ঋণগ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া হয়। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দের আইনে (The Act VI of 1871) পৌরসভা গঠনের কিছু পরিবর্তন করা হয়। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার জাস্টিসরা কলিকাতা শহরেরও জাস্টিস ছিলেন। এই আইনে তাঁদের কলিকাতা পৌরসভার সদস্যের মর্যাদা দেওয়া হয়। এরপর ১৮৭২ ও ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে আরও দুটি আইন প্রণীত হয়। উভয় আইনেই কলিকাতা পৌরসভার পরিকল্পনা রূপায়ণে অধিক পরিমাণে ঋণগ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া হয়। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে নতুন একটি আইনে পূর্বের সব আইন বাতিল হয়ে যায়। এই নতুন আইনে পৌর কমিশনারের সংখ্যা ৭২ করা হয়। এর মধ্যে $\frac{২}{৩}$ অংশ করদাতাদের দ্বারা নির্বাচিত হবে। বাকিদের সরকার মনোনীত করবেন। এই আইনে নতুন ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কয়েকটি ধারা সন্নিবেশিত হয়েছিল—পৌর ঋণ গ্রহণের জন্য সুদ দেবার বিধান, পুলিশ বাহিনী প্রতিপালনের জন্য সংরক্ষিত তহবিলের সংস্থান, সমস্ত শহরে ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করা, শহর থেকে আবর্জনা অপসারণের সুষ্ঠু ব্যবস্থা ও পানীয় জল সরবরাহের প্রসার।

এইসব আইন প্রণয়নের ফলে শহর কলিকাতায় ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী, আবর্জনা অপসারণ ও পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা ধীরে ধীরে সারা শহরে প্রসারিত হতে থাকে। ১৮৬৬ থেকে ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কলিকাতায় অনেকগুলি রাজপথ নির্মাণ ও সংস্কারের খোঁজ পাওয়া যায়। ওই সব রাজপথ নির্মাণ সম্বন্ধে খুব সংক্ষেপে কিছু বলা হবে।

প্রথমেই মুরগিহাটা স্ট্রিটের কথা। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে এই রাস্তাটির সংস্কার, উন্নতি ও জমি অধিগ্রহণ নিয়ে মোট ব্যয় হয় ২,৯৪,৬৫২ টাকা। সেকালের আলু গুদামের মধ্য দিয়ে জ্যাকসন ঘাট স্ট্রিট পর্যন্ত রাস্তাটি প্রসারিত হয়েছিল। সংস্কার ও প্রশস্ত করার পর রাস্তাটির পুরানো নাম বদলে ভারতের প্রথম ভাইসরয় ও গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং-এর নামে নামাঙ্কিত করা হয়।

ওই বছর (১৮৬৬) ৪,৭০,০০০ টাকা ব্যয়ে আরও দুটি সড়ক নির্মাণের ব্যবস্থা করা হয়। একটি নিমতলা ঘাট স্ট্রিট এক্সটেনশন, এটিকে প্রসারিত করে সারকুলার রোড পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে রাজপথটি যান চলাচলের জন্য মুক্ত করা হয়। গভর্নর জেনারেল বিডনের নামে রাস্তাটির নামকরণ করা হয় বিডন স্ট্রিট। দ্বিতীয় রাজপথটি ক্লাইভ রো। রাস্তাটি নির্মাণে জমির

প্রয়োজন হয়েছিল ১ বিঘা ১১ কাঠা ১৩½ ছটাক। মূল্য ধার্য হয়েছিল ২৯,৫৬৮ টাকা। সেকালের ধনী বাবু ব্রজবন্ধু মল্লিক এই রাস্তা নির্মাণে আরও ১৮ কাঠা ১০ ছটাক জমি দান করেন। তার মূল্য ছিল ৩৬,০০০ টাকা। এই বছরে রামহরি মিস্ত্রী লেন চওড়া করার ব্যবস্থা হয়। তার জন্য ১৬,৩৪০ টাকা মূল্যের জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। এই সব রাস্তা ছাড়াও বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, ওল্ড চায়না বাজার স্ট্রিট, জানবাজার লেন প্রভৃতি রাস্তা সংস্কারের ব্যবস্থা করা হয়। শুধু তাই নয়, জানবাজার ফোর্থ লেনকে সংস্কার ও প্রশস্ত করে ধর্মতলা স্ট্রিট ও ফ্রী স্কুল স্ট্রিটের সংযোগকারী সড়ক করে দেওয়া হয়। এর ফলে ফ্রী স্কুল স্ট্রিট থেকে ধর্মতলা স্ট্রিট পর্যন্ত সোজাসুজি প্রশস্ত রাজপথ হয়ে যায়।

বহু পুরাতন একটি পুষ্করিণী সংস্কারও এই বছরে করা হয়। দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রিটে অবস্থিত ব্ল্যাকওয়ার পুষ্করিণীটি প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে মজা পুকুরে পরিণত হয়েছিল। সে সময় এটিকে রোগজীবাণুর সূতিকাগার বলা হত। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে সংস্কারের পর এটি একটি বিশুদ্ধ পানীয় জলের পুকুরে পরিণত হয়। এখানে ৩৭টি সোপান যুক্ত একটি পাকাঘাট নির্মাণ করে দেওয়া হয়।

১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে চিৎপুর রোড ও বিডন স্ট্রিটের সংযোগস্থলে একটি বৃহৎ আকারের বস্তি উচ্ছেদ করে একটি উদ্যান নির্মাণ করা হয়। তার জন্য ব্যয় হয়েছিল ৩ লক্ষ টাকা। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে গভর্নর জেনারেল বিডনের নামে উদ্যানটি নামাঙ্কিত হয় বিডন উদ্যান। এই বছরে উদ্যানে ৬০০০ বৃক্ষ রোপণ করা হয়, তার মধ্যে ৩৫ প্রকারের ফুলের গাছ, ৪০ রকমের গোলাপ গাছ ও ১২ জাতের তালগাছ লাগানো হয়েছিল। বাগানে গ্যাসের আলো ও জলের ব্যবস্থাও ছিল। এক কথায় বলা যায় এটি স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য ছিল এক সুরম্য উদ্যান।

১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে আরও কয়েকটি রাস্তার সংস্কার ও উন্নতি করা হয়েছিল—সেগুলি মট লেন, তালতলা বাজার স্ট্রিট, জ্যাকসন ঘাট স্ট্রিট, জানবাজার ফিফ্‌থ্ লেন প্রভৃতি।

১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে শহর কলিকাতায় সর্বপ্রথম সংখ্যাসূচক গৃহ নির্দেশিকা প্রবর্তন (Numbering of Buildings) করা হয়। এদিকে শহর কলিকাতায় গৃহের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াতে ওই ব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে নতুন করে সংখ্যাসূচক গৃহ নির্দেশিকা প্রবর্তিত হয়।

১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে দর্পনারায়ণ ঠাকুর স্ট্রিটের সংস্কারের ব্যবস্থা করা হয়। এর ব্যয়ভার বহন করেন বাবু সুবল দাস মল্লিক। ওই বছরই পৌর বাজার নির্মাণের জন্য জানবাজার স্ট্রিট ও লিন্ডসে স্ট্রিটের মধ্যে ২৪ বিঘা ১৯ কাঠা ৩ ছটাক এলাকার এক বিরাট বস্তি অধিগ্রহণ করা হয়। স্থপতিদের কাছ থেকে বাজার নির্মাণের একটি নক্সা আহ্বান করা হয়। মনোনীত নক্সা প্রস্তুতকারীকে ১০০০ টাকা পারিতোষিক দেবার কথা ঘোষণা করা হয়। ২১টি নক্সা পাওয়া গিয়েছিল, তার মধ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির স্থপতি মিঃ আর আর বায়ানের (Mr. R. R. Bayan) নক্সা মনোনীত হয়। তাঁকেই পুরস্কৃত করা হয়। বাজার নির্মাণের ব্যয় ধরা হয়েছিল ৩ লক্ষ টাকা এবং মেসার্স বার্ন এ্যান্ড কোং'র সঙ্গে চুক্তি করে বাজার নির্মাণের ভার দেওয়া হয়। পৌর বাজার নির্মাণের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য সরকার ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে নতুন একটি আইন (The Act VIII of 1871) প্রণয়ন করেন। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে ৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাজারের নির্মাণকার্য সম্পন্ন হয়। কালে এটি নিউ মার্কেট এবং আরও পরে, হগ মার্কেট নামে পরিচিতি লাভ করে।

১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে মুক্তারাম বাবু স্ট্রিটের উন্নতি ও সংস্কার কার্য হাতে নেওয়া হয়। রাস্তাটি ছিল অতি সংকীর্ণ ও আঁকাবাঁকা। কাজটি রূপায়ণের জন্য ১৮ কাঠা জমি ৭,২৪৫ টাকায় অধিগ্রহণ করা হয়।

১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে পঞ্চম ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালীর উপর নতুন একটি সড়ক নির্মিত হয়। এটি চিৎপুর রোড থেকে সারকুলার রোড পর্যন্ত বিস্তৃত। রাস্তাটি নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল ২০ বিঘা ৯ কাঠা, মূল্য ছিল ২,৬৮,০০০ টাকা। রাস্তা নির্মাণের পর অতিরিক্ত জমি বিক্রি করে ৭৩,০৪৭ টাকা পাওয়া গিয়েছিল। ফুটপাথ নিয়ে রাস্তাটির প্রস্থ ৫০ ফুট। বাংলার ছোটলাট স্যার উইলিয়াম গ্রে'র নামে রাস্তাটি নামাঙ্কিত করা হয়। এটি গ্রে স্ট্রিট নামে পরিচিত। ওই বছরই লিন্ডসে স্ট্রিটকে প্রশস্ত করা হয়। এর জন্য যে জমির প্রয়োজন হয়েছিল তা Mr. Elias S. Gubboy বিনামূল্যে

দিয়েছিলেন।

১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের শহর কলিকাতার জাস্টিসেস অফ পিস্-দের এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে সে সময় শহরে পাকা রাজপথের মোট দৈর্ঘ্য ছিল ১০৬$\frac{১}{২}$ মাইল, তার মধ্যে ২৭$\frac{১}{২}$ মাইল পাথর দিয়ে বাঁধানো এবং ৭৯ মাইল ইট নির্মিত রাস্তা। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দের পৌরসভার Administration Report থেকে জানা যায় যে ওই সময় শহর কলিকাতায় মোট রাস্তার দৈর্ঘ্য ছিল ১৩১$\frac{১}{২}$ মাইল, তার মধ্যে ৮১$\frac{১}{২}$ মাইল পাথর নির্মিত আর ৫০ মাইল ইট দিয়ে তৈরি। ১৮৬৪ থেকে ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দ অর্থাৎ এই ১২ বছরের মধ্যে ২৯ মাইল ইটের রাস্তা পাথর দিয়ে বাঁধিয়ে দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল।

পৌরসভার ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত Administration Report থেকে সেকালের পৌরসভার অধীনে ১৬টি উদ্যান সমেত পুষ্করিণীর একটি তালিকা পাওয়া যায়—(১) ডালহৌসি স্কোয়ার, (২) বিডন স্কোয়ার, (৩) কর্নওয়ালিস স্কোয়ার, (৪) মির্জাপুর স্কোয়ার, (৫) কলেজ স্কোয়ার, (৬) ওয়েলিংটন স্কোয়ার, (৭) ওয়েলেসলি স্কোয়ার, (৮) ভিক্টোরিয়া স্কোয়ার, (৯) ট্রায়াঙ্গুলার স্কোয়ার, (১০) শর্টবাজার স্কোয়ার, (১১) ঝাউতলা স্কোয়ার, (১২) অকল্যান্ড স্কোয়ার, (১৩) গোরস্থান স্কোয়ার, (১৪) মসজিদ স্কোয়ার, (১৫) ব্ল্যাকওয়ার স্কোয়ার ও (১৬) পাঁচকুঠিয়া স্কোয়ার। শহরবাসীর পানীয় জল সমস্যা দূর করার জন্য সরকারের উদ্যোগে এই সব পুষ্করিণী খনন করা হয়েছিল।

ওই বছরের Administration Report থেকে সেকালের গ্রামীণ কলিকাতার জমি বণ্টনের মাধ্যমে অসংখ্য বস্তি গড়ে ওঠার চিত্র স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছে। জমির মালিকগণ তাদের অধীনস্থ প্রজাদের লীজ দলিলের মাধ্যমে জমি বণ্টন করত। জমি গ্রহীতারা নিজেদের সুবিধামত যত্রতত্র কুঁড়েঘর নির্মাণ করত। কলিকাতায় বস্তির সংখ্যা এইভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। জমির মালিকগণ এই প্রকার বস্তি নির্মাণের উপর কোনও নিয়ন্ত্রণ রাখার প্রয়োজন বোধ করত না। এর ফলে রাস্তাঘাটের সমস্যা, জনস্বাস্থ্যের ক্রমাবনতি প্রভৃতি পৌর সমস্যা দেখা দিতে থাকে। পৌরসভা এই সমস্যার প্রতিবিধানের জন্য হেলথ অফিসার Dr. Tonnerre ও পৌর সচিব Mr. Clark-কে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটির সদস্যবৃন্দ অবহিত হন যে জমির মালিকগণ অতি উচ্চ ভাড়ায় এই সব জমি প্রজাবিলি করত। পরে এখানে কুঁড়েঘর নির্মাণ করে দরিদ্র লোকেদের বসবাসের জন্য ভাড়া দেওয়া হত। জমির মালিকগণ ভাড়া আদায় করা ছাড়া এলাকার উন্নতির জন্য বস্তির মধ্যে রাস্তাঘাটের ব্যবস্থা, পানীয় জল সরবরাহ, পয়ঃপ্রণালী, জঞ্জাল অপসারণ প্রভৃতি বিষয়গুলি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকত। এদিকে পৌরসভাকে শহর কলিকাতার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বস্তিবাসীদের পূর্ণ পৌরসেবার সুযোগ সুবিধা দিতে গেলে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তা পৌর কোষাগারে ছিল না। তাই কমিটি সুপারিশ করেছিলেন যেহেতু জমিদারগণ জমির খাজনাদি ভোগ করে থাকে, তাই বস্তি-সেবার প্রয়োজনীয় বিধিগুলি তাদেরই কার্যকর করা উচিত। আর প্রজারা কেবলমাত্র তাদের প্রতিদিনের আবর্জনা অপসারণের ব্যবস্থা করবে।

পৌরসভার "Model Village" স্থাপনের প্রয়াসের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে কমিটি মন্তব্য করেছিলেন—

> "We do propose to consider that having regard to the large necessary expenditure which must be faced, it is our unanimous opinion that utopian idea of model villages should not be insisted upon. All that should be now demanded from the owners of property in town is that they should take such action for the improvement of the land as shall meet reasonable and moderable sanitary requirement."[২]

বিশেষ কমিটির প্রতিবেদনে এই কথাটির উপরেই জোর দেওয়া হয়েছে যে জমির মালিকদের উদাসীনতার ফলে শহর কলিকাতায় যত্রতত্র বস্তি গড়ে উঠে শহরের পরিকাঠামোর বিন্যাসের ভারসাম্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। কিন্তু ওই সময় সরকার ও পৌরসভা আইনের মাধ্যমে জমিবণ্টনের ধারাগুলিকে যদি নিয়ন্ত্রণ করতেন, তাহলে গোড়াতেই একটা সুষ্ঠু ও স্বাস্থ্যসম্মত প্রণালীতে বস্তি গড়ে

উঠত। শহর উন্নতির পরিকাঠামোকে এইভাবে বিঘ্নিত করত না। পরবর্তীকালে পৌরসভা বহু অর্থ ব্যয় করে বস্তি উচ্ছেদ করে, আবার কোথাও বা মডেল বস্তি নির্মাণ করে এই সমস্যা সমাধানে অগ্রণী হয়েছিলেন। কিন্তু তা ফলপ্রসূ হয়নি। বিশেষ কমিটি এই দিকে সম্যক দৃষ্টি দিলে বস্তি সমস্যা এত গভীরে যেতে পারত না, বরং গ্রামীণ কলিকাতা থেকে শহরে রূপান্তরিত হবার সময় আধুনিক বিন্যাসের বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রকাশিত হত।

**তথ্যসূত্র**

১ Beverley's Report, pp. 53-54

২ Report of the Special Committee appointed by the Justices during 1875 headed by Dr. Tonnerre & Mr. Clark.

## ২০
# কলিকাতার জনগণনা ও বিভার্লির প্রতিবেদন

১৮৭৬ খ্রিঃ কলিকাতা পৌরসভা শহর কলিকাতার পুনরায় জনগণনার ব্যবস্থা করেন। এই কাজের জন্য কমিশনার এইচ. বিভার্লিকে (Mr. H. Beverley) কলিকাতা পৌরসভা ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে নিযুক্ত করেন। তিনি ওই বছরের ৬ই এপ্রিল জনগণনা শুরু করেন এবং ১৪ই আগস্ট, ১৮৭৬ খ্রিঃ পৌরসভার চেয়ারম্যান ও কমিশনারদের কাছে তাঁর প্রতিবেদনটি দাখিল করেন। এখানে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে—১৮৭১-৭২ খ্রিঃ ব্রিটিশ ইন্ডিয়ায় জনগণনার সময় কলিকাতা পৌরসভাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, নতুন করে পুনরায় কলিকাতার জনগণনার প্রয়োজন হল কেন ? বিভার্লি সাহেব এই প্রশ্নটির উপরও আলোকপাত করেছেন। তাঁর মতে, কলিকাতার জনগণনার সার্বিক চিত্র ওই প্রতিবেদনে পরিস্ফুট হয়নি। তা ছাড়া কলিকাতার জনস্বাস্থ্য, কলিকাতার শাসন ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে কোনও তথ্যনির্ভর তত্ত্ব পাওয়া যায়নি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে কলিকাতা সম্পর্কীয় ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের জনগণনার কাগজপত্র নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এই সব বিবেচনা করে ১৮৭৬ খ্রিঃ কলিকাতার জন্য পুনরায় জনগণনার ব্যবস্থা করেন কলিকাতা পৌরসভা।

বিভার্লি সাহেবের জনগণনার প্রতিবেদন (Census Report) নানা কারণে ঐতিহাসিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। এই সময় শহর কলিকাতা ১৮টি ওয়ার্ডে (থানাভিত্তিক) বিভক্ত হয়েছিল। তিনি কেবল শহরের জনগণনা করেই ক্ষান্ত থাকেননি, প্রতিটি ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের জাতিগত পেশা, ধর্ম, তাদের আবালবৃদ্ধবনিতার সংখ্যা প্রভৃতি দিয়ে তাঁর প্রতিবেদনকে সমৃদ্ধ করেছেন। এর ফলে কোনও ওয়ার্ডে কোনও ধর্ম ও পেশার কত লোক বাস করে তা সহজেই চিহ্নিত করা যায়। সেকালের শহর কলিকাতায় পেশা অনুযায়ী মহল্লার যে স্বীকৃতি ছিল, যেমন জেলেপাড়া, কাঁসারীপাড়া, পালপাড়া, ছুতোর পাড়া, আহিরিটোলা, কুমারটুলি প্রভৃতি—তার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায় এই প্রতিবেদনে। শহর কলিকাতার কোন কোন এলাকায় কী কী ব্যবসায়ের প্রচলন ছিল তারও এক স্পষ্ট চিত্র তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন।

জমি বণ্টনের অসম নীতির ফলে কলিকাতায় যে অসংখ্য বস্তি গড়ে ওঠে সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। বিভার্লি সাহেব ওয়ার্ডভিত্তিক একটি বস্তির তালিকা প্রণয়ন করেছিলেন, সেটিকে ওই প্রতিবেদনের সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন। এই তালিকা থেকে শহর কলিকাতায় মোট বস্তির সংখ্যা, কোন রাস্তায় বস্তিগুলি অবস্থিত, প্রতিটি বস্তিতে স্ত্রী পুরুষের মোট সংখ্যার পরিমাণ নির্দেশ করা হয়েছে। এ ছাড়া সারা শহরে মোট বাজারের সংখ্যা, তাদের অবস্থান, মালিকের নাম, কী কী জিনিস বাজারে বেচাকেনা হয় সে সম্বন্ধে এক বিস্তারিত তথ্যও দেওয়া হয়েছে। ওয়ার্ডভিত্তিক উপাসনালয়ের তালিকা, সরকারি শিক্ষালয়, সরকারি অনুদান প্রাপ্ত শিক্ষালয়, পাঠশালা প্রভৃতির তালিকাও দেওয়া আছে।

বিভার্লি সাহেবের প্রতিবেদনের এক মহান অবদান হল শহর কলিকাতা গড়ে ওঠার এক তথ্যভিত্তিক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এ ছাড়া শহর কলিকাতার একটি মানচিত্র সংযোজন করে এই প্রতিবেদনকে আরও মূল্যবান করা হয়েছে। সে সময় কলিকাতায় যে সব রাস্তাঘাট তৈরি হয়েছিল সেগুলি সবই পরিস্ফুট করা আছে এই মানচিত্রে (পরিশিষ্ট ৭ দ্রষ্টব্য)।

বিভার্লি সাহেব ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের আইনে (The Calcutta Municipal Consolidation Act, 1876) বর্ণিত শহর কলিকাতার নির্দিষ্ট পরিসীমাকে ভিত্তি করে জনগণনার কাজ আরম্ভ করেন। ওই আইনে কলিকাতার সীমানা এইভাবে নিরূপণ করা হয়েছিল : "...include all places within the local limits of the ordinary Original Civil Jurisdiction of the High Court of Judicature at Fort William, but not (a) Fort William, (b) the Esplanade, or (c) Coolie Bazar, now called Hastings, except such portion as is bounded on the north by Clyde Row, on the south by Tolly's Nullah, on the east by the road leading from Kidderpore Bridge to Clyde Row and on the west by the Strand Road." অর্থাৎ শহর কলিকাতার সীমানা হল কলিকাতা হাইকোর্টের দেওয়ানি বিভাগের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল। এ থেকে ফোর্ট উইলিয়াম এলাকা, এসপ্লানেড ও কুলিবাজার (এখন যাকে হেস্টিংস বলে) অঞ্চল বাদ যাবে। হেস্টিংসের নীচে বর্ণিত সীমানার মধ্যের অংশটুকু শহর কলিকাতার অন্তর্ভুক্ত থাকবে—উত্তরে ক্লাইড রো, দক্ষিণে টালিনালা, পূর্বে খিদিরপুরের সেতু থেকে যে পথটি ক্লাইড রো পর্যন্ত প্রসারিত এবং পশ্চিমে স্ট্র্যান্ড রোড। শহর কলিকাতার সীমানার এই সংজ্ঞা থেকে শহরের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের একটা আভাস দেওয়া হয়েছে। তাতে দেখা যায় যে উত্তর থেকে দক্ষিণে শহরের বিস্তৃতি হল ৪$\frac{১}{২}$ মাইল, আর প্রসার হল ১$\frac{১}{২}$ মাইল। কেবল শহর কলিকাতাই নয়, শহরতলির প্রতিও তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়েছেন। কলিকাতার শহরতলি ক্রমশ ঘন বসতিপূর্ণ হয়ে উঠছিল। তিনি তাঁর প্রতিবেদনে সেগুলির পরিচয় দিয়েছেন এবং তাঁর মানচিত্রে সেগুলি সন্নিবেশিত করেছেন। তা হল—চিৎপুর, কাশীপুর, উল্টাডিঙ্গি, বাহির মানিকতলা, বাহির সিমলা, নারিকেলডাঙা, শিয়ালদহ, এন্টালি, বালিগঞ্জ, ভবানীপুর, আলিপুর ও খিদিরপুর।

১৮৫০ খ্রিঃ সীম সাহেব শহর কলিকাতার প্রথম জনগণনা ও জরিপ করেন। সে সময় কলিকাতার আয়তন ছিল ৭ বর্গ মাইল ৫১৬ একর ৩ রুড ১৩ রড ২৮ গজ অর্থাৎ ৭·৮০৭৫ বর্গ মাইল। বিভার্লি সাহেবের জরিপে কলিকাতার আয়তন পাওয়া গিয়েছিল ৫০৩৭ একর অর্থাৎ ৭ বর্গ মাইল ৫৫৭ একর ২৩ রড ২৮ গজ। ১৮৫০ খ্রিঃ ও ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের দুই জরিপের ব্যবধানে শহর কলিকাতার আয়তন ৪০ একরের মতো বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। জোড়াবাগান ও বড়বাজার ওয়ার্ডের সীমান্তবর্তী গঙ্গার ধারে পলিজমা নতুন জমি উদ্ধার এই বৃদ্ধির কারণ বলে স্থির করা হয়েছে। এই জমির উপরই স্ট্র্যান্ড ব্যাঙ্ক রোড নির্মিত হয়েছিল।

বিভার্লি সাহেব জরিপের সময় শহর কলিকাতার আয়তনকে দু' ভাগে বিভক্ত করে দেখিয়েছেন—

(১) শহর কলিকাতা
(২) কলিকাতা পৌরসভার শাসনাধীন কলিকাতা

| | | |
|---|---|---|
| শহর কলিকাতার মোট আয়তন— | | ৫০৩৭ একর |
| কলিকাতা পৌরসভার অধিকৃত এলাকা— | | ৩৭৫৪ " |
| | | ১২৮৩ " |
| ১২৮৩ একর জমির মধ্যে | | |
| ফোর্ট উইলিয়ম অধিকৃত এলাকা | ... | ১৭২ একর |
| এসপ্লানেড এলাকা ও টালিনালার আংশিক এলাকা | ... | ১১১১ " |
| | | মোট ১২৮৩ " |

বিভার্লি সাহেব শহর কলিকাতার তুলনামূলক জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটি পরিসংখ্যান দিয়েছেন—

| | ১৮৬৬ শক সাহেবের জনগণনা | ১৮৭২ ব্রিটিশ ভারতের জনগণনা | ১৮৭৬ বিভার্লি সাহেবের জনগণনা |
|---|---|---|---|
| শহর কলিকাতা (Town Proper) — | ৩,৫৮,৬৬২ | ৪,২৮,৪৫৮ | ৪,০৯,০৩৬ |
| ফোর্ট উইলিয়াম— | ৩,৮৭৮ | ২,৪৮৩ | ২,৮০৩ |
| বন্দর এলাকা— | ১৫,৩৮৪ | ১৬,৬৬০ | ১৭,৬৯৬ |
| মোট | ৩,৭৭,৯২৪ | ৪,৪৭,৬০১ | ৪,২৯,৫৩৫ |

১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দের জনগণনায় উত্তর কলিকাতার জনসংখ্যা ছিল ২,৪১,৭৯০ জন আর দক্ষিণ কলিকাতার ১,১৬,৮৭২। বিভার্লি সাহেবের প্রতিবেদনে দেখা যায় উত্তরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২,৮২,৩৬২ ; ওই সময় দক্ষিণের ১,২৬,৬৭৪ জন। তুলনামূলক বিচারে উত্তরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অধিক।

১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের পৌর আইনে শহর কলিকাতাকে ১৮টি থানায় বিভক্ত করা হয়। প্রতিটি থানা একটি করে পৌর ওয়ার্ড (Ward) রূপে চিহ্নিত হয়।

| ওয়ার্ডের সংখ্যা | থানার নাম | ওয়ার্ডের সংখ্যা | থানার নাম |
|---|---|---|---|
| ১ নং | শ্যামপুকুর | ১০ নং | বৌবাজার |
| ২ ” | কুমারটুলি | ১১ ” | পদ্মপুকুর |
| ৩ ” | বটতলা | ১২ ” | ওয়াটারলু স্ট্রিট |
| ৪ ” | সুকিয়া স্ট্রিট | ১৩ ” | ফেনিক বাজার |
| ৫ ” | জোড়াবাগান | ১৪ ” | তালতলা |
| ৬ ” | জোড়াসাঁকো | ১৫ ” | কলিঙ্গ |
| ৭ ” | বড়বাজার | ১৬ ” | পার্ক স্ট্রিট |
| ৮ ” | কলুটোলা | ১৭ ” | বামুন বস্তি |
| ৯ ” | মুচিপাড়া | ১৮ ” | হেস্টিংস |

বিভার্লি সাহেব তাঁর প্রতিবেদনের সহিত যুক্ত কলিকাতার মানচিত্রে থানাভিত্তিক ওয়ার্ডগুলি সন্নিবেশিত করেছেন। থানাভিত্তিক পৌর ওয়ার্ডের রূপরেখায় কলুটোলা ওয়ার্ডে জনবসতি সর্বাধিক। এর পরেই কুমারটুলি, জোড়াবাগান ও বৌবাজার ওয়ার্ড। তারপর আসছে জোড়াসাঁকো, মুচিপাড়া ও ফেনিক বাজার। তুলনামূলক বিচারে শ্যামপুকুর, বটতলা ও সুকিয়া স্ট্রিটের জনসংখ্যা বিশেষ বৃদ্ধি পায়নি। দক্ষিণ দিকে কলিঙ্গ ও তালতলা অঞ্চলে এদেশীয় বাসিন্দারা থাকলেও চৌরঙ্গী ও পার্ক স্ট্রিট এলাকা ইউরোপীয় অধ্যুষিত অঞ্চল বলে চিহ্নিত হয়েছিল। এখানকার জনসংখ্যা ছিল খুবই কম।

## বিভার্লির প্রতিবেদন—ওয়ার্ডগুলির বৈশিষ্ট্য ও নামের তাৎপর্য

বিভার্লি সাহেব তাঁর প্রতিবেদনে প্রতিটি ওয়ার্ডের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য ও নামের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর এই বিশ্লেষণ থেকে সেকালের গ্রামীণ কলিকাতার শহরে রূপান্তরের চিত্রটি স্পষ্ট রূপে প্রতিফলিত হয়েছে। ২নং ওয়ার্ডের শুরু উত্তরে কুমারটুলি থেকে। অঞ্চলটি চিৎপুর রোড ও হুগলি নদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত। ১৭৫৭ খ্রিঃ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নির্দেশে এক একটি পেশায় নিয়োজিত শিল্পী ও কারিগর শ্রেণীর লোকেরা তাদের জন্য সংরক্ষিত অঞ্চলে বসবাস করতে শুরু করে। কুমোরগণ এই অঞ্চলে বসবাস করত বলে এ অঞ্চলের নাম হয়েছিল কুমারটুলি। "টোলা" টুলির মতো একই অর্থ বহন করে। কারও কারও মতে "টুলি"-যুক্ত এলাকার অর্থ হচ্ছে কারিগর বা দোকানদার যেখানে সাময়িক আস্তানা নেয়, স্থায়ীভাবে বসবাস করে না। কুমারটুলির মতো আরও কয়েকটি টুলি ও টোলা যুক্ত এলাকা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে শহর কলিকাতায়—ডোমটুলি (Domtooly), গোয়ালটুলি, নিহারিটুলি (Niharitooly), নৈয়াটুলি, কসাইশোলা জেলেটোলা, কলুটোলা, আহিরিটোলা, বেনিয়াটোলা, কম্বুলিয়াটোলা, কাপালীটোলা, ব্যাপারীটোলা, শাঁখারিটোলা প্রভৃতি।

পুনরায় কুমারটুলির কথায় ফিরে আসা যাক। কুমোরদের কাজের জন্য শহরের বাইরে থেকে নৌকা করে মৃত্তিকা বয়ে আনা হত। তাই দিয়ে কুমোররা মূর্তি, হাঁড়ি, কলসী প্রভৃতি গড়ত। আর কুমারটুলিতে নদীর ধারে দেশীয় ব্যবসায়ীরা বাস করত। তারা পূর্ববঙ্গের পাট, ধান ও অন্যান্য শস্যের আমদানি ও ব্যবসা করত। এখানে অনেক পাকা বাড়ি থাকলেও দোকানদার, মাঝি ও বারবণিতারা বস্তি বাড়িতে বাস করত।

কুমারটুলি ওয়ার্ডের নীচের দিকে "হাটখোলা"। এটি সম্ভবত কলিকাতার সবচেয়ে প্রাচীন স্থান। এক সময় গ্রাম সুতানুটি এখানে অবস্থিত ছিল। জোব চার্নকের নেতৃত্বে ইংরেজরা এখানেই প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। হাটখোলার পুরো নাম ছিল "সুতানুটি হাটখোলা"। এখানে যে বাজার ছিল সেইটিও সুতানুটি-হাটখোলা বাজার নামে পরিচিত ছিল। কলিকাতার রাজস্বের ওপর হলওয়েল সাহেবের প্রতিবেদনে সুতানুটি ও হাটখোলা দুটি নামের উল্লেখ আছে। তিনি আরও উল্লেখ করেছিলেন যে ১৭৩৮ খ্রিঃ থেকেই সুতানুটি ও শোভাবাজারের অস্তিত্ব ছিল, এই বাজার দুটি পরস্পরের নিকটবর্তী ছিল, একই ব্যক্তিকে ইজারা দেওয়া হয়েছিল। এই সব বিবিধ সুযোগসুবিধা থাকায় ইংরেজরা সুতানুটিতে উপনিবেশ স্থাপনে মনস্থ করেছিলেন। প্রাইস সাহেব (Mr. Price) তাঁর "Observation"-এ লিখেছেন, "...that one reason why the English settled at Calcutta was that it was situated near to several populous villages filled with cloth manufacturers. The Sets and Bysaks, who figure so largely in the early history of Calcutta, belong to the weaver caste."

কুমারটুলি ওয়ার্ডের দক্ষিণে ছিল জোড়াবাগান ওয়ার্ড (৫নং)। কলিকাতার বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তিদের আবাসভবন ছিল জোড়াবাগানের উত্তর অংশে, তাঁরা হলেন ঠাকুর, মল্লিক ও ঘোষ পরিবার। এটিও ঘন বসতিপূর্ণ অঞ্চল। জোড়াবাগান ওয়ার্ডের মধ্যে টাঁকশাল ও স্ট্র্যান্ড ব্যাঙ্ক রোড অবস্থিত। এই

অঞ্চলের দক্ষিণ দিকে পশ্চিমা ব্যবসায়ীরা বসবাস করে। এখানকার বাসগৃহ সবই পাকা।

এর পরই দুটি ওয়ার্ড—একটি বড়বাজার (৭নং ওয়ার্ড), অপরটি ওয়াটারলু স্ট্রিট (১২নং ওয়ার্ড)। বড়বাজারের অস্তিত্ব ১৭৩৮ খ্রিস্টাব্দেও দেখা যায়। এই দুই ওয়ার্ডই এককালে ইউরোপীয় অধ্যুষিত অঞ্চল ছিল। বর্তমানে শহর কলিকাতার প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র। দিনের বেলায় এই অঞ্চল যেমন কর্মকোলাহলে মুখরিত থাকে ; রাত্রিবেলায় থাকে প্রায় নৈঃশব্দ্য—কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় লোকের অবস্থিতির কারণে। লন্ডন শহরের মতো কলিকাতার এই বিখ্যাত বাণিজ্যিক পীঠস্থানে দারোয়ান ও রক্ষীবাহিনী তাদের প্রভুদের ব্যবসা কেন্দ্রগুলি সারা রাত জেগে নজরদারি করে। এই এলাকার অন্তর্ভুক্ত—আর্মেনিটোলা, নিহারীটোলা, আমড়াতলা, ডোমটুলি।

কলিকাতার পূর্বদিকে ছড়িয়ে আছে তিনটি ওয়ার্ড—জোড়াসাঁকো (৬নং ওয়ার্ড), কলুটোলা (৮নং ওয়ার্ড) ও বহুবাজার (১০নং ওয়ার্ড)। বিভার্লি স্বীকার করেছেন যে তিনি জোড়াবাগান ও জোড়াসাঁকো নামের বুৎপত্তি উদ্ধারে সফল হননি। কলুটোলা সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, এ অঞ্চলে গোড়ার দিকে কলুরা বাস করত, তৈল বীজ থেকে তৈল নিষ্কাশনই তাদের পেশা ছিল। পরবর্তীকালে বাধ্য হয়ে পূর্বদিকে চলে গেছে। বর্তমানে তারা সুকিয়া স্ট্রিট ওয়ার্ডে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

"বহু" অর্থ হল অনেক, বহুবাজার গড়ে উঠেছে অনেক বাজারের সমন্বয়ে। শোনা যায় মতিলাল পরিবারের পারিবারিক সম্পত্তি বাঁটোয়ারার সময় একটি বাজার বাড়ির কোনও এক বধূর ভাগে পড়ে। তাই থেকেই "বউবাজার" হয়েছে। হলওয়েল সাহেব তাঁর পুস্তকে এ সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ করেননি।

জনগণনার দিক থেকে এই তিনটি ওয়ার্ডকে শহর কলিকাতার হৃৎপিণ্ড বলা যেতে পারে। এই অঞ্চলে একদিকে যেমন আরমেনিয়ান, ইহুদি এবং পার্শিরা বাস করেন, অন্যদিকে মধ্য, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের অসংখ্য ব্যবসায়ী বাস করেন। কলুটোলা ও বহুবাজারে চীনে, মগ অধিক সংখ্যায় বাস করে। এই অঞ্চলটিকে ইন্ডো-পর্তুগীজ ও পূর্ব-ভারতীয়দের আবাসভূমি বলে চিহ্নিত করা যায়। কলুটোলাতে অনেকগুলি বড় বস্তি আছে। এখানকার বাসিন্দাদের ৬৮ ভাগই এই বস্তির কুঁড়েঘরে বাস করে। অনুরূপভাবে বহুবাজারে আছে অসংখ্য কুঁড়েঘর, পর্তুগীজ ও মগেরা এখানে বসবাস করে।

এই তিনটি ওয়ার্ডের মধ্যে পড়ে—রামবাগান, সিমলা, কাঁসারীপাড়া, চোরবাগান, মেছুয়াবাজার, জেলেটোলা, সুরতিবাগান, পটলডাঙা, চীনে পাড়া, চুনামগলি, মলঙ্গা, নলপুকুর, ব্যাপারীটোলা।

শহরের উত্তর-পূর্ব দিকের ওয়ার্ডের জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি নয়। এই অঞ্চলে পড়ে শ্যামপুকুর ওয়ার্ড (১নং)। এরই অন্তর্ভুক্ত বাগবাজার ও শ্যামবাজার। হলওয়েল সাহেব শ্যামবাজারকে চার্লস বাজার বলে উল্লেখ করেছেন। এটি কিন্তু কলিকাতার আদি বাসিন্দা বসাকদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। বাগবাজারেও একটি বাজার ছিল। শোনা যায় এক সময় এখানে বন্য প্রাণী বিক্রি হত। বাগবাজার নামের উৎপত্তির সঙ্গে জড়িয়ে আছে কোনও এক উদ্যানের কাহিনী। সম্ভবত সেটি পেরিন গার্ডেন। হলওয়েল সাহেব এই উদ্যানটি কেনেন ও পরে এটি ভগ্নদশা প্রাপ্ত হওয়াতে ১৭৫২ খ্রিঃ বিক্রি করে দেন। এই ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল— বোসপাড়া ও কম্বুলিয়াটোলা। বোসপাড়া অতি পুরাতন পল্লী, অনেক সম্ভ্রান্ত কুলীন কায়স্থ এই পল্লীতে বাস করেন।

শ্যামপুকুর ওয়ার্ডের দক্ষিণে অবস্থিত বটতলা ওয়ার্ড (৩নং)। উত্তরের অধিকাংশ ওয়ার্ডই সুতানুটি তালুকের অন্তর্গত। এই তালুকটি শোভাবাজারের রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠাতা রাজা নবকৃষ্ণকে ১৭৭৮ খ্রিঃ দেওয়া হয়। তালুকটির উৎপত্তি সম্বন্ধে মিঃ মিলেট (Mr. Millett) তাঁর কলিকাতার রাজস্বের প্রতিবেদনে (২০শে সেপ্টেম্বর ১৮৪৮) আলোকপাত করেছেন। মুর্শিদাবাদ (নদীয়া ?)-এর অন্তর্গত তালুক নপাড়া ১৭৬৯ খ্রিঃ রাজা নবকৃষ্ণকে দেওয়া হয়। পূর্ববর্তী তালুকদার তালুকের অধিকার পুনরায় ফিরে পায়। তখন রাজা নবকৃষ্ণের স্বত্ব খারিজ করা হয়। রাজা নবকৃষ্ণের পছন্দমতো কলিকাতার অন্তর্গত সুতানুটি, বাগবাজার ও হোগলকুন্ডি এবং ইহার সেয়ার (sayer) সমেত একটি সনদের মাধ্যমে ২৩ জানুয়ারি ১৭৭৮ খ্রিঃ তাঁকে দেওয়া হয়। কিন্তু ওই

অঞ্চলের বাসিন্দারা কোম্পানি ছাড়া অন্য কাউকে জমিদার বলে স্বীকার করতে অস্বীকার করে। সরকার তাদের এই বলে আশ্বস্ত করেন যে নবকৃষ্ণ বর্তমানে প্রচলিত জমিদারি রীতি ছাড়া নতুন কোনও নীতি প্রয়োগ করবেন না। কিন্তু এই আশ্বাসে প্রজাদের মনস্তুষ্টি হয়নি। অবশেষে নবকৃষ্ণের সুপারিশে ওই অঞ্চলগুলি চিরস্থায়ী ইজারার মাধ্যমে তাঁকে দেওয়া হয়। হেস্টিংসের নির্দেশে দলিলের বয়ান লেখা হয়। এই অঞ্চলের প্রথমে খাজনা ঠিক হয়েছিল সিক্কা টাকায় ১২৩৭-১৩-১০ পাই, সেয়ার প্রচলিত না থাকায় ২৭৭ সিক্কা টাকা মোট খাজনা থেকে বাদ দিয়ে নবকৃষ্ণের দেয় খাজনা ঠিক হয় কোম্পানির টাকায় ১০২৪-১৪-৪ পাই। পরবর্তীকালে দেখা গেছে সুতানুটি তালুক শোভাবাজার দেব পরিবারের কাছে লাভজনক হয়নি। স্ট্র্যান্ড রোড নির্মিত হবার সময় তালুকদার ২০ লক্ষ টাকা দাবি করেছিলেন। তার জন্য মামলা মকদ্দমা চলেছিল প্রায় ২০ বছর ধরে। অবশেষে ৩ লক্ষ টাকা দিয়ে এই মামলা মিটিয়ে নেওয়া হয়।

নবকৃষ্ণ পারিবারিক বাসভবন নির্মাণের জন্য সুতানুটি তালুকে পূর্বেই জমি সংগ্রহ করেন। জমির পরিমাণ ছিল ২ বিঘা ১৩ কাঠা ৮ ছটাক। খাজনা ধার্য হয়েছিল টা. ৮-০-৫ পাই। রাসবিহারী শেঠ ও বিনোদবিহারী শেঠের নিকট থেকে ৭ই মার্চ ১৭৬১ খ্রিঃ এক পাট্টার মাধ্যমে নবকৃষ্ণ ওই জমি ক্রয় করেন।

পুনরায় বটতলার কথায় ফিরে আসা যাক। এই ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত শোভাবাজার ও গরানহাটা। শোভাবাজার নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভার্লি সাহেব দুটি তথ্য দিয়েছেন—১৮০২ খ্রিঃ রাজা নবকৃষ্ণের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সম্পত্তি বণ্টনের যে দলিল সম্পাদিত হয় তার মধ্যে একটি উদ্যান পূর্ববর্তী কোনও এক শোভারাম ঘোষের অধিকারে ছিল। সম্ভবত এই শোভারামের নামে শোভাবাজার প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকবে। দ্বিতীয় মত— সেকালের বিখ্যাত ধনী শোভারাম বসাক এই বাজারটি স্থাপন করে থাকতে পারেন। আর, সুন্দরী গাছের গুঁড়ি বিক্রয়ের আড়ত থাকায় অপর অঞ্চলটির নাম হয় গরানহাটা।

সে সময় হাতিবাগান, নন্দনবাগান, হালসীবাগান ও রাজাবাগান পতিত জমি ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। নগরের ছোঁয়াচ তখনও তাদের স্পর্শ করেনি। হাতিবাগান নামের বিশেষত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন বিভার্লি সাহেব। নগরে প্রবেশ করার পর হাতিদের যেখানে আটকে রাখা হয়, তাকেই হাতিবাগান বলা হত। তিনি হাতিবাগান নামে আরেকটি জায়গার খোঁজ পেয়েছিলেন বালিগঞ্জ অঞ্চলে। নন্দনবাগান ও হালসীবাগান ছিল উমিচাঁদের উদ্যান ভবনের অন্তর্ভুক্ত। ১৭৫৭ খ্রিঃ সিরাজদ্দৌলা দ্বিতীয়বার কলিকাতা আক্রমণের সময় ছাউনি পেতেছিলেন উমিচাঁদের এই উদ্যানে। আর রাজাবাগান নামের উৎপত্তি সম্ভবত রাজা নবকৃষ্ণের নাম থেকেই।

বটতলা ওয়ার্ডকে কর্নওয়ালিস স্ট্রিট প্রায় সমভাবে ভাগ করে দিয়েছে। এই অঞ্চলের $\frac{২}{৩}$ অংশ বাসিন্দা রাস্তার পশ্চিম দিকে বসবাস করে।

সুকিয়া স্ট্রিট ওয়ার্ড (৪নং)-এর সাদৃশ্য আছে শ্যামপুকুর ও বটতলা ওয়ার্ডের পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে। এই তিনটি ওয়ার্ড অর্থাৎ শ্যামপুকুর, বটতলা ও সুকিয়া স্ট্রিট অসংখ্য বস্তিতে পরিপূর্ণ। এখানকার বাসিন্দাদের অর্ধেক কুঁড়েঘরে বাস করে। সুকিয়া স্ট্রিট ওয়ার্ডের অন্তর্গত ঝামাপুকুর, মানিকতলা প্রভৃতি অঞ্চল।

সুকিয়া স্ট্রিট ওয়ার্ডের দক্ষিণে মুচিপাড়া ওয়ার্ড (৯নং)। এখানে জনসংখ্যা প্রতি একরে ১৪১ জন। কলুটোলা ওয়ার্ডে (৮নং) মুসলমানের সংখ্যা বেশি। এখানকার ৫৭ শতাংশ বাসিন্দা কুঁড়েঘরে বাস করে। এ অঞ্চলের মধ্যে পড়ে মির্জাপুর, চাঁপাতলা প্রভৃতি অঞ্চল। এর দক্ষিণে পদ্মপুকুর ওয়ার্ড (১১নং)। এ অঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসীরা পাকা বাড়িতে বাস করে। ওয়ার্ডের শতকরা ৮০ ভাগ অধিবাসী হিন্দু। এই অঞ্চলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত— ডিঙাভাঙা, চাষা ধোপা পাড়া ইত্যাদি। অন্যদিকে ফেনিকবাজার (১৩নং) ও তালতলায় (১৪নং) মুসলমানের সংখ্যা অনেক বেশি।

পার্ক স্ট্রিট (১৬নং) ও বামুন বস্তি (১৭নং) ওয়ার্ডে বৃহৎ অট্টালিকার সংখ্যা অধিক, কিন্তু জনসংখ্যা মুষ্টিমেয় মাত্র।

বিভার্লি সাহেবের প্রতিবেদনে সে সময়ের শহর কলিকাতার ঘরবাড়ির বৈশিষ্ট্যের রূপটি ধরা পড়ে—

| | | |
|---|---|---|
| একতলা পাকা বাড়ির সংখ্যা | — | ৭০৩৭ |
| দোতলা পাকা বাড়ির সংখ্যা | — | ৮৬৩৬ |
| তেতলা পাকা বাড়ির সংখ্যা | — | ১১৮৭ |
| চারতলা পাকা বাড়ির সংখ্যা | — | ৩৪ |
| পাঁচতলা পাকা বাড়ির সংখ্যা | — | ২ |
| মোট পাকা বাড়ির সংখ্যা | — | ১৬,৮৯৬ |
| মাটির তৈরি বাড়ির সংখ্যা | — | ২২,৮৬০ |
| শহর কলিকাতায় মোট বাড়ির সংখ্যা | — | ৩৯,৭৫৬ |

বিভার্লি সাহেবের প্রতিবেদনে সে সময়ের শহর কলিকাতার শিক্ষিতের একটা পরিসংখ্যান দেওয়া আছে। সে সময়ের শহর কলিকাতায় লিখতে-পড়তে জানা বাসিন্দার সংখ্যা ছিল ১,১০,৫৬৫ জন। এর মধ্যে $\frac{১০}{১১}$ অংশ পুরুষ। সকল শ্রেণীর পুরুষের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা হচ্ছে ৩৫·৬ শতাংশ। সকল শ্রেণীর স্ত্রীলোকের মধ্যে লিখতে-পড়তে জানার সংখ্যা ৬·৭ শতাংশ। অন্য দিকে হিন্দু পুরুষের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা ৪২ শতাংশ। আর মুসলমানদের মধ্যে ১৬·৫ শতাংশ ; খ্রিস্টানদের মধ্যে ওই হার ৬৮ শতাংশ, খ্রিস্টান মহিলাদের মধ্যে ৫৪ শতাংশ। সে তুলনায় হিন্দু মহিলাদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা খুবই নগণ্য, ৩·৩ শতাংশ, আর মুসলমান মহিলাদের মধ্যে ১ শতাংশেরও কম।

বিভার্লি সাহেবের প্রতিবেদনে ১৮৬৬ থেকে ১৮৭৬ পর্যন্ত শহর কলিকাতায় যেসব রাস্তার সংস্কার, উন্নতি ও যেসব নতুন রাস্তা হয়েছে তার একটা সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ওই সব রাস্তার বিবরণ পূর্বেই দেওয়া হয়েছে, কাজেই নতুন করে উল্লেখের প্রয়োজন নেই।

এই প্রতিবেদনের সঙ্গে যে মানচিত্রটি সংযুক্ত করা ছিল তাতে হুগলি নদীর তীরে ছ'টি ঘাট সন্নিবেশিত—আর্মেনিয়ান ঘাট, কয়লা ঘাট, কলভিন ঘাট, চাঁদপাল ঘাট, বাবু ঘাট ও প্রিন্সেপ ঘাট। এই ঘাটগুলি ছাড়া অন্য কোনও ঘাটের উল্লেখ নেই।

কলিকাতার জনগণনার উপর ভিত্তি করে ঊনবিংশ শতাব্দীর পাঁচের দশক থেকে ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ৪টি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল—

১) ১৮৫০ খ্রিঃ সীম (Mr. Simms) সাহেবের প্রতিবেদন।
২) ১৮৬৬ খ্রিঃ শক (Mr. Schalch) সাহেবের প্রতিবেদন।
৩) ১৮৭২ খ্রিঃ ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার জনগণনার প্রতিবেদন।
৪) ১৮৭৬ খ্রিঃ বিভার্লি সাহেবের প্রতিবেদন।

এই ৪টি প্রতিবেদনের মধ্যে বিভার্লি সাহেবের প্রতিবেদনের মূল্য অপরিসীম। তিনি জনগণনার মাধ্যমে সেকালের শহর কলিকাতার সামাজিক, আর্থিক, ধর্মীয়, শিক্ষা সংক্রান্ত প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছেন। তা ছাড়া তাঁর এই প্রতিবেদনে শহর কলিকাতা কীভাবে গ্রামীণ চেহারা ধীরে ধীরে বদল করে আধুনিক শহরের বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে তার এক তথ্যবহুল সবঙ্গীণ ইতিহাস আমাদের উপহার দিয়েছেন। কলিকাতাপ্রেমীর কাছে এর মূল্য অসীম।

সেকালের শহর কলিকাতার বস্তি ও বাজার সম্বন্ধে সম্যক অবগত হতে হলে বিভার্লি সাহেবের প্রদত্ত তালিকা দুটির উপর দৃষ্টি দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। পাঠের সুবিধার জন্য তালিকা দুটি পরিশিষ্টে (ক ও খ) সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য এই যে গৃহ নির্মাণের জন্য যেমন আইনের বন্ধন ছিল, ঠিক সেইরূপ বস্তি-নির্মাণের ব্যাপারে যদি আইনের দৃঢ় বন্ধন থাকত, তা হলে কলিকাতার যত্রতত্র অস্বাস্থ্যকর, বিনা পরিকল্পনায় বস্তি গড়ে উঠে কলিকাতার সমাজ জীবনকে নানাভাবে দুঃসহ করে তুলত না। শহর কলিকাতায় যত আধিব্যাধির প্রকোপ ছিল, প্রায় সবই বস্তি থেকে উৎপত্তি লাভ করে মহামারীর আকার ধারণ করত। পরবর্তীকালে বস্তি পুনর্গঠনে ও বস্তি উচ্ছেদে বহু অর্থ ব্যয় হলেও সমস্যার কিন্তু ইতর-বিশেষ হয়নি।

বাজারের তালিকাটি পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে সেকালে শহর কলিকাতার বিখ্যাত ধনী ব্যক্তিরাই বাজারের মালিক ছিলেন। বাজার ছিল তাঁদের আয়ের প্রধান উৎস। আরেকটি বিষয়, বাজারের অবস্থিতি থেকে সে অঞ্চলের লোকবসতির চিত্রটি স্পষ্টরূপে ধরা পড়ে।

## ২২

# ১৮৮১—বিভার্লির পুনর্বার জনগণনা

১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে শহর কলিকাতায় পুনরায় জনগণনার কাজ আরম্ভ হয়। এবারেও বিভার্লি সাহেবের উপর ভার অর্পণ করা হয়। জনগণনার উপর তিনি একটি প্রতিবেদন পেশ করেন। তিনি তাঁর প্রতিবেদনে ১৮৭৬ থেকে ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কলিকাতার সংস্কার, উন্নতি, নতুন রাস্তাঘাট রূপায়ণ প্রভৃতির এক সার্বিক চিত্র তুলে ধরেছেন। ওই সময় স্ট্র্যান্ড ব্যাঙ্ক রোডকে প্রশস্ত করা হয়। ওই রাস্তার যে অংশ কুমারটুলি, জোড়াবাগান ও বড়বাজারের মধ্যে পড়েছে, তার ধারে পাট ও বিবিধ শস্যের গুদাম নির্মাণ করা হয়।

শ্যামপুকুর ওয়ার্ডের অন্তর্গত ১০ বিঘা জমির উপর অবস্থিত নিকারীপাড়া বস্তি উচ্ছেদ করা হয়। ওই জমিতে কলিকাতা পৌরসভার মালমসলা রাখার গুদাম নির্মিত হয়। রাজা রাজবল্লভ স্ট্রিট ও রামকান্ত বসু স্ট্রিটের মধ্যে একটি যোগাযোগকারী রাস্তাও নির্মাণ করা হয়। রাস্তাটির নাম রাখা হয়েছিল রাজা পাড়া লেন। বর্তমানে এ রাস্তার কোনও অস্তিত্বই নেই। গিরিশ অ্যাভিনিউ নির্মাণের সময় রাস্তাটির অবলুপ্তি ঘটে। এই ওয়ার্ডে ছিল বৃন্দাবন পাল ফার্স্ট লেন। পল্লীবাসীর স্মারকপত্রের ভিত্তিতে কলিকাতা পৌরসভা রাস্তাটির নাম বদল করে মহেন্দ্র বোস লেন নামাঙ্কিত করেন। মহেন্দ্র বসু হলেন বাগবাজারের বসু পরিবারের নন্দলাল বসু ও পশুপতিনাথ বসুর জ্যেষ্ঠভ্রাতা।

কুমারটুলি ওয়ার্ডে শক স্ট্রিট নামে রাজপথটি এই সময় নির্মিত হয়। এই রাস্তাটি সম্বন্ধে দু'চার কথা বলা দরকার। যাঁর নামে এই রাস্তাটি নামাঙ্কিত হয়েছিল সেই শক সাহেব ছিলেন কলিকাতা পৌরসভার প্রথম চেয়ারম্যান (১.৭.১৮৬৩—২.৪.১৮৬৬)। একই সঙ্গে কলিকাতা পুলিশের কমিশনারও ছিলেন। ১২ই আগস্ট ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দের এক সরকারি আদেশবলে ভি.এইচ. শক (V.H. Schalch) এই দুই উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হন। এই ব্যবস্থা ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাস পর্যন্ত বলবৎ ছিল। এর পর থেকে কলিকাতা পৌরসভার চেয়ারম্যানকে কলিকাতা পুলিশ কমিশনারের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।[১]

শক সাহেব ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে তিন বছর পর্যন্ত পুলিশ কমিশনারের দায়িত্বে ছিলেন। তারপর স্যার স্টুয়ার্ট হগ এই কার্যভার গ্রহণ করেন। কলিকাতা পৌরসভার চেয়ারম্যানের পদে অতিমাত্রায় ব্যস্ত থাকায় শক সাহেব পুলিশের কাজে বিশেষ নজর দিতে পারতেন না। তাঁর ডেপুটি মিঃ রিলে (Mr. Reillay) পুলিশি ব্যবস্থার নজরদারিতে ছিলেন। শক সাহেবের কার্যকালে পুলিশ কর্মচারীর জন্য বৃদ্ধ বয়সে পেনসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়।[২] তাঁর নেতৃত্বে ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা পৌরসভার অন্তর্গত সব অঞ্চলের প্রথম জনগণনার কাজ আরম্ভ হয়।

শক স্ট্রিট যে অঞ্চলে অবস্থিত তাকে কুমারটুলি বলে। এটি প্রাচীন কলিকাতার ডিহি সুতানুটির অন্তর্গত ছিল। কুমারটুলিতে কুম্ভকার বা কুমোররা বাস করতেন। তাঁদের বসবাসের কারণে এ অঞ্চলের নাম হয় কুমারটুলি। গঙ্গার ধারে যে জায়গাটি কুমারটুলি নামে পরিচিত, পূর্বে সেখানে ছিল হোগলার বন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে কৃষ্ণনগরের কিছু মৃৎশিল্পী রাজা নবকৃষ্ণের বাড়ির পূজার প্রতিমা তৈরি করার জন্য সুতানুটি গ্রামের এই অঞ্চলে আশ্রয় নেন। দুর্গাপূজার কিছু আগে এখানে তাঁরা আসতেন। গোটা কয়েক প্রতিমা তৈরি করে আবার কৃষ্ণনগরে ফিরে যেতেন।

কুমোরগণ পরে হোগলার বন পরিষ্কার করে এখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করতে মনস্থ করেন।

১৭৫৮ খ্রিঃ গোবিন্দপুর গ্রামে যখন নতুন দুর্গ নির্মাণ শুরু হয়, তখন অনেকে জমির ক্ষতিপূরণের টাকা নিয়ে সুতানুটির বিভিন্ন স্থানে নিজেদের বসতি গড়ে তোলেন। এই সময় শোভাবাজার, কুমারটুলি, বাগবাজার প্রভৃতি অঞ্চল লোকে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। অনেক অবস্থাপন্ন বাঙালি পরিবার এই কুমারটুলিতে এসে বসবাস আরম্ভ করেন। কুমারটুলির প্রাচীন বাসিন্দাদের মধ্যে বনমালী সরকার, গোবিন্দরাম মিত্র, নন্দরাম সেন প্রমুখ উল্লেখ্য।

প্রতিমা গড়বার কাজে কুমারটুলি কলিকাতার মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। কুমারটুলিতে প্রথম দিকে ও পরে যে সব খ্যাতনামা শিল্পীর খোঁজ পাওয়া যায় তাঁরা হলেন মধুসূদন পাল, কাঙালীচরণ পাল, কাশীনাথ পাল, হরিপদ পাল, লোহারাম পাল, অন্নদাবরণ পাল, গোপেশ্বর পাল, নিতাইচরণ পাল প্রমুখ।

আবার শক স্ট্রিটের কথায় ফিরে আসি। সে সময় শক স্ট্রিট ছিল অত্যন্ত অপ্রশস্ত। যানবাহন চলাচলে খুবই অসুবিধা ছিল। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই রাস্তাটি প্রশস্ত করার চিন্তা-ভাবনা চলতে থাকে। এই রাস্তাটির উত্তরদিকে ছিল পোর্ট কমিশনারের বিশাল জমি। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা পৌরসভার ডিস্ট্রিক্ট স্পেশাল কমিটি সুপারিশ করেন যে শক স্ট্রিটকে উত্তরদিকে আরও ২০ ফুট প্রশস্ত করার জন্য পোর্ট কমিশনারকে জমি দেবার জন্য অনুরোধ করা হোক। পোর্ট কমিশনারের জমি ছাড়াও আরও ১০০ ফুট লম্বা সাধারণের জমি প্রয়োজন হবে। পোর্ট কমিশনারের জমির দাম ধরা হয়েছিল ৭৫,০০০ টাকা এবং সাধারণের জমির দাম ৫০,৩১৩ টাকা। প্রাক্তন পৌরপ্রতিনিধি দুর্গাচরণ ব্যানার্জি বিষয়টি কার্যকরী করার জন্য সবিশেষ প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। তারই উদ্যোগে পোর্ট কমিশনারের প্রাপ্য ৭৫,০০০ টাকা ১০টি বার্ষিক কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা হয়। কলিকাতা পৌরসভা তাঁদের ১১ মার্চ ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের অধিবেশনে এই প্রস্তাব অনুমোদন করেন। এই প্রস্তাব বাস্তবায়িত হওয়ায় শক স্ট্রিট প্রশস্ত হয়ে বর্তমান আকার ধারণ করে।[৩]

যে দুর্গাচরণ ব্যানার্জির সহযোগিতায় ও তৎপরতায় শক স্ট্রিট সংস্কার ও প্রশস্ত করা সম্ভব হয়েছিল, ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে দুর্গাচরণ ব্যানার্জি মেমোরিয়াল কমিটি এক প্রস্তাবে কলিকাতা পৌরসভাকে অনুরোধ করেন যে শক স্ট্রিটের নাম পরিবর্তন করে দুর্গাচরণ ব্যানার্জির নামে নামাঙ্কিত করা হোক।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কীর্তিমান ছাত্র, কলিকাতা হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠিত সলিসিটার, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও দেশগৌরব সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সহযোগী, স্বদেশি শিল্প স্থাপনে উদ্যোগীপুরুষ দুর্গাচরণ ব্যানার্জি (১৮৮৩-১৯৩৫) কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা রামনারায়ণ ব্যানার্জির একমাত্র পুত্র ছিলেন তিনি। এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে আইন অধ্যয়ন করেন। পরে এই পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে মেসার্স ওর ডিগনাম (Messrs Orr Dignam) কোম্পানিতে প্রবেশ করেন। কালে এই প্রতিষ্ঠানের একমাত্র ভারতীয় অংশীদার হন। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা পৌরসভার কমিশনার নির্বাচিত হন। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে উদার হস্তে অর্থ দান করেন। স্বরাজ দল এবং দেশবন্ধু গ্রাম সংস্কার ভাণ্ডার (Deshbandhu Village Re-Organisation Fund) তাঁর অকাতর দানে পরিপুষ্ট হয়েছিল। দেশবন্ধু স্মৃতিসভার (Deshbandhu Memorial Committee) তিনি ছিলেন কোষাধ্যক্ষ। এ ছাড়া বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে মহাত্মা গান্ধী তাঁর বাসভবনে পদার্পণ করেছিলেন।

শুধুমাত্র সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাই নয়, দুর্গাচরণ সেকালের বহু স্বদেশি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন এবং সেগুলির শ্রীবৃদ্ধিতে তৎপর ছিলেন। তিনি বেঙ্গল পটারিজ কোম্পানির ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান হয়েছিলেন। স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর আত্মজীবনীতে বেঙ্গল পটারিজের উন্নতিতে দুর্গাচরণের ভূমিকার সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন।

দুর্গাচরণের লেখা কতকগুলি আইন পুস্তকের মধ্যে (১) Indian Conveyance এবং (২) Indian Registration Act উল্লেখ্য। এক সময় দুর্গাচরণ কলিকাতার এরিয়ান ক্লাবের সভাপতি ছিলেন। বাগবাজার দুর্গোৎসব এবং প্রদর্শনীর তিনি একজন সক্রিয় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে ৫৩ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর বাসভবন ছিল ৩৮নং কাশী মিত্র ঘাট স্ট্রিটে।[৪]

কলিকাতা পৌরসভা ৬ জুলাই ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের অধিবেশনে দুর্গাচরণের চরিত্রের গুণাবলী উল্লেখ করে শক স্ট্রিটের নাম পরিবর্তন করে দুর্গাচরণ ব্যানার্জি স্ট্রিট নামকরণ করেন। সে নাম আজও বহাল আছে।[৫]

১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে বেনিয়াটোলা স্ট্রিট ও শোভাবাজার স্ট্রিটের মধ্যে আরেকটি রাস্তা নির্মিত হয়েছিল। সেটির নাম বারোয়ারীতলা লেন। একটি বড় বস্তি উচ্ছেদ করে ট্রাম কোম্পানির ঘোড়ার আস্তাবল নির্মিত হয় একই ওয়ার্ডে।

বটতলা ওয়ার্ডে প্রায় ৬টি নতুন রাস্তা তৈরি করা হয়। সেগুলি—ডালিমতলা লেন, পেয়ারাবাগান লেন, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট (আংশিক) প্রভৃতি। শেষের রাস্তা নির্মাণে রানী স্বর্ণময়ী জমি দান করেছিলেন এবং রায় বাহাদুর বদ্রীদাস ১০০০ টাকা দান করেছিলেন। এই ওয়ার্ডের অন্তর্গত বিডন স্ট্রিটের একটি বড় বস্তি উচ্ছেদ করে সেই জায়গায় ফ্রী চার্চ অরফ্যানেজ ও জেনানা হোম (Free Church Orphanage and Zenana Home) প্রতিষ্ঠা করা হয়।

সুকিয়া স্ট্রিট ওয়ার্ডে এই সময় দুটি রাস্তা নির্মাণ করা হয়। সারকুলার রোড থেকে বুদ্ধু ওস্তাগর লেন পর্যন্ত একটি নতুন রাস্তা নির্মিত হয়—নাম পাটওয়ারবাগান স্ট্রিট। আর আপার সারকুলার রোডের প্রথম বাই লেনটির নাম বদলে গিরিশ বিদ্যারত্ন লেন রাখা হয়। সেকালের বিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত, শিক্ষাব্রতী, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহপাঠী, বিধবাবিবাহ আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী, সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন (১৮২২-১৯০৩)। "সংস্কৃত যন্ত্র" স্থাপনে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রধান সহযোগী ছিলেন। তিনি নিজেও একটি প্রেস স্থাপন করেছিলেন—নাম "গিরিশ বিদ্যারত্ন যন্ত্র"। বহু পুস্তক এখান থেকে ছাপা হয়েছিল। গিরিশচন্দ্র নিজ গ্রামে ১০,০০০ টাকা ব্যয়ে দরিদ্র ভাণ্ডার স্থাপন করেন। সুকিয়া স্ট্রিট অঞ্চলে কিছু বস্তি উচ্ছেদ করে পাকা বাড়ি ওই সময় নির্মিত হতে থাকে।

ধর্মতলা স্ট্রিটের উপর খোলামেলা জায়গায় ছিল নেটিভ হাসপাতাল। এটি ১৭৯৮ খ্রিঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পরে হাসপাতালটিকে জোড়াবাগানের অন্তর্গত স্ট্র্যান্ড রোড নর্থের উপর একটি বড় বাড়িতে স্থানান্তরিত করা হয়। প্রয়াত গভর্নর জেনারেল আর্‌ল্‌ মেয়ো-র (Earl Mayo) নামে হাসপাতালটি নতুন নামে নামাঙ্কিত হয় মেয়ো হাসপাতাল। আর্‌ল্‌ মেয়ো (১৮২২-১৮৭২) ১৮৬৯ থেকে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে ভাইসরয় ও গভর্নর জেনারেল পদে নিযুক্ত ছিলেন। আন্দামান দ্বীপে সূর্যাস্ত দেখার সময় সিয়ার আলি নামে এক ওয়াহাবী কয়েদী গভর্নর জেনারেলকে পিছন থেকে ছোরা দিয়ে আঘাত করে তাঁকে হত্যা করে। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে হাসপাতালটি তাঁর নামে নামাঙ্কিত করা হয়।

জোড়াবাগান এলাকায় অনেকগুলি বস্তি উচ্ছেদ করে সেই জায়গায় অনেকগুলি গুদাম ঘর সেই সময় নির্মাণ করা হয়। সিকদার পাড়া স্ট্রিট এই এলাকার একটি বিশিষ্ট রাস্তা। রাস্তাটি সে সময় এত সঙ্কীর্ণ ছিল যে পৌরসভার জঞ্জালবাহী ঠেলাগাড়িও প্রবেশ করতে পারত না। রাস্তা চওড়া করার জন্য ১৭,৪৭০ টাকা ব্যয়ে এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

জোড়াসাঁকো এলাকায় এই সময় অনেকগুলি রাস্তা তৈরি হয়েছিল। তার জন্য বহু বস্তি ভাঙা পড়ে। রাস্তাগুলি চোরবাগান স্ট্রিট, সরকার লেন, সিংহী লেন প্রভৃতি। এই রাস্তাগুলি বারানসী ঘোষ স্ট্রিট ও মুক্তারামবাবু স্ট্রিটের মধ্যে অবস্থিত। বাদুড়বাগান স্ট্রিট, বাদুড়বাগান ফার্স্ট ও সেকেন্ড লেন, কালীতলা লেন, বসাক দিঘি লেন, বেনিয়াপাড়া লেন প্রভৃতি নিয়ে মেছুয়াবাজার অঞ্চল। বড়বাজার এলাকায় অনেকগুলি বস্তি ভেঙ্গে কিছু গুদাম ঘর নির্মাণ করা হয়। এগুলি ছাড়া আরও কয়েকটি রাস্তা নির্মাণের খোঁজ পাওয়া যায়। ৪৩নং ও ৪৯নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটের মধ্যবর্তী গলিটির ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে কিশোরীলাল মুখার্জী স্ট্রিট নামকরণ করা হয়। ঠিক একই ভাবে ৩৮নং ও ৪২নং

কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটের মধ্যবর্তী গলিটি নন্দকুমার চৌধুরী লেন নামে নামাঙ্কিত হয়।

কলুটোলা ওয়ার্ডে ইডেন হসপিটাল স্থাপনের জন্য একটি বড় বস্তি অধিগ্রহণ করা হয়। সেই সঙ্গে মেডিকেল কলেজ স্ট্রিট নামে রাস্তাটি বন্ধ করে দেওয়া হয় ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে। ওই জায়গায় নতুন শিশু চিকিৎসা বিভাগ স্থাপনের ব্যবস্থা হয়।

মুচিপাড়া ওয়ার্ডে মিস ফেন্‌ডাল হোম স্থাপনের জন্য একটি বস্তি অধিগ্রহণ করা হয়। ওই বছর সেন্ট পল্‌স মিশন চ্যাপেল স্কট লেনে স্থাপন করা হয়। প্রতাপ চ্যাটার্জি লেনের পূর্ব নাম ছিল "ফক্স লেন" (Fox Lane)। ওই এলাকার বাসিন্দাদের নামটি পছন্দ না হওয়াতে এটি বদল করার জন্য পৌরসভার চেয়ারম্যানের কাছে এক স্মারকলিপি প্রদান করেন। পৌরসভা স্মারকলিপিটি অনুমোদন করে রাস্তাটির নাম বদল করে প্রতাপ চ্যাটার্জি লেন রাখেন (২৫.৪.১৮৭৭)।

১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা পৌরসভা মৌলভী এমদাদ আলি লেন ও মৌলভী আবদুল লতিফ লেনের মধ্যে একটি নতুন রাস্তা নির্মাণ করেন। এই রাস্তার $\frac{৩}{৪}$ অংশের জমির মালিক ছিলেন মৌলভী আলিমুদ্দিন। তিনি বিনামূল্যে ওই জমি পৌরসভাকে হস্তান্তর করেন। বিনিময়ে পৌরসভা ওই রাস্তাটির নাম মৌলভী আলিমুদ্দিন লেন নামকরণ করেন (২১.৮.১৮৮০)। এই সময় তালতলা ওয়ার্ডে আরও কয়েকটি নতুন রাস্তা তৈরি হয়েছিল।

কলিঙ্গ ওয়ার্ডে ছিল ডানকান বস্তি। এটি অবস্থিত ছিল উড স্ট্রিটে। এই বস্তিটি উচ্ছেদ করে এখানে সার্ভেয়ার জেনারেলের অফিস স্থাপন করা হয়। এই বছরে সাউথ কলিঙ্গ স্ট্রিট ও ইউরোপীয়ান এ্যাসাইলাম লেনের মধ্যে নতুন একটি রাস্তা তৈরি হয়। এটির নামকরণ করা হয় মৌলভী আবদুল লতিফ স্ট্রিট। এই সময় সাউথ কলিঙ্গ স্ট্রিট ও অ্যানী বারবার লেনের মধ্যে একটি বাই লেনের নামকরণ করা হয় মৌলভী বাজলার রহমান লেন।

মোটামুটি এই হল বিভার্লি সাহেবের ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের জনগণনার প্রতিবেদনে শহর কলিকাতার রাস্তাঘাটের এক সংক্ষিপ্তসার।[৬]

## তথ্যসূত্র


১ A contribution towards a history of Police in Bengal—Gourlay.
২ Story of Lalbazar—T. Chattapadhya.
৩ The Proceedings of the meeting of Calcutta Corpn. dt. 11.3.1925.
৪ The Calcutta Municipal Gazette dt. 6.7.35, p. 232.
৫ The Proceedings of the meeting of Calcutta Corpn. dt. 6.7.1956.
৬ Calcutta Mpl. Corpn. Administration Report 1881/Town Council Proceedings 1880

## ২৩

# শহর কলিকাতার ওয়ার্ডভিত্তিক পথ-উন্নয়নের রূপরেখা : ১৮৮১-১৮৮৮

১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে নতুন পৌরসভা আইন গৃহীত হয়। তার আগে ১৮৮১ থেকে ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে শহর কলিকাতার আরও কী কী শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল তার দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক। এই সময় চিৎপুর রোডকে চওড়া করার ব্যবস্থা হয়। ফায়ার ব্রিগেড ফান্ড (Fire Brigade Fund) ৬০,৬৪৭ টাকা সরকারি অনুদানে স্থাপিত হয়। তৎকালীন ছোটলাটের নির্দেশে ওই তহবিল পৌরসভাকে হস্তান্তরিত করা হয়। পৌরসভা আরও ৬০,০০০ টাকা তাঁদের সাধারণ তহবিল থেকে ওই ফায়ার ব্রিগেড ফান্ডে দান করেন। বিভার্লি সাহেবের উদ্যোগে সরকার ও পৌরসভার সম্মতিতে ওই অর্থ চিৎপুর রোড প্রশস্ত করার জন্য ব্যয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতায় টেলিফোন চালু করার এক প্রস্তাব আনেন মেসার্স ওরিয়েন্টাল টেলিফোন কোম্পানি (Messrs Oriental Telephone Co.)। দীর্ঘ আলোচনার পর তাঁদের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।[১]

১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে শহর কলিকাতার রাস্তা ও গলি প্রভৃতিকে লন্ডন শহরের ধাঁচে শ্রেণী বিভাগের ব্যবস্থা করা হয়। তালিকাটি ছিল এইরূপ—[২]

| রাস্তার শ্রেণী | রাস্তার প্রস্থ | এই প্রকার রাস্তার দৈর্ঘ্য | | |
|---|---|---|---|---|
| | | মাইল | ফার্লং | ফুট |
| ১ম শ্রেণী | ৩২ ফুট ও তার ঊর্ধ্বে | ২৮ | ৪ | ৫৯৭ |
| ২য় শ্রেণী | ১৪ ফুট থেকে ৩১ ফুট | ৫৫ | ৭ | ৪৮০ |
| ৩য় শ্রেণী | ৯ ফুট থেকে ১৪ ফুট | ৩৪ | ৭ | ৫০৭ |
| ৪র্থ শ্রেণী | ৯ ফুট | ১৬ | ৭ | ৫৩৪ |
| ৫ম শ্রেণী | সরু পয়ঃপ্রণালী ভরাট করে যে সব রাস্তা নির্মিত হয়েছিল | ২৩ | ২ | ২১৮ |

রাজপথের এই শ্রেণী বিন্যাস বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত চালু ছিল।

১৮৮১ থেকে ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে শহর কলিকাতায় অনেকগুলি রাস্তা নির্মিত হয়েছিল। এগুলির পরিচয়ের ইতিহাসে পৌরসভার তৎকালীন Administration Report, Town Council ও General Committeeর কার্যবিবরণীকে নির্ভরযোগ্য উপাদান বলে মনে করি। বস্তুত, এদের সাক্ষ্যপ্রমাণ সম্বন্ধে অবাস্তবতার আপত্তি তোলার হেতু নেই। তা ছাড়া এর মধ্যে যতটুকু পাওয়া যায়, যতটুকু বোঝা যায়, ততটুকু মূল্যবান ও নির্ভরযোগ্য। এইসব প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যপ্রমাণের মধ্যে এমন কিছু কিছু ইঙ্গিত আছে যা খুব সুবোধ্য নয়। তা ছাড়া এমন সব রাস্তা বা গলির বর্ণনা দেওয়া আছে যার অস্তিত্ব বর্তমানে খুঁজে বার করা দুষ্কর। নানান আবর্তন, বিবর্তন ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে শহরে নতুন রাস্তাঘাটের মধ্যে তারা বিলীন হয়েছে। সে যাই হোক, ওই সময় নব নির্মিত গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলিকে তৎকালীন ১৮টি ওয়ার্ডের মধ্যে সাজিয়ে দেবার ব্যবস্থা করব।

তার পূর্বে রাস্তাঘাটের উন্নতি ও পরিকল্পনা সম্বন্ধে সেকালের কলিকাতার পৌর প্রতিনিধিরা

কীভাবে চিন্তা ভাবনা করেছিলেন সে সম্বন্ধে আমাদের অবহিত হওয়া দরকার।

অ্যাবারক্রম্বির পরিকল্পনা সম্বন্ধে আমরা পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। পরিকল্পনাটি সে সময় অর্থের অভাবে পরিত্যক্ত হয়েছিল। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে পৌরসভার হেলথ অফিসার ডঃ সিমসন অ্যাবারক্রম্বির পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করার জন্য জোরালো যুক্তি দেখিয়ে পৌরসভার কাছে আবেদন করেন, যদিও ওই প্রকল্পের কিছু অংশ যথা বিডন স্ট্রিট, গ্রে স্ট্রিট, আপার স্ট্যান্ড রোড পূর্বেই নির্মিত হয়েছিল। বাকি অংশ রূপায়ণের জন্য ১$\frac{১}{২}$ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রয়োজন হয়। এবারেও পৌরসভা অর্থ অনটনের অজুহাতে ডঃ সিমসনের প্রস্তাব বাতিল করেছিলেন। উল্টে তারা একটি নতুন প্রস্তাব গ্রহণ করলেন যেটি তাঁদের বিবেচনায় অনেক কম খরচে সুদূরপ্রসারী ফলপ্রসূ করা যাবে। প্রস্তাবটি ছিল এইরূপ—"A model plan of the City, as it is intended to be laid out with reference to existing streets and future streets, both in town and suburbs, should be drawn, and kept constantly in sight by the Commissioners and no houses that interfere with this plan should be allowed to be built.....Even for the older portion of the town such a plan is perfectly feasible."[৩]

উচ্চ সম্ভাবনাময় পরিকল্পনা রূপায়ণে যে আগ্রহ নিয়ে পৌরসভা প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন, ঠিক সেইভাবে তা কার্যকরী হয়নি। যদি তা ফলপ্রসূ হত, কলিকাতার রাস্তাঘাটের ইতিহাস হয়তো অন্যভাবে লেখা হতে পারত।

আবার আমরা ফিরে আসি পুরানো কথায়। নীচে তৎকালীন ১৮টি ওয়ার্ডের মধ্যে নবনির্মিত গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলি সাজিয়ে দেওয়া হল।

## ১নং ওয়ার্ড

১। ১৫ ফুট চওড়া এই নতুন রাস্তাটি রামকান্ত বসু স্ট্রিটকে বাগবাজার স্ট্রিটের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে। এরই একটি শাখাপথ পশ্চিম দিকে বোসপাড়া লেন পর্যন্ত প্রসারিত। ১৮৮২-৮৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এটি কাঁটাপুকুর এলাকার মধ্য দিয়ে নির্মিত হয়। ঘিঞ্জি এলাকার মধ্যে পথটি হওয়াতে এ অঞ্চলের বাসিন্দাদের বিশেষ উপকার হয়েছিল। পরবর্তীকালে এই অঞ্চলের নামে নতুন রাস্তাটির নাম কাঁটাপুকুর লেন রাখা হয়।

কাঁটাপুকুর অঞ্চলটি কাঁটাগাছের ঝোপে ভর্তি ছিল, এখানকার প্রথম বাসিন্দারা কাঁটাগাছের ঝোপ জঙ্গল পরিষ্কার করে একটি পানীয় জলের পুষ্করিণী খনন করে।[৪] পুকুরটি কাঁটাপুকুর নামে পরিচিত ছিল। পরে এই অঞ্চল রামকান্ত বসুর পূর্বপুরুষদের দখলে আসে। কাঁটাপুকুর লেনের দক্ষিণ অংশ এঁদের বাগানের উপর দিয়ে গেছে। রামকান্ত বসু মহাশয়দের পুষ্করিণীটি কলুটোলার শোভারাম বসাক লেনের দেবেন্দ্র নাথ মল্লিক খরিদ করে ভরাট করেন। ওই জমিতে সুন্দর সব বাড়ি তৈরি হয়েছে।[৫]

কাঁটাপুকুর লেন নাম নিয়ে বহু বছর কেটে গেল। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে রাস্তাটির নাম বদলের এক প্রস্তাব এলো। তাতে অমৃতবাজার পত্রিকার শিশির ঘোষ মহাশয়ের নামে কাঁটাপুকুর লেন নামাঙ্কিত করার কথা বলা হয়েছিল।[৬] যে কোনও কারণেই হোক সে প্রস্তাব রূপায়িত হয়নি।

১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের ২৬ আগস্ট কলিকাতা পৌরসভা প্রয়াত দেশপ্রেমী ও শহীদ শচীন মিত্রের নামে কাঁটাপুকুর লেনের নাম পরিবর্তন করে শচীন মিত্র লেন নামাঙ্কিত করেন। তিনি ওই লেনেই বসবাস করতেন।

ছাত্রনেতা, স্বাধীনতা সংগ্রামী, হিন্দুমুসলমান ঐক্যের পৃষ্ঠপোষক শচীন মিত্র ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন অগ্রণী সৈনিক ছিলেন। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে কারারুদ্ধ হন। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি বঙ্গীয় ছাত্রসংসদ প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতের স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই হিন্দুমুসলমান দাঙ্গা নিবারণের জন্য মহাত্মা গান্ধী যে শান্তি সেবাদল স্থাপন করেন, শচীন মিত্র ছিলেন তার সক্রিয় কর্মী। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে কলিকাতায়

হিন্দুমুসলমান দাঙ্গা শুরু হয়। সেই দাঙ্গা প্রশমনের জন্য তিনি তাঁর বন্ধু ও অনুগামীদের নিয়ে শান্তি পদযাত্রায় বের হন। চিৎপুর রোড ও ক্যানিং স্ট্রিটের সংযোগস্থলে মুসলমান দুর্বৃত্তের হাতে নিহত হন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ৩৮ বছর। গান্ধীজী শচীনবাবুর মৃত্যুতে গভীর শোকাহত হন। তিনি শচীনবাবুর বিধবা পত্নী অংশুরানী মিত্রকে সান্ত্বনা দিয়ে যে বাণী পাঠান তা ছিল এইরূপ—"Such a death should not be an occasion for sorrow, but rather of joy. You can demonstrate your affection for him by following in his footsteps."[৭]

প্রয়াত শচীন মিত্র ছিলেন কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘের প্রাণশক্তি। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য বলেন, "কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে। আনুষ্ঠানিক ভাবে ১৪ অক্টোবর ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে শনিবারের চিঠির সম্পাদক সজনীকান্ত দাস কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘের উদ্বোধন করেন।

"সঙ্ঘের প্রাণপুরুষ হিসাবে শচীন্দ্রনাথ মিত্রের কথা আগে আসে। সৌম্যদর্শন বলিষ্ঠ এই পুরুষটি ব্যারিস্টারী পাশ করে এসে পেশাগত বৃত্তিতে আত্মনিয়োগ না করে দেশের কাজে লেগে পড়লেন। শচীন্দ্রনাথের উদ্যোগে প্রধানত উত্তর কলিকাতায় সমভাবাপন্ন যে যুববৃন্দ জমায়েত হতেন তাঁদের মধ্যে সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষ এবং সাংবাদিক সাগরময় ঘোষের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।"[৮]

২। ১৮৮২-৮৩ খ্রিস্টাব্দে ৬৮৫ ফুট লম্বা ও ২০ ফুট চওড়া নতুন একটি রাস্তা তৈরি হয়। এটি রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিট ও শ্যামপুকুর স্ট্রিটকে সংযুক্ত করেছিল।[৯] রাস্তাটির নাম রাখা হয় মল্লিক লেন। বর্ধিষ্ণু মল্লিক পরিবার ওই অঞ্চলে বাস করতেন। তাঁদের কিছু জমি রাস্তা নির্মাণে গ্রহণ করা হয়েছিল।

১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলার পোস্ট মাস্টার জেনারেল (Post Master General, Bengal) কলিকাতা পৌরসভাকে জানালেন যে কলিকাতায় তিনটি "মল্লিক লেন" নামে রাস্তা আছে। একই নামে তিনটি রাস্তা থাকায় চিঠিপত্র বিলি ব্যবস্থায় বিশেষ অসুবিধা দেখা দিচ্ছে। তিনি এই রাস্তাটির নাম পরিবর্তনের অনুরোধ জানান। সে সময় মল্লিক পরিবারের স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন আনন্দমোহন মল্লিক। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে ও তত্ত্বাবধানে ওই অঞ্চলের অনেক উন্নতি হয়। কলিকাতা পৌরসভা মল্লিক লেনের নাম পরিবর্তন করে আনন্দমোহন মল্লিকের নামে আনন্দ লেন নামাঙ্কিত করেন।[১০]

৩। সিকদার বাগান স্ট্রিট ও গ্রে স্ট্রিটের যোগাযোগকারী নতুন একটি রাস্তা এই বছরে নির্মিত হয়। এটির দৈর্ঘ্য ৭৭০ ফুট আর প্রস্থ ২০ ফুট।

৪। উপরের রাস্তার সমকোণে আরেকটি নতুন রাস্তা তৈরি হয়েছিল। রাস্তাটি কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটকে আপার সারকুলার রোডের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে। এই নতুন রাস্তার দৈর্ঘ্য হল ১৩৫০ ফুট ও প্রস্থ ২০ ফুট। অঞ্চলটিতে ছিল ঘিঞ্জি বস্তি, মজা পুকুর ও গোশালা। জনস্বাস্থ্যের কোনও নিয়মকানুনই এখানে মানা হত না। রাস্তা তৈরি হওয়াতে এলাকাটি অনেক আলোবাতাস যুক্ত ও স্বাস্থ্যসম্মত হয়েছিল। ৩নং ও ৪নং দুটি রাস্তাই হাতিবাগান স্ট্রিট নামে নামকরণ করা হয়। কলিকাতা পৌরসভা ৯ মার্চ ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের অধিবেশনে হাতিবাগান স্ট্রিটের নাম পালটে নলিন সরকার স্ট্রিট নামকরণ করেন।

তারক সরকারের পুত্র হলেন নলিনবিহারী সরকার। তাঁরা তিন ভাই—বিপিনবিহারী, নলিনবিহারী ও পুলিনবিহারী সরকার। তারক সরকার ছিলেন এক ব্যবসায়ী, কার তারক এ্যান্ড কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা। কার এখানে কোনও ইংরেজ কোম্পানির উপাধি নয়। তারক সরকার নিজের বংশ পদবীর শেষাংশ অর্থাৎ (সর) কার তারক নিয়ে নিজ ব্যবসায়ের নামকরণ করেন। তারক সরকারের বাড়ি ছিল বিডন স্ট্রিটে। তারকবাবুর বড় ছেলে পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে সাহেবপাড়ায় বাড়ি করে বসবাস করেন। মেজ ছেলে নলিনবিহারী পৈতৃক বাড়ি পান। তিনি পরবর্তীকালে কলিকাতার শেরিফ, কলিকাতা পৌরসভার কমিশনার হয়েছিলেন। তাঁরই নামে নলিন সরকার স্ট্রিট।[১১]

৫। ১১৩২ ফুট দীর্ঘ ও ১৫ ফুট প্রশস্ত নতুন একটি সড়ক ফড়িয়াপুকুর বস্তির মধ্য দিয়ে প্রসারিত হয়ে কর্নওয়ালিস স্ট্রিট ও আপার সারকুলার রোডকে সংযুক্ত করেছে। রাস্তাটি মোহনবাগান ভিলার দক্ষিণ ধার দিয়ে প্রসারিত হয়েছিল। রাস্তা নির্মাণে কিছু জমি ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী ভরাট করে

পাওয়া গিয়েছিল। কিছু জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। আর সেকালের ধনী কীর্তিচন্দ্র মিত্রের উত্তরাধিকারী বিনামূল্যে কিছু জমি দান করেছিলেন। রাস্তাটি ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে তৈরি হয়ে যায়।[১২] কলিকাতা পৌরসভা ২৯ আগস্ট ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে রাস্তাটির মোহনবাগান লেন নামকরণ করেন।

মহারাজা নবকৃষ্ণ দেবের পুত্র রাজা গোপীমোহন দেব এই মোহনবাগানের মালিক ছিলেন। পরে গোপীমোহনের পুত্র রাজা রাধাকান্ত দেব এই বাগানের মালিক হন। সে সময় বাগানটি ছিল ১নং ফড়িয়াপুকুর স্ট্রিটে। সেকালের খ্যাতনামা পাটব্যবসায়ী কীর্তিচন্দ্র মিত্র ঊনবিংশ শতাব্দীর আটের দশকে রাধাকান্ত দেবের উত্তরপুরুষের কাছ থেকে "মোহনবাগান" কিনে নেন। সেকালের কীর্তিমান ইঞ্জিনিয়ার নীলমণি মিত্রকে দিয়ে এক চোখ ধাঁধানো শ্বেত পাথরের প্রাসাদ নির্মাণ করান। কীর্তি মিত্র এই মর্মর প্রাসাদের নাম দেন "মোহনবাগান ভিলা"। এই ভিলার চারি দিকে ছিল প্রকাণ্ড বাগান। সে সময় মোহনবাগান ভিলার সীমানা ছিল উত্তরে ফড়িয়াপুকুর স্ট্রিট (এখন শিবদাস ভাদুড়ি স্ট্রিট), পূর্বে আপার সারকুলার রোড (আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড), পশ্চিমে ও দক্ষিণে যথাক্রমে এখনকার কীর্তি মিত্র লেন ও মোহনবাগান লেন। এটি প্রায় ১৩ বিঘা জমির ওপর অবস্থিত ছিল। গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠানের অল্প কিছুদিন পরে কীর্তি মিত্র মারা যান। তাঁর একমাত্র পুত্র প্রিয়নাথ মিত্র এই উদ্যান ভবনের মালিক হন। তিনি সাধারণের কাছে পি. মিত্র নামে পরিচিত ছিলেন। সুন্দর সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন তিনি।

কলিকাতার বিখ্যাত মোহনবাগান ক্লাব ১৮৮৯ খ্রিঃ প্রিয়নাথ মিত্রের আমলে মোহনবাগান ভিলায় স্থাপিত হয়। মোহনবাগান ভিলার উদ্যানে ক্লাবের খেলাধূলা হত বলে এর নাম হয় মোহনবাগান ক্লাব। প্রিয় মিত্র ছিলেন মোহনবাগান ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষক। আরেক পৃষ্ঠপোষক হলেন ব্যারিস্টার এইচ. ডি. বোস (হরিদাস বোস)। প্রিয় মিত্র মোহনবাগান ক্লাবের ১১ জন খেলোয়াড়দের পোশাক করিয়ে দিয়েছিলেন সেকালের কলিকাতার বিখ্যাত পোশাক প্রস্তুতকারক র‍্যাংকিনের দোকান থেকে। ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে মোহনবাগান ক্লাবের যে শতবর্ষ পূর্তি উৎসব মহা আড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল তাতে এই ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষকদের নাম একবারও উচ্চারিত হয়নি কারুর মুখে। এটা খুবই দুঃখের বিষয়। বাঙালি যে আত্মবিস্মৃত জাতি এ থেকেই তা প্রতীয়মান হয়।

প্রিয় মিত্র রাজা রাজবল্লভ স্ট্রিটে বিলেতি কায়দায় এক অট্টালিকা নির্মাণ করেন। নাম দেন অ্যাসক্রফট হল (Ashcroft Hall)। এই বাড়িতে উঠে আসার পর প্রিয় মিত্র মোহনবাগান ভিলা বিক্রি করতে মনস্থ করেন। এ্যাটর্নি নিমাই বসু, ভূপেন্দ্রনাথ বসু ও আরও একজন এই তিন জন মিলে দেড় লক্ষ টাকায় ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে মোহনবাগান ভিলা কিনে নেন। ওই বছরে কলিকাতায় ট্রিভোলি পার্কে জাতীয় কংগ্রেসের এক অধিবেশন হয়। বাংলার বাইরে থেকে কংগ্রেসের যে সব প্রতিনিধি এসেছিলেন তাঁদের মোহনবাগান ভিলায় রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল। পরের বছর ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে এই বাড়িটি ভেঙে ফেলা হয়।[১৩]

পিতার মতো প্রিয় মিত্রও পাটের ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন। পাটের ব্যবসায়ে সমূহ ক্ষতি হওয়ায় অ্যাসক্রফট হল বিক্রি হয়ে যায়। ভাগ্যকুলের রায়েরা এই বাড়িটি কিনে নেন। প্যারীচরণ সরকারের কনিষ্ঠ পুত্র শৈলেন্দ্রনাথ সরকার এই বাড়িটি ভাড়া নিয়ে সরস্বতী স্কুল স্থাপন করে পঠন-পাঠন শুরু করেন। পরে স্কুলটি এখান থেকে শ্যামপুকুর স্ট্রিটের নিজস্ব বাড়িতে উঠে আসে। প্রিয় মিত্র শেষ বয়সে সব হারিয়ে শুঁড়োর বাগানবাড়িতে আশ্রয় নেন। তাঁর তিন পুত্র রবিন, সিসিল ও মলয় এবং আট কন্যা। প্রিয় মিত্রের মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা পত্নী পুত্র কন্যাদের নিয়ে ১৯/৪, নয়নচাঁদ দত্ত স্ট্রিটের নিজের বাড়িতে চলে আসেন। বর্তমানে এই বাড়িটি রবিন মিত্রের একমাত্র পুত্র অশোক মিত্রের এবং সিসিল মিত্রের একমাত্র কন্যা ও কাঁটাপুকুর সেন বাড়ির গৃহবধূ দীপ্তি সেনের হেপাজতে আছে। অশোক মিত্র এখন দিল্লি প্রবাসী।

এদিকে মোহনবাগান ভিলা বিক্রি হয়ে যাওয়ায় ওই বিশাল উদ্যানবাটির জমি টুকরো টুকরো করে বিক্রি হতে থাকে। ২৫ জানুয়ারি এবং ৩ আগস্ট ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দের কলিকাতা পৌরসভার জেনারেল কমিটির প্রতিবেদনে দেখা যায় যে কমিশনার ভূপেন্দ্রনাথ বসু সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, ১৩ বিঘার বাগানবাড়ির জমি ছোট ছোট খণ্ডে বিক্রি করায় দুটি রাস্তার উদ্ভব হয়েছে। এর

জন্য জমির মালিকেরা ১৮ কাঠার মতো জমি বিনামূল্যে কলিকাতা পৌরসভাকে দিতে চায় যার তৎকালীন বাজার দর ১৩,০০০ টাকা। এই সব ছোট জমির মালিকদের পক্ষে নিজেদের খরচে রাস্তাটি পাকা করা এবং পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তাই পৌরসভার কাছে তাদের নিবেদন যে পৌরসভা নিজ খরচে এই রাস্তাটি পাকা করে দিক অথবা তাদের ৭০০০ টাকা দিক যাতে তারা ওই অর্থ দিয়ে রাস্তাটি সংস্কারের ব্যবস্থা করতে পারে। ভূপেন্দ্রনাথ বসুর বক্তব্য শোনার পর কমিটি রাস্তাটি নির্মাণের অর্ধেক ব্যয়ভার বহনে সম্মত হন।[১৪]

এইভাবে মোহনবাগান ভিলার জমির মধ্যে দুটি রাস্তা নির্মিত হয়—একটি উত্তর-দক্ষিণে, অন্যটি পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত। কলিকাতা পৌরসভার জেনারেল কমিটি তাঁদের ২৩ আগস্ট ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের অধিবেশনে পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত রাস্তাটির মোহনবাগান রো নামকরণ করেন।

অন্য রাস্তাটি কাঁচা অবস্থায় বহুদিন পড়ে থাকে। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে রাস্তাটি পাকা করা এবং পয়ঃপ্রণালী নির্মাণের ব্যবস্থা করা হয়। ১৭ই নভেম্বর ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের অধিবেশনে জেনারেল কমিটি এই নির্মাণ কার্যের জন্য ৭৩৫৭ টাকা ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুর করেন। রাস্তাটি পাকা হলে পর ২০ মে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা পৌরসভা ফড়িয়াপুকুর স্ট্রিট থেকে মোহনবাগান লেন পর্যন্ত প্রসারিত রাস্তাটি কীর্তি মিত্র লেন নামাঙ্কিত করেন।

৬। ১৮৮৭-৮৮ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা পৌরসভা ৮৪০ ফুট লম্বা ও ১৬ ফুট চওড়া নতুন একটি রাস্তা নির্মাণ করেন। অনেকগুলি বস্তি উচ্ছেদ করে রাস্তা নির্মাণ করা হয়। রাস্তাটি উত্তর থেকে দক্ষিণে এসে ক্যানেল রোডের সঙ্গে কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের সংযোগ সাধন করেছে।

এই এলাকার পল্লীবাসীরা পৌরসভার চেয়ারম্যানের কাছে নতুন রাস্তাটির নাম ওই অঞ্চলের বিশিষ্ট অধিবাসী অক্ষয়কুমার বসুর নামে করার জন্য আবেদন করেন। অক্ষয়কুমার বসু ছিলেন কাঁটাপুকুর বসু পরিবারের একজন। আবেদনটির পক্ষে জোরালো যুক্তি দেখিয়ে ওয়ার্ড কমিশনার নলিনবিহারী সরকার বলেন যে অক্ষয়কুমার বসু এই রাস্তা নির্মাণে বিনামূল্যে তাঁর মূল্যবান জমি দান করেছেন। শুধু তাই নয়, অন্য বাসিন্দাদেরও বিনামূল্যে জমি দেবার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন। অক্ষয়বাবুর ঐকান্তিক আগ্রহে ও প্রচেষ্টায় রাস্তা নির্মাণের $\frac{৩}{৪}$ অংশ জমি পৌরসভার পক্ষে বিনামূল্যে পাওয়া সম্ভব হয়েছিল।

কলিকাতা পৌরসভার জেনারেল কমিটি তাঁদের ১৮ জুন ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের অধিবেশনে রাস্তাটি অক্ষয়কুমার বোস লেন নামে নামাঙ্কিত করেন। প্রায় ২৬ বছর পরে পৌরসভা ১০ মার্চ ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের অধিবেশনে রাস্তার নামটি ছোট করে অক্ষয় বোস লেন রাখেন।[১৫]

ওই বছরে অর্থাৎ ১৮৮৭-৮৮ খ্রিস্টাব্দে বাগবাজার অঞ্চলে আরও নতুন ৬টি রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছিল। সেগুলি হল—

(১) হরলাল মিত্র স্ট্রিটের দুটি বাই লেনকে প্রশস্ত করে বাগবাজার স্ট্রিট ও ক্যানেল স্ট্রিটের সংযোগকারী রাস্তার সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। দুটি রাস্তারই দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ১৬০ ফুট ও ৮০ ফুট ও প্রস্থ মাত্র ৯ ফুট। সেকালে এই অঞ্চলকে কপিবাগান বলা হত। কপি চাষ হওয়ার জন্য এলাকাটি এই নামে পরিচিত হয়েছিল। তাই নতুন রাস্তার নাম হয়েছিল কপিবাগান লেন, কপিবাগান বাই লেন প্রভৃতি।

১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের কথা। পৌরসভার কাছে প্রস্তাব আসে যে কপিবাগান লেনের নাম পরিবর্তন করে ঠাকুর রাধাকান্ত লেন করা হোক। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে পল্লীবাসীর আরেক দলের আপত্তি হল যে ঠাকুর রাধাকান্ত জীউ জনসাধারণের উপাস্য দেব নন। ইনি হলেন হরলাল মিত্র স্ট্রিটের এক ব্যক্তিবিশেষের উপাস্য গৃহদেবতা। যেহেতু ঠাকুর রাধাকান্ত কপিবাগান লেনে অবস্থান করেন না, সেই কারণে কপিবাগান লেনের নাম বদলের কোনও সার্থকতা নেই। তাঁরা আরও উল্লেখ করেন যে ১নং ওয়ার্ডে রাধাকান্ত জীউ স্ট্রিট নামে আরেকটি রাস্তা আছে। প্রায় একই নামে দুটি রাস্তা একই ওয়ার্ডে থাকলে ডাক বিলি ব্যবস্থায় গুরুতর সমস্যা দেখা দিতে পারে। পৌরসভা ১৯ নভেম্বর ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের অধিবেশনে

প্রথম প্রস্তাবটি অনুমোদন করেন, ফলে কপিবাগান লেনের নতুন নাম হল ঠাকুর রাধাকান্ত লেন।[১৬]

(২) দ্বিতীয় রাস্তাটির নামকরণ করা হয় ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে। সেই সময় কলিকাতা পৌরসভায় একগুচ্ছ অনামী রাস্তার নামকরণের প্রস্তাব আসে। তার মধ্যে দ্বিতীয় রাস্তাটিও ছিল। পৌরসভা তাঁদের ১২ অক্টোবর ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের অধিবেশনে এই রাস্তাটির নাম করেন গোপাল মিত্র লেন।

পার্শি ও উর্দু সাহিত্যে কৃতবিদ্য, ইংরেজি শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষিত, কলিকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা আইনজীবী, গোপাললাল মিত্র ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের কলিকাতা শহরের পৌর নির্বাচনে ১নং ওয়ার্ডের কমিশনার নির্বাচিত হন। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে রায় বাহাদুর শ্যামাচরণ দে'র মৃত্যু হলে পর তিনি পৌরসভার ভাইস-চেয়ারম্যানের পদ অলংকৃত করেন। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে পৌরসভার চেয়ারম্যান স্যার হেনরী হ্যারিসনের অনুপস্থিতিতে চেয়ারম্যানের কার্য পরিচালনা করেন। সেকালের পৌরসভায় তিনি "Grand old man" নামে পরিচিত ছিলেন। গোপাল মিত্রের পিতা ছিলেন রায় কাশীনাথ প্রসাদ মিত্র বাহাদুর, আর প্রপিতামহ ছিলেন মহারাজা দুর্লভরায়। ইতিহাসে 'রায় দুর্লভ' নামে খ্যাত। প্রথমে নবাব আলবর্দি, পরে নবাব সিরাজদ্দৌল্লার অর্থমন্ত্রী হন। গোপাললাল মিত্র ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।[১৭]

(৩) তৃতীয় নতুন রাস্তাটি দৈর্ঘ্যে ৬৩০ ফুট ও প্রস্থে১৬ ফুট। গোপীমোহন দত্ত লেনকে ক্যানেল রোডের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে। ১২ অক্টোবর ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের অধিবেশনে পৌরসভা অনেকগুলি অনামী রাস্তার নামকরণের সঙ্গে এই রাস্তারও নামকরণ করেন নেবুবাগান লেন। রাস্তাটির নামের মধ্যে নিহিত আছে এর ইতিহাস, অর্থাৎ এককালে এ অঞ্চলে লেবুর বাগান ছিল। কলিকাতার স্থানীয় লোকেরা লেবুকে নেবু বলে। তাই থেকে নেবুবাগান।

পৌরসভা ১৯৩১-৩২ খ্রিস্টাব্দে নেবুবাগান লেন, নেবুবাগান বাই লেন ও মারহাট্টা ডিচ লেনের উন্নতির জন্য ৬০০০ টাকা মঞ্জুর করেন।[১৮]

(৪) বাগবাজার অঞ্চলে ৪নং নতুন রাস্তাটি ৮৫০ ফুট লম্বা ও ১৬ ফুট চওড়া। এটি নবীন সরকার লেনের মুখ থেকে উত্তরে প্রসারিত হয়ে ক্যানেল রোডে এসে পড়েছে। পরবর্তীকালে এটিকে দক্ষিণদিকে বাগবাজার স্ট্রিটের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে রাস্তাটির নাম পশুপতি নাথ বসু লেন রাখা হয়।

পশুপতিনাথ বসু (১৮৫৫-১৯০৭) পাটনা, গয়া ও লোহারডাঙ্গার জমিদার, বাগবাজার পল্লী সমিতির প্রতিষ্ঠাতা, ভারতীয় সঙ্গীত সমাজের আজীবন সদস্য, কলিকাতা পৌরসভার কমিশনার, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য ও কংগ্রেসের জাতীয় তহবিলের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। কলিকাতার বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। বাগবাজারে তিনি একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। তাঁর ভবনে দরিদ্র ছাত্রদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল।

পৌরসভা ১৯ মার্চ ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের অধিবেশনে রাস্তাটির নাম ছোট করে পশুপতি বোস লেন রাখেন।

(৫) পঞ্চম রাস্তাটির নাম নন্দলাল বোস লেন। রাস্তাটি ১০৬০ ফুট দীর্ঘ ও ১৬ ফুট প্রশস্ত, বাগবাজার স্ট্রিটের সঙ্গে ক্যানেল রোডকে সংযুক্ত করেছে।

নন্দলাল বসু (বঃ ১২৫৩-১৩১০)—এঁরা তিন ভাই—মহেন্দ্রনাথ বসু, নন্দলাল বসু ও পশুপতিনাথ বসু। তিন ভাইয়ের নামে কলিকাতায় তিনটি রাস্তা আছে। মহেন্দ্রনাথ ও পশুপতিনাথ সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হয়েছে। পিতা মাধবচন্দ্র বসু। তাঁদের পূর্বপুরুষ রামানন্দ বসু সর্বপ্রথম কলিকাতার কাঁটাপুকুরে এসে বসবাস করেন।

নন্দলাল বসুর সামাজিক ও কর্মজীবন বিশেষভাবে উল্লেখ্য। ১৮৮৮ খ্রিঃ কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনে যখন নতুন কর ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়, তখন তিনি জনমতকে বিধিসম্মত

ভাবে সংহত করে উক্ত আইনের অসঙ্গতি ও অন্যায় দেখিয়েছিলেন।

প্রতীচ্যের প্রভাব আমাদের জাতীয় জীবন গঠনের সহায়ক নয় ভেবে তিনি সাধারণের উপযোগী করে হিন্দু ধর্মের মূল তত্ত্বগুলি সংগ্রহ করে প্রকাশ ও বিনামূল্যে বিতরণ করেন। কায়স্থ সমাজের উন্নয়নকল্পে তিনি 'কায়স্থ কুল-রক্ষিণী সভা' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২০ খ্রিঃ 'কায়স্থ কারিকা' গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এ ছাড়া বহুবিধ দান এবং আর্তের সেবামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

নন্দলাল ছিলেন রামকৃষ্ণদেবের পরম ভক্ত। রামকৃষ্ণদেব নন্দলাল বসুর বাটিতে শুভাগমন করেছিলেন তার উল্লেখ "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত" (৩য়) পুস্তকে উল্লেখ আছে।

শেষ বয়সে তিনি সর্বকর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করে শাস্ত্রালোচনায়, তীর্থ পর্যটনে, সাধুসঙ্গে কালাতিপাত করেন।

(৬) বাগবাজার এলাকায় বিশ্বকোষ লেন নামে যে রাস্তাটি আজও আছে সেটি তৈরি হয়েছিল ১৮৮৮-৮৯ খ্রিস্টাব্দে। রাস্তাটি কাঁটাপুকুর লেনের সঙ্গে শান্তিরাম ঘোষ স্ট্রিটের সংযোগ সাধন করেছিল। ঘিঞ্জি এলাকায় নতুন রাস্তাটি নির্মিত হওয়াতে এলাকার অধিবাসীদের চলাচলের অনেক সুবিধা হয়েছিল।[১৯]

প্রথম থেকেই রাস্তাটির নাম বিশ্বকোষ লেন ছিল না। ১২ অক্টোবর ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের অধিবেশনে পৌরসভা অনেকগুলি অনামী রাস্তার নামকরণের প্রস্তাব নিয়ে বিবেচনা করেন। ওই অধিবেশনে রাস্তাটির নাম কাঁটাপুকুর বাই লেন রাখা হয়। ১৭ মার্চ ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের অধিবেশনে পৌরসভা কাঁটাপুকুর বাই লেনের নাম বদলে 'বিশ্বকোষ লেন' রাখেন।

"বিশ্বকোষ" বাংলা ভাষার কোষ গ্রন্থ। পুস্তকটি রচনার সূচনা করেন রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় ও ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। এঁদের আরব্ধ বিশ্বকোষের ভার নগেন্দ্রনাথ বসু (১৮৬৬-১৯৩৮) প্রথম থেকেই নিজ স্কন্ধে তুলে নেন। ভারতীয় ভাষায় বিশ্বকোষই প্রথম কোষগ্রন্থ (এনসাইক্লোপিডিয়া)। নগেনবাবু গ্রন্থটি ২২ খণ্ডে সম্পূর্ণ করেন। শেষ খণ্ডের প্রকাশকাল ১৩১৮ বঙ্গাব্দ। এর হিন্দি সংস্করণও প্রকাশ করেন ২৪ খণ্ডে। প্রকাশকাল ১৯১৬ থেকে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে।[২০]

বিশ্বকোষের মতো কোষগ্রন্থের নামে রাস্তার নামকরণের মধ্য দিয়ে সেকালের কলিকাতা পৌর প্রতিনিধিদের সূক্ষ্ম রুচিবোধের পরিচয় মেলে। কলিকাতার রাস্তার ইতিহাসে এটি একটি অভিনব সংযোজনা। পরবর্তীকালে আরেকটি পুস্তকের নামে কলিকাতার অন্য একটি পথ নামাঙ্কিত হয়, সেটি 'স্বর্ণলতা স্ট্রিট'। ভারতবর্ষের কোনও শহরের রাজপথের নাম পুস্তকের নামে নামাঙ্কিত হয়েছে কিনা সন্দেহ আছে।

বিশ্বকোষ লেনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে কবি সমর সেন লিখেছেন, "শৈশবের প্রথম স্মৃতি বাগবাজারের বিশ্বকোষ লেনের একান্নবর্তী পরিবার—বিশ্বকোষ রচয়িতা প্রখ্যাত নগেন বসুর বাড়ি লাগোয়া তিনতলা বাড়ি। বাবা অরুণচন্দ্র সেন ছিলেন ইতিহাসের অধ্যাপক। দিল্লির সেন্ট স্টিফেন্স কলেজ, রঙপুর কারমাইকেল কলেজ এবং অন্য একটি কলেজে পড়িয়ে যোগ দিয়েছিলেন স্কটিশ চার্চ কলেজে। মার দাদামশাই ছিলেন জগদীশ নাথ রায়, যাঁকে বঙ্কিমচন্দ্র 'বিষবৃক্ষ' উৎসর্গ করেন।

"রবীন্দ্রনাথ একবার দুপুরে নিমন্ত্রণে এসেছিলেন বিশ্বকোষ লেনে। ঘরদোর সাফ করার ভার ছিল ছোটদের উপর। সকাল থেকে বালতি বালতি জল খরচ হয়। কবি এসে ষোড়শ ব্যঞ্জনের কয়েকটা মাত্র স্পর্শ করলেন—তখন মনে হয়েছিল আমরা বাঙালিরা কত অপচয় করি।

"ঠাকুরদা দীনেশচন্দ্রের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে তাঁর অক্লান্ত অনুরাগ ও গবেষণায় অসাধারণ পরিশ্রমের কথা—বাগবাজারে ঠাকুরদা লেখাপড়া করতেন একতলার একটা ছোট ঘরের মেঝেতে বসে। চেয়ার টেবিলের বালাই ছিল না। অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি আসতেন।

"নগেন বসুর রকে সকাল বিকেলে উঠতি বয়সীদের ভিড় জমত। আমিও বসতাম।

কলতলায় দিনে ঝি, রাতে বারবধূদের জমায়েত হত। অনেকের চেহারা ও স্বাস্থ্য খাসা ছিল। রসালাপে কলতলা মুখর হয়ে উঠত। কলতলার রকে যুব সমাবেশের কারণ সে বয়সে ঠিক ধরতে পারিনি।"[২১]

ক্ষত্রিয় সমিতির মুখপত্র ছিল "ক্ষত্রিয়" পত্রিকা। এটি ৯নং বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার থেকে প্রকাশিত হত। এর সম্পাদক ছিলেন যোগেন্দ্রনাথ রায় ও প্রসন্নকুমার শর্মা। পত্রিকাটি ১৩২৮ সনে প্রথম প্রকাশিত হয়। ক্ষত্রিয় পত্রিকায় ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষিকার্য ও দেশরক্ষা সম্পর্কে মূল্যবান প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল।[২২]

## ২নং ওয়ার্ড

১। রমজান ওস্তাগর লেন নিমতলা অঞ্চলে অবস্থিত, কলিকাতার একটি প্রাচীন পথ। মহম্মদ রমজান সেকালের একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান। তিনি এই রাস্তার ধারে একটি মসজিদ ও পানীয় জলের এক পুষ্করিণী নির্মাণ করে দেন। তাঁরই নামে এই রাস্তাটির নামকরণ হয়। মহম্মদ রমজান কিন্তু ওস্তাগর ছিলেন না। বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন মৌলভী আমেদ। তিনি ২৫ মে ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের পৌরসভার অধিবেশনে রাস্তাটির নাম সংশোধনের এক প্রস্তাব রাখেন। প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। নতুন নাম হয় 'মহম্মদ রমজান লেন'। সেই নাম আজও বহাল আছে।

১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে রমজান ওস্তাগর লেনের পশ্চিম দিকের খানিকটা অংশ নিয়ে মদন দত্ত লেন নামাঙ্কিত হয়।[২৩] এখানেও রমজান ওস্তাগর লেনের মতো ভুলের পুনরাবৃত্তি হয়। যদুলাল মল্লিক ২৫ মে ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের পৌর অধিবেশনে সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে মদনমোহন দত্তকে মদন দত্ত করা ভুল ছাড়া আর কিছুই নয়। এটি সংশোধন করা হোক। সভা যদুলাল মল্লিকের প্রস্তাব মেনে নিয়ে রাস্তাটির নাম 'মদনমোহন দত্ত লেন' রাখেন।

রমজান ওস্তাগর লেনের পশ্চিম দিকের যে অংশ মদন দত্ত লেন নামাঙ্কিত হয়েছিল সেখানে অনেকগুলি পাটের গুদাম ছিল, রাস্তাটি ছিল অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। এমনকি দুটি ঠেলা গাড়িও পাশাপাশি যেতে পারত না। ফলে যানজটের ঝামেলায় গুদামের মালিকরা বিরক্ত হত। ১৫নং ভবনের মালিক বাবু রামদয়াল দত্ত রাস্তাটির উন্নতি বিধানের জন্য ১০০০ টাকা পৌরসভার হাতে দেন। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে পৌরসভা রাস্তাটি চওড়া করার ব্যবস্থা করেন।[২৪]

মদনমোহন দত্ত (১৭১০-১৭৮৭) হাটখোলার দত্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। মদনমোহনের পিতামহ রামচন্দ্র কোম্পানির নির্দেশে গোবিন্দপুর ছেড়ে চিৎপুর রোডের উপর জোড়াসাঁকোতে ভূমি লাভ করেন। চিৎপুর রোডকে সেকালে পিলগ্রিম রোড বলা হত। সেইসময় এই পথ দিয়ে সর্বদা কোম্পানির সৈন্য চলাচল করত। তাই রামচন্দ্রের এই স্থান পছন্দ হয়নি। সে যাই হোক, তিনি তাঁর বাড়ির পিছনে একটি সুন্দর বাগান করেন, তাই থেকে সে জায়গার নাম হয় রামবাগান। তিনি তাঁর বাড়ির সামনে একটি বাজার পত্তন করেন। সেকালে এই বাজারকে রামবাজার বলা হত। আপজন সাহেবের ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের কলিকাতার মানচিত্রে রামবাজারের উল্লেখ আছে। অবশেষে তিনি চিৎপুরের জোড়াসাঁকোর বাড়ি ছেড়ে হাটখোলায় নিমতলা ঘাটের সম্মুখে অর্থাৎ দরমাহাটা ও স্ট্র্যান্ডরোডের সংযোগস্থলে পূর্বদিকে নতুন ভবনে উঠে আসেন।

মদনমোহন দত্ত ব্যবসা বাণিজ্যের দৌলতে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। তৎকালে পোস্তার রাজাদের পূর্বপুরুষ লক্ষ্মীনারায়ণ ধরের বিশেষ আনুকূল্য লাভ করেন। লক্ষ্মীনারায়ণ ধরকে লোকে নকু ধর বলত। তাঁর বাসস্থান ছিল নতুনবাজারের উত্তরাংশে চড়কডাঙ্গায়। এখন নাম টেগোর ক্যাসেল স্ট্রিট।

প্রথমে মদনমোহন দত্ত কোম্পানির অধীনে লবণ বিভাগের দেওয়ান হন। সেই সময় নবাব সিরাজদ্দৌলা কলিকাতা আক্রমণ করলে মদনমোহন সপরিবারে কলিকাতা ত্যাগ করে ভগ্নীর কাছে বারুইপুরে যান। তাঁর কলিকাতা ভবন ও সম্পত্তি লুণ্ঠিত হয়। কিন্তু তাঁর বাণিজ্য জাহাজগুলির বিশেষ ক্ষতি হয়নি। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি সল্ট কমিটির দেওয়ান নিযুক্ত হন।

কলিকাতায় মদনমোহন একজন প্রধান ব্যাঙ্কার ছিলেন। যে প্রচুর অর্থ তিনি উপার্জন করেছিলেন তার বহু অংশ সৎ কাজে ব্যয় করেন। কাশীর ছত্রিশ যোগিনী ঘাটে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বৃহৎ শিবলিঙ্গ আছে। গয়াধামে কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় করে ৩৯৫টি প্রেতশিলার সোপান নির্মাণ করে দেন। এ ছাড়া বাংলা দেশের চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ তীর্থের পাহাড়ে ওঠার সিঁড়ি বাঁধিয়ে দেন। মেদিনীপুর, ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলে বৃহৎ জলাশয় ও শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই সব প্রতিষ্ঠিত দেবসেবার জন্য অর্থ ও সম্পত্তির ব্যবস্থা করেছিলেন।[২৫]

২। এই ওয়ার্ডে ১৮৮২-৮৩ খ্রিস্টাব্দে ৭৮০ ফুট লম্বা ও ১৬ ফুট চওড়া নতুন একটি রাস্তা নির্মিত হয়। এটি নাথেরবাগান স্ট্রিট ও বেনিয়াটোলা স্ট্রিটের মধ্যে তৈরি করা হয়। যতগুলি রাস্তা এই বছরে তৈরি হয়েছে তার মধ্যে এই রাস্তাটির গুরুত্ব সর্বাধিক। দীর্ঘ খোলা পয়ঃপ্রণালী ভরাট করে চলাচলের পথ তৈরি হয়েছিল। রাস্তাটি নির্মাণে এলাকার শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। এখানে যে বস্তি উচ্ছেদ করা হয়েছিল তাতে প্রধানত বারবনিতারা বাস করত। নতুন রাস্তা হওয়াতে ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হয়েছিল।[২৬] রাস্তাটির নামকরণ করা হয়েছিল সেন লেন। ওখানকার বর্ধিষ্ণু পরিবার হল সেন। রাস্তা নির্মাণে অনেক জমি দান করেছিলেন এই সেন পরিবার।

৩। আহিরিটোলায় নাথেরবাগান অঞ্চলে ১৮৮৪-৮৫ খ্রিস্টাব্দে নতুন একটি রাস্তা নির্মিত হয়। এটির নাম নাথেরবাগান লেন। রাস্তাটি বেনেটোলা স্ট্রিটের সঙ্গে আহিরিটোলার সংযোগ ঘটিয়েছিল। নাথেরবাগান বস্তির মধ্যে দিয়ে নতুন পথ প্রসারিত হওয়াতে এলাকায় আলো বাতাসের প্রাচুর্য ঘটেছিল।

একসময় আহিরিটোলা অঞ্চলে নাথ সম্প্রদায়ভুক্ত ভক্তবৃন্দ বাস করতেন। "নাথ" কথাটি নাথ সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ গুরুগণের বা সিদ্ধাচার্যগণের উপাধিরূপে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যোগীগণ যখন প্রকৃত সিদ্ধিলাভ করেন তখনই তাঁরা প্রকৃত নাথ হন। "মহাদেব" নাথ গুরুগণের আরাধ্য বা আদর্শ। নাথ-পন্থীদের মধ্যযুগে তন্ত্র, হঠযোগ, সহজিয়া, শৈবাচার, ধর্মপূজা প্রভৃতি অনুষ্ঠানই তাঁদের সাধন মার্গ। নাথ যোগীদের মাথায় জটা, সর্বাঙ্গে ছাই ভস্ম, কানে কড়ি ও কুণ্ডল, গলায় সূতা বা সেলী, তাতে কাঠের নাদ গাঁথা, বাহুতে রুদ্রাক্ষ, হাতে ত্রিশূল, পায়ে নূপুর, কাঁধে ঝুলি ও কাঁথা। অধিকাংশই জাতিতে যুগী, জীবিকা কাপড় বোনা, কেহ কেহ বা কবিরাজ।[২৭]

নাথ সম্প্রদায়ের বসবাসের ফলে আহিরিটোলার এই অঞ্চল নাথেরবাগান নামে পরিচিতি লাভ করে। অঞ্চলটি ছিল বস্তি প্রধান। বস্তি উচ্ছেদ করে এই এলাকায় নতুন নতুন রাস্তা নির্মিত হয়।

প্রদীপ জ্বালানোর আগে যেমন সলতে পাকাতে হয় তেমনি নাথেরবাগান প্রসঙ্গে আহিরিটোলা সম্বন্ধে দু'চার কথা না বললে আলোচনা অসমাপ্ত থেকে যায়। কলিকাতার প্রাচীন পথের অন্তর্নিহিত অর্থের অনুসন্ধান করতে গিয়ে শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেন লিখেছেন, "প্রথম ধরি 'টোলা' অন্তক নামগুলি। 'টোলা' ছোট হলে টুলি, বোঝায় কোন জীবিকা কাজের জন্য অস্থায়ী, অ-পোক্ত আবাস অর্থাৎ ঝাঁপড়ি, কুঁড়ে, তাঁবু, কামরা ছাউনি ইত্যাদির মতো। একদা আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা বিদ্যা-শিক্ষা দিতেন এই রকম অস্থায়ী আবাসে। তাই বলত 'টোল'। কলকাতার যে সব অঞ্চলে একটু নিম্নস্তরের জীবিকা অবলম্বনকারীদের অস্থায়ী আস্তানা বা কুঁড়ে ঘর সারি সারি থাকত সেই অঞ্চলের নাম হত 'টোলা' দিয়ে।...আহিরিটোলা নামটির ঠিক উচ্চারণ ও বানান 'আহিড়ি টোলা'। আহিড়ি মানে পাকমারা শিকারিদের আস্তানা।"[২৮] অন্য আরেক দল কলিকাতা গবেষকদের মতে সংস্কৃত আভীর শব্দ থেকে হিন্দি 'আহির' শব্দ এসেছে। আহিরিটোলার অর্থ গয়লাপাড়া। একসময় বিহারী ও বাঙালি গয়লাদের ঘনবসতি গড়ে উঠেছিল এই অঞ্চলে। তাই থেকে অঞ্চলের নাম হয় আহিরিটোলা। সে সময় এটি সুতানুটি মৌজার অন্তর্গত ছিল। শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ দেব এই অঞ্চলের অধিকাংশ জমির মালিক ছিলেন। এই অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে যে প্রধান রাস্তাটি প্রসারিত হয়েছিল তাই আহিরিটোলা স্ট্রিট নামে আখ্যাত হয়। সে সময় রাস্তাটি চিৎপুর রোড থেকে শুরু হয়ে স্ট্র্যান্ড রোড নর্থ পর্যন্ত প্রসারিত ছিল।

আহিরিটোলার প্রাচীন অধিবাসীদের মধ্যে মুখোপাধ্যায় পরিবারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এই

বংশের রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায় কনৌজ থেকে এসে আহিরিটোলায় বসবাস শুরু করেন। মহারাজা নবকৃষ্ণ তাঁকে ভদ্রাসন নির্মাণের জন্য জমি দান করেন। রামনারায়ণের উত্তরপুরুষ চন্দ্রকান্ত এই বংশের কৃতী সন্তান। তিনি ছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বেনিয়ান, কর্মসূত্রে বিপুল অর্থের মালিক হয়েছিলেন। তিনি আহিরিটোলার বাজারের প্রতিষ্ঠাতা। এই বংশের স্বনামধন্য পুরুষ পার্বতী মুখোপাধ্যায়, আহিরিটোলা অঞ্চলে বহু জনহিতকর ও সমাজসেবামূলক কাজে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৮৫৯ খ্রিঃ তাঁরই উদ্যোগে আহিরিটোলা বঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। শতবর্ষ অতিক্রম করে আজও সগৌরবে অধিষ্ঠিত এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। নাটকের সঙ্গে এই বাড়ির সম্পর্ক ছিল নিবিড়। এই বাড়িতে এক সময় স্থাপিত হয়েছিল আহিরিটোলা ক্লাব। নাটকের আকর্ষণে বহুবার এই বাড়িতে এসেছেন নাট্যসম্রাট গিরিশ চন্দ্র ঘোষ ও তাঁর পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু)। মুখোপাধ্যায় পরিবারের নাট্যপ্রীতি ও জনসেবার প্রতি অনুরাগ পরবর্তী প্রজন্মেও সঞ্চারিত হয়েছিল। এই পরিবারের উত্তরপুরুষ যাদব মুখোপাধ্যায় আহিরিটোলা অঞ্চলে বহু জনহিতকর ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত। বহুদিন তিনি কলিকাতা পৌরসভার নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি ১৬৩নং আহিরিটোলা স্ট্রিটের পৈতৃক বাড়িতে বাস করেন।

শীতলা মন্দির আহিরিটোলা অঞ্চলের বিশিষ্ট মন্দির। ১৩২০ বঙ্গাব্দে গোপালচন্দ্র রাজপণ্ডিত এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। শীতলা মাতার স্মরণে শীতলা লেন নামাঙ্কিত হয়েছে।

আহিরিটোলার প্রাচীন অধিবাসীদের মধ্যে শঙ্কর হালদারের নাম উল্লেখ্য। তাঁর পুরো নাম ছিল রামশঙ্কর হালদার। তাঁর নামে আহিরিটোলায় দুটি রাস্তা আছে—শঙ্কর হালদার লেন ও শঙ্কর হালদার বাই লেন। পূর্ণচন্দ্র দে তাঁর সম্বন্ধে লিখেছেন—"রামশঙ্কর হালদার John Zephanian Holwell সাহেবের দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার মত বলবান ও ঔদরিক পুরুষ তৎকালে কলিকাতায় কেহই ছিলেন না। তিনি ২৭ খানি গোরুর গাড়ি ধরিয়া রাখতে পারিতেন। এখনও আহিরিটোলায় শঙ্কর হালদারস্ লেন তাঁহার নাম জাগরুক রাখিয়া দিয়াছে।"[২৯]

ফিরে আসি আহিরিটোলা স্ট্রিটের কথায়। এটি কলিকাতার প্রাচীন রাস্তাগুলির অন্যতম। মার্ক উডের কলিকাতা মানচিত্রে (১৭৮৪ খ্রিঃ) আহিরিটোলা স্ট্রিটের উল্লেখ আছে। কলিকাতায় জনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই অঞ্চলে ঘন বস্তিবাড়ি গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে এখানে গড়ে ওঠে ডাল বিক্রির বিরাট আড়ত। নাম ছিল আহিরিটোলা ডালগোলা। একে অস্বাস্থ্যকর সারি সারি বস্তি, তার ওপর গড়ে উঠেছে বড় বড় ডালের গুদাম। ইঁদুর বাঁদরের উৎপাতে অঞ্চলের লোকেরা হয়ে ওঠে অতিষ্ট। কলিকাতা পৌরসভার তৎকালীন হেলথ অফিসারেরা কলিকাতা পৌরসভাকে ওই সব বস্তি উচ্ছেদ করার জন্য তৎপর হতে আহ্বান জানান। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দশকে কলিকাতায় প্লেগ রোগ যখন ভয়াবহ মহামারীরূপে দেখা দেয়, সে সময় এই অঞ্চল ভীষণভাবে প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়। তখন থেকেই বস্তি উচ্ছেদের চিন্তাভাবনা দানা বাঁধতে থাকে। ইতিমধ্যে কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা স্থাপিত হওয়ায় বস্তি উচ্ছেদের প্রস্তাব জোরালো সমর্থন পেতে থাকে। ১৮ নভেম্বর ১৯১৪ খ্রিঃ অনুষ্ঠিত কলিকাতা পৌর অধিবেশনে পৌর-প্রতিনিধি সীতানাথ রায় আহিরিটোলা অঞ্চলের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, "That successive Health Officers had condemned this place a veritable Plague Spot, as being one of the most insanitary areas in Calcutta. It was extremely dirty, and a hot bed of all epidemic. There was not a single masonry building in the area, it was a perpetual menace to the health of the neighbourhood. Serveral residents of which had asked me to propose the acquisition of the Bustees for the purpose of the construction of a square by the C.I.T."। ওই দিনই (১৮ নভেম্বর ১৯১৪) কলিকাতা পৌরসভা আহিরিটোলার ডালগোলা বস্তি উচ্ছেদ করে ওই জায়গায় একটি উদ্যান নির্মাণের জন্য কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থার কাছে সুপারিশ করেন। উদ্যান নির্মাণের ব্যয় ধরা হয়েছিল ৩,৬৬,৬৫০ টাকা—তার মধ্যে ৫ বিঘা ৮ কাঠা জমি অধিগ্রহণের মূল্য ধরা হয়েছিল ৩,৪৮,৩৫০ টাকা এবং রাস্তা নির্মাণের জন্য ১৮,৩০০ টাকা।[৩০]

কলিকাতা পৌরসভার এই সুপারিশ পাবার পর কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা আহিরিটোলা অঞ্চলের

সবাঙ্গীণ উন্নতির জন্য তৎপর হন। তাঁরা ওই অঞ্চলের উন্নতির জন্য দুটি সড়ক পরিকল্পনা রচনা করেন—

১. Proposed Public Street No. VI (Ahiritola Diagonal)

২. Proposed Public Street No. VIII (Ahiritola Street Wideneing)

প্রথম প্রস্তাবে বলা হয় চিৎপুর রোড থেকে নিমতলা ঘাট স্ট্রিট পর্যন্ত একটি Diagonal Road নির্মিত হবে। এটি ৮৪ ফুট চওড়া হবে। দুপাশে ফুটপাত রাখার ব্যবস্থা থাকবে। এটি রূপায়ণের জন্য নিমতলা ঘাট স্ট্রিট, আহিরিটোলা স্ট্রিট, আহিরিটোলা সেকেন্ড লেন, শঙ্কর হালদার লেন, শঙ্কর হালদার বাই লেন, আপার চিৎপুর রোড, বাবুরাম ঘোষ লেন, হর ঢোল লেন, বেনিয়াটোলা স্ট্রিট, সোনার গৌরাঙ্গ টেম্পল লেন প্রভৃতি রাস্তায় অবস্থিত কিছু কিছু বাড়ি অধিগ্রহণের ব্যবস্থা হবে। প্রস্তাবটি ১৯১৬ সালের মে মাসে পৌরসভার বিবেচনার জন্য পাঠানো হয়। পৌরসভা দু'টি সংশোধনী দিয়ে প্রস্তাবটি অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করেন। প্রথম সংশোধনীতে বলা হয় যে ২৯৬নং আপার চিৎপুর রোডে নির্ণীয়মান বৃহৎ অট্টালিকাটি না ভেঙে রাস্তার প্রস্থ ৭০ ফুট করা হোক। দ্বিতীয় সংশোধনীতে বলা হয় ১৩২নং আহিরিটোলা স্ট্রিটে শীতলা মন্দিরের সামনে যে বারান্দা আছে সেটি রক্ষা করার জন্য রাস্তার alignment দক্ষিণ দিকে সরিয়ে দেওয়া হোক। আর দু' নম্বর প্রস্তাবে আহিরিটোলা স্ট্রিটকে প্রশস্ত করার জন্য ওই রাস্তায় অবস্থিত কয়েকটি বাড়ি অধিগ্রহণের কথা বলা হয়।

কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থার প্রস্তাবিত এই দুটি প্রকল্প নিয়ে কাজ আরম্ভ হয়। প্রস্তাবিত ৮৪ ফুট চওড়া Diagonal Roadকে চিৎপুর রোড থেকে আরও পূর্বদিকে গ্রে স্ট্রিট পর্যন্ত প্রসারিত করার প্রয়োজন দেখা দেয়। অতঃপর কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা নতুন একটি পরিকল্পনা (Scheme No. XLIV—Diagonal Raod—Grey Street to Nimtola Ghat Street) রূপায়ণে তৎপর হন। এটি ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪ খ্রিঃ প্রকাশিত হয়। ২১ জুন ১৯৩৫ সালে সরকারের অনুমোদন পাওয়া যায়। প্রকল্পটি রূপায়ণের জন্য ১৭·৭৩ একর জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব ছিল। জমি অধিগ্রহণের ব্যয় ধরা হয়েছিল ২১ লক্ষ টাকা এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের জন্য ৬,৪১,০০০ টাকা।[৩১] ১৯৩৮ সালের শেষের দিকে Diagonal Roadটি তৈরি হয়ে যায়। এর ফলে আহিরিটোলা স্ট্রিট, বাবুরাম ঘোষ লেন, গোপীকৃষ্ণ পাল লেন, কালীকৃষ্ণ ব্যানার্জি রোড প্রভৃতি রাস্তাগুলির মধ্য দিয়ে নবনির্মিত Diagonal Road প্রসারিত হয়। আহিরিটোলা ডালগোলার বস্তি উঠে গিয়ে আহিরিটোলা সেকেন্ড লেনের পশ্চিম দিকে নতুন উদ্যান নির্মিত হয়। উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি রূপায়ণের ফলে আহিরিটোলা অঞ্চলের নোংরা ঘিঞ্জি ও অস্বাস্থ্যকর অবস্থা অপসারিত হয়। রাস্তা প্রশস্ত হওয়ায় যানচলাচল সহজসাধ্য হয় এবং সুষ্ঠু বায়ুচলাচলের ফলে আহিরিটোলায় স্বাস্থ্যকর পরিবেশ গড়ে ওঠে।

কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে শেষের দিকে নবনির্মিত রাস্তা (Diagonal Road) এবং উদ্যানটি কলিকাতা পৌরসভাকে হস্তান্তরিত করেন। কলিকাতা পৌরসভা ১৫ মার্চ ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের অধিবেশনে এই রাস্তা ও উদ্যান সেকালের খ্যাতনামা ব্যবসায়ী ও সমাজসেবী বটকৃষ্ণ পালের নামে যথাক্রমে 'বটকৃষ্ণ পাল অ্যাভিনিউ' এবং 'বটকৃষ্ণ পাল স্কোয়ার' নামাঙ্কিত করেন।[৩২]

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য বটকৃষ্ণ পালের নামে কলিকাতায় আরও দুটি রাস্তা আছে। একটি রাস্তা তাঁর বেনেটোলার বসতবাড়ির পাশ দিয়ে প্রসারিত। পূর্বে এই রাস্তাটি বেনিয়াটোলা বাই লেন নামে নামাঙ্কিত ছিল। কলিকাতা পৌরসভার ১২ অক্টোবর ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের অধিবেশনে রাস্তাটির নাম পরিবর্তন করে 'বটকৃষ্ণ লেন' রাখা হয়। আর দ্বিতীয় রাস্তাটি দমদম রেলস্টেশনের কাছে দমদম রোডের ওপর বি কে পাল এ্যান্ড কোং-এর যে কারখানা ও বাগানবাড়ি আছে তারই কাছ দিয়ে প্রসারিত হয়েছে 'বি কে পাল লেন'। এ ছাড়াও হেদুয়াতে আছে বটকৃষ্ণের মর্মর মূর্তি।

বাঙালি ওষুধ ব্যবসায়ীদের অন্যতম পথিকৃৎ বটকৃষ্ণ পাল (১৮৩৫-১৯১৪)। সামান্য আফিমের দোকান থেকে যাত্রা শুরু করে পরবর্তীকালে বিখ্যাত বি কে পাল অ্যান্ড কোং প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারীরূপে আখ্যাত হন। তাই তাঁর যাত্রাপথ যেমন নাটকীয় তেমনি ঘটনাবহুল। পিতা লক্ষ্মীনারায়ণ পাল শিবপুরের প্রাচীন গন্ধবণিক পরিবারের সন্তান। মাতা শ্যামাসুন্দরী দাসী।

শিবপুরের নবগোপাল মুখার্জি লেনে বটকৃষ্ণের জন্ম হয়। ছেলেবেলায় পিতামাতাকে হারিয়ে কলিকাতার বেনিয়াটোলা স্ট্রিটে মাতুলালয়ে মানুষ হন। মামা রামকুমারের চিৎপুরের নতুনবাজারে মশলার দোকান ছিল। মাত্র ১২ বছর বয়সে বটকৃষ্ণ মামার দোকানে শিক্ষানবিশ হন। ওই বয়সে তিনি স্বাধীন ব্যবসা করার স্বপ্ন দেখতেন। তাই ১৬ বছর বয়সে মামার দোকানের কাজ ছেড়ে চিৎপুর রোডে ছোট্ট একটা আফিমের দোকান খোলেন। এরপর নতুন নতুন ব্যবসা সূত্র ধরে অগ্রসর হয়েছেন—পাটের ব্যবসা ছেড়ে ১৮৫৬ খ্রিঃ খোংরাপট্টিতে খুললেন মশলার দোকান। অর্থের অনটন দেখা দেওয়ায় ব্যবসার অংশীদার করলেন মাধবচন্দ্র দাঁকে। বটকৃষ্ণ তাঁর ব্যবসায়িক দূরদৃষ্টি দিয়ে অনুভব করেছিলেন যে ভবিষ্যতে এ দেশে এক বিরাট ওষুধের ব্যবসা গড়ে ওঠার সম্ভাবনা প্রবল। কাজেই বিদেশি ওষুধ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এদেশে নানাবিধ ওষুধ আমদানির ব্যবস্থা করলেন। তাঁর স্থাপিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বি কে পাল অ্যান্ড কোম্পানি এক সময় দেশি ফরমূলায় তৈরি ওষুধ বিক্রি করে স্বদেশে ও বিদেশে খ্যাতি অর্জন করে। বটকৃষ্ণের এই প্রচেষ্টা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বেঙ্গল কেমিক্যাল কোম্পানি স্থাপনের পূর্বের ঘটনা।

দয়ালু ও দাতারূপে বটকৃষ্ণের সমধিক প্রসিদ্ধি ছিল। নিজ জন্মস্থান শিবপুরে একটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন করে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে এটিই বি কে পাল ইনষ্টিটিউশন নামে খ্যাত হয়। এ ছাড়াও বেনিয়াটোলায় বালক ও বালিকাদের জন্য দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বটকৃষ্ণ ৮২নং বেনিয়াটোলা স্ট্রিটে বাস করতেন।

১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে ব্যবসা থেকে অবসর নিয়ে তিনি বাকি জীবন কাশীতে অতিবাহিত করেন। ব্যবসার হাল ধরে তাঁর পুত্রেরা এবং তাঁদের সুযোগ্য পরিচালনায় বি কে পাল অ্যান্ড কোম্পানি ওষুধ ব্যবসায়ে গৌরবের চরম সীমায় পৌঁছে যায়।[৩৩]

বটকৃষ্ণ ১নং বনফিল্ড লেনের বাড়ি ক্রয় করে নতুন একটি ওষুধের দোকান পুত্র ভূতনাথের তত্ত্বাবধানে পরিচালনার ব্যবস্থা করেন। ব্যবসা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ১২নং বনফিল্ড লেনে জমি কিনে বড় একটি বাড়ি করা হয়। ওষুধ গুদামজাত করার জন্য গুদাম বাড়ি করা হয় ১৬ ও ১৭নং পুরাতন চীনে বাজার স্ট্রিটে (এখন সিনাগগ স্ট্রিট)। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে ৩০নং শোভাবাজার স্ট্রিটে (এখন ৯২নং) পাল পরিবারের বসতবাটি নির্মিত হয়। এই বাড়িতে আছে হাওয়ামহল, গ্রন্থাগার, কিছু কিছু দুষ্প্রাপ্য তৈলচিত্র আর একতলায় আছে ওষুধের দোকান প্রভৃতি। এখানে স্থানের অকুলান হওয়ায় ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে ১৮নং শশী সুর লেনে পরীক্ষাগার স্থাপন করা হয়। বটকৃষ্ণের পুত্রেরা কেবলমাত্র ওষুধের ব্যবসায়েই মনোনিবেশ করেননি, সেই সঙ্গে আরও অনেক ব্যবসার প্রবর্তন করেছিলেন—যেমন দন্ত চিকিৎসা, চক্ষু চিকিৎসা, অ্যারোরুট চাষ, শল্য চিকিৎসা, যন্ত্রপাতি মেরামত, আয়ুর্বেদ ওষুধ প্রস্তুত, ম্যালেরিয়ার ওষুধ প্রস্তুত, বিলিতি মদের দোকান প্রভৃতি ১৬টি বিভাগ চালু করেছিলেন। বি কে পাল অ্যান্ড কোম্পানি প্রসঙ্গে ইংলন্ডের "কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট" পত্রিকায় ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ২৮ অক্টোবর যে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছিল তা উল্লেখের দাবি রাখে :

"Truth is stranger than fiction, but would anybody believe that this Indian firm sells more pharmaceutical preparations than any other chemist's shop in the world." বাঙালি প্রতিষ্ঠানের প্রতি এই মন্তব্য শ্লাঘার বিষয় সন্দেহ নেই।

৪। শোভাবাজার অঞ্চলে ১৮৮৮-৮৯ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা পৌরসভা ২৫০ ফুট লম্বা ও ১৬ ফুট চওড়া নতুন একটি রাস্তা নির্মাণ করেন। এটি বলরাম মজুমদার স্ট্রিটের সঙ্গে কৃপানাথ লেনের সংযোগ ঘটিয়েছে। রাস্তাটির নামকরণ করা হয় 'রসিকলাল ঘোষ লেন'।

রসিকলালের জন্ম হয় ১৮১৭-তে। তাঁর পিতা রামধন ঘোষই ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম নীলকুঠির প্রতিষ্ঠাতা,—তাঁর নীলকুঠি ছিল বিহারে। রসিকলালের শিক্ষা শুরু হয় রাজা রামমোহন রায়ের বিদ্যালয়ে। ডেভিড হেয়ারের কাছ থেকে ইংরেজি জ্ঞানের জন্য প্রশংসাপত্র লাভ করেন। বীরভূমের সিংহ পরিবারের শিক্ষক হয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। পরে ভারতের অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেলের অফিসে চাকুরি, তাই থেকে উচ্চ সরকারি পদ লাভ। তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁর

মাতৃভক্তি। দরিদ্রের প্রতি ছিল তাঁর গভীর সহানুভূতি। মাত্র ৫২ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন।[৩৪]

## ৩নং ওয়ার্ড

১৮৮৮-৮৯ খ্রিস্টাব্দে রাজাবাগান বস্তির উত্তর-পশ্চিম দিকে যানবাহন চলাচলের উপযোগী দুটি রাস্তা তৈরি হয়—

(১) প্রথম রাস্তাটি ৩০০ ফুট লম্বা ও ৩০ ফুট চওড়া, কর্নওয়ালিস স্ট্রিট থেকে আরম্ভ হয়ে পূর্বদিকে প্রসারিত হয়ে দ্বিতীয় রাস্তাটির সঙ্গে সমকোণে মিশেছে।

(২) এই রাস্তাটি গ্রে স্ট্রিট থেকে আরম্ভ হয়ে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে প্রথম রাস্তাটির সমকোণে এসে পড়েছে। পরে আরও দক্ষিণে এগিয়ে রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রিটে এসে মিশেছে। এটি ৬৭০ ফুট লম্বা ও ৩০ ফুট চওড়া। এই রাস্তা দুটি তৈরি করার জন্য যে অতিরিক্ত জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল তার মধ্যে স্টার থিয়েটারের পিছনের একটি পুষ্করিণী ছিল, সেটিকে ভরাট করে গৃহ নির্মাণের মূল্যবান জমি পাওয়া যায়।[৩৫]

রাজাবাগান সুতানুটি গ্রামের অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাজা নবকৃষ্ণের প্রকাণ্ড বাগানবাড়ি ছিল এই এলাকায়। তা থেকে ওই জায়গার নাম হয় রাজাবাগান। শ্রী এ. কে. রায়ের মতে রাজাবাগান রাজা রাজবল্লভের সম্পত্তি ছিল।[৩৬] পরবর্তীকালে লটারি কমিটির তত্ত্বাবধানে কর্নওয়ালিস স্ট্রিট তৈরি হলে বাগান উঠে। সেখানে বস্তি গড়ে ওঠে। ওই বস্তি উচ্ছেদ করে উপরের দুটি রাস্তা তৈরি হয়।

কলিকাতা পৌরসভার সাধারণ সভা (General Committee) তাঁদের ২০শে জুলাই ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দের অধিবেশনে রাজাবাগানের যে রাস্তাটি পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত তার নাম রাখা হয় "রাজাবাগান স্ট্রিট" এবং যে রাস্তাটি উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রসারিত, সেটি নামাঙ্কিত হয় "রাজাবাগান জাংশন রোড"। রাজাবাগান স্ট্রিট আজও আছে। তবে রাজাবাগান জাংশন রোডের নতুন নামকরণ করা হয়েছে সে কথায় আমরা পরে আসছি।

রাজাবাগান স্ট্রিট দৈর্ঘ্যে ক্ষুদ্র হলেও এককালে এই রাস্তার ধারে বাসভবন ছিল শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু, শিশু সাহিত্যিক ও ভাইবোন পত্রিকার সম্পাদক প্রভাতকিরণ বসু, বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক অমরনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রথিতযশা অভিনেত্রী নটী বিনোদিনী ও তারাসুন্দরী প্রমুখের।

অবনীন্দ্রনাথের প্রিয় শিষ্য রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য নন্দলাল বসু (১৮৮৩-১৯৬৬) ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী। ভারতশিল্পকে বিশ্বদরবারে তুলে ধরার অন্যতম পথিকৃৎ হলেন নন্দলাল বসু। আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপাল হ্যাভেল সাহেবের সামনে বসে সিদ্ধিদাতা গনেশ-এর প্রতিকৃতি এঁকে আর্ট স্কুলে প্রবেশাধিকার পান। আর্ট স্কুলের পাঁচ বছরের শিক্ষা শেষ করে জোড়াসাঁকোয় অবনীন্দ্রনাথের বাড়িতে তিন বছর শিল্পচর্চা করেন। সিস্টার নিবেদিতার পরামর্শে লেডি হেরিংহ্যামের সহকারীরূপে অজন্তা গুহাচিত্রের প্রতিলিপি গ্রহণ করেন। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে তিনি শান্তিনিকেতনে স্থায়ীভাবে বাস করতে আসেন। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে কলাভবনের অধ্যক্ষ হন। রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণসঙ্গী হয়ে চীন, জাপান, সিংহল প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেন। মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে লক্ষ্ণৌ, ফৈজপুর ও হরিপুরায় কংগ্রেস অধিবেশন উপলক্ষে ভারতশিল্প প্রদর্শনী সংগঠিত করেন। শ্রীনিকেতন ও শান্তিনিকেতন গ্রন্থাগারে এবং চীনাভবনে তাঁর শিল্প অলংকরণের নিদর্শন আছে। তাঁর অঙ্কিত বিখ্যাত চিত্রাবলীর নাম শোকার্ত সিদ্ধার্থ, সতী, শিবসতী, জগাই-মাধাই, কর্ণ, শ্রীচৈতন্য, উমার তপস্যা, নটরাজের তাণ্ডব প্রভৃতি। বহু সম্মানে ও পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন। তাঁর রচিত পুস্তক—শিল্পচর্চা ও রূপাবলী বিখ্যাত। ২নং রাজাবাগান স্ট্রিটে নন্দলাল বসুর বসতবাটি বহুদিন হস্তান্তরিত হয়ে গেছে। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা পৌরসভা কলিকাতার একটি রাস্তা লিটল রাসেল স্ট্রিট-এর নাম বদল করে 'নন্দলাল বসু সরণি' নামাঙ্কিত করেন।

কলিকাতা পৌরসভার ১নং ডিস্ট্রিক্ট অফিসের পাশে রাজাবাগান স্ট্রিটের ওপর অবস্থিত ৭ নম্বর বাড়িতে শিশু সাহিত্যিক প্রভাতকিরণ বসু বাস করতেন। ওই বাড়ি থেকেই ছোটদের পত্রিকা ভাইবোন প্রকাশিত হত। ছোটদের কাছে এই পত্রিকাটি ছিল খুবই আকর্ষণীয়। সেকালের বহু কবি

ও সাহিত্যিকদের আড্ডা বসত এই ভাইবোন পত্রিকার সম্পাদকের দপ্তরে।

৬নং রাজাবাগান স্ট্রিটে লব্ধপ্রতিষ্ঠিত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক অমর মুখোপাধ্যায়ের বাসভবন ছিল। সমস্ত বাড়ি শ্বেত পাথরের, ঘরের দেওয়াল কাঠের প্যানেল দিয়ে তৈরি। ওই বাড়িতে ছিল ডাক্তার মুখোপাধ্যায়ের বিরাট গ্রন্থাগার। চিকিৎসক হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল সুদূরপ্রসারী। শোনা যায়, এক সময় বঙ্গদেশের গভর্নর লর্ড ব্রেবোর্নের চিকিৎসা করেছিলেন। অঞ্চলের নিম্নবিত্তদের বিনা দক্ষিণায় চিকিৎসা করতেন। পরিণত বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

বঙ্গদেশের রঙ্গমঞ্চের আদি পর্বে বহুমুখী প্রতিভাশালিনী ও নাট্যাভিনেত্রী ছিলেন "নটী বিনোদিনী" (১৮৬৩-১৯৪২)। তিনি শুধু নৃত্যগীতপটিয়সী অভিনেত্রী ছিলেন তাই নয়, তাঁর সাহিত্যপ্রতিভাও বিশেষ উল্লেখ্য। কবিতা ও গদ্য লেখায় তাঁর বিশেষ পারদর্শিতা ছিল।

বিনোদিনীর অভিনেত্রী জীবন মাত্র ১২ বছর—১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দ-এর ডিসেম্বর থেকে ১৮৮৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে তিনি চারটি রঙ্গালয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন—গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার (১৮৭৫ ডিসেম্বর—১৮৭৬ ডিসেম্বর), বেঙ্গল থিয়েটার (১৮৭৬ ডিসেম্বর—১৮৭৭ জুলাই), ন্যাশনাল থিয়েটার (১৮৭৭ জুলাই—১৮৮৩ জুলাই) এবং বিডন স্ট্রিটের স্টার থিয়েটার (১৮৮৩ জুলাই—১৮৮৬ ডিসেম্বর)। তিনি প্রায় ৫০টি নাটকে এবং ৬০টির অধিক চরিত্রে অভিনয় করেছেন। তখনকার পত্র-পত্রিকাগুলি বিনোদিনীর অভিনয়ে চমৎকৃত হয়ে তাঁকে "ফ্লাওয়ার অফ দি নেটিভ স্টেজ", "প্রাইমা ডোনা অব দি বেঙ্গলি স্টেজ" প্রভৃতি আখ্যায় ভূষিত করেছিল। গিরিশচন্দ্রের মতে "বিনোদিনীর মতো প্রতিভাশালী অভিনেত্রী সর্বদেশেই বিরল"। তাঁর রচিত চৈতন্যলীলা নাটকে চৈতন্যদেবের ভূমিকায় অভিনয় করে বিনোদিনী বিরল নৈপুণ্যের পরিচয় দেন এবং রামকৃষ্ণদেবের আশীর্বাদ পেয়ে ধন্য হন।

লেখিকা হিসাবে বিনোদিনী গৌরবের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ 'বাসনা' এবং কাব্যোপন্যাস 'কনক ও নলিনী'। আত্মজীবনীমূলক রচনা 'আমার কথা' ছাড়াও তাঁর নাট্য জীবনের স্মৃতিচারণে ভরা পরিণত বয়সে লেখা 'আমার অভিনেত্রী জীবন' উল্লেখ্য। স্মৃতিচারণমূলক রচনার মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন তাঁর জীবনের অনেক ঘাত প্রতিঘাত, দুঃখ শোক প্রকাশ পেয়েছে, অন্যদিকে সে যুগের নাট্যমঞ্চের ইতিহাসের অনেক উপাদান এইসব রচনার মধ্যে নিহিত আছে।[৩৭]

বিনোদিনী তাঁর বসতবাটি ৪নং রাজাবাগান স্ট্রিটে গোপাল মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে তাঁর সেবায় শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। বর্তমানে এই ভবনে তাঁর পালিতা কন্যার উত্তরপুরুষগণ বসবাস করেন।

সেকালের বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের আরেক প্রতিভাশালিনী অভিনেত্রী হলেন তারাসুন্দরী। ১৮৯৪ থেকে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বঙ্গদেশে অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী। বিনোদিনীর মতো তিনিও বহু নাটকে ও বহু চরিত্রে অভিনয় করে সেকালের দর্শকদের মনোরঞ্জন করেছিলেন। তাঁর অভিনয় নৈপুণ্যের কথা সেকালের বহু পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

অভিনেত্রী তারাসুন্দরী বিনোদিনীর পাশের বাড়িতে থাকতেন। বিনোদিনী তারাসুন্দরীকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। বিনোদিনীর সাহায্যে ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে বিডন স্ট্রিটের স্টার থিয়েটারে যোগদান করে বালক বেশে চৈতন্যলীলা নাটকে ও সরলা নাটকে গোপাল চরিত্রে অভিনয় করেন। অমৃতলাল মিত্র তাঁর নাট্যশিক্ষক ছিলেন। রামতরণ সান্যালের কাছে সংগীত এবং কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে নৃত্য শিক্ষা করেন। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর নাটকে শৈবলিনীর ভূমিকায় অভিনয় করে দর্শকহৃদয় জয় করেন এবং রাতারাতি বিখ্যাত হন। জীবনের শেষ পর্যায়ে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সঙ্গে জনা নাটকে 'জনা' এবং আলমগীর নাটকে 'উদিপুরীর' ভূমিকায় অভিনয় করে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন।[৩৮]

বিনোদিনী তারাসুন্দরীকে আধ্যাত্মিক পথেরও সন্ধান দিয়েছিলেন। তিনি তারাসুন্দরীকে সঙ্গে করে প্রথম বেলুড় মঠে নিয়ে যান। সেখানে তারাসুন্দরী স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী প্রেমানন্দের সান্নিধ্যে আসেন এবং ক্রমে স্বামী ব্রহ্মানন্দের কৃপালাভ করেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দের দেহত্যাগের পর তারাসুন্দরী অভিনয় জগৎ থেকে বিদায় গ্রহণ করে ভুবনেশ্বরে রাখালকুঞ্জে নিরাসক্ত জীবন যাপন করতে থাকেন। মা সারদামণিও তাঁকে স্নেহ করতেন।[৩৯]

তারাসুন্দরীর স্মৃতির উদ্দেশে কলিকাতা পৌরসভা কলিকাতার একটি উদ্যানকে 'তারাসুন্দরী পার্ক' নামাঙ্কিত করেছেন। উদ্যানটি ৫৬নং রতন সরকার গার্ডেন স্ট্রিটে অবস্থিত।

প্রায় একই নামে দুটি রাস্তা গায়ে গায়ে থাকায় ডাক বিলি ব্যবস্থার গুরুতর সমস্যা দেখা দিতে থাকে। সমস্যার সমাধান কল্পে সেন্ট্রাল কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ক্ষুদিরাম বোসের নামে রাজাবাগান জাংশন রোডের নাম পরিবর্তন করে ক্ষুদিরাম বোস রোড নামকরণ করার এক প্রস্তাব আসে। পৌরসভা ২ সেপ্টেম্বর ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে প্রস্তাবটি অনুমোদন করেন।

পরবর্তীকালে ক্ষুদিরাম বোস রোডের আরও কিছু পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা পৌরসভার ৪নং বোরো কমিটি এই মর্মে পৌরসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে ক্ষুদিরাম বোস রোডকে লোকে প্রায়শই শহীদ ক্ষুদিরাম বোসের নামে নামাঙ্কিত রাস্তা বলে ভুল করে। তাই কমিটির প্রস্তাব হল রাস্তাটিকে প্রিন্সিপাল ক্ষুদিরাম বোস রোড বলে পুনর্নামকরণ করা হোক। পৌরসভা ২৬ আগস্ট ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে এই প্রস্তাব অনুমোদন করেন।

৩নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত জগদীশনাথ রায় লেন পূর্বে হরি ঘোষ স্ট্রিটের অংশবিশেষ ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর আটের দশকে পথটি জগদীশনাথ রায়ের নামে নামাঙ্কিত হয়।

সেকালের কলিকাতায় স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন জগদীশনাথ রায় (১৮২৫-১৮৮৭)। পুলিশ বিভাগে অতি দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে প্রথম ভারতীয় সুপারিনটেন্‌ডেন্ট অফ পুলিশের পদে উন্নীত হন। এ পদ ছাড়াও তিনি সল্ট কমিশনারের পদে নিয়োজিত হয়েছিলেন। জগদীশনাথ সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরঙ্গ সুহৃদ্, যদিও বয়সে ১৩ বছরের বড় ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসগ্রন্থ 'বিষবৃক্ষ' জগদীশনাথ রায়কে উৎসর্গ করেন।

জগদীশনাথ রায়ের কাঁচড়াপাড়ার বিখ্যাত বৈদ্যবংশে জন্ম। জগদীশনাথের প্রপিতামহ মুক্তারাম রায় নবাব আলিবর্দির দেওয়ান ছিলেন। নবাব তাঁকে 'রায় রায়ান' খেতাব দিয়েছিলেন। সাধক রামপ্রসাদ এই পরিবারের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছিলেন। রামপ্রসাদ এঁদের কাঁচড়াপাড়ার বাড়িতে থেকে লেখাপড়া শেখেন। জগদীশনাথের পিতা গুরুপ্রসাদ 'শব্দারত্নকোষ' প্রণয়ন করেন। তাঁর তিন পুত্র—রমানাথ, উমানাথ ও জগদীশনাথ। ইংরেজি শিক্ষালাভের জন্য জগদীশনাথ পিতার সঙ্গে কলিকাতায় আসেন এবং হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। সে সময় পটলডাঙ্গার অন্তর্গত ১৩নং রাধানাথ মল্লিক লেনের বাড়িটি কলিকাতায় বসবাসের জন্য ভাড়া নেন। ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু কলেজে সিনিয়ার ও জুনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষা সর্বপ্রথম প্রবর্তিত হয়। সিনিয়র বিভাগের ১ম ও ২য় শ্রেণীর ছাত্ররা সিনিয়র বৃত্তি এবং ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীর ছাত্রেরা জুনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষা দিতে পারত। ১৮৪২ খ্রিঃ জুনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষায় জগদীশনাথ প্রথম স্থান অধিকার করে বৃত্তি পান। সে সময় তাঁর সতীর্থ ছিলেন পরবর্তীকালে 'পারিবারিক প্রবন্ধ'র লেখক ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বনমালী মিত্র, কবি মধুসূদন দত্ত এবং ব্যবসায়ী ও দাতা শ্যামাচরণ লাহা প্রমুখ। ৭ জানুয়ারি ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে ইংলিশম্যান পত্রিকায় এই পরীক্ষার যে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল তা এখানে তুলে দেওয়া হল :

Hindu College—The annual distribution of scholarship and prizes to the students of the Hindu College took place yesterday at 10 A.M. at the Town Hall.

Students who obtained junior scholarship—

| | |
|---|---|
| Jugdishnath Roy | Junior scholarship |
| Bhoodeb Mukherjee | Do |
| Rajundernath Mittre | Do |
| Obotar Chunder Gangooly | Do |
| Bannomally Mittre | Do |
| Muddoosoodan Dutt | Do |
| Shama Churn Law | Do |

পরবর্তীকালে জগদীশনাথ উচ্চ ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করে পুলিশ বিভাগে চাকুরি গ্রহণ করেন।

জগদীশনাথের সংগীতের প্রতি ছিল গভীর অনুরাগ, নিজেও একজন সংগীতজ্ঞ ছিলেন। সাহিত্যচর্চাও করতেন। বঙ্গদর্শন পত্রিকায় তাঁর কিছু কিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। হিন্দু কলেজে রি-ইউনিয়ন প্রথা তাঁর উদ্যোগে প্রবর্তিত হয়।

যে রাস্তাটি জগদীশনাথ রায়ের নামে নামাঙ্কিত হয়েছে সেটি পূর্বে হরি ঘোষ স্ট্রিটের অংশবিশেষ ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর আটের দশকে রাস্তাটি জগদীশনাথ রায়ের নামে নামাঙ্কিত হয়। জগদীশনাথের বসতবাড়ি এই রাস্তার উপর ছিল। বাড়িটি তিনি ২৩শে জানুয়ারি ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে ক্রয় করেন। সে সময় ৬ নম্বর সিমলা নামে চিহ্নিত ছিল। বাগান, পুকুর ও লাগোয়া জমি নিয়ে বাড়িটি ছিল বিশাল। এই বিশাল বাড়ির জমিজমা বিভক্ত হলে পর একটি গলিপথ তৈরি হয়। জগদীশনাথ স্বয়ং এই গলিপথ পৌরসভাকে হস্তান্তরিত করেন। পরবর্তীকালে এই গলিপথ তাঁর নামে নামাঙ্কিত হয় সে কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। জগদীশনাথের আদি বাড়ি অনেকগুলি ভাগে বিভক্ত হয়। যথা ৮, ৯, ১০ ও ১১, জগদীশনাথ রায় লেন। অংশগুলি চার পুত্রের মধ্যে ভাগ হয়। বড় ছেলে রাধানাথ রায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ. ডিগ্রিধারী। তিনি স্বামী বিবেকানন্দ ও নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্র ঘোষের বন্ধু ছিলেন। পিতার মতো তিনিও উচ্চ সরকারি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ছিলেন রেজিস্ট্রার জেনারেল অফ্ বেঙ্গল। ৮ নম্বর বাড়িটি তাঁর অধিকারে ছিল। বর্তমানে এই বাড়িটি রাধানাথের পৌত্র গোপীনাথ রায়ের হেপাজতে আছে। অন্য বাড়িগুলি হস্তান্তরিত হয়ে গেছে।

জগদীশনাথ রায়ের গৃহ সেকালের বহু মানভাজন ব্যক্তির পদধূলিতে ধন্য হয়েছিল। প্রিয় সুহৃদ্ বঙ্কিমচন্দ্র প্রায়ই আসতেন। আর আসতেন নীলদর্পণ প্রণেতা দীনবন্ধু মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়। কবি মধুসূদন দত্ত তাঁর কাব্যগ্রন্থ পাঠ করতে এ বাড়িতে বহুবার এসেছেন। তিনি জগদীশনাথ রায়কে আদর করে 'জাগ' বলে ডাকতেন। সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হত এ বাড়িতে। গৃহস্বামীর আতিথেয়তায় এই আড্ডা আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠত। কখনও কখনও তা আড্ডার পরিধি ছাড়িয়ে সাহিত্যসভার পর্যায়ে পড়ত।

১ ও ২ নম্বর জগদীশনাথ রায় লেন বসু মল্লিকদের বাসভবন। এই পরিবারের প্রিয়মাধব বসু মল্লিকের পূর্বপুরুষ বর্ধমানের অকালপৌষ গ্রাম থেকে মহারাজা নবকৃষ্ণের আমন্ত্রণে কলিকাতায় আসেন। নবকৃষ্ণ তাঁর বসবাসের জন্য ১৫ বিঘা জমি দান করেন। প্রিয়মাধবের পুত্র আশুতোষ বসু মল্লিক বড়লাটের নিয়োগ বিভাগের (Appointment Dept.) রেজিস্ট্রার ছিলেন। আশুতোষ বসু মল্লিকের ভগিনীকে জজ সারদাচরণ মিত্র বিবাহ করেন।

একসময় এই বাড়ি বিপ্লবীদের কেন্দ্রভূমি হয়ে ওঠে সে কথায় এবারে আসছি। যতীন্দ্রলোচন মিত্র (১৮৯৫-১৯৬৮) ছিলেন এই কেন্দ্রের প্রাণপুরুষ। তিনি অতি অল্প বয়সে বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন এবং পি. মিত্র ও সতীশচন্দ্র বসুর প্রভাবে অনুশীলন সমিতিতেও যোগ দেন। ছাত্রাবস্থায় লাডলীমোহন মিত্রের সহায়তায় বিপ্লবীদের মুখপত্র বেআইনি যুগান্তর পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। ১৯১৩ খ্রিঃ বিপ্লবীরা স্বাধীন ভারতের যে প্রতীক তৈরি করেন তিনি সেই প্রতীকের উদ্ভাবক। বিপ্লবীদের অস্ত্রাগার ও অস্ত্র মেরামতির কারখানা তিনি পরিচালনা করতেন। বিপ্লবীদের কাছে এটি ত্রিলোচন মিস্ত্রির কারখানা নামে পরিচিত ছিল। বাঘা যতীনের নেতৃত্বে ভারত-জার্মান পরিকল্পনায় (১৯১৫) তিনি অংশগ্রহণ করেন। ১৯১৫ খ্রিঃ বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে (শিবপুর) পড়ার সময় রডা কোম্পানির অপহৃত দুটি পিস্তল সহ তিনি ধরা পড়ে কারারুদ্ধ হন। ১৯২০ খ্রিঃ তাঁর কারামুক্তি ঘটে। এই সময় তিনি আশুতোষ বসু মল্লিকের জগদীশনাথ রায় লেনের বাড়িতে দু'খানি ঘর ভাড়া করেন। একটি ঘরে এক ছাপাখানা স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে আশুতোষ বসু মল্লিকের সেজ মেয়েকে বিবাহ করেন। আশুতোষের কোনও পুত্র সন্তান না থাকায় বিবাহের পর এই বাড়িতে বসবাস শুরু করেন। বিবাহের পর যতীন্দ্রলোচনকে বহুবার কারান্তরালে কাটাতে হয়। পরে তিনি গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। ব্যবহারিক জীবনে যতীন্দ্রলোচন ছিলেন একজন খ্যাতনামা কনসাল্টিং ইঞ্জিনিয়ার ও আর্কিটেক্ট (Consulting Engineer and Architect)।

যতীন্দ্রলোচনের পৈতৃক বাড়ি ছিল ২৩নং বিডন রো। সে সময় ওই বাড়িটি ছিল অনুশীলন ও যুগান্তর দলের সদস্যদের কাছে মিলনকেন্দ্র। পরবর্তীকালে ২ নম্বর জগদীশনাথ রায় লেনের বাড়িটিও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাছে বিডন রো-এর বাড়ির মতো মিলনকেন্দ্র হয়ে ওঠে। ওই দুই দলের প্রায় সকল সদস্যদের এখানে যাতায়াত ছিল। শ্রুতকীর্তি বিপ্লবী যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় বহুবার এ বাড়িতে থেকে গেছেন। ১৯৩০ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামের কেন্দ্রভূমি হয়ে দাঁড়ায় এই বাড়িটি। সে সময় সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, ভূপতি মজুমদার, মনোরঞ্জন গুপ্ত, সুরেশ দাশ, কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পদধূলিতে ধন্য হয়েছিল এই ভবন। বর্তমানে এই বাড়িতে আছেন যতীন্দ্রলোচন মিত্রের পুত্র সমরেন্দ্রলোচন মিত্র, পেশায় কনসাল্টিং ইঞ্জিনিয়ার, অবসরে সাহিত্যসেবী।

হরি ঘোষ স্ট্রিটের যে অংশ নিয়ে জগদীশনাথ রায় লেন নামাঙ্কিত হয় সেই হরি ঘোষ স্ট্রিট সম্বন্ধে দু-চার কথা বলা যেতে পারে।

হরি ঘোষ স্ট্রিট কলিকাতার প্রাচীনতম রাস্তাগুলির অন্যতম। মার্ক উড (১৭৮৪-৮৫) ও আপজনের (১৭৯২-৯৩) কলিকাতার মানচিত্রে রাস্তাটির কিছু অংশ চিহ্নিত করা হলেও সেখানে রাস্তার নামের কোনও উল্লেখ নেই। কলিকাতা পৌরসভায় রক্ষিত ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দের Assessment Register-এ হরি ঘোষ স্ট্রিটের নাম প্রথম নথিভুক্ত হতে দেখা যায়। শক ও প্রিন্সেপ সাহেব (Mr.I.P. Schalch & Captain T. Prinsep) লটারি কমিটির প্রয়োজনে ১৮২৫ সালে কলিকাতার যে মানচিত্রটি প্রস্তুত করেন তাতেই হরি ঘোষ স্ট্রিট নামাঙ্কিত করা আছে। রাস্তাটি গ্রে স্ট্রিট (এখন শ্রীঅরবিন্দ সরণি) থেকে আরম্ভ হয়ে সোজা দক্ষিণে এগিয়ে নয়ন চাঁদ দত্ত স্ট্রিটে এসে পড়েছে।

হরি ঘোষ ছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মুঙ্গের দুর্গের দেওয়ান। বাংলা ও ফারসী ভাষায় তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল, ইংরেজিতেও তাঁর দখল ছিল। এই ঘোষ পরিবার কলিকাতার এক বনেদি পরিবার। সেকালের কলিকাতায় এঁদের অর্থ, কৌলীন্য ও প্রতিপত্তি ছিল প্রবল। এই পরিবারের আরও দুই প্রধান পুরুষের নামে কলিকাতায় দুটি রাজপথ আজও আছে—একটি বলরাম ঘোষ স্ট্রিট, অন্যটি বারানসী ঘোষ স্ট্রিট। যে ঘোষ পরিবারের তিন প্রধানের নামে তিনটি রাস্তা বর্তমান, তাঁদের সম্বন্ধে এবার কিছু বলি।

শোনা যায়, গৌড়ের রাজা আদিশূর যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থকে আমন্ত্রণ করে বঙ্গদেশে এনেছিলেন তাঁদের অন্যতম মকরন্দ ঘোষ থেকে এই বংশের সূত্রপাত। গৌড়েই তিনি সপরিবারে বাস করতেন। এই পরিবারের ষষ্ঠ পুরুষ নিশাপতি ঘোষ গৌড়ের বাস উঠিয়ে হুগলি জেলার বালি গ্রামে চলে আসেন। নিশাপতি ঘোষের উত্তরপুরুষ মাধব বা মনোহর ঘোষ বালি ছেড়ে ব্যারাকপুরের চন্দনপুকুর গ্রামে বসতি স্থাপন করেন।

মনোহর ঘোষ প্রথম দিকে খুব দরিদ্র ছিলেন। বাদশাহ আকবরের রাজপুত সেনাপতি টোডরমলের অধীনে সামান্য গোমস্তার চাকুরি গ্রহণ করেন। পরে টোডরমলের মহর্‌রার পদে নিযুক্ত হন। এই পদে থাকাকালীন তিনি বিপুল বিত্তের মালিক হন। শেষ জীবন শান্তিতে অতিবাহিত করার জন্য সুবর্ণরেখার তীরে বসবাসের জন্য আসেন। মোগল-পাঠান যুদ্ধের সময় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে তিনি সুবর্ণরেখার তীর ছেড়ে সামান্য কিছু সঞ্চয় নিয়ে পালিয়ে এসে চিত্রপুরীতে (এখনকার চিৎপুর) আশ্রয় নেন। এখানে থাকাকালীন তিনি সর্বমঙ্গলা ও চিত্রেশ্বরীর মন্দির নির্মাণ ও প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করেন ১৬১০ খ্রিঃ। ইউরোপীয়গণ চিত্রেশ্বরী মন্দিরকে কালীমন্দির বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু চিত্রেশ্বরী কালী নন—দেবী দুর্গা। চিত্রেশ্বরীই সম্ভবত বাংলার একমাত্র ডাকাত পূজিতা দুর্গা। বঙ্গদেশের নানান স্থানে ডাকাতদের আরাধ্য কালীর সন্ধান পাওয়া যায় কিন্তু দুর্গার আরাধনার কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না। "হুগলী জেলার ইতিহাস" গ্রন্থ প্রণেতা সুধীর মিত্র লিখেছেন : "এখন বাংলা দেশের সর্বত্র ডাকাতে কালী দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু ডাকাতে দুর্গা একমাত্র কাশীপুর চিৎপুর ছাড়া আর কোথাও আমার নয়নগোচর হয়নি।" প্রথম মন্দিরটি ১৫/১নং, আর দ্বিতীয় মন্দিরটি ৯, খগেন চ্যাটার্জি রোডে অবস্থিত।

মনোহর ঘোষের মৃত্যু হয় আনুমানিক ১৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর মৃত্যুর পর চিত্রেশ্বরী মন্দির

প্রধানত ডাকাতদের আয়ত্ত্বাধীনে চলে যায়। তারা এখানে প্রায় নরবলি দিতে থাকে। এখানে থাকা একপ্রকার অসম্ভব হয়ে পড়ায় মনোহর ঘোষের পুত্র রাম সন্তোষ ঘোষ ওরফে সন্তোষ ঘোষ চিৎপুর ছেড়ে সপরিবারে বর্ধমানে পালিয়ে যান। তিনি অনেকগুলি ভাষা জানতেন। ইংরেজ, ফরাসি ও ওলন্দাজ কোম্পানির দপ্তরে চাকুরি করে বহু বিত্ত সঞ্চয় করেন। পরবর্তীকালে রহিম সিংহ তাঁর ধনসম্পত্তি লুণ্ঠনের জন্য তাঁর বাড়িতে চড়াও হয়, মৃত্যুবরণের পূর্বে তিনি তাঁর স্ত্রী ও পুত্র বলরামের পলায়নের ব্যবস্থা করে দেন। বহু স্থান ঘুরে বলরাম অবশেষে ফরাসি অধিকৃত চন্দননগরে আশ্রয় নেন। এখানে তিনি চন্দননগরের গভর্নর মঁসিয়ে দুপ্লের সঙ্গে পরিচিত হন। পরবর্তীকালে ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি দুপ্লের পরামর্শদাতা হন। নানান ব্যবসা সূত্রে তিনি বিশেষ ধনবান হন। ১৭৫৬ খ্রিঃ ৯৫ বছর বয়সে তিনি পরলোকগমন করেন।[৪০]

এই বলরাম ঘোষের নামে শ্যামপুকুর অঞ্চলে একটি রাস্তা আছে। রাস্তাটি খুবই প্রাচীন, আপজন সাহেবের ১৭৪২ খ্রিস্টাব্দের কলিকাতার মানচিত্রে রাস্তাটি চিহ্নিত আছে। কোনও নামাঙ্কিত করা নেই। ১৭৮৪-৮৫ খ্রিস্টাব্দে মার্ক উডের মানচিত্রে রাস্তাটি বলরাম ঘোষ স্ট্রিট নামে নামাঙ্কিত আছে। পথটি শ্যামবাজার থেকে আরম্ভ হয়ে পূর্ব দিকে এগিয়ে মারহাট্টা ডিচের (সারকুলার রোড, এখনকার আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড) ধারে এসে শেষ হয়েছে। শক ও প্রিন্সেপ সাহেব লটারি কমিটির জন্য যে মানচিত্রটি (১৮২৫) তৈরি করেছিলেন তাতেও বলরাম ঘোষ স্ট্রিট সারকুলার রোড অবধি প্রসারিত হতে দেখা যায়। অ্যাবারক্রম্বির কলিকাতা মানচিত্রে (১৮৩৬) রাস্তাটি একই অবস্থায় দেখানো ছিল। কিন্তু সীম সাহেবের (P.W. Simms) মানচিত্রে (The City and Environs of Calcutta, 1852-56) এই রাস্তাটি দু'ভাগে দেখানো আছে। বলরাম ঘোষ স্ট্রিট কর্নওয়ালিস স্ট্রিট অবধি প্রসারিত এবং তার পরের অংশটুকু অর্থাৎ কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের পূর্ব দিক থেকে সারকুলার রোড পর্যন্ত অংশটুকু ফড়িয়াপুকুর স্ট্রিট এই নতুন নামে চিহ্নিত হয়েছে। কলিকাতা পৌরসভায় রক্ষিত ১৮৪৩ খ্রিঃ Assessment Register-এ রাস্তাটি প্রথম নথিভুক্ত হতে দেখা যায়। সম্ভবত ১৮৪০ সালের পর এই নতুন নামকরণ হয়ে থাকবে। ফড়েপুকুর নামকরণ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেন লিখেছেন : "যারা জেলের কাছে মাছ কিনে বাজারে মাছ বিক্রেতাদের কাছে পাইকারি ভাবে বেচে তাদের বলত 'নিকিরি', মাছ ছাড়া অন্য বস্তু হলে 'ফড়ে' (ফড়িয়া)। নিকিরিপাড়া বস্তি এখন নিশ্চিহ্ন। তবে কাছেই 'ফড়েপুকুর'। এ পুকুর নিকিরিদের উচ্ছন্ন হবার আগেই ডাঙ্গা হয়ে গিয়েছিল। তবে এখন রাস্তার নামে টিকে আছে।"[৪১]

বলরাম ঘোষ স্ট্রিট সম্বন্ধে শ্যামপুকুর আঞ্চলিক বিবরণ প্রসঙ্গে বিস্তারিত তথ্য পরবর্তী এক অধ্যায়ে পরিবেশিত হয়েছে। কাজেই নতুন করে এখানে বিশদ উল্লেখের প্রয়োজন দেখি না। ফিরে আসি ফড়িয়াপুকুর স্ট্রিটের কথায়।

কলিকাতার সমাজ সংস্কৃতির ইতিহাসে ফড়িয়াপুকুর স্ট্রিটের মতো ক্ষুদ্র পথটির অবদান কম নয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ফড়িয়াপুকুর স্ট্রিটে স্থাপিত হয়েছিল কলিকাতার অন্যতম প্রাচীন মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠান—আজকের নাম—'সেন মহাশয়'। এঁদের তৈরি 'বৈশাখী' মিষ্টান্ন রসিকের রসনা-তৃপ্তিকর অতি উপাদেয় বস্তু। দোকানের প্রতিষ্ঠাতা আশুতোষ সেন, ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে ফড়িয়াপুকুর স্ট্রিটের একটা ভাঙা খোলার ঘরে ছোট্ট এক মিষ্টির দোকান দিয়েছিলেন। দিনে দিনে দোকানের নানাবিধ মিষ্টির সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সেন মহাশয়ের নলেন গুড়ের 'দেদো সন্দেশ' খেয়ে রবীন্দ্রনাথ 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক সজনীকান্ত দাসকে রসিকতা করে বলেছিলেন, "বাংলা দেশে এখনো সেন রাজত্বের শেষ হয়নি দেখছি ; সেন রাজারা গেছেন ঠিকই কিন্তু আরেক সেন রাজত্ব শাসন করে চলেছেন"।

প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে দোকানের কোনও নাম ছিল না। নাম না থাকাতেও আশুতোষ সেনের মিষ্টির সুখ্যাতি সারা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। সাধারণ ক্রেতা ছাড়াও বহু গণ্যমান্য ক্রেতারাও এই দোকানে ভিড় জমাতেন নিয়মিত। নিঃসন্তান আশুতোষ সেনের ভাইপো নীলমণি সেন পরবর্তীকালে এই দোকানের মালিক হন। তাঁরই আমলে দোকানের বাড়বাড়ন্ত শুরু হয়। ইতিমধ্যে কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা (C.I.T.) খোলার বস্তি ভেঙে ফড়িয়াপুকুর স্ট্রিট প্রশস্ত করার কাজ শুরু করায়

দোকানের একটা নামের প্রয়োজন দেখা দেয়। শোনা যায়, আনন্দবাজার পত্রিকার সুরেশচন্দ্র মজুমদার দোকানের নামকরণ করলেন 'সেন মহাশয়'। সেই নামই আজও চলছে। সেন মহাশয়ের দোকান ১/১ সি, ফড়িয়াপুকুর স্ট্রিটে এক বিরাট অট্টালিকায় অবস্থিত। এই নামের ঐতিহ্য আজও বজায় রেখে চলেছেন নীলমণির পুত্র পরেশনাথ সেন।[৪২]

বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসে 'বিচিত্রা' সাহিত্য পত্রিকা এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। এই পত্রিকাটি ২৭/১, ফড়িয়াপুকুর স্ট্রিট থেকে প্রকাশিত হত। বাড়ির ফটকে লেখা ছিল 'বিচিত্রা নিকেতন লিমিটেড'। লব্ধ-প্রতিষ্ঠিত ঔপন্যাসিক ও ভাগলপুরের আইনব্যবসায়ী উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এই পত্রিকার সম্পাদক হয়েছিলেন। উপেন্দ্রনাথের বৈবাহিক যোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পত্রিকা প্রকাশের আর্থিক দায়দায়িত্বের ভার নিয়েছিলেন। পত্রিকা সম্পাদনায় উপেন্দ্রনাথের সহযোগী ছিলেন চারজন—কান্তিচন্দ্র ঘোষ, অমল হোম, সতীনাথ ঘোষ ও সতীশচন্দ্র ঘটক। এই প্রসঙ্গে উপেন্দ্রনাথ লিখেছেন, "পাঁচ সংখ্যা লক্ষ্য করে কেউ কেউ আমাদের নাম দিতে লাগল—পঞ্চপাণ্ডব ; আর বিচিত্রা দ্রৌপদী।" এই পঞ্চপাণ্ডবের ঐকান্তিক আগ্রহ ও অধ্যবসায়ে বিচিত্রা সর্ববিষয়ে বাংলাদেশে একটি সার্থক সাহিত্য পত্রিকা হয়ে উঠেছিল। শুধু তাই নয়, একই সঙ্গে বাংলার দুই বহুমানভাজন দিকপাল সাহিত্যরথী রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের রচনা প্রকাশ করে সাময়িক পত্রের ইতিহাসে এক গৌরবের আসন অধিকার করেছিল।

বিচিত্রার নামকরণের ইতিহাসও কম বিচিত্র নয়। প্রথমে স্থির হয়েছিল পত্রিকাটির নাম হবে 'সবিতা' কিংবা 'হিমালয়'। এই প্রসঙ্গে উপেন্দ্রনাথ 'স্মৃতিকথায়' লিখেছেন, "তিন চার দিন পরে একদিন কান্তিবাবু বললেন, 'আচ্ছা, কাগজের নাম 'বিচিত্রা' রাখলে কেমন হয় ? কবির বিচিত্রা ক্লাবের সঙ্গে মিলিয়ে নাম রাখলে কবির সহানুভূতি হয়তো একটু বেশি মাত্রায় দৃঢ় করা যেতে পারে'। কান্তিবাবুর মতই বহাল রহিল, পত্রিকার নাম হল 'বিচিত্রা'।" প্রথম প্রকাশ আষাঢ় ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ। এই পত্রিকার ডামি প্রকাশিত হয় ১৩৩৪ সনের বৈশাখ মাসে। কোনও পত্রিকার ডামি সংখ্যা ইতিপূর্বে বাংলায় কখনও প্রকাশিত হয়নি।

বিচিত্রা নামের প্রেরণায় হোক অথবা অন্য কারণেই হোক রবীন্দ্রনাথের রচনা সম্ভার 'নিঃস্ব করা দানে' বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হয়েছিল। লেখা এবং লেখক সংগ্রহের সময়েও উপেন্দ্রনাথ উচ্চহারে দক্ষিণা দিতেন। রবীন্দ্রনাথের সম্মান দক্ষিণার ব্যাপারে উপেন্দ্রনাথ কখনও কার্পণ্য করেননি। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি মন্তব্য স্মরণীয়। তিনি চিঠিতে লিখেছেন, 'বিচিত্রার জন্য একটা গল্প লেখা চাই, বিচিত্রার গরজে ততটা নয় যতটা আমার নিজের গরজে। অর্থাগমের আর কোন রাস্তা জানিনে, কলমের জোরে যা পারি'।

এই সম্মান দক্ষিণার ব্যাপারে শরৎচন্দ্রের সঙ্গেও একটা বোঝাপড়া হয়েছিল—সে কথা উপেন্দ্রনাথের স্মৃতিকথায় উল্লেখ আছে। এ ছাড়া ছোট বড় সকল লেখককে উপেন্দ্রনাথ সম্মান-দক্ষিণা দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন।

নতুন প্রতিভা আবিষ্কারে বিচিত্রার দান অনবদ্য। প্রায় সমস্ত প্রতিভাবান লেখকরা আত্মপ্রকাশের সুযোগ পেয়েছিলেন বিচিত্রায়। তাঁদের মধ্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, চারুচন্দ্র চক্রবর্তী প্রমুখের নাম উল্লেখ্য। এ ছাড়া প্রথমে সবুজপত্র গোষ্ঠী, পরে কল্লোল ও কালিকলমের লেখকবৃন্দ প্রায় সকলেই বিচিত্রার লেখক হয়েছিলেন। শুধুমাত্র হিন্দু লেখকরাই নন, বিচিত্রার আঙ্গিনায় সমবেত হয়েছিলেন সুফী মোতাহার হোসেন, হুমায়ুন কবির, আবদুল গফ্‌ফর চৌধুরী, কবি জসীমউদ্দীন, মৌলভী মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, এম. আবদুল আলি প্রমুখ বহু মুসলমান লেখক। হিন্দু মুসলমানের মননশীলতার ক্ষেত্রে এক সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের বীজ বপনে বিচিত্রার সাফল্য উল্লেখের দাবি রাখে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে এমন একটি উচ্চশ্রেণীর মাসিক পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়, বাংলার সংস্কৃতি প্রাঙ্গণের একটি উজ্জ্বল দীপশিখা অকালে নির্বাপিত হল।[৪৩]

প্রায় শতাধিক বছর পরে ফড়িয়াপুকুর স্ট্রিটের নাম বদল করে সেকালের খ্যাতনামা আইনজীবী যতীন্দ্রনাথ বসুর নামে ১৯৫৭ সালে কলিকাতা পৌরসভার কাছে নামকরণের এক প্রস্তাব আসে।

যতীন্দ্রনাথ ছিলেন সেকালের প্রসিদ্ধ কংগ্রেসসেবী ও কীর্তিমান আইনজীবী ভূপেন্দ্রনাথ বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র ; মোহনবাগান ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, কলিকাতা পৌরসভার অল্ডারম্যান। এ ছাড়াও বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য এবং বহুমানভাজন সমাজসেবী ছিলেন। পৌরসভার বোরো কমিটি প্রস্তাবটি গ্রহণের সুপারিশ করলেও কলিকাতা পৌরসভার অনুমোদন মেলেনি।[৪৪]

এর প্রায় দু'বছর বাদে ফড়িয়াপুকুর স্ট্রিটের নাম পরিবর্তনের আরেক প্রস্তাব আসে। এই প্রস্তাবে মোহনবাগান ফুটবল ক্লাবের কীর্তিমান খেলোয়াড় শিবদাস ভাদুড়ীর (১৮৮৫-১৯৩২) নামে রাস্তাটি নামকরণ করতে চাওয়া হয়। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে শিবদাসের নেতৃত্বে মোহনবাগান ক্লাব ইস্টইয়র্ক দলকে ২-১ গোলে পরাজিত করে প্রথম ভারতীয় দল হিসাবে আই এফ এ শীল্ড পায়। ভারতের ফুটবলের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে সে কাহিনী লেখা আছে। তাঁর ভাই বিজয় ভাদুড়ীও ছিলেন একজন সেরা ফুটবল খেলোয়াড়। শিবদাস ভাদুড়ীর অধিনায়কত্বে মোহনবাগান ক্লাব মিলিটারি মেডিক্যাল, ওয়াই-এম-সি-এ, চৌরঙ্গী মেজারারস্ প্রভৃতি দলকে পরাজিত করে। সাধারণত লেফট আউটে খেলতেন শিবদাস।

ফড়িয়াপুকুর স্ট্রিটের উত্তরে কালাচাঁদ সান্যাল লেনে থাকতেন শিবদাস ভাদুড়ী। তিনি পশুচিকিৎসক হিসাবে ভেটারিনারি কলেজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। দুই ভাই সাইকেলে ঘোরাফেরা করতেন। স্বাদেশিকতার উন্মাদনায় দুই ভাই ছিলেন ভরপুর। স্বদেশি আন্দোলনের সময় তাঁরা দুজনে রচনা করেছিলেন বহু স্বদেশি গান। পরবর্তীকালে গানগুলি পুস্তকাকারে ছাপা হয়েছিল।[৪৫]

কলিকাতা পৌরসভা ওই নামকরণের প্রস্তাবটি ১২ই আগস্ট ১৯৬০ সালের অধিবেশনে অনুমোদন করেন। ফড়িয়াপুকুর স্ট্রিটের নতুন নামকরণ হয় 'শিবদাস ভাদুড়ী স্ট্রিট'।[৪৬]

আবার ঘোষ পরিবারের প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। বলরাম ঘোষের চার পুত্র—রামহরি, শ্রীহরি, নরহরি ও শিবহরি বা শিবনারায়ণ ; ছোট দুই ছেলের বলরামের জীবদ্দশায় মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুর পর প্রথম দুই ছেলে চন্দননগরের ব্যবসা গুটিয়ে কলিকাতায় চলে আসেন। তাঁরা বাগবাজারে ২০ বিঘা জমি কিনে পুষ্করিণী ও বাগান সহ এক বিশাল অট্টালিকা নির্মাণ করেন। এই প্রাসাদের উত্তরে ছিল বোসপাড়া লেন, দক্ষিণে কাঁটাপুকুর, পশ্চিমে গৌর বোসের লেন আর পূর্বে ছিল গোপালচন্দ্র বোস ও অন্যান্যদের বাড়ি।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে বলরামের মধ্যম পুত্র শ্রীহরি ঘোষের বাংলা ও ফারসী ভাষায় ব্যুৎপত্তি ছিল। ইংরেজিও কিছু জানতেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মুঙ্গের কেল্লার দেওয়ান পদ লাভ করেছিলেন। আপন ব্যবহারে কোম্পানির সকল শ্রেণীর কর্মচারীর প্রিয়পাত্র ছিলেন। দেওয়ানি পদের দৌলতে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। কিন্তু তাঁর জীবনযাত্রা ছিল খুবই সাদাসিধা। দানের কোনও সীমা ছিল না।

দেওয়ানের পদ থেকে অবসর গ্রহণের পর শ্রীহরি ঘোষ কলিকাতায় বসবাস আরম্ভ করেন। কলিকাতায় তাঁর আবাসে বহু দরিদ্র ছাত্র থাকা-খাওয়ার সুযোগ পেত। গৃহহীন বহু মানুষের আশ্রয়স্থল হওয়াতে তাঁর ভবনকে লোকে "হরি ঘোষের গোয়াল" বলত। অন্যদিকে নিষ্ঠাবান ও ধনী হিন্দু হিসাবে তিনি বার মাসে তের পার্বণ সমারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠান করতেন। শেষ জীবনে এক বন্ধুর জামিন দাঁড়িয়ে তার বিশ্বাসঘাতকতায় তিনি সর্বস্বান্ত হন। বন্ধুর এই বঞ্চনায় সংসার সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হয়ে জীবনের অবশিষ্ট কাল বারানসীতে অতিবাহিত করেন এবং সেখানেই পরলোকগমন করেন।[৪৭] শ্রীহরি ঘোষের নামে হরি ঘোষ স্ট্রিটের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা পৌরসভার কাছে কালী মিত্রের নামে হরি ঘোষ স্ট্রিটের একাংশের নতুন নামকরণের এক প্রস্তাব আসে। সেকালের ৩নং ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি ছিলেন কালী মিত্র। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রথম পৌর প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। দীর্ঘদিন পৌরসভার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকায় তাঁর গভীর পৌরজ্ঞান পর্যবেক্ষণ করে স্যার রিভার্স থমসন (Sir Rivers Thompson) কালী মিত্রকে বাংলা ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত করেন। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দের পৌর আইন গৃহীত হবার সময় তিনি ওই বিলের আলোচনায় অংশগ্রহণ করে ওই বিলের দুর্বল দিকগুলির প্রতি সরকারের

দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এরপর যখন ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের আরেকটি পৌর বিল ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত হবার জন্য পেশ করা হয়, তিনি কলিকাতার নগরবাসীর পক্ষ থেকে ওজস্বী ভাষায় ওই বিলের প্রতিবাদ করেন। বিলটি আইনে পরিণত হয়। ইহাই ম্যাকেঞ্জি আইন (Mackenzie Act) নামে পরিচিত। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কলিকাতা পৌরসভার যে ২৮ জন পৌর প্রতিনিধি এই পৌর আইনের বিরুদ্ধে পদত্যাগ করেন, কালীনাথ মিত্র তাঁদের অন্যতম।

কালীনাথ মিত্র কলিকাতা হাইকোর্টের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠিত সলিসিটর ছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল K.N. Mitter & Sarvadhikary। তিনি পঞ্চাশ বছর ধরে আইন ব্যবসায় লিপ্ত ছিলেন। এই উপলক্ষে কলিকাতা হাইকোর্টে তাঁর সুবর্ণজয়ন্তী পালিত হয়। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি দেহত্যাগ করেন। ৫৮নং বিডন স্ট্রিটে তাঁর প্রাসাদোপম বাসভবন ছিল। বর্তমানে এখানে আছে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার একটি শাখা অফিস।

কলিকাতা পৌরসভা কালী মিত্রের নামে নামকরণের প্রস্তাবটি বিচার-বিবেচনা করে অবশেষে ১২ই অক্টোবর ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের অধিবেশনে প্রস্তাবটি অনুমোদন করেন। হরি ঘোষ স্ট্রিটের এই অংশের নতুন নাম হয় 'কালী মিত্র লেন'।[৪৮] আজও সে নাম বহাল আছে।

সেকালের কলিকাতায় খ্যাতিমান সমাজসেবী, বিপ্লবী ও স্বনামধন্য পুরুষদের আবাসভবন ছিল হরি ঘোষ স্ট্রিটে ও জগদীশনাথ রায় লেনে। সর্বাগ্রে যাঁর কথা উল্লেখ্য, তিনি হলেন নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা এবং ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস-চ্যান্সেলার স্যার বিপিনকৃষ্ণ বসু (১৮৫১-১৯৩৩)। এঁর জন্ম কলিকাতায়। পিতা দীননাথ বসু। ৫০ নম্বর হরি ঘোষ স্ট্রিটে মাতুলালয়ে লালিতপালিত হন। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে এম. এ. এবং বি. এল. পাশ করে কলিকাতায় হাইকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন। ওকালতিতে সুবিধা না হওয়াতে জব্বলপুরে যান এবং সেখানে একটি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে জব্বলপুর থেকে নাগপুরে আসেন এবং পুনরায় আইন ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন। শীঘ্রই তাঁর পশার বৃদ্ধি পায় এবং বহু অর্থ উপার্জন করেন। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি ছোট আদালতের (Small Causes Court) অস্থায়ী বিচারপতি নিযুক্ত হন। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে নাগপুরের গভর্নমেন্ট অ্যাডভোকেট এবং ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে ইম্পিরিয়াল লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলের বেসরকারি সদস্য হন। এ ছাড়াও তিনি বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন—নাগপুর পৌরসভার সেক্রেটারি, ভারতীয় দুর্ভিক্ষ কমিশনের একমাত্র ভারতীয় সদস্য এবং বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সদস্য ছিলেন। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় তাঁরই ঐকান্তিক আগ্রহ ও উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি প্রথম ভাইস-চ্যান্সেলারের পদ অলংকৃত করেছিলেন এবং ১৯২৯ সাল পর্যন্ত ওই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কেও বহু অর্থ দান করেন। তাঁর রচিত কিছু কিছু সারগর্ভ প্রবন্ধ সেকালের পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।[৪৯]

কলিকাতায় এসে বিপিনকৃষ্ণ ৬৩নং হরি ঘোষ স্ট্রিটে বসতবাড়ি নির্মাণ করেন। এর সঙ্গে ছিল ঘোড়ার এক প্রকাণ্ড আস্তাবল। পরে আস্তাবল ও বসতবাড়ি ৬৩ ও ৬৩-এ নম্বরে পৃথকীকরণ করা হয়। এই বাড়িতেই তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

বিপিনকৃষ্ণ বসুর দুই পুত্র—ললিতমোহন ও শচীন্দ্রমোহন। ললিতমোহন এক ইউরোপীয় মহিলাকে বিবাহ করেন। এঁদের পুত্র ভিভিয়ান বসু। তিনি প্রথমে নাগপুর হাইকোর্টের বিচারক, পরে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন। ললিতমোহনের বসবাসের জন্য বিপিনকৃষ্ণ ৬২ নম্বর হরি ঘোষ স্ট্রিটের বাড়ি খরিদ করেন। পরে ললিতমোহন নাগপুরে চলে যান। পরবর্তীকালে বিপিনকৃষ্ণ নাগপুরের সম্পত্তি ললিতমোহনকে এবং কলিকাতার সম্পত্তি শচীন্দ্রমোহনের পুত্র বিমলকৃষ্ণকে দিয়ে যান। বিমলকৃষ্ণের পুত্র বিমানকৃষ্ণ ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা পৌরসভার কাউন্সিলার নির্বাচিত হয়েছিলেন।

শক্তি প্রেস—সেকালের অগ্নিযুগের বিপ্লবী ও পরবর্তীকালে গান্ধীবাদী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মিলনতীর্থ ছিল এই শক্তি প্রেস। তাই স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে শক্তি প্রেসের গুরুত্ব ছিল অনেক বেশি। প্রেসটি প্রথমে হেদুয়ার কাছে রায়বাগানে স্থাপিত হয়। পরে ২৭/৩/এ, হরি ঘোষ

স্ট্রিটে উঠে আসে। প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত (১৮৮৫-১৯৩০) শ্রীরামপুরে বাস করতেন। স্বদেশি আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ সতীশচন্দ্র ছাত্র ও যুবকদের বিপ্লবী দলে আনার জন্য শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। বাগনানে, হরিপালে, কলিকাতা মর্টন স্কুলে, সেন্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতার কাজ করেছেন। মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ও সংগঠক ছিলেন। শিক্ষকসমাজের সুবিধার্থে প্রধানত প্রশ্নপত্র ছাপার উদ্দেশ্যে তিনি কলিকাতায় শক্তি প্রেস স্থাপন করেন। এটি ক্রমে তাঁর অনুবর্তী সহকর্মীদের কর্মকেন্দ্র হয়ে ওঠে।

মহাত্মা গান্ধীর হরিজন পত্রিকা (বাংলা) শক্তি প্রেস থেকে ছেপে প্রকাশিত হত। সম্পাদক ছিলেন প্রখ্যাত গান্ধীবাদী নেতা রতনমণি চট্টোপাধ্যায় (১৮৯৩-১৯৭৩)। তিনি বিপ্লববাদী শিক্ষক সতীশ সেনগুপ্তের ছাত্র ছিলেন। ১৯৪২ সালে 'নির্মোক' নামে আরেকটি সাপ্তাহিক পত্রিকা শক্তি প্রেস থেকে মুদ্রিত হত। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন অতুল্য ঘোষ।

প্রথম থেকেই শক্তি প্রেস বিপ্লবীদের কর্মকেন্দ্র হয়ে উঠে। সে সময় এখানে আসতেন ডাক্তার আশুতোষ দাস, রতনমণি চট্টোপাধ্যায়, শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায়, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। পরবর্তীকালে শক্তি প্রেস গান্ধীবাদী আন্দোলনের মিলনকেন্দ্র হয়ে ওঠে। ১৯৮২ সালে শক্তি প্রেসের জন্য অছি পরিষদ গঠিত হয়। প্রেসের ম্যানেজার ছিলেন অজিত বসুমল্লিক।

সেকালের কলিকাতায় চিকিৎসাশাস্ত্রে ডিগ্রিধারী প্রথম মহিলা চিকিৎসক ও সমাজসেবী বিধুমুখী বসু ৯৩/১, হরি ঘোষ স্ট্রিটে বাস করতেন। দেরাদুন প্রবাসী বাঙালি খ্রিস্টান পরিবারের কন্যা। পিতা ভুবনমোহন বসু। এঁরা দুই বোন—চন্দ্রমুখী ও বিধুমুখী। চন্দ্রমুখী প্রথম ভারতীয় মহিলা ইংরেজি অনার্সসহ এম এ পাশ করেন এবং ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে বেথুন কলেজের প্রথম অধ্যক্ষা হন।

বিধুমুখী দিদি চন্দ্রমুখীর মতোই প্রতিভাশালিনী ও গুণবতী মহিলা ছিলেন। বিধুমুখী ও আরেকজন ছাত্রী ভার্জিনিয়া মেরী মিত্র ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে চিকিৎসাশাস্ত্রে এম বি উপাধি লাভ করেন। সেকালের বঙ্গদেশ তথা সারা ভারতে এঁরা দুজনেই এই বিরল গৌরবের অধিকারী ছিলেন। বাঙালি মহিলাদের পক্ষে শ্লাঘার বিষয় সন্দেহ নেই।

সমাজসেবায় বিধুমুখী ছিলেন উদারহস্ত। এক সময় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কন্যারা (মধ্যম ও চতুর্থ) আর্থিক কৃচ্ছ্রতার শিকার হয়ে বিধুমুখীর কাছে সাহায্য প্রত্যাশী হলে তিনি গভীর মর্মবেদনায় বিচলিত হয়ে পড়েন। দেশবাসীকে এই মর্মান্তিক ঘটনা অবহিত করার জন্য আনন্দবাজার পত্রিকায় তিনি মর্মস্পর্শী ভাষায় এক পত্র প্রকাশের জন্য পাঠান। এটি ১৯২৫ সালের কথা। আনন্দবাজার পত্রিকা পত্রটি প্রকাশ করে এক সম্পাদকীয় লেখেন। বিধুমুখী এখানেই থেমে থাকেননি। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কন্যাদের সাহায্যার্থে একটি তহবিল গঠন করেন। এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে দেশবাসী বিদ্যাসাগরের প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলেন। সেই তহবিলে দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তি থেকে শুরু করে অতি সাধারণ মানুষও সাহায্য নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন। শোনা যায়, এই তহবিল বিধুমুখী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে দিয়েছিলেন। অর্থ সাহায্য পেয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কন্যাগণ দেশবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যে পত্র দিয়েছিলেন তা ১০ই জুন ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে আনন্দবাজার পত্রিকায় সংবাদরূপে প্রকাশিত হয় :

"ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কন্যা শ্রীযুক্তা কুমুদিনী দেবী এক পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'দেশের সু-সন্তানেরা আমাদের যে সাহায্য করিয়াছেন, তাহার জন্য আমরা দুই ভগ্নী কৃতজ্ঞ। আমরা সহৃদয় সন্তানদিগকে আমাদের আন্তরিক আশীর্বাদ জানাইতেছি। আমরা এইবার বুঝিতে পারিতেছি যে আমরা নিরাশ্রয় নহি। বরং আমরা এই ভাবিয়া সুখ পাইতেছি যে, আমাদের বহু সহৃদয় সন্তান দেশে আছেন। আমরা সকলের উন্নতির জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি।"

"যাহাদের নিকট হইতে সাহায্য পাওয়া গিয়াছে, শ্রীমতী বিধুমুখী বসু তাহার একটি তালিকা ফরোয়ার্ড পত্রিকায় দিয়াছেন।"

বিধুমুখীর জীবনের বিচিত্র কর্মকাণ্ডে সামাজিক সচেতনার প্রকাশ আমাদের মুগ্ধ করে যা সেকালের মহিলাদের পক্ষে এক বিরল দৃষ্টান্তরূপে গণ্য হতে পারে।

ঘোষ পরিবারের আরেক সন্তান বলরাম ঘোষের জ্ঞাতি-ভাই বারানসী ঘোষ। তিনি ছিলেন ২৪ পরগনার কালেক্টর মিঃ গ্লাডউইনের (Francis Gladwin) দেওয়ান। ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত ফ্রান্সিস গ্লাডউইন আইন-ই-আকবরী পুস্তক ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। তাঁর উদ্যোগে ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে 'The Calcutta Gazette' প্রতিষ্ঠিত হয়। বারানসী ঘোষের পিতা ও পিতামহ ছিলেন রাধাকান্ত ও গণেশচন্দ্র ঘোষ। বিবাহ করেছিলেন জোড়াসাঁকোর শান্তিরাম সিংহের কন্যাকে। সুদৃশ্য বাসভবন নির্মাণ করেছিলেন জোড়াসাঁকোতে। ব্যারাকপুরে গঙ্গাতীরে স্থাপন করেছিলেন ছটি শিবের মন্দির। সেকালের কলিকাতায় বিত্তশালী ও প্রভাবপ্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বারানসী ঘোষ। জোড়াসাঁকোতে তাঁর নামে ৪টি রাস্তা আছে—বারানসী ঘোষ স্ট্রিট, বারানসী ঘোষ লেন, বারানসী ঘোষ সেকেন্ড লেন ও থার্ড লেন। এদের মধ্যে বারানসী ঘোষ স্ট্রিটই প্রধান রাস্তা। আপজনের কলিকাতা মানচিত্রে (১৭৯২-৯৩) রাস্তাটির কিছু অংশ চিহ্নিত থাকলেও নামের প্রলেপ তখনও পড়েনি।

শক সাহেবের মানচিত্রে (১৮২৫) রাস্তাটি নামাঙ্কিত হতে দেখা যায়। কলিকাতা পৌরসভায় রক্ষিত ১৮২৫ সালের Assessment Register-এ রাস্তাটি প্রথম অন্তর্ভুক্ত হয়। একই নামের ছোট রাস্তাগুলি পরবর্তীকালে তৈরি হয়ে থাকবে। সে সময় বারানসী ঘোষ স্ট্রিট কর্নওয়ালিস স্ট্রিট থেকে আরম্ভ হয়ে পশ্চিমদিকে এগিয়ে পরে উত্তরমুখো হয়ে বলরাম দে স্ট্রিটে এসে পড়েছিল। চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ নির্মিত হলে পর রাস্তাটি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়—প্রথম অংশ কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের পশ্চিম দিক থেকে শুরু হয়ে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ এসে পড়েছে। দ্বিতীয় অংশ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ-এর পশ্চিম দিক থেকে আরম্ভ হয়ে প্রথমে পশ্চিমে, পরে মোড় ঘুরে উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে বিবেকানন্দ রোডে এসে মিশেছে। বারানসী ঘোষ স্ট্রিটের প্রথম অংশ পরবর্তীকালে অন্য নামে নামাঙ্কিত হয়েছে—সে কথায় আমরা পরে আসছি।

বহুমানভাজন মনীষী কালীপ্রসন্ন সিংহের (১৮৪০-১৮৭০) বসতবাড়ি বারানসী ঘোষ স্ট্রিটের গৌরব বহুলাংশে বৃদ্ধি করেছে। হুগলি জেলার বাক্স গ্রামের রামকিশোর সিংহের কনিষ্ঠ পুত্র শান্তিরাম সিংহ জোড়াসাঁকোর সিংহবাড়ির প্রতিষ্ঠাতা। শান্তিরাম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কালেকটর মিঃ মিডলটন ও স্যার টমাস র‍্যামবোল্ড সাহেবের দেওয়ান ছিলেন। তিনি পাটনা ও মুর্শিদাবাদ জেলা সম্বন্ধীয় কাজের অধ্যক্ষ ছিলেন। বারানসীতে একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর দুই পুত্র প্রাণকৃষ্ণ সিংহ ও জয়কৃষ্ণ সিংহ। কনিষ্ঠ জয়কৃষ্ণের একমাত্র সন্তান নন্দলাল। বহুগুণান্বিত মহাভারতকার কালীপ্রসন্ন সিংহ এই নন্দলাল সিংহের একমাত্র পুত্র। কালীপ্রসন্নের জন্ম উপলক্ষে এক বিরাট উৎসবের আয়োজন করেছিলেন নন্দলাল। সংবাদ প্রভাকরের ১৮৪০ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় এই উৎসবের বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল।

কালীপ্রসন্ন মাত্র ৩০ বছরের জীবনে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ও বাংলার সমাজজীবনে এক প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত। মাত্র ১৩ বছর বয়সে বিদ্যোৎসাহিনী সভা প্রতিষ্ঠা করে কীর্তিমান বন্ধুদের সঙ্গে নানা বিষয়ে উচ্চাঙ্গের আলোচনা করতেন। ক্রমে বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা (১৮৫৫) এবং বিদ্যোৎসাহিনী থিয়েটার (১৮৫৬) প্রতিষ্ঠা করে বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনকে পরিপুষ্ট করেন। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে রামনারায়ণ অনূদিত বেণীসংহার নাটকে প্রথম অভিনয় করেন। সর্বতত্ত্ব প্রকাশিকা (প্রাণিতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, শিল্প ও সাহিত্য বিষয়ক), বিবিধার্থ সংগ্রহ, পরিদর্শক প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি প্রথম গুণীজন সম্বর্দ্ধনার প্রবর্তন করেন। কবি মধুসূদন দত্তের সম্মাননার জন্য কালীপ্রসন্ন নিজ ভবনে একটি সভা আহ্বান করে কবিকে একটি অভিনন্দন পত্র ও মদ্য পানোপযোগী একটি রূপোর পাত্র উপহার দেন। নীলদর্পণ নাটকের জন্য পাদরি লঙ সাহেবের জরিমানার হাজার টাকা তিনি আদালতে জমা দেন (২৪শে জুলাই, ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দ)। এ ছাড়া হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকার সম্পাদক হরিশ মুখার্জি ও তাঁর

পরিবারবর্গকে, মুখার্জিস্ ম্যাগাজিনের শম্ভুচন্দ্র, শিক্ষক রিচার্ডসন ও লঙ সাহেব প্রমুখদের নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। বিধবাবিবাহকে জনপ্রিয় করার জন্য পুরস্কার ঘোষণা, বহু-বিবাহ রোধ ও বারবনিতা উৎসারণ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ছদ্মনামে লেখা তাঁর "হুতোম প্যাঁচার নক্সা" (১৮৬২-৬৪) সেকালের বঙ্গ সমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছিল। উনিশ শতকের শহর কলিকাতার সমাজচিত্র এই হুতোম প্যাঁচার নক্সা। সংস্কৃত শব্দবহুল ভাষা পরিত্যাগ করে বাংলা সাহিত্যে কথ্যভাষার প্রচলনের জন্য গ্রন্থটির অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁর রচিত নাটক "বাবু" (১৮৫৪), বিক্রমোর্বশী (১৮৫৭), সাবিত্রী সত্যবান (১৮৫৮) ও মালতীমাধব (১৮৫৯)। মহাভারত অনুবাদই কালীপ্রসন্ন সিংহের জীবনের আরেক মহান কীর্তি। বিদ্যাসাগরের উৎসাহে ও তত্ত্বাবধানে হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য, ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ পণ্ডিতের সাহায্যে মূল সংস্কৃত মহাভারত বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করা এবং বিনামূল্যে সুধীসমাজে বিতরণ তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। কালীপ্রসন্ন সিংহের স্মরণে কাশীপুরে আছে একটি রাস্তা আর সিংহী লেনে (৯নং সিংহী লেনে) আছে একটি উদ্যান।

বারানসী ঘোষ স্ট্রিটে 'সিংহবাড়ি' বলে পরিচিত বাড়িটিতে প্রবেশের মুখে রাস্তার উপর দেখা যাবে বৃত্তাকার শুষ্ক ফোয়ারা কালের সাক্ষী হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে। কলিকাতায় যখন পানীয় জলের অভাব, সে সময় অর্থাৎ ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে কালীপ্রসন্ন চারটি ঢালাই লোহার সুদৃশ্য ফোয়ারা ইংলন্ড থেকে আমদানি করে কলিকাতা পৌরসভাকে উপহার দেন। এগুলিতে আলো দিয়ে সাজানোর ব্যবস্থা ছিল। কালীপ্রসন্নের নির্দেশ ছিল উত্তর কলিকাতার জনবহুল রাজপথে এগুলি স্থাপন করলে একদিকে যেমন পল্লীবাসীর জলকষ্ট দূর হবে, অন্যদিকে ফোয়ারার আলোতে রাত্রিতে পথ আলোকিত হবে। ১৮৬৫ সালের ৬ই ডিসেম্বর তারিখে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায়, "বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের দত্ত দুই সহস্র টাকা দ্বারা ইংলন্ড হইতে ধারা যন্ত্র ৪টি আনয়ন করা হইয়াছে। ইহার ব্যয় সর্বশুদ্ধ ২৯৮৫ টা. ১০ আনা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন স্থাপনের ব্যয় স্বতন্ত্র দেওয়া হইবে"।

১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে একটি ফোয়ারা ডালহৌসি স্কোয়ারের উত্তর-পশ্চিম কোণে আরেকটি বিডন স্ট্রিট ও গুরুদাস স্ট্রিটের সংযোগস্থলে (বর্তমান মিনার্ভা থিয়েটারের কাছে) স্থাপিত হয়েছিল।[৫০]

অন্য একটি ফোয়ারা তাঁর বারানসী ঘোষ স্ট্রিটের বাড়ির সামনে পৌর কর্তৃপক্ষ স্থাপন করেছিলেন।[৫১] সেটি আজও সেখানে দাঁড়িয়ে আছে।

৩০ নম্বর বারানসী ঘোষ স্ট্রিটে যে দোতলা বাড়িটি এখনও আছে, তার মালিক শুকদেবচন্দ্র সিংহ। কালীপ্রসন্ন সিংহ হলেন তাঁর ঠাকুর্দার কাকা। এই বাড়িতে আছে সিংহদের ঠাকুর মন্দির। এ ছাড়া ছিল তাঁদের আরও পাঁচটি বাড়ি। এই বাড়িগুলি ও তার আসবাবপত্র সবই প্রায় বিক্রি হয়ে গেছে মাড়োয়ারিদের কাছে। শুকদেব সিংহ থাকেন হাঙ্গার ফোর্ড স্ট্রিটে (এখন পিকাসো বীথি)। শোনা যায় তিনি কালীপ্রসন্ন সিংহের স্মৃতিবিজড়িত এই ভবনটি গ্রহণ করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনুরোধ করেছিলেন। যে কোনও কারণেই হোক, সে প্রস্তাব বাস্তবায়িত হয়নি।

কালীপ্রসন্ন ছিলেন নিঃসন্তান। মৃত্যুকালে স্ত্রীকে দত্তক গ্রহণের অনুমতি দিয়ে যান। তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী শরৎকুমারী ছিলেন শ্যামপুকুরের অভয় ঘোষ লেন নিবাসী চন্দ্রনাথ বসুর কন্যা। চন্দ্রনাথ বসু "যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ" অনুবাদ করেছিলেন। এ ছাড়া "ভারতরত্নমালা" গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। শরৎকুমারী অতঃপর সিংহ বংশের বলাইচাঁদ সিংহের তৃতীয়পুত্র বিজয়চন্দ্রকে দত্তক গ্রহণ করেন।

বিজয়চন্দ্র সিংহ এই বংশের শেষ উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। আচার্য জগদীশচন্দ্রের প্রিয় ছাত্র এবং কলিকাতায় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা প্রচলনের অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন বিজয়চন্দ্র। বহুমূত্র রোগের অ্যালোপ্যাথি ওষুধ ইনসুলিনের হোমিওপ্যাথি সংস্করণ আবিষ্কার করেছিলেন। তা ছাড়া আয়ুর্বেদের বহুবিধ ভেষজকে হোমিওপ্যাথি ওষুধে রূপান্তরিত করেন। ভারতে তিনিই প্রথম উচ্চশক্তির (ডাইলিউশনের) হোমিওপ্যাথি ওষুধ ব্যবহার করে সাফল্য লাভ করেন। চিকিৎসার সুবিধার জন্য ইউরোপ থেকে আনিয়েছিলেন এক্সরে (X-Ray) মেশিন। বাড়ির ছাদে বসিয়েছিলেন টেলিস্কোপ। সে সময়ের কলিকাতায় তিনিই প্রথম নিজের বাড়িতে বেতারযন্ত্র রাখেন। অ্যান্টিম্যালেরিয়া

সোসাইটি, হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকা প্রভৃতি তাঁর আর্থিক সাহায্যে পুষ্ট হয়েছিল। বহু অর্থ ব্যয়ে নিজ ভবনে রসায়ন চর্চার জন্যে বিজ্ঞানাগার স্থাপন করেন। তিনি পিতার মতো মহাভারতের একটি রাজসংস্করণ প্রকাশ করে বিতরণের ব্যবস্থা করেছিলেন।[৫২] বিজয়চন্দ্র তাঁর বিষয়সম্পত্তি অধিকাংশই দান করে দিয়েছিলেন, আর কিছু বিক্রি হয়ে যায়। ১৯৩৩ সালে তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁর একমাত্র পুত্র সঞ্জীবচন্দ্র সিংহ ব্লক জি, ১৪৩ নিউ আলিপুরে বাস করেন। তাঁর বয়স প্রায় ৮৭ বছর।

আবার বারানসী ঘোষ স্ট্রিটের কথায় ফিরে আসি। আগেই বলা হয়েছে যে চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ তৈরি হলে পর রাস্তাটি দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। এর প্রথম অংশ কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের পশ্চিম দিক থেকে শুরু হয়ে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ পর্যন্ত প্রসারিত! ১৯৩৭ সালে বারানসী ঘোষ স্ট্রিটের এই অংশটুকু জোড়াসাঁকো নিবাসী তারকনাথ প্রামাণিকের নামে নামকরণের এক প্রস্তাব কলিকাতা পৌরসভার বিবেচনার জন্য পেশ করা হয়। তারকনাথ প্রামাণিক এই রাস্তায় বাস করতেন।

দানশীল তারকনাথ প্রামাণিকের (১২২৩-১২৯১ বঙ্গাব্দ) জন্ম কলিকাতায়। গ্রামের পাঠশালায় শিক্ষালাভ করে ১২ বছর বয়সে পিতা গুরুচরণের সহকারীরূপে ব্যবসায়ে প্রবেশ করেন। গুরুচরণ এদেশে প্রথম জাহাজ মেরামতির কারখানা স্থাপন করেছিলেন। তারকনাথের পরিচালনায় ওই কারখানার শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। তারকনাথের কাঁসা পেতলের ব্যবসা ছিল বহু বিস্তৃত। কলিকাতার বড়বাজার ও চাঁদনীতে তাঁদের প্রকাণ্ড আড়ত ছিল। জাহাজের তলদেশে ব্যবহারের জন্য পেতল ও তামার চাদর এই আড়ত থেকে বিদেশে রপ্তানি হত। দাতা হিসেবেও তারকনাথ সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলকেই মুক্ত হস্তে দান করতেন। বিবিধ ধর্মানুষ্ঠানে ও পূজা পার্বণাদি প্রচুর অর্থ ব্যয় করতেন। মহারানী ভিক্টোরিয়া ভারতসম্রাজ্ঞী উপাধি ধারণ উপলক্ষে ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারিতে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত দরবারে তারকনাথকে তাঁর দানধ্যানের জন্য 'সার্টিফিকেট অফ অনার' দ্বারা সম্মানিত করা হয়।[৫৩]

কলিকাতায় পৌরসভা ১০ই ফেব্রুয়ারি ১৯৩৭ সালের অধিবেশনে কর্নওয়ালিস স্ট্রিট ও চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ-এর মধ্যবর্তী বারানসী ঘোষ স্ট্রিটের অংশবিশেষের নাম পরিবর্তন করে 'তারক প্রামাণিক রোড' নামাঙ্কিত করেন।[৫৪] সে নাম আজও আছে।

## ৪ নং ওয়ার্ড

১। পূর্বের মানিকতলা স্ট্রিট থেকে আরম্ভ হয়ে দক্ষিণে এগিয়ে তিনটি শাখায় বিভক্ত হয়েছে 'ঘোষ লেন'—একটি শাখা চালতাবাগান লেনে এসে পড়েছে। আরেকটি যুগলকিশোর দাস লেনে ও তৃতীয়টি আমহার্স্ট স্ট্রিটে। পৌরসভা ২৯শে আগস্ট ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে এই রাস্তাটির নাম ঘোষ লেন নামকরণ করেন। এর পূর্বে এই রাস্তাটির নাম ছিল শুঁড়িপাড়া লেন। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে শুঁড়িপাড়া লেনের নাম বদল করে গিরিশচন্দ্র ঘোষ লেন নাম রাখার এক প্রস্তাব আসে। পৌরসভা ১৩ সেপ্টেম্বর ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে প্রস্তাবটি নাকচ করে দেন। পরবর্তীকালে বিবেকানন্দ রোড নির্মাণের সময় কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা (Calcutta Improvement Trust) এই রাস্তার কিছু অংশ স্কিম নং VII-C (The Scheme No.-VIIC)-এর অন্তর্ভুক্ত করেন। ফলে বিবেকানন্দ রোডের ধারের ঘোষ লেনের অংশ ৩০ ফুট চওড়া করা এবং রাস্তাটির ধারে ৬ ফুট করে ফুটপাতের ব্যবস্থা রাখা হয়। পৌরসভা ঘোষ লেনের নবনির্মিত অংশ ২রা সেপ্টেম্বর ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থার কাছ থেকে গ্রহণ করেন।

যে বর্ধিষ্ণু ঘোষ পরিবারের নামে ঘোষ লেন, তাঁরা ৪নং ঘোষ লেনে বাস করেন। এই বাড়িটির পাশের বাড়িগুলিও তাঁদের। এই পরিবারের গিরিশচন্দ্র ঘোষ ছিলেন উদ্যোগী পুরুষ। তিনি ছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জাহাজি কারবারের দালাল। অল্পদিনের মধ্যে গিরিশচন্দ্র পেলেন নাম, যশ, অর্থ ও প্রতিপত্তি। তাঁর জন্মভূমি হুগলি জেলার পরঞ্চপুর গ্রামে যে দুর্গাপূজা হত, তাকে তিনি ১৮৫৬ সালে কলিকাতায় এনে সাড়ম্বরে অর্চনার ব্যবস্থা করেন। সেই পূজা আজও অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। বর্তমানে এই বাড়িতে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের বংশধরগণ বাস করছেন।

২। ১৮৮৪-৮৫ খ্রিস্টাব্দে মদন মিত্র লেনের সঙ্গে কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের সংযোগকারী নতুন একটি রাস্তা নির্মিত হয়। এটির দৈর্ঘ্য ৩২৩ ফুট ও প্রস্থ ৯ ফুট। রাস্তাটি খোলা পয়ঃপ্রণালী ভরাট করা জমির উপর তৈরি হয়।[৫৫] এটির নামকরণ করা হয় মদন মিত্র থার্ড লেন। পুনরায় রাস্তাটির নাম বদল করা হয়। কলিকাতা পৌরসভা ২৩শে জুন ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের অধিবেশনে মদন মিত্র থার্ড লেনের নাম বদল করে ভারতবিখ্যাত কবি ও নাট্যকার রায় বাহাদুর দীনবন্ধু মিত্রের নামে "দীনবন্ধু লেন" রাখেন।

দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-৭৩) বাংলার অন্যতম প্রধান নাট্যকাররূপেই সমধিক খ্যাত। তাঁর 'নীলদর্পণ'(১৮৬০) ছদ্মনামে প্রকাশিত"(...কেনচিৎ পথিকেনাভি প্রণীতম্)" হয়ে নীলকরদের বিরুদ্ধে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। মাইকেল মধুসূদন এটির ইংরেজি অনুবাদ করে গোপনে তিরস্কৃত হন। পাদ্রি লঙ সাহেব পুস্তকটি প্রকাশ করে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন। আর সীটনকার হন অপদস্থ। বঙ্কিমচন্দ্র বইটিকে "আংকল টম্‌স্ কেবিন"-এর সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। বাঙালির জাতীয় রাজনৈতিক চেতনার উপর এই নাটকের প্রভাব অসামান্য। বাংলার কৃষকদের বিদ্রোহ ও গণ অভ্যুত্থানকে নাটকে রূপায়িত করার যে ধারা দীনবন্ধু নীলদর্পণে প্রবর্তন করলেন, বিংশ শতাব্দীতে বহু নাট্যকার সেই ধারাটিকে অনুসরণ করেছেন।

নীলদর্পণ ছাড়া সুরধুনী কাব্য ১ম ভাগ (১৮৭১) ও ২য় ভাগ (১৮৭৬) তাঁর অমর সৃষ্টি। কাব্যের মধ্য দিয়ে তিনি উত্তর ভারতের বিভিন্ন জনপদ এবং বঙ্গদেশ ও সমকালীন কলিকাতার বিশিষ্ট স্থান ও স্মরণীয় মনীষীদের চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর পরবর্তী রচনা নবীন তপস্বিনী, সধবার একাদশী, লীলাবতী, কমলে কামিনী প্রভৃতি বিখ্যাত নাটক। বিয়ে পাগলা বুড়ো (১৮৬৬) ও জামাইবারিক (১৮৭২) নামে দু'খানি প্রহসনও তিনি রচনা করেন।

তীক্ষ্ণ সমাজদৃষ্টি, লোকচরিত্রদর্শিতা, জীবন্ত চরিত্রচিত্রণ, মানবিক সহানুভূতি আর জীবন সম্বন্ধে বাস্তব অভিজ্ঞতা দীনবন্ধুর সৃষ্টিকে অমর করে রেখেছে।[৫৬]

৩। 'পঞ্চানন ঘোষ লেন' নামে রাস্তাটি ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে নির্মাণের কাজ শুরু হয়। এই নতুন রাস্তাটি বৃন্দাবন মল্লিক লেনের সঙ্গে আমহার্স্ট স্ট্রিটকে সংযুক্ত করেছে। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে রাস্তাটি সাধারণের ব্যবহারের জন্য খুলে দেওয়া হয়। এটি ১৬ ফুট চওড়া করার জন্য আমহার্স্ট স্ট্রিটের ৫৪ ও ৫৫নং বাড়ি ও ফকির চন্দ্র মিত্র স্ট্রিটের ১৮নং বাড়ি অধিগ্রহণ করা হয়।[৫৭] এই পঞ্চানন ঘোষ সেকালের কলিকাতার একজন বিশিষ্ট, সম্মানভাজন ব্যক্তি ছিলেন।

৪। ৩৭০ ফুট লম্বা ও ১৮ ফুট চওড়া একটি নতুন রাস্তা ১৮৮৭-৮৮ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়। এটি হরিতকি বাগান লেন ও ডাফ স্ট্রিটের মধ্যে যোগাযোগ সৃষ্টি করে। রাস্তাটির নতুন কোনও নামকরণ হয়নি। হরিপাল লেনের বর্দ্ধিতাংশ বলেই ধরা হয়।[৫৮]

এরপর যে রাস্তাটির কথা বলব সেটি কলিকাতার ইতিহাসে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। নাম বাদুড়বাগান স্ট্রিট। এই রাস্তার ধারে প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) তাঁর বসতবাটি নির্মাণ করেছিলেন, আর সেই বাড়িটি ছিল কলিকাতা তথা সারা ভারতবাসীর কাছে পবিত্র তীর্থভূমি।

প্রাচীন কলিকাতায় সারকুলার রোডের দু' ধারে ছিল বহু উদ্যানভবন। এই সব বাগানবাড়ির মধ্যে যেগুলি বিশিষ্টতার দাবি রাখে, সেই সব বাগানের নামে অঞ্চলটি নামাঙ্কিত হতে দেখা যায়। যেমন—সিকদারবাগান, নন্দনবাগান, হালসীবাগান, নারিকেলবাগান, পার্শীবাগান, বাদুড়বাগান প্রভৃতি। বাদুড়বাগানের বিস্তৃতি ছিল আমহার্স্ট স্ট্রিটের (রাজা রামমোহন রায় রোড) পূর্বদিকে আমহার্স্ট রো থেকে মেছুয়াবাজার স্ট্রিটের (কেশব সেন স্ট্রিট) উত্তর দিক পর্যন্ত। এই চৌহদ্দির মধ্যে সেকালের কলিকাতার বহু ধনী ব্যক্তির উদ্যানভবন ছিল। তাঁরা হলেন বিশ্বম্ভর মল্লিক, শান্তিরাম সিংহ, কাশীনাথ বাবু, রূপচাঁদ রায় প্রমুখ (এদের উদ্যানের উল্লেখ লটারি কমিটির মানচিত্রে আছে)। রসাল ফলের গাছে পরিপূর্ণ ছিল এই সব বিশাল বাগান। খাদ্যের লোভে হাজার হাজার

বাদুড় এই সব বাগানে ভিড় জমাতো। শ্রদ্ধেয় ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর রচিত 'স্বামী বিবেকানন্দ' পুস্তকে এই বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করেছেন : "রামবাগান থেকে নারকেলডাঙ্গা পর্য্যন্ত বাগানের পর বাগান ছিল, গাছে গাছে বাদুড় ঝুলত। লেখকের মাতাঠাকুরানী বলেছেন যে, বাল্যকালে তাঁর মাতামহের সঙ্গে নারকেলডাঙ্গা যাওয়ার কালে বাদুড় অধ্যুষিত বাগানগুলির মধ্য দিয়ে যেতেন। সেই জন্য নাম হয় বাদুড়বাগান। তাছাড়া, বহুকাল পর্য্যন্ত বানরের উৎপাতও বড় কম ছিল না, এরা দক্ষিণ দিক থেকে আসত" (পৃষ্ঠা ৬৯)।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে নগরায়নের চাপে এই সব উদ্যানভবন টুকরো টুকরো আকারে বিক্রি হতে থাকে। এই সব জমিতে বহু মধ্যবিত্তের আবাসভবন গড়ে ওঠে। কয়েকটি রাস্তাও তৈরি হয়ে যায়। এই ভাবে বাদুড়বাগানের নামে চারটি রাস্তাও নামাঙ্কিত হয়—বাদুড়বাগান স্ট্রিট, বাদুড়বাগান লেন, বাদুড়বাগান সেকেন্ড লেন ও বাদুড়বাগান রো। বাদুড়বেষ্টিত বাগানের অস্তিত্ব লোপ পেলেও এই পথ চারটি অঞ্চলের স্মৃতিকে জাগরুক রেখেছিল। পরবর্তীকালে তাদেরকেও নতুন নামে নামাঙ্কিত হতে হয়েছিল, সে কথায় আমরা এবারে আসছি।

১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের কলিকাতা পৌরসভার টাউন কাউন্সিলের প্রতিবেদনে দেখা যায় যে বাদুড়বাগান অঞ্চলে সারকুলার রোডের পশ্চিম দিক থেকে শুরু করে বৃন্দাবন মল্লিক লেন পর্যন্ত নতুন একটি রাস্তা ওই সময় নির্মিত হয়। কলিকাতা পৌরসভা ১৮৮০ সালে নতুন রাস্তাটি 'বাদুড়বাগান স্ট্রিট' নামকরণ করেন।

বাদুড়বাগানের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি ২৫ নম্বর বৃন্দাবন মল্লিক লেনে (এখন ৩৬নং বিদ্যাসাগর স্ট্রিট) একটি দোতলা বাড়ি নির্মাণ করেন। ১৮৭৭ সালের জানুয়ারি মাসে গৃহপ্রবেশ করেন। এই বাড়ির ডানদিকে একটু এগোলেই ছিল সেকালের বাদুড়বাগান স্ট্রিট। নিজস্ব বাড়ি তৈরি করার পূর্বে বিদ্যাসাগর কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে ভাড়া বাড়িতে বাস করেছিলেন, সে সম্বন্ধে দু'চার কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

পিতা ঠাকুরদাসের সঙ্গে বীরসিংহ গ্রাম থেকে কলিকাতায় প্রথম এসে বড়বাজারে ১৩নং দয়েহাটা স্ট্রিটে (এখন দিগম্বর জৈন টেম্পল রোড) কায়স্থ জমিদার জগদ্দুর্লভ সিংহের বাড়িতে ওঠেন। জমিদার কন্যা বিধবা রাইমণি বালক ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনে স্নেহের যে গভীর প্রভাব ফেলেছিলেন সে কথা দয়েহাটা স্ট্রিটের ইতিবৃত্তে সবিস্তারে বলা হয়েছে।

এরপর ঠাকুরদাস দয়েহাটার বাড়ি ছেড়ে ১৫নং হিদারাম ব্যানার্জি লেনে আনন্দরাম সেনের বাড়িতে প্রায় তিন বছর বাস করেন। যাঁর নামে গলিটি নামাঙ্কিত হয়েছে সেই হৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায় আনন্দরাম সেনের বাড়ির বিপরীত দিকে থাকতেন। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর ছোট ভাইরাও এই বাড়িতে বাস করতেন।

কিছুকাল পরে ঠাকুরদাস আনন্দরাম সেনের বাড়ি ছেড়ে হৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বর্হিবাটির (৫৪নং হিদারাম ব্যানার্জি লেন) দু'খানি ঘর ভাড়া নেন। সেখানে ছেলেদের নিয়ে বাস শুরু করেন। এই বাড়িতে থাকাকালীন ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে হৃদয়রামের পৌত্র রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠতা জন্মায়। পরে ঠাকুরদাস ওই বাড়ির সমগ্র বর্হিবাটি ৮ টাকা ভাড়ায় নিয়েছিলেন।

সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষ হবার পর বিদ্যাসাগর কিছুকাল ওই কলেজ ভবনের একতলার একটি ঘরে থাকতেন। কিছুকাল মেছুয়াবাজার স্ট্রিটের একতলা বাড়িতে ভাড়া করে ছিলেন।

যকৃতের রোগে আক্রান্ত হলে চিকিৎসার জন্য বিদ্যাসাগর কিছুকাল রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়িতে ছিলেন। তখনও বহুবাজারের ভাড়াবাড়িটি তাঁর হেপাজতে ছিল।

এরপর ঈশ্বরচন্দ্র ৬৩নং আমহার্স্ট স্ট্রিটের বাড়ি ভাড়া করে কিছুকাল ছিলেন।

১৮৭১ খ্রিস্টাব্দের মে-জুন মাস থেকে কলিকাতার উত্তর উপকণ্ঠে কাশীপুরের গঙ্গাতীরে হীরালাল শীলের এক বাংলো বাড়ি মাসিক ১৫০ টাকা ভাড়া নিয়ে তিনি কিছুকাল বাস করেন। এরপর ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে নিজের বাড়ি করেন, যার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

বিদ্যাসাগরের নিজস্ব বাড়ি নির্মাণের কোনও ইচ্ছা ছিল না। তাঁর ছিল এক বিশাল পুস্তক সংগ্রহ। সংস্কৃত, বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি, ফারসী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষার ১৬,০০০ পুস্তক নিয়ে এই

বিশাল ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল। এই পুস্তকগুলির প্রতি তাঁর যত্ন ছিল অসীম। বহু অর্থ ব্যয় করে সেগুলি উত্তম বাঁধাই-এর ব্যবস্থা করেছিলেন। পুস্তকরাজির উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের জন্যই তাঁকে নিজস্ব গৃহ নির্মাণে প্রবৃত্ত হতে হয়েছিল।[৫৯]

বাদুড়বাগানে বিদ্যাসাগর-ভবন সেকালের কলিকাতায় ঐতিহাসিক গুরুত্ব লাভ করেছিল। বহু জ্ঞানীগুণী-মহাজনের পদধূলিতে পবিত্র হয়েছিল এই ভবন। তাঁরা আসতেন বিদ্যাসাগরের কাছে নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করতে, আবার কখন বা আসতেন তাঁর উপদেশ ও পরামর্শ নিতে। এঁরা ছাড়াও আসতেন বহু সাধারণ মানুষ, নানা প্রত্যাশা পূরণের আশায়।

বিদ্যাসাগর ছিলেন অত্যন্ত বন্ধুবৎসল। রাজা মহারাজা থেকে আরম্ভ করে দরিদ্রতম ব্যক্তি পর্যন্ত তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তাঁরা হলেন—প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, জজ দ্বারকানাথ মিত্র, রমেশচন্দ্র মিত্র, শ্যামাচরণ দে, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, প্যারীচরণ সরকার, রামতনু লাহিড়ী, ডাঃ দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, রাজেন্দ্রনাথ দত্ত, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, দুর্গামোহন দাস, দীনবন্ধু মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল, মাইকেল মধুসূদন, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রমুখ। বিদ্যাসাগরের অনুরাগী ও গুণমুগ্ধ ভক্তের সংখ্যাও কম ছিল না। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ্য—কালীপ্রসন্ন সিংহ, পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাশিমবাজারের রাজা কৃষ্ণনাথ নন্দী, মহারানী স্বর্ণময়ী, রানী কাত্যায়নী, কবি নবীনচন্দ্র সেন, নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শিবনাথ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, অমৃতলাল বসু, বিহারীলাল সরকার প্রমুখ। এই সব বন্ধু ও ভক্তবৃন্দের সমাগমে বিদ্যাসাগর ভবন মুখরিত হত।

বিদ্যাসাগর নিজে ছিলেন অত্যন্ত রসিক ও মজলিসি পুরুষ। হাসি ঠাট্টায় ও সরস কথাবার্তায় তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা আসর জমিয়ে রাখতেন। শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তাঁর আলাপ শুনতেন। সময় কোথা দিয়ে বয়ে যেত কেউ বুঝতে পারতেন না।

বিদ্যাসাগরের এই বাদুড়বাগানের বাড়িতে ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে ৫ আগস্ট বেলা ৪টার সময় শুভাগমন করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব। কয়েক ঘণ্টা এখানে অতিবাহিত করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত-শিষ্য 'শ্রীম' এই আগমনের এক চাক্ষুষ বিবরণ দিয়েছিলেন তাঁর বিখ্যাত "কথামৃত" গ্রন্থে। এই বিবরণ থেকে তৎকালীন বিদ্যাসাগর ভবনের পরিকাঠামো ও গৃহের সাজসজ্জা সম্বন্ধে সম্যক অবগত হওয়া যায়। তিনি লিখেছেন, "বিদ্যাসাগরের বাটীর সম্মুখে গাড়ী দাঁড়াইল। গৃহটি দ্বিতল, ইংরাজ পসন্দ। জায়গার মাঝখানে বাটী ও জায়গার চতুর্দিকে প্রাচীর। বাড়ীর পশ্চিমধারে সদর দরজা ও ফটক। ফটকটি দ্বারের দক্ষিণ দিকে। পশ্চিমের প্রাচীর ও দ্বিতল গৃহের মধ্যবর্তী স্থানে মাঝে মাঝে পুষ্পবৃক্ষ। পশ্চিম দিকের নিচের ঘর হইয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে হয়। উপরে বিদ্যাসাগর থাকেন। সিঁড়ি দিয়া উঠিয়াই উত্তরে একটি কামরা, তাহার পূর্বদিকে হলঘর। হলের দক্ষিণ-পূর্ব ঘরে বিদ্যাসাগর শয়ন করেন। ঠিক দক্ষিণে আর একটি কামরা আছে—এই কয়টি কামরা বহুমূল্য পুস্তক পরিপূর্ণ। দেওয়ালের কাছে সারি সারি অনেকগুলি পুস্তকাধারে অতি সুন্দররূপে বাঁধানো বইগুলি সাজানো আছে। হলঘরের পূর্ব সীমান্তে টেবিল ও চেয়ার আছে। বিদ্যাসাগর যখন বসিয়া কাজ করেন তখন সেইখানে তিনি পশ্চিমাস্য হইয়া বসেন। যাঁহারা দেখাশুনা করিতে আসেন, তাঁহারাও টেবিলের চতুর্দিকে চেয়ারে উপবিষ্ট হন। টেবিলের উপর লিখিবার সামগ্রী—কাগজ, কলম, দোয়াত, ব্লটিং, অনেকগুলি চিঠিপত্র, বাঁধানো হিসাবপত্রের খাতা, দুচারখানি বিদ্যাসাগরের পাঠ্যপুস্তক রহিয়াছে—দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ কাষ্ঠাসনের ঠিক দক্ষিণের কামরাতে খাট বিছানা আছে—সেইখানে ইনি শয়ন করেন।"[৬০]

বিদ্যাসাগর এই বাড়িতেই তাঁর বাকি জীবন অতিবাহিত করেন। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের ২৯শে জুলাই এই গৃহেই তিনি দেহত্যাগ করেন। পরবর্তীকালে এই বাড়ির অনেক পরিবর্তন হয়েছিল। সেই 'শ্রী' আর ছিল না। 'কথামৃত' প্রণেতা শ্রীম বহুবছর বাদে বিদ্যাসাগর ভবনে পদার্পণ করেছিলেন। 'শ্রীম দর্শন' (১৫ ভাগ, দ্বাবিংশ অধ্যায়) পুস্তকে এর একটি সুন্দর বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে : "বিশ্রামান্তে

অন্তেবাসী পুনরায় ঠাকুরের স্থানসমূহ দেখিতে বাহির হইলেন। প্রথমে গেলেন বাদুড়বাগান বিদ্যাসাগর ভবনে। এখন আর বাড়ির পূর্বাবস্থা নেই। দোতলায় উঠিবার সিঁড়ি ছিল পশ্চিমে। সামনে বড় বিলিতি ঝাউ গাছ ছিল। প্রবেশদ্বারাদি সবই বদলাইয়া গিয়াছে, এখন ঐ বাড়িতে একটি স্কুল।"

সম্ভবত বিদ্যাসাগরের তিরোধানের পর কলিকাতা পৌরসভা তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে বাদুড়বাগান স্ট্রিটের নাম পরিবর্তন করে "বিদ্যাসাগর স্ট্রিট" নামাঙ্কিত করেন। রাস্তার এই নতুন নামকরণে বিদ্যাসাগর ভবন যথাপূর্ব বৃন্দাবন মল্লিক লেনের উপরই থেকে যায়। বিদ্যাসাগরের নামে বিদ্যাসাগর স্ট্রিট নামকরণ হল, অথচ বিদ্যাসাগর ভবন তার আওতার বাইরে রইল, বিষয়টি পৌরসভাকে ভাবিয়ে তোলে। অবশেষে ১৯২৫ সালে এই মর্মে একটি প্রস্তাব দেওয়া হয় যে বৃন্দাবন মল্লিক লেনের উত্তর দিকের ৪৫০ ফুট রাস্তার অংশবিশেষ যা সুকিয়া স্ট্রিট (এখন মহেন্দ্র শ্রীমানী স্ট্রিট) থেকে বিদ্যাসাগর স্ট্রিট পর্যন্ত প্রসারিত, যার মধ্যে বিদ্যাসাগর ভবন অবস্থিত, রাস্তার সেই অংশটুকুও বিদ্যাসাগরের নামে নামাঙ্কিত করা হোক। কলিকাতা পৌরসভা তাঁদের ২৯শে জুলাই ১৯২৫ সালের অধিবেশনে এই প্রস্তাব অনুমোদন করেন। এর ফলে বিদ্যাসাগর স্ট্রিট সম্প্রসারিত হয়ে সারকুলার রোড (এখন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড) থেকে শুরু হয়ে পশ্চিম দিকে এগিয়ে পরে মোড় ঘুরে বিদ্যাসাগরের ভবনের সামনে দিয়ে উত্তরে অগ্রসর হয়ে সুকিয়া স্ট্রিটে এসে মিশেছে। বৃন্দাবন মল্লিক লেনের দৈর্ঘ্য হ্রাস পায়, পথটি পঞ্চানন ঘোষ লেন ও ফকিরচাঁদ মিত্র স্ট্রিটের সংযোগস্থল থেকে আরম্ভ হয়ে উত্তরে এগিয়ে বিদ্যাসাগর স্ট্রিটে এসে মিশেছে। বিদ্যাসাগর-ভবনের নতুন ঠিকানা ৩৬নং বিদ্যাসাগর স্ট্রিট। বিষয়টি পরিস্ফুট করার জন্য ওই অঞ্চলের একটি খসড়া রেখাচিত্র পরপৃষ্ঠায় দেওয়া হল :

এই ৩৬নং ভবনের প্রধান ফটকের বামদিকের রাস্তার উপরের দেওয়ালে শ্বেতপাথরের ফলকে লেখা আছে—

"Here lived Pandit Iswar Chandra Vidyasagar, C.I.E.—Educationist, Reformer and Philanthropist—Born 1820, Died 1891."

বিদ্যাসাগর ভবনের কিছু অংশ দেবোত্তর সম্পত্তি করা হয়েছিল। বিদ্যাসাগর তাঁর সম্পত্তির উইল বা চরম নির্দেশপত্র স্বাক্ষর করেন ৩১শে মে ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে। বাদুড়বাগানে নিজ বাসভবন নির্মাণ করেন ১৮৭৬ এবং গৃহপ্রবেশ ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে। কাজেই তাঁর উইলে এই দেবোত্তর সম্পত্তির কোনও উল্লেখ নেই। তিনি তাঁর উইলে পুত্র নারায়ণচন্দ্রকে বিষয়-সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেন। নারায়ণচন্দ্র পরবর্তীকালে হাইকোর্টে মামলা করে পিতার বিষয়সম্পত্তির অধিকারী হন। সেই সূত্রে দেবোত্তর সম্পত্তির সেবাইত হন। বিদ্যাসাগর তাঁর উইলে যাঁদের বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন, নারায়ণচন্দ্র তাঁদেরকে ঠিক সময়মত বৃত্তি দিতে না পারায় তাঁরা আদালতের আশ্রয় নিয়ে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে রিসিভার নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। রিসিভার হলেন হাইকোর্টের একজন অফিসার জ্যোতিষচন্দ্র মিত্র। ১৯১১ সালে জ্যোতিষচন্দ্র মিত্রের জায়গায় এলেন ব্যারিস্টার প্রভাতকুসুম রায়চৌধুরী। ১৯২৭-২৮ সালে কলিকাতা পৌরসভায় রক্ষিত অ্যাসেসমেন্ট রেজিষ্টারে (Assesment Register) ৩৬নং বিদ্যাসাগর স্ট্রিটের মালিকানা এইভাবে নথিভুক্ত করা হয়েছে—

"Recorded owner P. Roy Chowdhury, Receiver to the Vidyasagar Estate & Pandit Narayan Ch. Vidyaratna, Sabait, Vidyasagar Mandir."

রিসিভার দেবোত্তর সম্পত্তির অংশটুকু বাদ দিয়ে ৩৬নং বিদ্যাসাগর ভবনের বাকি অংশ বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেন। ১৯৩৩ সালে সুরেশচন্দ্র মুখার্জি হাইকোর্ট থেকে এই অংশটুকু কিনে নেন। সুরেশবাবুর উত্তর-পুরুষগণ বর্তমানে এই বাড়িতে বাস করছেন।

এরপর ১ এপ্রিল ১৯৩৫ সালে ৩৬নং বিদ্যাসাগর স্ট্রিট (বিদ্যাসাগর ভবন) দু'ভাগে ভাগ হয়—৩৬ নং ও ৩৬/১ নং। প্রথম অংশের অধিকারী হন সুরেশচন্দ্র মুখার্জি এবং দ্বিতীয় অংশের বিদ্যাসাগর মন্দিরের ট্রাস্টি ও সেবাইতগণ যথা, ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, প্রফুল্লকমল ঘোষাল এবং

## বাদুড়বাগান অঞ্চলের রেখাচিত্র

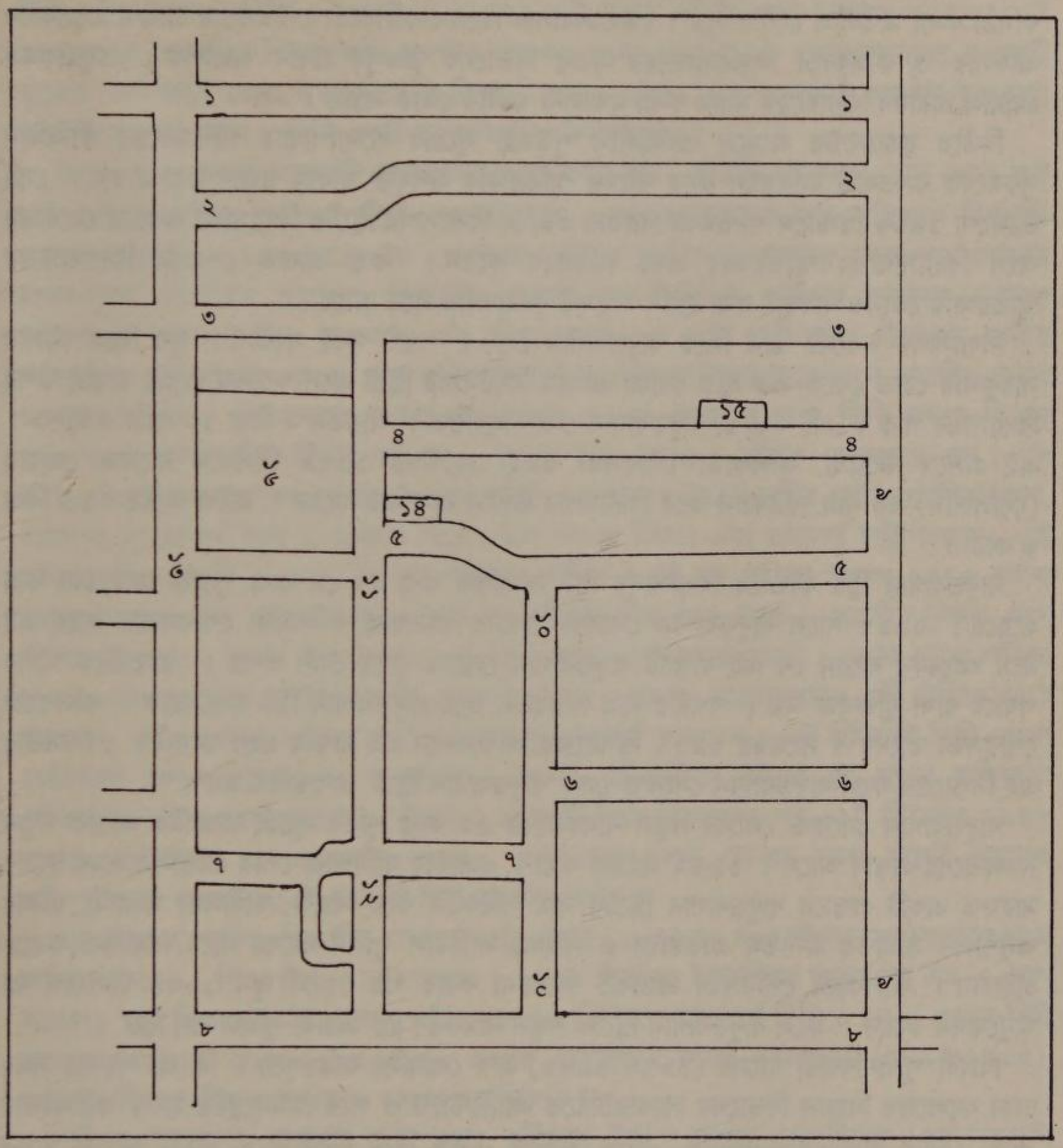


১ আমহার্স্ট রো
২ বাদুড়বাগান রো
৩ সুকিয়া স্ট্রিট
৪ বাদুড়বাগান লেন
৫ বিদ্যাসাগর স্ট্রিট
৬ পার্শিবাগান লেন
৭ পঞ্চানন ঘোষ লেন
৮ মেছুয়াবাজার স্ট্রিট
৯ আপার সারকুলার রোড
১০ বাদুড়বাগান সেকেন্ড লেন
১১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন
১২ ফকিরচাঁদ মিত্র স্ট্রিট
১৩ আমহার্স্ট স্ট্রিট
১৪ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ি
১৫ বিদ্যাসাগর উদ্যান
১৬ হৃষিকেশ পার্ক

অন্যান্যেরা।[৬১] এঁরা সকলেই নারায়ণ বিদ্যারত্নের উত্তরাধিকারী। ক্ষিতীশপ্রসাদ, নারায়ণ বিদ্যারত্নের কনিষ্ঠা কন্যা মতিলাল দেবীর পুত্র। ক্ষিতীশপ্রসাদ ছিলেন কলিকাতা পৌরসভার প্রাক্তন এডুকেশন অফিসার ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের ভূতপূর্ব প্রধান অধ্যাপক। প্রফুল্লকমল ঘোষাল নারায়ণ বিদ্যারত্নের মধ্যম কন্যা মৃণালিনী দেবীর জ্যেষ্ঠ সন্তান।

দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টের আমলে তৎকালীন পূর্তমন্ত্রী সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের কীর্তিমান পুরুষদের বসতবাটি অধিগ্রহণ করে তাঁদের স্মৃতিরক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে তৎপর হন। সেই উদ্দেশ্যে ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৩৬/১, বিদ্যাসাগর স্ট্রিটের বিদ্যাসাগর ভবনের দেবোত্তর অংশ বিদ্যাসাগরের স্মৃতিরক্ষার জন্য অধিগ্রহণ করেন। কিন্তু আজও সেখানে বিদ্যাসাগরের স্মৃতিরক্ষার কোনও ব্যবস্থাই করা হয়নি। সেটি দৈন্যদশায় পড়ে আছে।

বিদ্যাসাগর ভবনের ডান দিকে বাদুড়বাগান লেন। পথটি খুবই সংকীর্ণ। পূর্ব দিকে আপার সারকুলার রোড থেকে শুরু হয়ে সোজা এগিয়ে বিদ্যাসাগর স্ট্রিটে এসে পড়েছে। এই রাস্তার ওপর বিদ্যাসাগর পার্ক। এটি ২৬/১, বাদুড়বাগান লেনে অবস্থিত। আয়তন ২ বিঘা ১০ কাঠা ৩ ছটাক। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, কলিকাতা পৌরসভা ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে কলেজ স্কোয়ার (গোলদিঘি)-এর নাম পরিবর্তন করে বিদ্যাসাগর উদ্যান নামাঙ্কিত করেন। এটির আয়তন ১৩ বিঘা ৬ কাঠা।

বাদুড়বাগান স্ট্রিট কীভাবে বিদ্যাসাগর স্ট্রিট নামাঙ্কিত করা হয় সে কথা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। ১৯১৭ সালে বাদুড়বাগান সেকেন্ড লেনের বাসিন্দারা কলিকাতা পৌরসভার কাছে এই মর্মে আবেদন করেন যে এই রাস্তাটি বাদুড়বাগান লেনের চেয়ে বেশি প্রশস্ত। রাস্তাটিকে গলির পর্যায়ে রাখা যুক্তিযুক্ত নয়। পথটির নাম পরিবর্তন করে বাদুড়বাগান স্ট্রিট করা হোক। কলিকাতা পৌরসভা তাঁদের ৭ নভেম্বর ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের অধিবেশনে এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন। পৌরসভার এই সিদ্ধান্তের ফলে বাদুড়বাগান সেকেন্ড লেন 'বাদুড়বাগান স্ট্রিটে' রূপান্তরিত হল।[৬২]

বাদুড়বাগান সেকেন্ড লেনের নতুন নামকরণের ৫০ বছর পূর্তির পূর্বেই রাস্তাটির আরেক নতুন নামকরণের প্রস্তাব আসে। ১৯৬২ সালের কথা। এলাকার বাসিন্দারা পৌর প্রতিনিধি সমর রুদ্রের মারফত একটি প্রস্তাবে বাদুড়বাগান স্ট্রিটের নাম পরিবর্তন করে বিপ্লবী, স্বাধীনতা সংগ্রামী, ঢাকার অনুশীলন সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও বিখ্যাত লাঠিয়াল পুলিন দাসের নামে নামাঙ্কিত করতে চাইলেন। কলিকাতা পৌরসভা প্রস্তাবটি বিবেচনা করার পর ১৯শে জুন ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে তা অনুমোদন করেন। ফলে বাদুড়বাগান স্ট্রিটের নতুন নামকরণ হয় 'বিপ্লবী পুলিন দাস স্ট্রিট'।[৬৩]

বিপ্লবী পুলিনবিহারী দাসের (১৮৭৭-১৯৪৯) জন্ম লোনসিং ফরিদপুরে। বি. এ. পড়বার সময় ঢাকা কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের ল্যাবরেটরিতে অ্যাসিস্ট্যান্ট ও পরে ডিমন্‌স্ট্রেটর হন। কলিকাতার সরলা দেবীর আখড়ার অনুকরণে ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তিনি টিকাটুলিতে একটি আখড়া স্থাপন করেন। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় শ্রীরামপুরের বিখ্যাত লাঠিয়াল ওস্তাদ মুর্তজা সাহেবের কাছে লাঠি ও তরবারি খেলা শেখেন। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে পি. মিত্রের কাছে বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত হন এবং ঢাকায় অনুশীলন সমিতি সংগঠিত করেন। ঢাকায় অনুশীলন সমিতিতে তিনি এই সব শিক্ষা ছাড়াও কুচকাওয়াজ এবং কৃত্রিম যুদ্ধের মাধ্যমে তরুণদের উৎসাহিত করে তোলেন। ১৯০৭ থেকে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অনুশীলন দলের সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব বহন করেন। তাঁর নেতৃত্বে পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের এবং বাংলার বাইরেও সমিতির শাখা বিস্তার লাভ করে। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে যখন অনুশীলন সমিতিসহ বিভিন্ন সমিতি বেআইনি ঘোষিত হয়, তখন তাঁর নেতৃত্বে সমিতির প্রায় ৬০০ শাখা বিদ্যমান ছিল। এরপর ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়, পরে আপিলে কারাদণ্ড কমে ৭ বছর হয়। তিনি আন্দামানে প্রেরিত হন। বীর সাভারকর, ভাই পরমানন্দ, বারীন ঘোষ, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী প্রমুখ তাঁর সঙ্গে একত্রে আন্দামানে ছিলেন। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে মুক্ত হয়ে দেশে ফিরে আসেন। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে পুলিনবিহারী অহিংস আদর্শের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লবের প্রচারের জন্য ভারত সেবক সংঘ গঠন করেন। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের শেষে অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ায় তিনিও ভারত সেবক

সংঘ ভেঙে দেন এবং সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যাসাগর স্ট্রিটে বঙ্গীয় ব্যায়াম সমিতি ও আখড়া স্থাপন করে লাঠি, ছোরা প্রভৃতি খেলা শেখাতে থাকেন। এই সব খেলার বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধীয় পুস্তকও রচনা করেন। এ ছাড়াও অন্যান্য কয়েকটি স্থানেও তিনি লাঠি, ছোরা, জুজুৎসুপ্রভতি শিক্ষা দিতেন। ব্যায়াম সমিতির মাঠেই অকস্মাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। তিনি একটি আত্মজীবনীও লিখেছিলেন।

বাদুড়বাগান অঞ্চলে আরেকটি রাস্তার নাম বাদুড়বাগান রো। রাস্তাটি সারকুলার রোড থেকে শুরু হয়ে পশ্চিমে এগিয়ে আমহার্স্ট স্ট্রিটে এসে মিশেছে। বাদুড়বাগান রো তার অস্তিত্বকে দীর্ঘস্থায়ী করতে পারেনি। ১৯৪৩ সালে ৩০ সেপ্টেম্বর তারিখে সেকালের ভারতের সংবাদপত্র জগতের প্রবাদ-পুরুষ খ্যাতিমান প্রাবন্ধিক, শিক্ষাবিদ, প্রবাসী, মডার্ন রিভিউ পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় পরলোকগমন করেন। তাঁর তিরোধানের পর তাঁর স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে স্থানীয় অধিবাসীরা বাদুড়বাগান রো-এর নাম পরিবর্তন করে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের নামে নামাঙ্কিত করার জন্য তৎপর হন। রামানন্দবাবু অবশ্য বাদুড়বাগান রো-তে থাকতেন না। তিনি প্রথমে ছিলেন ২১০/৩/১, কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের বাড়িতে। বাড়িটি ছিল প্রকাণ্ড। মালিক কেদারনাথ রায়। সে সময় এই বাড়িতে থাকতেন দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, লোকনাথ মৈত্র (কাশীর হোমিওপ্যাথি ডাক্তার, অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র ও ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রের পিতা) এবং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। এই বাড়িতে ছিল প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউ পত্রিকার অফিস। এই দুই পত্রিকা বৈশাখ ১৩১৫ বঙ্গাব্দ থেকে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত এ বাড়ি থেকেই প্রকাশিত হতে থাকে। প্রবাসীর নিজস্ব প্রেস স্থাপিত হয় ১৩৩১ সনের আষাঢ় মাসে ৯১ নম্বর আপার সারকুলার রোডে। তখন থেকে পত্রিকা দু'খানি এই সারকুলার রোডের বাড়ি থেকে বেরোতে থাকে। রামানন্দবাবুও এই বাড়িতে উঠে আসেন। এই ৯১ নম্বর বাড়িতে পূর্বে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় থাকতেন। এই বাড়িতেই তিনি বেঙ্গল কেমিক্যাল স্থাপন করেন।[৬৪] বাদুড়বাগান রো-এর অধিবাসীগণ তাঁদের এই প্রস্তাব কলিকাতা পৌরসভার কাছে পেশ করেন। পৌরসভা প্রস্তাবটি বিচার-বিবেচনার পর ১১ই ডিসেম্বর ১৯৪৬ সালের অধিবেশনে তা অনুমোদন করেন। ফলে বাদুড়বাগান রো-এর সমগ্র রাস্তাটি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের নামে 'রামানন্দ চ্যাটার্জি স্ট্রিট' নামাঙ্কিত হয়।

খ্যাতনামা সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (১৮৬৫-১৯৪৩) বাঁকুড়ার পাঠকপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায়। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজিতে অনার্স সহ এম. এ. পাশ করেন। ছাত্র হিসেবে তিনি ছিলেন কৃতী। ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। প্রথমে সিটি কলেজে অধ্যাপনা করেন (১৮৯৩-৯৫), এরপর এলাহাবাদে কায়স্থ পাঠশালায় (১৮৯৫-১৯০৫), সর্বশেষে বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ হয়েছিলেন।

পত্রিকা সম্পাদনায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কৃতিত্বের উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছিলেন। অনেকগুলি পত্রিকা প্রতিষ্ঠা ও সম্পাদনা করেছিলেন, যথা ধর্মসিন্ধু (১৮৯০), দাসী (১৮৯২), শিশুপত্রিকা মুকুল (১৮৯৫), প্রদীপ (১৮৯৭) প্রভৃতি। এলাহাবাদে প্রবাসকালে ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে সেকালের প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকা প্রবাসী প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন। ১৯০৭ সালে ইংরেজি মাসিক পত্রিকা মডার্ন রিভিউ (Modern Review) প্রকাশ করেন। ১৯২৭ সালে প্রকাশ করেন "বিশাল ভারত" নামে হিন্দি পত্রিকা। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বাংলায় ব্রেইল প্রথার উদ্ভাবন করেন। পত্রিকা প্রকাশনার মাধ্যমে একদিকে যেমন ভারতবাসীদের জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণে সচেষ্ট ছিলেন, অন্য দিকে এদেশের বহু বিখ্যাত ব্যক্তির সংগ্রাম ও সাধনায় পোষকতা করেছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। সাংবাদিক হিসাবে নির্ভীক, নিরপেক্ষ এবং দৃঢ়চেতা হওয়ার জন্য সরকারের কাছে বহুবার জরিমানা দিতে হয়েছে তাঁকে। পত্রিকাগুলিতে তিনি নতুন ধারার প্রবর্তন করেছিলেন—প্রতি ইংরেজি ও বাংলা মাসের ১ তারিখে পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা এবং ভারতীয় রীতি অনুসারে অঙ্কিত চিত্রকলা তাঁর পত্রিকায় প্রকাশের ব্যাপারে তিনি ছিলেন পথিকৃৎ।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কর্মধারা শুধুমাত্র পত্রিকা সম্পাদনায় সীমাবদ্ধ ছিল না, বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ সম্পাদক এবং ১৯২২

খ্রিস্টাব্দে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে লিগ অব নেশনস্ কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে তিনি ইউরোপ গমন করেন। রামানন্দ ১৯২৩ ও ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের এলাহাবাদে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের মূল সভাপতি, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো এবং সেকেণ্ডারি এডুকেশন রিফর্ম কমিটির সদস্য ছিলেন।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের চরিত্রে বহুবিধ গুণের সমন্বয়ের জন্য সেকালের বহু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, রবীন্দ্রনাথ, আচার্য যদুনাথ সরকার প্রমুখ মনীষীগণ প্রায়ই নিজেদের করণীয় সম্পর্কে তাঁর পরামর্শ গ্রহণের জন্য তাঁর কাছে উপস্থিত হ'তেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্বন্ধে গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। আর মহাত্মা গান্ধী বলেছেন, ''The Prince of journalists''।

বাদুড়বাগান অঞ্চলে বাদুড়বাগান নামে চিহ্নিত চারটি রাস্তার মধ্যে তিনটি-ই তাদের প্রাচীন ঐতিহ্য এইভাবে বিসর্জন দিয়ে নতুন নামে নামাঙ্কিত হয়েছে। একমাত্র আদি অকৃত্রিম 'বাদুড়বাগান লেন' আজও তার অস্তিত্ব বজায় রেখে প্রাচীন ইতিহাসের স্মৃতিকে জাগরুক রেখেছে।

## ৫নং ওয়ার্ড

১। সুজেন্দ্র শেঠ লেন ও ব্রজকুমার শেঠ লেন : ১৮৮৬-৮৭ খ্রিস্টাব্দের পৌরসভার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রিপোর্টে জানা যায় যে জোড়াবাগানের শেঠ পরিবার জোড়াবাগান বস্তির মধ্য দিয়ে নতুন রাস্তা নির্মাণের সময় পৌরসভাকে বিনামূল্যে জমি দিয়েছিলেন। দানের একটি শর্ত ছিল— নতুন যে দুটি রাস্তা তৈরি হবে তা তাঁদের পরিবারের দুজনের নামে নামকরণ করতে হবে। রাস্তা যথাসময়ে নির্মিত হলেও নামকরণ নিয়ে উভয় পক্ষই নীরব ছিলেন।

১৯১৪ সালে বাবু মন্মথনাথ শেঠ ও হীরালাল শেঠ কলিকাতা পৌরসভার কাছে এক স্মারকলিপির মাধ্যমে পৌরসভাকে তাঁদের পুরানো শর্তের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। ওই স্মারকপত্রে আরও বলা হয় যে রাস্তা দুটির নাম তাঁদের দুই পূর্বপুরুষ সুজেন্দ্রমোহন শেঠ ও ব্রজেন্দ্রকুমার শেঠের নামে নামাঙ্কিত করা হোক। ওই অঞ্চলের পৌর প্রতিনিধি শেঠেদের প্রস্তাব সমর্থন করেন।

কলিকাতা পৌরসভা তাদের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ১৯১৪ সালের অধিবেশনে শেঠেদের প্রস্তাব অনুমোদন করেন। অতঃপর যে রাস্তাটি জোড়াবাগান স্ট্রিট ও মণ্ডল স্ট্রিটকে সংযুক্ত করেছে তার নাম রাখা হল 'সুজেন্দ্র শেঠ লেন'। আর যে রাস্তাটি অক্ষয় দত্ত লেনের পূর্ব প্রান্ত দিয়ে প্রসারিত হয়েছে তার নাম হল 'ব্রজকুমার শেঠ লেন'।

২। মাধবকৃষ্ণ শেঠের নামে নামাঙ্কিত 'মাধব শেঠ লেন' বড়বাজার এলাকায় ১৮৮৭-৮৮ খ্রিঃ তৈরি হয়। এটি ৩০০ ফুট লম্বা ও ১২ ফুট চওড়া, জগমোহন মল্লিক স্ট্রিটকে হাঁসপুকুর লেনের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে।[৬৫]

মাধবকৃষ্ণ শেঠ বড়বাজারের রাধাকৃষ্ণ শেঠের পুত্র, কলিকাতা শহরের জাস্টিস অব্ পীস ছিলেন। এঁদের আদি বাস ছিল গোবিন্দপুরে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নির্মাণের সময় গোবিন্দপুরের জমির বদলে শেঠ ও বসাকদের কলিকাতায় জমি দান করেন। এই শেঠ ও বসাকদের মধ্যে ৫ জনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য— এঁরা হলেন যাদবিন্দু শেঠ, বৈষ্ণবদাস শেঠ, শোভারাম বসাক, বৃন্দাবন বসাক ও কৃষ্ণচন্দ্র বসাক।

যাদবিন্দু অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন। বিষ্ণুপুরের রাজাদের ইষ্টদেবতা রাধাকান্ত জীউ-এর বিগ্রহ এনে যাদবিন্দু শেঠ ৫নং বাঁশতলা লেনে প্রতিষ্ঠা করেন। যাদবিন্দু শেঠের দুই বংশধর চৈতন্যচরণ ও আনন্দচন্দ্র। আনন্দচন্দ্র মৃত্যুকালে ৫০ লক্ষ টাকা রেখে যান। উত্তরাধিকার সূত্রে এই অর্থ পেয়েছিলেন চৈতন্যচরণ শেঠের বংশধর রাধাকৃষ্ণ শেঠের পুত্র মাধবকৃষ্ণ শেঠ। তিনি চৈতন্যচরণ ও আনন্দচন্দ্রের উভয়ের সম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন।[৬৬]

৩। ৩৮০ ফুট দীর্ঘ ও ১৬ ফুট প্রস্থ এই নতুন রাস্তাটি বড়বাজারের বসাক লেন ও ময়দা পট্টির মধ্য দিয়ে তৈরি হয় ১৮৮৮-৮৯ সালে। এই অঞ্চলের পল্লীবাসীরা হলেন শহর কলিকাতার আদি বাসিন্দা শেঠ-বসাক পরিবার। তাঁদেরই বসবাসের কারণে রাস্তাটির নাম 'বসাক স্ট্রিট'।

৪। ১৮৮৪ সালে 'সিকদার পাড়া বাই লেন'-এর অধিবাসীদের সনির্বন্ধ অনুরোধে পৌরসভা এই

গলিটি গ্রহণ করেন। রাস্তাটি পল্লীবাসীরাই নির্মাণ করেন। পৌরসভায় ১১ই মার্চ ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের অধিবেশনে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়।

## ৬নং ওয়ার্ড

১। রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক ১৮৭৮ খ্রিঃ বিনামূল্যে কিছু জমি কলিকাতা পৌরসভাকে দেবার প্রস্তাব দেন। ওই জমি মুক্তারামবাবু স্ট্রিট ও মুন্সী সদরুদ্দীন লেনের উন্নতির কাজে লাগানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেন।[৬৭] পৌরসভা তখন মুন্সী সদরুদ্দীন লেনকে বসাক দীঘি পর্যন্ত প্রসারিত করার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। নতুন এই রাস্তাটি ৬০৫ ফুট লম্বা ও ১৫ ফুট চওড়া। রাস্তাটির নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হয় ১৮৮২-৮৩ খ্রিঃ। ফলে মেছুয়াবাজার স্ট্রিটের যানজট ঝামেলার সেসময় অনেকটা সুরাহা হয়েছিল।[৬৮]

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে মুন্সী সদরুদ্দীন লেনের উন্নতিকল্পে কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা রাস্তাটির ভার গ্রহণ করেন। সংস্থা রাস্তাটিকে ৪০ ফুট প্রশস্ত করার ব্যবস্থা করেন। তার মধ্যে যান চলাচলের জন্য ২৪ ফুট ও দুপাশে ৮ ফুট করে ১৬ ফুট ফুটপাতের ব্যবস্থা হয়েছিল। ফুটপাত ভারতীয় পেটেন্ট স্টোন দিয়ে বাঁধিয়ে দেওয়া হয়। পৌরসভা ২১শে এপ্রিল ১৯২৬ খ্রিঃ কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থার কাছ থেকে রাস্তাটির ভার গ্রহণ করেন।

মুন্সী সদরুদ্দীন সেকালের একজন খ্যাতনামা সম্ভ্রান্ত মুসলমান পণ্ডিত, সুপ্রিম কাউন্সিলের রিচার্ড বারওয়েলের ও জন গ্রাহামের মুন্সী ছিলেন। তাঁর আবাস ছিল মেছুয়াবাজার অঞ্চলে, আসল নাম ছিল শেরায়েতুল্লা খাঁন (Sherayatullah Khan)। স্যার উইলিয়াম জোন্স তাঁর কাছে আরবি শিক্ষা করেছিলেন। ১৮ই এপ্রিল ১৭৯২ খ্রিঃ পরলোকগমন করেন।[৬৯]

২। ১৮৮১ সালের কথা। রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক ২ ফুট চওড়া ও ১০৩৫ ফুট লম্বা একপ্রস্থ জমি কলিকাতা পৌরসভাকে রাস্তা নির্মাণে দান করেন। জমি পাওয়ায় রাস্তাটি তৈরি হয়েছিল সিংহীবাগান বস্তির মধ্য দিয়ে। এটি মুক্তারাম বাবু স্ট্রিটের সঙ্গে বারানসী ঘোষ স্ট্রিটের সংযোগসাধন করে। সাধারণের চলাচলের জন্য রাস্তাটি ১৮৮২ খ্রিঃ খুলে দেওয়া হয়। এটি রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের নামে 'রাজেন্দ্র মল্লিক স্ট্রিট' নামকরণ করা হয়।[৭০]

রাজেন্দ্র মল্লিক (১৮১৯-১৮৮৭) সুবর্ণবণিক সমাজের একজন কৃতী পুরুষ। তাঁর পূর্বপুরুষ সপ্তগ্রাম থেকে হুগলির চুঁচুড়ায়, তারপর কলিকাতায় এসে বসতি স্থাপন করেন। নীলমণি মল্লিক নিজের বাড়ি পাথুরিয়াঘাটায় সদাব্রত প্রতিষ্ঠার পরে চোরবাগানে জগন্নাথদেবের ঠাকুরবাড়ি নির্মাণ করেন।

নীলমণি মল্লিকের দত্তক পুত্র রাজেন্দ্র মল্লিক। ১৮১৯ খ্রিঃ তাঁর জন্ম। তিন বছর বয়সে পিতাকে হারান। বিষয়সম্পত্তি নিয়ে মামলা মোকদ্দমা চলতে থাকায় নীলমণি মল্লিকের বিধবা স্ত্রী রাজেন্দ্রকে নিয়ে পাথুরিয়াঘাটার বাড়ি ছেড়ে চলে আসেন চোরবাগানের ঠাকুরবাড়িতে। রাজেন্দ্র মল্লিক নাবালক থাকায় সুপ্রিম কোর্ট মিঃ হগ (Mr. J.W. Hogg) নামে এক ইংরেজ ভদ্রলোককে তাঁর অভিভাবক নিযুক্ত করেন। মিঃ হগের তত্ত্বাবধানে ও সাহচর্যে রাজেন্দ্র মল্লিকের মনে পশুপাখি ও গাছপালার প্রতি আকর্ষণ জন্মায়। সংগীতেও তাঁর জ্ঞান ছিল অসাধারণ। চিকিৎসাবিদ্যাও চর্চা করেন তিনি।

১৮৩৫ খ্রিঃ রাজেন্দ্র মল্লিক তাঁর বিখ্যাত প্রাসাদ নির্মাণে ব্রতী হন। সমাপ্ত হতে পাঁচ বছর সময় লাগে। কলিকাতার দ্রষ্টব্য তালিকার মধ্যে এটি অন্যতম। ভবনটি "মার্বেল প্যালেস" নামে খ্যাত।

রাজেন্দ্র মল্লিক তাঁর নবনির্মিত ভবনে পশুশালা স্থাপন করেন। আলিপুর চিড়িয়াখানা প্রতিষ্ঠার তিনি একজন উদ্যোক্তা ছিলেন। সে কারণে চিড়িয়াখানার প্রথম বাড়িটির নাম হয় "মল্লিকস্ হাউস"। পশুপক্ষী পালনের জন্য তিনি বহু পদক, ডিপ্লোমা প্রভৃতিতে ভূষিত হয়েছিলেন।

পল্লীসংস্কার, রাস্তাঘাট নির্মাণ, ঠাকুরবাড়িতে অন্নসত্র প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি রাজেন্দ্র মল্লিকের বিশেষ কীর্তি। ১৮৬৫-৬৬ খ্রিঃ দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির হাতে তিনি দৈনিক ১০০ টাকা দিতেন। অনাথ বালকদের প্রতিপালনের জন্য চল্লিশ হাজার টাকা দান করেছিলেন। এই মহানুভবতার জন্য ১৮৭৮

খ্রিঃ বড়লাট লর্ড মিন্টো তাঁকে "রাজা" উপাধি প্রদান করেন।

৩। পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত ৪৫০ ফুট লম্বা ও ১৬ ফুট চওড়া 'মধু গুপ্ত লেন' নামে নতুন রাস্তাটি ১৮৮৬ খ্রিঃ তৈরি হয়। এটি সিদ্ধেশ্বর চন্দ্র লেনের সঙ্গে আরপুলি লেনের সংযোগ ঘটায়, যা তৈরি হওয়াতে কলেজ স্ট্রিটের সঙ্গে আমহার্স্ট স্ট্রিটের সরাসরি যোগসূত্র স্থাপিত হয়। পৌরসভার জেনারেল কমিটি ২২শে জুলাই ১৮৮৯ খ্রিঃ রাস্তাটি ভারতে শল্য চিকিৎসার পথিকৃৎ এবং প্রথম হিন্দু শবব্যবচ্ছেদকারী মধুসূদন গুপ্তের নামে নামাঙ্কিত করেন। ওই অঞ্চলের অনেকগুলি বাড়ির মালিকানা মধুসূদন গুপ্তের পরিবারবর্গের হেপাজতে ছিল।[৭১]

মধুসূদন গুপ্ত সংস্কৃত কলেজের বৈদ্যক শ্রেণীর একজন কৃতী ছাত্র। আনুমানিক ১৮০০ খ্রিঃ তাঁর জন্ম। হুগলি জেলার বৈদ্যবাটীর বলরাম গুপ্তের পুত্র। ১৮২৬ খ্রিঃ সংস্কৃত কলেজে বৈদ্যক শ্রেণী প্রবর্তিত হয়। ১৮৩০ খ্রিঃ খুদিরাম বিশারদের স্থলে ৬০ টাকা বেতনে বৈদ্যক শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন মধুসূদন গুপ্ত। ১৮৩৫ খ্রিঃ মার্চ মাসে মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার সূচনাতে এখানকার শারীরবিদ্যা (Anatomy) ও শল্যবিদ্যার (Surgery) ডিমন্‌স্ট্রেটর পদে নিযুক্ত হন। ১৮৩৬ খ্রিঃ মধুসূদন গুপ্ত সর্বপ্রথম শবব্যবচ্ছেদ করেন। মেডিকেল কলেজে অধ্যাপনার সময় ছাত্রদের সঙ্গে তিনি পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রের কলেজের শেষ পরীক্ষায় ১৮৪০ খ্রিঃ কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। ১৮৪৮ খ্রিঃ তিনি প্রথম শ্রেণীর সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন পদে উন্নীত হন। ১৮৪৯ খ্রিঃ শিল্পী মিসেস বেলনস্ অঙ্কিত মধুসূদনের তৈলচিত্রখানি মেডিকেল কলেজের থিয়েটার হলে স্থাপিত হয়। ১৮৫৬ খ্রিঃ ১৪ই নভেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

মধুসূদন গুপ্ত কয়েকটি চিকিৎসা শাস্ত্রের পুস্তক অনুবাদ করেন— "Anatomist Vadicum" ১৮৩৫ খ্রিঃ সংস্কৃত ভাষায়। লন্ডন ফার্মাকোপিয়া (১৮৪৯), অ্যানাটমি অর্থাৎ শারীরবিদ্যা (১৮৪৯) এই দুইখানি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন।[৭২]

## ৭নং ওয়ার্ড

১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দেএই ওয়ার্ডে নতুন একটি রাস্তা তৈরি হয়। এটি ৫৭৮ ফুট লম্বা ও ১৫ ফুট চওড়া। নতুন রাস্তাটি পাটোয়ারবাগান স্ট্রিটের সঙ্গে আপার সারকুলার রোডের সংযোগসাধন করেছে। ১৪ই ডিসেম্বর ১৮৮৯ খ্রিঃ পৌরসভা ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র সেনের নামে রাস্তাটি 'কেশব চন্দ্র সেন লেন' নামাঙ্কিত করেন।[৭৩]

## ৯নং ওয়ার্ড

১। এই ওয়ার্ডে কোরিস চার্চ স্ট্রিট থেকে শুরু হয়ে নতুন একটি রাস্তা উত্তর দিকে এগিয়ে উত্তর গোখানার পাশ দিয়ে মেছুয়াবাজার স্ট্রিট এসে পড়ে। এই রাস্তাটি ৮১৪ ফুট লম্বা ও ২৪ ফুট চওড়া। এটি ১৮৮২ খ্রিঃ নির্মিত হয়। রাস্তাটির নামকরণ করা হয় ওল্ড বৈঠকখানা বাজার রোড। পরবর্তীকালে রাস্তাটির নাম বদল করে 'বৈঠকখানা রোড' রাখা হয়। এই রাস্তাটি বৌবাজার স্ট্রিট পর্যন্ত প্রসারিত।

সেকালের শহর কলিকাতায় লালবাজারের মোড় থেকে বরাবর পূর্বদিকে শিয়ালদহের মোড় পর্যন্ত চলে গেছে যে রাস্তা তাকেই বৈঠকখানা রোড বলা হত। এই পথের ধারে শিয়ালদহের নিকটে ছিল ইতিহাস প্রসিদ্ধ বৈঠকখানা বৃক্ষ। সারকুলার রোড তৈরি হবার সময় এই বৃক্ষটি কাটা পড়ে। এই বটগাছের ছায়ায় কলিকাতায় আগত ব্যবসায়ীরা বিশ্রাম করত। প্রবাদ আছে, কলিকাতার প্রতিষ্ঠাতা জোব চার্নকও এই গাছের তলায় বসে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে জিনিসপত্রের দরদস্তুর করতেন ও গল্প করার ফাঁকে ফাঁকে গড়গড়া টানতেন। ১৭৮৪ খ্রিঃ কলিকাতার মানচিত্রে লালবাজার থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত সারা পথটি বৈঠকখানা রোড বলে চিহ্নিত ছিল। তা ছাড়া সারকুলার রোডের কিছু অংশকেও বৈঠকখানা রোড বলা হত। পরে এই নাম উঠে গিয়ে লালবাজার মোড় থেকে শিয়ালদহের মোড় পর্যন্ত 'বৌবাজার স্ট্রিট' হয়।

বৈঠকখানা রোডকে কলিকাতার ইতিহাসে স্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যেই ওল্ড বৈঠকখানা বাজার রোডের নাম বদলে বৈঠকখানা রোড রাখা হয়।

২। নিমু খানসামা লেন কলিকাতার একটি প্রাচীন রাস্তা। পূর্বে এর নাম ছিল চাঁপাতলা সেকেন্ড বাই লেন। মেডিকেল কলেজের মধ্যে নতুন প্রতিষ্ঠিত ইডেন হাসপাতাল স্থাপিত হলে পর তার নামে ১৮৮৫ খ্রিঃ নিমু খানসামা লেনের নাম বদল করে 'ইডেন হসপিটাল লেন' রাখা হয়।[৭৪] আজও এই নাম বহাল আছে।

নিমু খানসামা লেনের মতো অনেকগুলি রাস্তা খানসামা নামধারী লোকেদের নামে সেকালের শহর কলিকাতায় নামাঙ্কিত হয়েছিল। সেগুলি—

| | নাম বদলের পর নতুন নাম |
|---|---|
| ১। ছকু খানসামা লেন | — (বদল হয়নি) |
| ২। চমরু খানসামা লেন | — -ঐ- |
| ৩। পাঁচু খানসামা লেন | — ডঃ দেবেন্দ্র মুখার্জি রো |
| ৪। করিম বক্স খানসামা লেন | — করিম বক্স লেন |
| ৫। মিসরী খানসামা লেন | — মারকুইস লেন |
| ৬। নিমু খানসামা লেন | — ইডেন হসপিটাল লেন |
| ৭। পিরু খানসামা লেন | — টার্নবুল লেন—টার্নার লেন |
| ৮। মিঞাজান খানসামা লেন | — নবাব আবদুর রহমান স্ট্রিট, মিঞাজান লেন |
| ৯। গদাই খানসামা লেন | — ইলিয়ট লেন |

প্রথম দুটি রাস্তা তাদের আদি অকৃত্রিম নামে আজও বহাল আছে। আর ৪ ও ৮নং রাস্তা তাদের খানসামা শব্দটি খসিয়ে পুরানো নামেই পরিচিত আছে। এখন আর চেনার উপায় নেই এই দুই নামধারী রাস্তা সেকালে খানসামার প্রতিপত্তি নিয়ে বিরাজ করত। ভাবতে অবাক লাগে কীভাবে খানসামারা সেকালের শহর কলিকাতার সমাজজীবনে এত প্রতিপত্তি লাভ করল।

সাধারণত খানসামারা দুই শ্রেণী থেকে আসত— ভারতীয় পর্তুগীজ বংশোদ্ভব এবং মুসলমান সমাজ। হিন্দুদের খানসামা হতে দেখা যায়নি। প্রথম শ্রেণীর খানসামাদের অস্তিত্ব খুব কমই চোখে পড়ে। দ্বিতীয় শ্রেণীদের মধ্যে দু' প্রকারের খানসামা দেখতে পাওয়া যায়— শেখ ও পাঠান। শেখের অন্তর্ভুক্ত যারা তাদের শেখ-সী (Sheak See), আর পাঠানদের খাঁন সাহেব বলে সম্বোধন করা হত। নবাবী আমলে খানসামা বাবুর্চিখানার সর্বেসর্বা ছিল। বাবুর্চিখানার সকল কর্মচারী তাকে অত্যন্ত সমীহ করত। পলাশী যুদ্ধের পর নবাবী আমলের অবসান হলে খানসামারা জীবিকার সন্ধানে কলিকাতায় পাড়ি জমায়। বণিক ইংরেজ রাতারাতি রাজ্যের মালিক হয়ে প্রথমেই নবাবীয়ানাকে কায়মনোবাক্যে গ্রহণ করল। নবাবী কায়দায় তারা তাদের কিচেন ঘর বা বাবুর্চিখানা গড়ে তুলতে আগ্রহী হল। ফলে খানসামাদের চাকুরির অভাব হল না। খানসামারা শুধু ইংরেজ অন্দরমহলে ও রসুইখানার তদারকি করত তা নয়, ভাঁড়ারের চাবিও তাদের জিম্মায় থাকত। বাড়ির সব ঝি চাকর খানসামার হুকুমের অধীন ছিল।[৭৫]

সেকালের শহর কলিকাতায় ধনী ইংরেজ নবাবী হালচাল নিজেদের বাসভবনে আমদানি করেছিল। ভবনগুলি ছিল যেন এক একটি প্রতিষ্ঠান। নবাবীয়ানা চালু রাখার জন্য ছিল বিরাট ভৃত্য বাহিনী— খিদমতগার, বাবুর্চি, মশালচি, বেয়ারা, দারোয়ান, বরকন্দাজ, ভিস্তি, হুঁকোবরদার, জমাদার, দর্জি, মালি, আয়া, মেথর নিয়ে এক বিরাট যৌথ পরিবার। এদের নিয়ন্ত্রণ ও খবরদারি করত খানসামা। ফলে সাহেব বাড়িতে খানসামার চাকুরি লোভনীয় পেশা। এটা একমাত্র মুসলমানদের একচেটিয়া ছিল।[৭৬]

এই খানসামাদের একজন কিন্তু ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হয়ে আছেন। তিনি হলেন শেখ করিম বক্স। সেকালের ইংরেজ লাটসাহেবদের বড় খানসামা ছিলেন তিনি। লর্ড ডালহৌসি গভর্নর জেনারেল থাকাকালীন খানসামার চাকুরিতে বহাল হলেন শেখ করিম বক্স। সময় ১৮৪৮ খ্রিঃ। ওই সময়

থেকে পর পর ৭ জন গভর্নর জেনারেলকে লাট প্রাসাদের হেড খানসামা হয়ে সেবা করে গেলেন শেখ করিম বক্স। সর্বশেষ গভর্নর জেনারেল হলেন লর্ড মিন্টো। করিম বক্সের সেবায় তুষ্ট গভর্নর জেনারেল নির্মাণ করে দিয়েছিলেন তাঁরই এক তৈলচিত্র। কলিকাতার রাজভবনের একতলার উত্তর-পূর্ব দিকের সিঁড়ির পথে রাখা হয়েছিল শেখ করিম বক্সের এই তৈলচিত্র। সেকালের কলিকাতায় খানসামাদের প্রতিপত্তির এ এক উজ্জ্বল নিদর্শন।[৭৭]

খানসামাদের কেবলমাত্র ইংরেজ অন্দরমহলেই প্রতিপত্তি ছিল তাই নয়, তারা যে অঞ্চলে বাস করত সেখানে তাদের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি কম ছিল না। যে সাহেব যত বড় দরের তার খানসামার প্রতিপত্তি তত উঁচু। এর ফলে খানসামার নামে ধীরে ধীরে অঞ্চলটি পরিচিতি লাভ করে। প্রথম যখন আদি কলিকাতায় সরকারি তত্ত্বাবধানে রাস্তার নামকরণ হতে থাকে, সেই সময় এলাকাভিত্তিক চালু নামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রাস্তা বা গলি নামাঙ্কিত করা হয়। এতে একদিকে যেমন কপিবাগান, নেবুবাগান, চালতাবাগান, নারকেলবাগানের নামে রাস্তা হয়েছে, অন্য দিকে পাঁচু খানসামা, পিরু খানসামা প্রভৃতির নামেও রাস্তার কমতি নেই। পরবর্তীকালে ইংরেজরা যখন স্বদেশবাসীর চাপে নবাবীয়ানা পরিহারে বাধ্য হলেন, তখনই খানসামাদের কপাল পুড়ল। তারা তখন অন্য পেশার খোঁজে এইসব অঞ্চল ছেড়ে অন্যত্র চলে গেল। স্বভাবতই নামের মাহাত্ম্য ধীরে ধীরে ম্লান হতে লাগল। নতুন বাসিন্দাদের চাপে খানসামাদের নামের রাস্তা বদলে নতুন প্রজন্মের খ্যাতনামা পুরুষদের নামে নামাঙ্কিত হতে থাকে। আজও যে দু-একটি রাস্তা খানসামাদের নামে চিহ্নিত হয়ে আছে, তা থেকে কলিকাতার সামাজিক ইতিহাসের একটা নির্দিষ্ট সময়ের কিছু উপকরণ পাওয়া যেতে পারে।

৩। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের গোড়ার দিকে প্রথম কলিকাতা ডিভিসনের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (Executive Engineer, 1st. Calcutta Division) পৌরসভাকে এই মর্মে এক প্রস্তাব দেন যে নিমু খানসামা লেনের উত্তর দিকে সরকারের যে জমি আছে, সেই জমির উপর কলেজ স্ট্রিট থেকে ইডেন হাসপাতাল পর্যন্ত একটা নতুন রাস্তা তৈরি করা যেতে পারে। এই রাস্তা ২৪ ফুট চওড়া হবে এবং দু' দিকে ৬ ফুট চওড়া ফুটপাত থাকবে। সরকারের এই প্রস্তাব গ্রহণ করে পৌরসভা রাস্তা নির্মাণে প্রয়াসী হন। পরবর্তীকালে এই রাস্তাটি 'ইডেন হসপিটাল রোড' নামে নামাঙ্কিত হয়।[৭৮] এর আগে নিমু খানসামা লেনের নাম বদলে ইডেন হসপিটাল লেন করা হয়, সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

১৮৮২ খ্রিঃ কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল চত্বরে একটি প্রসূতি সদন নির্মাণ করা হয়। এই ভবনের নকশা নির্মাণ করে দেন মিঃ অ্যানলে (Mr. G.A.D Anley)। এখানে ৭৫ জন প্রসূতির চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল। এই হাসপাতালের সমস্ত ওয়ার্ডগুলি ও বারান্দা মার্বেল পাথরে নির্মিত এবং সিঁড়িগুলিও সুদৃশ্য। ভবনটির নির্মাণকার্য সমাপ্ত হলে পর ১৯শে এপ্রিল ১৮৮২ খ্রিঃ বাংলার গভর্নর স্যার অ্যাসলে ইডেন (Sir Asley Eden) এটির দ্বার উন্মোচন করেন। নতুন প্রসূতি সদনের নাম অ্যাসলে ইডেনের নামে ইডেন হাসপাতাল রাখা হয়।[৭৯]

প্রায় ৯ দশক ধরে ইডেন হাসপাতালের নাম বুকে নিয়ে কালাতিপাত করার পর কলিকাতা পৌরসভা ৮ই জানুয়ারি ১৯৭১ খ্রিঃ ইডেন হাসপাতাল রোডের নাম পরিবর্তন করে প্রখ্যাত শল্য চিকিৎসক ডাঃ ললিত ব্যানার্জির নামে 'ডাঃ ললিত ব্যানার্জি সরণি' করেন। এই সঙ্গে উল্লেখ্য, ইডেন হাসপাতালের নাম বদল করে পরে ভারতবন্ধু ডেভিড হেয়ারের নামে নামাঙ্কিত করা হয়।

৪। রতন মিস্ত্রি লেন শহর কলিকাতার একটি প্রাচীন পথ। রতন মিস্ত্রির মতো কলিকাতায় আরও কয়েকটি মিস্ত্রির নামে রাস্তা আছে। সেগুলি—

১) রামহরি মিস্ত্রি লেন
২) রামকান্ত মিস্ত্রি লেন
৩) অখিল মিস্ত্রি লেন

এক রতন মিস্ত্রি লেন ছাড়া আর তিনটি রাস্তাই পুরানো নামে বহাল আছে। শহর কলিকাতা গড়ে

ওঠার সময় নানান পেশার লোক জীবিকার সন্ধানে এখানে আসে। সেই সময় এক এক পেশার লোক গোষ্ঠীবদ্ধভাবে এক একটি নির্দিষ্ট স্থানে তাদের আবাসভূমি গড়ে তোলে। সেই সব এলাকা চিহ্নিত হয় এই সব গোষ্ঠীর নামে— যেমন কুমারটুলি, কসুটোলা, ভোমপাড়া, জেলেপাড়া, ভাঁড়িপাড়া প্রভৃতি। ঠিক একইভাবে কুশলী কারিগরের নামেও এলাকা চিহ্নিত হতে দেখা যায়। নিপুণ কারুকুশলী হওয়ার ফলে লোকে এই সব কারিগরের এক ডাকে চিনত। দক্ষ কারিগর যে পাড়ায় থাকত রাস্তাটি তাঁর নামে পরিচিত হত। এইভাবে সেকালের কলিকাতায় কয়েকটি রাস্তা মিস্ত্রিদের নামে নামাঙ্কিত হতে দেখা যায়। সে যাই হোক, ১৮৭৫ খ্রিঃ কলিকাতা পৌরসভা তাঁদের প্রয়াত ভাইস-চেয়ারম্যানের নামে বহুল ব্যবহৃত মিস্ত্রি লেনের নাম পরিবর্তন করে শ্যামাচরণ দে লেন নামকরণ করেন। ট্রামলাইন রোড নির্মাণের সময় পার্শ্ববর্তী রাস্তাগুলি প্রশস্ত করার ব্যবস্থা হয়। ফলে শ্যামাচরণ দে লেন চওড়া হল। রাস্তাটি তখন স্ট্রিটের পর্যায়ে উন্নীত হয়। নতুন নাম হয় 'শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট'।

শ্যামাচরণের পুরো নাম শ্যামাচরণ দে সিকদার, কলিকাতা পৌরসভার ভাইস-চেয়ারম্যান পদে ১৮৬৯খ্রিঃ থেকে ৯.৭.১৮৮৩ পর্যন্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন। শ্রীনাথ ঘোষের মৃত্যুর পর তিনি ওই পদে আসীন হন। হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভ, ৪০ টাকা বেতনে অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেলের অফিসে একজন কেরানিরূপে যোগদান, পরে নিজ পরিশ্রম ও যোগ্যতায় ওই দপ্তরে একটি উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হন (Assistant Comptroller General of Accounts)। সরকারি কর্ম অবসরের ৪ বছর পূর্বে তাঁকে "রায় বাহাদুর" খেতাব দেওয়া হয়। ১৮৭৯-৮০ খ্রিঃ বিদ্যালয়ে ইন্ডিয়ান শিক্ষা কমিটিতে সাক্ষ্য দেবার জন্য ডাকার আমন্ত্রণ হয়। তখনকার দিনে এইরূপ আমন্ত্রণ সম্মানজনক বলে মনে করা হত। কিন্তু শ্যামাচরণ এই সম্মান হয়তো অস্বীকৃত হন।

সাবর্ণ ঘরানার সন্তানের ১৩নং কলেজ স্কোয়ারে (এখন বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট) শ্যামাচরণ দে'র বাড়ি ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে সেখানে যাতায়াত ছিল। শ্যামাচরণ পৌরসভার ভাইস-চেয়ারম্যান হলে বৃহত্তর পাড়ার প্রবীণ কয়েকের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ এই বাড়িতে আসতেন।[৮০] পরবর্তীকালে পৌরসভা থেকে অবসর গ্রহণের পর কাশীপুরের একটি উদ্যানভবনে বাস করতেন। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে কলেজ স্কোয়ারের ভবনে পরলোকগমন করেন। বর্তমানে শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট বহুপাড়া হিসাবে বিস্তৃত।

শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট থেকে এক সময় 'অবসর' নামে রঙ্গরসের এক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হত। এটি এক শ্রেণীর পাঠকের মধ্যে যথেষ্ট সমাদর পেয়েছিল। এই পত্রিকায় ছোট গল্প, প্রবন্ধ, নকশা, সমালোচনা, ছড়া, কবিতা এবং বিজ্ঞাপন ছাপা হত। ছোট গল্প লিখেছিলেন বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রনাথ সরকার, তারাপদ মুখোপাধ্যায়, জীবনকৃষ্ণ কাব্যতীর্থ এবং আরও অনেকে। হরেকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (যাদুবাবু) ব্যঙ্গ কবিতা লিখতেন। তিনি অবসর পত্রিকার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। যাদুবাবু অবসর ছাড়া 'ভোঁদড়', 'রঙ্গ-বেরঙ্গ', 'যমেশ', 'শিশির', 'ভাদুড়ে', 'মনোমোহন', 'সন্ধ্যা', 'নবরঙ্গ' প্রভৃতি কাগজে নিয়মিত লিখতেন। ১৯২৩ সালে পত্রিকাটি ৫নং শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট থেকে প্রকাশিত হত। সে সময় এই পত্রিকার মূল্য ছিল ১ পয়সা। ১৯৩৯ সালে ৫নং শ্যামাচরণ দে স্ট্রিটের ঠিকানা থেকে ১৯৪১ সালে ১০নং শ্যামাচরণ দে স্ট্রিটে পত্রিকা অফিস উঠে আসে।

এই পত্রিকার বৈশিষ্ট্য ছিল, সেকালের কলিকাতার বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে ব্যঙ্গ কবিতা ছাপা, যেমন— কলিকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচন, কলিকাতার নতুন বাবু। কলিকাতার বিভিন্ন সমস্যার কথাও বাদ যেত না।

৫। ১৮৮৮ খ্রিঃ পটুয়াটোলা অঞ্চলে ৩টি নতুন রাস্তা হয়। সবগুলিই পটুয়াটোলা লেনের সমান্তরাল।

৬। এই অঞ্চলে আরেকটি রাস্তা এই সময় নির্মিত হয়— এটি ১৫০ ফুট লম্বা ও ১৬ ফুট চওড়া। রাস্তাটি মির্জাপুর স্ট্রিট ও পটুয়াটোলা লেনের মধ্যে সংযোগকারী রাস্তা। এটিরও নাম 'পটুয়াটোলা লেন'।

কালীঘাটের মতো মির্জাপুর ও গোলদিঘি অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল পটুয়াদের আস্তানা— যাকে বলা হতো পটুয়াটোলা। এই সব পটুয়ারা ২৪ পরগনা, বীরভূম, নদিয়া, বর্দ্ধমান প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকতেন। এঁরা সব জাত শিল্পী, তাঁরা কাপড়ের উপর তুলি দিয়ে ছবি আঁকতেন। পটুয়ারা সেই ছবিকে বলতেন "পটলেখা"। এক সময় পটুয়াদের শিল্পী হিসাবে মর্যাদা ছিল। পরবর্তীকালে পটশিল্পের পেশা হেয় প্রতিপন্ন হওয়াতে পটুয়ারা তাঁদের বংশগত পেশা ছেড়ে অন্য বৃত্তি গ্রহণ করেন। অনেকেই গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসেন। কালীঘাটের বিখ্যাত পোটোপাড়া এবং কলিকাতার অন্যান্য স্থানের পটুয়াটোলা গড়ে উঠেছে এইভাবে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত কলিকাতার পটুয়াদের স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে। তাঁরা তখন কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে বসতি স্থাপন করেন। এই সব শিল্পী যে সব পটচিত্র আঁকতেন তা কালীঘাটের পটচিত্র নামে খ্যাতি লাভ করে। সমান আদরে দেশি বিদেশি রসিকজনের কাছে সমাদৃত হত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ব্রিটিশ ফরাসি প্রভৃতি বিদেশি শিল্পীরা কলিকাতা শহরের আকর্ষণে এদেশে আসতে থাকেন। তাঁরা যেমন সেকালের ধনী ইংরেজ ও বাঙালি বাবুদের ছবি আঁকতেন, অন্যদিকে তেমনি সামাজিক চিত্র আঁকতেও কসুর করতেন না। পটশিল্পীরা সাহেব শিল্পীদের আঁকা এদেশের সামাজিক চিত্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁরা তখন সমসাময়িক সমাজের ব্যঙ্গ চিত্র অঙ্কনে প্রলুব্ধ হলেন। তাঁদের আঁকা পটচিত্রে ধীরে ধীরে বিলিতি অনুকরণের ছাপ পড়তে থাকে। ফলে তাঁরা তাঁদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হারাতে থাকেন। তাঁদের অধঃপতন শুরু হয়। এইভাবে কালীঘাট তথা কলিকাতার পটশিল্পীরা ক্রমে অবলুপ্ত হন।[৮১] রাস্তাগুলি আজও তাঁদের ঐতিহ্যের সাক্ষী হয়ে আছে।

## ১৩নং ওয়ার্ড

১। জানবাজার সেকেন্ড লেন শহর কলিকাতার একটি প্রাচীন পথ। জনবাজার অপভ্রংশ হয়ে বাংলায় জানবাজার হয়েছে।

১৭৪৮ খ্রিঃ বেঙ্গল কাউন্সিল যে জমি লাভ করে তার নাম দেওয়া হয় জননগর (Johnnagar)। জননগরে যে বাজার স্থাপন করা হয় তার নাম জনবাজার। পুরাতন ফোর্ট উইলিয়াম থেকে মাত্র এক লীগ দূরত্বে পূর্ব দিকে ১৫৫ বিঘা ৫ কাঠা জমি "দি ডিস্ট্রিক্ট অফ দি প্লেস"-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। পুরাতন ফোর্ট উইলিয়াম কর্ত্তৃপক্ষের ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৭৪৮ খ্রিঃ কোর্ট অফ ডিরেক্টরকে লেখা চিঠি থেকে জানা যায় যে জমিদারদের সঙ্গে অনেক বিতর্কের পর ওই জমি জমিদাররা কোম্পানিকে হস্তান্তর করতে রাজি হয়। কোম্পানি এখানে একটা কাছারি ও বাজার স্থাপন করে। জায়গাটির নাম দেওয়া হয় জননগর। এখানে ৩৬৭টি পরিবার বাস করে। এরা প্রায় সকলে তন্তুবায়, পিয়ন প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোক। প্রথম বছরে এ অঞ্চলের রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ১৭৪৬ টাকা।[৮২]

পরবর্তীকালে এ অঞ্চলে অনেকগুলি পথ তৈরি হয়। তার মধ্যে প্রধান জানবাজার রোড। এটি এখন 'সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড' নামে খ্যাত। আর ছোট রাস্তাগুলি জানবাজার ফার্স্ট লেন, সেকেন্ড লেন, থার্ড লেন, ফোর্থ লেন ও ফিফথ লেন প্রভৃতি।

১৮৮১ খ্রিঃ জানবাজার সেকেন্ড লেনের নাম পরিবর্তন করে কলিকাতা পৌরসভার দ্বিতীয় চেয়ারম্যান স্যার স্টুয়ার্ট হগের নামে 'হগ স্ট্রিট' রাখা হয়।[৮৩]

এই রাস্তাটির টানাপোড়েনের কাহিনী কম বিচিত্র নয়। জানবাজার রোডের উপর যখন নতুন পৌরভবন নির্মিত হয় তখন হগ স্ট্রিটকে অধিগ্রহণ করে রাস্তার জায়গা পৌরভবনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। জানবাজার স্ট্রিট ও নিউ মার্কেটের মধ্যবর্তী এলাকায় নতুন হগ স্ট্রিট (New Hogg Street) ১৯০২ খ্রিঃ নির্মিত হয়, ব্যয় হয়েছিল ১৮,৮৯০ টাকা। কলিকাতা পৌরসভা ২৮শে নভেম্বর ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের অধিবেশনে নিউ হগ স্ট্রিটের নাম পরিবর্তন করে পুনরায় 'হগ স্ট্রিট' নামকরণ করেন।[৮৪]

এরপর পৌরসভা হগ স্ট্রিটের অঙ্গসজ্জার দিকে দৃষ্টি দেন। পৌরভবন থেকে করপোরেশন প্লেস পর্যন্ত হগ স্ট্রিটের প্রস্থ ছিল ৬০ ফুট। পৌরভবনের সম্মুখের স্কোয়ারের দক্ষিণ-পূর্ব কোণের কাছে হগ

স্ট্রিট প্রায় ৯০ ফুট প্রশস্ত। মার্কেট স্ট্রিটের সংযোগস্থল পর্যন্ত আরও প্রশস্ত হয়েছে। রাস্তাটির এতটা প্রশস্ত হওয়ার প্রয়োজন না থাকায় মার্কেট স্ট্রিটের সংযোগস্থল পর্যন্ত ৬০ ফুট অ্যালাইন্‌মেন্ট রাখার প্রস্তাব দেওয়া হয়। অ্যালাইন্‌মেন্টের ফলে পূর্ব দিকে যে উদ্বৃত্ত জমি পাওয়া যাবে তাতে বাড়ি তৈরি করে ইঞ্জিনিয়ারদের, কেয়ারটেকারের থাকার ব্যবস্থা করা হবে ; নীচের তলা বাজারের দোকানদারদের জন্য সংরক্ষিত করা যেতে পারে ; বর্তমানে এই জায়গায় অনেকগুলি চালা ঘর আছে— সেইগুলি ভেঙে ফেলে এই প্রকল্প রূপায়ণ করা সম্ভব। পৌরসভা ৯ই অক্টোবর ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের অধিবেশনে এই প্রস্তাবটি অনুমোদন করেন। এর ফলে মার্কেট স্ট্রিট পর্যন্ত হগ স্ট্রিটের প্রস্থ ৬০ ফুট করা হয়। যে অতিরিক্ত জমি পাওয়া গেল তাতে ৩নং ডিস্ট্রিক্ট বিল্ডিং নির্মিত হয়।

স্টুয়ার্ট হগ ১৮৫৯ খ্রিঃ ভারতে আসেন এবং বর্ধমানের কালেক্টর নিযুক্ত হন। ১৮৬৫-৬৬ খ্রিঃ দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া যখন বর্ধমানকে গ্রাস করে, সুষ্ঠু ত্রাণ ব্যবস্থার মাধ্যমে হগ সাহেব ওই সমস্যার মোকাবিলা করেন। এর ফলে আপামর জনসাধারণের কাছে তিনি প্রশংসা পেয়েছিলেন। তিনি তাঁর কাছারি বাড়িতে প্রতিদিন ৫০০০ ক্ষুধার্ত বর্ধমানবাসীদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেছিলেন।

এরপর ১৮৬৬ সালে তিনি পৌরসভার চেয়ারম্যান ও কমিশনার অফ পুলিশ পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৮৭৬ সাল পর্যন্ত উভয় পদে আসীন ছিলেন। পৌরসভার চেয়ারম্যান থাকাকালীন কলিকাতায় পানীয় জলের প্রকল্প, ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী, শহরে আলোর ব্যবস্থা রূপায়িত হয়। ধর্মতলা মার্কেট অধিগ্রহণ বিষয়ে প্রখ্যাত ধনী হীরালাল শীলের সঙ্গে হগ সাহেবের বিরোধ তো ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হয়ে আছে। অবস্থা এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছায় যার প্রতিবিধানের জন্য এদেশীয় কয়েকজন গণ্যমান্য জাস্টিস অফ পিসের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ফলে বিষয়টির একটা সুরাহা হয়। হীরালাল শীল ৭ লক্ষ টাকায় পৌরসভাকে ধর্মতলা মার্কেট বিক্রি করেন। সেকালের রানীমুদি গলিতে অবস্থিত ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির উপস্থিতিতে উভয়ের করমর্দনে দ্বন্দ্বের যবনিকাপাত হয়। এর ফলে হগ সাহেবের হাতে গড়ে ওঠা নতুন নিউ মার্কেট জমজমাট হয়ে ওঠে। তারপর বহু বছর বাদে লর্ড কার্জনের উদ্যোগে নিউ মার্কেটের নাম হগ মার্কেট রাখা হয়।

কলিকাতার পুলিশ কমিশনার হিসাবে হগ সাহেব গৌরবের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তিনি সর্বপ্রথম কলিকাতা পুলিশের ডিটেকটিভ বিভাগকে ঢেলে সাজানোর ব্যবস্থা করেন। কলিকাতা পুলিশ হগ সাহেবের কাছে বহু বিষয়ে ঋণী।

দুই পদ থেকে অবসর নেবার পর বাংলা সরকার তাঁকে ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ পদে নিয়োগ করেন। কিন্তু স্বদেশে ফিরে যাওয়া মনস্থ করায় তিনি ওই পদে যোগদান করেননি।

কলিকাতায় তিনি ১০নং ক্যামাক স্ট্রিটে থাকতেন, তাঁর দপ্তর ছিল ৪নং জানবাজার স্ট্রিটে।

দেশে ফিরে তিনি ২০ বছর লন্ডনের ফিনান্সিয়াল কোম্পানিগুলির চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

২। জানবাজার থার্ড লেনও পুরানো রাস্তা। এটির ১৮৮১ খ্রিঃ নাম বদল করে 'দত্ত লেন' রাখা হয়। এই পথটি বর্তমানে করপোরেশন প্লেসের সঙ্গে ফেনিক বাজার স্ট্রিটের সংযোগসাধন করেছে।

৩। ১৮৮১ খ্রিঃ জানবাজার ফোর্থ ও ফিফ্‌থ লেনের নাম বদল করে 'মার্কেট স্ট্রিট' করা হয়।[৮৫] বর্তমানে মার্কেট স্ট্রিট— ফেনিক বাজার স্ট্রিট, দত্ত লেন ও হগ স্ট্রিটের সংযোগস্থল থেকে আরম্ভ হয়ে ফ্রী স্কুল স্ট্রিটকে (মির্জা গালিব স্ট্রিট) অতিক্রম করে আরও পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে কলিন স্ট্রিটে এসে পড়েছে।

পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে এই মার্কেট স্ট্রিট কোন মার্কেটের নামে নামাঙ্কিত হল। ওই অঞ্চলে সে সময় কয়েকটি মার্কেট ছিল। প্রথমে আসে জানবাজারের কথা। তার নামে তো রাস্তা আছে। ফেনিক বাজারের নামে ফেনিক বাজার স্ট্রিট, যদিও সে সময় ফেনিক বাজার উঠে গিয়ে গড়ে উঠেছিল এক বিরাট বস্তি। আর নিউ মার্কেট, মাত্র কয়েক বছর আগে অর্থাৎ ১লা জানুয়ারি ১৮৭৪ খ্রিঃ এই মার্কেটের দ্বারোদ্ঘাটন হয়েছিল। সম্ভবত নিউ মার্কেট স্থাপনের পরিপ্রেক্ষিতেই ১৮৮১ খ্রিঃ মার্কেট স্ট্রিট নামকরণ করা হয়। ১৯০৫ খ্রিঃ ১৩৬২৪ টাকা ব্যয় করে রাস্তাটি ৪০ ফুট প্রশস্ত করার

ব্যবস্থা হয়।[৮৬]

যে মার্কেটের নামে মার্কেট স্ট্রিট হল তার সম্বন্ধে দু-চার কথা জানতে কার না আগ্রহ হয়। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দের কথা— কলিকাতা পৌরসভা সাধারণ বাজারগুলির অবস্থা খুঁটিয়ে দেখার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করেন। এই কমিটি অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে কলিকাতায় পৌরসভার নিজস্ব তত্ত্বাবধানে একটি বাজার খোলার সুপারিশ করেন। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা পৌরসভার তৎকালীন চেয়ারম্যান স্যার স্টুয়ার্ট হগ বিষয়টির উপর গুরুত্ব দিয়ে বিচার-বিবেচনা করে একটি বিশেষ কমিটির উপর সিদ্ধান্তে আসার ভার দেন। এই কমিটি ধর্মতলা মার্কেট অধিগ্রহণের কথা বলেন। অন্যথায় করপোরেশন স্ট্রিট (বর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড) ও লিন্ডসে স্ট্রিটের মধ্যবর্তী অঞ্চলে একটি নতুন বাজার পৌরসভার তত্ত্বাবধানে নির্মাণের পক্ষে অভিমত দেন। ধর্মতলা মার্কেট অধিগ্রহণের কথা হগ স্ট্রিটের আলোচনায় বলা হয়েছে। পৌরসভার তত্ত্বাবধানে নতুন মার্কেট স্থাপনের প্রয়াসকে স্বাগত জানাতে সরকারও এগিয়ে আসেন। পৌরসভার জাস্টিস অফ পিসের হাতে ঋণ গ্রহণের ক্ষমতা নতুন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে দেওয়া হয়। আইনটির নাম দি ক্যালকাটা মার্কেট অ্যাক্ট (The Calcutta Market Act VIII of 1871)। মার্কেটের নকশা তৈরি করে দেন ইস্ট ইন্ডিয়া রেলের স্থপতি R.R. Bayne। নকশা পছন্দ হওয়ায় কলিকাতা পৌরসভা স্থপতিকে ১০০০ টাকা পুরস্কৃত করেন। বাজার তৈরির ভার পড়ে বার্ন কোম্পানির ওপর। ১৮৭১ খ্রিঃ সেপ্টেম্বর মাসে কাজ শুরু হয় আর ১লা জানুয়ারি ১৮৭৪ খ্রিঃ নবনির্মিত বাজারের দ্বারোদ্ঘাটন হয়। ২৫ বিঘা জমির ওপর মার্কেট তৈরির ব্যয় হয়েছিল ২,৫৮,৭২০ টাকা। পরে বাজারটি সম্প্রসারিত হয়ে ৩৮ বিঘায় দাঁড়ায়। এটি পৌরসভার নিয়ন্ত্রণে প্রথম মার্কেট, নামকরণ করা হয় নিউ মার্কেট। পরে লর্ড কার্জনের উদ্যোগে ১৯০৩ খ্রিঃ কলিকাতা পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্যার স্টুয়ার্ট হগের নামে নিউ মার্কেটের নতুন নামকরণ করা হয় হগ মার্কেট। এখানে প্রায় ২৫০০ বিভিন্ন পণ্যের বিপণি আছে। বাজারের মধ্যে একই সারিতে একই দ্রব্যের ব্যবসার প্রচলন করা হয়েছিল। ক্রেতাসাধারণ যাতে একই ছাদের তলায় সর্বপ্রকার পণ্য সওদা করতে পারে সেই ব্যবস্থার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছিল। সে সময় হগ মার্কেট ছিল ভারতবর্ষ তথা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মার্কেট। ১৯০৭ ও ১৯০৯ খ্রিঃ মার্কেটের সম্প্রসারণ ও বিবিধ পরিবর্তন করা হয়।

সম্প্রসারিত হগ মার্কেট প্রাঙ্গণে একটি ঘড়িঘর স্থাপনের প্রয়োজন অনুভূত হতে থাকে। কলিকাতা পৌরসভা ৩রা মার্চ ১৯০৯ সালের অধিবেশনে ঘড়িঘর (Clock Tower) স্থাপনের জন্য ৬৫,০০০ টাকা মঞ্জুর করেন। ঘড়িঘর নির্মাণের পর ঘড়ি (Tower clock) সরবরাহের জন্য দরপত্র (tender) আহ্বান করা হয়। তিনটি দরপত্র পাওয়া গিয়েছিল :

| | | |
|---|---|---|
| ১. | Messrs Lund & Blockby.<br>Esplanade Road,<br>Bombay. | ১৪,০০০ টাকা |
| ২. | Messrs Hamilton & Co.,<br>Calcutta. | ১০,০০০ টাকা |
| ৩. | Messrs Cooke & Kelvey,<br>Calcutta. | ৯,৮০০ টাকা |

কলিকাতা পৌরসভার জেনারেল কমিটি তাঁদের ৭ মে ১৯০৯ সালের অধিবেশনে মেসার্স কুক অ্যান্ড কেলভিকে ঘড়ি সরবরাহের বরাত দেন। ১৯০৯ সালের শেষের দিকে ঘড়িঘরে ঘড়িটি স্থাপিত হয়।

এদিকে হগ মার্কেটের জনপ্রিয়তার সুযোগে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী খাদ্যে ভেজাল ও ওজনে কম দিতে শুরু করে। সে সময় পৌরসভার হাতে এই সব অসাধু ব্যবসায়ীকে শাস্তিদানের কোনও ব্যবস্থা ছিল না। ১৯১০ সালে তৎকালীন সরকার কলিকাতা পৌরআইনের ৫৫৯ ধারার ৩৮ উপধারার সংশোধন করে পৌরসভার হাতে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা দেন।

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে হগ মার্কেটের নাম মুখে মুখে নিউ মার্কেটে রূপান্তরিত হয়, যদিও পৌরসভার নথিপত্রে আজও হগ মার্কেট নাম বহাল আছে। বর্তমানে নিউ মার্কেটের বার্ষিক আয় ৭০ লক্ষ টাকা। ফেনিক বাজার স্ট্রিটের পূর্বদিকে অবস্থিত নিউ মার্কেটের অংশবিশেষ ভেঙে ফেলে বহুতল বাড়ি নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ের কাজ শুরু হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হবার আগেই ১৯৮৫ সালে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে নিউ মার্কেটের সমূহ ক্ষতি হয়। অবশেষে মার্টিন বার্নের সহায়তায় নতুন করে বাজারের আগুনে পোড়া অংশ গড়ে তোলা হয়েছে। ১৯৯০ সালে এটি সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়।

## ১৫নং ওয়ার্ড

ইলিয়ট রোড ও গোরস্থান লেনের মধ্যে একটি বড় বস্তির মধ্য দিয়ে এই নতুন রাস্তাটি নির্মিত হয়। এটি ৪০০ ফুট লম্বা ও ১৫ ফুট চওড়া। রাস্তাটি ১৮৮৫ খ্রিঃ তৈরি হয়। এটি পার্ক স্ট্রিট ও ইলিয়ট রোডের গুরুত্বপূর্ণ সংযোগকারী সড়করূপে চিহ্নিত। 'ম্যাকলিওড স্ট্রিট' নামে রাস্তাটির নামকরণ করা হয়। তিনি ছিলেন সেকালের খ্যাতনামা চিকিৎসক।

ইন্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসের শল্য চিকিৎসক লেফটেন্যান্ট কর্নেল ম্যাকলিওড একসময় কলিকাতা পৌরসভার হেলথ অফিসার ছিলেন (১১.১২.১৮৭৯ থেকে ২৭.১.১৮৮০)। পরে চিকিৎসকরূপে ১৮৮৪ খ্রিঃ পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।[৮৭] পরবর্তীকালে তিনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক হয়েছিলেন।

১৮৮১ থেকে ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তৎকালীন ১৮টি ওয়ার্ডের মধ্যে যে সব ওয়ার্ডের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা নির্মিত হয়েছিল সেগুলি ওয়ার্ডভিত্তিক হিসাবে পরপর সাজিয়ে দেওয়া হল। ওপরের এই বিবরণ থেকে সেকালের কলিকাতার রাস্তাঘাটের একটা স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে পৌরসভা অথবা কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থার হস্তক্ষেপে কিছু রাস্তার যে পরিবর্তন, পরিবর্জন ও পরিবর্ধন ঘটেছিল সে সম্বন্ধেও দু-চার কথা এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।

## তথ্যসূত্র


১ Calcutta Mpl. Corpn. Administration Report 1882-83.
২ C.M.C. Administration Report 1882-83.
৩ Municipal Calcutta—S.W. Goode, p. 239.
৪ A Short History of Calcutta—A.K. Roy, p. 195.
৫ কলিকাতার ইতিবৃত্ত—প্রাণকৃষ্ণ দত্ত
৬ Calcutta Municipal Gazette dt. 23.12.1933.
৭ The Harijan, Sept.14, 1947.
৮ গীতিনাট্য অভ্যুদয় ও তৎসম—গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, দেশ, ১৫.১.৮৩
৯ The Administration Report of the Cal. Mpl. Corpn. 1882-83.
১০ Calcutta Mpl. Corpn. Proceedings dt. 22.9.15.
১১ কলিকাতা দর্পণ—রাধারমণ মিত্র
১২ The Administration Report of the Cal. Municipal Corpn., 1885-86.
১৩ কলকাতার বাড়ি, বাগান ও বাগান বাড়ি—রাধারমণ মিত্র, এক্ষণ, শারদীয়া ১৩৮৭
১৪ The Proceedings of the meeting of General Committee, C.M.c—1895.
১৫ The Proceedings of the meeting of General Committee of the Cal. Municipal Corpn. dt. 18.6.1892.
১৬ The Proceedings of the meeting of the Cal. Corpn. dt. 19.11.1934.
১৭ The Proceedings of the meeting of the Cal. Mpl. Corpn. dt. 12.10.1909.
১৮ Cal. Corpn. Administration Report—1931-32.
১৯ Calcutta Municipal Corporation Administration Report—1888-89.
২০ ভারতকোষ—৫ম খণ্ড
২১ বাবুবৃত্তান্ত—সমর সেন

২২ পদবী পত্রিকা—দেবদাস কুণ্ডু
২৩ A Short History of Calcutta—A.K. Roy.
২৪ Administration Report of the Calcutta Mpl. Corpn. 1882-83.
২৫ Modern History of Indian Chiefs, Rajahs, Zamindars etc.—lokenath Ghosh.
২৬ Cal. Mpl. Corpn. Administration Report—1882-83.
২৭ ভারতকোষ—৪র্থ খণ্ড
২৮ শব্দবিদ্যার আঁচড়ে কলকাতার স্কেলিটন—সুকুমার সেন, আনন্দবাজার পত্রিকা।
২৯ মদনমোহন ঠাকুর ও গোকুলচন্দ্র মিত্র—পূর্ণচন্দ্র দে, উদ্ভটসাগর
৩০ The Proceedings of the meeting of the Cal. Municipal Corpn. dt. 18.11.1914.
৩১ Annual Report of the C.I.T.—1937-38.
৩২ The Proceedings of the meeting of the Cal. Corpn. dt. 15.3.1939.
৩৩ Butto Krishna Pal—G.C.Sen, Cal. Municipal Gazette, 22.1.1949.
৩৪ কলিকাতার বাবু বৃত্তান্ত—লোকনাথ ঘোষের "The Native Aristocracy & Gentry" থেকে শুদ্ধোদন সেনের অনুবাদ
৩৫ Cal. Mpl. Corpn. Administration Report 1888-89.
৩৬ A Short History of Calcutta—A.K. Roy, p. 201
৩৭ আমার কথা, আমার অভিনেত্রী জীবন—বিনোদিনী দাসী সঙ্কলক—সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও নির্মাল্য আচার্য
৩৮ ভারতকোষ—৩য় খণ্ড
৩৯ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা অভিধান—কালীজীবন দেবশর্মা
৪০ Modern History of the Indian Chiefs, Rajahs, Zamindars etc. Lokenath Ghosh.
৪১ শব্দ-বিদ্যার আঁচড়ে কলকাতার স্কেলিটন—সুকুমার সেন
৪২ সেন মহাশয়ের বৈশাখী—সুনীল দাস, দেশ, ২।৫।৮৭
৪৩ উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিচিত্রা, চিত্রা দেব, দেশ সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৯৭
৪৪ The Calcutta Municipal Gazette dt. 20. 8. 1960.
৪৫ শতাব্দীর প্রতিধ্বনি—ডঃ অতুল সুর, পৃ-২৯
৪৬ The Proceedings of the meeting of the Cal. Corpn. dt. 12. 8. 1960
৪৭ Modern History of the Indian Chiefs, Rajaha, Zamindars etc.—Lokenath Ghose.
৪৮ The Proceedings of the meeting of the Calcutta Municipal Corpn. dt. 12.10.1909
৪৯ Stray thoughts on some incidents in my life—Sir Bepin Krishna Bose। সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান
৫০ Administration Report of Municipal Calcutta—1868
৫১ — Do — 1882-83
৫২ জীবনীকোষ—শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার সংকলিত
৫৩ সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান
৫৪ The Proceedings of the meeting of the Cal. Corpn. dt. 10.2.1937
৫৫ Calcutta Mpl. Corpn. Admn. Report, 1884-85
৫৬ ভারতকোষ—৪র্থ খণ্ড
৫৭ Calcutta Mpl. Corpn. Admn. Report, 1885-86
৫৮ C.M.C. Admn. Report, 1887-88
৫৯ কলিকাতায় বিদ্যাসাগর—রাধারমণ মিত্র
৬০ কথামৃত—শ্রীম, প্রথম খণ্ড, তৃতীয় ভাগ, ১ম পরিচ্ছেদ
৬১ Assesment Register of the Calcutta Corpn.—1927-28
৬২ The Proceedings of the meeting of the Cal. MLP. Corpn/ dt. 7. 11. 1917
৬৩ The Proceedings of the meeting of the Cal. Corpn. dt 19.6.64
৬৪ কলিকাতা দর্পণ—রাধারমণ মিত্র/ভারতকোষ, ৫ম খণ্ড/সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান
৬৫ The C.M.C. Adm. Report 1887-88
৬৬ কলকাতার বাবু বৃত্তান্ত— লোকনাথ ঘোষের ''The Native Aristocracy & Gentry'' শুদ্ধোদন সেনের অনুবাদ।
৬৭ Cal. Corpn. Adm. Report 1878
৬৮ Cal. Corpn. Adm. Report 1882-83
৬৯ Seton Karr's Selection from Cal. Gazette dt. 19.4.1792. Vol. II.
৭০ Cal. Mpl. Corpn. Adm. Report 1881, 1882-83

৭১ The Proceedings of the C.M.C. General Committee dt 22.7.1889
৭২ ভারতকোষ/সংবাদপত্রে সেকালের কথা ২য় —ব্রজেন বন্দ্যোপাধ্যায়।
৭৩ Cal. Mpl. Corpn Adm. Report 1885-86.
৭৪ Cal. Mpl. Corpn. Adm. Report 1885-86
৭৫ Asiatic Journal, Aug 1836, p. 284-86
৭৬ কলকাতা কালচার— বিনয় ঘোষ

৭৭ কলিকাতা সেকালের ও একালের, পৃ ৮৭৪— হরিসাধন মুখোপাধ্যায় ।
৭৮ Cal. Mpl. Corpn. Adm. Report 1885-86
৭৯ Bengal under the Lt. Gover nors-Buckland, p. 743
৮০ স্মৃতিরেখা— দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী

৮১ কলকাতা কালচার—বিনয় ঘোষ ।
৮২ Old Fort William—Wilson Vol. I, p. 202.
৮৩ A Short History of Calcutta— A.K.Roy.
৮৪ The Proceedings of the meeting of the Cal. Municipal Corpn. dt. 28.11.1905.
৮৫ A Short History of Calcutta—A.K. Roy. p.244.
৮৬ The Proceedings of the Meeting of the Calcutta Mpl. Corpn. dt. 8.12.1905
৮৭ A Short History of Calcutta— A.K. Roy, p. 102.

২৪

# ১৮৮৮-এর নতুন পৌর আইন ও কলিকাতার সীমানা

১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দের কলিকাতা পৌর আইন নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। এই আইনে সর্বপ্রথম শহর কলিকাতার সঙ্গে শহরতলিকে যুক্ত করার ব্যবস্থা হয়। কাজেই নতুন পৌর আইন বিধিবদ্ধ হবার পূর্বে সে সময়ের পরিস্থিতির উপর একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া প্রয়োজন।

১৮৮৩-৮৪ খ্রিঃ শহর কলিকাতার সঙ্গে শহরতলিকে যুক্ত করার প্রশ্নটি ধীরে ধীরে প্রাধান্য পেতে থাকে। এর প্রধান কারণ শহর কলিকাতার পয়ঃপ্রণালী শহরতলির বৃহৎ অংশের মধ্য দিয়ে প্রসারিত। কলিকাতার জল সরবরাহ ব্যবস্থা এই সব শহরতলিকে জল সরবরাহ করে। এখানেই শেষ নয়। এই শহরের গ্যাস কোম্পানি শহরতলিকে আলোকিত করার জন্য গ্যাসের চাহিদা মিটিয়ে থাকে। অবশেষে অনেক বিচার-বিবেচনার পর এই সিদ্ধান্তে আসা হয়েছিল যে উভয় প্রতিষ্ঠানের (শহর কলিকাতা ও শহরতলি) জল সরবরাহ, পয়ঃপ্রণালী, আলোর জন্য গ্যাস সরবরাহ এবং সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়গুলি একটি প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণে থেকে রূপায়িত হওয়া প্রয়োজন।

এই সংযুক্তির বিরুদ্ধে দুটি আপত্তি প্রবল হয়েছিল— (১) দুটি পৌরসভা (শহর কলিকাতা পৌরসভা ও শহরতলির পৌরসভা) এই সংযুক্তির স্বপক্ষে ছিল না। শহর কলিকাতার কমিশনারগণের আশঙ্কা হয়েছিল যে তাঁদের তহবিলের অর্থ শহরতলির উন্নতিবিধানে ব্যয়িত হবে। আর অন্যদিকে, শহরতলির কমিশনারদের উৎকণ্ঠা শহর কলিকাতার মতো তাঁদেরও করভার সমানভাবে বৃদ্ধি পাবে। (২) আর দ্বিতীয়টি ছিল, এত বড় বিশাল এলাকার নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের অভাব এতে ঘটবে। এইভাবে শহর কলিকাতার আয়তন বৃদ্ধি হলে পুর-পরিষেবা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বানচাল হয়ে নিয়ন্ত্রণ হারাবে।

দুটি প্রতিবাদের মধ্যে যুক্তির সারবত্তা যথেষ্ট আছে। তবে এই বছরে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে লন্ডন পৌর বিল (London Municipal Bill) যেভাবে গৃহীত হতে যাচ্ছে, ঠিক সেইভাবে যদি শহর কলিকাতার পরিষেবার ব্যবস্থা বণ্টন করা হয় তাতে এ সমস্যার সমাধান সহজসাধ্য হবে। প্রস্তাবিত সমগ্র পৌরসভাকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করে তাঁদের উপর যদি স্থানীয় পরিষেবা, যেমন, রাস্তা ধোয়ার ব্যবস্থা, জঞ্জাল অপসারণ, রাস্তার ছোটখাটো সংস্কার ইত্যাদির ভার অর্পণ করা হয়, তবে তাঁরা স্থানীয় স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে কাজগুলি সুষ্ঠুভাবে ও মিতব্যয়িতার সঙ্গে সুসম্পন্ন করবেন। যে সব প্রকল্পে নগর উন্নয়নের বৃহত্তর উন্নতি জড়িত, সে সব কাজগুলি কেন্দ্রীয় পৌরসভা নিজ তত্ত্বাবধানে রূপায়িত করবেন। অন্যদিকে নতুন জাহাজ সংস্কারের স্থান, দ্রুত রেল পরিবহণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, শহরতলিতে নতুন নতুন শিল্প গড়ে ওঠায় দুটি পৌরসভাকে পৃথক রাখার পক্ষে জোরালো মতবাদ প্রাধান্য পেতে থাকে।[১]

সামগ্রিক উন্নয়নের কথা চিন্তা করে সরকার দুই পৌরসভাকে সংযুক্তিকরণের প্রশ্নে আরও অগ্রসর হলেন। ১৮৮৬ খ্রিঃ বোর্ড অফ রেভিনিউ শহর কলিকাতা ও শহরতলির জরিপের ব্যবস্থা করার জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। পৌরসভার টাউন কাউন্সিল তাঁদের ভাইস-চেয়ারম্যানকে ওই সভায় প্রতিনিধিত্ব করার জন্য পাঠান, কমিটির সুপারিশ কিছু অদলবদল হয়ে আইনে পরিণত হয় (Act I (B.C) of 1887)। আইনের নির্দেশ অনুসারে লেফটেন্যান্ট কর্নেল ব্যারনের (Lt. Colonel

Barron) নেতৃত্বে জরিপের কাজ পরিচালিত হয়। জরিপের পরে শহরের যে নতুন মানচিত্র প্রণয়ন করা হয় তার পরিমাপ ছিল এক ইঞ্চি ৫০ ফুটের সমান। এই মানচিত্রে শহর ও শহরতলির সমস্ত রাস্তা, ফুটপাত, গলি, জলপ্রণালী, পুষ্করিণী, বাড়িঘর ও বস্তি প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। মানচিত্রটি প্রস্তুত করতে ব্যয় হয়েছিল প্রতি স্কোয়ার মাইল ১০ হাজার টাকা হিসাবে।[২] ১৮৮৮ খ্রিঃ ২৫টি ওয়ার্ডযুক্ত কলিকাতার মানচিত্রটি পরিশিষ্ট ৮-এ সংযুক্ত করা হয়েছে।

জরিপের পর মানচিত্র প্রস্তুত হলে সরকার দুই পৌরসভার সংযুক্তিকরণে তৎপর হন। ১৮৮৮ খ্রিঃ এই উদ্দেশ্য নিয়ে একটি আইন প্রণয়ন করা হয় (The Municipal Consolidation Act II of 1888)। আইনের মাধ্যমে এই সংযুক্তির ফলে শহর কলিকাতার আয়তন ১১৯৫৪ একর থেকে বেড়ে ২০৫৪৭ একর হয়। আয়তন বৃদ্ধি হওয়াতে ওয়ার্ডের সংখ্যা বেড়ে ১৮ থেকে ২৫-এ দাঁড়ায়। কলিকাতার এই আয়তন বৃদ্ধি সম্বন্ধে সামান্য আলোচনার অবকাশ আছে।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের পৌর আইনে শহর কলিকাতায় মোট ওয়ার্ডের সংখ্যা ছিল ১৮টি। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দের আইনে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২৫টি। শহরতলি মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত মৌজাগুলি শহর কলিকাতার সঙ্গে সংযুক্তির ফলে ৭টি নতুন ওয়ার্ডের আবির্ভাব হয়। নতুন ওয়ার্ড ছাড়াও পুরানো ওয়ার্ডের সঙ্গে শহরতলি মিউনিসিপ্যালিটির কিছু কিছু মৌজা যুক্ত হওয়াতে সেগুলিকে ফ্রিঞ্জ এরিয়া ওয়ার্ড (Fringe Area Ward) বলে চিহ্নিত করা হল। কোন কোন মিউনিসিপ্যালিটি থেকে কোন কোন মৌজা শহর কলিকাতার পুরানো ওয়ার্ডের অঙ্গীভূত হয় তা জানতে হলে মিউনিসিপ্যালিটির আয়তন সম্বন্ধে প্রথমে অবহিত হওয়া দরকার।

১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট শহরতলির পুরসভাকে ৬টি ওয়ার্ডে ও ১৪টি থানায় বিভক্ত করে। ৫৫টি গ্রামের কিছু গ্রাম ছাড়াও ২৪ পরগনার অনেকগুলি গ্রাম এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেই পুরসভার আকার ছিল নিম্নরূপ :

| ওয়ার্ড নম্বর | পুলিশ থানার নাম | মৌজার নাম |
|---|---|---|
| ১ নম্বর | কাশীপুর | কাশীপুর ও সিঁথি। |
| | চিৎপুর | চিৎপুর, দুর্গাপুর, টালা, বীরপাড়া, পাইকপাড়া ও কালিদহ। |
| | উল্টাডিঙ্গি | বেলগেছিয়া ও উল্টাডিঙ্গি। |
| ২ নম্বর | মানিকতলা | গৌরীবেড়ে, সিমলা, মানিকতলা ও বাগমারি। |
| | বেলিয়াঘাটা | কাঁকুড়গাছি, নারিকেলডাঙ্গা, শিয়ালদহ, কুচওয়ান, শুঁড়া, কুলিয়া ও বেলিয়াঘাটা। |
| ৩ নম্বর | এন্টালি | এন্টালি, ট্যাংরা, পাগলাডাঙা, কামারডাঙা ও গোবরা। |
| | বেনিয়াপুকুর | জাননগর, তিলজলা ও তোপসিয়া। |
| ৪ নম্বর | বালিগঞ্জ | পুরানোনগর, বালিগঞ্জ, কড়েয়া, বন্ডেল, উলুবেড়িয়া ও ঘুঘুডাঙা। |
| | টালিগঞ্জ | গুদসা, মনোহরপুর, শা'নগর ও মুদিয়ালি। |
| ৫ নম্বর | ভবানীপুর | ভবানীপুর, চক্রবেড়ে ও কালীঘাট। |
| | আলিপুর | আলিপুর, জিরাট, রাধানগর, গোপালনগর, দুর্গাপুর, চেতলা, সোনাডাঙ্গা (আংশিক), মায়াপুর ও শুরুরপুর (আংশিক)। |
| ৬ নম্বর | একবালপুর | বাঁশবেড়িয়া, রাজারামপুর, ভূকৈলাস, দক্ষিণ শেরপুর, মণিপুর, বলরামপুর, জারুল, মঞ্জুরাট, দৌলতপুর ও একবালপুর। |

| | |
|---|---|
| গার্ডেনরীচ | মানিকতলা, রামনগর, ইন্দ্রী ও সোনাই। |
| টালিগঞ্জ (দুর্গাপুর) | গোবিন্দপুর, ঢাকুরিয়া ও আরাকপুর। |
| ওয়াটগঞ্জ | খিদিরপুর, বৈকুণ্ঠপুর, আদিগঙ্গাচর ও রামচন্দ্রপুর। |

১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দের বেঙ্গল কাউন্সিল অ্যাক্ট অনুসারে শহরতলির মিউনিসিপ্যালিটির চেহারায় আমূল পরিবর্তনের সূচনা হয়। ১৮৮৯ খ্রিঃ শহরতলির মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে ৪ ভাগে ভাগ করা হয় :

১) নর্থ সুবার্বন মিউনিসিপ্যালিটি
২) ইস্ট ,, ,,
৩) সাউথ ,, ,,
৪) সুবার্বন মিউনিসিপ্যালিটি অফ গার্ডেনরীচ।

পুরানো ১নং ওয়ার্ড কাশীপুর চিৎপুর মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্ভুক্ত হয়। একে বলা হত নর্থ-সুবার্বন মিউনিসিপ্যালিটি।

পুরানো ২নং ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত হয় মানিকতলা মিউনিসিপ্যালিটি। এটি ইস্ট সুবার্বন মিউনিসিপ্যালিটি।

আর ৩, ৪, ৫ ও ৬ নম্বর ওয়ার্ড কলিকাতার সঙ্গে সংযুক্ত হয়। নতুন আইনের বলে ৫৫ গ্রামের অনেকগুলি এই সব মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত হয়েছিল। কোন কোন গ্রাম এই সব মিউনিসিপ্যালিটির এলাকাধীনে এল সেগুলি নীচে দেখানো হল :

| মিউনিসিপ্যালিটির নাম | থানার নাম | ৫৫ গ্রামের অন্তর্ভুক্ত মৌজার নাম |
|---|---|---|
| ১। নর্থ সুবার্বন মিউনিসিপ্যালিটি | কাশীপুর, চিৎপুর, উল্টাডিঙ্গি | সিঁথি, কাশীপুর, পাইকপাড়া, চিৎপুর, টালা, বীরপাড়া, কালীদহ, বেলগেছিয়া, উল্টাডিঙ্গি (আংশিক) |
| ২। ইস্ট সুবার্বন মিউনিসিপ্যালিটি | মানিকতলা, বেলিয়াঘাটা | দক্ষিণদ্বারী, কাঁকরিয়া, উল্টাডিঙ্গি (আংশিক), দত্তাবাদ, মল্লিকবাদ, বাগমারি, শুঁড়া, নারিকেলডাঙ্গা, কাঁকুড়গাছি |
| ৩। সাউথ সুবার্বন মিউনিসিপ্যালিটি | টালিগঞ্জ | কৈখালি মৌজা ও ২৪ পরগনার অন্তর্গত গোবিন্দপুর, ঢাকুরিয়া, আরাকপুর প্রভৃতি। |
| ৪। সুবার্বন মিউনিসিপ্যালিটি অফ্ গার্ডেনরীচ | গার্ডেনরীচ | গার্ডেনরীচ থানার অন্তর্গত অঞ্চলের অংশ-বিশেষ ও ২৪ পরগনার কিছু অংশ। |

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে শহরতলি পুরসভার ৩, ৪, ৫ ও ৬ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত টালিগঞ্জ থানা ও গার্ডেনরীচ থানা (আংশিক) বাদ দিয়ে বাকি সব অঞ্চল নতুন আইনে শহর কলিকাতার অঙ্গীভূত হয়। ফলে সারকুলার ক্যানেল দ্বারা বেষ্টিত পশ্চিম দিকের সমস্ত অঞ্চল শহর কলিকাতার সীমানার মধ্যে আসে। এই এলাকা কলিকাতার পুরানো ওয়ার্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে "ফ্রিঞ্জ এরিয়া ওয়ার্ড" (Fringe Area Ward) নামে চিহ্নিত হল। নতুন ফ্রিঞ্জ এরিয়া ওয়ার্ডের বিবরণ নীচে দেওয়া হল :

| | | | |
|---|---|---|---|
| শহর কলিকাতার ১নং ওয়ার্ডের সঙ্গে যুক্ত হল | উল্টাডিঙ্গি মৌজা (আংশিক) | = ১নং ফ্রিঞ্জ ওয়ার্ড |
| ,, ,, ৩ ,, ,, ,, ,, | বাগমারি (আংশিক) ও গৌরীবেড়ে (আংশিক) | = ৩ ,, ,, ,, |
| ,, ,, ৪ ,, ,, ,, ,, | বাহির সিমলা ও নারিকেলডাঙ্গা | = ৪ ,, ,, ,, |

| | | |
|---|---|---|
| | (আংশিক) | |
| শহর কলিকাতার ৯নং ওয়ার্ডের সঙ্গে যুক্ত হল | নারিকেলডাঙ্গা (আংশিক) ও শিয়ালদহ | = ৯নং ফ্রিঞ্জ ওয়ার্ড |

১৮টি ওয়ার্ড ছাড়া নতুন যে আরও ৭টি ওয়ার্ড কলিকাতার সঙ্গে সংযুক্ত হয় তাদের অন্তর্ভুক্ত মৌজাগুলি হল—

| নতুন ওয়ার্ড নম্বর | মৌজার নাম |
|---|---|
| ১৯ | — বেলিয়াঘাটা (আংশিক), এন্টালি, পাগলাডাঙ্গা, কামারডাঙ্গা, গোবরা ও ট্যাংরা। |
| ২০ | — তোপসিয়া (আংশিক), তিলজলা, কড়েয়া সহ বেনিয়াপুকুর, বণ্ডেল উলুবেড়িয়া, বেদিয়াডাঙ্গা, কুষ্ঠিয়া। |
| ২১ | — পুরানোনগর, ঘুঘুডাঙ্গা, শ্রীরামপুর, বালিগঞ্জ, গুদসা, বেলতলা, মনোহরপুর (আংশিক), মুদিয়ালি ও শা'নগর। |
| ২২ | — চক্রবেড়ে, ভবানীপুর, নিজগ্রাম, কালীঘাট ও মনোহরপুর (আংশিক)। |
| ২৩ | — রাধানগর, আলিপুর, জিরাট, গোপালনগর, চেতলা, সোনাডাঙ্গা (আংশিক), ময়েরপুর, সাহারপুর। |
| ২৪ | — বাঁশবেড়িয়া, রাজারামপুর, ভূকৈলাস, দক্ষিণ শেরপুর, মণিপুর, বলরামপুর, জারুল, মঞ্জুরাট, দৌলতপুর ও একবালপুর। |
| ২৫ | — খিদিরপুর, বৈকুণ্ঠপুর, আদিগঙ্গাচর, রামচন্দ্রপুর, ইন্দ্রী।[৩] |

উপরের এই তালিকায় দেখা যায় যে ৫৫ গ্রামের অধিকাংশ মৌজা শহর কলিকাতার অন্তর্ভুক্ত হয়ে এর কলেবর বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের সেন্সাস প্রতিবেদনে বিষয়টির উপর সুস্পষ্টরূপে আলোকপাত করা হয়েছে। সে সময় শহরে মোট জমির পরিমাণ ছিল ২০,৫৪৭ একর, পাকা বাড়ির সংখ্যা ২৬,০৭০, কাঁচাবাড়ি ৪৭,৩৫১, রাস্তার দৈর্ঘ্য ৩১৫ মাইল ও পুকুরের সংখ্যা ২৮৮টি।

নতুন আইনে শহরের শুধু আয়তন বৃদ্ধিই নয়, পৌর কমিশনারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৭৫ হয়। এর মধ্যে ৫০ জন নির্বাচিত প্রতিনিধি, ১৫ জন সরকার মনোনীত, ৪ জন চেম্বার অফ কমার্স দ্বারা ও ৪ জন ক্যালকাটা ট্রেডস্ অ্যাসোসিয়েশন দ্বারা নির্বাচিত। আর ২ জন পোর্ট কমিশনারের প্রতিনিধি। এই নতুন আইনটি কার্যকরী ছিল ১লা এপ্রিল ১৮৮৯ থেকে ৩১ মার্চ ১৯০০ পর্যন্ত। এই আইনে ব্যক্তিগত ভোট প্রয়োগের প্রথম ব্যবস্থা করা হয়। এই আইনের আরেকটি ধারায় পুরসভাকে এই মর্মে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল যে সাধারণের চলাচলের রাস্তা যাতে বেদখল না হয়ে যায় এবং বাড়িঘর নির্মাণের ব্যাপারে পুরসভার নিয়ন্ত্রণ যেন বজায় থাকে। আইনের এই ধারাটি কিন্তু কার্যকরী করা সম্ভব হয়নি।[৪]

**তথ্যসূত্র**

১ Cal. Mpl. Corpn. Administration Report 1883-84.
২ Cal. Mpl. Corpn. Adiministration Report 1886-87.
৩ A Short History of Calcutta. A.K.Roy, p. 111-115.
৪ তদেব, পৃঃ ১৭১

## ২৫

# ১৮৮৮-এর পৌর আইনে কলিকাতার নতুন রাস্তা ও উদ্যান

নতুন পৌর আইন [Act II (B.C) of 1888] প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচিত পৌরপ্রতিনিধিগণ (Commissioner) কলিকাতার সার্বিক উন্নতিতে তৎপর হলেন। এই কর্পোরেশনকে প্রকৃতপক্ষে বর্তমান কর্পোরেশনের জনক বলা চলে। এই সময় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ মনীষীরা এই কর্পোরেশনের কমিশনার হয়েছিলেন। এঁদেরই তত্ত্বাবধানে ১০ বছরে ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হয়। সেই সঙ্গে শহরের সংযোজিত নতুন এলাকায় ড্রেনের ব্যবস্থা আরম্ভ হয়। অনেক অস্বাস্থ্যকর পুকুর ও ডোবা ভরাট করা হল এবং অনেক নতুন রাস্তা, পার্ক ও স্কোয়ার তৈরি করা হয়। নতুন কমিশনারদের ১১ বছরের অধিষ্ঠানের মধ্যে যে সব গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা ও উদ্যান প্রভৃতি নির্মিত হয়েছিল তারই একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে চেষ্টা করব।

নতুন পুরসভার কার্যকালের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল হ্যারিসন রোড নির্মাণের প্রকল্পটি রূপায়ণের ব্যবস্থা করা। এই রাজপথটি নির্মাণে হাওড়া স্টেশনের সঙ্গে শিয়ালদহ স্টেশনের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হয়। এতে ওই অঞ্চলের পূর্বেকার পরিকাঠামো সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়েছিল। আদি বাসিন্দারা নগর উন্নয়নের চাপে এই অঞ্চল ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। রাস্তা নির্মাণের পর যে অতিরিক্ত জমি পুরসভার হস্তগত হয়, তা নিলামে বিক্রি করে রাস্তা নির্মাণের আংশিক ব্যয়-নির্বাহের ব্যবস্থা করা হয়। ওই অতিরিক্ত জমির অধিকাংশ উচ্চ মূল্যে অবাঙালি ব্যবসায়ীরা হস্তগত করে। ফলে কলিকাতার আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামো এইভাবে ধীরে ধীরে বদলে যেতে থাকে।

রবীন্দ্র সেতুর (হাওড়া ব্রিজ) পূর্ব প্রান্ত থেকে শুরু করে শিয়ালদহ রেল স্টেশন পর্যন্ত পূর্বদিকে ধনুকের আকারে প্রসারিত কলিকাতার বিখ্যাত রাজপথটির সর্বপ্রথম নাম ছিল সেন্ট্রাল রোড। পরে হ্যারিসন রোড, আরও পরে মহাত্মা গান্ধী রোড নামে নামাঙ্কিত হয়। ১৮৮০ খ্রিঃ সড়কটি নির্মাণের চিন্তাভাবনা শুরু হয়। সে সময়ের শহর কলিকাতার নগর উন্নয়ন কমিটি এই সড়ক পথটি নির্মাণের সুপারিশ করেন। পুরসভার আর্থিক অনটনের জন্য ওই সুপারিশ কার্যকর করা যায়নি। অবশেষে ১৮৮৮ খ্রিঃ কলিকাতা পুরসভা সেন্ট্রাল রোড নির্মাণে তৎপর হন। ১১ই এপ্রিল ১৮৮৯ খ্রিঃ এক বিশেষ সভায় পৌর কর্তৃপক্ষ সেন্ট্রাল রোড তৈরির প্রস্তাবটি অনুমোদন করেন। সরকার বিনা সুদে অর্থ সাহায্যের প্রস্তাব দেন। নির্মাণকার্য পরিচালনা, পর্যবেক্ষণ, জমি অধিগ্রহণের কার্য দেখাশোনার জন্য ১২ জন সদস্যের এক কমিটি গঠন করা হয়। ওই বছরই সেন্ট্রাল রোড তহবিল গঠিত হয়। ১৮৮৯ খ্রিঃ এপ্রিল মাসে রাস্তার কাজ শুরু হয়। ১৮৯১-৯২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রাস্তার নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয় এবং যান চলাচলের জন্য রাজপথটি উন্মুক্ত হয়। এই বছরই পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্যার হেনরি হ্যারিসনের নামে রাজপথটি নামাঙ্কিত করা হয়। মোট খরচ ধরা হয়েছিল ৪৭,০৯,৬৬৭ টাকা। খরচ হয়েছিল ২৮,৫০,০০০ টাকা। পথটির মোট দৈর্ঘ্যের পরিমাণ ৮৯১৪ ফুট ও প্রস্থ ৫০ ফুট। পথের দু'ধারে ১২½ ফুট করে ফুটপাতের ব্যবস্থা আছে। রাস্তার দু' ধারে মেহগিনি ও গোলমোহর গাছ লাগানো হয়েছিল। হ্যারিসন রোড (মহাত্মা গান্ধী রোড) সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য, সে

তো এক মহাভারত, তা এখানে পরিবেশনের অবকাশ নেই।

**নরেন্দ্র সেন স্কোয়ার :**

১৯নং সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটে একটি খোলা জায়গা ছিল। ১৮৮৯ খ্রিঃ ওই অঞ্চলের পল্লীবাসীরা পুরসভার কাছে এই মর্মে আবেদন করেন যে খোলা জায়গাটি একটি উদ্যানে রূপান্তরিত করে উদ্যানটি পুরসভার কোনও চেয়ারম্যানের নামে নামকরণ করা হোক। যদি তা সম্ভব না হয় তবে ওয়ার্ড কমিশনার নরেন্দ্রনাথ সেনের নামে উদ্যানটি নামকরণ করা যেতে পারে। আবেদনে আরও বলা হয়েছিল যে নরেন্দ্রনাথ এই পল্লীর উন্নয়নে সদাই সচেষ্ট ছিলেন। পুরসভা তাঁদের ৬ই জুন ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দের অধিবেশনে এই প্রস্তাব অনুমোদন করেন। সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটের খালি জমিটি অতঃপর নরেন্দ্র সেন স্কোয়ার নামে নামাঙ্কিত হয়।

ইন্ডিয়ান মিরর (Indian Mirror) পত্রিকার সম্পাদক, কলিকাতা হাইকোর্টের সলিসিটার, কলিকাতা পুরসভার কমিশনার ও বাংলা ব্যবস্থাপক সভার পুরপ্রতিনিধি নরেন্দ্রনাথ সেন ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন।[১]

তিনি রামকমল সেনের পৌত্র, জয়পুরের প্রধানমন্ত্রী হরিমোহন সেনের পুত্র। প্রথম শিক্ষালাভ হিন্দু কলেজে ও পরে গৃহশিক্ষক অভিজ্ঞ সাংবাদিক ও শিক্ষাবিদ ক্যাপ্টেন ফ্রাঙ্ক পামারের কাছে। সুপণ্ডিত সাংবাদিক পামারের সংস্পর্শে এসে সাংবাদিক হবার বাসনা তিনি পোষণ করতে থাকেন। পামারের নির্দেশমত অল্প বয়সে সমসাময়িক পত্র পত্রিকায় ছোট ছোট প্রবন্ধ পাঠাতে আরম্ভ করেন। স্বীয় জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধির সংকল্প নিয়ে কঠোর অধ্যয়ন শুরু করেন ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরিতে। হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখার্জির মতো তিনিও স্বয়ং-অধ্যয়নের দ্বারা শিক্ষিত হয়েছিলেন। কেননা হরিশচন্দ্রের মতো তিনিও বিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বিশেষ লাভ করেননি। ১৯/২০ বছর বয়সে সেকালের কলিকাতার বিখ্যাত অ্যাটর্নি মিঃ উইলিয়াম অ্যাসলির শিক্ষানবিশ হন। শিক্ষা সমাপনের পর ১৮৬৬ খ্রিঃ কলিকাতা হাইকোর্টের অ্যাটর্নিরূপে যোগদান করেন। পরে মিঃ জেমস হিউমের প্রতিষ্ঠিত ও কিশোরীচাঁদ মিত্রের সম্পাদিত "ইন্ডিয়ান ফিল্ড" পত্রিকায় সম্পাদকীয় বিভাগে যুক্ত হন।

মনমোহন ঘোষের উদ্যোগে এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আর্থিক সহায়তায় ১লা আগস্ট ১৮৬১ খ্রিঃ ইন্ডিয়ান মিরর পত্রিকা পাক্ষিক রূপে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন। ১৮৬৬ খ্রিঃ অ্যাটর্নিশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নরেন্দ্রনাথ অ্যাটর্নি হন এবং 'মিররে'র সংশ্রব ত্যাগ করেন। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দের ১লা জানুয়ারি ইন্ডিয়ান মিরর দৈনিকে রূপান্তরিত হলে সম্পাদনার ভার পুনরায় নরেন্দ্রনাথ সেনের ওপর অর্পিত হয়। সহযোগী সম্পাদক ছিলেন কেশবচন্দ্র সেনের অনুজ কৃষ্ণবিহারী সেন। ১৮৭৯ খ্রিঃ পত্রিকাটির স্বত্ত্বাধিকারী হন নরেন্দ্রনাথ।[২]

নরেন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—

"I remember Narendra Nath Sen in the days of his sturdy manhood when age and disappointment had not worked their havoc upon his noble temperament, when he was the terror of evil doers and when the enemies of his country shrank from his virile presume."[৩]

**মার্কাস স্কোয়ার :**

এরপর মার্কাস স্কোয়ার নির্মাণের কথা। আদি কলিকাতায় এটির নাম ছিল বসাকদিঘি। কলিকাতার প্রাচীন অধিবাসী কোনও এক বসাক পরিবার এর মালিক ছিলেন। ওই অঞ্চলের পল্লীবাসীরা একে কলাবাগানের দিঘি বলত। দিঘিটি ছিল প্রকাণ্ড। এর চারিদিকে ছিল কলাগাছের ঝাড়। পরবর্তীকালে কলাগাছের কোনও অস্তিত্ব ছিল না।[৪]

মার্কাস স্কোয়ার সম্বন্ধে কিছু জানার আগে মার্কাস সাহেব সম্বন্ধে দু'চার কথা বলা দরকার। মিঃ

জি. টি. মার্কাস (Mr. G.T. Marcus) একসময় কলিকাতার নাগরিক ছিলেন। ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে মারা যান। কলিকাতায় থাকাকালীন এই শহরের প্রতি তাঁর ভালবাসা জন্মায়। তিনি তাঁর উইলে কলিকাতার চারখানি মূল্যবান ভবন এই শহরের মঙ্গলের জন্য কলিকাতা পুরসভাকে দান করে যান। সেগুলি—

১) ৩নং লিটল রাসেল স্ট্রিট,
২) ৩৫নং ধর্মতলা স্ট্রিট,
৩) ৩৬নং ধর্মতলা স্ট্রিট ও
৪) ২৮নং থিয়েটার রোড[৫]

তাঁর উইলে এই মর্মে আর একটি নির্দেশ ছিল যে সম্পত্তির আয় থেকে বার্ষিক ২৫০ পাউন্ড ইংল্যান্ডনিবাসী শ্রীমতী থর্নটনকে (Mrs. Thornton) দিতে হবে। কলিকাতা পুরসভা অতঃপর শ্রীমতী থর্নটনের অনুমতি নিয়ে মার্কাস সাহেব প্রদত্ত চারটি ভবন ১,১৭,০০০ টাকায় বিক্রি করে দেন। পুরসভা 'মার্কাস ফান্ড' নামে একটি তহবিল গঠন করেন এবং ওই অর্থ তাতে জমা রাখা হয়। পরে প্রাপ্ত অর্থের ৭০,০০০ টাকা সরকারি ঋণপত্রে লগ্নি করে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর জেনারেল ও জাস্টিস অব পিস-এর নামে ব্যাংক অব বেঙ্গলের হেফাজতে রাখা হয়। এর সুদ থেকে শ্রীমতী থর্নটনের বার্ষিক প্রাপ্য অর্থ দেবার ব্যবস্থা হয়। বাকি ৪৭,০০০ টাকা বর্তমানের পৌরভবন নির্মাণে ব্যয় হয়। ১৮৮৩ খ্রিঃ শ্রীমতী থর্নটন পরলোকগমন করেন। এর পর অ্যাডমিনিস্ট্রেটর জেনারেল সুদ সমেত ৭২,০০০ টাকা পুরসভাকে প্রত্যর্পণ করেন। পুরসভা ওই অর্থে মার্কাসের নামে একটি উদ্যান নির্মাণে ব্রতী হন। ১৮৮৭ খ্রিঃ মেছুয়াবাজার স্ট্রিটের নিকটে অবস্থিত বসাকদিঘি অধিগ্রহণ করা হয়। এটি ৯ বিঘা জমির উপর অবস্থিত ছিল। দিঘির সামান্য অংশ রেখে বাকি ভরাট করার ব্যবস্থা হয়। পাশেই ছিল হ্যালিডে পার্ক। সেখানে সে সময় ভূগর্ভস্থ জলাধার নির্মিত হচ্ছিল। ঠিক হয় জলাধার খননের মৃত্তিকা দিয়ে বসাকদিঘির অধিকাংশ ভরাট করা হবে। এই ব্যবস্থায় ১৮,৭৫০ টাকা সাশ্রয় হয়। উদ্যান নির্মিত হলে পর এটিকে মেছুয়াবাজার স্ট্রিটের কিনারা পর্যন্ত প্রসারিত করা হয়। উদ্যানের মধ্যে ১০ ফুট প্রশস্ত একটি রাস্তা ও ছোট একটি পুষ্করিণীর ব্যবস্থাও রাখা হয়। মার্কাস ফান্ড থেকে এই উদ্যান নির্মাণের ব্যয় নির্বাহ হল। ১৮৮৯ খ্রিঃ এটির নাম 'মার্কাস স্কোয়ার' নামাঙ্কিত হয় এবং সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য খুলে দেওয়া হয়।[৬]

১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের কথা, বাংলার ছোটলাট স্যার চার্লস ইলিয়ট ছাত্রদের জন্য মার্কাস স্কোয়ারে একটি ব্যায়ামাগার স্থাপনে উদ্যোগী হলেন। প্রকল্পটি রূপায়ণের জন্য পুরসভার কাছে কয়েকটি প্রস্তাব রাখলেন :

১) পুষ্করিণীটি ভরাট করা,
২) উদ্যানের পশ্চিমদিকের বস্তি জমি থেকে ৪½ বিঘার মতো জমি অধিগ্রহণ করা,
৩) উদ্যানের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ৪ জন প্রতিনিধি নিয়ে একটি পর্ষদ গঠনের ব্যবস্থা করা। প্রথম জন কলিকাতা পুরসভার, দ্বিতীয় জন বাংলা সরকারের, তৃতীয় ব্যক্তি আসবেন দি সোসাইটি ফর দি হায়ার ট্রেনিং অব ইয়ংমেন (The Society for the Higher Training of Youngmen) এবং শেষের জন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের।

প্রস্তাবটি রূপায়ণে মোট ব্যয় ধরা হয়েছিল ৯৭,০০০ টাকা। তার মধ্যে সরকার দিয়েছিলেন ৫০,০০০ টাকা এবং বাকি অর্থ সাধারণের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়।[৭] এইভাবে সেকালের বসাকদিঘি আজকের মার্কাস স্কোয়ারে রূপান্তরিত হয়।

পরবর্তীকালে মার্কাস স্কোয়ারের রক্ষণাবেক্ষণ মার্কাস স্কোয়ার কমিটির উপর ন্যস্ত হয়। সে সময় এই কমিটির চেয়ারম্যান হতেন পুরসভার মহাধ্যক্ষ। আজও সে ব্যবস্থা বহাল আছে। মার্কাস স্কোয়ার কমিটির উদ্যোগে এই স্কোয়ার একটি মনোরম খেলার ময়দানে পরিণত হয়। সে সময় সমস্ত মার্কাস স্কোয়ারে ছিল সবুজের সমারোহ, ঘাসের ভেলভেটে ঢাকা ছিল সমস্ত উদ্যানটি। সব রকম খেলার ব্যবস্থা এই কমিটির তত্ত্বাবধানে থাকলেও ক্রিকেটই ছিল এখানকার সবচেয়ে আকর্ষণীয় খেলা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সামরিক কর্তৃপক্ষ মার্কাস স্কোয়ার সামরিক প্রয়োজনে গ্রহণ করে

স্কোয়ারের মধ্যে কিছু কিছু গৃহাদি নির্মাণ করেন। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর সামরিক কর্তৃপক্ষ ওই সব গৃহ তুলে নিয়ে গেলেও মার্কাস স্কোয়ারের ক্ষতি হয়েছিল অপূরণীয়। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ৯ই জুন এই স্কোয়ারের নিয়ন্ত্রণের ভার পুনরায় মার্কাস স্কোয়ার কমিটিকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। স্কোয়ারের যে ক্ষতি হয়েছিল তা Land Acquisition Collector-এর হিসাব মতো স্কোয়ার কমিটিকে ক্ষতিপূরণ বাবদ ২২,৫০৭ টাকা দেবার ব্যবস্থা হয়। দুঃখের বিষয় ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দেও ওই অর্থ পাওয়া যায়নি, অবশেষে কলিকাতা পুরসভা স্কোয়ারটির উন্নতিকল্পে সার্কাস পার্টিকে ওই ময়দান ভাড়া দিয়ে অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করেন। ১৯৫৪ খ্রিঃ কমলা সার্কাস ১৫,০০০ টাকার বিনিময়ে মার্কাস স্কোয়ারে সার্কাস দেখাবার জন্য সাময়িক ভাড়া নেয়। মার্কাস স্কোয়ারের অঙ্গসজ্জায় ওই অর্থ ব্যয় হয়।[৮]

মার্কাস সাহেবের নামে ওই অঞ্চলে একটি রাস্তাও আছে— নাম মার্কাস লেন, যার মধ্যে নিহিত আছে ছোট্ট এক ইতিহাস। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত ঠনঠনিয়া কালীবাড়ির কাছে দুটি রাস্তা ছিল— একটি কালীবাড়ির সামনের দিক দিয়ে পশ্চিমে প্রসারিত হয়ে পরে উত্তরে মোড় ঘুরে মুক্তারাম বাবু স্ট্রিটে এসে মেশে। সে সময় ওই রাস্তাটির নাম ছিল কালীবাড়ি লেন। আর দ্বিতীয় পথটি শুরু হয়েছিল কালীবাড়ি লেন যেখানে উত্তর দিকে মোড় ঘুরেছে ঠিক তার বিপরীত দিক থেকে শুরু হয়ে দক্ষিণে এগিয়ে পরে মোড় ঘুরে সোজা পশ্চিম দিকে এগোবার সময় বালক দত্ত লেনকে অতিক্রম করে মার্কাস স্কোয়ারের পূর্ব ধারে এসে পড়েছে। সে সময় এই রাস্তাটির নাম ছিল কালীতলা লেন। একই অঞ্চলে কালীবাড়ি লেন ও কালীতলা লেন থাকাতে ওই অঞ্চলের চিঠিপত্রের আদান প্রদান এবং অন্যান্য বিষয়ে অসুবিধা দেখা দিতে থাকে। অবশেষে মুক্তারাম বাবু স্ট্রিটের বাসিন্দারা ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯১৩ সালে একটি যুক্ত আবেদনপত্রে তাঁদের অসুবিধের কথার উল্লেখ করে কলিকাতা পুরসভার কাছে এই রাস্তা দুটির নাম পরিবর্তনের আবেদন করেন। কলিকাতা পুরসভা তাঁদের ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯১৫ সালের অধিবেশনে ওই আবেদনপত্রটি বিবেচনা করেন এবং কালীতলা ও কালীবাড়ি লেনের নাম পরিবর্তন করে যথাক্রমে 'মার্কাস লেন' এবং 'মুক্তারাম রো' নামকরণ করেন।[৯] পরবর্তীকালে মুক্তারাম রো এর নাম আবার পরিবর্তন করে রাজেন্দ্র দেব রোড করার কথা যথাস্থানে বলা হবে।

**হরকুমার টেগোর স্কোয়ার :** উনবিংশ শতাব্দীর আটের দশকে এই উদ্যানটি নির্মিত হয়। এটি তালতলায় জানবাজার স্ট্রিটের (এখন, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোড) উপর অবস্থিত। উদ্যানটি নির্মাণের সময় রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর পুরসভাকে বিনামূল্যে জমি দান করেন। দানের শর্ত ছিল এই মর্মে যে উদ্যানটি তাঁদের প্রয়াত পিতা হরকুমার ঠাকুরের নামে নামাঙ্কিত করতে হবে। পুরসভা এই শর্তে জমি গ্রহণ করেছিলেন।

পুরসভা ৬ই জুন ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দের অধিবেশনে তালতলার নবনির্মিত স্কোয়ারটিকে হরকুমারের নামে হরকুমার টেগোর স্কোয়ার নামকরণ করেন।

দর্পনারায়ণ ঠাকুরের পৌত্র ও গোপীমোহন-এর পঞ্চম পুত্র হরকুমার (১৭৯৮-১৮৫৮) অত্যন্ত নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। জীবনযাপন ছিল অত্যন্ত সাধাসিধা, সংস্কৃতে ছিল তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য। বিখ্যাত পণ্ডিত নিমচাঁদ শিরোমণির নিকট বেদান্ত-দর্শন অধ্যয়ন করেন। ইংরেজি শিক্ষা প্রথম শেরবোর্নের স্কুলে। পরে হিন্দু কলেজে। ফরাসি ভাষাতেও তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল। অবাধে ও দ্রুত এই ভাষাতে কথা বলতে পারতেন। তিনি সঙ্গীতশাস্ত্রেও বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

হরকুমারের গ্রন্থাগারটি ছিল বৃহদায়তনের। এই গ্রন্থাগারে তিনি অমূল্য, দুর্লভ সংস্কৃত পুথির সংগ্রহ রেখে গেছেন। তিনি কয়েকখানি প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। সেগুলি— দক্ষিণার্চ্চ-পারিজাত, হরতত্ত্বদীধিতি, পুরশ্চরণ বোধিনী, শিলা চক্রার্থবোধিনী প্রভৃতি। মণিমুক্তার গুণাগুণ নির্ণয়ে তিনি পারদর্শী ছিলেন। ১৮৫৮ খ্রিঃ তিনি পরলোকগমন করেন।

তাঁর দুই পুত্র— মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ও রাজা শৌরীন্দ্রমোহন— রাজনীতি ও সাহিত্য জগতের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ছিলেন তাঁরা।[১০]

**প্যারীচরণ সরকার স্ট্রিট :** ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে সেনেট হাউস ও হেয়ার স্কুলের

মধ্যবর্তী অঞ্চলের মধ্য দিয়ে নতুন একটি রাস্তা তৈরি হয়। ১৮৮৯ খ্রিঃ কলিকাতা পুরসভার কাছে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল স্নাতক এবং স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধিদল লিখিত আবেদনে এই নতুন রাস্তাটি শিক্ষাব্রতী প্যারীচরণ সরকারের নামে নামাঙ্কিত করার অনুরোধ করেন।[১১] ১২ই আগস্ট, ১৮৮৯ পুরসভার জেনারেল কমিটির অধিবেশনে প্রস্তাবটি নিয়ে বিচার-বিবেচনা করার সময় রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের মন্তব্য উল্লেখের দাবি রাখে— ''Although Babu Peary Charan Sirkar had not lived in that locality it was admitted on all hands that he held the first place amongst native educationists in this country ; he was Head Master of the Hare School and also a professor of the Presidency College and he was moreover both the projector and the first Supdt. of the Hindu Hostel. Moreover, no one had thought of putting forward any other name in connection with this new Street.''[১২] ওই দিনই রাস্তাটি 'প্যারীচরণ সরকার স্ট্রিট', নামাঙ্কিত হয়। ১৮৯৮ খ্রিঃ রাস্তাটি আরও ১২ ফুট চওড়া করার ব্যবস্থা করা হয়। এর জন্য সরকারের কাছ থেকে বিনামূল্যে জমি পাওয়া গিয়েছিল।[১৩]

ইংরেজি শিক্ষার প্রথম সোপান ফার্স্ট বুক, সেকেন্ড বুক প্রভৃতি পুস্তক প্রণেতা, প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক, এডুকেশন গেজেটের সম্পাদক ও হিতসাধক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা প্যারীচরণ সরকার (১৮২৩-১৮৭৫) কলিকাতার চোরবাগানে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে হেয়ার সাহেবের পটলডাঙ্গা স্কুলে ও পরে হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। শৈশবে তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। শিক্ষা শেষ করে বারাসত স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে (১৮৪৬-৫৪) খ্যাতিলাভ করেন। পরে কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলের প্রধানশিক্ষক হয়ে আট বছর ছিলেন। তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহে ও প্রচেষ্টায় এই স্কুল ডেভিড হেয়ার সাহেবের নামে 'হেয়ার স্কুল' নামাঙ্কিত হয়। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক হন এবং ওই পদে আমৃত্যু বহাল থাকেন।

শুধু শিক্ষাক্ষেত্রেই নয়, বাংলার নবজাগরণেও তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের জন্য বারাসত ও কলিকাতার চোরবাগানে একাধিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বিধবাবিবাহ প্রচারে বিদ্যাসাগরের সহযোগী ছিলেন। নারী শ্রমিকগণের সন্তানদের শিক্ষার জন্য কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। স্ত্রীশিক্ষা ছাড়া, এ দেশে কৃষি বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। নবীনকৃষ্ণ ও কালীকৃষ্ণ মিত্র এ বিষয়ে তাঁকে প্রভূত সাহায্য করেছিলেন।

পত্রপত্রিকা সম্পাদনে প্যারীচরণ তাঁর গৌরবের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। ১৮৬৬ খ্রিঃ তিনি সরকারি সংবাদপত্র 'এডুকেশন গেজেট'-এর সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেছিলেন। ১৮৬৮ খ্রিঃ পূর্ববঙ্গ রেলপথে যে ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনা হয় তার যথাযথ বিবরণ স্বীয় মন্তব্যসহ প্রকাশ করায় সরকারের সঙ্গে মতানৈক্য হয়। ফলে তিনি এডুকেশন গেজেটের সম্পাদকের পদ পরিত্যাগ করেন।

মদ্যপান নিবারণের জন্য প্যারীচরণ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ১৮৫৭ খ্রিঃ 'বঙ্গীয় মাদক নিবারণী সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। আন্দোলনকে সক্রিয় ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ইংরেজি কাগজ "ওয়েল উইসার" (Well-Wisher) ও বাংলায় "হিতসাধক" পত্রিকা প্রকাশ করে জনসমাজে আলোড়ন তুলেছিলেন। ইডেন হিন্দু হোস্টেল তাঁর আর এক কীর্তি। এই প্রতিষ্ঠানের তিনিই প্রথম কর্ণধার ছিলেন।

শিশুদের ইংরেজি শিক্ষার জন্য তাঁর প্রণীত দুটি পুস্তক 'First Book of Readings' ও 'Second Book of Readings' সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাঁর অসমাপ্ত শেষ গ্রন্থ— 'The Tree of Intemperance'।

প্যারীচরণ সরকারের চরিত্রে এত জ্ঞানের সমন্বয়ের জন্য তাঁকে ''The Arnold of the East'' বলা হয়।

প্যারীচরণের নামে সেকালের কলিকাতার ৩ নম্বর ওয়ার্ডে আরেকটি রাস্তা ছিল— নাম প্যারীচরণ লেন। এ রাস্তাটির ইতিহাসও যেমন আকর্ষণীয় তেমনিই বিতর্কমূলক।

প্যারীচরণ ও তাঁর পরিবারবর্গ বিডন স্ট্রিটের উপর বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে আবাসগৃহ নির্মাণ করেন। অঞ্চলটি ঘিঞ্জি ও ঘনবসতিপূর্ণ হওয়ায় চলাচলের জন্য একটি রাস্তার প্রয়োজন দেখা দেয়। বিংশ

শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে প্যারীচরণ সরকারের দুই পুত্র গিরীন্দ্রনাথ সরকার ও শৈলেন্দ্রনাথ সরকার তাঁদের ৩২/৭ ও ৩২/৭/১, বিডনস্ট্রিটের অংশ বিশেষ থেকে ৩ কাঠা ৫ ছটাক ২৮ স্কোয়ার ফুট জমি বিনামূল্যে রাস্তা নির্মাণের জন্য কলিকাতা পুরসভাকে দান করেন। এই জমি পাবার পর ১২ ফুট চওড়া একটি রাস্তা নির্মিত হয়। রাস্তাটি বিডন স্ট্রিট থেকে শুরু হয়ে উত্তরে প্রসারিত হয়ে কারবালা ট্যাঙ্ক লেনে এসে পড়েছে। রাস্তাটি নির্মিত হলে পর নামকরণের প্রশ্ন দেখা দেয়। প্যারীচরণের পুত্রেরা এই নবনির্মিত রাস্তাটি তাঁদের পিতার নামে নামাঙ্কিত করার প্রস্তাব দেন। কলিকাতা পুরসভার তৎকালীন অ্যাসেসর সুপারিশ করেন যে রাস্তাটির নাম 'সরকার রো' রাখা হোক। তিনি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন যে ৮ নম্বর ওয়ার্ডে প্যারীচরণ সরকারের নামে আরও একটি রাস্তা বর্তমান।

২১শে সেপ্টেম্বর ১৯১৭ খ্রিঃ ডিস্ট্রিক্ট কমিটি বিষয়টি বিবেচনা করে খ্যাতনামা শিক্ষাব্রতী প্যারীচরণ সরকারের নামে প্যারী লেন নামকরণের সুপারিশ করেন। প্রস্তাবটি ১৭ই অক্টোবর ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের পৌর অধিবেশনে বিবেচনার জন্য পেশ করা হয়। সেই সময় রেভারেন্ড কেনেথ এস ম্যাকডোনাল্ডের কিছু প্রাক্তন ছাত্র, বন্ধু এবং তাঁর গুণমুগ্ধ সুধীজন পুরসভার চেয়ারম্যানের কাছে আবেদন রাখেন, নতুন পথটি কেনেথ ম্যাকডোনাল্ডের নামে নামাঙ্কিত করা হোক। যে বাড়িতে এই শিক্ষাব্রতী সমাজসেবী বাস করতেন তার পাশ দিয়ে গেছে নবনির্মিত পথটি। পুরসভা প্রস্তাবটি পুনর্বিবেচনার জন্য ডিস্ট্রিক্ট কমিটির কাছে প্রেরণ করেন।

ডিস্ট্রিক্ট কমিটি ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের অধিবেশনে এই মর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করেন, যেহেতু প্যারীচরণ সরকারের নামে একটি রাস্তা আছে, নতুন রাস্তাটি রেভারেন্ড কেনেথ ম্যাকডোনাল্ডের নামে নামাঙ্কিত করা হোক।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পর যে ক'জন বিদেশি মিশনারি অধ্যাপক বাংলা দেশে এসে এখানকার ধর্ম আন্দোলন ও বহু বিচিত্র সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নিজেদের অঙ্গীভূত করে বাংলাদেশ ও বাঙালিকে ভালবেসেছিলেন কেনেথ এস ম্যাকডোনাল্ড তাঁদের অন্যতম। স্কটল্যান্ডের আর্কুহাট উপত্যকায় মিলটন গ্রামে ১৮৩২ সালের ১৮ই এপ্রিল কেনেথ ম্যাকডোনাল্ডের জন্ম। এম. এ. উপাধি লাভের পর ম্যাকডোনাল্ড ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য এডিনবরার নিউ কলেজে প্রবেশ করেন। ১৮৬১ সালে নিউ কলেজের পাঠ শেষ করে জীবিকার জন্য কাজের সন্ধান করতে থাকেন। এই সময় আলেকজান্ডার ডাফের বক্তৃতা শুনে মিশনারি বৃত্তিতে আগ্রহী হয়ে উঠেন। ফ্রি চার্চ তাঁকে প্রথম মিশনারি নিয়োগ করে ভারতে পাঠান। ম্যাকডোনাল্ড কলিকাতায় এলেন ১৮৬২ সালের ১লা মার্চ। কলিকাতার ফ্রি চার্চ ইনস্টিটিউশনে অধ্যাপক হিসাবে তিনি যোগদান করলেন। কলিকাতায় এসে প্রথমে তিনি রাসেল স্ট্রিটে এবং পরে বৈঠকখানা অঞ্চলে বসবাস শুরু করেন। সর্বশেষে তিনি ৩২/৬, বিডন স্ট্রিটের বাড়িতে উঠে আসেন।

কেনেথ ম্যাকডোনাল্ড ফ্রি চার্চ ইনস্টিটিউশনে ১৯ বছর অধ্যাপনা করেন। কিন্তু তাঁর অধ্যাপক পরিচয়ের থেকেও বড় হয়ে আছে তাঁর বাগ্মিতার ও সমাজসেবার পরিচয়। এর পর কলেজের সংশ্রব ত্যাগ করে তিনি বিডন স্কোয়ারে সন্ধ্যায় নিয়মিত ভাবে খ্রিস্টধর্মীয় বক্তৃতা শুরু করেন। এই বক্তৃতাকে অবলম্বন করে সেকালে এক বিখ্যাত মামলার উদ্ভব হয়। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের ১লা মে কলিকাতা পুরসভার বিনা অনুমতিতে বিডন উদ্যানে সভা করার জন্য পুলিশ তাঁকে বাধা দিতে যায়। পরে বেআইনি জনসমাবেশের জন্য সমন জারি করা হয়। ফলে খ্রিস্টান মিশনারিরা মামলায় জড়িয়ে পড়লেন। এই মামলা সে সময় কলিকাতায় প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এই মামলায় ম্যাকডোনাল্ডের জয় হয়। এর পর হিন্দুধর্ম প্রচারক, ব্রাহ্মসমাজ ও রোমান ক্যাথলিকদের সঙ্গে ধর্মীয় বিবাদবিতর্কের মধ্যে তাঁর মিশনারি পরিচয় প্রকাশ পেলেও শিক্ষাবিদ হিসাবে তিনি অনেক বেশি সম্মান পেয়েছেন। শুধু ফ্রি চার্চ ইনস্টিটিউশনে অধ্যাপনা নয়, কলিকাতার অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (ডবটন কলেজ) প্রভৃতির সঙ্গেও তাঁর প্রত্যক্ষ যোগ ছিল। ১৮৮০ খ্রিঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো এবং ১৮৯৩ খ্রিঃ বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

কলিকাতায় ম্যাকডোনাল্ডের জীবনের যে ৪২ বছর কেটেছে তার একটা বড় অংশ বাঙালি

সমাজের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনের ইতিহাস বলে গণ্য করা যায়। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, প্রসাদদাস মল্লিকের "বড়বাজার গার্হস্থ্য সাহিত্য সমাজের" সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ দিনের যোগাযোগ। সাহিত্য সমাজের দশম বর্ষে (১৮৬৭) তিনি সভাপতি নির্বাচিত হন। তারপর পাঁচ বছর শুধু সভাপতিরূপে নয়, একাধিক প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতার মধ্য দিয়ে তাঁর উৎসাহ ও আগ্রহ প্রকাশ করেন। পরে ভারতে পুনরায় ফিরে এসে বড়বাজার গার্হস্থ্য সাহিত্য সমাজে যোগ দিয়েছিলেন এবং প্রবন্ধ পাঠ করেছেন।

ম্যাকডোনাল্ডের জীবনের অন্যতম প্রধান ব্রত ছিল মদ্যপান নিবারণী সভার প্রচার ও সেই বিষয়ে জনমত গঠন। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক প্যারীচরণ সরকারের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল টেম্পারেন্স সোসাইটির (১৮৬৪) আন্দোলনে যোগদান করেন। তিনি ও কেশবচন্দ্র সেন এই সভার সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। এই আন্দোলনকে সফল করার জন্য হিন্দু, ব্রাহ্ম ও খ্রিস্টান নেতারা সমবেতভাবে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেন তার ফলে বাঙালি শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে মদ্যপানের অভ্যাস অনেকটা কমে যায়। এ ছাড়া প্রকাশ্য স্থানে অশ্লীলতা নিবারণের জন্য আন্দোলন, ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন, ইলবার্ট বিলের সমর্থনে আন্দোলন প্রভৃতিতে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণের জন্য ম্যাকডোনাল্ডের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। শুধু তাই নয়, বিখ্যাত শালগ্রাম শিলা মামলার সময়েও তিনি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থক ছিলেন।

১৯০৩ সালের ৩০শে জুলাই যখন ম্যাকডোনাল্ড পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন তখন কলিকাতার শুধু খ্রিস্টান সমাজ বা কলেজের ছাত্ররা নয়, বৃহত্তর বাঙালি সমাজ গভীর শোকে মুহ্যমান হয়েছিল।

তাই ৩১শে জুলাই ১৯০৩ খ্রিঃ প্রকাশিত ''Bengalee'' পত্রিকায় ম্যাকডোনাল্ডের স্মৃতির উদ্দেশে যে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পিত হয়েছিল তারই কিয়দংশ হল— ".....his memory will be cherished lovingly and reverentially, as that of a white Rishi, for many years to come.''[১৪]

এমনই এক বাংলা ও বাঙালিপ্রেমী শ্বেতকায় ঋষির জন্য পুরসভা ১২ ফুট চওড়া সরু গলির নাম ম্যাকডোনাল্ড লেন নামাঙ্কিত করে যথার্থ কাজ করেছিলেন। কিন্তু বাদ সাধলেন প্যারীচরণ সরকারের পুত্রেরা।

কলিকাতা পৌরসভার আইন অনুসারে ম্যাকডোনাল্ড লেন নামকরণের প্রস্তাবে জনসাধারণের কোনও আপত্তি আছে কি না, তা জানতে চেয়ে এই মর্মে যখন সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হল তখন প্যারীচরণ সরকারের দুই পুত্র গিরীন্দ্রনাথ সরকার ও শৈলেন্দ্রনাথ সরকার লিখিত আবেদনে জানালেন যে তাঁরা ওই রাস্তা নির্মাণের জন্য বিনামূল্যে কলিকাতা পুরসভাকে এক শর্ত সাপেক্ষে চুক্তিপত্রের মাধ্যমে জমি দান করেছিলেন। শর্ত ছিল পথটি নির্মাণের পর তাঁদের স্বর্গত পিতা অধ্যাপক প্যারীচরণ সরকারের নামে নামাঙ্কিত করতে হবে। যদি তা না করা হয় তবে তাঁরা আইনের আশ্রয় নিয়ে জমির মূল্য আদায় করবেন।

এ ছাড়া ডি. সি. মিত্র এবং ৩৯ জনের স্বাক্ষর করা এক যৌথ আবেদনে রাস্তাটির নাম প্যারীচরণ সরকার লেন অথবা রো রাখার আবেদন রাখা হয়।[১৫]

অবশেষে সমস্ত বিষয়টি খতিয়ে দেখে এবং কিছুটা নিরুপায় হয়ে পুরসভা তাঁদের পূর্বের প্রস্তাব পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ৮ই মে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের অধিবেশনে রাস্তাটির নাম প্যারীচরণ লেন করা হয়।[১৬] রাস্তাটি নির্মাণে মোট খরচ হয়েছিল ১৪,৮৪৪ টাকা, তার মধ্যে জমি অধিগ্রহণের জন্য ৭০৮৫ টাকা এবং রাস্তা নির্মাণের জন্য ৭৭৫৯ টাকা।[১৭] ১৯২০ খ্রিঃ রাস্তাটি উন্নত ও প্রশস্ত করার জন্য আরও ৩৯৮৫ টাকা ব্যয় করা হয়।[১৮]

এদিকে প্যারীচরণ লেন নিয়ে ডাক বিভাগের চিঠি বিলিতে গোলমাল দেখা দেয়। তিন নম্বর ওয়ার্ডে প্যারীচরণ লেন ও প্যারী সুর লেন এবং ৮ নম্বর ওয়ার্ডে প্যারী সরকার স্ট্রিট থাকায় এই জটিলতা তীব্রভাবে বৃদ্ধি পায়। এই সমস্যা সমাধানকল্পে রাস্তাটির পুনর্নামকরণ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। অবশেষে ৮ই মার্চ ১৯২২ খ্রিঃ কলিকাতা পুরসভা রাস্তাটির নামকরণ করেন 'প্যারী রো'।[১৯] আজও এই নাম বহাল আছে।

প্যারীচরণ সরকারের ভ্রাতুষ্পুত্র ডাক্তার ভুবনমোহন সরকারের নামে চোরবাগানে একটি রাস্তা

আছে, সে কথায় আমরা এবার আসছি।

এই পথটি ১৮৮৯ খ্রিঃ খোলা পয়ঃপ্রণালী ভরাট করে নির্মিত হয়। সিমলা স্ট্রিটের ধার বরাবর আরম্ভ হয়ে মুক্তারামবাবু স্ট্রিটের পূর্ব প্রান্তে এসে নতুন রাস্তাটি পড়েছে। এটি খুবই সংকীর্ণ। মাত্র ৯ ফুটের মতো চওড়া। রাস্তাটি হওয়ায় পদযাত্রীদের খুব সুবিধা হয়। রাস্তাটি সেকালের ওই পল্লীর চিকিৎসক ভুবনমোহন সরকারের বাসভবনের পূর্ব ধার দিয়ে প্রসারিত।

কলিকাতা পুরসভার ওই অঞ্চলের ইঞ্জিনিয়ার চেয়ারম্যানের কাছে একটি প্রতিবেদনে জানান যে ডাক্তার ভুবন সরকারের ঐকান্তিক আগ্রহ ও প্রয়াসের ফলে এই অঞ্চলের পৌর স্বাস্থ্যনীতি রূপায়ণ সম্ভব হয়েছিল। তিনি প্রস্তাব করেন রাস্তাটি ডাক্তার সরকারের নামে নামাঙ্কিত হোক। কলিকাতা পুরসভা ৬ই জুন ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দের অধিবেশনে এই প্রস্তাব অনুমোদন করেন।

ডাক্তার ভুবনমোহন সরকার (১৮৩৮-১৯১১) চোরবাগানের সরকার পরিবারের সন্তান। শিবরাম সরকার এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি হুগলি জেলার তড়াগ্রামে বাস করতেন। ১৭৯১ সালে গ্রাম ছেড়ে তিনি কলিকাতায় আসেন এবং চোরবাগানের মুক্তারামবাবু স্ট্রিটে একটি বাড়ি কিনে বসবাস শুরু করেন। শিবরামের পুত্র ভৈরবচন্দ্রের চার পুত্র— পার্বতীচরণ, প্রসন্নকুমার, প্যারীচরণ এবং রামচন্দ্র। পার্বতীচরণের পুত্র হলেন ডাক্তার ভুবনমোহন সরকার। পিতার অকালমৃত্যু হওয়ায় কাকা প্যারীচরণের স্নেহ ও যত্নে লালিতপালিত হন।

ভুবনমোহনের জন্ম কলিকাতায় ৪ জানুয়ারি ১৮৩৮ খ্রিঃ। প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষালাভ, পরে ১৮৫৬ সালে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে এল. এম. এফ. পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে চিকিৎসাবৃত্তিতে প্রবৃত্ত হন। অল্পকালের মধ্যে শহরের খ্যাতিমান চিকিৎসকরূপে তিনি গণ্য হন। প্যারীচরণের মৃত্যুর পর তিনি 'বেঙ্গল টেম্পারেন্স সোসাইটির' সম্পাদক হন। প্রতিষ্ঠানটি পরে উঠে যায়। চোরবাগানের স্বগৃহে তিনি একটি বালিকা বিদ্যালয় পরিচালনা করতেন। তিনি ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটির সদস্য ছিলেন। এ ছাড়া দীর্ঘদিন ওই অঞ্চলের পৌরপ্রতিনিধিত্ব করেছিলেন (১৮৭৬ থেকে ১৮৯৮)। পল্লীর শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক হয়ে শুধু বিনা পারিশ্রমিকে চিকিৎসাই করেননি, প্রয়োজনে দুঃস্থ রোগীদের অর্থ সাহায্যও করেছেন।

রিপন লেন কলিকাতার একটি প্রাচীন পথ। সেকালে এটির নাম ছিল অ্যানিস বারবার লেন। পরবর্তীকালে এ অঞ্চলে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা বসবাস শুরু করায় এ অঞ্চলের কৌলীন্য বৃদ্ধি পায়। পুরানো অ্যানিস বারবার নামের মধ্যে সম্ভ্রমের কোনও চিহ্ন নেই। তাই ওই অঞ্চলের বাসিন্দারা পুরসভার কাছে রাস্তাটি নতুন নামে নামাঙ্কিত করার আবেদন রাখেন। তাঁরা রাস্তাটির নাম রিপন লেন অথবা প্রিমরোজ লেন (Primrose Lane) নামকরণ করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। রাস্তার নামের মাহাত্ম্যের সঙ্গে সম্পত্তির মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনার কথাও তাঁরা ভেবে রেখেছিলেন। পুরসভা তাঁদের ১৪ই ডিসেম্বর ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দের অধিবেশনে অ্যানিস বারবার নাম পরিবর্তন করে বড়লাট লর্ড রিপনের নামে 'রিপন লেন' নামকরণ করেন। এই নামকরণ একদল বাসিন্দাদের মনঃপূত হয়নি। তাঁদের মতে কলিকাতার জনপ্রিয় প্রাচীন পথের নাম বদল করা ঠিক হয়নি। তাঁরা এই মর্মে প্রস্তাব দিলেন যে, "বারবার" শব্দটি বাদ দিয়ে অ্যানিস লেন রাখা হোক, পুরসভা এই প্রস্তাবে সম্মত হননি।[২০]

১৯১৩ খ্রিঃ পুরসভা মৌলভী বাজলার রহমন স্ট্রিটকে রিপন লেনের অঙ্গীভূত করেন।[২১] ফলে রিপন লেন রিপন স্ট্রিট (বর্তমানে মুজফ্‌ফর আমেদ স্ট্রিট) থেকে আরম্ভ হয়ে দক্ষিণে এগিয়ে ইলিয়ট রোডে এসে পড়েছে।

লর্ড রিপন (১৮২৭-১৯০৯) ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল ছিলেন (১৮৮০-৮৪ খ্রিঃ)। তাঁর পুরো নাম ছিল জর্জ ফ্রেডরিখ স্যামুয়েল রবিনসন, মারকুইস অফ রিপন। ভারতবাসীদের প্রতি তাঁর নীতি ছিল উদার ও বন্ধুত্বপূর্ণ। কারখানা আইন প্রবর্তন করে শিশুদের বয়স ও কাজের ঘণ্টা নির্দিষ্ট করে দেন। লর্ড লিটনের আরোপিত দেশীয় সংবাদপত্র আইন বাতিল করে দেন। শিক্ষিত ভারতবাসীদের শাসনকার্যে অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ করে দিয়েছিলেন তিনি। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক

শিক্ষা প্রসারের জন্য হান্টার কমিশন নিয়োগ করেন। মূল্যবৃদ্ধির কারণ ছাড়া ভূমিরাজস্ব বৃদ্ধি করা হবে না— এই নীতি ঘোষিত হওয়াতে কৃষক সম্প্রদায় উপকৃত হয়। তাঁর আমলে ইলবার্ট বিল পাশ হওয়াতে শ্বেতাঙ্গ সমাজ তুমুল আন্দোলন শুরু করে। অবশেষে তাঁকে নতি স্বীকার করতে হয়। কার্যকাল শেষ হবার এক বছর পূর্বেই পদত্যাগ করেন। ভারতে জাতীয় আন্দোলনের দুই নেতা রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ও মহামতি গোখলে রিপনের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।[২২]

**চোরবাগান লেন। চোরবাগান সেকেন্ড লেন :**

সেকালের কলিকাতায় চোরবাগান অঞ্চল দিয়ে যাবার সময় গঙ্গা-স্নানার্থীদের সর্বস্ব লুটপাট করে নিত চোর ডাকাতের দল। তখন থেকেই এই স্থানটির কলঙ্ক আর ঘুচল না। লটারি কমিটির দৌলতে এ অঞ্চলে লম্বা রাস্তা "ঠনঠনিয়া স্ট্রিট" (পরবর্তীকালের, কর্নওয়ালিস স্ট্রিট) তৈরি হল। ধীরে ধীরে জনবসতি গড়ে ওঠায় চোর ডাকাতেরা এখান থেকে পাততাড়ি গোটায়। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে স্থান মাহাত্ম্যের পরিচয়কে স্মরণীয় করে রাখার জন্য এ অঞ্চলের একটি প্রধান রাস্তার নামকরণ করা হয়েছিল চোরবাগান লেন। ১৯৮২ সালে চোরবাগান লেনের নাম বদল করে অগ্নিযুগের বিপ্লবী অমর বসুর নামে 'অমর বসু সরণি' করা হয়। উত্তর কলিকাতা কংগ্রেস স্থাপনে অন্যতম পথিকৃৎ, সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সহযোগী এবং সিমলা ব্যায়াম সমিতির সঙ্গে আজীবন যুক্ত অমর বসুর (১৮৯১-১৯৭৫) আদর্শ ও নিষ্ঠা চিরস্মরণীয়।

চোরবাগানের কাছেই ছিল এক জমজমাট বাজার। শোনা যায় সেকালে তার নাম ছিল সখেরবাজার। কিন্তু সে নাম কবে বিলুপ্তির আড়ালে গা ঢাকা দিয়েছে।

আজকের মুক্তারামবাবু স্ট্রিটের উত্তর অঞ্চলটি চোরবাগান, আর সখেরবাজার ছিল এরই আশেপাশে।

এরপর চোরবাগান সেকেন্ড লেনের কথা। ১৮৮৯ খ্রিঃ ৬৮নং মুক্তারামবাবু স্ট্রিটের পাশ দিয়ে নতুন সরু একটি গলিপথ নির্মাণ করা হয়। চেয়ারম্যান এই গলিপথের নামকরণ করার এক প্রস্তাব আনেন। ওই অঞ্চলের পৌরপ্রতিনিধি ডাঃ ভুবনমোহন সরকার গলিটির নাম কায়স্থপাড়া লেন রাখার আবেদন করেন। তিনি বলেন বর্তমানে ওই গলিতে কায়স্থরা বসবাস করেন। কাজেই কায়স্থপাড়া লেন নামকরণ করলে রাস্তার নামের যৌক্তিকতা প্রমাণিত হবে। কিন্তু অন্য এক পৌরপ্রতিনিধি উমাকান্ত সেন এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন ও গলিটির নাম চোরবাগান লেন রাখার প্রস্তাব দেন। যেহেতু চোরবাগান লেন নামে একটি রাস্তা বর্তমান, তাই ওই প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। অবশেষে গলিটির নাম চোরবাগান সেকেন্ড লেন রাখা হয় (১লা মার্চ ১৮৯০ খ্রিঃ)।[২৩]

চোরবাগান সেকেন্ড লেন খুবই সঙ্কীর্ণ রাস্তা, মাত্র ৫ থেকে ৬ ফুটের মতো প্রশস্ত। ৩০শে জুন ১৯৩২ খ্রিঃ রাস্তাটির নাম বদল করে 'রামচন্দ্র চ্যাটার্জী লেন' করা হয়।

রামচন্দ্র চ্যাটার্জী ছিলেন ওই পল্লীর বাসিন্দা, আদি বাড়ি ছিল ২৪ পরগনা জেলার নারায়ণপুর গ্রামে। দরিদ্র ঘরের সন্তান হয়েও নিজ পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের বলে বিশাল সম্পত্তির মালিক, পরে এক বিদেশি সওদাগরি অফিসে বেনিয়ান নিযুক্ত হন এবং তাঁর মাসিক আয় দাঁড়ায় ৫০০০ টাকা। মুক্তরামবাবু স্ট্রিটে নিজস্ব ভবন নির্মাণ করেন এবং ১৮৮১ খ্রিঃ কর্ম থেকে অবসর নেবার পর ওই বাড়িতে বসবাস করেন। ১৯০৮ খ্রিঃ ১০০ বছর বয়সে রামচন্দ্র পরলোকগমন করেন। শোনা যায় চোরবাগান সেকেন্ড লেন নির্মাণের সময় $\frac{৩}{৪}$ অংশ জমি কৃষ্ণদাস পালের অনুরোধে বিনামূল্যে তিনি পুরসভাকে দান করেছিলেন। কিন্তু পুরসভায় তার কোনও প্রমাণ নেই।[২৪]

এইভাবে চোরবাগান লেন ও চোরবাগান সেকেন্ড লেনের নতুন নামকরণের মাধ্যমে অঞ্চলের কলঙ্কমোচন করা হলেও আজও এই স্থানটি চোরবাগান নামে খ্যাত।

**মারকুইস লেন :**

পূর্বে এই রাস্তাটির নাম ছিল মিসরী খানসামা লেন। সেকালের কলিকাতায় খানসামাদের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও প্রতিপত্তি সম্বন্ধে নিমু খানসামা লেন প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

মারকুইস লেন নামে রাস্তাটি খুব ছোট, মারকুইস স্ট্রিট থেকে আরম্ভ হয়ে সোজা উত্তরে এগিয়ে পরে পূর্বদিকে বাঁক নিয়ে মির্জা মেহেন্দী লেনে এসে পড়েছে।

মিসরী খানসামা লেনে ধীরে ধীরে ইউরোপীয়দের বসবাস শুরু হয়। তারা তখন এই রাস্তাটির নতুন নামকরণে তৎপর হয়। যৌথ আবেদনের ভিত্তিতে পুরসভার চেয়ারম্যানের কাছে দাবি জানানো হয়। পুরসভা জেনারেল কমিটি ৮ই মার্চ ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের সভায় আবেদনটি বিচার-বিবেচনা করে মিসরী খানসামা লেনের নাম বদল করে 'মারকুইস লেন' রাখেন। [২৫]

কে এই মারকুইস সাহেব ? পুরসভার নথিপত্রে এর কোনও উল্লেখ নেই। কটন সাহেব লিখেছেন, ''Ripon Street, Ripon Lane, Marquis Street and Marquis Lane, which are in the immediate vicinity, are named after the Viceroy who govorned India from 1880 to 1884, and who is now (1906) a member of Sir Henry Campbell—Bannermanis Goverment.''[২৬] কটন সাহেবের এই লেখা থেকে স্পষ্ট অনুমিত হয়, গভর্নর জেনারেল লর্ড রিপনের নামেই মারকুইস লেন নামাঙ্কিত হয়েছে। একটা বিষয় সুস্পষ্ট যে সেসময় একই ব্যক্তির নামে চারটি পথ নামাঙ্কিত হবার কোনও বাধা ছিল না।

**মতিলাল শীল স্ট্রিট :**

ধর্মতলা অঞ্চলে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে মতিলাল শীলের পুত্র হীরালাল শীলের ধর্মতলা মার্কেট ছিল। কলিকাতা পুরসভার চেয়ারম্যান স্যার স্টুয়ার্ট হগ-এর হাতে গড়া হগ মার্কেটকে জনপ্রিয় করার জন্য ধর্মতলা মার্কেট অধিগ্রহণের ব্যবস্থা হয়। এই প্রসঙ্গ নিয়ে হীরালাল শীলের সঙ্গে হগ সাহেবের বিরোধ তো ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হয়ে আছে। বিষয়টির সমাধানের সূত্র অবশেষে পাওয়া যায়। হীরালাল শীল ৭ লক্ষ টাকায় পুরসভাকে ধর্মতলা মার্কেট বিক্রি করতে সম্মত হন। এর ফলে নিউ মার্কেট জমে ওঠে আর ধর্মতলা মার্কেট উঠে যায়। সেই জায়গাটা টুকরো টুকরো করে ঘরবাড়ি নির্মাণের জন্য বিক্রি করে দেওয়া হয়। জমি ভাগ করার সময় তার মধ্যে দিয়ে একটা রাস্তা তৈরি হয়। কালীনাথ মিত্র ছিলেন এক পুরপ্রতিনিধি। তাঁরই সুপারিশে পুরপ্রতিষ্ঠানের সাধারণ সভা ৮ই মার্চ ১৮৯০ খ্রিঃ এই নবনির্মিত রাস্তাটির নাম হীরালাল শীলের পিতা মতিলাল শীলের নামে মতিলাল শীল স্ট্রিট নামকরণ করেন। [২৭]

বিংশ শতাব্দীর তিনের দশকে রাস্তাটি প্রশস্ত করার ভার গ্রহণ করেন কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা। এটিকে তাঁরা স্কিম (Scheme) নম্বর XXXI-এর অন্তর্ভুক্ত করেন। ১৯৩২ খ্রিঃ মতিলাল শীল স্ট্রিটকে চওড়া করে প্রথমে ৪৫ ফুট করা হয়। পরে ১৯৩৫ খ্রিঃ এর প্রস্থ বৃদ্ধি করে ৬০ ফুট করা হয়। সে সময় রাস্তাটির নাম সংক্ষেপ করে 'মতি শীল স্ট্রিট' করা হয়। [২৮] আজও এই নাম বহাল আছে।

নিমাই মল্লিকের উদ্যোগে আঠারো শতকে যে বাণিজ্যিক বনিয়াদ তৈরি হয় কর্মযোগী মতিলাল শীল (১৭৯২-১৮৫৪) তাঁর ক্রান্তিকারী প্রচেষ্টায় তাকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করেন এবং উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত তার স্থায়িত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। শোনা যায় এক সময় তিনি কলুটোলা থেকে সস্তায় ছিপি-বোতল কিনে তা বিক্রি করে কিছু অর্থ সঞ্চয় করেন। এইভাবে সংগৃহীত মূলধন তিনি আমদানি-রপ্তানির ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করেন।

মতিলাল তাঁর কর্মজীবনের প্রথমে ফোর্ট উইলিয়ামে নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদি সরবরাহ করতেন। পরে বালিখালের কাস্টমস দারোগা হন। ১৮২০ থেকে ১৮৩৪ খ্রিঃ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে মুৎসুদ্দির কাজ করেন। প্রথমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মধ্যবর্তী হিসাবে ও পরে নিজে আমদানি-রপ্তানির ব্যবসা করে মতিলাল ১২/১৩ খানি জাহাজ ক্রয় করেন। তাঁর নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল "অসোয়াল্ড শীল অ্যান্ড কোং"। তাঁর 'রাজরানী' ইত্যাদি নামের জাহাজ ইউরোপ ও দূর প্রাচ্যে পাড়ি দিত। উপকূল বাণিজ্যে টাগ স্টিমারের বহুল প্রচলন তাঁর বাণিজ্যিক প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছে।

বাণিজ্যে লক্ষ্মী লাভ মতিলালকে সমাজে বরেণ্য করেছে। তিনিও সেই অর্থ অকুণ্ঠভাবে সৎ

কাজে ব্যয় করেছিলেন। সাধারণ গৃহস্থের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রথমে শীলস্ স্কুল স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়ের বেতন ছিল মাত্র এক টাকা। পরে তিনি বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ করে দেন এবং এটি পরে কলেজে রূপান্তরিত হয়। রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের মতো তিনিও বেলঘরিয়ায় এক অতিথিশালা স্থাপন করেন। কলিকাতার মেডিকেল কলেজ মতিলালের দেওয়া জমির উপর প্রতিষ্ঠিত। অন্য দিকে বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলনের একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। প্রথম বিধবাবিবাহকারীকে ২০ হাজার টাকা পুরস্কার দেবার অঙ্গীকার করেছিলেন। গঙ্গাতীরে সাধারণের স্নানের জন্য একটি ঘাট নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। এটি মতি শীলের ঘাট নামে পরিচিত। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের ২০শে মে তিনি পরলোকগমন করেন।[২৯]

**অভয় মিত্র স্ট্রিট :**

চিৎপুর রোড থেকে নন্দরাম সেন স্ট্রিট পর্যন্ত নতুন একটা রাস্তা নির্মিত হলে পর ওই অঞ্চলের ওয়ার্ড কমিশনার চেয়ারম্যানের কাছে অনুরোধ করেন নতুন রাস্তাটি অভয়চরণ মিত্রের নামে নামকরণ করা হোক। সেইমত পুরসভার সাধারণ সভার ৩১শে মে ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে অধিবেশনে রাস্তাটির নাম অভয় চরণ মিত্র স্ট্রিট রাখা হয়। পরে যখন রাস্তার নামকে সংক্ষিপ্ত করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে, সেই সময় পুরসভা তাঁদের ১৯শে মার্চ ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের অধিবেশনে অভয় চরণ মিত্র স্ট্রিটকে ছোট করে 'অভয় মিত্র স্ট্রিট' করেন।

কলিকাতার জমিদার হলওয়েল সাহেবের সময় প্রথম ব্ল্যাক ডেপুটি ও কুমারটুলির মিত্র বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোবিন্দরামের পৌত্র রঘুনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র হলেন রাধাচরণ মিত্র। রাধাচরণের দুই বিবাহ। প্রথম পক্ষের ছিল এক পুত্র আর দ্বিতীয় পক্ষের দুই পুত্র। তাঁদের একজন হলেন অভয়চরণ। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং বিশেষ কর্মদক্ষ। ২৪ পরগনার ও সীমপুরের কালেক্টরের দেওয়ান ছিলেন অভয়চরণ। পূর্বপুরুষদের ন্যায় তিনিও রাজকীয় জাঁকজমকের সঙ্গে দুর্গাপূজা ও কালীপূজা করতেন। শোনা যায় তাঁর গুরুদেবকে তিনি এক লক্ষ টাকা দান করেন। প্রখ্যাত ধনী নিমাইচরণ মল্লিক ও বৈষ্ণবচরণ মল্লিকের সঙ্গে অভয়চরণের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। অভয়চরণ ও তাঁর কাকা কৃষ্ণচরণের মধ্যে দেওয়ানি বিরোধ বাধলে, নিমাইচরণ ও বৈষ্ণবচরণকে সালিসি মানা হয়। তাঁদের রায়ে অভয়চরণ বিপুল পরিমাণ অর্থ লাভ করেন।[৩০]

আপার চিৎপুর রোডের (রবীন্দ্র সরণি) উপর অবস্থিত সিদ্ধেশ্বরীকালী মন্দির। এই মন্দিরে পলাশী আমলের পরও নরবলি হত। সেকালের সরকারি গেজেটে এর উল্লেখ আছে। পরবর্তীকালে অভয়চরণ মিত্র বর্তমান দেবস্থানটি নির্মাণ করে দেন।

১৮০৮ খ্রিঃ অভয়চরণ মীনপুরীতে দেহত্যাগ করেন।

**পার্শীবাগান লেন :**

বাদুড়বাগান সেকেন্ড লেন এবং নর্দার্ন সারকুলার রোডের মধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর আটের দশকে যে নতুন রাস্তাটি নির্মিত হয় তার নামকরণের একটি প্রস্তাব পুরসভার বিবেচনার জন্য আসে। রাস্তাটি রুস্তমজী পার্শীর বাগানের পাশ দিয়ে প্রসারিত হয়েছিল। লোকে এটিকে পার্শীবাগান বলত। পুরসভা তাঁদের ৩রা জুলাই ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের অধিবেশনে নতুন রাস্তাটির নামকরণ করেন 'পার্শীবাগান লেন।'[৩১]

পার্শীবাগানের ইতিহাস সত্যই খুব আকর্ষণীয়। উদ্যানটি সম্ভবত ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে নির্মিত হয়ে থাকবে। এই বাগানের নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সেকালের কলিকাতার প্রসিদ্ধ শিল্পপতি ও সমাজসেবী রুস্তমজী কাওয়াসজীর (১৭৯২-১৮৫২) নাম। তিনি প্রথম কলিকাতায় আসেন ১৮০৬ খ্রিঃ। বেশি দিন থাকেননি এখানে। ফিরে গেলেন বোম্বাইতে কিছুদিন পরে। দ্বিতীয়বার কলিকাতায় আসেন ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে। এরপর কলিকাতায় রয়ে গেলেন। নানা ব্যবসার মাধ্যমে অর্থ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। জাহাজ ব্যবসায়ে তিনি ছিলেন প্রবাদপুরুষ, অনেকগুলি জাহাজের কেবল মালিকই ছিলেন না, এই দেশে জাহাজ নির্মাণ কারখানা স্থাপনেও অগ্রণী ছিলেন।

তিনি শুধু মানবদরদী ছিলেন তাই নয় একজন কলিকাতাপ্রেমীও বটে। কলিকাতার নানান জনহিতকর কাজে সর্বদা উৎসাহদান তাঁর চরিত্রের এক উজ্জ্বল দিক। কলিকাতার উন্নয়নে রুস্তমজীর দান অপরিসীম। কলিকাতার ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটি মারফত দুঃস্থশালা নির্মাণ আইন ও ভ্যাগ্রান্ট আইন বিধিবদ্ধ করার জন্য আন্দোলন করেন। কলিকাতার জলকষ্ট নিবারণ, পয়ঃপ্রণালী সংস্কার, অগ্নি নির্বাপণের ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে বহু অর্থ ব্যয় করেন।

আপার সারকুলার রোডে ছিল রুস্তমজীর প্রাসাদোপম অট্টালিকা। গৃহপ্রবেশের দিনে সেখানে এক বড় রকমের বল নাচের ব্যবস্থা করা হয়। গর্ভনর জেনারেল লর্ড অকল্যান্ড সেই উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন। এই উদ্যান ভবনের নাম তারপর থেকে হয় পার্শীবাগান। অঞ্চলটিও ওই নামেই পরিচিতি লাভ করে।[৩২]

ঋষি রাজনারায়ণ বসু তাঁর আত্মচরিতে হিন্দুমেলা প্রসঙ্গে এই পার্শীবাগানের উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "১৮৭৫ সালে যে মেলা হয় তাহার সভাপতির কার্য আমি সম্পাদন করি। ওই মেলা কলিকাতার পার্শীবাগান নামক বিখ্যাত উদ্যানে হয়েছিল। এই মেলা উপলক্ষে বরদাবাসী সুবিখ্যাত গায়ক মৌলাবক্সের গান হয় এবং যশোহরের নড়ালবাসী জমিদার রায়চরণ রায় ব্যাঘ্র শিকারে নৈপুণ্যের জন্য এক স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হয়েন। আমি সভাপতি স্বরূপে ওই পদক তাঁহার গলায় পরাইয়া দিই।"

পার্শীবাগানে হিন্দুমেলার নবম অধিবেশন হয়েছিল। অধিবেশনের তারিখ ছিল ১১ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৫।[৩৩]

এখন যেখানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ রয়েছে, তার পাশের রাস্তাটির নাম 'পার্শীবাগান লেন'— রুস্তমজী কাওয়াসজীর বাগানবাড়ির স্মৃতি রক্ষা করে চলেছে।

"ক্যালকাটা আরবিট্রারি ক্লাবের" কথা উল্লেখ না করলে পার্শীবাগানের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এটি স্থাপিত হয়েছিল রাজশেখর বসুর পৈতৃক বাড়ি ১৪নং পার্শীবাগান লেনে। এই বাড়িতেই ক্লাবের আড্ডা বসত। পরে এই ক্লাবের নাম হয় 'উৎকেন্দ্র সমিতি'। এই আড্ডায় জলধর সেন, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ সত্য রায়, ডঃ দ্বিজেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ অংশগ্রহণ করতেন। রাজশেখর বসুর "গড্ডালিকার" গল্পগুলি এই আড্ডায় প্রথম পড়া হয়েছিল। শিল্পী যতীন্দ্রকুমার সেন ছিলেন এই সমিতির সভাপতি। রাজশেখর বসুর দুই ভাই শশিশেখর ও গিরীন্দ্রশেখরও আড্ডায় অংশ নিতেন। মাঝে মাঝে উৎকেন্দ্র সমিতির অধিবেশনে এসেছেন যদুনাথ সরকার, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ বিরজাশঙ্কর গুহ, শিল্পী পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, শিল্পী পুলিনচন্দ্র কুণ্ডু।[৩৪]

উৎকেন্দ্র সমিতির অধিবেশনগুলিতে যতীন্দ্রকুমার সেন নিজ হাতে চা তৈরি করে সকলকে পরিবেশন করতেন। এখানে চা, দাবা ও তাসের সঙ্গে সাহিত্য, শিল্প, কাব্য, মনস্তত্ত্ব, বিজ্ঞান, পুরাণ ও ইতিহাস আলোচনা হত। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রাচীন বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে দু'দিন আলোচনা করেছিলেন। গিরীন্দ্রশেখরের "স্বপ্ন" (১৩৩৫) গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি এখানেই প্রথম পড়া হয়। রাজশেখর বসু তখন মানিকতলায় বেঙ্গল কেমিক্যালের কারখানা সংলগ্ন বাড়িতে থাকতেন। প্রতি রবিবার তিনি পার্শীবাগানে আসতেন এই আড্ডার আকর্ষণে। ১৪ নম্বর পার্শীবাগানের উৎকেন্দ্র সমিতির এই আড্ডাই পরশুরামের গল্পের ১৪ নম্বর হাবসিবাগান রূপে আমাদের কাছে পরিচিত।

উৎকেন্দ্র সমিতির সভ্যবৃন্দ দু'বার পরশুরামের 'চিকিৎসা সঙ্কট' অভিনয় করেছিলেন। প্রথমবার রামমোহন লাইব্রেরি হলে, দ্বিতীয়বার ইউনির্ভাসিটি ইনস্টিটিউট হলে। এটির নাট্যরূপ দিয়েছিলেন যতীন্দ্রকুমার সেন। বাংলা ১৩৩৫ সনে "চিকিৎসা সঙ্কট" নাটিকারূপে প্রকাশিত হয়।[৩৫]

**ফিয়ারস্ লেন :**

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৩৪৫-এর (১৯৩৮) সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় "কলিকাতা নামের ব্যুৎপত্তি" শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। ওই প্রবন্ধের এক স্থানে চুনাগলি

সম্বন্ধে আলোকপাত করেছেন। চুনাগলি ইংরাজিতে হয়েছে চুনামগলি। চুনাগলি, চুনারীতলাতে চুনারী বা চুনের কাজ হত বলে ওই পেশার লোকেরা ওখানে বাস করত। এখন যেমন শাঁখারিটোলাতে এক ঘরও শাঁখারি নেই, তেমনি চুনাগলি, চুনারীতলা থেকে চুনারীদের অস্তিত্ব অনেককাল আগেই লোপ পেয়েছে। কিন্তু আঠারো শতকের শেষভাগেও তাদের অধ্যুষিত পল্লীর নাম তাদের স্মৃতি বহন করে চলেছিল এবং চুনাগলির রাস্তা ও পল্লীর নামে এখনও তাদের ব্যবসায়ের স্মৃতি জড়িত রয়েছে।

কিন্তু রাধারমণ মিত্র সুনীতিবাবুর সঙ্গে একমত হতে পারেননি। তিনি "কলিকাতা দর্পণে" লিখেছেন যে অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রস্তুত সর্বশেষ আপজন সাহেবের কলিকাতার মানচিত্রে চুনাগলির কোনও উল্লেখ নেই।

চুনাগলিতে এক সময় কালো ফিরিঙ্গীদের (অর্থাৎ পর্তুগীজ বা অন্য ইউরোপীয়দের সহিত মিশ্রিত দেশীয় খ্রিস্টানদের) বাসস্থান ছিল বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। এইসব কালো ফিরিঙ্গিদের বলা হতো চুনো-ফিরিঙ্গি। এই ফিরিঙ্গিরা ওই গলিতে বাস করত বলে ওই গলির নাম চুনাগলি হয়েছিল।

অন্যদিকে কটন সাহেব লিখেছেন যে ১৭৫২ খ্রিঃ হলওয়েল সাহেব কলিকাতার জমিদার হবার পর কোম্পানির ডিরেক্টরদের নির্দেশে এক আদেশ জারি করেছিলেন— "...Many of the Streets are called after the occupations of the former residents and date from the period when Holwell under the Directors' order, allotted separate districts to the Company's workmen. Of such are Suriparah (the place of the wine sellers), Maidapatty (the flour-market), Colootollah (the place of oilmen), Chuttarparah (the place of carpenters), Chunam Gully (Lime Lane), Molunga (the place of the salt works), Aheeritollah (cowherds' quarter), Coomartolly (potters' quarter)"[৩৬]

কটন সাহেবের এই বিবরণের সঙ্গে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্যের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। চুনাগলি চুনের জন্য প্রসিদ্ধ এবং পথটি অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পর নির্মিত হয়েছিল।

কলিকাতা পুরসভা ১৮৮৯-৯০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে চুনাগলির নাম পরিবর্তন করে বিচারক ফিয়ারের নামে 'ফিয়ারস্ লেন' নামকরণ করেন।[৩৭]

স্যার জন বাড ফিয়ার (১৮২৫-১৯০৫) কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারক ছিলেন। ১৮৬৪ থেকে ১৮৭৬ খ্রিঃ পর্যন্ত ওই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৭৭ খ্রিঃ তিনি সিংহলের (শ্রীলঙ্কা) প্রধান বিচারপতির পদ অলংকৃত করেন। তিনি ওই পদে ১৮৭৯ খ্রিঃ পর্যন্ত ছিলেন। এ দেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপর তাঁর যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল। সেকালের বাঙালিরা তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর অবসর উপলক্ষে ১০ই আগস্ট ১৮৭৬ খ্রিঃ দি স্টেট্সম্যান পত্রিকায় যে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় তা এই প্রসঙ্গে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য : "On Tuesday morning a deputation of the Bethune Society proceeded to Mr. Phear's residence, headed by venerable Raja Ramanath Tagore. The Vice-President introduced the members of the deputation to Mr. Phear and after a few words from Raja Ramanath Tagore expressive of the high respect in which the retiring Judge was held by the country, and his deep regret at Mr. Phear's departure, and the loss of the country sustained thereby, the address was read by the Honorary Secretary. Mr. Phear made a very fitting reply, shook hands with all the members of the deputation, and wished them goodbye. The deputation then retired." এই প্রতিবেদন থেকে বোঝা যায় বিচারপতি ফিয়ারের প্রতি বাঙালির শ্রদ্ধা কত গভীর ছিল।

ফিয়ার সাহেব কতগুলি পুস্তক রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে ভারতবর্ষ ও সিংহলের গ্রামগুলিকে ভিত্তি করে রচিত পুস্তক— The Aryan Village in India and Ceylon, International Trade etc.[৩৮]

১৯৫৬ খ্রিঃ ফিয়ারস্ লেনের নাম পরিবর্তন করে কার্তিক মল্লিক স্ট্রিট রাখার এক প্রস্তাব আসে।

কিন্তু এটি পুরসভার অনুমোদন পায়নি।[৩৯]

**হুজুরিমল ট্যাঙ্ক লেন :**

এটি কলিকাতার প্রাচীন রাস্তা। হুজুরিমল বহুবাজারে যে বড় দিঘি কাটিয়ে দেন তারই পূর্বদিকের গলিপথটির নাম ছিল হুজুরিমল ট্যাঙ্ক লেন অর্থাৎ হুজুরিমলের পুকুরে যাবার গলি। পরবর্তীকালে এই দিঘিটি ভরাট করা হয়। হুজুরিমল ট্যাঙ্ক লেন বহুবাজার স্ট্রিটের দক্ষিণ দিক থেকে আরম্ভ হয়ে সোজা দক্ষিণ দিকে এগিয়ে সারপেন্টাইন লেনে এসে পড়েছে। ১৮৯১ খ্রিঃ ওই অঞ্চলের পুর-কমিশনার পুরসভার চেয়ারম্যানকে অনুরোধ করেন যে হুজুরিমল ট্যাঙ্ক লেন থেকে ট্যাঙ্ক কথাটি বাদ দেওয়া হোক, যেহেতু ট্যাঙ্ক বহুদিন পূর্বে ভরাট করা হয়েছে। পুরপ্রতিষ্ঠানের সাধারণ সভার ২৩শে মে ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের অধিবেশনে বিষয়টি নিয়ে বিচার-বিবেচনা করে পুর-কমিশনারের প্রস্তাব অনুমোদন করেন।[৪০] গলিটির নতুন নাম হয় 'হুজুরিমল লেন'। সে নাম আজও আছে।

হুজুরিমল ছিলেন পঞ্জাবি শিখ। পঞ্জাবি ব্যবসায়ী আমীরচাঁদ বা উমিচাঁদের শ্যালক ও জগৎ শেঠের মুৎসুদ্দি। সে সময় জগৎ শেঠ ও উমিচাঁদের পর হুজুরিমলের মতো এত ধনী বাংলা দেশে কেউ ছিলেন না। তিনি বাস করতেন বড়বাজারে। তাঁর গদিতে ছিল সুদক্ষ মুহুরির দল। ষোল দল গায়ক ও বাদক সৎশ্রী আকালের বন্দনা করত রাতদিন। ১৭৬৭ খ্রিঃ উমিচাঁদের মৃত্যুর পর তাঁর সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন হুজুরিমল।

১৭৬৪ খ্রিঃ বক্সারের যুদ্ধে হুজুরিমল ইংরেজ কোম্পানিকে নানাভাবে সাহায্য করেন। গভর্নর ভেরেলেস্ট হুজুরিমলকে পুরস্কৃত করতে চান। কিন্তু তিনি পুরস্কারের পরিবর্তে কালীঘাটে ১২ বিঘা জমি চাইলেন মন্দির নির্মাণের জন্য। গভর্নর কালীঘাটের সেবাইতদের কাছ থেকে ১২ বিঘা দেবোত্তর জমি নিয়ে তাঁদের তার বদলে সাহানগরে ১২ বিঘা নিষ্কর জমি দেন। দেবোত্তর জমিতে মন্দির নির্মাণ অশাস্ত্রীয় হবে জেনে তিনি নিজের খরচে গঙ্গার ঘাট, চাঁদনি ও শিব মন্দির নির্মাণ করে দেন। কালীঘাটের জমি কালীর নামে দান করেন।

১৭৮০ খ্রিঃ বৌবাজারের বৈঠকখানা অঞ্চলে ৫৫ বিঘা জমির উপর একটি প্রকাণ্ড পুকুর কাটিয়ে দেন হুজুরিমল। সেটি পদ্মপুকুর নামে পরিচিত ছিল। এই পুকুরের দক্ষিণ-পূর্বে একটি থানা ছিল, নাম পদ্মপুকুর থানা। পরে ভরাট করা পদ্মপুকুরের পশ্চিমে স্থাপিত হয় মুচিপাড়া থানা। আর পুকুরের জায়গায় একটা বাগান করা হয়। সেই বাগানে বাস করত কোম্পানির কেরানিরা, এরা ছিল পর্তুগীজদের বংশধর। তাই বাগানটির নাম হয় "কেরানিবাগান।" পরবর্তীকালে এই বাগানের মালিক হন একজন ফিরিঙ্গি, মিঃ রবার্ট ল্যাজেরাস ড' আলিভিয়েরা।[৪১]

কলিকাতার প্রথম বিশপ টমাস ফ্যানশ মিডলটন ১৮১৪ খ্রিঃ বৌবাজার অঞ্চলে একটি গির্জা নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি জনসাধারণের কাছে সাহায্যের আবেদন করেন। কেরানিবাগানের মালিক মিঃ রবার্ট ল্যাজেরাস বিশপের আবেদনে সাড়া দিয়ে বাগানটি গির্জা নির্মাণের জন্য বিশপকে দান করেন। বিশপ মিডলটন ১৪ই নভেম্বর ১৮২০ সালে এই জমিতে গির্জার ভিত্তি স্থাপন করেন। গির্জার দ্বারোদ্ঘাটন হয় ১১ই নভেম্বর ১৮২৩ সালে। নতুন গির্জার নামকরণ করা হয় সেন্ট জেমস গির্জা। এই গির্জার পশ্চিম পাশে একটি ছেলেদের ও মেয়েদের বিদ্যালয় তৈরি হয় ১৮২৪ সালে। পুকুর ভরাট করা জমিতে নির্মিত হওয়াতে গির্জা ধীরে ধীরে বসে যেতে থাকে। বিপদের আশঙ্কা দেখে গির্জার কর্তৃপক্ষ গির্জার চূড়া নির্মাণ বন্ধ করে দিলেন। এই কারণে লোকে এই গির্জাকে ন্যাড়া গির্জা বলত।

সেন্ট জেমস গির্জার নামানুসারে পশ্চিম দিকের রাস্তাটির নাম হয় সেন্ট জেমস স্ট্রিট। সে সময় রাস্তাটি ছিল খুবই অপ্রশস্ত। কলিকাতার রাস্তাঘাটের উন্নতির জন্য লেফটেন্যান্ট এইচ. অ্যাবারক্রম্বি এবং ক্যাপ্টেন এইচ. এন. ফরবেস ১৮৩৬ সালে ফিভার হসপিটাল কমিটির কাছে কলিকাতার একটি মানচিত্র তৈরি করে দাখিল করেন। ওই মানচিত্রে শহর কলিকাতার উন্নতি এবং যানবাহন চলাচল সহজসাধ্য করার জন্য কয়েকটি নতুন রাস্তা নির্মাণের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। তার মধ্যে আমহার্স্ট স্ট্রিটকে সেন্ট জেমস স্ট্রিটের মধ্যে দিয়ে প্রসারিত করে দক্ষিণ দিকে লাউডন স্ট্রিট পর্যন্ত নিয়ে যেতে

চাওয়া হয়েছিল। অন্যদিকে আমহার্স্ট স্ট্রিটকে উত্তর দিকে আপার সারকুলার রোড পর্যন্ত প্রসারিত করার প্রস্তাব ছিল। এই প্রস্তাব রূপায়িত হলে কলিকাতার বৌবাজার অঞ্চলের যানজটের ঝামেলা অনেকাংশে দূর হত। অর্থের অভাবের জন্য অ্যাবারক্রম্বির এই প্রস্তাব কার্যকরী হয়নি। সেই মানচিত্রে এটা স্পষ্ট যে ১৮৩৬ সালে রাস্তাটির নাম ছিল সেন্ট জেমস স্ট্রিট। সম্ভবত সেন্ট জেমস গির্জা (ন্যাড়া গির্জা) ১৮২৩ সালে নির্মাণের পর রাস্তাটির নাম সেন্ট জেমস স্ট্রিট হয়ে থাকবে।

এদিকে গির্জাটি উইপোকার আক্রমণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ২২ আগস্ট ১৮৫৮ সালে গির্জাটি ভেঙে পড়ে। পরে গির্জার কর্তৃপক্ষ ১৬৭নং লোয়ার সার্কুলার রোডে নতুন জমি কিনে সেন্ট জেমস্ গির্জা নির্মাণ করেন। এই গির্জায় দুটো চূড়া লাগানো হল। তাই গির্জাটির নাম হয় জোড়া গির্জা। এটি কলিকাতার মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রোটেস্ট্যান্ট গির্জা। ৬০০ জন লোক বসতে পারে এর ভিতরে।

পুরাতন সেন্ট জেমস গির্জা ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে পর মিঃ রবার্ট ল্যাজেরাস ড' আলিভিয়েরার নাতি মিঃ এইচ. এ. এলিয়ট জমির খানিকটা অংশ কিনে নেন। বাকি অংশ ক্রয় করেন এক বাঙালি ভদ্রলোক। সে সময় এই জায়গাটি ছিল বসতিহীন। এইসব বসতিহীন ফাঁকা জায়গাগুলিতে যখন অল্প অল্প করে বসতি শুরু হয় তখন পাড়াগাঁয়ের প্রচলিত রীতি অনুসারে কোনও স্থানীয় উল্লেখযোগ্য গাছের নামের সঙ্গে 'তলা' যোগ করে দেওয়া হত। এই অঞ্চলে ছিল লেবু গাছের প্রাধান্য। লেবুকে চলতি কথায় নেবু বলে। লোকে অঞ্চলটিকে নেবুতলা বলত। বাঙালি ভদ্রলোক তাঁর কেনা জায়গায় এক নতুন বাজার স্থাপন করেন। অঞ্চলের নাম অনুসারে বাজারের নাম হয় নেবুতলার বাজার বা ন্যাড়া গির্জার বাজার। আজও সে বাজার আছে। আর এলিয়ট সাহেবের জমিতে নির্মিত হয় সেন্ট জেমস স্কোয়ার, এখন যার নাম হয়েছে সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, ১৮৩৬ সালে রাস্তাটির নাম ছিল সেন্ট জেমস স্ট্রিট। ১৮৫৮ সালে সেন্ট জেমস গির্জা ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় রাস্তাটির নাম বদল করে এলাকার নামে 'নেবুতলা লেন' রাখা হয়। কলিকাতা পুরসভার প্রথম চেয়ারম্যান শক সাহেব (Mr. V.H. Schalch) ১৮৬৬ সালে কলিকাতার জনগণনার একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেন— নাম "Report on the Census of Calcutta for the year 1866"। এই প্রতিবেদনে কলিকাতার সর্বসমেত ৪৩৮টি রাস্তার নাম দেওয়া আছে। ২৬২ সংখ্যক রাস্তাটি নেবুতলা লেন। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে, ১৮৫৮ সালের পর সেন্ট জেমস স্ট্রিটের নাম পরিবর্তন করে নেবুতলা লেন রাখা হয়।

আবার কেরানিবাগান প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। কেরানিবাগান অঞ্চলটি ঘিরে অনেকগুলি রাস্তার খোঁজ পাওয়া যায়— কেরানিবাগান নর্থ লেন, কেরানিবাগান মিডল লেন, কেরানিবাগান ইস্ট লেন, কেরানিবাগান ওয়েস্ট লেন এবং পশ্চিম দিকের নেবুতলা লেন ও নেবুতলা রো। এই সব রাস্তা কীভাবে আধুনিক নামে নামাঙ্কিত হল সেই সম্বন্ধে দু'চার কথা বলা দরকার। প্রথমে নেবুতলা লেনের কথা।

১৯২৬ সালে কলিকাতা পুরসভার জেনারেল কমিটির চেয়ারম্যানের কাছে গণস্বাক্ষর করা একটি আবেদনপত্রে নেবুতলা লেনের নাম বদল করে প্রয়াত কবিরাজ মোহনানন্দ গুপ্ত'র নামে রাখার এক প্রস্তাব আসে। কমিটি কিন্তু সিদ্ধান্ত নিলেন রাস্তাটি শশী দে স্ট্রিট করা হোক। শশী দে হলেন রায়বাহাদুর শশীভূষণ দে। এই প্রস্তাব সম্বন্ধে জনমত আহ্বান করা হলে পর স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ জানালেন যে যদি রাস্তাটির নাম একান্তই পরিবর্তন করতে হয় তবে তা' কবিরাজ মোহনানন্দ গুপ্তের নামে করা হোক। তিনি এখানকার স্থানীয় বাসিন্দা এবং দয়ালু ও উত্তম চিকিৎসক ছিলেন। এদিকে রায়বাহাদুর শশীভূষণ দে কলিকাতা পুরসভার মহাধ্যক্ষকে (Chief Executive Officer) তাঁর নামে রাস্তার নামকরণ প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রস্তাব দিয়ে ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯২৬ সালে এক পত্র লিখলেন :[৪২]

১. শশীভূষণ দে বিদ্যালয়ের সংলগ্ন ৮ কাঠা জমি অধিগ্রহণ করা হোক। শশীভূষণ ওই জমিতে একটি কারিগরি বিদ্যালয় এবং ছেলেদের খেলার ময়দান তৈরি করে দেবেন। জমির অর্ধেক মূল্য তিনিই বহন করবেন।

২. দ্বিতীয় প্রস্তাবে বলা হয় যে আরও ৪ কাঠা জমি ওই বিদ্যালয়ের পাশে সংগ্রহ করা হোক।

শশীভূষণ ওই জমিতে একতলা বাড়ি তৈরি করে একটি বর্হিবিভাগ চিকিৎসালয় নির্মাণ করে দেবেন।

ওই পত্রে আরও বলা হয়েছিল নিম্নলিখিত শর্তগুলি পূরণ হলে পর উপরের প্রস্তাবগুলি কার্যকর করা হবে :—

(১) নেবুতলা লেন শশীভূষণ দে'র নামে নামাঙ্কিত করতে হবে।

(২) প্রস্তাবিত বর্হিবিভাগ চিকিৎসালয় এবং সেন্ট জেমস উদ্যানটি তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী রাজরাজেশ্বরী দেবীর নামে নামাঙ্কিত করতে হবে।

পত্রের উপসংহারে তিনি লিখেছিলেন যেহেতু তিনি দীর্ঘ অবসর যাপনের জন্য ইউরোপ যাচ্ছেন, তাই তাঁর ইচ্ছা, পুরসভার মতামত এক পক্ষকালের মধ্যে যেন তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হয়।

পুরসভার উত্তর না পেয়ে তিনি ৪ঠা মার্চ ১৯২৬ সালে পুরসভার মহাধ্যক্ষকে ক্ষোভ প্রকাশ করে আরেকটি পত্রে জানান যে তিনি অনন্তকালের জন্য তাঁর প্রস্তাব এইভাবে ফেলে রাখতে রাজি নন। তাঁকে যেন শীঘ্রই উত্তর দেওয়া হয়।

রায়বাহাদুর শশীভূষণের এই পত্র পৌরসভার অধিবেশনে তীব্র আলোড়ন তুলেছিল। চারুচন্দ্র বিশ্বাস (পরবর্তীকালে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি) প্রতিবাদের মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। জীবিত ব্যক্তির নামে রাস্তার নামকরণের প্রশ্নে তিনি তীব্র আপত্তি জানিয়েছিলেন। তা ছাড়া রায়বাহাদুর শশীভূষণের নামে যদি রাস্তার নামকরণ একান্তই প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে তবে নতুন কোনও অনামী রাস্তা তাঁর নামে নামাঙ্কিত করা যেতে পারে। নামাঙ্কিত প্রাচীন রাস্তার নাম এইভাবে পরিবর্তন মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। তিনি আরও মন্তব্য করেন, কোনও কিছুর বিনিময়ে পুরসভা যদি রাস্তা নামকরণের প্রশ্ন বিবেচনা করেন তবে তা নিলামের মাধ্যমে উচ্চ মূল্য প্রদানকারীকে দেওয়ার ব্যবস্থা হোক। এর ফলে প্রদেয় অর্থ পুরসভা যথাযথ সদ্ব্যবহার করতে পারবেন।

এরপর শশীভূষণ তাঁর প্রস্তাব লিখিতভাবে প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন।

সে যাইহোক্, কলিকাতা পুরসভা ৩১শে মার্চ ১৯২৬ সালের অধিবেশনে নেবুতলা লেনের নাম পরিবর্তন করে শশীভূষণ দে-র নামে 'শশীভূষণ দে স্ট্রিট' নামকরণ করেন। সে সময় শশীভূষণ পাশ্চাত্যে ভ্রমণরত ছিলেন। কলিকাতার মেয়র যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত Jersey-তে টেলিগ্রাম করে শশীভূষণকে জানান যে নেবুতলা লেনের নামকরণ হয়েছে শশীভূষণ দে স্ট্রিট।[৪৩]

রাস্তার নামকরণ উপাখ্যানে জড়িয়ে পড়লেও শশীভূষণ দে (১৮৬৮-১৯৫৮) একজন বিশিষ্ট সমাজসেবী ও দাতা ছিলেন। কলিকাতা শেয়ার বাজারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শশীভূষণ শেয়ার ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। আবার সেই অর্থ শিক্ষা বিস্তারে, হাসপাতাল নির্মাণে ব্যয় করতে কার্পণ্য করেননি। প্রায় সাড়ে আট লক্ষ টাকা দান করেছিলেন Calcutta Medical AID and Research Society-কে, যাদবপুরের যক্ষা হাসপাতালকে এবং কার্সিয়াং-এ স্যানাটোরিয়াম নির্মাণে। এছাড়া ২৭/১, নেবুতলা লেনে প্রায় এক বিঘা জমির উপর শশীভূষণ দে অবৈতনিক বালক বিদ্যালয় ও রাজরাজেশ্বরী অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয় এক লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করে দেন। ১৯২৩ সালের ৬ই জুলাই তদানীন্তন বড়লাট লর্ড লিটন এই বিদ্যালয় দুটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। বর্তমানে এই বিদ্যালয় দুটি কলিকাতা পুরসভার অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। এ দুটির পরিচালনার জন্য ৮০,০০০ টাকার একটি তহবিল শশীভূষণ গঠন করে দিয়েছিলেন। এ ছাড়াও রামকৃষ্ণ বিদ্যামন্দির বেলুড় মঠ, কলিকাতা অন্ধ বিদ্যালয়, চিত্তরঞ্জন ক্যানসার হাসপাতাল, চিত্তরঞ্জন সেবা সদন, হিন্দু সৎকার সমিতি, কলিকাতা সুবর্ণ বণিক সমিতি এবং আরও অনেক প্রতিষ্ঠান তাঁর দানে পরিপুষ্ট হয়েছে।

আবার শশীভূষণ দে স্ট্রিটের কথায় ফিরে আসা যাক। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, রাস্তাটি খুবই অপ্রশস্ত ছিল। এটির উন্নয়নে কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা তৎপর হলেন। তাঁরা রাস্তাটির কিছু অংশ প্রশস্ত করার জন্য একটি পরিকল্পনা (Scheme No. XXII—Soshi Bhusan De Street—Widening from St. James Square to Bow Bazar Street) প্রণয়ন করেন। বিষয়টি ২৭শে জানুয়ারি ১৯২৭ সালে বিজ্ঞাপিত হয়। ৮ই জুন ১৯২৮ সালে সরকারের অনুমোদন মেলে।[৪৪] এটি রূপায়ণের পর রাস্তাটি ৬০ ফুট প্রশস্ত হয়— যান চলাচলের জন্য ৩৬ ফুট এবং

রাস্তার দু' ধারে ১২ ফুট করে মোট ২৪ ফুট ফুটপাত রাখার ব্যবস্থা হয়। ১২ ইঞ্চি গভীর করে পাথরের খোয়া দিয়ে রাস্তাটি তৈরি করা হয়। কলিকাতা পুরসভা ৭ই আগস্ট ১৯৩৩ সালে কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থার কাছ থেকে রাস্তাটির রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করেন। রাস্তাটি বৌবাজার স্ট্রিট ও আমহার্স্ট স্ট্রিটের সংযোগস্থল থেকে নেবুতলা বাজার পর্যন্ত ৬০ ফুট প্রশস্ত, তার পর থেকে মহেন্দ্র সরকার স্ট্রিট ও গোকুল বড়াল স্ট্রিটের সংযোগস্থল অবধি খুবই সঙ্কীর্ণ। এই অংশটুকুকে প্রশস্ত করার জন্য ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

সেন্ট জেমস গির্জার নামের সঙ্গে ওই এলাকার রাস্তাঘাটের সম্পর্কের নৈকট্য দেখা যায়। সেন্ট জেমস স্ট্রিট ও তার বিবর্তনের কথা আগেই বলা হয়েছে। ঠিক আর একটি রাস্তা ছিল সেন্ট জেমস স্কোয়ার। নিম্নলিখিত কয়েকটি রাস্তার অংশ বিশেষ নিয়ে তৈরি হয়েছিল সেন্ট জেমস স্কোয়ার :

১) সারপেন্টাইন লেনের সামান্য অংশ
২) কেরানিবাগান ওয়েস্ট লেনের,
৩) কেরানিবাগান মিডল লেনের এবং
৪) কেরানিবাগান ইস্ট লেনের কিছু কিছু অংশ।

সেন্ট জেমস স্ট্রিটের মতো সেন্ট জেমস স্কোয়ারও কলিকাতার প্রাচীন পথ। শক সাহেবের জনগণনার প্রতিবেদনে (১৮৬৬ খ্রিঃ) এই রাস্তাটির উল্লেখ আছে। আরেকটি কথা, সে সময় সেন্ট জেমস স্কোয়ার (উদ্যান) এত বড় ছিল না। তার পাশে ছিল এক বিরাট বস্তি। ৩রা ডিসেম্বর ১৯১৩ খ্রিঃ কলিকাতা পুরসভা এই মর্মে কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থাকে সুপারিশ করেন যে নেবুতলা বাজারের উত্তরে ১০৬নং সারপেন্টাইন লেনের অন্তর্গত ৬ বিঘা ৪ কাঠা ২ ছটাক ১৫ স্কোয়ার ফুট এলাকা জুড়ে বস্তিটি অধিগ্রহণ করে উদ্যানে (Square) রূপান্তরিত করা হোক। এর জন্য ২,১৫,৬৮৯ টাকা ব্যয়বরাদ্দ ধরা হয়েছিল, তার মধ্যে জমির মূল্য ২,০০,৮০৩ টাকা এবং নির্মাণ ব্যয় ১৪,৮৮৬ টাকা। ঘিঞ্জি বস্তি এলাকার চারিদিকে আছে সরু সরু রাস্তা। কাজেই জায়গাটি উদ্যান হবার খুবই উপযোগী। উদ্যান নির্মাণ হলে পর এ অঞ্চলের ঘিঞ্জি ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ অনেকাংশে দূর হয়ে এক স্বাস্থ্যসম্মত অঞ্চল গড়ে উঠবে।[৪৫]

কলিকাতা পুরসভার এই উন্নয়ন প্রস্তাব পাবার পর কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা এই অঞ্চল উন্নয়নে তৎপর হলেন। তাঁরা একটি পরিকল্পনা রচনা করেন। এটি ১১নং প্রকল্প নামে পরিচিত (The Scheme No XI —St. James Square)। পরিকল্পনাটির আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছিল ৫,৭৫,০০০ টাকা। ১৭ই মে ১৯১৬ খ্রিঃ প্রকল্পটি বিজ্ঞাপিত হয়। সরকার এই পরিকল্পনাটি অনুমোদন করেন ১১ই নভেম্বর ১৯১৭ খ্রিঃ। এর জন্য ৫·৫৩ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়।[৪৬]

পরিকল্পনাটি রূপায়ণের সময় একটি বড় বস্তি উচ্ছেদ করতে হয় এবং কেরানিবাগান নামধারী রাস্তাগুলি এবং পার্শ্ববর্তী অন্যান্য রাস্তাও সংস্কার ও প্রশস্ত করা হয়। বিখ্যাত মতিলাল পরিবারের রামনারায়ণ মতিলাল কিছু জমি কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থাকে অঞ্চল উন্নয়নের জন্য দান করেন। এর মূল্য ছিল ৭২০০ টাকা।[৪৭] ১৬ই জুন ১৯২৫ খ্রিঃ কলিকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠান কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থার কাছ থেকে সংস্কার করা অঞ্চলটির রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করেন।[৪৮]

এলাকাটির উন্নয়নের ফলে নতুন সেন্ট জেমস স্কোয়ার আরও পূর্ব দিকে প্রসারিত হয় এবং এই উদ্যানের পশ্চিম দিকের পুরানো অংশ রাস্তার অন্তর্গত হয়। নতুন সেন্ট জেমস স্কোয়ারের জমির পরিমাণ হল ৭ বিঘা ১৭ কাঠা। উদ্যানের তিন ধারে যে প্রশস্ত রাস্তা নির্মিত হল, সেটিও সেন্ট জেমস স্কোয়ার নামে নামাঙ্কিত হয়। এর ফলে একই অঞ্চলে দুটি সেন্ট জেমস স্কোয়ারের (রাস্তার) উদ্ভব হল। কলিকাতা পুরসভা তাঁদের ২৩ জুলাই ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের অধিবেশনে পুরানো সেন্ট জেমস স্কোয়ার নামের রাস্তাটি 'নেবুতলা রো' নামকরণ করেন।[৪৯] নেবুতলা রো নামে রাস্তাটি শশীভূষণ দে স্ট্রিটের পূর্ব দিক থেকে শুরু হয়, পরে আরও পূর্ব দিকে এগিয়ে মোড় ঘুরে দক্ষিণে অগ্রসর হবার সময় এই রাস্তার অপর একটি শাখাপথের সঙ্গে মিলিত হয়। নেবুতলা রো-এর এই শাখাপথটিও শশীভূষণ দে স্ট্রিট থেকে আরম্ভ হয়ে সোজা পূর্ব দিকে এগিয়ে নতুন সেন্ট জেমস স্কোয়ার-এর (রাস্তা) দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এসে পড়েছে।

নেবুতলা রো-এর নামও কিন্তু দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়নি। কলিকাতা পুরসভা ১লা জুন ১৯৫৬ খ্রিঃ নেবুতলা রো-এর নাম পরিবর্তন করে 'নটবর দত্ত রো' নামকরণ করেন। নটবর দত্ত (১৮৯৫-১৯৫১) ছিলেন একজন সমাজসেবী এবং ওই অঞ্চলের পুর প্রতিনিধি। ১৯৩২ সালে কলিকাতা পুরসভার কাউন্সিলার নির্বাচিত হন। এ ছাড়া ওই অঞ্চলের বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে সংযুক্ত ছিলেন।[৫০]

১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দের ৭ই জুলাই কলিকাতা পুরপ্রশাসকের (Administrator) আদেশবলে নটবর দত্ত রো-এর অংশবিশেষের নাম ওই রাস্তার উপর অবস্থিত একটি প্রাচীন গ্রন্থাগার শান্তি ইনস্টিটিউটের নামে 'শান্তি ইনস্টিটিউট রো' নামকরণ করা হয়। শশীভূষণ দে স্ট্রিট থেকে আরম্ভ হয়ে মুচিপাড়া থানা পর্যন্ত প্রসারিত রাস্তার অংশটুকু শান্তি ইনস্টিটিউট রো নামাঙ্কিত হল। এই রাস্তার পরের অংশটুকু যথারীতি নটবর দত্ত রো নামে পরিচিত থাকে।

নতুন সেন্ট জেমস স্কোয়ার—উদ্যান ও তার তিন দিকের রাস্তা—নামবদলের পালা থেকে রেহাই পায়নি। ভারত-স্বাধীনতার ঊষালগ্নের কিছু পূর্বে সেন্ট জেমস উদ্যানটি বিখ্যাত বিপ্লবী ও শহীদ সন্তোষকুমার মিত্রের নামে নামকরণের এক প্রস্তাব আসে। কলিকাতা পুরসভা তাঁদের ১২ই মার্চ ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের অধিবেশনে সেন্ট জেমস স্কোয়ারটি (উদ্যান) বিপ্লবী শহীদ সন্তোষকুমার মিত্রের নামে নামাঙ্কিত করেন এবং উদ্যানের তিন দিকের জনপথটির 'সেন্ট জেমস স্ট্রিট' নামকরণ করেন।[৫১]

অগ্নিযুগের বিপ্লবী শহীদ, স্বরাজ সেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সহপাঠী সন্তোষকুমার মিত্র (১৯০০-১৯৩১) মধ্য কলিকাতার এক কায়স্থ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা দুর্গাচরণ মিত্র। ছাত্রাবস্থায় রাজনৈতিক জীবন শুরু, ওই সময় তিনি বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি, অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, অনুকূলচন্দ্র মুখার্জি প্রমুখ বিপ্লবী নেতাদের সংস্পর্শে আসেন এবং বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত হন। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে দর্শন শাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে অনার্স নিয়ে বি.এ. পাশ করেন। আলিপুর বোমার মামলায় তিনি ধৃত হন। অন্তরিন অবস্থায় তিনি এম.এ. ও আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। মুক্তিলাভ করার পর তিনি শ্রমিক ও কৃষক সংগঠনে আত্মনিয়োগ করেন। অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনা করেন। কংগ্রেসে যোগদান করে ১৯২২ সালে স্বরাজ সেবক সঙ্ঘ গঠন করেন। ১৯২৩ সালে শাঁখারিটোলা পোস্টমাস্টার হত্যার মামলায় ধৃত হন এবং যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও অপূর্ব মুখার্জির অনবদ্য সওয়ালে তিনি মুক্তিলাভ করেন। সন্তোষ মিত্রের প্রচেষ্টায় কলিকাতায় জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে স্যোসালিস্ট কনফারেন্স হয়। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ব্যাপারে গ্রেপ্তার হয়ে ১৯৩০ সালে হিজলি জেলে প্রেরিত হন। এখানে, ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৩১ সালে রাজবন্দিদের ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণের ফলে আহত হয়ে ওই দিন মারা যান।[৫২]

হিজলি জেলে গুলি চালনার প্রায় ২৫ বছর বাদে ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৬ সালে কলিকাতা পুরসভার তৎকালীন মেয়র সতীশচন্দ্র ঘোষ সন্তোষ মিত্র উদ্যানে শহীদ সন্তোষ মিত্রের এক আবক্ষ প্রস্তর মূর্তি উন্মোচন করেন। ওই অনুষ্ঠানে সন্তোষ মিত্রের বিধবা পত্নী শ্রীমতী জ্যোৎস্না মিত্র উপস্থিত ছিলেন। খ্যাতনামা বিপ্লবী জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।[৫৩]

সেন্ট জেমস স্ট্রিট ও সেন্ট জেমস স্কোয়ারের মতো ওই অঞ্চলে সেন্ট জেমস লেন আরেকটি রাস্তা। এটি শশীভূষণ দে স্ট্রিটের পশ্চিম দিকে অবস্থিত। রাস্তাটির পূর্ব নাম ছিল স্ক্যাভেঞ্জার লেন অর্থাৎ মেথরদের বসবাসকারী রাস্তা। একই বৃত্তিধারীদের এক জায়গায় বসবাস করার যে নির্দেশ হলওয়েল সাহেব দিয়েছিলেন, তার ভিত্তিতে কলিকাতার অনেক অঞ্চলে একই পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের বসতি গড়ে উঠেছিল, যে কথা অনেকবার বলা হয়েছে। ১৮৯০ সালে কলিকাতা পুরসভা স্ক্যাভেঞ্জার লেনের নাম পরিবর্তন করে 'সেন্ট জেমস লেন' নামকরণ করেন।[৫৪]

১৯৪০ খ্রিঃ কলিকাতা পুরসভার কাছে সেন্ট জেমস লেনের নাম পরিবর্তন করে রামকানাই অধিকারীর নামে নামকরণের এক প্রস্তাব আসে। রামকানাই অধিকারী ১নং বাবুরাম শীল লেনে একটি দেবালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ ছাড়া বহু প্রতিষ্ঠান তাঁর অনুদানে পুষ্ট হয়েছিল। কলিকাতা মেডিকেল কলেজের মধ্যে স্যার জন অ্যান্ডারসন ক্যাজুয়ালটি ব্লক নির্মাণের সময় তিনি ৩৭৫০ টাকা

দান করেছিলেন। ওই অঞ্চলের গ্রন্থাগার শান্তি ইনস্টিটিউট ভবন নির্মাণের জন্য ৬০০০ টাকা মূল্যের জমি এবং গৃহনির্মাণের জন্য ১০০০ টাকা দান করেছিলেন। এ ছাড়া যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালকে ৫০০০ টাকা দিয়েছিলেন।

কলিকাতা পুরসভা ১৩ই মার্চ ১৯৪০ খ্রিঃ প্রস্তাবটি বিবেচনা করে সেন্ট জেমস লেন রাস্তাটির নাম বদল করে 'রামকানাই অধিকারী লেন' নামাঙ্কিত করেন।[৫৫]

আবার কেরানিবাগানের কথায় ফিরে আসা যাক। ওই অঞ্চলে কেরানিবাগান নামধারী চারটি রাস্তা ছিল, সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়াও ১৮৯৬ খ্রিঃ কেরানিবাগান বস্তির মধ্যে নতুন একটা রাস্তা নির্মাণ করা হয়। কলিকাতা পুরসভা ৩রা ডিসেম্বর ১৮৯৬ খ্রিঃ নতুন রাস্তাটি 'রামনারায়ণ মতিলাল লেন' নামকরণ করেন। রাস্তাটি বর্তমানের সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের দক্ষিণে অবস্থিত।[৫৬]

কলিকাতা পুরসভার কাছে ১৯৩০ সালে কেরানিবাগান ইস্ট লেন (আংশিক) এবং কেরানিবাগান নর্থ লেনের নতুন নামকরণের প্রস্তাব আসে। ইতিমধ্যে কেরানিবাগান অঞ্চলে নগরায়ণের ছোঁয়া লাগায় বস্তি উচ্ছেদ করে নতুন নতুন ঘরবাড়ি তৈরি হতে থাকে। কাজেই নতুন প্রজন্মের কাছে পুরাতন নাম আর পছন্দ নয়। তাঁরা তাঁদের কালের খ্যাতনামা ব্যক্তি ও সংস্থার নামে রাস্তার নামকরণের প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে এলেন।

কেরানিবাগান ইস্ট লেন নামে রাস্তাটির যে অংশ বৌবাজার স্ট্রিট ও সেন্ট জেমস স্কোয়ারের উত্তর-পূর্ব কোণের মধ্যে অবস্থিত সেই রাস্তাটিকে হিন্দু আইনের বিশিষ্ট পণ্ডিত গোপালচন্দ্র সরকার শাস্ত্রীর নামে নামকরণের এক প্রস্তাব আসে। কলিকাতা পুরসভা তাঁদের ২৩শে জুলাই ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের অধিবেশনে এই প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন। এর ফলে কেরানিবাগান ইস্ট লেনের নাম পরিবর্তন করে 'গোপাল শাস্ত্রী লেন' রাখা হয়।[৫৭]

হিন্দু আইনে সুপণ্ডিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠাকুর অধ্যাপক, বিশিষ্ট সমাজসেবী গোপালচন্দ্র সরকার (১৮৪৬-১৯১৫) বাঁকুড়ার ইন্দাস গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা শম্ভুনাথ সরকার। গোপালচন্দ্র সংস্কৃত কলেজের প্রথম অব্রাহ্মণ ছাত্র যিনি সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে ১৮৭১ খ্রিঃ শাস্ত্রী উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৭৩ খ্রিঃ আইন পরীক্ষায় পাশ করে আইন ব্যবসা শুরু করেন। হিন্দু আইনের মূল স্মৃতি ও ধর্মশাস্ত্রে প্রগাঢ় জ্ঞানের জন্য হিন্দু আইন বিশেষজ্ঞ হিসাবে বঙ্গের বাইরে তাঁর খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল। প্রিভি কাউন্সিলে হিন্দু আইন ও মুসলমান আইন বিশেষজ্ঞ নির্বাচনে পরামর্শ দান করেন। ১৮৮৮ খ্রিঃ তিনি টেগোর ল-এর অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং হিন্দু আইনে দত্তক গ্রহণের বিষয়ে একটি পুস্তক প্রকাশ করেন। তিনি অনেকগুলি মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন, তাদের মধ্যে হিন্দু আইন, বীর মিত্রোদয়, দায়তত্ত্ব, বিবিধ রত্নাকর, দায়ভাগ ও মিতাক্ষরা উল্লেখযোগ্য। প্রথমটি মৌলিক, অন্যগুলি কোলব্রুকের লেখা মূল ইংরাজি গ্রন্থের অনুবাদ। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর মেট্রোপলিটন কলেজের সঙ্কটময় কালে তিনি বিনা বেতনে অধ্যাপকের কাজ করেন এবং প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক সাহায্য দিয়ে তার স্থায়িত্ব বিধান করেন। ১৯০৮ খ্রিঃ তিনি ল বোর্ডের ফ্যাকাল্টি অফ ল-এর সভাপতি হয়েছিলেন। বহু বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান তাঁর অর্থ সাহায্যে পুষ্ট হয়েছিল—জাতীয় শিক্ষা পরিষদ, মহাকালী পাঠশালা, সাহিত্য পরিষদ, ইন্দাস গ্রামের উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অফ সায়েন্স। এ ছাড়া ১৮৯৭-১৮৯৯এর মধ্যে কলিকাতায় যে প্লেগ রোগ মহামারী আকারে দেখা দেয়, তার জন্য ১১নং ওয়ার্ডে যে প্লেগ হাসপাতাল স্থাপিত হয়েছিল তাতেও তিনি অর্থ সাহায্য করেছিলেন। তিনি একটানা ৩৬ বছর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "ফেলো" ছিলেন।[৫৮]

গোপাল শাস্ত্রীর নামের প্রস্তাবের সমসাময়িক প্রস্তাব ছিল কেরানিবাগান নর্থ লেনের নাম বদল করে বৌবাজারের বিখ্যাত অনাথ আশ্রম 'দি রেফিউজ'-এর নামে রেফিউজ লেন নামকরণ। কলিকাতা পুরসভা একই অধিবেশনে (২৩শে জুলাই ১৯৩০) দুটি প্রস্তাব অনুমোদন করেন। প্রথমটির কথা আগেই বলা হয়েছে। দ্বিতীয় প্রস্তাব অনুমোদিত হওয়াতে কেরানিবাগান নর্থ লেনের নাম বদল করে 'রেফিউজ লেন' নামকরণ করা হয়।[৫৯]

বৌবাজার অঞ্চলে "দি রেফিউজ" প্রতিষ্ঠান একটি অনাথ আশ্রম। প্রতিষ্ঠাতা হলেন আনন্দমোহন বিশ্বাস নামে এক খ্রিস্টান সমাজসেবী। ১৯০১ খ্রিঃ ১৪ই ফেব্রুয়ারি এটি স্থাপিত হয়। প্রতিষ্ঠানটি সম্বন্ধে কিছু জানার আগে প্রতিষ্ঠাতা সম্বন্ধে দু'চার কথা বলা দরকার।

মানবদরদী সমাজসেবী আনন্দমোহন বিশ্বাস (১৮৬৯-১৯৫০) নদীয়া জেলার শান্তিপুরে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি ছিলেন বুদ্ধিমান ও মেধাবী। কিশোর বয়সে এক ইউরোপীয় চিকিৎসকের প্রেরণা ও উদ্যোগে ইংল্যান্ডে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নের সুযোগ এসেছিল, কিন্তু পিতামাতার অনিচ্ছার জন্য সে সুযোগ ত্যাগ করতে হয়। কলিকাতায় এসে কেশব অ্যাকাডেমি ও মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে শিক্ষালাভের পর আনন্দমোহন সরকারি চাকুরিতে প্রবেশ করেন।

১৯০০ খ্রিঃ কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে আনন্দমোহন গিয়েছিলেন বোম্বাই শহরে। সেখানে প্লেগ মহামারী ও দুর্ভিক্ষের করাল ছায়ায় মানুষের অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করে এবং তিনি মনে মনে সেবাব্রত দীক্ষা নেবার সংকল্প গ্রহণ করেন। কলিকাতায় এসে চাকুরিতে ইস্তফা দেন এবং অনাথ আতুরের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। এ বিষয়ে তাঁর প্রধান সহায় হলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও তাঁর কেশব অ্যাকাডেমির শিক্ষক প্রসন্নকুমার সেন। "দি রেফিউজ" প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আনন্দমোহন মানবসেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেন।

এবার প্রতিষ্ঠানটির কথায় ফিরে আসা যাক। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ব্রাহ্ম-সমাজের কিছু উৎসাহী যুবক মিলে অনাথ নিরাশ্রয়দের জন্য একটি আশ্রম স্থাপন করেন। নাম ছিল "দাস আশ্রম"। কয়েক বছর বাদে অর্থাভাবে এই আশ্রম বন্ধ হয়ে যায়। আনন্দমোহন বিশ্বাস ওই আশ্রমের আশ্রিতদের নিয়ে "দি রেফিউজ" প্রতিষ্ঠা করেন।

দি রেফিউজ প্রতিষ্ঠিত হবার পর প্রতিষ্ঠানটিকে অনেকবার বাড়ি বদল করতে হয়েছে। অবশেষে ১৯০৯ খ্রিঃ ১২৫নং বৌবাজার স্ট্রিটের বর্তমান ভবনটি ভাড়া নেওয়া হয়। পরে তহবিল সংগ্রহ করে বাড়িটি কিনে নেবার ব্যবস্থা হয়। এ বিষয় বাগবাজারের গোকুল মিত্রের উত্তরপুরুষ বিহারীলাল মিত্র এককালীন ৭৫,০০০ টাকা দান করায় আনন্দমোহনের পক্ষে বাড়িটি ক্রয় করা সম্ভব হয়েছিল। বাড়িটির খরিদ মূল্য ছিল ১,৩৭,৯৫০ টাকা।

রেফিউজের জন্য প্রথম যে কার্য-নির্বাহক সমিতি গঠিত হয়েছিল তার সদস্যরা হলেন—

| | | |
|---|---|---|
| সভাপতি | — | কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় |
| সহঃসভাপতি | — | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর |
| | | এম. এস. দাস |
| | | রামচরণ মিত্র |
| | | বি. উপাধ্যায় |
| সম্পাদক | — | অধ্যাপক জে. আর. ব্যানার্জি |
| কোষাধ্যক্ষ | — | অধ্যাপক বি. সি. দত্ত। |

১৯১১ খ্রিঃ ৯ই আগস্ট দি রেফিউজের তত্ত্বাবধানে একটি হোমিওপ্যাথি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। কলেজটির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, চারুচন্দ্র বিশ্বাস, বংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ। বর্তমানে এটির কোনও অস্তিত্ব নেই।[৬০]

আবাসিকদের শিক্ষার জন্য দি রেফিউজ-এ নানা প্রকার ব্যবস্থা আছে—স্কুল, হাসপাতাল, হাতে-কলমে কাজ শেখার বিভিন্ন বিভাগ প্রভৃতি। সব বয়সের নারী পুরুষ ঠাঁই পেয়েছেন এই প্রতিষ্ঠানে। সংখ্যায় তাঁরা হবেন প্রায় ২৫০। এ ছাড়া এই প্রতিষ্ঠানে আছে একটি সুসজ্জিত ব্যান্ড পার্টি। আর আছে দীপক সংঘ নামে একটি সাংস্কৃতিক সংস্থা। সরকারি সাহায্য, পুরসভার অনুদান, ব্যক্তিগত ও অন্যান্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সাহায্য এই প্রতিষ্ঠানটিকে পরিপুষ্ট করেছে। আজও এই সংস্থা সগৌরবে অধিষ্ঠিত।

এইভাবে কেরানিবাগান ইস্ট লেন ও কেরানিবাগান নর্থ লেনের নতুন নামকরণে তারা তাদের অস্তিত্ব হারাল, আর কেরানিবাগান মিডল লেন এবং ওয়েস্ট লেন অনেক আগেই লুপ্ত—নতুন সেন্ট

জেমস স্কোয়ার নির্মাণের সময় পথ-দুটি ওই উদ্যানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এইভাবে নগরায়নের চাপে হুজুরিমলের ট্যাঙ্ক ও কেরানিবাগান নামের তকমাধারী পথগুলি কলিকাতার বুক থেকে চিরতরে হারিয়ে গেল। নতুন প্রজন্মের কাছে তারা অন্ধকারের অন্তরালেই রইল।

আপার স্ট্র্যান্ড রোড : এই রাস্তাটির উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও নামকরণের প্রসঙ্গটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে স্ট্র্যান্ড রোডের ইতিহাস। লটারি কমিটি হুগলি নদীর কিনারায় ১৮২০ সালে স্ট্র্যান্ড রোড নির্মাণ করেন। স্ট্র্যান্ড রোড নির্মাণের পর রাস্তাটির কিনারায় নদীর ধার বরাবর পলি জমতে থাকে। তা ছাড়া মিলিটারি বোর্ড (Military Board) কলিকাতার পুরানো কেল্লাকে রক্ষা করার জন্য নদীর পাড় বাঁধাবার ব্যবস্থা করেন। অন্য দিকে পুরসভা শহরের যত জঞ্জাল নদীর ধারে জেগে উঠা জমিতে ফেলতে থাকেন। কালক্রমে স্ট্র্যান্ড রোডের গা ঘেঁষে মাথা চাড়া দিয়ে উঠে নতুন একপ্রস্থ জমি। কিন্তু জমিতে জঞ্জাল ফেলায় গঙ্গার ধার ক্রমশ অস্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে। ১৮৪৮ খ্রিঃ পুরসভা তার উপর আস্তরণের ব্যবস্থা করেন। ফলে মূল্যবান একখণ্ড জমি পাওয়া যায়। জমির আয়কে একটি তহবিলের মধ্যে আনার জন্য সরকার "Strand Bank Fund" স্থাপন করেন। এই অর্থের দ্বারা ময়দানে পয়ঃপ্রণালী ও বৃক্ষরোপণের ব্যবস্থা, ইডেন গার্ডেনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও এসপ্ল্যানেডের উৎকর্ষসাধন প্রভৃতি কাজে হাত দেওয়া হয়।

এরপর জমির মালিকানা শর্ত নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়। সরকার স্ট্র্যান্ড ব্যাঙ্কের জমি নিজের দখলে রাখার জন্য একটি আইন প্রণয়নে উদ্যত হন। তার জন্য খসড়া আইন তৈরি করা হয়। অন্য দিকে স্ট্র্যান্ড রোডের জমির মালিকেরা ভারত সরকারের কাছে একটি স্মারকপত্র দাখিল করে এই মর্মে আবেদন করেন যে যখন স্ট্র্যান্ড রোডের জমির বিলি ব্যবস্থা হয় তাতে উল্লেখ ছিল যে পশ্চিম দিকের জমি তাঁদের অধিকারে থাকবে ; সুতরাং নদীর ধারের নতুন জমি দলিলের শর্ত অনুসারে তাঁদেরই প্রাপ্য। বিষয়টি মীমাংসার জন্য তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড ডালহৌসির কাছে পেশ করা হয়। তিনি স্বীকার করলেন যে ১৮২০ খ্রিঃ জমির পাট্টার শর্ত হিসাবে স্ট্র্যান্ড রোডের পূর্ব দিকের গৃহের মালিকরা তাঁদের বাসস্থানের সম্মুখের জায়গা এবং নদীর ধার রাস্তা হিসাবে ব্যবহার করবে। ওই জমি অন্য কোনও উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। কাজেই স্ট্র্যান্ড রোডের ধারে নদীর কিনারায় নতুন যে জমি পাওয়া যাচ্ছে সে জমি জনস্বার্থ সম্পর্কীয়, যথা—ব্যবসা বাণিজ্য, পরিবহণ, জনস্বাস্থ্য এবং জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করতে হবে। এই জমির উপর উচ্চ কোনও ঘরবাড়ি নির্মাণ করা চলবে না। লর্ড ডালহৌসি আরও নির্দেশ দেন যে নতুন জমির মালিকানার জন্য অতিরিক্ত আইন প্রণয়নের কোনও প্রয়োজন নেই।

১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দের ১০নং আইনে কলিকাতা বন্দরের উন্নয়নের জন্য জাস্টিসদের নিয়ে সরকার একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির উপর সরকার স্ট্র্যান্ড ব্যাঙ্কের স্বার্থ ও অধিকার অর্পণ করেন। সে সময় চাঁদপাল ঘাট থেকে সার্কুলার ক্যানেল লকগেট পর্যন্ত নতুন গড়ে ওঠা জায়গা থেকে মাসে ৪০০০ টাকা আয় হত। এই তহবিলের ভার কমিটির উপর অর্পণ করা হয়েছিল। কমিটিকে কয়েকটি নির্দিষ্ট কাজের ভার দেওয়া হয়েছিল :

(১) স্ট্র্যান্ড ব্যাঙ্ক ও এসপ্ল্যানেডের উন্নয়ন, যা পূর্বে স্ট্র্যান্ড ব্যাঙ্ক ফান্ড থেকে করা হত।

(২) কমিটি সর্বদা সতর্ক থাকবেন যে স্ট্র্যান্ড রোডের উপর বসবাসকারীরা যেন নতুন জমিতে কোনও গৃহাদি নির্মাণ না করেন।

(৩) স্ট্র্যান্ড ব্যাঙ্ক সর্বদা খোলা থাকবে, কেবলমাত্র বন্দর কর্তৃপক্ষ তাঁদের পরিবহণের জন্য গৃহাদি নির্মাণ করতে পারবেন।

এই কমিটি পোর্ট কমিশনার্স স্থাপনের প্রাথমিক কাজ অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছিলেন। এর ফলে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের ৫নং আইনে পোর্ট কমিশনার্স স্থাপিত হয়। চাঁদপাল ঘাট থেকে আহিরিটোলা পর্যন্ত স্ট্র্যান্ড ব্যাঙ্কের জমি ৩৭,২৯২ টাকা ভাড়ায় পোর্ট ট্রাস্টকে স্থায়ী লীজ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়।

পুরসভার জাস্টিসগণ স্ট্র্যান্ড ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে সরকারি সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেননি। তাঁরা সরকারের কাছে এই মর্মে স্মারকলিপি পেশ করলেন, "The land to the west of the Strand

Road forming the Strand Bank, or such portion thereof as lies to the North of Armenian Ghat, be vested in the justices as representing the inhabitants of the town of Calcutta and also that Act V of 1870 might not extended thereto.'' কিন্তু সরকার জাস্টিসগণের এই আবেদন নামঞ্জুর করে দেন।[৬১]

এরপর ১৮৯২ খ্রিঃ পৌর প্রতিনিধি ডঃ ইউ. কে. দত্ত পুরসভার অধিবেশনে জানালেন যে হুগলি নদীর ধার বরাবর শোভাবাজার স্ট্রিট থেকে যে রাস্তাটি উত্তরে প্রসারিত হয়েছে তার কোনও নামকরণ আজও করা হয়নি। তিনি প্রস্তাব দিলেন রাস্তাটির নাম স্ট্র্যান্ড ব্যাঙ্ক রোড রাখা হোক। তিনি আরও বলেন এইরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার নামকরণ না হওয়ায় এরই কিছু অংশকে নয়ন সুর লেন, জয়মিত্র ঘাট লেন ও বিশ্বম্ভর লেন বলা হয়। বাস্তবিকক্ষেত্রে এগুলি গলি (Lane) নয়, নদীর সমান্তরাল বড় রাস্তা। এই অসঙ্গতি দূর করার জন্যই স্ট্র্যান্ড ব্যাঙ্ক রোড নামকরণের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

পৌরপ্রতিষ্ঠানের ২৫শে জুন ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের সাধারণ সভার অধিবেশনে প্রস্তাবটির পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হয়। চেয়ারম্যান বলেন যে পোর্ট কমিশনারের অধীনে স্ট্র্যান্ড ব্যাঙ্ক রোড নামে একটি রাস্তা বর্তমান। অন্য একটি পৃথক নাম গ্রহণ করা হোক। অবশেষে রাস্তাটির নাম 'আপার স্ট্র্যান্ড রোড' রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।[৬২]

ডাক্তার দুর্গাচরণ ব্যানার্জি স্ট্রিট : তালতলা অঞ্চলে নিয়োগীপুকুর ইস্ট লেন কলিকাতার প্রাচীন রাস্তা। সে সময় নিয়োগীরা এ অঞ্চলের ধনী ও প্রতিপত্তিশালী পরিবার ছিলেন। তাঁরা যে পুকুর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার নাম ছিল নিয়োগীপুকুর। এই নিয়োগীপুকুরের দু'ধার দিয়ে দুটি রাস্তা ছিল—একটি নিয়োগীপুকুর ইস্ট লেন, অন্যটি নিয়োগীপুকুর ওয়েস্ট লেন।

পুরসভা তাঁদের ৩১শে আগস্ট ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের অধিবেশনে নিয়োগীপুকুর ইস্ট লেনের পাশের নতুন রাস্তাটির নাম বদল করে সেকালের বিখ্যাত ডাক্তার দুর্গাচরণ ব্যানার্জির নামে ডাক্তার দুর্গাচরণ ব্যানার্জি স্ট্রিট নামাঙ্কিত করেন, (That the new road at 31, Neoageepooker East Lane be called Dr. Doorga Churan Banerjee St.)।[৬৩] তারপর ৭ই জুন ১৯০৫ খ্রিঃ পুরসভা নিয়োগীপুকুর ইস্ট লেনের নাম পরিবর্তন করে ডাক্তার দুর্গাচরণ ব্যানার্জি রোড নামাঙ্কিত করেন। এই নামকরণ প্রসঙ্গে সেকালের পুর প্রতিনিধি মিঃ কটনের (Mr. Cotton) মন্তব্য উল্লেখ্য—''The change in name would not only be more euphorious but it would serve to commemorate the name of a person who had done vast amount of good, in Calcutta.'' পরবর্তীকালে রাস্তাটির নাম পরিবর্তন করে 'দুর্গাচরণ ডাক্তার রোড' করা হয়।

দুর্গাচরণ ডাক্তার রোড দুটি রাস্তার সংমিশ্রণে তৈরি হয়েছে। রাস্তাটি অনেকটা ইংরেজি 'X' অক্ষরের মতো। এই রাস্তার একটি শাখা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড দিয়ে প্রসারিত হয়ে সোজা দক্ষিণ দিকে এগোবার সময় দুর্গাচরণ ডাক্তার রোডের অপর শাখাটি ভেদ করে ডাক্তার লেনে এসে পড়েছে। এই রাস্তার অন্য শাখাটি লোয়ার সার্কুলার রোড থেকে বেরিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এগোবার সময় দুর্গাচরণ ডাক্তার রোডের পূর্বতন শাখাকে ছেদ করে সেরাং লেনে এসে মিশেছে।

সেকালের কলিকাতায় ডাক্তার দুর্গাচরণের নাম সর্বসাধারণের কাছেই পরিচিত ছিল। রোগ নির্ণয়ে ছিল তাঁর অদ্বিতীয় ক্ষমতা। লোকে দুর্গাচরণ ডাক্তারকে সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি মনে করত। তিনি তালতলায় বাস করতেন।

গোলকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৯-১৮৭০) ২৪ পরগনার অন্তর্গত মণিরামপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। দশ বছর বয়সে হিন্দু কলেজে ভর্তি হয়ে ইতিহাস ও গণিতে কৃতিত্ব প্রদর্শন করলেও অর্থাভাবে পড়া বন্ধ রেখে 'Salt Board'-এর অধীনে চাকুরি গ্রহণ করেন। পরে ওই বোর্ডের দেওয়ান দ্বারকানাথ ঠাকুরের উদ্যোগে পুনরায় হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। এবারেও একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। আর্থিক দুরবস্থার জন্য পুনরায় কলেজ ছাড়তে বাধ্য হন। ২১ বছর বয়সে হেয়ার সাহেবের ইংলিশ স্কুলে শিক্ষকের চাকুরি গ্রহণ করেন। হেয়ার সাহেবের অনুমতি নিয়ে

দৈনিক ২ ঘণ্টা করে মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ডাক্তারের অভাবে স্ত্রীর অকালমৃত্যু ঘটায় তিনি চিকিৎসক হবার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। অবশেষে চাকুরি ত্যাগ করে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে নিয়োজিত করেন। ৫ বছর শিক্ষার পর তিনি মেডিকেল কলেজ ছাড়লেন। সেই সময় ইংল্যান্ডের বিখ্যাত চিকিৎসক ডঃ রিচার্ডসন কলিকাতায় এসে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাঁর চিকিৎসা ব্যবস্থায় মুগ্ধ হন।

অর্থ ও প্রতিষ্ঠা দুর্গাচরণ নিজ মেধা ও অধ্যবসায়ে অর্জন করেছিলেন। এদেশীয় ধর্মীয় আচার-আচরণে তাঁর আস্থা ছিল না। তিনি খ্রিস্টধর্মের প্রতি উৎসুক ছিলেন। ধনীদের জাঁকজমক আর বর্তমান সমাজব্যবস্থার প্রতি তাঁর ঘৃণা ছিল প্রবাদতুল্য। এত অর্থ ও সম্মান পেয়েও তিনি সরল জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। তার পোশাকআশাকও ছিল অতি সাধারণ। রোগীদের প্রতি তাঁর সহানুভূতির সীমা ছিল না। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত রোগীদের আহার ও পথ্যের ব্যবস্থা ছিল দুর্গাচরণের গৃহে। এইভাবে প্রায় ৫০ জন প্রতিদিন আহার করতেন তাঁর আবাস ভবনে। এই জনদরদী চিকিৎসক ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারি নিমুনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন।

ডাঃ দুর্গাচরণের সুযোগ্য পুত্র হলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।[৬৪]

আগা মহম্মদ মেহেদি স্ট্রিটের আছে এক চমকপ্রদ কাহিনী। কলিকাতা পুরসভা এই পথটিকে নিয়ে এক সময় এক বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। কলিকাতায় রাস্তাঘাটের ইতিহাসে সে কাহিনী কম আকর্ষণীয় নয়।

১৮৯৩ খ্রিঃ কলিকাতা পুরসভা কামেদনবাগান বস্তি অঞ্চলটি সংস্কার করে তার মধ্য দিয়ে একটি নতুন রাস্তা নির্মাণ করেন। রাস্তাটি ছিল অনেকটা ইংরেজি 'H' অক্ষরের মত। এই রাস্তার দুই বাহু আলিমুদ্দিন স্ট্রিট থেকে শুরু হয়ে সোজা দক্ষিণে এগিয়ে পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত কামেদনবাগান লেনের দুই প্রান্তের সঙ্গে মিলিত হয়। রাস্তার মধ্যবর্তী শাখাপথটি পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত হবার সময় নবাব আব্দুল লতিফ স্ট্রিটকে ভেদ করে উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত পূর্বোক্ত দুই বাহুপথের সঙ্গে মিলিত হয়। এই রাস্তাটি নির্মিত হওয়াতে কামেদন বস্তি অঞ্চলের অধিবাসীদের যাতায়াতের সুবিধা হয় এবং ওই অঞ্চলের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ কিছুটা উন্নত হয়।[৬৫]

কলিকাতা পুরসভা এরপর রাস্তাটির নামকরণে তৎপর হন। ৫ই অক্টোবর ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের অধিবেশনে তৎকালীন পুরসভার চেয়ারম্যানের প্রস্তাবে নবনির্মিত রাস্তাটির আগা মহম্মদ মেহেদি স্ট্রিট নামকরণ হয়। প্রয়াত আগা মহম্মদ কলিকাতা পুরসভার নির্বাচিত ও মনোনীত কমিশনার ছিলেন। পরবর্তীকালে রাস্তাটির নাম সংক্ষিপ্ত করে 'আগা মেহেদি স্ট্রিট' করা হয়।[৬৬]

প্রায় বছর পনেরো বাদে রাস্তাটির নামকরণ নিয়ে এক বিতর্কের সৃষ্টি হয়। ১৯০৭ সালে মিস্টার কাশিম ইসমাইলজী মদন কলিকাতা পুরসভাকে অনুরোধ করেন যে, কামেদনবাগান বস্তির মধ্যে দিয়ে যে রাস্তাটি করা হয়েছিল এবং যা আগা মহম্মদ মেহেদি স্ট্রিট নামে নামাঙ্কিত, সেই রাস্তাটি তাঁর প্রয়াত পিতা হাজী ইসমাইল মদনের নামে করা হোক। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেন যে, রাস্তাটি নির্মাণের সময় তাঁর পিতা বিনামূল্যে যে জমি দিয়েছিলেন তার শর্ত ছিল নবনির্মিত রাস্তাটি তাঁর নামে নামকরণ করতে হবে। কলিকাতা পুরসভা ২রা জুলাই ১৮৯৩ সালে এই শর্ত স্বীকার করে নেন।

কাশিম ইসমাইলজী মদনের এই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে কলিকাতা পুরসভা ফ্যাসাদে পড়ে যান। রাস্তাটি ইতিমধ্যে পুরসভার এক কমিশনার আগা মহম্মদ মেহেদির নামে নামকরণ করা হয়েছে। উপায়ান্তর না দেখে পুরসভা কাশিম সাহেবের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। কাশিম সাহেব আইনের সাহায্যে এ বিষয় নিষ্পত্তি করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। পুরসভা বুঝলেন যে, আইনের আশ্রয় গ্রহণ করলে বিষয়টি তাঁদের বিরুদ্ধে যাবে। তাঁরা তখন আপোষে বিষয়টি সমাধানের জন্য এগিয়ে এলেন। কাশিম সাহেবকে প্রস্তাব দেওয়া হয়, আগা মহম্মদ মেহেদি স্ট্রিট ছাড়া অন্য যে কোনও রাস্তা তাঁর পিতার নামে নামকরণ করা যেতে পারে। কলুটোলা অঞ্চলে সে সময়ে ধর্মতলা লেন নামে একটি রাস্তা ছিল। কাশিম সাহেবের ইচ্ছানুসারে কলিকাতা পুরসভা ১৮ই ডিসেম্বর ১৯০৭ খ্রিঃ

ধর্মতলা লেনের নাম বদল করে 'ইসমাইল মদন লেন' নামকরণ করেন।[৬৭]

কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থার দ্বারা এই অঞ্চলের উন্নয়ন পরিকল্পনা রূপায়ণের সময় ইসমাইল মদন লেনের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে, সেই কথায় আমরা এবারে আসছি।

কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা ইসমাইল মদন লেন অঞ্চল উন্নয়নের জন্য একটি পরিকল্পনা (The Scheme No. IC) ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯১৬ খ্রিঃ গ্রহণ করেন। সরকার প্রস্তাবটি ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯১৭ খ্রিঃ অনুমোদন করেন। পরিকল্পনাটি রূপায়িত হলে পর ৪০ ফুট প্রশস্ত নতুন একটি রাস্তা তৈরি হয়। এই রাস্তা নির্মাণ হওয়ায় ইসমাইল মদন লেনের এবং রতু সরকার লেনের কিছু অংশ এই রাস্তার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় এবং ইসমাইল মদন লেনের বাকি অংশ অতিরিক্ত জমি হিসাবে গণ্য হয়।[৬৮] ফলে ইসমাইল মদন লেনের অস্তিত্ব মুছে যায়। বিভাগীয় প্রতিবেদনে বিষয়টির প্রতি কলিকাতা পুরসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

কলিকাতা পুরসভা তাঁদের ৩১শে মার্চ ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের অধিবেশনে ৪০ ফুট প্রশস্ত নবনির্মিত রাস্তার যে অংশ কলুটোলা স্ট্রিট থেকে কানাই শীল স্ট্রিট পর্যন্ত প্রসারিত সেই অংশটুকু 'বলাই দত্ত স্ট্রিট' নামকরণ করেন এবং বলাই দত্ত স্ট্রিট থেকে উত্তরে প্রসারিত জ্যাকেরিয়া স্ট্রিট পর্যন্ত নতুন রাস্তাটির নাম 'ইসমাইল মদন লেন' রাখা হয়। এইভাবে কলিকাতার বুক থেকে মুছে যাওয়া একটি রাস্তাকে পুনরায় সঞ্জীবিত করা হয়।

সেকালের কলিকাতায় খ্যাতনামা অ্যাটর্নি বলাইচাঁদ দত্তের (১৮৪৯-১৯০৬) বাসভবন ছিল ২৭ নম্বর কলুটোলা স্ট্রিটে। এখানেই তিনি জন্মগ্রহণ করেন। জাতিতে সুবর্ণবণিক। পিতা কবি রাজনারায়ণ দত্ত (১৮২৪-৯১) হিন্দু কলেজের সিনিয়র স্কলার ছিলেন। হেয়ার সাহেব ও ডি. এল. রিচার্ডসনের প্রিয় ছাত্র ছিলেন রাজনারায়ণ। 'Osmyn' কাব্য ১৮৪১ খ্রিঃ রচনা করেন। ১৮৪০ খ্রিঃ প্রণয়ন করেন একটি প্রহসন, নাম ''Chuckerbutty Faction''।

বলাইচাঁদ হেয়ার স্কুলের পাঠ শেষ করে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন। অ্যাটর্নিশিপ পরীক্ষার জন্য মেসার্স বারলার্ড এ্যান্ড স্যান্ডারসন কোম্পানির অফিসে শিক্ষানবিশ হিসাবে যোগদান করেন। পরে ওই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে স্বাধীনভাবে ব্যবসা শুরু করেন। ১৮৯১ খ্রিঃ পিতার মৃত্যুর পর তিনি বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হন।

বলাইচাঁদ দত্ত তাঁর জীবিতকালে বহু অর্থ দান করে গেছেন। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ইংরাজিতে প্রথম স্থানাধিকারী ছাত্রকে মাসিক ১০ টাকা হারে পারিতোষিক দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। ২৭নং কলুটোলার বসত বাড়িটিকে ঠাকুরবাড়ি করেছিলেন এবং সেখানে প্রতিদিন ২৫ জন ভিক্ষুককে খাওয়ানোর ব্যবস্থা আছে। মধুপুরে তিনি একটি হাসপাতাল স্থাপন করেন। গভর্নর স্যার উডবার্ন ১৯০০ খ্রিঃ এই হাসপাতালের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। দার্জিলিং-এ অক্ষম ব্যক্তিদের থাকার জন্য লুইস জুবিলি স্যানাটোরিয়ামের কর্তৃপক্ষের হাতে ৬০০০ টাকা দান করেন। তাঁর পত্নীর নামে ইডেন হাসপাতালের শিশু বিভাগে ৩০,০০০ টাকা দান করেন। বঙ্গদেশের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর জেনারেলের হাতে দাতব্য প্রতিষ্ঠান সমূহ পরিচালনার জন্য মোট তিন লক্ষ টাকা দান করেন।[৬৯]

স্যান্ডেল স্ট্রিট : ১৮৯৩ খ্রিঃ ৮৭নং রিপন স্ট্রিটে অবস্থিত কামেদনবাগান বস্তির মধ্য দিয়ে ১৬ ফুট চওড়া নতুন একটি রাস্তা নির্মিত হয়। এটি শুরু হয় আবদুল লতিফ স্ট্রিটের মুখ থেকে। মিস্টার স্যান্ডেল এই পথটি নির্মাণের জন্য পুরসভাকে ৭ কাঠা জমি দান করেন যার মূল্য সেকালের বাজার দর অনুসারে ৪০০০ টাকা থেকে ৫০০০ টাকার মধ্যে। ওই বছরের এক পৌর অধিবেশনে ওই অঞ্চলের পুরপ্রতিনিধি মৌলভি আমেদ নতুন পথটির নাম মিস্টার স্যান্ডেলের নামে নামকরণের এক প্রস্তাব আনেন। মিস্টার স্যান্ডেল ছিলেন সেকালের খ্যাতনামা একজন আইনজীবী। মনিলাল সান্ন্যাল ওরফে স্যাণ্ডেল (১৮৪৪-১৮৯৭) রেভারেন্ড লালবিহারী দে'র জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। রিপন স্ট্রিট ও স্যাণ্ডেল স্ট্রিটের মধ্যে ছিল তাঁর বিশাল আবাসভবন। কলিকাতা পুরসভা তাঁদের ২রা সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের সাধারণ সভায় প্রস্তাবটি বিচার-বিবেচনার পর নতুন রাস্তাটি স্যান্ডেল স্ট্রিট নামকরণ করেন।[৭০]

এরপর রাস্তাটি পুনরায় নামকরণের এক প্রস্তাব আসে। ২রা নভেম্বর ১৯৬৭ সালের পুর

অধিবেশনে স্যান্ডেল স্ট্রিটের নাম বদল করে 'মৌলানা আবদুর রেজ্জাক মালিয়াবাদ স্ট্রিট' নামাঙ্কিত করা হয়।

অদ্বৈতচরণ মল্লিক লেন : রাস্তাটি দৈর্ঘ্যে ছোট, যোগেন দত্ত লেন থেকে আরম্ভ হয়ে পূর্বে প্রসারিত হয়ে চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউতে এসে পড়েছে। রাজা দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক রাস্তাটি নির্মাণের সমস্ত জমি দান করেছিলেন। জমি পাবার পর কলিকাতা পুরসভা রাস্তাটি ২৪ ফুট প্রশস্ত করার ব্যবস্থা করেন। রাস্তা নির্মাণের পর কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের সাধারণ সভা তাঁদের ৩রা আগস্ট ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের অধিবেশনে রাস্তাটি রাজা দেবেন্দ্রনাথ মল্লিকের পিতা অদ্বৈতচরণ মল্লিকের নামে নামাঙ্কিত করেন।

১৯১৮ খ্রিঃ কলিকাতা পুরসভা সারা কলিকাতার রাস্তার নাম সঙ্কোচনের বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেন। অবশেষে ১৯শে মার্চ ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের অধিবেশনে অনেকগুলি রাস্তার সঙ্গে এই রাস্তাটির নাম সংক্ষিপ্ত করে 'অদ্বৈত মল্লিক লেন' করা হয়। আজও রাস্তাটি ওই নামে পরিচিত।

সুবর্ণবণিক সমাজের সুপ্রসিদ্ধ নিমাইচরণ মল্লিকের পৌত্র এবং রামগোপাল মল্লিকের পুত্র হলেন অদ্বৈতচরণ মল্লিক। অদ্বৈতচরণের দুই পুত্র—ব্রজেন্দ্রনাথ ও দেবেন্দ্রনাথ। ব্রজেন্দ্রনাথ ছিলেন সেকালের বিখ্যাত অ্যাটর্নি। কনিষ্ঠ হলেন রাজা দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক। অদ্বৈতচরণ সেকালের ধনী ও দানবীর মতিলাল শীলের কন্যাকে বিবাহ করেন।[৭১]

ক্যাথিড্রাল মিশন লেন : দেবাদিদেব মহেশ্বরের আরেক নাম পঞ্চানন। প্রাচীন কলিকাতায় বহু অঞ্চলে শিব মন্দির স্থাপিত হয়েছিল। শিব মন্দির যে রাস্তায় স্থাপিত হয়েছিল সে রাস্তাটির নাম কোথাও শিবতলা লেন, আবার কোথাও বা পঞ্চাননতলা লেন নামকরণ করা হয়। সে সময়ের কলিকাতায় পঞ্চাননতলা লেন নাম নিয়ে অনেকগুলি রাস্তা ছিল। সেকালের ৯নং ওয়ার্ডে পঞ্চাননতলা লেন এইরূপ একটি পথ। এটিও বেশ প্রাচীন। পুরসভা তাঁদের ২৩শে জুলাই ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের অধিবেশনে এই মর্মে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন :—

"That Punchanuntolla Lane in Ward-9 be called Cathedral Mission Lane."

ক্যাথিড্রাল মিশন ছিল মির্জাপুর স্ট্রিটের (সূর্য সেন স্ট্রিট) উপর অবস্থিত, কলিকাতা কর্পোরেশনের ২নং জেলা অফিসের জায়গায়। ১৮২০ খ্রিঃ এই জায়গায় ছিল একটি বিশাল বাগান। তার মধ্যে ছিল কয়েকটি পাকা বাড়ি। এই বাগানবাড়ির মালিক ছিলেন পোস্তার রাজা নরসিংহচন্দ্র রায়। লোকে তাঁকে রাজা নরসিংহ রায় বলত। এই বাগানবাড়ির একটিতে স্কুল সোসাইটির একটি স্কুল স্থাপিত হয়। এটি প্রতিষ্ঠা করেন ডেভিড হেয়ার। পরে স্কুলটির নাম হয় হেয়ার স্কুল। ১৮৪২ খ্রিঃ ১লা জুন হেয়ার সাহেবের কলেরায় মৃত্যু হলে পর মতিলাল শীলের প্ররোচনায় রাজা নরসিংহ হেয়ার সাহেবের স্কুলকে উঠে যেতে বাধ্য করেন। ঘটনাটি ঘটে ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে। হেয়ার স্কুল প্রেসিডেন্সি কলেজের পিছন দিকে ভবানীচরণ দত্ত লেনে উঠে যায়। আর নরসিংহ রায়ের বাগানের হেয়ার স্কুলের ছেড়ে যাওয়া খালি বাড়িটি দখল করে মতিলাল শীলের ফ্রি কলেজ।

পাদ্রি আলেকজান্ডার ডাফ ১৮৩০ খ্রিঃ কলিকাতায় আসা অবধি নরসিংহ রায়ের এই বাগানের আর একটি বাড়িতে বাস করতেন। তিনি এখানে ছিলেন ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত। সেই মাসে হেদুয়া দিঘির (আজাদ হিন্দ বাগ) পূর্ব দিকে তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্কুল জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশনের নিজস্ব পাকা বাড়ি তৈরি হয়ে গেলে গরানহাটায় গোরাচাঁদ বসাকের বাড়ি থেকে তাঁর স্কুলটিকে নিয়ে নতুন বাড়িতে উঠে যান। আর ওই বাড়িতে ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই আগস্ট স্থাপিত হয় দি স্কুল ফর ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট। ক্যাথিড্রাল মিশন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দের ১লা জানুয়ারি ২৫নং সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়িতে। ১৮৬৭ খ্রিঃ নরসিংহ রায়ের বাগানবাড়ি কিনে নেন ক্যাথিড্রাল মিশন। পুরানো বাড়িগুলি ভেঙে নতুন বাড়ি তৈরি আরম্ভ হয় ওই বছরের মে মাসের শেষ নাগাদ। বাড়ি তৈরির কাজ শেষ হয় ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে। আর কলেজের উদ্বোধন হয় ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দের ৩রা এপ্রিল। পরে এই কলেজের নাম হয় সেন্ট পলস্ কলেজ।

ক্যাথিড্রাল মিশন তাঁদের কলেজ বাড়ি ১৯০৭ খ্রিঃ কলিকাতা পুরসভাকে বেচে দিয়ে আমহার্স্ট স্ট্রিটের বর্তমান বাড়িতে উঠে আসে। কলিকাতা পুরসভা এখানে তাঁদের ২ নম্বর জেলা অফিস খোলেন ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে।[৭২]

ক্যাথিড্রাল মিশন ও কলেজ ওই জায়গায় থাকার জন্য পাশের রাস্তাটি ক্যাথিড্রাল মিশন লেন নামাঙ্কিত করা হয়েছিল।

১৯০৮ খ্রিঃ ডাঃ হরিধন দত্ত কলিকাতা পুরসভায় এই মর্মে একটি প্রস্তাব আনেন যে ক্যাথিড্রাল মিশন লেনের নাম পরিবর্তন করে শ্রীগোপাল মল্লিক লেন রাখা হোক। তাঁর প্রস্তাবে আরও বলা হয়েছিল ক্যাথিড্রাল মিশন বর্তমানে ওই স্থানে নেই। কাজেই অধিকাংশ পল্লীবাসীর ইচ্ছা যে রাস্তাটি শ্রীগোপালবাবুর নামে পুনর্নামকরণ করা হোক। শ্রীগোপাল মল্লিক একজন বিশিষ্ট ধনী ও সমাজসেবী, উচ্চশিক্ষা প্রসারের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ১ লক্ষ টাকা দান করেছেন। দরিদ্র বিধবাদের দুর্দশা লাঘবের জন্য ২০,০০০ টাকা অনুদানে একটি তহবিল গঠন করে দিয়েছেন। ওই তহবিল থেকে প্রায় ২০০ জন অসহায় বিধবাকে সাহায্য দানের ব্যবস্থা হয়েছিল। তাঁর ওই প্রস্তাব থেকে আরও জানা যায় যে সে সময় ওই অঞ্চলে পঞ্চাননতলা লেন নামে দুটি রাস্তা ছিল।

পুরসভা তাঁদের ২২শে জুলাই ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের অধিবেশনে প্রস্তাবটি বিবেচনা করে ক্যাথিড্রাল মিশন লেনের নাম পরিবর্তন করে 'শ্রীগোপাল মল্লিক লেন' নামাঙ্কিত করেন।

শ্রীগোপাল মল্লিক সম্বন্ধে কিছু বলার আগে এই মল্লিক পরিবার সম্বন্ধে দু'চার কথা বলা দরকার। এই পরিবার পটলডাঙার মল্লিক পরিবার নামে খ্যাত। মল্লিকদের আসল উপাধি ছিল 'বসু'। পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা বা আদিপুরুষ হিসাবে দশরথ বসুরই নাম উল্লেখ করা হয়। বসু পরিবারের বংশধরেরা ২৪ পরগনার মাহীনগরে বসবাস করতেন। গোপীনাথ বসু হলেন এই পরিবারের ত্রয়োদশ পুরুষ। তিনি ছিলেন হোসেন শাহ'র উজীর। পরিবারের সপ্তদশ পুরুষ রঘুনাথ বসু বাংলার নবাবের দেওয়ান ছিলেন। দেওয়ানি কাজের সুষ্ঠু পরিচালনার স্বীকৃতি হিসাবে রঘুনাথ বসুকে মল্লিক উপাধি দেওয়া হয়। সেই থেকে বসু পরিবার বসুমল্লিক উপাধি গ্রহণ করেন। এই বসুমল্লিক পরিবার হুগলি জেলার কাঁটাগোরে গ্রামে বাস করতেন। রঘুনাথের উত্তরপুরুষ রামকুমার কাঁটাগোরে গ্রাম থেকে ১৭৯৪ খ্রিঃ কলিকাতায় চলে আসেন। রামকুমারের পুত্র রাধানাথ বসুমল্লিক (১৭৯৮-১৮৪৪)। ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে মাতুল কৃষ্ণরাম আইচের পঞ্চাননতলা লেনের বাসভবনে রাধানাথের জন্ম হয়।

সামান্য লেখাপড়া শেষ করে রাধানাথ গঙ্গাধর বিশ্বাসের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে চাকুরি গ্রহণ করেন। এরপর তিনি একটি ইউরোপীয় জাহাজ কোম্পানির বেনিয়ান নিযুক্ত হন। অবশেষে ১৮২৪ সালে সেকালের কলিকাতার বিখ্যাত জাহাজ প্রতিষ্ঠান Beauchamps & Co.-তে প্রবেশ করেন। তিনি ছিলেন পরিশ্রমী ও উদ্যোগী। তাঁর কর্মপ্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে Mr. Beauchamp রাধানাথকে তাঁর প্রতিষ্ঠানের অংশীদার করে নেন। চাকুরির মোহ ত্যাগ করে নিজ উদ্যোগে ব্যবসায় প্রবৃত্ত হন। ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে রাধানাথ Mr. Beauchamp ও টমাস উইলিয়াম টিনগেটের সঙ্গে মিলিত উদ্যোগে একটি যৌথপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন এবং কারবারের প্রয়োজনে 'স্যার উইলিয়াম ওয়ালেশ' নামে ২০০ টনের একটি জাহাজ ১২,০০০ টাকায় ক্রয় করেন। সে সময় মাল চলাচল ও ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য বড় বড় জাহাজ কলিকাতা বন্দরে নোঙর করত। অথচ তাদের মেরামতির কোনও ব্যবস্থা ছিল না। এই সমস্যা সমাধানে তিনি একটি জাহাজ মেরামতি কারখানা স্থাপনে উদ্যোগী হন। Beauchamps & Co.-এর ম্যানেজার স্যামুয়েল রিডের সহযোগিতায় হাওড়ার সালকিয়াতে এক বিঘা সতের কাঠা জমির ওপর ৩১শে অক্টোবর ১৮৪২ খ্রিঃ হুগলি ডক ইয়ার্ড (Hooghly Dock Yard) স্থাপন করেন। প্রতিষ্ঠানটির জন্য তিনি এক লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। ওই সংস্থার মূলধনের $\frac{৩}{৪}$ অংশ তাঁর অধিকারে ছিল। এই ডক ইয়ার্ডের মাধ্যমে তিনি বিপুল বিত্ত ও সম্পত্তির অধিকারী হন এবং সেকালের কলিকাতায় গণ্যমান্য ব্যক্তিরূপে পরিচিত হন। ১৮৪৬ সালে রিড সাহেব স্বদেশে ফিরে গেলে বসু পরিবার হুগলি ডকের একমাত্র স্বত্ত্বাধিকারী হন।[৭৩]

১৮২৫ সালে রাধানাথ মল্লিক তাঁর মাতুলালয়ের পাশে আড়পুলি (আরপুলি) গ্রামে জমি কিনে

বসতবাটি নির্মাণ করেন। পরবর্তীকালে এটি সম্প্রসারিত হয় এবং তা' কয়েক বিঘা জমির ওপর অবস্থিত ছিল। সে সময় ওই বাড়ির ঠিকানা ছিল পঞ্চাননতলা লেন, গোয়ালপাড়া, আড়পুলি গ্রাম। ছোট্ট ইতিহাস আছে এই আড়পুলি গ্রামের।

আঠারো শতকে শহর কলিকাতায় যে দাস ব্যবসার প্রচলন ছিল আড়পুলি গ্রাম তার সাক্ষ্য বহন করে। কথিত আছে আড়পুলি বলা হত সেইসব লোককে যারা দাস ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিল। এই আড়পুলিরা কলিকাতার দরিদ্র অধিবাসীদের নানাভাবে প্রলোভিত করে ভারতের বাইরে পাঠিয়ে দিত। সেখানে তারা কৃতদাস হয়ে জীবনযাপন করত। আড়পুলিরা দলবদ্ধ হয়ে এই অঞ্চলে বাস করত বলে অঞ্চলের নাম হয়েছিল আড়পুলি। দাস ব্যবসা বন্ধ হলে পর আড়পুলিরা ওই অঞ্চল থেকে উৎখাত হয়ে যায়। কেবলমাত্র আড়পুলি লেন নামে রাস্তাটি ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে টিকে ছিল। এই শতকের পাঁচের দশকে আড়পুলি লেনের নাম বদল করে 'সুরেন্দ্রলাল পাইন লেন' নামকরণ করা হয়। সুরেন্দ্রলাল পাইন ৬৩এ, শ্রীগোপাল মল্লিক লেনে বাস করতেন। পেশায় ছিলেন আইনজীবী। অঞ্চলের জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। ১৯৫৭ সালে ২১শে মার্চ পরিণত বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন।[৭৪]

রাধানাথ মল্লিক আড়পুলি গ্রামে যে ভবনটি তৈরি করেছিলেন বর্তমানে এটি ১৮ নম্বর রাধানাথ মল্লিক লেনের অন্তর্গত। বাড়িটির পিছনের অংশ অর্থাৎ অন্দরমহল শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের উপর। রাধানাথ মল্লিক মাত্র ৪৬ বছর বয়সে ১৮৪৪ সালে পরলোকগমন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বাসভবনের সামনের পথটি তাঁর নামে নামাঙ্কিত হয়েছিল।

পুনরায় শ্রীগোপাল মল্লিকের প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। হিন্দু ও প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র, হিন্দু বেদ ও দর্শনের প্রবক্তা, সমাজসেবী ও দানশীল শ্রীগোপাল মল্লিক ১৮৪০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। রাধানাথ বসুমল্লিকের কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন তিনি। চার বছর বয়সে তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। লেখাপড়া সমাপ্তির পর তিনি বসুমল্লিক পরিবারের বিষয়সম্পত্তি দেখাশোনা করতেন। অন্য ভাইয়েরা হুগলি ডকের পরিচালনায় ছিলেন। অবসর সময় শ্রীগোপাল বেদ ও হিন্দু দর্শন নিয়ে গভীর অধ্যয়ন করতেন। তাঁরই দেয় অর্থে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ''Fellowship'' স্থাপিত হয়েছিল ১৮৯৭ সালে, নাম—''The Sreegopal Basu Mullick Fellowship for research and study of Vedic Culture and Hindu Philosophy.''

শ্রীগোপাল ৪৬ নং ক্যাথিড্রাল মিশন লেনে একটি বাসভবন নির্মাণ করেন এবং ১৮৯৪ খ্রিঃ থেকে ওই ভবনে বসবাস আরম্ভ করেন। বসুমল্লিক পরিবারের উপাস্য দেব শ্রীশ্রীধর জীউ তাঁদের আদিবাড়ি ৪৫ নম্বর ক্যাথিড্রাল মিশন লেনে (বর্তমানে শ্রীগোপাল মল্লিক লেন) আজও পূজিত হন। এই বাড়ির আরেক সুসন্তান হলেন রাজা সুবোধ মল্লিক।[৭৫]

বেথুন রো : এটি কলিকাতার প্রাচীন রাস্তা। আপজনের কলিকাতার মানচিত্রে পথটি বিনা নামে দেখানো আছে। পরবর্তীকালে রাস্তাটির নাম হয় কৃষ্ণ সিংহী লেন। কৃষ্ণ সিংহী হলেন জোড়াসাঁকোর দেওয়ান শান্তিরাম সিংহীর উত্তরপুরুষ। শান্তিরাম মিঃ মিডলটন ও স্যার টমাস র‍্যামবোল্ডের অধীনে প্রথমে পাটনা ও পরে মুর্শিদাবাদ জেলার দেওয়ান নিযুক্ত হন। শান্তিরামের দুই পুত্র : প্রাণকৃষ্ণ ও জয়কৃষ্ণ। প্রাণকৃষ্ণ ছিলেন জেনারেল ট্রেজারির দেওয়ান। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রের নাম ছিল শ্রীকৃষ্ণ সিংহী। মনে হয় তাঁর নামেই এই রাস্তার নামকরণ হয়েছিল।[৭৬]

শ্রীকৃষ্ণ সিংহ ডেভিড হেয়ার ও এইচ. এইচ. উইলসনের সঙ্গে একত্রে দেশের শিক্ষা-বিস্তারে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এ ছাড়াও তিনি হিন্দু কলেজের কার্যকরী সমিতির সদস্য ছিলেন। সে যুগে রামকমল সেনের নেতৃত্বে কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যখন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডিরোজিওকে হিন্দু কলেজ থেকে বরখাস্ত করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ সিংহ ডিরোজিওর পক্ষ অবলম্বন করে তাঁকে বিশেষ সহায়তা করেন।

মহামতি ডেভিড হেয়ারের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। ১৮৪২ খ্রিঃ ১লা জুন ডেভিড হেয়ারের মৃত্যু হলে ১৭ই জুন মেডিকেল কলেজ হলে এক সভায় ডেভিড হেয়ারের

স্মৃতিরক্ষার জন্য একটি মর্মর মূর্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে যে সমিতি গঠিত হয় শ্রীকৃষ্ণ সিংহ তাঁর অন্যতম সদস্য ছিলেন। তা ছাড়া ডেভিড হেয়ারের স্মৃতিসভা বহু বছর ধরে শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাড়িতে অনুষ্ঠিত হত।

১৮৪৩ খ্রিঃ গোড়ার দিকে ইংল্যান্ডের সমাজসংস্কার আন্দোলনের অন্যতম নেতা জর্জ টমসন দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে এদেশে আসেন। প্রথমে হিন্দু কলেজে ও পরে রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও চন্দ্রশেখর দেবের বাড়িতে টমসন সাহেবকে নিয়ে সভা করা হয়। তারপরে শ্রীকৃষ্ণ সিংহের মানিকতলার বাগানবাড়িতে ওই সভা প্রতি সপ্তাহে নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হত। প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজ বিরোধ বা বিদ্বেষ এই সভাগুলির লক্ষ্য না হলেও এর প্রভাবে শিক্ষিত বাঙালিদের মধ্যে দেশাত্মবোধের অঙ্কুর ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয়েছিল।

শ্রীকৃষ্ণ সিংহের চরিত্রে আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল নাটক ও নাট্যশালা সম্পর্কে তাঁর অসীম উৎসাহ। ১৮৩১ খ্রিঃ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বাগানবাড়িতে প্রসন্নকুমার ঠাকুর, শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, মাধবচন্দ্র মল্লিক, হরচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ নাট্যামোদীগণ সম্মিলিত হয়ে হিন্দু থিয়েটার স্থাপন করেন। এই নাট্যশালাই বাঙালির উদ্যোগে স্থাপিত প্রথম নাট্যশালা।

শুধু নাট্যশালা স্থাপনেই নয়, দেশীয় যাত্রার উন্নত সংস্করণ প্রবর্তনে শ্রীকৃষ্ণ সিংহের আগ্রহ কম ছিল না। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে লিখেছেন, "১৮৪৯ খ্রিঃ মার্চ মাসে একটি নতুন ধরনের যাত্রার অভিনয় হয়। ইহার নাম "নন্দ বিদায়" যাত্রা। ১৮৪৯-এর ১৪ই এপ্রিল তারিখে শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাড়িতে এই "নন্দ বিদায়" যাত্রার তৃতীয় অভিনয় হয়। ১৭ই এপ্রিল ১৮৪৯-এর 'সম্বাদ ভাস্করে' এ সম্বন্ধে লেখা হয়—"এতদ্দেশ্যে যে সকল যাত্রা হইয়া থাকে, এ যাত্রা সেরূপ যাত্রা নহে, ইহা নতুন প্রকার।" [৭৭] ১৮৬৮ খ্রিঃ বিডন স্ট্রিট নির্মিত হয়। ওই সময় কৃষ্ণ সিংহী লেনের উন্নয়ন করা হয়। রাস্তাটির নাম বদল করে বেথুন রো নামাঙ্কিত করা হয় সম্ভবত ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে।

শিক্ষাবিদ, সমাজসেবী, বহু ভাষাবিদ ও ভারতে নারী শিক্ষা প্রচলনের অন্যতম কর্ণধার জন এলিয়ট ড্রিংক ওয়াটার বেথুন (১৮০১-১৮৫১) স্কটল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন। কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজের মেধাবী ছাত্র ; কেমব্রিজের চতুর্থ র‍্যাংলার এবং গ্রিক, ল্যাটিন প্রভৃতি বহু ইউরোপীয় ভাষায় তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল। এ ছাড়া তাঁর কবিখ্যাতিও ছিল। ১৮৩৭ খ্রিঃ ব্যারিস্টারি পাশ করে আইন ব্যবসা শুরু করেন এবং ইংল্যান্ডের স্বরাষ্ট্র বিভাগে আইন বিষয়ক পরামর্শদাতারূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ১৮৪৮ খ্রিঃ বড়লাটের শাসন পরিষদের আইন সচিব হয়ে ভারতবর্ষে আসেন। ওই বছরই বেথুন কাউন্সিল অব এডুকেশন বা শিক্ষা পর্ষদের সভাপতির পদ লাভ করেন। কাউন্সিলের সভ্য রামগোপাল ঘোষের সঙ্গে পরিচয় হওয়াতে তিনি এদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এরই ফলশ্রুতি "নেটিভ ফিমেল স্কুল" নামে কলিকাতায় সাধারণের জন্য ৭ই মে ১৮৪৯ খ্রিঃ একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। এই বিদ্যালয়কে সার্থক করে তোলার জন্য তিনি সময়, শক্তি ও অর্থ প্রচুর ব্যয় করেন। বিদ্যালয়টি প্রথমে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সিমলা স্ট্রিটের বৈঠকখানা বাড়িতে আরম্ভ হয়। পরে হেদুয়ার পশ্চিম দিকের জমিতে বর্তমান বেথুন স্কুলগৃহ নির্মিত হয়। ৬ই নভেম্বর, ১৮৫০ খ্রিঃ সাড়ম্বরে স্কুলবাড়ির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল। বেথুন সাহেব কিন্তু ভবনের নির্মাণকার্যের সমাপ্তি দেখে যেতে পারেননি। এর পূর্বেই কলিকাতায় ১২ আগস্ট ১৮৫১ খ্রিঃ তাঁর জ্বর রোগে মৃত্যু হয়। তিনি তাঁর যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তি এই স্কুলের জন্য উইল করে দিয়ে যান। তাঁর মৃত্যুর কয়েক বছরের মধ্যে স্কুলটি বেথুন স্কুল নামে আখ্যাত হয়। বেথুন স্কুল ছাড়াও তিনি আরও কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বেথুন স্কুলের আরেক শুভানুধ্যায়ী মদনমোহন তর্কালঙ্কার বেথুনের পরামর্শে বালিকাদের উপযোগী পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। বেথুন সাহেব নিজে পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারকৃত স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক পুস্তকের একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশ করে প্রচার করেন। স্ত্রীশিক্ষা প্রচার ছাড়াও তাঁর কর্মধারা বহু দিকে প্রসারিত হয়েছিল। তিনি কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরি ও বঙ্গ ভাষানুবাদক সমাজের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। [৭৮]

বেথুন রো-এর সম্প্রসারণের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সিমলা অঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাস। বর্তমান

বেথুন কলেজের কিছু অংশ ও বেথুন রো-এর অংশবিশেষ নিয়ে অবস্থিত ছিল সিমলা বাজার। এই সিমলা বাজার সম্বন্ধে মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন—"আমাদের সময় যেটা সিমলা বাজার ছিল সেটা হল এখানকার বেথুন কলেজের বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ এবং খানিকটায় বেথুন কলেজের পশ্চিম দিককার রাস্তা হইয়াছে।" [৭৯] ১৮৭৯ খ্রিঃ বেথুন স্কুলে কলেজ বিভাগ খোলা হয়। এর ভারপ্রাপ্ত হলেন অধ্যাপক শশীভূষণ দত্ত। সরকার বেথুন কলেজ সম্প্রসারণের জন্য সিমলা বাজার অধিগ্রহণ করেন, তার কিছু অংশ বেথুন রো প্রশস্ত করার জন্য ক্রয়মূল্যে কলিকাতা পুরসভাকে হস্তান্তরের এক প্রস্তাব দেন। এই প্রসঙ্গে কলিকাতা পুরসভাকে লেখা বাংলা সরকারের সেক্রেটারির পত্র থেকে জানা যায় যে সরকার ২ বিঘা ৮ কাঠা ৮ ছটাক জমি ৮৩,১২০ টাকায় অধিগ্রহণ করেন। প্রতি কাঠার মূল্য ১৭১৪ টাকা, রাস্তা প্রশস্ত করার জন্য পুরসভার প্রয়োজন ৩ কাঠা ১২ বর্গফুট জমি। ওই জমি বিনামূল্যে সরকারের কাছ থেকে চাওয়া হয়েছিল। সরকার পুরসভার ওই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। অবশেষে পুরসভা তাঁদের ২৩শে মার্চ ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের অধিবেশনে সরকারের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। অর্থাৎ ১৭১৪ টাকা কাঠা দরে ৩ কাঠা ১২ বর্গফুট জমি সরকারের কাছ থেকে কেনার ব্যবস্থা হয়। [৮০]

এর পর বেথুন রো-তে ফুটপাতের ব্যবস্থা হয়। জেনারেল কমিটি ২৯শে মে ১৯১৪ খ্রিঃ ফুটপাত নির্মাণের জন্য ১৬৫৭ টাকা ব্যয় অনুমোদন করেন। ওই অর্থে বেথুন রো-এর পশ্চিম দিকে ৫ ফুট চওড়া ফুটপাত নির্মিত হয়।

সিমলা বাজারের মধ্য দিয়ে সাধারণের চলাচলের একটি পথ ছিল। এই পথ দিয়ে মানিকতলা স্ট্রিট, বেথুন রো ও সিমলা স্ট্রিটে আসা যাওয়া করা হত। বেথুন কলেজের জন্য বাজারের জমি অধিগ্রহণ করায় এবং পরবর্তীকালে বেথুন কলেজ প্রাচীর দিয়ে ঘিরে দেওয়াতে সেই পথটি বন্ধ হয়ে যায়। সাধারণের এই অসুবিধা দূর করার জন্য পুরসভা জেনারেল কমিটি তাঁদের ৩রা মে, ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের অধিবেশনে দুটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন—

১. বেথুন রো-কে ২৮ ফুট চওড়া করে সোজা মানিকতলা স্ট্রিট পর্যন্ত প্রসারিত করা।

২. বেথুন রো থেকে ২৮ ফুট কোনাকুনি রাস্তা নির্মাণ করে মানিকতলা স্ট্রিটের সঙ্গে সংযুক্তির করার ব্যবস্থা করা। এর জন্য ব্যয় ধরা হয়েছিল ২,২৪,৫৩৭ টাকা। [৮১]

উপরের এই প্রস্তাব রূপায়িত হলে পর বেথুন রো আকারে অনেকটা ইংরেজি 'H' অক্ষরের মতো দাঁড়ায়। বিডন স্ট্রিট থেকে বেথুন রো-এর দুটি শাখাপথ দক্ষিণে প্রসারিত হয়ে মানিকতলা স্ট্রিটে (রামদুলাল সরকার স্ট্রিট) এসে পড়েছে। বেথুন রো-এর আরেকটি শাখাপথ পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত হয়ে উপরের দুটি শাখাপথকে সংযুক্ত করেছে।

বেথুন রো-এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে ভারতের অন্যতম সুসন্তান বীর সন্ন্যাসী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, ধাত্রীবিদ্যা বিশারদ স্বনামধন্য কেদারনাথ দাস, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের প্রিয় ছাত্র ও শিল্পী কার্তিকচন্দ্র নান প্রমুখের নাম। প্রথমে কেদারনাথ দাসের কথা।

বেথুন রো-এর দাসেরা একটি বহু পরিচিত পরিবার। এঁদের বাসভবন ২০, ২১ ও ২২ নম্বর বেথুন রো। এই পরিবারের বহুমানভাজন কেদারনাথ দাস (১৮৬৭-১৯৩৬) ধাত্রীবিদ্যায় প্রবাদপুরুষ ছিলেন। পিতা যাদবকৃষ্ণ দাস ছিলেন হিন্দু স্কুলের শিক্ষক। ছাত্রজীবনে কেদারনাথ ছিলেন এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়ে প্রথম থেকে শেষ পরীক্ষা অবধি প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং শেষ পরীক্ষায় ধাত্রীবিদ্যায় পূর্ণ নম্বর পান। ১৮৯২ খ্রিঃ এম.বি. এবং ১৮৯৫ খ্রিঃ মাদ্রাজ থেকে এম.ডি. হন। সাত বছর তিনি মেডিকেল কলেজ ও ইডেন হাসপাতালের রেজিস্ট্রার ছিলেন। ১৮৯৯ খ্রিঃ ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলে ধাত্রীবিদ্যার শিক্ষক নিযুক্ত হন। এই সময় থেকে তিনি ধাত্রীবিদ্যা গবেষণায় নিযুক্ত থাকেন। ১৯১৪ খ্রিঃ প্রসব করাবার একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেন, নাম 'Das Forceps'। এর পর (১৯১৯) তিনি কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন এবং ১৯২২ খ্রিঃ ওই কলেজের অধ্যক্ষরূপে আমৃত্যু অধিষ্ঠিত ছিলেন। কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে (অধুনা আর. জি. কর মেডিকেল কলেজ) স্যার কেদারনাথ দাস প্রসূতি হাসপাতাল নামে পরিচিত বিভাগটি তাঁর প্রচেষ্টায় নির্মিত হয়। এই কলেজ হাসপাতালে তাঁর

সংগৃহীত পুস্তক এবং ডাক্তারি যন্ত্রপাতির মিউজিয়াম দর্শনীয় বস্তু। ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম F.C.O.G. উপাধিধারী। ভারত ধর্মমহামণ্ডল তাঁকে 'ধাত্রীবিদ্যার্ণব' উপাধি প্রদান করেন। দেশীয় চিকিৎসকদের ইউরোপীয় ডাক্তারদের সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে তাঁর অবদান স্মরণীয়। দেশি বিদেশি বহু প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ধাত্রীবিদ্যার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পুস্তক রচনা করেছিলেন। বাড়িতে সঙ্গীতচর্চার রেওয়াজ ছিল। তাঁর পৌত্র মুকুল দাস পেশায় ইঞ্জিনিয়ার হয়েও একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ গিটারবাদক রূপে পরিচিত।

স্বদেশভক্ত, ত্যাগী, বীর সন্ন্যাসী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় (ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়) অল্পবয়সে ক্ষাত্রশক্তির সাহায্যে দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের স্বপ্ন দেখতেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "তিনি ছিলেন রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসী, অপরপক্ষে বৈদান্তিক— তেজস্বী, নির্ভীক, ত্যাগী, বহুশ্রুত ও অসামান্য প্রতিভাশালী"। বেথুন রো-এর সঙ্গে ব্রহ্মবান্ধবের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। বেথুন রো-এর নান পরিবারের সন্তান কার্তিকচন্দ্র নানকে ছাত্ররূপে পান—যিনি ব্রহ্মবান্ধবের পরম স্নেহের পাত্র এবং পরবর্তীকালে তাঁর সর্ববিধ কর্মের একজন প্রধান সহায়ক হন। নান পরিবারের কার্তিক নান প্রসঙ্গ মানিকতলা স্ট্রিটে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

বেথুন রো-তে ব্রহ্মবান্ধব স্থাপন করেছিলেন কংকর্ড ক্লাব। এটির জন্ম ১৮৮৬ খ্রিঃ। স্থাপিত হয়েছিল কার্তিক নানের বাড়িতে—১৮ নম্বর বেথুন রো, তখনকার নাম কৃষ্ণ সিংহী লেন। ক্লাবের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন কুচবিহারের মহারাজা, সম্পাদক উইলিয়াম উইলসন হান্টার। সদস্যদের মধ্যে ছিলেন দেশীয় ও ইউরোপীয় সমাজের অনেক বিদ্বান ও খ্যাতিমান ব্যক্তি। স্থানের অকুলান হওয়াতে ক্লাবটিকে আপার সার্কুলার রোডের (এখন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড) একটি বাড়িতে উঠিয়ে আনা হয়—যে জমির ওপর এখন রাজাবাজার ট্রাম ডিপো। নানান বিষয় ছিল কংকর্ড ক্লাবের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত—ইতিহাস, দর্শন, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ক আলোচনা। এ ছাড়া ছিল বক্তৃতা, গানবাজনা, শরীরচর্চা, খেলাধূলা ইত্যাদি। ব্রহ্মবান্ধব ছিলেন ক্লাবের প্রাণপুরুষ। সব কাজেই তাঁর উৎসাহ, বিশেষত খেলাধূলায় ছিল তাঁর প্রবল আগ্রহ। কংকর্ড ক্লাবের মুখপত্ররূপে প্রকাশিত হয় কংকর্ড পত্রিকা। এই পত্রিকা সম্বন্ধে কিছু বলার আগে এর পূর্ব ইতিহাস জানা দরকার।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় কংকর্ড ক্লাব প্রতিষ্ঠার পূর্বে ঈগলস্ নেস্ট (Eagle's Nest) নামে আরেকটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। সহযোগী পেয়েছিলেন ব্রাহ্মসমাজের প্রমথলাল সেন, নন্দলাল সেন, বিনয়েন্দ্রনাথ সেন, মোহিতচন্দ্র সেন প্রমুখ উন্নত চরিত্রের যুবকগোষ্ঠী। এইসব যুবকদের উদ্যমের মূলে ছিল ধর্মানুরাগ এবং স্বদেশের উন্নতির জন্য ঐকান্তিক আগ্রহ। কৃষ্ণবিহারী সেনের বাড়িতে ঈগল্স নেস্ট-এর পত্তন হয়। সেখান থেকে ২৯/২, মদন মিত্র লেনে কিছুকাল থেকে ১৭ নম্বর ভবানী দত্ত লেনে এটি উঠে আসে। ঈগল্স নেস্টে ব্রহ্মবান্ধব সংস্কৃত পড়াতেন। এই প্রতিষ্ঠানের 'Youngman' নামে এক পাক্ষিক পত্রিকা ছিল। নন্দলাল সেন ও ব্রহ্মবান্ধব সেটা পরিচালনা করতেন। ওই পত্রিকাই রূপান্তরিত হয়ে সাপ্তাহিক এবং পরে মাসিক 'The Concord' নামে কংকর্ড ক্লাবের মুখপত্র হয়েছিল। ব্রহ্মবান্ধবের কাকা রেভারেন্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কংকর্ড পত্রিকার সম্পাদক আর ব্রহ্মবান্ধব হলেন ম্যানেজার। কংকর্ড ক্লাবের পরমায়ু বেশিদিন ছিল না, ১৮৮৭ সালের শেষের দিকে উঠে যায়। এর তিন বছর পরে ১৮৯০ সালে কংকর্ড ক্লাবের অনুরূপ উদ্দেশ্য নিয়ে Calcutta University Institute স্থাপিত হয়। গোড়ায় প্রতিষ্ঠানটির নাম ছিল—The Society for the Higher Training of Youngmen। প্রতিষ্ঠানটি আজ শতবর্ষের পাদপ্রদীপে এসে দাঁড়িয়েছে।

এরপর যে পত্রিকাটি ব্রহ্মবান্ধব প্রকাশ করেন তার নাম সোফিয়া (Sophia) মাসিক পত্রিকা। এরও আছে এক আকর্ষণীয় ইতিবৃত্ত। খ্রিস্টান হওয়ার পর ভবানীচরণ (ব্রহ্মবান্ধব) করাচিতে চলে যান। এই সময় তিনি শরৎচন্দ্র দত্তের বাড়িতে থাকতেন। পরবর্তীকালে শরৎচন্দ্রের কন্যা শ্রীমতী মহামায়ার (প্রবর্তক সংঘের অরুণচন্দ্র দত্তের ভগিনী) সঙ্গে কার্তিক নানের পুত্র সুধীরকুমার নানের বিবাহ হয়। করাচিতে থাকাকালীন ব্রহ্মবান্ধব Sind Times কাগজের সম্পাদকের কাজ কিছুদিন

করেছিলেন। এই সময় একজন সিভিল সার্জেনের ঘুষ নেওয়ার কথা কাগজে লেখায় তাই নিয়ে চারিদিকে হৈ-চৈ শুরু হয়। কাগজের মালিক এই বিতর্ক থেকে মুক্তি পাবার জন্য ব্রহ্মবান্ধবকে ক্ষমা চাইতে বলেন। সত্যাশ্রয়ী ব্রহ্মবান্ধব এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের সঙ্গে সঙ্গে সম্পাদকের পদে ইস্তফা দেন। এই সময় নিজে একটা কাগজ প্রকাশ করতে মনস্থ করেন। ১৮৯৪ সালের জানুয়ারি মাসে 'সোফিয়া' প্রকাশিত হয়। ক্যাথলিক কাগজ হলেও অন্যান্য ধর্মের বিশেষ করে বেদ-উপনিষদ-পুরাণ প্রভৃতির তত্ত্ব নিরপেক্ষভাবে পাঠকদের সামনে উপস্থিত করা সোফিয়ার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। সোফিয়া যে সালে প্রকাশিত হয় সেই সালে ব্রহ্মবান্ধব সন্ন্যাসীভাবে জীবনযাপন ও গৈরিক ধারণ আরম্ভ করেন। 'ব্রহ্মবান্ধব' নামগ্রহণ সেই সালের ঘটনা। ১৮৯৯ সালের মার্চ মাসে সোফিয়ার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। ১৯০০ সালের গোড়ার দিকে তিনি কলিকাতায় চলে আসেন। এখন থেকে কলিকাতাই তাঁর কর্মকেন্দ্র হল।

করাচিতে মাসিক সোফিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার তিন মাসের মধ্যে ১৯০০ খ্রিঃ জুন মাসে কার্তিকচন্দ্র নানের সহায়তায় সাপ্তাহিকরূপে সোফিয়ার পুনরুজ্জীবন হয়। খ্রিস্টান সম্প্রদায় পুনরায় এই পত্রিকার বিরুদ্ধাচরণ শুরু করেন। তাঁরা মন্তব্য করলেন, ব্রহ্মবান্ধব সোফিয়াতে খ্রিস্টধর্মকে হিন্দু সাজ পরাবার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের এই অসহযোগিতার ফলে ৮ ডিসেম্বর সোফিয়ার শেষ সংখ্যা প্রকাশ করে পত্রিকাটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে জানিয়ে দেওয়া হয় শীঘ্রই নতুন একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে।

১৯০১ সালে ৩১শে জানুয়ারি নতুন পত্রিকা 'The Twentieth Century'-র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। প্রকাশক কার্তিকচন্দ্র নান, যুগ্ম সম্পাদক—নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। এই কাগজে ব্রহ্মবান্ধবের দর্শন বিষয়ের প্রবন্ধগুলি 'নরহরি দাস'-এই ছদ্মনামে এবং অন্যান্য বিষয়ের উপর লেখা স্বনামে প্রকাশিত হয়। The Twentieth Century পত্রিকাতে যাঁদের লেখা প্রকাশিত হয়েছিল তাঁদের মধ্যে রমেশচন্দ্র দত্ত, প্রমথলাল সেন, মোহিতচন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ প্রমুখের নাম উল্লেখ্য। বিদেশি লেখক-লেখিকারাও ছিলেন, যেমন উইনতার-নিত্‌জ্‌, মেরিভিন মারি স্নেল প্রমুখ।

ইংরাজি সাপ্তাহিক সোফিয়া ও টোয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরি-র দুটি প্রবন্ধ কিন্তু বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পক্ষে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তার একটি হল ১৯০০ সালের ১লা সেপ্টেম্বর সাপ্তাহিক সোফিয়াতে প্রকাশিত ব্রহ্মবান্ধবের ''The World Poet of Bengal'' শীর্ষক প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে ব্রহ্মবান্ধব রবীন্দ্রনাথকে সর্বপ্রথম World Poet বা বিশ্বকবি বলে অভিনন্দিত করেন। ব্রহ্মবান্ধব লেখেন "রবীন্দ্রনাথ শুধু প্রেম ও প্রকৃতির কবি নন, যাকে চোখে দেখা যায় না, তাকেও তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ রহস্যময় অরূপজগতের প্রত্যক্ষদর্শী। বিদেশিরা যদি কোনওদিন বাংলা ভাষা শেখে, তারা শিখবে শুধু রবীন্দ্রনাথের জন্যই, রবীন্দ্রনাথ একজন বিশ্বকবি।"

রবীন্দ্রনাথের সদ্য প্রকাশিত 'নৈবেদ্য' কবিতার ওপর ব্রহ্মবান্ধবের একটি সমালোচনা প্রবন্ধ ১৯০১ সালের জুলাই মাসের The Twentieth Century পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের সূচনা প্রসঙ্গে ব্রহ্মবান্ধবের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্রের কথা বলতে গিয়েও রবীন্দ্রনাথ টোয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরির এই প্রবন্ধের উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "এমন সময় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। আমার নৈবেদ্যের কবিতাগুলি প্রকাশ হচ্ছিল কিছুকাল পূর্বে। এই কবিতাগুলি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তাঁর সম্পাদিত Twentieth Century পত্রিকায় এই রচনাগুলির যে প্রশংসা তিনি ব্যক্ত করেছিলেন সেকালে সেরকম উদার প্রশংসা আমি আর কোথাও পাইনি। বস্তুত এর অনেককাল পরে এই সকল কবিতার কিছু অংশ এবং 'খেয়া' ও 'গীতাঞ্জলি' থেকে এই জাতীয় কবিতার ইংরাজি অনুবাদের যোগে যে সম্মান (নোবেল প্রাইজের সম্মান) পেয়েছিলেম, তিনি আমাকে অকুণ্ঠিত সম্মান দিয়েছিলেন সেই সময়েই"।

বৈদিক আদর্শে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করে মানুষ তৈরি করাই ছিল ব্রহ্মবান্ধবের মূল উদ্দেশ্য। দু'চারটি ছেলে নিয়ে 'আয়তন' স্থাপন করেন। তাঁর আদর্শ ছিল প্রাচীন ভারতের গুরুগৃহের শিক্ষা। কার্তিক নানের পুত্র সুধীর এবং আরও কয়েকটি আত্মীয় বন্ধুর পুত্রদের ছাত্ররূপে পাওয়া গেল।

প্রথমে 'আয়তন'-এর কর্মকাণ্ড কার্তিক নানের বেথুন রো-এর বাড়িতে আরম্ভ হয়। পরে সিমলা স্ট্রিটে এই আয়তনের জন্য একটি বাড়ি ভাড়া করা হয়। সেই সময় কার্তিক নানের বেথুন রো-এর বাড়িই ছিল ব্রহ্মবান্ধবের অফিস ও বাসস্থান। এই বাড়িতেই রবীন্দ্রনাথের আগমন হত। রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকো থেকে কখনও ঘোড়ার গাড়িতে কখনও বা হেঁটে আসতেন। —"কার্তিকবাবু আছেন ?" বলে ডাক দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় বারান্দায় এসে মেজেতে উপবিষ্ট গৈরিকধারী ব্রহ্মবান্ধবের সহিত আলাপরত হতেন। রবীন্দ্রনাথের বসার জন্য একটি চেয়ার আনা হত। উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির ফলে ক্রমে জানা গেল শান্তিনিকেতন আশ্রমে একটি আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপনে রবীন্দ্রনাথ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অনুমতি পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় স্থাপনকালে (১৯০১) ব্রহ্মবান্ধবের সক্রিয় সাহায্য পান। কিন্তু ১৯০২ সালের আগস্ট মাসে ব্রহ্মবান্ধব ও তাঁর খ্রিস্টান অনুগামী রেবাচাঁদ শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে আসেন। তাঁরা চলে আসার পর আরও কয়েকটি ছেলেও চলে আসে। এদের নিয়ে কলিকাতায় 'সারস্বত আয়তন' খোলা হয়। রেবাচাঁদ এই বিদ্যালয়ের পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করলেন। ১৯০৪ সালে সারস্বত আয়তনের পরিচালনার ব্যাপার নিয়ে ব্রহ্মবান্ধবের সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় রেবাচাঁদ পৃথক হয়ে Boys Own Home নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়টি সেকালের একটি উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় বলে খ্যাতিলাভ করেছিল। শিক্ষাবিষয়ক স্যাডলার কমিশনের রিপোর্টে বয়েজ ওন হোমের ভূয়সী প্রশংসা আছে। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং একবার বয়েজ ওন হোমের পুরস্কার বিতরণীসভায় সভাপতি হয়ে রেবাচাঁদের কীর্তিকে অভিনন্দন জানান। এই বয়েজ ওন হোমের এক ছাত্র প্রদ্যোৎকুমার রুদ্র তাঁর কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে তাঁর স্কুলের নামে বয়েজ ওন লাইব্রেরি নামে এক ক্ষুদ্র পাঠাগার স্থাপন করেন। কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সেই ক্ষুদ্র পাঠাগার আজ এক মহীরূহে রূপান্তরিত হয়ে প্রায় শতবর্ষের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে।

জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত বেথুন রো-এর কার্তিক নানের বাড়ির সঙ্গে ব্রহ্মবান্ধবের সম্পর্ক ছিল নিবিড়। ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯০৭ সালে কিংসফোর্ডের আদালতে 'সন্ধ্যা' পত্রিকার মামলা চলাকালীন অবস্থায় ব্রহ্মবান্ধব অসুস্থ হয়ে পড়েন। কার্তিক নানের বাড়িতে তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। অবস্থার দ্রুত অবনতি হওয়ায় ২১শে অক্টোবর সোমবার সন্ধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব কার্তিক নানের বাড়ি থেকে ক্যাম্বেল হাসপাতালে (নীলরতন সরকার হাসপাতাল) স্থানান্তরিত হন। ২৬শে অক্টোবর শনিবার সন্ধ্যা পত্রিকার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় রাজদ্রোহের মামলা দায়ের করা হয়। হাসপাতালে ব্রহ্মবান্ধবের শয্যার পাশে পুলিশ বসে। ২৭শে অক্টোবর ১৯০৭ সালে ব্রহ্মবান্ধব হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।[৮২]

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের জীবনের বিবিধ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ক্ষুদ্র পথ বেথুন রো কলিকাতার ইতিহাসে এক গৌরবের আসন অধিকার করে আছে।

উনবিংশ শতাব্দীর নয়ের দশকে রাজাবাগান অঞ্চলে এক বিরাট বস্তি অপসারণ করে তিনটি নতুন রাস্তা নির্মিত হয়। পুরসভা তাঁদের ৩রা ডিসেম্বর ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের অধিবেশনে এই তিনটি রাস্তার নামকরণ এইভাবে করেন—

(১) রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রিট
(২) ডালিমতলা লেন ও
(৩) ভালুকপাড়া লেন

রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রিট কর্নওয়ালিস স্ট্রিট (বিধান সরণি) থেকে শুরু হয়ে সোজাসুজি পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে আপার সার্কুলার রোডে (আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড) এসে পড়েছে।

কলিকাতাস্থ শোভাবাজারের রাজ পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজা নবকৃষ্ণের সাতজন পত্নী ছিলেন। তাঁরা সকলেই নিঃসন্তান হওয়াতে রাজা নবকৃষ্ণ তাঁর দাদা রামসুন্দর দেবের পুত্র গোপীমোহন দেবকে দত্তক গ্রহণ করেন। তিনি সুবিখ্যাত রাধাকান্ত দেবের পিতা। দত্তক গ্রহণের পর এক পত্নীর গর্ভে নবকৃষ্ণের এক পুত্র সন্তান জন্মে ; তাঁর নাম রাজকৃষ্ণ দেব। রাজকৃষ্ণের জন্ম

১৭৮২ খ্রিঃ, মৃত্যু ১৯শে আগস্ট ১৮২৩ খ্রিঃ। নবকৃষ্ণের মৃত্যুর পর তাঁর জমিদারি ও বিষয়সম্পত্তি রাজা গোপীমোহন দেব ও রাজা রাজকৃষ্ণ দেবের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ হয়। রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিটের সমস্ত দক্ষিণ ভাগ রাজা রাজকৃষ্ণ-এর অংশে পড়ে আর সমস্ত উত্তর ভাগ রাজা গোপীমোহন দেব পান।

রাজা রাজকৃষ্ণ মুসলমানি পোশাকআশাক ও চালচলন পছন্দ করতেন। তিনি সঙ্গীতের অনুরাগী ছিলেন। মুসলমান সঙ্গীতজ্ঞ, বাদক ও বাইজিদের প্রতি বিশেষ পক্ষপাতিত্ব ছিল। কালীপ্রসাদ দত্তের মতো তাঁরও যবনী দোষ ছিল। তাঁর মুসলমান রক্ষিতার জন্য রাজবাড়ির কাছেই এক মসজিদ নির্মাণ করে দিয়েছিলেন, সে মসজিদ আজও আছে। মুসলমানদের মহরমের মিছিলে অংশ নিতেন, আবার হিন্দুদের উৎসব অনুষ্ঠানেও যোগ দিতেন।

৫ই এপ্রিল ১৮৩৪ খ্রিঃ 'সমাচার দর্পণে'একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল যে কলিকাতার কোনও ব্যক্তি নাগ্নিজান, সুপন জান ও নিক্তি প্রভৃতি যবনী বাইজিদের সঙ্গে বারো বছরেরও বেশি কাল একান্নভুক্ত থেকে নগরকীর্তন উপলক্ষে আবার হিন্দুদের মধ্যে গৃহীত হন। অনেকের মতে এই ব্যক্তি রাজা রাজকৃষ্ণ দেব।[৮৩]

রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রিট নামে রাজপথটি আকারে ছোট হলেও কলিকাতার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এই রাস্তাটির অবদান কম নয়। এই পথের ধারে স্থাপিত হয়েছে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, চারটি রঙ্গমঞ্চ—বিশ্বরূপা, রঙ্গনা, বিজন থিয়েটার, সারকারিনা আর আছে একটি সিনেমা হল, নাম পূর্ণশ্রী। কলিকাতার অন্যতম প্রাচীন রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষাকেন্দ্র "গীতবিতান" এই পথের ধারেই অবস্থিত।

বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক "বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়ণ" সূত্রের রূপকার, পরবর্তীকালে বোস সংখ্যায়ণ (Bose Statistics) নামেই সুপরিচিত, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার অন্যতম পথিকৃত আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু (১৮৯৪-১৯৭৪) এই বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করার সময় থেকেই বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার বিষয়টিকে প্রাধান্য দিতে থাকেন। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তাঁর উদ্দীপনা ও উৎসাহে "বিজ্ঞান পরিচয়" নামে একটি দ্বিমাসিক বিজ্ঞান পত্রিকা ঢাকা থেকে প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চায় সত্যেন্দ্রনাথের এই উদ্যমকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রমুখ মনীষীবর্গ। তার আগে অর্থাৎ ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে 'পরিচয়' পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায় 'বিজ্ঞানের সঙ্কট' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ভারতের স্বাধীনতালাভের অব্যবহিত পরেই তিনি বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার জন্য "বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ" স্থাপনে উদ্যোগী হন। এই উদ্দেশ্যে ১৯৪৭ খ্রিঃ ১৮ই অক্টোবর কলিকাতার রাজাবাজারের বিজ্ঞান কলেজে একটি সভা আহ্বান করেন। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন তাঁর বহু সহকর্মী, ছাত্র ও বিদগ্ধ ব্যক্তিবর্গ। সভায় স্থির হয়—বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করা, সমাজকে বিজ্ঞান সচেতন করা এবং সমাজ কল্যাণে বিজ্ঞানের প্রয়োগের উদ্দেশ্যে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করা। প্রতিষ্ঠানটির নাম দেওয়া হয় 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ'। ১৯৪৮ খ্রিঃ ২৫শে জানুয়ারি পরিষদের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানচর্চার প্রচেষ্টা ভারতবর্ষে এই প্রথম। সত্যেন্দ্রনাথ আমৃত্যু এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন। পরিষদের কর্মধারা নির্বাহ হত সার্কুলার রোডে (এখন আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড) অবস্থিত "মিলন মন্দির" ভবন থেকে (Federation Hall)। ১৯৪৮ খ্রিঃ জানুয়ারি মাসে পরিষদের মুখপত্র "জ্ঞান ও বিজ্ঞান" নামে বিজ্ঞানভিত্তিক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। আজও এই পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। প্রধানত আচার্য বসুর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় ১৯৬৯ খ্রিঃ কলিকাতার গোয়াবাগানে রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রিটের উপর পরিষদের নিজস্ব ভবন নির্মিত হয় (পি-২৩)।[৮৪] বর্তমানে এখানে আছে আলোচনা সভাগৃহ, একটি সুদৃশ্য গ্রন্থাগার আর আছে রেডিও, টেলিভিশন, ফটোগ্রাফি প্রভৃতি বিষয় হাতে-কলমে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা। এ ছাড়া বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে বাংলায় আলোচনা, বিতর্ক প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার যে উজ্জ্বল দীপশিখাটি আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন সেটি আজও অম্লান।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ ১৯এ ও বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রিটে অবস্থিত। রামকৃষ্ণদেবের মন্ত্রশিষ্য

কালীপ্রসাদ চন্দ্রের বেদান্তে গভীর ব্যুৎপত্তি থাকায় তাঁর গুরুভাইরা তাঁকে কালীবেদান্তী বলতেন। উত্তরকালে তিনিই স্বামী অভেদানন্দ (১৮৬৬-১৯৩৯)। শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের প্রতিষ্ঠাতা।

১৯২৩ খ্রিঃ স্বামী অভেদানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটি (পরে মঠ) স্থাপন করেন। এটি তখন ৪৮বি, মেছুয়াবাজার স্ট্রিটের দোতলা ভাড়া বাড়িতে ছিল। ১লা মে, ১৯২৩ খ্রিঃ প্রতিষ্ঠানটি ১১নং ইডেন হসপিটাল রোডে (এখন ডাক্তার ললিত ব্যানার্জি রোড) উঠে আসে। এর পর প্রতিষ্ঠানটিকে ৪০নং বিডন স্ট্রিটের (এখন অভেদানন্দ রোড) বাড়িতে স্থানান্তরিত করা হয়। সময় ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ২৭ জুলাই। ওই বছরের ৭ই সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠানটি ১৮৬০ সালের ২১ আইন অনুসারে রেজিস্ট্রিকৃত হয়। সমিতির উদ্দেশ্য এইভাবে নির্ধারিত হয় :—

(১) বেদান্তমতে দ্বৈত, বিশিষ্ট দ্বৈত ও অদ্বৈত ভাবের সমন্বয়, জগতের অন্যান্য ধর্মের সহিত সম্বন্ধ নির্ণয়, আধ্যাত্মিক প্রচার ও শিক্ষাদান।
(২) ধর্মোপদেশ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতিকে পূর্ণাঙ্গ করা।
(৩) অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রচলন ও বিস্তার।
(৪) সামাজিক বৈষম্য ও সঙ্কীর্ণতার দূরীকরণ।
(৫) পীড়িত ও বিপন্ন ব্যক্তিকে সাহায্য প্রদান এবং
(৬) কুটিরশিল্পের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি সাধন।

সমিতির মুখপত্র 'বিশ্ববাণী'—পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১লা বৈশাখ, বাং ১৩৩৪ সনে। এই সমিতির সভাপতি ছিলেন স্বয়ং স্বামী অভেদানন্দ।

১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের প্রথমভাগে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মন্দির এবং বিবেকানন্দের স্মৃতিমণ্ডপ নির্মাণকল্পে স্বামী অভেদানন্দের নেতৃত্বে এই বিডন স্ট্রিটের ভবন থেকে নব উদ্যোগে কাজ শুরু হয়। এই বছরের ৫ই মার্চ বিরাট জনসভা হয় অ্যালবার্ট হলে। কলেজ স্ট্রিটের যে ভবনে আজকের কফি হাউস অবস্থিত সেই ভবনে ছিল অ্যালবার্ট হল। এই সভায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মন্দির নির্মাণের প্রাথমিক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

এদিকে বেদান্ত সমিতি ও রামকৃষ্ণদেবের মন্দির নির্মাণের জন্য জমি খোঁজা শুরু হয়। অবশেষে রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রিটে ১১ কাঠা জমি পাওয়া যায়। শোভাবাজারের কুমার প্রফুল্লদেব ওই জমি ১৮,৫০০ টাকায় বিক্রি করেন। নড়াইলের জমিদার বীরেন্দ্রনাথ রায় ও তাঁর ভাইয়েরা জমি কেনার টাকার বড় অংশ দান করেন। ৬ই মার্চ ১৯২৯ খ্রিঃ ওই জমি তখনকার বেদান্ত সোসাইটির সম্পাদক ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়ের নামে খরিদ করা হয়। পরে ওই জমি স্বামী অভেদানন্দের নামে হস্তান্তরিত করা হয়। ভবনের নির্মাণকার্যের তত্ত্বাবধানের সুবিধার জন্য সমিতি ১৩বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রিটে ভাড়া করা বাড়িতে উঠে আসেন। ওই বছরের ৩০শে আগস্ট সোসাইটি ভাড়া বাড়ি ছেড়ে নবনির্মিত ভবনে চলে আসেন। ১৯৩৫ খ্রিঃ ৬ই মার্চ স্বামী অভেদানন্দ রামকৃষ্ণদেবের মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন। ঠিক দু' বছর পরে ১৯৩৭ খ্রিঃ ১৪ মার্চ নতুন মন্দির নির্মিত হয়। এর পূর্বে ২রা মার্চ ১৯৩৭ খ্রিঃ বিবেকানন্দ-স্মৃতিভবনের দ্বারোদ্ঘাটন এবং রামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথিতে মন্দিরে ঠাকুরের চিত্রমূর্তি স্থাপন করা হয়। ১৯৩৯ খ্রিঃ ২০শে ফেব্রুয়ারি স্বামী অভেদানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটির সকল সম্পত্তি বেদান্ত মঠের নামে উৎসর্গ করেন এবং ৭ জন সন্ন্যাসী শিষ্যকে নিয়ে ট্রাস্টিবোর্ড গঠন করেন। ওই দিন থেকে প্রতিষ্ঠিত হয় 'শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ' এবং সঙ্ঘের নাম হয় শ্রীরামকৃষ্ণ অভেদানন্দ সঙ্ঘ। বেদান্ত মঠের অনেকগুলি শাখা আছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—দার্জিলিং-এ রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম, মজঃফরপুর জেলার মিথানপুর গ্রামে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, কোচবিহারের অন্তর্গত নীলকুঠিতে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম, কার্শিয়াং-এ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম এবং শিলিগুড়ি শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম প্রভৃতি।

এদিকে কলিকাতার মঠে স্থানের অকুলান হওয়ায় মঠের পাশের জমি খরিদের ব্যবস্থা হয়। সেখানে ছিল পালেদের বিরাট কাঠের গোলা। মালিক ছিলেন ধীরেন পাল। স্বামী অভেদানন্দের জীবিতকালে ওই জমি কেনা হয়। এটি ১৯এ, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রিটের ওপর অবস্থিত।

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রিটের ভবনের একতলায় আছে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মন্দির। এখানে

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শ্বেতপাথরের মূর্তি স্থাপিত হয় ১৯৮০ খ্রিঃ ১৭ই নভেম্বর। মন্দিরের পাশেই আছে প্রকাশন বিভাগ। এখান থেকে মঠের মুখপত্র মাসিক বিশ্ববাণী পত্রিকা, স্বামী অভেদানন্দের রচনাবলী ও স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ এবং অন্যান্য লেখকদের পুস্তক প্রকাশিত হয়। এই বাড়ির দোতলায় তিনটি ঘর স্বামী অভেদানন্দ স্বয়ং ব্যবহার করতেন—প্রথমটি তাঁর বেদান্ত দর্শন ও যোগ শিক্ষা দেবার কক্ষ, দ্বিতীয়টি তাঁর শয়নঘর, আর শেষেরটি তাঁর ভোজনকক্ষ। যোগ শিক্ষা কক্ষে আছে চেকোস্লোভাকিয়ার রাজধানী প্রাগ-এর বিদগ্ধ শিল্পী Frant Dvorak-এর আঁকা বিশাল আকারের শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ও মা সারদামণির প্রাণবন্ত তৈলচিত্র। শয়নঘরে আছে ব্রহ্মদেশ থেকে আনা বুদ্ধমূর্তি, বিভিন্ন দেশ থেকে পাওয়া নানা মানপত্র। সকল সম্ভার সযত্নে সাজান আছে।

১৯এ, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রিটের ভবনটির আকার ইংরাজি 'L' অক্ষরের মতো। এই ভবনের একতলার একদিকে আছে দুর্গামণ্ডপ, অন্য দিকে বক্তৃতাকক্ষ। দ্বিতলে আছে বহু পুস্তকে সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার, সুদৃশ্য পাঠকক্ষ, রন্ধনশালা ও ভোজনকক্ষ। ত্রিতলে আছে সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও অতিথি অভ্যাগতদের আবাসকক্ষ।[৮৫]

রামকৃষ্ণদেবের ভজন পূজন আরাধনার কেন্দ্ররূপে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ কলিকাতাবাসীর কাছে এক পরমতীর্থ।

বিশ্বরূপা থিয়েটারের পূর্বের নাম নাট্য নিকেতন থিয়েটার। ১৯৩১ খ্রিঃ প্রবোধচন্দ্র গুহ নাট্য নিকেতন থিয়েটার স্থাপন করেন। 'জননী' নাটকে এই থিয়েটারে প্রথম 'ওয়াগন স্টেজ' ব্যবহৃত হয়। সতু সেন ও নির্মলেন্দু লাহিড়ী অনেকদিন এই থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। চক্রব্যূহ ও সিরাজদৌল্লা (১৯৩৮) তাঁদের পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয়। দশ বছর এই থিয়েটার চালাবার পর প্রবোধচন্দ্র গুহ এর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন। থিয়েটারের স্বত্ত্বাধিকারী হয়ে মঞ্চে অবতীর্ণ হলেন শিশিরকুমার ভাদুড়ী (১৮৮৯-১৯৫৯)। থিয়েটারের নতুন নামকরণ করলেন শ্রীরঙ্গম।

শ্রীরঙ্গমের উদ্বোধন হয় ১০ই জানুয়ারি ১৯৪২ খ্রিঃ। ওই দিন মঞ্চস্থ হয় নতুন নাট্যকার তারাকুমার মুখোপাধ্যায়ের রচিত 'জীবনরঙ্গ' নাটক। এরপর শিশিরকুমারের পরিচালনায় অনেকগুলি স্মরণীয় নাটক পরিবেশিত হয়—যথা, মাইকেল মধুসূদন, পরিচয়, প্রশ্ন, তখত্-এ তাউস প্রভৃতি। শ্রীরঙ্গমের শেষ স্মরণীয় অর্ঘ্য ১৯৫১ সালে আলমগীর নাটকের অভিনয়। ১৯৫৬ সালে শিশিরকুমার শ্রীরঙ্গম ছেড়ে চলে আসেন।[৮৬]

শিশিরকুমারের পরে এই থিয়েটারের স্বত্ত্বাধিকারী হলেন ব্যবসায়ী রাসবিহারী সরকার। তিনি মঞ্চগৃহের নতুন নামকরণ করেন 'বিশ্বরূপা' (১৯৫৬)। বহু বিখ্যাত নাটক এই মঞ্চে অভিনীত হয়েছিল, তার মধ্যে 'সেতু' নাটক অন্যতম।

রঙ্গনা থিয়েটার ১৯৭০ খ্রিঃ রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রিটে স্থাপিত হয়। নান্দীকার নাট্যগোষ্ঠী প্রথম থেকেই এখানে অভিনয় করেছেন। 'তিন পয়সার পালা' তাঁদের মঞ্চসফল নাটক। নান্দীকার নাট্যগোষ্ঠীর জন্যে 'রঙ্গনা' জনমানসে বিখ্যাত হয়ে ওঠে।

১৯৭৬ খ্রিঃ সারকারিনা থিয়েটার প্রতিষ্ঠা হয়। এই রঙ্গমঞ্চ অনেকটা সার্কাস এরেনার (Circus Arena) আকারে নির্মিত। গোলাকার মঞ্চ, চারিদিকে দর্শকের আসন, মাঝখানে মঞ্চটি। এটি ঘূর্ণায়মান, একই সঙ্গে ওপরে নীচে ওঠানামা করে। আধুনিক্ প্রযুক্তিতে এটি তৈরি।

বাংলা নাট্যমঞ্চের খ্যাতনামা নাট্যকার, সুঅভিনেতা বিজন ভট্টাচার্য (১৯১৭-১৯৭৮)-এর নামে "বিজন থিয়েটার"। ১৯৭৯ খ্রিঃ এটি স্থাপিত হয়। রঙ্গনার ঠিক উল্টোদিকে রঙ্গমঞ্চটি স্থাপিত। প্রথম দিকে এখানে গ্রুপ থিয়েটারের নাটক অভিনীত হত। পরবর্তীকালে ব্যবসায়িক নাটকও অভিনীত হতে থাকে।

নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য বাংলার নাট্যজগতের একজন স্বনামধন্য পুরুষ। প্রথম জীবনে তিনি গল্প, ফিচার ও স্কেচ লিখতেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরুতে মামা সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রতিষ্ঠিত 'অরণি' পত্রিকায় গল্প ও নানা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতে থাকেন। পরে কমিউনিস্ট ভাবাদর্শে প্রভাবিত হন এবং ১৯৪২ খ্রিঃ কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়ে সর্বক্ষণের কর্মী হন। ফ্যাসীবিরোধী লেখক ও

শিল্পী সঙ্ঘ, প্রগতি লেখক সঙ্ঘ ও ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। তাঁর প্রথম নাটক 'আগুন' ১৯৪৩ খ্রিঃ নাট্য ভারতীতে অভিনীত হয়। 'জবানবন্দী' নাটকের পর দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের পটভূমিকায় তাঁর বিখ্যাত নাটক 'নবান্ন'। ১৯৪৪ খ্রিঃ ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ নাটকটি মঞ্চস্থ করে এবং প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেন বিজন ভট্টাচার্য স্বয়ং। ১৯৪৩ খ্রিঃ লেখিকা মহাশ্বেতা দেবীর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। ১৯৫০ খ্রিঃ 'ক্যালকাটা থিয়েটার গ্রুপ' স্থাপন করে ২০ বছর প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। পর পর অনেকগুলি নাটক লেখেন—জীবনকন্যা, মরা চাঁদ, দেবীগর্জন, কলঙ্ক, গোত্রান্তর, ছায়াপথ, মাস্টারমশাই, হাঁসখালির হাঁস প্রভৃতি। ১৯৭০ খ্রিঃ ক্যালকাটা থিয়েটার গ্রুপ ছেড়ে 'কবচ কুণ্ডল' নামে নাট্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে আমৃত্যু ওই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এ সময় তাঁর লেখা কৃষ্ণপক্ষ, আজ বসন্ত, সোনার বাংলা, চলো সাগরে প্রভৃতি নাটক মঞ্চে অভিনীত হয়েছিল। চলচ্চিত্রেও তিনি অভিনয় করেছেন। তিনি মানুষের বেদনা ও সামগ্রিক জীবনকে প্রকাশ করেছেন বিভিন্ন পটভূমিকায় লেখা তাঁর নাটকে। কেন্দ্রীয় সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি, পশ্চিমবঙ্গ অ্যাকাডেমি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে মানপত্র দিয়ে সম্মানিত করেছেন।[৮৭]

ডালিমতলা লেন রাস্তাটি নির্মাণের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। রাস্তাটি গ্রে স্ট্রিট থেকে শুরু হয়ে সোজা দক্ষিণে প্রসারিত হয়ে হোগলকুড়িয়া গলি (সাহিত্য পরিষদ স্ট্রিট)-তে এসে মিশেছে। কলিকাতা পুরসভা তাঁদের ২৩শে জুলাই ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের অধিবেশনে রাস্তাটি ৪০ ফুট করার জন্য কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থার (C.I.T.) কাছে প্রস্তাব রাখেন। গোয়াবাগান বস্তি অপসারণ করার সময় ডালিমতলা লেন, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রিট ও সাহিত্য পরিষদ স্ট্রিটের অংশবিশেষ প্রশস্ত করা হয়। তখন এই অংশটুকু সি.আই.টি. স্কিম নম্বর LXIV ও LXIVA-এর অংশভুক্ত করা হয়। রাস্তার এই অংশটুকুর উপর অবস্থিত কলিকাতার একটি প্রাচীন গ্রন্থাগার 'বয়েজ ওন লাইব্রেরি ও ইয়ং ম্যানস্ ইনস্টিটিউট'। এটি ১৯০৯ খ্রিঃ স্থাপিত। সাধারণের ও গ্রন্থাগারের সদস্যদের অনুদানে এই গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষ সুদৃশ্য চারতলা ভবন ও সঙ্গে একটি ছোটখাটো রঙ্গমঞ্চ তৈরি করেছেন। এঁদের সংগ্রহে প্রায় ৪০ হাজারের মতো বিভিন্ন বিষয়ের পুস্তক আছে। আর আছে ছাত্রদের জন্য পাঠ্যপুস্তক বিভাগ। লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষ এই রাস্তাটির নাম বয়েজ ওন লাইব্রেরি রো রাখার এক প্রস্তাব দেন। কলিকাতার পুরসভার অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ২৫শে ফেব্রুয়ারি ১৯৮১ খ্রিঃ এক আদেশবলে রাস্তাটির নাম 'বয়েজ ওন লাইব্রেরি রো' নামাঙ্কিত করেন। এই নামকরণের ফলে পূর্বের ডালিমতলা লেন দু'ভাগে বিভক্ত হয়। প্রথম অংশ গ্রে স্ট্রিট (শ্রীঅরবিন্দ সরণি) থেকে রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রিট পর্যন্ত—নাম ডালিমতলা লেন, আর দ্বিতীয় অংশ বয়েজ ওন লাইব্রেরি রো—রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রিট থেকে সাহিত্য পরিষদ স্ট্রিট পর্যন্ত প্রসারিত।

ভালুকপাড়া লেন : ভালুক ও বাঁদরের নানা প্রকারের নাচ দেখিয়ে যারা জীবিকা অর্জন করত, তারা দলবদ্ধভাবে এক সময় এই অঞ্চলে বাস করত। বাবু কালীনাথ মিত্র ছিলেন এই ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি। তাঁরই সুপারিশে পুরসভা এই রাস্তাটির নাম 'ভালুকপাড়া লেন' নামকরণ করেন। বস্তি উচ্ছেদের পর এখানে ধীরে ধীরে "ভদ্রলোকের বসতি" গড়ে উঠে। তাঁরা এই রাস্তার নাম বদলে তৎপর হয়ে ওঠেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদও পল্লীবাসীদের এই প্রচেষ্টায় সামিল হন। উভয়ে মিলিতভাবে পুরসভার কাছে একটি স্মারকলিপির মাধ্যমে ভালুকপাড়া লেনের নাম পরিবর্তন করে খ্যাতনামা কবি ও সাহিত্যিক মনোমোহন বসুর নামে নামাঙ্কিত করার আবেদন করেন। কলিকাতা পুরসভা তাঁদের ১৮ই ডিসেম্বর ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের অধিবেশনে রাস্তাটির নাম 'মনোমোহন বসু লেন' নামকরণ করেন।[৮৮] পরবর্তীকালে রাস্তাটি ৩০ ফুট চওড়া করা হলে পর পুরসভা (৩০ জুলাই ১৯৩৪) মনোমোহন বসু লেনকে 'মনোমোহন বসু স্ট্রিটে' রূপান্তরিত করেন।[৮৯]

ভালুকপাড়া লেন গ্রে স্ট্রিট থেকে আরম্ভ হয়ে সোজা দক্ষিণে এগিয়ে সাহিত্য পরিষদ স্ট্রিটে এসে পড়েছে। গোয়াবাগান বস্তি উচ্ছেদের সময় কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থার তত্ত্বাবধানে এই রাস্তাটি প্রশস্ত

করা হয়।

সুপ্রসিদ্ধ কবি ও নাট্যকার ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের শিষ্য মনোমোহন বসু (১৮৩১-১৯১২) ১৮৩১ খ্রিঃ ১৪ই জুলাই যশোহর জেলার নিশ্চিন্তপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা দেবনারায়ণ বসু অল্পবয়সে মারা যান। হেয়ার স্কুল ও জেনারেল অ্যাসেম্ব্লিজ ইনস্টিটিউশনে (বর্তমান স্কটিশ চার্চ কলেজ) শিক্ষালাভ করেন। তিনি কৃতী ছাত্র ছিলেন।

শৈশবকাল থেকে মনোমোহনের কবিত্ব শক্তি বিকশিত হতে থাকে। কলিকাতায় এসে তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর প্রথম জীবনের অধিকাংশ রচনাই সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে তিনি নিজেই দু'খানি পত্রিকা সম্পাদনা করেন—১৮৫২ খ্রিঃ 'সংবাদ বিভাকর' এবং ১৮৭২ খ্রিঃ 'মধ্যস্থ'। মনোমোহন হিন্দুমেলার সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

নাটক রচনায় তিনি নতুন ধারা প্রবর্তন করেন, যা সেকালের শিক্ষিত বাঙালি সমাজে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। পরবর্তীকালে এই আদর্শেই গিরিশচন্দ্র ঘোষ নাটক রচনা করেন। মনোমোহনের প্রথম রচনা "রামাভিষেক নাটক" (১৮৬৭)—পৌরাণিক এবং দ্বিতীয় নাটক "প্রণয় পরীক্ষা নাটক" (১৮৬৯)—সামাজিক। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে পদ্যমালা (১৮৭০), সতী নাটক (১৮৭৩), হরিশচন্দ্র নাটক (১৮৭৫), হিন্দুর আচার ব্যবহার (১৮৭৩), বক্তৃতামালা (১৮৭৩), দুলীন (ঐতিহাসিক উপন্যাস, ১৮৯১) উল্লেখযোগ্য।

তিনি কলিকাতায় মনোমোহন লাইব্রেরি নামে একটি পুস্তাকালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্যনির্বাহক সভার সভ্য ছিলেন। ১৩০৩ বঙ্গাব্দে এর অন্যতম সহকারী-সভাপতির পদ লাভ করেন। ১৯১২ খ্রিঃ ৪ঠা ফেব্রুয়ারি তিনি ৮১ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন।

মেটকাফ স্ট্রিট : এই রাস্তাটির পূর্বের নাম ছিল জিগজ্যাগ লেন অর্থাৎ আঁকাবাঁকা গলি। কলিকাতার ইতিহাসের সঙ্গে রাস্তাটির নামের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর নয়ের দশকে রাস্তাটির নামের যৌক্তিকতা নিয়ে আলোড়ন ওঠে। সেই সময় ওই রাস্তাটির উপর অবস্থিত ৩৭টি পাকা বাড়ির মালিক ও ভাড়াটেরা এবং ১৪টি বস্তি বাড়ির অধিবাসীরা রাস্তাটির নাম পরিবর্তনের জন্য পুরসভার চেয়ারম্যানের কাছে একটি স্মারকপত্র পেশ করেন। পুরসভা তাঁদের ১১ই ফেব্রুয়ারি ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের অধিবেশনে রাস্তাটির নাম পরিবর্তন করে গভর্নর জেনারেল মেটকাফের নামে 'মেটকাফ স্ট্রিট' নামাঙ্কিত করেন। রাস্তাটি বহুবাজার স্ট্রিটকে চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ-এর সঙ্গে যুক্ত করেছে।[৯০] কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা এই রাস্তার আংশিক ২৫ ফুট চওড়া করার ব্যবস্থা করেন।[৯১]

চার্লস থিওফিলস্ ব্যারন মেটকাফ (Sir Charles Theophiles Baron MetCalfe) ৩০শে জানুয়ারি ১৭৮৫ খ্রিঃ কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা স্যার টমাস মেটকাফ প্রথমে ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সামরিক বিভাগে কর্মরত ছিলেন, পরে ওই কোম্পানির একজন ডিরেক্টর হয়েছিলেন। চার্লস মেটকাফ শিক্ষা লাভ করেছিলেন বোম্বাই ও ঈটন-এ (Eton)। ১৮০১ খ্রিঃ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাইটারের চাকুরি নিয়ে ভারতে প্রত্যাবর্তন। লর্ড ওয়েলেসলি যে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপন করেন মেটকাফ ছিলেন তার প্রথম ছাত্র। নিজ জ্ঞান ও অধ্যবসায়ের ফলে ভারতে গভর্নর জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৮৩৫ খ্রিঃ ২০শে মার্চ থেকে ১৮৩৬ খ্রিঃ ৪ঠা মার্চ পর্যন্ত অর্থাৎ লর্ড অকল্যান্ড বিলাত থেকে ভারতে না পৌঁছানো পর্যন্ত গভর্নর জেনারেল ছিলেন। মেটকাফের নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ভারতীয় মুদ্রণযন্ত্রের এক ঐতিহাসিক স্মৃতি। গভর্নর জেনারেল পদ লাভ করেই ১৮৩৫ খ্রিঃ ৩রা আগস্ট মুদ্রণযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান করে এক আইন বিধিবদ্ধ করেন। লর্ড মেকলে তাঁকে এ বিষয়ে অনেক সাহায্য করেছিলেন। মুদ্রণযন্ত্রের স্বাধীনতার জন্য যে আন্দোলন চলছিল, এই আইনের ফলে তাঁদের প্রচেষ্টা সাফল্য লাভ করে। গভর্নর জেনারেল মেটকাফকে বলা হত ''Liberator of the Indian Press''.

গভর্নর জেনারেল মেটকাফের নামে আরেকটি পথ চিহ্নিত আছে, তার নাম মেটকাফ লেন। এই

রাস্তাটির পূর্বের নাম ছিল ওয়ারিশবাগান লেন। প্রাচীন কলিকাতায় কোনও এক স্বোয়ারিশ এর একটি উদ্যান ভবন ছিল এই অঞ্চলে। কালক্রমে স্বোয়ারিশ (Swaris) নামটি পরিবর্তিত হয়ে ওয়ারিশ (Warris) হয়ে যায়। এই পথটি মেটকাফ স্ট্রিটের শাখাপথের মতো হওয়াতে এবং এ অঞ্চলে ওয়ারিশ সাহেবের বাগানের চিহ্নমাত্র না থাকাতে পুরসভা ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯০৭ খ্রিঃ মেটকাফ স্ট্রিটের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ওয়ারিশবাগান লেনের নাম পরিবর্তন করে মেটকাফ লেন নামাঙ্কিত করেন। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে পুরসভা রাস্তাটিকে প্রধান সড়ক (main thoroughfare) রূপে ঘোষণা করেন।[৯২]

চার্লস মেটকাফের ''Liberator of the Indian Press''-এর গৌরবজনক শিরোপার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হলে তৎকালীন ভারতবর্ষে মুদ্রণযন্ত্রের ভূমিকা, তার উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় দেশব্যাপী প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে সম্যক অবগত হওয়া দরকার। ভারতবর্ষে জাতীয় চেতনার বিকাশে মুদ্রণযন্ত্র ও সংবাদপত্রের প্রভাব কম নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে মুদ্রণযন্ত্রের প্রচলন ভারতীয় ভাবধারাকে এক সম্পূর্ণ নতুন পথে পরিচালিত করে। জাতীয়তাবাদের আদর্শ সর্বত্র প্রচারিত হতে থাকে এইসব সংবাদপত্রের মাধ্যমে। ভারতে ব্রিটিশ শাসকবর্গের অত্যাচার, শোষণ ও অবিচারের কাহিনী, তাঁদের নানাবিধ অন্যায় ও দুর্নীতির প্রকাশ ও কঠোর ভাষায় তা' সমালোচিত হতে থাকে।

সাধারণভাবে ভারতবর্ষে ছাপাখানার ব্যবহার শুরু হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং সেই সময় থেকে এদেশে সংবাদপত্র প্রকাশন শুরু হয়। জেমস অগাস্টাস হিকির 'বেঙ্গল গেজেট'ই এদেশের সর্বপ্রথম ইংরাজি সংবাদপত্র। এটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৭৮০ খ্রিঃ। ধীরে ধীরে বিভিন্ন দেশীয় সংবাদপত্র প্রকাশিত হতে থাকে। ১৭৯৮ সালে 'বেঙ্গল হরকরা' প্রকাশিত হয়। দেশের দুর্দশার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য এই পত্রিকার সম্পাদককে সরকার নির্বাসিত করেন। ১৮১৮ সালে বাংলায় প্রথম দুটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়—'দিগদর্শন' ও 'সমাচার দর্পণ'। পত্রিকা দুটির সম্পাদনা করেছিলেন শ্রীরামপুরের মিশনারি মার্শম্যান। ১৮২১ খ্রিঃ রামমোহন রায়ের সম্পাদনায় "সংবাদ কৌমুদী" নামে একটি বাংলা সাপ্তাহিক প্রকাশিত হল।

বঙ্গদেশের সংবাদপত্র ছাড়া মাদ্রাজের হিন্দু, স্বদেশমিত্রম্, তান্ত্রপ্রকাশিকা, কেরল পত্রিকা, গুজরাটের রাষ্ট্রগোপ্তা এবং ইন্দুপ্রকাশ, বালগঙ্গাধর তিলক প্রবর্তিত মারাঠা ও কেশরী পত্রিকা, উত্তরপ্রদেশে অ্যাডভোকেট, হিন্দুস্থানী ও আজাদ, পাঞ্জাবে ট্রিবিউন, আখবার-ই-আম ও কোহিনুর প্রভৃতি সংবাদপত্র ভারতের জাতীয় আন্দোলনের মুখপত্র হয়ে ওঠে। এইসব সংবাদপত্র বিচার-ব্যবস্থার ত্রুটি বিচ্যুতি, ইংরেজদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ এবং দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

দেশাত্মবোধক প্রচার ও সরকারের অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদ প্রভৃতি বিষয়ের উপর সমালোচনা দেশের বিদেশি শাসক ভাল চোখে দেখেননি। তাঁরা এইসব সংবাদপত্রের প্রচার নিষিদ্ধ করতে দৃঢ়সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। এই উদ্দেশ্যে ১৮২৩ সালে "প্রেস অর্ডিন্যান্স" নামে এক কঠোর সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন করা হয়। রাজা রামমোহন এর তীব্র প্রতিবাদ করেন। ব্রিটিশ সরকার সংবাদপত্রগুলির উপর নানা প্রকার দমনপীড়ন চালাতে থাকেন। এর ফলে শিক্ষিত ভারতবাসীর মনে বিদেশি শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে ভারতে এক দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা গঠনের আকাঙ্ক্ষা তীব্র আকার পেতে থাকে। ১৮৩৫ সালে কলিকাতার টাউন হলে এক জনসভায় ১৮২৩ সালের প্রেস অর্ডিন্যান্স বা সংবাদপত্র সংক্রান্ত বিধিনিষেধ প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়। অগ্নিগর্ভ এই পরিস্থিতিতে গভর্নর জেনারেল হয়ে এলেন চার্লস মেটকাফ। শাসনভার গ্রহণ করেই সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের আইন তুলে নেন—সেকথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। এই আইন বাতিলের ফলে চার্লস মেটকাফকে যথেষ্ট মূল্য দিতে হল। তিনি কোম্পানির বিরাগভাজন হলেন। তাঁকে কোম্পানি মাদ্রাজের গভর্নর নিযুক্ত করলেন না। ১৮৩৭ খ্রিঃ মাদ্রাজে গভর্নরের পদ শূন্য হওয়ায় সে পদে মেটকাফকে নিযুক্ত না করে লর্ড এলফিন্‌স্টোনকে নিয়োগ করা হলে তিনি ১৮৩৮ খ্রিঃ কর্মে ইস্তফা দিয়ে ইংল্যান্ডে ফিরে গেলেন।

ভারতবাসী চার্লস মেটকাফের মহান অবদানের কথা বিস্মৃত হননি। টাউন হলে একটি সভা

আহ্বান করে মেটকাফের নামে একটি ভবন ও গ্রন্থাগার নির্মাণের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই ভবনটি নির্মাণের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। এই সময় কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরি স্থাপনের জন্য আরেকটি কমিটি গঠিত হয়েছিল। উভয় কমিটিতে একই ব্যক্তি থাকায় এঁদের কাজ একসঙ্গে চলতে থাকে। স্যার এডওয়ার্ড রেয়ন (Sir Edward Rayan) কমিটির সভাপতি ছিলেন। কলিকাতার ব্যবসায়ীরা আরেকটি কমিটি গঠন করেন—নাম মেটকাফ টেস্টিমনিয়াল কমিটি।

ভবন নির্মাণের জন্য স্থান সংগ্রহের চেষ্টা চলতে থাকে। বর্তমানে যে স্থানে 'মেটকাফ হল' দাঁড়িয়ে আছে (স্ট্র্যান্ড রোড ও হেয়ার স্ট্রিটের সংযোগস্থলে) সেখানে ছিল ''Sailors' House''। বাড়িটি ছিল জীর্ণ ও ভগ্নপ্রায় এবং জমি ছিল বাংলা সরকারের অধীনে, ভবন নির্মাণের জন্য ওই জমি বাংলা সরকার কমিটিকে দান করেন। বিভিন্ন সংস্থা অর্থ দিয়ে সাহায্য করেন—এগ্রিকালচারাল অ্যান্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটি দেন ১০,০০০ টাকা, সদস্যবৃন্দ ৩০০০ টাকা, পাবলিক লাইব্রেরি কমিটি ৬০০০ টাকা এবং মেটকাফ টেস্টিমনিয়াল কমিটিও মোটা অর্থ দান করেন। মোট ৭০,০০০ টাকা সংগৃহীত হয়। ১৮৪০ খ্রিঃ ১৯শে ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন ডঃ জেমস গ্রান্ট। তিনি হলেন Grand Master of Bengal। গভর্নর জেনারেল লর্ড অকল্যান্ড ও তাঁর ভগিনী মিস ইডেন ও বহু দেশি ও বিদেশি বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। স্থির হয় প্রস্তাবিত ভবনের নীচে থাকবে এগ্রিকালচারাল অ্যান্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটি এবং উপরের তলায় পাবলিক লাইব্রেরি।

১৮৪৪ খ্রিঃ মেটকাফ হলের নির্মাণকার্য শেষ হয়। এথেন্স শহরে অবস্থিত Temple of the Winds-এর অনুকরণে মেটকাফ হলের বহিরঙ্গের বিন্যাস রূপায়িত হয়েছিল। পূর্বের ব্যবস্থামতো ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে পাবলিক লাইব্রেরি ও এগ্রিকালচারাল অ্যান্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটি মেটকাফ হলে উঠে আসে।[৯৩]

সেকালে কলিকাতার সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্র ছিল মেটকাফ হল। কৃষি বিদ্যা ও জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চার মিলনক্ষেত্র ছিল এই মেটকাফ হল। সেকালের জ্ঞানপিপাসু সাহিত্যিক, বিশিষ্ট সাংবাদিক, দার্শনিক এখানে সমবেত হতেন। প্রথম দিকে এই গ্রন্থাগারের কর্ণধার ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র। ১৮৬৭ খ্রিঃ ২২শে জানুয়ারি এই ভবনে বেঙ্গল সোস্যাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্পাদক ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র।

পরে মেটকাফ হলের মালিকানা সরকার গ্রহণ করেন।

১৮৯১ খ্রিঃ ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি স্থাপিত হয়। বড়লাট লর্ড কার্জনের চেষ্টায় কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরি ও ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি একত্রিত হয় ১৯০৩ খ্রিঃ ৩০শে জুন। তখন এর নাম হয় ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি। প্রথম ২০ বছর এই লাইব্রেরির কার্যকলাপ মেটকাফ হলেই চলতে থাকে। তারপর এসপ্ল্যানেড রো ইস্ট (সিধু কানু ডহর) ও জবাকুসুম হাউসে কিছুদিন থাকার পর ১৯৪৮ খ্রিঃ ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি ন্যাশনাল লাইব্রেরি নাম গ্রহণ করে প্রাক্তন বড়লাটের প্রাসাদ বেলভেডিয়ারে উঠে আসে।

ব্লকম্যান স্ট্রিট : পূর্বে এই রাস্তাটির নাম ছিল মুচিপাড়া লেন। রাস্তাটি খুবই ছোট, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড থেকে আরম্ভ হয়ে সোজা দক্ষিণে এগিয়ে পরে পশ্চিমে মোড় ঘুরে ওয়েলেসলি স্ট্রিটে (রফি আহ্মেদ কিদওয়াই রোড) এসে পড়েছে। পুরসভা ১১ই মে ১৮৯৭ খ্রিঃ রাস্তাটির নাম পরিবর্তন করে কলিকাতা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ হেনরী ফারনিন্যান্ড ব্লকম্যানের নামে ব্লকম্যান লেন নামাঙ্কিত করেন। পরবর্তীকালে রাস্তাটির নাম 'ব্লকম্যান স্ট্রিট' করা হয়। ব্লকম্যান সাহেব এই রাস্তায় বসবাস করতেন।

সেকালের খ্যাতনামা পণ্ডিত, কলিকাতা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ, এশিয়াটিক সোসাইটির ভাষাতত্ত্বের সম্পাদক হেনরী ফারনিন্যান্ড ব্লকম্যান (Henry Ferninand Blockman) ৮ই জানুয়ারি ১৮৩৮ খ্রিঃ ড্রেসডেনে জন্মগ্রহণ করেন। লিপজিগ ও প্যারিসে শিক্ষালাভ করেছিলেন। ১৮৫৮ খ্রিঃ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সৈনিক হিসাবে তাঁর ভারতে আগমন। পরে সৈনিক বৃত্তিতে ইস্তফা দিয়ে

শিক্ষকতা অবলম্বন করেন। ১৮৬০ খ্রিঃ কলিকাতা মাদ্রাসার সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৬৫ খ্রিঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হিব্রুতে স্নাতকোত্তর উপাধি লাভ করেন। ওই বছরই তিনি মাদ্রাসার অধ্যক্ষ হন, ওই পদে ১৮৭৮ খ্রিঃ পর্যন্ত বহাল থাকেন। ১৮৬৯ খ্রিঃ এশিয়াটিক সোসাইটির ভাষাতত্ত্বের সম্পাদক হন। আমৃত্যু ওই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অনেক সারগর্ভ প্রবন্ধ ও পুস্তক রচনা করেছেন। এ ছাড়া তাঁরই সম্পাদনায় আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরী দুটি খণ্ডে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশ করেন। প্রাচীন কলিকাতার উপর তাঁর বক্তৃতাবলী খুবই মূল্যবান। বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের সিটি প্রেস ''Calcutta during the last century'' নাম দিয়ে পুস্তক আকারে প্রকাশ করেন। ১৩ই জুলাই ১৮৭৮ খ্রিঃ কলিকাতায় তিনি পরলোকগমন করেন। লোয়ার সার্কুলার রোডের কবরখানায় তাঁর পুত্রের পাশেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।[১৪]

১৮৮৮ থেকে ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে যেসব নতুন রাস্তা হয়েছিল এবং পুরানো রাস্তার নতুন নামকরণ হয় তাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলির ইতিহাস এখানে বর্ণিত হল। পরবর্তী পর্যায়ে শহরতলিতে (কলিকাতার অন্তর্গত) যেসব নতুন রাস্তার পত্তন হয়েছিল তাদের সম্বন্ধে দু'চার কথা বলা হবে।

## তথ্যসূত্র


১ সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান
২ প্রবাসী, ১৩৬৪
৩ A Nation in Making— Sir S. N. Banerjee, (1925).
৪ National Magazine, Sarat Ch. Mitra, Dec, 1889, p-467
৫ Cal. Mpl. Corpn. Adm. Report 1868.
৬ C.M.C. Adm. Report 1868, 1883-84 & 1889-90
৭ Municipal Calcutta— S.W.Goode, p-347, C.M.C Adm. Report 1883-84, 1889-90.
৮ Calcutta Corpn. Adm. Report, 1953-54.
৯ The Proceedings of the meeting of the Cal. Municipal Corpn, dt. 24.2.1915.
১০ ভারতকোষ, ৫ম খণ্ড
১১ C.M.C Adm. Report 1889-90
১২ The Proceedings of the meeting of the C.M.C. General Committee dt. 12.8.1889.
১৩ C.M.C Adm. Report 1898-99.
১৪ আলেকজান্ডার ডাফ ও অনুগামী কয়েকজন—অলোক রায়, পৃ ৯৮
১৫ The Proceedings of the meeting of C.M.C dt. 6.3.1918
১৬ The Proceedings of the meeting of C.M.C dt. 8.5.1918
১৭ The Proceedings of the meeting of C.M.C dt. 19.3.1919
১৮ C.M.C. Adm. Report, 1920-21.
১৯ The Proceedings of the meeting of Cal. Mpl. Corpn.dt. 8.3.1922.
২০ C.M.C. Adm. Report 1889-90.
২১ The Proceedings of the meeting of C.M.C. dt. 16.7.1913.
২২ ভারতকোষ, ৫ম খণ্ড
২৩ The Proceedings of the meeting of the C.M.C dt. 1.3.1890
২৪ The Proceedings of the meeting of the Cal. Corpn. dt. 30.6.1932.
২৫ C.M.C. Administration Report 1889-90.
২৬ Calcutta Old & New— H.E.A Cotton, p-242.
২৭ The Proceedings of the meeting of General Committee of the C.M.C. dt. 8.3.1890 & Administration Report of C.M.C of 1889-90
২৮ The Proceedings of the meeting of Cal. Corpn. dt. 18.12.1935.
২৯ ভারতকোষ, ৫ম খণ্ড, বনেদী বণিক সুবর্ণবণিক— চিত্তব্রত পালিত, দেশ, ৭. ৮. ৮২.
৩০ কলকাতার বাবু বৃত্তান্ত— ''The Native Aristocracy & Gentry''—লোকনাথ ঘোষ, অনুবাদক—শুদ্ধোধন সেন
৩১ The Proceedings of the meeting of the C.M.C dt. 3.7.1890.
৩২ কলিকাতা দর্পণ—রাধারমণ মিত্র
৩৩ রবীন্দ্র জীবনী— প্রশান্ত পাল
৩৪ উৎকেন্দ্র সমিতি, শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা— কথাসাহিত্য, শ্রাবণ, ১৩৬১

৩৫ রাজশেখর বসু—দীপেন সাহা
৩৬ Calcutta Old and New— H.E.A Cotton, p-282.
৩৭ A Short History of Calcutta—A.K.Roy.
৩৮ Dictionary of Indian Biography, C.E. Buckland, p-336.
৩৯ C.M. Gazette, 21.1.1956, p-253.
৪০ The Proceedings of the General Committee meeting of C.M.C., dt. 23.5.1891.
৪১ কলিকাতা দর্পণ— রাধারমণ মিত্র ।
৪২ The Proceedings of the meeting of Cal. Corpn., dt. 31.3.1926.
৪৩ The Proceedings of the meeting of Calcutta Corpn., dt. 31.3.1926.
৪৪ C.I.T Annual Report, 1937-38.
৪৫ The Proceedings of the meeting of Calcutta Mpl. Corpn., dt. 3.12.1913.
৪৬ Annual Report of the C.I.T, 1937-38.
৪৭ The Proceedings of the meeting of Cal. Corpn., dt. 27.3.30,
৪৮ Adm. Report of Cal. Corpn., 1925-26.
৪৯ The Proceedings of the meeting of Cal. Corpn., dt 23.7.1930.
৫০ The Proceedings of the meeting of Cal. Corpn. dt. 1.6.1956
৫১ The Proceedings of the meeting of Cal. Corpn. dt. 12.3.1947
৫২ সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান । Dictionary of National Biography, Vol. III
৫৩ The Cal. Mpl. Gazette dt. 22.9.1956
৫৪ —Do— 13.4.1940
৫৫ The Proceedings of the meeting of Cal. Corpn. dt. 13.3.1940
৫৬ The Proceedings of the meeting of Cal. Mpl. Corpn. dt. 3.12.1896
৫৭ The Proceedings of the meeting of Cal. Corpn. dt. 23.7.1930
৫৮ —Do— —Do— —Do—
৫৯ —Do— —Do— —Do—
৬০ শহর কলকাতার পথনাম—দেবাশিস বসু ; এক্ষণ বার্ষিক সংখ্যা, ১৩৯৩
৬১ The Proceedings of the meeting of Justices of Peace, 6th July 1871
Govt. of Bengal's letter No. 1427-T dt. 11.8.1866
Govt. of Bengal's letter No. 4871 dt. 20.6.1863 to Govt. of India, containing a note on the ownership of Strand Bank.
Govt. retained the right to defray the charges on account of Eden Gardens, the Maidan Roads and drainage and the section of Strand Road between Chandpal Ghat and Hastings from the income derived from the Strand Bank Lands : Municipal Calcutta—S. W. Goode, P. 260
৬২ The Proceedings of the the meeting of C. M. C. General Committee dt. 25.6.1892
৬৩ The Proceeding of the meeting of C.M.C. dt. 31.8.1893
৬৪ কলকাতার বাবু বৃত্তান্ত : লোকনাথ ঘোষের "The Native Aristrocracy & Gentry" থেকে শুদ্ধোদন সেনের অনুবাদ
৬৫ The Admn. Report of the Cal. Mpl. Corpn, 1893-94
৬৬ The Proceedings of the meeting of Cal. Mpl. Corpn. dt. 5.10.1893
৬৭ —Do— dt. 18.12.1907
৬৮ The Annual Report of the C.I.T., 1937-38
৬৯ The Proceedings of the meeting of Cal. Corpn. dt. 31.3.1926
৭০ The Proceedings of the meeting of the General Committee of the Cal. Municipal Corpn. dt. 2.9.1893
৭১ সুবর্ণবণিক কথা ও কীর্তি—নরেন্দ্রনাথ লাহা
৭২ কলিকাতা দর্পণ—রাধারমণ মিত্র, পৃঃ ৫০
৭৩ Raja Subodh Ch. Mallick and his times—Amalendu De, *Bengal Past & Present*, July.-Dec. 1979
৭৪ The Calcutta Municipal Gazette—April 6th, 1957
৭৫ —Do— —Aug. 19th, 1939
৭৬ কলিকাতার বাবু বৃত্তান্ত : লোকনাথ ঘোষের "The Native Aristocracy & Gentry" থেকে শুদ্ধোদন সেনের অনুবাদ
৭৭ বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে কালীপ্রসন্ন সিংহ—ড. পরেশচন্দ্র দাস
৭৮ ভারতকোষ ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৬
৭৯ কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা—মহেন্দ্রনাথ দত্ত
৮০ Proceedings of the meeting of the CMC General Committee dt. 3.3.1911 এবং Cal. Mpl. Corpn. Proceedings dt. 23.3.1911
৮১ Proceedings of the meeting of the CMC General Committee dt. 3.5.1917 & Cal. Mpl Corpn. Proceedings dt. 26.3.1919
৮২ ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়—মনোরঞ্জন গুহ

৮৩ কলিকাতা দর্পণ—রাধারমণ মিত্র, পৃঃ ৩০১
৮৪ এক স্মরণীয় প্রতিভা—জয়ন্ত বসু
৮৫ স্বামী অভেদানন্দ জীবনস্মৃতি—নারায়ণচন্দ্র গুহরায়। মন ও মানুষ (৩য়)—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা অভিধান—কালীজীবন দেবশর্মা
৮৬ বাংলা সাহিত্য ও বাংলা চলচ্চিত্র—নিশীথকুমার মুখোপাধ্যায়
৮৭ সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান
৮৮ The Proceedings of the meeting of C.M.C. dt. 18.12.1918
৮৯ The Proceedings of the meeting of Cal. Corpn. dt. 30.7.1934
৯০ The Proceedings of the meeting of C.M.C. dt. 11.2.1897
৯১ Cal. Corpn. Adm. Report 1938-39.
৯২ MetCalfe St.—G. C. Sen, Calcutta Municipal Gazette, 26.2.1949.
৯৩ Calcutta Old and New—Cotton, pp.641-44.
৯৪ A History of Calcutta's Streets—P. T. Nair, p. 230.

## ২৬

# ১৮৮৮—পৌর আইন রূপায়ণে পৌরসভার কার্যাবলী

১৮৮৮ খ্রিঃ কলিকাতা পুরসভার জন্য যখন নতুন আইন প্রণীত হয় (Act II of 1888) সেই সময় কলিকাতা শহরে মোট রাস্তার দৈর্ঘ্য ছিল ১৮১½ মাইল। এর মধ্যে ৩৪½ মাইল হল সরু গলিপথ, এইগুলি খোলা নর্দমা ভরাট করে তৈরি হয়েছিল।

এ কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে কলিকাতা শহরতলির কিছু কিছু অংশ এই নতুন আইনের মাধ্যমে শহর কলিকাতার অঙ্গীভূত হয়। নতুন আইনের একটি ধারায় নির্দেশ ছিল যে কলিকাতার অন্তর্ভুক্ত শহরতলির উন্নতির জন্য বার্ষিক ৩ লক্ষ টাকা অবশ্যই ব্যয় করতে হবে। এই বাধ্যবাধকতা আরোপের ফলে শহর কলিকাতায় নতুন সংযোজিত অঞ্চলগুলির মধ্যে কয়েকটি চমৎকার প্রশস্ত রাস্তা নির্মিত হয়। তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলির তালিকা দেওয়া হল—[১]

| রাস্তার নাম | নির্মাণ ব্যয় |
|---|---|
| ১। ল্যান্সডাউন রোড | টাঃ ৩,২৮,০০০ |
| ২। হরিশচন্দ্র মুখার্জি রোড | ৫,১৬,০০০ |
| ৩। হাজরা রোড | ১,৮২,০০০ |
| ৪। চেতলা সেন্ট্রাল রোড | ৯৩,০০০ |
| ৫। স্টার্নডেল রোড | ১১,০০০ |
| ৬। জাজেস কোর্ট রোড ও গোপালনগর রোড | ৩৩,০০০ |
| ৭। সবজিবাগান রোড | ২১,০০০ |
| ৮। কালী টেম্পল রোড | ৪২,০০০ |
| ৯। হেস্টিংস পার্ক রোড | ৭,০০০ |
| ১০। উডবার্ন পার্ক রোড | ৪৯,০০০ |
| ১১। জগন্নাথ দত্ত রোড ও গ্যাস স্ট্রিট | ৬৮,০০০ |
| ১২। আপার সার্কুলার রোড ও গ্যাস স্ট্রিট | ৫১,০০০ |
| | মোট টাঃ ১৪,০১,০০০ |

এইসব চওড়া রাস্তা নির্মিত হওয়াতে যান চলাচল সুগম হয়েছিল। এইভাবে শহরতলি ক্রমশ শহরের রূপ পরিগ্রহ করে শহর কলিকাতার সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়।

১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের নতুন পৌর আইন বিধিবদ্ধ হবার প্রাক্কালে পুরানো আইনে (Act II of 1888) পুরসভার কর্মকাণ্ডের উপর একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক। এই সময় ৩৩০ মাইল রাস্তা নির্মিত

হয়েছিল, তার মধ্যে ছিল ১০৩ মাইল পাথর বাঁধানো এবং ১৬৫ মাইল ইট বাঁধানো। রাস্তা আলোকিত করার ব্যবস্থারও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। ৬৮১১টি গ্যাসের আলো, ২২৯৫টি তেলের আলো সে সময় শহর কলিকাতায় প্রজ্জ্বলিত হত। কলিকাতার রাস্তায় বৈদ্যুতিক আলো সরবরাহের ভার দেওয়া হয় কিলবার্ন কোম্পানিকে (Kilburn & Co.)। তাঁরা হ্যারিসন রোডে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা করেন। পরে শহর কলিকাতার অন্যান্য রাস্তায় তা সম্প্রসারিত হয়। সে সময় কলিকাতায় পাকা বাড়ির সংখ্যা ছিল ৪১,০৬৪ ; আর কাঁচা বাড়ি ৮৪,৪১৯টি। শহর কলিকাতার আবর্জনা চুল্লির (Incinerator) সাহায্যে পুড়িয়ে ফেলার ব্যবস্থা হয়েছিল। ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী ও পরিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা কলিকাতার অন্তর্ভুক্ত শহরতলি অঞ্চলেও প্রসারিত হয়। এই ব্যাপারে ইউরোপের ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী বিশেষজ্ঞ মিঃ বলডুইন ল্যাথাম (Baldwin Lathaum)-এর সুপারিশ চাওয়া হয়েছিল। ২৬শে নভেম্বর ১৮৯৬ খ্রিঃ নতুন জল নিকাশী প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন তৎকালীন ছোটলাট আলেকজান্ডার ম্যাকেঞ্জি। এটি ছিল একটি মিশ্র প্রকল্প—একদিকে ছিল শহরের জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা, অন্য দিকে শহরতলির ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালীর রূপায়ণ। জল সরবরাহ ব্যবস্থারও বিশেষ উন্নতি হয়। এই সময় ভবানীপুরে নতুন বিশুদ্ধ জল সরবরাহ পরিকল্পনা রূপায়িত হয়। ফলে শহরে দৈনিক জল সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়ে ২৪ মিলিয়ন গ্যালনে দাঁড়ায়। এ ছাড়াও পুরকমিশনারদের কর্মের পরিসর অন্য দিকেও প্রসারিত হয়েছিল। পৌরধোবীখানার জন্য জমি সংগ্রহ, শহরের কুষ্ঠ রোগীদের জন্য আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা, প্লেগ রোগের চিকিৎসার জন্য মার্কাস স্কোয়ার, বজবজ রোড ও মানিকতলায় হাসপাতাল স্থাপন, আবর্জনা অপসারণের উন্নততর ব্যবস্থা, অস্বাস্থ্যকর পুকুর ভরাট করা, স্নানের জন্য স্নানঘর (Bathing platform) নির্মাণ, অনেকগুলি বস্তি সংস্কার প্রভৃতি কার্যাবলী অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দের আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি পুরপ্রতিনিধিগণ মনোযোগ দিয়েছিলেন। তারই ফলশ্রুতি হল ১৮৯৭ খ্রিঃ বিল্ডিং কমিশন গঠন (The Building Commission of 1897)। কমিশন নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি করেছিলেন :—

(১) বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট ও চিৎপুর রোড প্রশস্ত করা।
(২) ডালহৌসি স্কোয়ারের উত্তর-পূর্ব কোণ থেকে উত্তর দিকে প্রসারিত একটি নতুন রাস্তা নির্মাণ।
(৩) হ্যালিডে স্ট্রিটকে উত্তরে এবং দক্ষিণে প্রসারিত করা।
(৪) দক্ষিণের লাউডন স্ট্রিটকে উত্তর দিকে প্রসারিত করে নেবুতলা স্ট্রিট পর্যন্ত নিয়ে আসা।

বিল্ডিং কমিশনের এই সুপারিশগুলি ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের নতুন আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

তথ্যসূত্র

১ Municipal Calcutta—S. W. Goode, p. 241.

এই আইনের প্রকৃত প্রণেতা ছিলেন বাংলার ছোটলাট স্যার আলেকজান্ডার ম্যাকেঞ্জি। নতুন এই আইন রচনার পশ্চাতে তাঁর ও বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের প্রধান ভূমিকা ছিল। এই কারণে আইনটি ম্যাকেঞ্জি আইন নামে খ্যাত। এই আইনে এদেশীয় পৌরপ্রতিনিধিদের ক্ষমতা খর্ব করার ব্যবস্থা হয়। যদিও কলিকাতা পুরসভা সংশোধন আইন একটি আঞ্চলিক বিষয়কে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছিল, কিন্তু এর মধ্য দিয়ে লর্ড কার্জন ভারতে স্বায়ত্তশাসনের কণ্ঠরোধ করতে চেয়েছিলেন। এই আইন প্রণয়নের ফলে সারা দেশব্যাপী যে আলোড়ন উঠেছিল সে বিষয়ে আমরা পরে আসছি।

এইভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর দীর্ঘপথ পরিক্রমা করে শহর কলকাতা বিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়াল।[১]

তথ্যসূত্র

১ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও ঊনিশ শতকের বাঙালি সমাজ—বদরুদ্দীন উমর। বাংলার নবচেতনার ইতিহাস—স্বপন বসু। সেকাল আর একাল/বিবিধ প্রসঙ্গ—রাজনারায়ণ বসু। কলিকাতা কালচার—বিনয় ঘোষ। বঙ্গদেশে শিক্ষা বিস্তার কার্যে কোম্পানির প্রবেশ—সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৪৫। Urban Roots of Indian Nationalism—Dr. Rajat Roy। সুতানুটির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—ড. সুধীন ভট্টাচার্য ও অজিতকুমার বসু।

## ২৮

# ১৮৯৯-এর নতুন পৌর আইন—প্রতিক্রিয়া

১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন ছোটলাট স্যার আলেকজান্ডার ম্যাকেঞ্জির উদ্যোগে নতুন যে একটি মিউনিসিপ্যাল আইন পাশ হয় তা ম্যাকেঞ্জি আইন নামে পরিচিত। পূর্বের আইনে ২৫টি ওয়ার্ডে করদাতাদের প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল ৫০। তা কমিয়ে ২৫ করা হয়। এই সব পৌরপ্রতিনিধিদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি অনেকাংশে হ্রাস করা হয়। কটন সাহেব এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, "...and many of its powers either largely curtailed or else transferred to a General Committee in which the elected Commissioners are in a minority."[১] পক্ষান্তরে গভর্নমেন্টের মনোনীত ও শ্বেতাঙ্গ বণিক সম্প্রদায়ের নির্বাচিত কমিশনারদের সংখ্যা পূর্বের মতো যথাক্রমে ১৫ ও ১০ রাখা হয়। পুরসভার চেয়ারম্যান হবেন "a member of the Indian Civil Service"। তিনি সরকারের দ্বারা নিয়োজিত হবেন। এই ৫০ জন সভ্য ও গভর্নমেন্ট নিযুক্ত চেয়ারম্যান নিয়ে নতুন কর্পোরেশন গঠিত হয়। এই আইনের বিরুদ্ধে জনমত প্রবল হয়ে ওঠে। দেশীয় সংবাদপত্র তীব্র ভাষায় সরকারি নীতির প্রতিবাদ করেন। সে সময় বড়লাট ছিলেন লর্ড কার্জন। তিনি এই আন্দোলনের প্রতি কোনও গুরুত্বই দিলেন না। ম্যাকেঞ্জি বিল ভারতীয়দের প্রতিবাদ সত্ত্বেও যথারীতি আইনে পরিণত হয়। এর প্রতিবাদে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মোট ২৮ জন ভারতীয় কমিশনার একযোগে পদত্যাগ করেন। প্রসিদ্ধ নাট্যকার অমৃতলাল বসু "সাবাশ আটাশ" নামে এক নাটক লিখে সমগ্র দেশের পক্ষ থেকে এই আটাশজন কমিশনারদের অভিনন্দন জানান। এঁরা হলেন—ভূপেন্দ্রনাথ বসু, পশুপতিনাথ বসু, এন.এন. ঘোষ, চণ্ডীলাল সিংহ, কালীনাথ মিত্র, অক্ষয়চন্দ্র বসু, নলিনবিহারী সরকার, মন্মথনাথ মিত্র, লালবিহারী বসাক, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, রুদ্রচরণ পাল, শ্রীনাথ দত্ত, নরেন্দ্রনাথ সেন, রাজচন্দ্র চন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ দাস, দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, মোহিনীমোহন চ্যাটার্জি, বিনোদবিহারী ব্যানার্জি, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মৌলভি সৈয়দ সামশুল হুদা, জে. ঘোষাল, অমৃতলাল ঘোষ, জ্যোতিপ্রকাশ গাঙ্গুলি, কান্তিচন্দ্র ব্যানার্জি, যোগেশচন্দ্র ঘোষ, রামরতন ব্যানার্জি, সুরেন্দ্রনাথ রায়, রায়বাহাদুর মণিলাল ব্যানার্জি। এঁদের মধ্যে অনেকেই সেই সময় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। এঁদের স্মৃতিরক্ষার জন্য কলিকাতার অনেক রাস্তাই নামাঙ্কিত হয়েছে।

নতুন পৌর আইন অনুসারে চেয়ারম্যান ও ৫০ জন কমিশনার নিয়ে গঠিত হল কর্পোরেশন। এই ৫০ জনের মধ্যে ১২ জনকে নিয়ে জেনারেল কমিটি নামে একটি কমিটি গঠিত হয়। কর্পোরেশনের সমস্ত ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু হল—কর্পোরেশন, জেনারেল কমিটি ও চেয়ারম্যান। এঁরা প্রত্যেকে নিজ নিজ গণ্ডির মধ্যে প্রধান ছিলেন। এ ছাড়া পুরসভার নির্দেশগুলি কার্যকর করার সমস্ত ক্ষমতা চেয়ারম্যানের হাতে ন্যস্ত ছিল। আইনটি ১ এপ্রিল ১৯০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে কার্যকরী হয়।

নতুন পৌর আইন বিধিবদ্ধ করে ইংরেজ সরকার সে সময়ের জাতীয় আন্দোলনকে এবং দেশীয় পৌর প্রতিনিধিদের ক্ষমতা হরণ করতে তৎপর হয়েছিলেন। ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠী তাঁর "The Extremist Challange" পুস্তকে এ বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছেন—

"১৮৯৯ সালে আলেকজান্ডার ম্যাকেঞ্জির আনা কলিকাতা পৌরসভা বিলটির দ্বারা কার্জন

একদিকে যেমন কংগ্রেসের নরমপন্থীদের বিপর্যস্ত করতে চেয়েছিলেন, অন্যদিকে কলিকাতা কর্পোরেশনে নেটিভ প্রতিনিধিদের সংখ্যা কমিয়ে শহরের ইংরেজ বাসিন্দাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়ানোর প্রয়াস চালানো হয়েছিল। এর ফলে কর্পোরেশনের ২৫টি ওয়ার্ড থেকে ২৫ জন নির্বাচিত সদস্য এবং মনোনীত ২৫ জন সদস্য সমসংখ্যক হয়ে যান এবং চেয়ারম্যান সরকার নিযুক্ত ব্যক্তি হওয়ায় শেষোক্তরা সব সময় সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখতে পারতেন। নির্বাচিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার চাপে সাহেবরা যাতে তাঁদের প্রভাব প্রতিপত্তি না হারান সেদিকে দৃষ্টি দিয়েই কার্জন এই বিল প্রণয়নে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এছাড়া ছিল একটা জেনারেল কমিটি। যার ১২ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ৪ জনকে নির্বাচিত ২৫ জন সদস্যদের মধ্য থেকে নেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। স্যার আশুতোষ মুখার্জি এই প্রতিষ্ঠানে কমিশনার, জেনারেল কমিটি ও চেয়ারম্যান—এই তিনটি পৃথক কর্তৃত্বের সহাবস্থানের মৌল নীতিটির সমালোচনা করেছিলেন। এই নতুন আইনে সামগ্রিক পরিকল্পনা রচনার কাজ কমিশনারদের হাতে, চেয়ারম্যান বহন করবেন রূপায়ণের দায়িত্ব আর এদের মধ্যিখানে থাকছে জেনারেল কমিটি—এই ব্যবস্থা যে অবাস্তব, তার প্রতি স্যার আশুতোষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তাছাড়া যথেচ্ছ কর বসানোর রীতিটাকেও তিনি অর্থনীতি বিরোধী বলে নিন্দা করেছিলেন। হিন্দুরা দিত মোট পৌর করের ৫৯·৫%, মুসলমানেরা ৫·৭% এবং ইউরোপীয়রা ১৮·৩%।"[২]

সেকালের সংবাদপত্রগুলিও কলিকাতা পুরসভার এই নতুন আইন বিধিবদ্ধ হওয়ায় তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন।

১৮৯৯ খ্রিঃ ৩০ সেপ্টেম্বর, বেঙ্গলী পত্রিকায় শোকসূচক কালো বর্ডার দিয়ে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়, তার শিরোনাম ছিল—"The Extinction of Local Self Government"। তাতে লেখা হয়েছিল— "The 27th of September, 1899, will be a memorable day in the annals of this city..., a date which will be remembered by the future historians as the date of the extinction of Local Self Government in the city... The main object of the Bill is to curtail Hindoo preponderance... Let the Government now carry on the administration of the city without the Hindoos. Their men of light and leading will be no party to the future Government of the city. Under the Bill their co-operation is impossible. It would be inconsistent with their self respect."

একই বিষয়ে অমৃতবাজার ওই বছরের ২৯ সেপ্টেম্বর "The Last Local Self Government" নাম দিয়ে তীব্র ব্যঙ্গপূর্ণ একটি উৎকৃষ্ট সম্পাদকীয় লেখেন। বাংলার ছোটলাট স্যার আলেকজান্ডার ম্যাকেঞ্জির সময় বিলটি রচিত হয়েছিল। তিনি বিলটিকে সিলেক্ট কমিটিতে দিয়ে চলে যান। পরবর্তী ছোটলাট স্যার জন উডবার্ন বিলটিকে আইন প্রণয়নের দিকে এগিয়ে দেন। অমৃতবাজার লিখেছিলেন, "মনে হচ্ছে স্যার জন উডবার্ন কলকাতার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের উপরে শেষ নিয়তির বিধান ঘোষণার সময়ে বড়ই বিচলিত হয়েছিলেন। এ তো খুবই প্রত্যাশিত, কারণ সকলেই জানে, মাননীয় গভর্নর মহোদয়ের হৃদয় বড়ই কোমল। ...স্যার এ. ম্যাকেঞ্জিই যখন তাঁর প্রায় মুমূর্ষু অবস্থার ডার্লিংটিকে গ্রহণ করবার জন্য চাপ দিচ্ছিলেন, তখন স্যার জন উডবার্নের পক্ষে হাত না বাড়িয়ে স্থির থাকা সম্ভব ছিল না। ...মহামান্য গভর্নর বাহাদুর অবশ্য স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রত্যাহার জনগণকে যে কষ্ট দিয়েছে, তা নিয়ে বেশি বিব্রত না হলেও পারবেন। এদেশের মানুষ এসব জিনিসে অভ্যস্ত। তারা শেষপর্যন্ত এই বুঝেছে, পীড়নই তাদের নিয়তি, ভারতীয়দের পক্ষে রাজনৈতিক অধিকার দাবি ভ্রান্তির কাজ। ...যাই হোক, স্যার জন আমাদের উপকার বা অনুপকার যাই করুন, তাতে মন না দিয়ে আমরা যেন এই প্রদেশ শাসকের প্রতি আমাদের ভালবাসার অনুভূতি বজায় রাখি।"

সুরেন্দ্রনাথ বলেছেন, এই ব্যাপারে যে প্রবল আন্দোলন হয়েছিল, একমাত্র বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনই তাকে ছাপিয়ে উঠতে পেরেছিল। —"They threw Calcutta into the vortex of an agitation that was only surpassed by the Anti Partition demonstrations, which also were due to Lord Curzon's policy."

বিষয়টি স্থানীয় হলেও এমনই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, তা জাতীয় মর্যাদা লাভ করেছিল এবং ১৮৯৯-এর লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে এ ব্যাপারে নিন্দা করে প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল।[৩]

## তথ্যসূত্র


১ Calcutta Old & New—H.E.A.Cotton, p.192.
২ অনুবাদক—নির্মল দত্ত।
৩ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, চতুর্থ খণ্ড—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, পৃ ৪৮-৪৯

২৯

# ১৮৯৯—পৌর আইন ও বৈদ্যুতিক আলো

১৮৯৯-র নতুন আইন বিধিবদ্ধ হবার পর যে তিনটি বিষয় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পেয়ে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়েছিল, সেগুলি—রাস্তায় বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা, কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা স্থাপন (Calcutta Improvement Trust) এবং রাস্তাঘাট নির্মাণের মালমশলা নিয়ে নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা।

প্রথমে আলোর কথা। শহর কলিকাতার উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় আলো সরবরাহের বিষয়টি প্রাধান্য পেতে থাকে। কলিকাতার মতো বড় শহরে বহু লোককে জীবিকার জন্য রাত্রে কাজ করতে হত। তা ছাড়া গাড়ি ঘোড়া, রিক্সা, মোটর গাড়ি প্রভৃতি বড় বড় রাস্তায় প্রায় সারা রাতই জরুরি কাজে চলাফেরা করত। এই সব কারণে কলিকাতার রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা করার জন্যে পুরসভা তৎপর হন। সেই সময় শহর কলিকাতার রাস্তায় প্রথমে ছিল তেলের বাতি। ১৮৫৭ খ্রিঃ পর্যন্ত এই ব্যবস্থা চালু ছিল। তখন সারা শহর কলিকাতায় মাত্র ৩১৩টি তেলের বাতি জ্বালানো হত। এগুলি সাধারণত প্রধান সড়ক পথে স্থাপিত হয়েছিল। দরিদ্র এলাকায় আলোর কোনও ব্যবস্থাই ছিল না। সে সময় আলো জ্বালানো, বাতিদান পরিষ্কার রাখা, তেল ও পলতের জোগান সব কাজই ঠিকাদার মারফত সম্পাদিত হত। এর জন্য ঠিকাদারকে প্রতি বাতিদানের জন্য মাসিক ১ টাকা ২ আনা ৬ পাই হিসাবে মজুরি দিতে হত। পুরসভার এই খাতে বার্ষিক ব্যয় হত ৭০০০ টাকার মতো। ঠিকাদারের কাজ দেখাশোনার জন্য একজন ওভারসিয়ার ছিলেন। তিনি মাসিক ৬০ টাকা বেতন পেতেন।

এই প্রকার তেলের আলোর বিস্তৃতি ছিল কম। বাতিদানের মধ্যে তেলের প্রদীপ বসিয়ে সে আলো জ্বালাতে হত। প্রদীপে যে সলতে থাকত তাই ঠিকাদারের লোক জ্বেলে দিত।

১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি ঠিকাদার মিঃ স্টাথামের সঙ্গে পুরসভার পাঁচ বছর মেয়াদের এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির শর্ত অনুসারে ঠিকাদার প্রতি বাতিদান রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মাসিক ৩ টাকা ৮ আনা হিসাবে মজুরি পাবেন। ওই চুক্তিতে আরেকটি শর্ত ছিল যদি পুরসভা গ্যাসের আলোর প্রবর্তন করেন তবে ছয় মাসের নোটিশে চুক্তিপত্র বাতিল হয়ে যাবে।

সেই সময় শহর কলিকাতার বড় রাস্তার উপর অবস্থিত গৃহের মালিকদের সদর দরজায় আলো দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। এই উদ্দেশ্যে ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দের পৌর আইনে (Act XII of 1852) ৫০ নম্বর ধারায় এটি সংযোজিত করা হয়। এর সারমর্ম হল, যে সব গৃহের মাসিক ভাড়া ৭০ টাকা ও তার উর্ধ্বে, সেই সব গৃহস্বামীকে তাদের নিজের খরচে সদর দরজায় অবশ্যই আলোর ব্যবস্থা করতে হবে। এই আইনে গৃহস্বামীদের খরচে রাস্তায় কিছুটা আলোর বন্দোবস্ত করা হয়। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের আইনে (Act XXVIII of 1856) এই বাধ্যতামূলক ধারাটি বাতিল করে দেওয়া হয়, উল্টে নতুন একটি ধারা সংযোজিত হয়। তাতে বলা হয় যে সব বাড়ির বার্ষিক মূল্যায়ন ১২০ টাকা ও তার উর্ধ্বে, সেই সব গৃহস্বামীদের উপর শতকরা ২ টাকা হিসাবে আলো-কর আরোপ করা যেতে পারে। এদিকে রাস্তার বাতিদানের সংখ্যা বাড়িয়ে ৪১৭টি করা হয়। এর জন্য পুরসভার বার্ষিক ব্যয় হত ১৬,৪৮৭ টাকা।

শহর কলিকাতার গুরুত্ব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যা দ্রুত হারে বাড়তে থাকে। কর্মের প্রসারও

রাত্রিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে। রাত্রিতে রাস্তায় পথচারী ও যান চলাচল ক্রমবর্ধমান হতে থাকায় রাস্তায় জোরালো আলোর প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সরকার তখন গ্যাসের আলো শহর কলিকাতায় প্রবর্তনের চিন্তাভাবনা শুরু করেন। ১৪ মে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানির সঙ্গে একটি চুক্তি হয়। চুক্তিটি সরকার ওই বছরের জুন মাসে অনুমোদন করেন। চুক্তির শর্তানুসারে গ্যাস কোম্পানি শহর কলিকাতার রাস্তায় ৬০০টি গ্যাস বাতিদান স্থাপন করবেন। বাতিদান পরিষ্কার, আলো জ্বালানোর কাজ প্রভৃতি কোম্পানির কর্মচারী সম্পাদন করবে। রাত্রে ১০ ঘণ্টার মত বাতিদান জ্বালানো থাকবে। প্রতিটি বাতিদানের জন্য বার্ষিক ব্যয় হবে ৯০ টাকা। এ ছাড়া গ্যাস কোম্পানি পুরসভাকে Rebate দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। বাতিদান ও ব্রাকেট (bracket) ইংল্যান্ড থেকে আমদানি করা হয়। কলিকাতার রাজপথে গ্যাসের আলো সরবরাহের কাজ ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ৯ জুলাই সুসম্পন্ন হয়। ওইদিন সন্ধ্যায় চৌরঙ্গী রোডে গ্যাসের আলোর উদ্বোধন করা হয়। সেদিন ওই রাস্তায় নতুন আলো দেখতে যে জনসমাগম হয়েছিল তার কথা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সেকালের পত্র-পত্রিকায়।

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে আলো-করের জন্য দাবির পরিমাণ ছিল টা. ১,১৯,১১৭। ওই বছরে অনাদায়ী করের পরিমাণ ছিল টা. ৫৪,২৯৩। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে পুরসভার রাজপথে আলো সরবরাহের জন্য বিভিন্ন খাতে এইভাবে ব্যয় হয়েছিল—

| | |
|---|---|
| ১। বার্ষিক ৯০ টাকা হিসাবে ৬০০ গ্যাস বাতিদানের খরচ— | টা. ৫৪,০০০ |
| ২। বার্ষিক ৪২ টাকা হিসাবে ১০০০টি তেলের বাতিদানের খরচ— | টা. ৪২,০০০ |
| মোট টা. | ৯৬,০০০ |

১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে আলো-কর খাতে ১,১৫,৩০৫ টাকা উদ্বৃত্ত থাকে। ওই অর্থ দিয়ে নতুন ১০০০টি গ্যাস এবং ৮০০টি তেলের বাতিদান স্থাপনের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু ইংল্যান্ড থেকে সময়মতো পোস্টগুলি না আসায় এই প্রস্তাব কার্যকর করা যায়নি। ইংল্যান্ড থেকে যে গ্যাসবাতিস্তম্ভ আমদানি করতে হত তার জন্য খরচ পড়ত প্রতিটি ৩৫ টাকা, শহর কলিকাতায় তা স্থাপনের খরচ হত ৮ টাকা ৪ আনা। গ্যাসের আলোর প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তেলের বাতি উঠে যেতে থাকে। তাই ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের শেষে শহর কলিকাতায় তেলের বাতির সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ৮০৫টিতে। ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দের সাইক্লোনে শহর কলিকাতায় আলোর স্তম্ভের সমূহ ক্ষতি হয়েছিল।

১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতার রাস্তায় তেলের ও গ্যাসের বাতিদান সংখ্যার দুটি সারণি কলিকাতা পুরসভা প্রকাশিত "Report for the Improvement of Calcutta—1861" পুস্তকে প্রকাশিত হয়েছিল। সেই সারণি দুটি পুস্তকের পরিশিষ্টে যুক্ত হল।

গ্যাসের আলোর অপ্রতুলতা ও অব্যবস্থা সম্বন্ধে শহরবাসী ও করদাতাদের কাছ থেকে ঘন ঘন অভিযোগ আসার ফলে কলিকাতা পুরসভা ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটির সুপারিশ অনুসারে উন্নততর গ্যাসের আলোর যন্ত্রপাতি (Photometric apparatus) ইংল্যান্ড থেকে আমদানির ব্যবস্থা হয়। ১ এপ্রিল, ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে এই সব যন্ত্রপাতির সাহায্যে নানা প্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়। পরীক্ষার ফলে প্রকাশ পায় যে গ্যাসের বার্নারগুলি ত্রুটিপূর্ণ এবং তাতে প্রয়োজনীয় গ্যাস সরবরাহ করা হয় না। ২৫ বছর ধরে এই ব্যবস্থাই চলতে থাকে। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে উন্নততর বার্নার (Incandescent burners) ব্যবহার করায় গ্যাসের আলোর যথেষ্ট উন্নতি হয়।

১৯০২-০৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলা সরকার পুরসভাকে রাস্তার আলো অধিকতর উন্নত করার পরামর্শ দেন। এর জন্য ৪৪০টি অতিরিক্ত বার্নারের ব্যবস্থা করা হয়। সরকারের নির্দেশকে রূপায়িত করতে পুরসভার ব্যয় হয় ১,১৩,০০০ টাকা। ওই অর্থ সরকার পরবর্তীকালে পরিশোধ করে দেন। এ ছাড়াও বার্ষিক ৫০০০ টাকা সরকারি অনুদানের ব্যবস্থা করা হয়। এই অর্থে আলোর ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য পুরসভায় উপযুক্ত কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। প্রদত্ত সারণির মাধ্যমে

শহর কলিকাতায় ১৮৬৩ খ্রিঃ থেকে আলো সরবরাহের ক্রমোন্নতির রূপরেখাটি পরীক্ষা করা যেতে পারে।

| বছর | তেলের বাতিদান সংখ্যা | গ্যাসের বাতিদান সংখ্যা | মোট ব্যয়ের পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| ১৮৬৪ খ্রিঃ | ৬৭৭ | ১০৮৪ | টাঃ ১,১৫,০৬৬ |
| ১৮৭০ ,, | ৬২১ | ২৭১১ | টাঃ ২,১২,২০২ |
| ১৮৮০ ,, | ১৫১ | ৩৮৫৯ | টাঃ ২,৪৪,৭৬০ |
| ১৮৮৯-৯০ | ৩৬৮ (শহর)<br>৬৮৭ (শহরতলি) | ৪৫২৪<br>৪৯৪ | টাঃ ৩,০০,৭৪৭ |
| ১৮৯০-৯১ | ১১৫৮ | ৫৩৯৭ | টাঃ ৩,২৩,০১৫ |
| ১৯০০-০১ | ২২৯৫ | ৬৮১১ | টাঃ ৪,৬১,৮০৪ |
| ১৯০৫-০৬ | ২৩৭৯ | ৮৯৯৭ | টাঃ ৫,৮৩,২৪৬ |
| ১৯১০-১১ | ২১৯২ | ১০,১৮৫ | টাঃ ৬,৬৫,৮২৯ |
| ১৯১৪-১৫ | ১৭৫৯ | ১১,৯০০ | টাঃ ৭,৯৭,০৩৯ |

এই সারণিতে একটি বিষয় স্পষ্ট যে গ্যাসবাতির সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তেলের বাতির সংখ্যা ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে।

এরপর আসে বৈদ্যুতিক আলোর কথা। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে হ্যারিসন রোড তৈরি হলে পর ওই রাস্তায় বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা ঠিকাদারের মাধ্যমে করা হয়। এর জন্য ৯২,০০০ টাকা ব্যয়ে হ্যালিডে স্ট্রিট পাম্পিং স্টেশনে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ডায়নামো বসানো হয়। ১৮৯৫-৯৬ খ্রিস্টাব্দে হ্যারিসন রোডে বৈদ্যুতিক আলোর ভূগর্ভস্থ তারের বিন্যাস বাতিল করে পোস্টের উপর দিয়ে তার টেনে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা হয়। এই পরিবর্তনের জন্য ১০,৬০০ টাকা খরচ হয়।

রাজপথের বৈদ্যুতিক আলোর উন্নতি ও বিকাশের সঙ্গে ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের নাম বিশেষভাবে জড়িত। শহর কলিকাতায় বিদ্যুৎ সরবরাহ ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দের বিদ্যুৎ আইনের [Act IX (B.C.) of 1895] দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই আইনে পুরসভার অনুমতি নিয়ে স্থানীয় সরকার বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থাকে লাইসেন্স মঞ্জুর করতে পারবেন এবং তাদের কার্যপ্রণালীর উপর নিয়ন্ত্রণের জন্য উপযুক্ত বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করতে পারবেন। বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যাপারে তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন হয়েছিল—

১. শহরবাসীর নিরাপত্তা,
২. বিদ্যুৎ সরবরাহ মূল্যের উপর নিয়ন্ত্রণ,
৩. নিয়মিত ও যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা।

১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দের আইন অনুসারে প্রথম যে কোম্পানিকে শহর কলিকাতায় বিদ্যুৎ সরবরাহের লাইসেন্স অনুমোদন করা হয়েছিল তাঁদের নাম "The Calcutta Electric Lighting Corporation Ltd."। এই সংস্থাটি পরবর্তীকালে কলিকাতায় বৈদ্যুতিক ট্রাম চালাবার লাইসেন্স লাভ করেছিলেন। সে সময় কোম্পানি পোল পিছু ১ টাকা বিদ্যুৎ মাশুল ধার্য করেন।

এরপর শহর কলিকাতায় বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজে অংশ গ্রহণের জন্য এগিয়ে এলেন কিলবার্ণ অ্যান্ড কোম্পানি। এঁরা বিলেতের ক্রম্পটন অ্যান্ড কোম্পানির (Crompton & Co.) কলিকাতার এজেন্ট। ১৮৯৭ এর জানুয়ারি মাসে এই কোম্পানি কলিকাতায় বিদ্যুৎ সরবরাহের অনুমতি পান। তাঁরা কলিকাতায় বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য নতুন একটি কোম্পানি স্থাপন করেন। নাম দিলেন Indian Electric Company Ltd.। একমাস পরেই ১৮৯৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এই কোম্পানির নতুন নাম হয় The Calcutta Electric Supply Corporation Ltd.। এই কোম্পানি এখন কলিকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ করেন।[১]

শহর কলিকাতার প্রথম বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল ইমামবাগ লেনে (প্রিন্সেপ স্ট্রিট)। এই কোম্পানি অন্যান্য স্থানেও বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র তৈরি করলেন। বিদ্যুৎ সরবরাহের উন্নতির সঙ্গে ১৯১০ খ্রিঃ থেকে Alternating Current উৎপাদন শুরু হয় উল্টাডিঙ্গিতে। এরপর ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে কাশীপুর বিদ্যুৎকেন্দ্র, তারপর দক্ষিণে মেটিয়াবুরুজে ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে, আর ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতার উত্তরে মূলাজোড়ে আরেকটি বৃহৎ আকারের বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপিত হয়।

The Calcutta Electric Supply Corporation Ltd. এর প্রথম অফিস ছোটই ছিল। তা ছিল কিলবার্নের সঙ্গে। পরে তাঁদের অফিস হাইকোর্টের দক্ষিণে Temple Chamber-এ উঠে আসে। চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ-এর উপর Victoria House তৈরি হলে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে The Calcutta Electric Supply Corpn. Ltd. এই নতুন ভবনে উঠে আসেন। এই সংস্থাটির সঙ্গে সরকারের চুক্তি ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে শেষ হয়ে যাবার পর তা' বাড়িয়ে ২০০০ সাল পর্যন্ত করা হয়।

শহরের উন্নতি ও এলাকা বৃদ্ধির সঙ্গে বৈদ্যুতিক ও গ্যাসবাতির সংখ্যা বাড়ানো হয়। ফলে তেলের বাতির ব্যবহার ক্রমেই কমে আসে। এই শতাব্দীর পাঁচের দশক পর্যন্ত বড় বড় রাস্তার একপাশে গ্যাসের আলো, অন্যধারে বৈদ্যুতিক আলো দেখা যেত। ১৯৪০-৪১ সালে কলিকাতার রাস্তায় আলোর সংখ্যা ছিল মোট ২৮,৩০১টি। তার মধ্যে—

তেলের বাতি— ৩৫২টি
গ্যাসের বাতি— ১৯,১০৯টি
বৈদ্যুতিক বাতি— ৮,৮৪০টি

ওই সময় কলিকাতা পৌরসভার রাস্তার আলোর জন্য গ্যাস ও বিদ্যুৎ কিনতে যথাক্রমে ৩,৯০,০০০ টাকা ও ১,০২,০০০ টাকা ব্যয় হয়। আর ৩৫২টি তেলের আলোর জন্য ১২,৫০০ টাকা লেগেছিল।[২] ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের পৌর আইন কার্যকরী হবার পর কলিকাতার বুক থেকে তেলের ও গ্যাসের আলো চিরতরে নির্বাসিত হল।

## তথ্যসূত্র


১ Municipal Calcutta—S.W. Goode, pp. 314-321
২ কলিকাতা ও উহার কর্পোরেশন—উপেন্দ্রনাথ বসু, পৃ ৭৯-৮০

## ৩০
# কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা

কলিকাতা উন্নয়ন আইনটি (The Calcutta Improvement Act, 1911) গৃহীত হবার পূর্বের পটভূমিকার উপর একবার দৃষ্টি দেওয়া যাক। কলিকাতা শহরের উন্নয়নের বিষয়টি ত্বরান্বিত করার জন্য ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে একটি সভা হয়। সেই সভায় হিউজেস্ সাহেবের পরিকল্পনাই (Mr. Hughes' Scheme) আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন বাংলা সরকার হিউজেস্ সাহেবকে পুরসভার কাজে নিযুক্ত করার জন্য পাঠিয়ে দেন। হিউজেস্ সাহেব কলিকাতা ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী রূপায়ণের জন্য যে পরিকল্পনা দাখিল করেন তাই 'হিউজেস্ পরিকল্পনা' নামে খ্যাত। এই পরিকল্পনাকে ভিত্তি করে কলিকাতা শহরের আধুনিক ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী গড়ে উঠেছে। তাঁর এই প্রকল্পে কলিকাতার ১৫$\frac{১}{২}$ মাইল রাস্তা নির্মাণের ও উন্নতির একটি রূপরেখা দেওয়া হয়েছিল। একে ভিত্তি করে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় :

উত্তর-দক্ষিণের রাস্তা সম্বন্ধে—

১। আমহার্স্ট স্ট্রিটকে উত্তরে সারকুলার রোড এবং দক্ষিণে লাউডন স্ট্রিট পর্যন্ত প্রসারিত করা।

২। হ্যালিডে স্ট্রিটকে (চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ) উত্তরে সারকুলার রোড এবং দক্ষিণে ফ্রি স্কুল স্ট্রিট পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া।

৩। ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিটকে বড়বাজারের মধ্য দিয়ে উত্তর দিকে স্ট্র্যান্ড রোড পর্যন্ত প্রসারণের ব্যবস্থা করা।

পূর্ব-পশ্চিমের রাস্তা সম্বন্ধে কমিটির সিদ্ধান্ত ছিল বর্তমান রাস্তাগুলি যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও উপযুক্ত উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করার। রাস্তাগুলি—গ্রে স্ট্রিট, বিডন স্ট্রিট, মেছুয়াবাজার স্ট্রিট, হ্যারিসন রোড, কলুটোলা স্ট্রিট, বহুবাজার স্ট্রিট এবং ধর্মতলা স্ট্রিট প্রভৃতি।

আরেক সাধারণ প্রস্তাবে বলা হয়েছিল যে ১ থেকে ৪ নম্বর, ১০, ১১ ও ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যে ৪০ ফুট দীর্ঘ আরও ৫ মাইল রাস্তা নির্মাণ করা। এর ফলে উত্তর-দক্ষিণে প্রস্তাবিত নতুন ও প্রশস্ত রাস্তার দৈর্ঘ্য হবে ৯$\frac{১}{৪}$ মাইল এবং পূর্ব-পশ্চিমে হবে ৬$\frac{১}{৪}$ মাইল।

কলিকাতা পুরসভা কলিকাতার সার্বিক উন্নয়নের রূপরেখা নিয়ে যখন এইভাবে চিন্তাভাবনা করছিলেন, ঠিক সেই সময় বাংলা সরকার কলিকাতা উন্নয়ন আইন (The Calcutta Improvement Act) নামে একটি আইন ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে বিধিবদ্ধ করেন। এটি ২ জানুয়ারি ১৯১২ খ্রিস্টাব্দ থেকে কার্যকর করা হয়। আইনটির মুখবন্ধে নতুন সংস্থার কর্মধারা এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে—

"Whereas it is expedient to make provision for the improvement and expansion of Calcutta by opening up congested areas, laying out or altering streets, providing open spaces for purposes of ventilation or recreation demolishing or constructing buildings, clearing bustees, executing housing schemes and schemes for the rehousing of persons displaced by the execution of improvement schemes, acquiring land for the said purposes and all works relating thereto, and otherwise, as

hereinafter appearing."

এই আইনের বলে কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা স্থাপিত হয়। কলিকাতার বিস্তৃতি, উন্নতি ও সম্পদ বৃদ্ধির দায়িত্ব এই সংস্থার উপর অর্পণ করা হয়। ১৯১৩-১৪ সালের কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থার বার্ষিক প্রতিবেদনে দেখা যায় যে ২৫০০ একর রাস্তার অন্তর্গত জমির মধ্যে ৮০০ একর হচ্ছে শ্রেণীবদ্ধ বস্তি জমি। গৃহ সমস্যাও খুব তীব্র, ৯ লক্ষ লোক মাত্র ৪৫০০০ গৃহে বাস করে। অর্থাৎ শতকরা হিসাবে ২০ জন ব্যক্তি একটি গৃহে বাস করে। সে সময় কলিকাতা ও হাওড়ার মিলিত জনসংখ্যা ছিল ১$\frac{১}{৪}$ মিলিয়ন। এই গভীর সমস্যা সমাধানের জন্য কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থার প্রধান তিনটি কাজ—কলিকাতা শহরের মধ্যে উন্নততর যোগাযোগ স্থাপনের জন্য নতুন রাস্তা নির্মাণের ব্যবস্থা, তীব্র গৃহ সমস্যার সমাধান, আর নতুন শহরতলি সৃষ্টি করে তার উন্নয়নের ব্যবস্থা করা।[১]

প্রথম সমস্যাটির উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তাই প্রথম পদক্ষেপে কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা কলিকাতা শহরের দুটি মানচিত্র নির্মাণ করেন। প্রথমটি কলিকাতা ও শহরতলির মানচিত্র। এর বৈশিষ্ট্য হল—

১। কলিকাতা শহরের ১ ও ২ নম্বর রাজপথগুলির বিন্যাস দেখানো হয়েছে।

২। প্রস্তাবিত নতুন রাস্তা ও উদ্যানগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে।

৩। বর্তমান রাস্তা যেগুলি চওড়া করা হবে সেগুলি স্পষ্টভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে।

আর দ্বিতীয় মানচিত্রকে বলা হয়েছিল "as the best layout of Calcutta"। এই মানচিত্রটি (পরিশিষ্ট ৯ দ্রষ্টব্য) রূপায়িত হলে কলিকাতা শহরের সামগ্রিক চেহারার রূপান্তর ঘটত, রাস্তাঘাটের বিন্যাস ইউরোপীয় শহরের ধাঁচে গড়ে উঠত। কিন্তু অত্যন্ত তুচ্ছ ওজরে এই মানচিত্রে প্রদর্শিত নগরবিন্যাসের প্রস্তাব বাতিল হয়েছিল। কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা তাঁদের প্রতিবেদনে এই সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন সেটি এখানে উদ্ধৃত হল :

"In the circumstances existing it is doubtful whether anything more than a severely practical scheme is desirable within the city. It appears to be clear that there is no popular demand for an elaborate scheme and in any event, there is insufficient money available for the execution of an ideal scheme for the centre of Calcutta."[২]

কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থার কর্তৃপক্ষের যদি সামান্যতম দূরদৃষ্টি থাকত তবে দ্বিতীয় মানচিত্রটি তুচ্ছ অজুহাতে এইভাবে বাতিল করতেন না। বরং এটিকে "Continuous plan" হিসাবে চিহ্নিত করে ধাপে ধাপে রূপায়ণের ব্যবস্থা করা যেতে পারত। ফরাসি দেশের প্যারি নগরীর উন্নয়নে যে "continuous planning"-এর কথা এই নিবন্ধের প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে, অথচ কলিকাতা শহরের বেলায় এই অভিজ্ঞতা কোনও কাজেই লাগানো হল না—এটাই পরিতাপের বিষয়।

প্রাথমিক পর্যায়ে কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থার আনুমানিক আয় ধরা হয়েছিল ৭ কোটি টাকা। ওই টাকার মধ্য থেকে ৪ কোটি টাকা শহরের নতুন রাস্তা নির্মাণে নির্দ্ধারিত ছিল। যে অঞ্চলের মধ্যবর্তী ভূভাগে এই সব রাস্তা নির্মিত হবে তা সারকুলার ক্যানেল ও সারকুলার রোডের মধ্যবর্তী অঞ্চল। আর ২ কোটি টাকা পৃথক করে রাখা হয়েছিল শহরতলির প্রধান রাস্তা, সেতু ও গৃহ নির্মাণের জন্য। বাকি ১ কোটি টাকা শহরে নতুন উদ্যান, গৃহনির্মাণ প্রকল্প, স্বাস্থ্যকর বিধিব্যবস্থা রূপায়ণে ব্যয়িত হবে।

কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা স্থানীয় ছোটখাটো উন্নয়নের কাজে অথবা স্বাস্থ্যকর বিধিব্যবস্থা রূপায়ণে তাদের মূলধন ব্যয় করবেন না, কারণ এগুলি রূপায়ণের ব্যাপারে কলিকাতা পুরসভার যথেষ্ট সামর্থ্য আছে। এই সংস্থা ব্যাপক ভিত্তিতে প্রস্তুত শহরের রাস্তাঘাটের মূল পরিকল্পনাগুলি রূপায়ণে তাঁদের ক্ষমতাকে নিয়োজিত করবেন।

কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা শহরের প্রধান রাস্তাগুলি প্রশস্ত করার দিকে সর্বপ্রথম নজর দিয়েছিলেন। এ বিষয়ে তাঁরা রাস্তাঘাট সম্বন্ধে আমেরিকান নির্ধারিত গুণমানের (American standard) পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁরা একটা খসড়া প্রস্তাব সংস্থার অনুমোদনের জন্য পেশ করেছিলেন—

| | | | |
|---|---|---|---|
| Main Avenues | ... | ... | 100 feet to 150 feet |
| Main Thoroughfares | ... | ... | 80 feet |
| Secondary ,, | ... | ... | 60 feet |
| Local Streets | ... | ... | 40 feet |

কিন্তু কলিকাতার প্রধান সড়কগুলি এমনভাবে নির্মিত হয়েছিল যে তাতে এই প্রশস্ততার রূপ দিতে যাওয়া এক অসম্ভব ব্যাপার ছিল, তা ছাড়া এর জন্য প্রচুর অর্থের সংস্থান প্রয়োজন। যদি কোনও প্রকারে এই সুপারিশকে কার্যকর করা সম্ভব হত, তাহলে বর্তমানে কলিকাতার যানজটের ঝামেলা অনেকাংশে হ্রাস করা যেত।

এই সব অসংগতি বিবেচনার পর কলিকাতার প্রধান সড়কগুলির প্রস্থ ৮০ ফুট নির্ধারিত হয়েছিল। এই ৮০ ফুট রাস্তার মধ্যবর্তী অঞ্চলে ২০ ফুট রাখা হবে ট্রাম চলাচলের জন্য, দুপাশে ১৬ ফুট রাখা হবে দু'সারি গাড়ি চলাচলের জন্য। এ ছাড়া তো ফুটপাত আছেই। এই প্রকারের রাজপথে যান চলাচল সহজসাধ্য হবে। যদিও বাণিজ্যক কেন্দ্রের রাজপথগুলি আরও প্রশস্ত হওয়া দরকার, কারণ পথের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা নানা প্রকারের গাড়ি রাস্তা দখল করে যান চলাচলে বাধা সৃষ্টি করবে।

যে সব রাজপথের বিস্তার ৬০ ফুট হবে সেখানে মোটেই ট্রাম লাইন পাতা অনুমোদন করা হবে না। এই রাস্তার দু'ধারে ১৪ ফুট করে ফুটপাত রাখার ব্যবস্থা থাকবে।

শহরতলির উন্নয়নের ব্যাপারে কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা উদার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন। তার প্রধান কারণ, এখানে জমিজমার মূল্য কলিকাতার মত অত মহার্ঘ নয়। কাজেই রাজপথগুলি চওড়া করার অনুকূলে মত প্রকাশ করা হয়েছিল। উন্নয়ন সংস্থার সুপারিশ মতো রাস্তার প্রস্থ এইভাবে নির্ধারিত হয়েছিল :

| | |
|---|---|
| Main Avenues or Boulevards | ১৫০ ফুট |
| Main Roads | ১০০ ফুট |
| Secondary Roads | ৮০ ফুট |
| Development Roads | ৪০ ফুট থেকে ৬০ ফুট |

রাস্তার বুক বরাবর যে অংশে যানবাহন চলাচল করবে, সেই অংশটুকু পাকা করা হবে। বাকি অংশ কাঁচা থাকবে। তাতে গাছগাছালি রোপণ করে সুদৃশ্য ছবির মতো করার ব্যবস্থা হবে।

মানিকতলা অঞ্চলে সারকুলার ক্যানেলের পূর্ব দিকে প্রধান সড়কপথের প্রস্থ হবে ১০০ ফুট। আর তার নিকটবর্তী রাস্তাগুলি ৮০ ফুট প্রশস্ত হবে।

এরপর কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থাকে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সেটি হল স্থায়ী রাজপথকে প্রশস্ত করার মাত্রাতিরিক্ত ব্যয়ের সঙ্গে নতুন রাস্তা নির্মাণের ব্যয়ের বিশাল ব্যবধান। বর্তমান রাজপথের ধারে জমির মূল্য অস্বাভাবিক উচ্চ হওয়ার কারণ, এই জমি বা বাড়ির পিছন দিকে কোনও রাস্তা নেই। এ ছাড়াও বাজার দামে যদি ওই সব জমি অধিগ্রহণের ব্যবস্থা হয় তবে রাস্তার ধারে যে সব ব্যবসায়ীরা আছে তাদের পুনর্বাসন একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। ফলে কলিকাতার পুরাতন রাজপথ প্রশস্ত করার বিষয়টি হবে ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার। প্রতিপাদ্য বিষয়টিকে তুল্যরূপে বিবেচনার জন্য কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা তাঁদের প্রতিবেদনে দুটি সারণি উপস্থিত করেছেন—একটি চিৎপুর রোড প্রশস্ত করার সম্ভাব্য ব্যয়ের তালিকা, অন্যটি প্রস্তাবিত সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউর।

Chitpure Road Widening

| | | | |
|---|---|---|---|
| Gross | ... | ... | 163 lakhs |
| Net | ... | ... | 97 lakhs |
| Engineering works | ... | ... | 10 lakhs |

New Central Avenue

| | | | |
|---|---|---|---|
| Gross | ... | ... | 96 lakhs |
| Net | ... | ... | 27 lakhs |
| Engineering works | ... | ... | 14 lakhs |

তা ছাড়া, চিৎপুর রোড চওড়া করতে গেলে প্রায় প্রতি বাড়ির গায়ে হাত দিতে হবে। বাড়ির মূল্য ধার্য নিয়ে কোনও নির্ধারিত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাবে না । ফলে টানাপোড়েন ও আইন আদালতের আশ্রয় নিয়ে সমস্ত প্রকল্পটি বানচাল হয়ে যাবার সম্ভাবনা সমধিক। এই সব চিন্তাভাবনা করার পর কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা পুরানো রাজপথ প্রশস্ত করার পরিকল্পনার উপর জোর না দিয়ে নতুন রাজপথ নির্মাণে বেশি তৎপর হয়েছিলেন। অবশ্য অনেক স্থায়ী সংকীর্ণ পথকেও সংস্কার ও প্রশস্ত করার ব্যবস্থা কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থাকে নিতে হয়েছিল।

কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা কলিকাতার সার্বিক উন্নতির জন্য রাস্তাঘাটের যে সব পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন সেগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি নিয়ে কিছু আলোচনার সূত্রপাত করা যাক। সে সময় কলিকাতার সর্বাপেক্ষা জনবহুল এলাকা এই সীমানার মধ্যে অবস্থিত ছিল—দক্ষিণে বৌবাজার স্ট্রিট, পশ্চিমে হুগলি নদী, উত্তর এবং পূর্ব দিকে সারকুলার রোড, এই এলাকার উন্নয়নে কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা সর্বপ্রথম তৎপর হন। যে পরিকল্পনাগুলি এই অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য গ্রহণ করা হয়েছিল তার মধ্যে ২$\frac{৩}{৪}$ মাইল দীর্ঘ সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ অন্যতম। রাজপথটি ১০০ ফুট চওড়া, শহরের মধ্য দিয়ে উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত প্রধান সড়ক। সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ খানিক অংশ নিয়ে ছিল হ্যালিডে স্ট্রিট, এটি নির্মিত হয়েছিল ১৮৫৬ খ্রিঃ, দৈর্ঘ্য ছিল $\frac{১}{৩}$ মাইল, প্রস্থ ৭০ থেকে ৮০ ফুট। নির্মাণের পর থেকে এটিকে উত্তরে বা দক্ষিণে প্রসারিত করারকোনওচিন্তাভাবনা হয়নি। ফলে যানবাহন চলাচলের ব্যাপারে এই পথটি বিশেষ কোন গুরুত্ব পায়নি। কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা এই পথটিকে উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত করে কলিকাতার একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজপথে রূপায়িত করতে তৎপর হয়েছিলেন।

| প্রকল্প সূচক সংখ্যা (Scheme No.) | প্রকল্পের নাম | জমি অধিগ্রহণের পরিমাণ (একর) | জমির মূল্য (টাঃ) | কাজের সূচনা/সমাপ্তি |
|---|---|---|---|---|
| VII | চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ (মেছুয়াবাজার স্ট্রিট থেকে বিডন স্ট্রিট পর্যন্ত) | ২৬ | ১৩,৫০,০০০ | ১৩.২.১৯১৭<br>১৯২৬ |
| VIIA | চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ (হ্যালিডে স্ট্রিট প্রশস্তকরণ) | ১১ | ২,৫০,০০০ | ১১.১.১৯১৬<br>১৯২৬ |
| VIIB | চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ (কলুটোলা স্ট্রিট থেকে বৌবাজার স্ট্রিট পর্যন্ত) | ১২·২ | ৭,২৫,০০০ | ৪.১.১৯১৬<br>১৯২৬ |
| VIID | চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ (বহুবাজার স্ট্রিট থেকে প্রিন্সেপ স্ট্রিট পর্যন্ত) | ২৮·৬ | ৩৭,৫০,০০০ | ১১.১১.১৯১৯<br>১৯৩৪ |
| VIIE | চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ (প্রিন্সেপ স্ট্রিট থেকে চৌরঙ্গী) | ৩৩·০৭ | ২২,০০,০০০ | ২৭.৫.১৯২১<br>১৫.৪.৩০ |
| VIIH | সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ (বিডন স্ট্রিট থেকে গ্রে স্ট্রিট পর্যন্ত) | ১৯·৩ | ১৫,০০,০০০ | ১৩.৩.১৯৩০<br>১৯৩৬ |
| VIIJ | সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ (গ্রে স্ট্রিট থেকে শ্যামবাজার স্ট্রিট) | ১৫·৮১ | ১৪,২৫,০০০ | ১২.২.১৯৩১<br>১৯৩৭ |
| XXXVII | সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ থেকে শ্যামবাজার | ২০·৪৬ | ১৯,৭৫,০০০ | ৪.৯.১৯৩৩<br>১৯৪২ |

এই সঙ্গে আরও তিনটি প্রকল্প রূপায়িত হয়েছিল—চিৎপুর স্পার, মানিকতলা স্পার ও জগন্নাথঘাট রোড। এদের বিবরণ নীচে বর্ণিত হল—

| প্রকল্প সূচক সংখ্যা (Scheme No.) | প্রকল্পের নাম | জমি অধিগ্রহণের পরিমাণ (একর) | জমির মূল্য (টাঃ) | কাজের সূচনা/সমাপ্তি |
|---|---|---|---|---|
| VIICS | চিৎপুর স্পার | ৯·৪৫ | ৭,৫০,০০০ | ১৯.৭.১৯১৮<br>১৯২৬ |
| VIIC | মানিকতলা স্পার | ২২·৫৩ | ৯,০০,০০০ | ১৭.১০.১৯১৯<br>১৯২৭ |
| VIIG | জগন্নাথঘাট রোড (আপার চিৎপুর রোড থেকে স্ট্র্যান্ড রোড নর্থ পর্যন্ত)। | ১৫·৭২ | ২০,০০,০০০ | ৫.৯.১৯২৭<br>১৯৩৫ |

এই সমস্ত পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য মোট ২০১·১ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। এই পরিকল্পনার অন্তর্গত হল সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ থেকে কর্নওয়ালিস স্ট্রিট (শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়) পর্যন্ত ৮৪ ফুট চওড়া একটি রাজপথ। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে কলিকাতা পুরসভা এই রাজপথটি সেকালের খ্যাতনামা আইনজীবী, জননায়ক ও রাজনীতিজ্ঞ ভূপেন্দ্রনাথ বসুর নামে 'ভূপেন্দ্র বসু অ্যাভিনিউ' নামাঙ্কিত করেন। আর গ্যালিফ স্ট্রিট ও কাশীপুর রোডের সংযোগস্থল থেকে শুরু হয়ে যে রাজপথটি ধর্মতলা ও চৌরঙ্গীর কেন্দ্রবিন্দুতে মিলেছে সেটি টুকরো টুকরো ভাবে নানা নামে নামাঙ্কিত হয়েছিল—প্রখ্যাত নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের নামে 'ক্ষিরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ অ্যাভিনিউ, বিশ্রুত নট ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের নামে 'গিরিশ অ্যাভিনিউ', দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের নামে 'যতীন্দ্রমোহন অ্যাভিনিউ' ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নামে 'চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ'। রাস্তাটি ১০০ ফুট চওড়া, দু-পাশে ২২ ফুট করে প্রশস্ত ফুটপাত, তার মধ্যে পথচারীদের ব্যবহারের জন্য ১৫ ফুট পাকা। আর বৃক্ষরোপণের জন্য ৭ ফুট কাঁচা ফুটপাত। এর কারণ হল বীথিকায় সুসজ্জিত হয়ে রাজপথটি অ্যাভিনিউর বৈশিষ্ট্য লাভ করতে পারবে। যান চলাচলের জন্য রাস্তার প্রস্থ রাখা হয়েছিল ৫৬ ফুট। এই দীর্ঘ রাজপথটি তৈরি হওয়াতে চিৎপুর রোডের যানজটের ঝামেলা সে সময় অনেকটা হ্রাস পেয়েছিল।

চিৎপুর স্পার ৮৩০ ফুট লম্বা এবং ৮৪ ফুট চওড়া। যান চলাচলের জন্য ৫৪ ফুট, আর ১৫ ফুট প্রশস্ত ফুটপাত রাখা হয়েছিল রাস্তার দু ধারে। সে সময় এই রাস্তার ধারে ২০টির মতো বাড়ি ছিল। কলিকাতা পুরসভা ৪ অক্টোবর ১৯৩৯ খ্রিঃ চিৎপুর স্পারের নাম বদল করে 'বালমুকুন্দ মক্কর রোড' নামকরণ করেন। বালমুকুন্দ মক্কর ছিলেন যোধপুরের অধিবাসী। কলিকাতায় এসে ব্যবসা-বাণিজ্যের দৌলতে লক্ষ্মী লাভ করেন। মাড়োয়ারি হাসপাতাল নির্মাণে ৪০০০ টাকা দান করেন। বসবাস করতেন ১৫নং বাঁশতলা স্ট্রিটে। বসতবাটি সংলগ্ন কিছু জমি বিনামূল্যে কলিকাতা পুরসভাকে দান করেছিলেন। সেকালের কাউন্সিলার মোহনলাল মক্করের তিনি ছিলেন পিতামহ।

চিৎপুর স্পার নির্মাণের সময় কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা পার্শ্ববর্তী রাস্তাগুলির উন্নতিবিধানে তৎপর হয়েছিলেন।

মানিকতলা স্পার সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউর পূর্বদিকে জেলেটোলা স্ট্রিট থেকে শুরু হয়ে মানিকতলা স্ট্রিট ও ঘোষ লেনের সংযোগস্থল ছাড়িয়ে আপার সারকুলার রোড পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। রাস্তাটি ৮৪ ফুট চওড়া। কলিকাতা পুরসভা ২৩ জুলাই ১৯৩০ খ্রিঃ মানিকতলা স্পারের নাম বদল করে স্বামী বিবেকানন্দের নামে 'বিবেকানন্দ রোড' নামকরণ করেন।

জগন্নাথঘাট রোড কলিকাতার একটি প্রাচীন পথ। কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা এই রাস্তাটি সংস্কার ও প্রশস্ত করেন। এই রাস্তাটি হওয়াতে উত্তর কলিকাতার বাসিন্দাদের হাওড়া যাবার পথ সুগম হয়েছিল। এটি চিৎপুর রোডকে স্ট্র্যান্ড রোডের সঙ্গে সংযুক্ত করেছিল। কলিকাতা পুরসভা ১৭ই মার্চ ১৯৩৭ খ্রিঃ রাস্তাটির নাম পরিবর্তন করে 'কালীকৃষ্ণ টেগোর স্ট্রিট' নামকরণ করেন। খ্যাতনামা দানশীল জমিদার কালীকৃষ্ণ ঠাকুর (১৮৪০-১৯০৫) কলিকাতার প্রসিদ্ধ ঠাকুর পরিবারের এক সুসন্তান। কলিকাতার বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও জনহিতকর সংস্থা তাঁর অকুণ্ঠ দানে সমৃদ্ধ হয়েছিল। তাঁর দানশীলতা কেবলমাত্র তাঁর জন্মনগরী কলিকাতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তার পরিধি জাতি-ধর্মের গণ্ডি ছাড়িয়ে সারা দেশে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। তিনি প্রায় ১০ লক্ষ টাকা দান করেছিলেন। ১৯০৫ খ্রিঃ ৬৫ বছর বয়সে তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁর পৌত্র রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুর তাঁর বিশাল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী হন।

কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা এরপর কড়েয়া বাজার অঞ্চল প্রকল্পটি রূপায়ণে তৎপর হয়েছিলেন। এলাকাটি পার্ক স্ট্রিটের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত। পার্ক সার্কাসের উন্নয়ন এই প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। পাঁচটি নতুন রাস্তার সমন্বয় ঘটেছিল এই পার্ক সার্কাসে—নিউ পার্ক স্ট্রিট, নিউ থিয়েটার রোড, সারকুলার অ্যাভিনিউ, সৈয়দ আমির আলি অ্যাভিনিউ এবং সুরাবর্দি অ্যাভিনিউ। প্রকল্পের সংক্ষিপ্তসার এইরূপ—

| প্রকল্পসূচক সংখ্যা (Scheme No.) | প্রকল্পের নাম | জমি অধিগ্রহণের পরিমাণ (একর) | জমির মূল্য (টাঃ) | কাজের সূচনা |
|---|---|---|---|---|
| VIII | পার্ক স্ট্রিট এক্সটেনশন | ৮৫·২ | ২৯,৫০,০০০ | ১৯১৮ |
| VIIIA | পার্ক স্ট্রিটের বাহিরের অংশ (Outer Park Street) | ৪৩·৮৬ | ১৬,০০,০০০ | ১৯১৮ |
| VIIIC | সৈয়দ আমির আলি অ্যাভিনিউ | ৪৪·৩ | ৩৬,০০,০০০ | ১৯২৬ |

এই প্রকল্পগুলি রূপায়িত হওয়াতে পার্ক সার্কাস এলাকার বহু ঘিঞ্জি বস্তি উচ্ছেদ করে, মজা পুষ্করিণী ভরাট করে নতুন নগরায়ণের পত্তন হয়। পার্ক স্ট্রিটকে ১০০ ফুট চওড়া করে ইস্টার্ন-বেঙ্গল রেলওয়ের ধারে ৪নং ব্রিজ পর্যন্ত প্রসারিত করা হয়। এ ছাড়া ৬৫ বিঘা জমির উপরে একটি বিশাল উদ্যান নির্মিত হয়।

যে পাঁচটি রাস্তার কথা বলা হয়েছে তাদের সম্বন্ধে দু'চার কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। নিউ পার্ক স্ট্রিট ও নিউ থিয়েটার রোড সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আলোচনা করার ইচ্ছা রইল।

পার্ক সার্কাস এলাকার উন্নয়ন সার্কাসের অ্যারেনার (arena) আকারে বিন্যাসের ব্যবস্থা হয়েছিল। তার গঠনশৈলীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এখানকার নবনির্মিত ১০০ ফুট চওড়া একটি রাস্তার নাম কলিকাতা পুরসভা ১৯ নভেম্বর ১৯৩৪ খ্রিঃ 'সার্কাস অ্যাভিনিউ' নামকরণ করেন। প্রথমে এটি নিউ সারকুলার রোড নামে পরিচিত ছিল। রাস্তাটি বেকবাগান ও লোয়ার সারকুলার রোডের সংযোগস্থল থেকে শুরু হয়ে উত্তর-পূর্বদিকে প্রসারিত হয়ে পার্ক স্ট্রিট এক্সটেনশনে এসে মিশেছে।

এরপরে আসছে সৈয়দ আমির আলি অ্যাভিনিউ-এর কথা। রাস্তাটি নিউ পার্ক স্ট্রিট ও ট্রাম ডিপোর পশ্চিম দিকের সংযোগস্থল থেকে আরম্ভ হয়ে বালিগঞ্জ স্টোর রোড পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। রাস্তাটির দৈর্ঘ্য ৫৬৭ গজ, প্রস্থ ১০০ ফুট। নির্মাণে খরচ হয়েছিল টাঃ ১১,০২,৮২১। পরে রাস্তাটি দক্ষিণে আরও সম্প্রসারিত হয়।

কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি, ইংল্যান্ডের প্রিভি কাউন্সিলের জুডিসিয়াল কমিটির সদস্য, বিদগ্ধ পণ্ডিত, মুসলমান সমাজের নেতা, হিন্দু মুসলমান ঐক্যের সমর্থক সৈয়দ আমির আলি (১৮৪৯-১৯২৮) চুঁচুড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৬৭ খ্রিঃ হুগলি কলেজ থেকে স্নাতক হবার পর ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এম. এ. ও আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে ভারত সরকারের বৃত্তি নিয়ে

ইংল্যান্ড থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করে আসেন। প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট রূপে কার্য পরিচালনার সময় লর্ড রিপন তাঁকে ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত করেন। পরে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের প্রথম মুসলমান বিচারকের পদ অলংকৃত করেন। ওই পদ থেকে অবসর নেবার পর তিনি ইংল্যান্ডে গমন করেন এবং সেখানে প্রিভি কাউন্সিলের জুডিসিয়াল কমিটির সদস্য নিযুক্ত হন। ১৯২৮ খ্রিঃ ইংল্যান্ডে তিনি দেহত্যাগ করেন।

সৈয়দ আমির আলি মুসলিম আইনে সুপণ্ডিত ছিলেন। কয়েকটি পুস্তক রচনা করেছিলেন তিনি— "Life of the Prophet", "The Ethics of Islam" ও "The History of the Saracens."। এ ছাড়াও তিনি The Central National Mahomedan Association in India নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। বিভিন্ন সময়ে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা, হুগলি ইমামবাড়ার সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত হন। বাঙালিদের মধ্যে তিনিই প্রথম ইসলাম ধর্ম, সংস্কৃতি ও ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেন।

পার্ক সার্কাস অঞ্চলের রেখাচিত্র

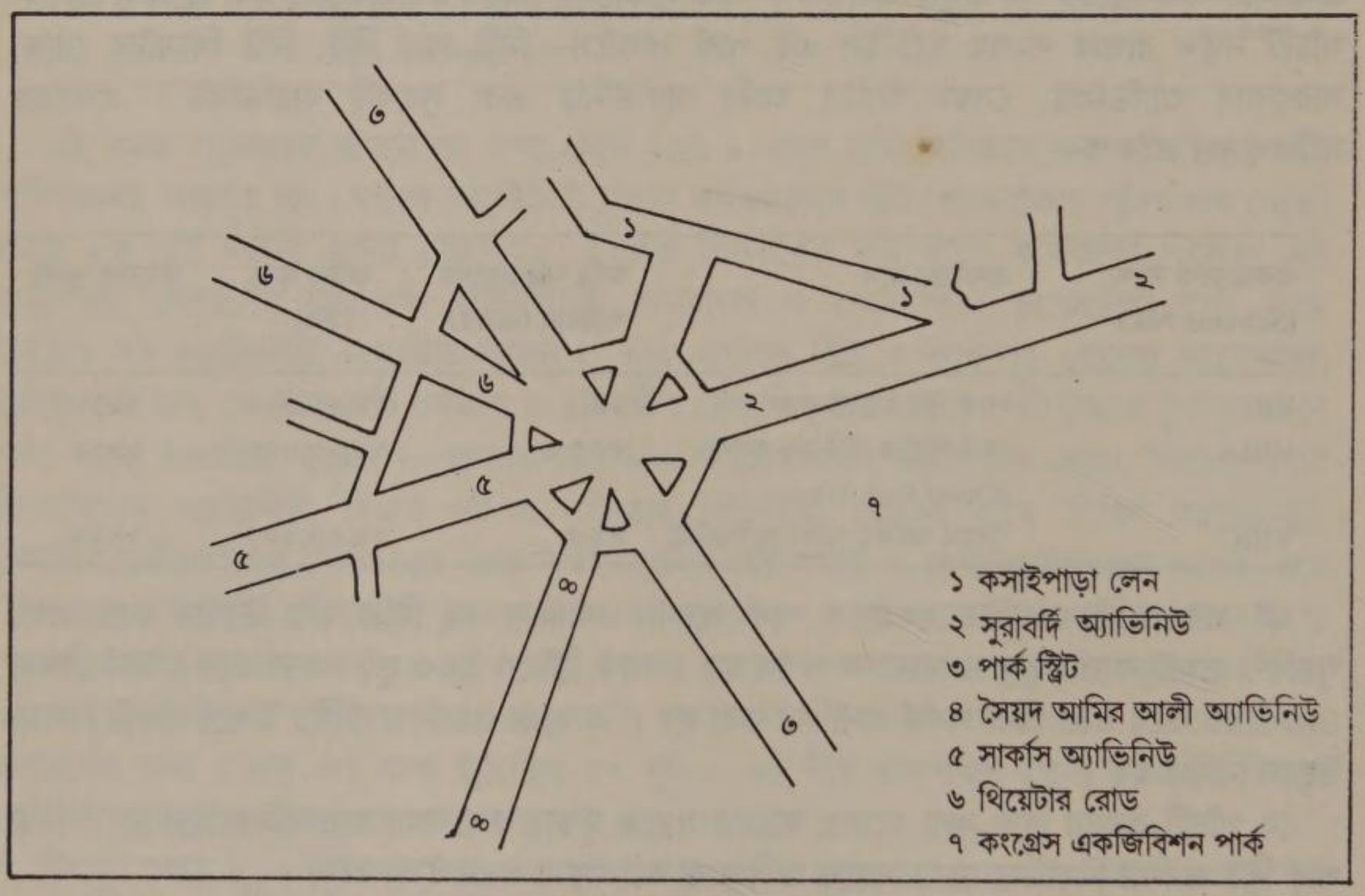


পাঠকের সুবিধার জন্য পার্ক সার্কাস অঞ্চলের রাস্তার বিন্যাস প্রদত্ত হল।

পার্ক সার্কাসের পঞ্চম রাস্তাটি সুরাবর্দি অ্যাভিনিউ। এটি ১০০ ফুট চওড়া, পার্ক সার্কাস থেকে শুরু হয়ে কসাইপাড়া লেনের এবং পার্ক সার্কাস উদ্যানের উত্তরে এসে পড়েছে। পরে রাস্তাটি দরগা রোড পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। কলিকাতা পুরসভার ৮ই মার্চ ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের অধিবেশনে সে সময়ের কাউন্সিলার শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নবনির্মিত রাস্তাটির নাম সুরাবর্দি অ্যাভিনিউ রাখার এক প্রস্তাব আনেন। সেই প্রস্তাবে বলা হয়েছিল—"That the new 100 feet Road constructed by the C.I.T. from Park Circus to the junction with Kasaipara Lane lying to the North of the park be called 'Suhrawardy Avenue'. He said that this should be in compliance with the unanimous desire of the local public and in recognition of the vast scholarship and erudition, deep piety and saintly character of the illustrious Moulana Obaidullah Suhrawardy." কলিকাতা পুরসভা ওই দিন ওই প্রস্তাব অনুমোদন করেন। নতুন রাস্তা 'সুরাবর্দি অ্যাভিনিউ' নামে নামাঙ্কিত হয়। মৌলানা সুরাবর্দি ছিলেন সাধু প্রকৃতির, জাতি ধর্ম-নির্বিশেষে সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা ভক্তি করত। তাঁর পুত্রেরা সকলেই কৃতবিদ্য

ছিলেন। তাঁরা হলেন স্যার আবদুল্লা সুরাবর্দি, স্যার হাসান সুরাবর্দি এবং মিস্টার মাসুম সুরাবর্দি।

কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা পার্ক সার্কাস অঞ্চলে এই পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ প্রধান রাজপথ ছাড়া আরও কয়েকটি রাস্তা নির্মাণ করে নগরায়ণ ব্যবস্থাকে ত্বরান্বিত করতে তৎপর হয়েছিলেন। ফলে ওই এলাকার সার্বিক চেহারায় এক বিরাট পরিবর্তন ঘটেছিল। শুধু পথঘাটই নয় কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা পার্ক সার্কাস অঞ্চলে বিশাল একটি উদ্যান নির্মাণ করেন। ৬৫ বিঘা জমি জুড়ে এই উদ্যানটির অবস্থান। প্রথমে এটি ইস্টার্ন পার্ক নামে পরিচিত ছিল, সে সময় এই উদ্যানে কংগ্রেসের কয়েকটি অধিবেশন হয়েছিল। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের বার্ষিক কংগ্রেস অধিবেশন। সভাপতি হয়েছিলেন মতিলাল নেহরু। কলিকাতা পুরসভা তাঁদের ২০ মে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের অধিবেশনে উদ্যানটিকে নামাঙ্কিত করেন "ন্যাশনাল কংগ্রেস পার্ক"।

বড়বাজার উন্নয়ন প্রকল্প কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা। এটি একদিকে যেমন অত্যন্ত ব্যয়বহুল অন্যদিকে এর রূপায়ণ ছিল অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। অঞ্চলটি কলিকাতার বাণিজ্যের কেন্দ্রভূমি, সরু সরু পথ, তার দু'ধারে দোকানপাট, রাস্তায় গাড়ির ভিড়, তার মধ্যে কাজ করা এক দুরূহ ব্যাপার। ইতিমধ্যে কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা বড়বাজার উন্নয়নের একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন এবং সেটি বিবেচনার জন্য পুরসভায় পাঠিয়ে দেন। এই প্রকল্পটি গ্রহণ করার পূর্বে কলিকাতা পুরসভা বিদেশি নগর-উন্নয়ন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এঁরা হলেন অধ্যাপক গেডিস্ (Prof. Geddes) এবং মিঃ ল্যানচেষ্টার (Mr. Lanchester)। অধ্যাপক গেডিস্ আমন্ত্রণ গ্রহণ করে বড়বাজার উন্নয়নের একটি রূপরেখা পুরসভার হস্তে অর্পণ করেন। তাঁর এই কাজের পারিশ্রমিক দেওয়া হয়েছিল ৬০০০ টাকা। মিঃ ল্যানচেষ্টার সেই সময় অস্ট্রেলিয়া থাকায় তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।[৩]

বড়বাজার উন্নয়ন বিন্যাসের রূপরেখা প্রণয়ন ছাড়াও অধ্যাপক প্যাট্রিক গেডিস্-এর সঙ্গে বঙ্গদেশ তথা ভারতের যে হার্দিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তার উপর আলোকপাত করা দরকার। ভারতবর্ষকে ভালবেসে অধ্যাপক গেডিস্ দীর্ঘদিন ভারতে কাজ করেছিলেন এবং ভারতের দুই মহামনীষীর অন্তরঙ্গ সংস্পর্শে এসেছিলেন। প্রথমজন স্বামী বিবেকানন্দ, ১৯০০ সালে প্যারি শহরে তাঁদের প্রথম পরিচয়। দ্বিতীয়জন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্যাট্রিক গেডিস্ ছিলেন ইউনিভার্সিটি অফ এডিনবরার টাউন অ্যান্ড কান্ট্রি প্ল্যানিং-এর অধ্যাপক। শহর ও শহরাঞ্চলের নকশা ও পরিকাঠামো নির্মাণের প্রদর্শনী নিয়ে ১৯১৫ সালে তিনি কলিকাতায় আসেন। এই প্রদর্শনী দেখে এবং অধ্যাপকের সঙ্গে আলাপচারিতায় রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হন। ক্রমে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অধ্যাপকের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে গেডিস্ ফ্রান্সে "ইন্ডিয়ান কলেজ দ্য মঁপেলিয়ে" স্থাপন করেন। এই কলেজের সভাপতি হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। অধ্যাপক গেডিস্ জগদীশচন্দ্র বসুর জীবনীগ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর আরেকটি মহৎ প্রয়াস—১৯২১ সালে নিজের ছেলে আর্থার গেডিস্কে পাঠালেন শান্তিনিকেতনে। রবীন্দ্রনাথের আদর্শ ও ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ ও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন আর্থার গেডিস্। রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে তিনি শান্তিনিকেতনের জন্য বহু মূল্যবান মৌলিক কাজ করেছিলেন। তাঁর পি. এইচ. ডি. থিসিস এর বিষয় ছিল "বেঙ্গল স্টাডি"। পরবর্তীকালে আর্থার গেডিস্ স্বাধীন ভারতের দীর্ঘমেয়াদি বহু পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষে (১৯৬১), বিখ্যাত "ম্যানুয়াল অফ আর্কিটেকচার, স্ট্রাকচার অ্যান্ড টাউন প্ল্যানিং" পত্রিকায় ডঃ গেডিস্ একটি মূল্যবান প্রবন্ধ লেখেন, "টু ফ্রেন্ডস : রবীন্দ্রনাথ টেগোর অ্যান্ড প্যাট্রিক গেডিস্"। (রবীন্দ্রনাথ ও গৃহস্থাপত্য এবং পরিবেশ—অরুণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, দেশ, ২৬/৮/৯৫)

কলিকাতা পুরসভার জেনারেল কমিটি কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থার ও অধ্যাপক গেডিস্-এর প্রস্তুত করা বড়বাজার উন্নয়নের মানচিত্র দুটি পরীক্ষা করেন। কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থার প্রস্তাবে বড়বাজারের পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত ৬টি নতুন ও প্রশস্ত রাস্তা নির্মাণ করতে চাওয়া হয়েছিল—তার মধ্যে একটি রাস্তা হ্যারিসন রোড ও নিউ জগন্নাথঘাট স্ট্রিটের মধ্যে, ৪টি রাস্তা চিৎপুর রোড থেকে ক্লাইভ স্ট্রিটের মধ্যে এবং শেষেরটি দরমাহাটা স্ট্রিট পর্যন্ত।

অধ্যাপক গেডিসের পরিকল্পনায় পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত তিনটি প্রশস্ত রাস্তা নির্মাণের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল—প্রথমটি কটন স্ট্রিট ও হ্যারিসন রোডের মধ্যবর্তী অঞ্চল দিয়ে অগ্রসর হয়ে হনুমানজী লেন হয়ে চিৎপুর রোড পর্যন্ত প্রসারিত হবে। আরেকটি বাঁশতলা এবং বটতলা স্ট্রিটের সংযোগস্থল থেকে শুরু হয়ে দরমাহাটা স্ট্রিট হয়ে চিৎপুর রোডে এসে পড়বে। তৃতীয়টি হল শোভারাম বসাক স্ট্রিটকে প্রশস্ত করে চিৎপুর রোড পর্যন্ত প্রসারিত করা। এ ছাড়া কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থার প্রস্তাবমতো কটন স্ট্রিট, মীরবহর ঘাট স্ট্রিট, বটতলা স্ট্রিট এবং বসাক স্ট্রিট প্রশস্ত করার বিষয়ে অধ্যাপক গেডিস্ একমত হননি।

অতঃপর পুরসভার জেনারেল কমিটি উপরের দুটি প্রস্তাব বিবেচনা করার পর বড়বাজার উন্নয়ন সম্পর্কে কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থার কাছে কতকগুলি সুপারিশ করেন।[৪]

**বড়বাজার অঞ্চলের পূর্ব-পশ্চিমের রাস্তাগুলি সম্বন্ধে—**

১। কটন স্ট্রিটকে চিৎপুর রোড পর্যন্ত ৪০ ফুট চওড়া করতে হবে।
২। মীরবহর ঘাট স্ট্রিট ও বটতলা স্ট্রিটকে ৪০ ফুট চওড়া করতে হবে।
৩। বটতলা স্ট্রিট ও বাঁশতলা স্ট্রিটের মধ্যবর্তী অঞ্চলের মধ্য দিয়ে নতুন একটি রাস্তা দরমাহাটা স্ট্রিট থেকে শুরু হয়ে চিৎপুর রোড পর্যন্ত তৈরি করা হোক। অধ্যাপক গেডিস্ এই রাস্তাটি নির্মাণের প্রস্তাব করেছিলেন।
৪। বাঁশতলা স্ট্রিটকে কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থার প্রস্তাব অনুসারে পূর্ব-পশ্চিমে প্রশস্ত করার ব্যবস্থা করা হোক।
৫। বসাক স্ট্রিটকে পশ্চিম দিকে প্রসারিত করে দরমাহাটা স্ট্রিটের সঙ্গে এবং পূর্বদিকে চিৎপুর রোডের সঙ্গে সংযুক্ত করা হোক। এটি অধ্যাপক গেডিসের প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত ছিল।
৬। শোভারাম বসাক স্ট্রিটকে প্রশস্ত করে চিৎপুর রোড পর্যন্ত প্রসারিত করা হোক।
৭। কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থার সুপারিশ মতো কালাকার স্ট্রিট থেকে চিৎপুর রোড পর্যন্ত একটি নতুন রাস্তা তৈরি করা হোক। এটি নির্মাণের সময় যতদূর সম্ভব সিকদারপাড়া স্ট্রিটকে যেন ব্যবহার করা হয়।
৮। রতন সরকার গার্ডেন স্ট্রিট ও রাজা ব্রজেন্দ্রনারায়ণ রায় স্ট্রিটকে কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থার সুপারিশ অনুসারে চওড়া করার ব্যবস্থা হোক।

**বড়বাজারের উত্তর-দক্ষিণের রাস্তাগুলি সম্বন্ধে—**

১। দরমাহাটা স্ট্রিট ও ক্লাইভ স্ট্রিটকে বাঁশতলা স্ট্রিটের মুখ থেকে কটন স্ট্রিট পর্যন্ত প্রশস্ত করার ব্যবস্থা হোক। অধ্যাপক গেডিস্ এই প্রস্তাব করেছিলেন।
২। উত্তরে দরমাহাটা স্ট্রিটকে আরও চওড়া করার ব্যবস্থা হোক। এটিও অধ্যাপক গেডিস্-এর প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত ছিল।
৩। রামকুমার রক্ষিত লেন এবং দয়েহাটা স্ট্রিটকে ৪০ ফুট প্রশস্ত করার সুপারিশ।
৪। কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থার প্রস্তাব অনুসারে বসাক স্ট্রিটের যে অংশ উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত হয়ে বাঁশতলা স্ট্রিট পর্যন্ত এসেছে সেই অংশটুকু প্রশস্ত করা হোক।
৫। অধ্যাপক গেডিস্-এর প্রস্তাবে সুপারিশ করা হয়েছিল যে নতুন জগন্নাথঘাট স্ট্রিট থেকে যে রাস্তা শোভারাম বসাক স্ট্রিট পর্যন্ত প্রসারিত সেটিকে দক্ষিণে বসাক স্ট্রিট পর্যন্ত প্রসারিত করা হোক। কলিকাতা পুরসভার জেনারেল কমিটি এই সুপারিশ সমর্থন করেছিলেন।
৬। ময়রাহাটা স্ট্রিট ও ময়দাপট্টি স্ট্রিটকে চওড়া করা হোক। অধ্যাপক গেডিস্-এর প্রস্তাবে এই সুপারিশ ছিল।
৭। চিৎপুর রোডের পশ্চিম দিকে ৬০ ফুট প্রশস্ত নতুন একটি রাস্তা জগন্নাথ ঘাট রোড ও

হ্যারিসন রোডের মধ্যে নির্মাণ করা হোক। এটি কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থার সুপারিশে ছিল।

বড়বাজার উন্নয়ন পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য কলিকাতা পুরসভা যে সব সুপারিশ করেছিলেন তার অধিকাংশই রূপায়িত হয়নি। এর প্রধান কারণ, জমি গ্রহণের নানাবিধ বাধা ও অর্থের অপ্রতুলতা। এ সত্ত্বেও বড়বাজারের ময়দাপট্টি এলাকায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি করা হয়েছিল। এখানে ৪৫ ফুট চওড়া একটি রাস্তা করা হয়। পূর্বে এখানে ময়রাহাটা স্ট্রিট ও ময়দাপট্টি লেন ছিল। রাস্তা দুটি দক্ষিণ থেকে উত্তরে প্রসারিত ছিল—হ্যারিসন রোড থেকে বাঁশতলা স্ট্রিট পর্যন্ত ছিল ময়রাহাটা স্ট্রিট, আর ময়দাপট্টি লেন বাঁশতলা স্ট্রিট থেকে উত্তরে এগিয়ে দরমাহাটা স্ট্রিটে এসে পড়েছিল। রাস্তাটির সংস্কার হবার পর কলিকাতা পুরসভা ১৭ মার্চ ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের অধিবেশনে 'নলিনী শেঠ রোড' নামে নামাঙ্কিত করেন। কলিকাতা হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠিত আইনজীবী, কলিকাতা পুরসভার কমিশনার, কলিকাতার বিখ্যাত শেঠ-বসাক পরিবারের সন্তান নলিনীনাথ শেঠ (১৮৭৭-১৯২৮) কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে হিন্দু স্কুল, পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে স্নাতক উপাধি লাভ করার পর তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে সলিসিটার হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। অল্প কয়েক বছরের মধ্যে আইনজীবী রূপে প্রতিষ্ঠা ও সম্মান অর্জন করেন। তিনি দীর্ঘ দিন কলিকাতা পুরসভায় পুরপ্রতিনিধি ছিলেন (১৯১২-১৯২৭)। একসময় তিনি কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থায় পুরপ্রতিনিধি মনোনীত হয়েছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সময় তিনি কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। পরবর্তীকালে দেশবন্ধু স্বরাজ্য দল গঠন করলে তিনি ওই দলে যোগদান করেন। এ ছাড়া পল্লীর বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে সরকার তাঁকে রায়বাহাদুর খেতাব দান করেন। মাত্র ৫২ বছর বয়সে তিনি পরলোকগমন করেন। ৩নং বাঁশতলা স্ট্রিটে (অধুনা স্যার হরিরাম গোয়েঙ্কা স্ট্রিট) তাঁর প্রাসাদোপম বাসভবন আছে।

কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা নলিনী শেঠ রোড ছাড়াও কালাকার স্ট্রিট ও বড়বাজারের অন্তর্গত হাওড়া ব্রিজ এলাকার উন্নয়ন ও রাজপথ প্রশস্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। এইসব প্রকল্পের সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হল—

| প্রকল্পসূচক সংখ্যা (Scheme No.) | প্রকল্পের নাম | জমি অধিগ্রহণের পরিমাণ (একর) | জমির মূল্য (টাঃ) | কাজের সূচনা/সমাপ্তি |
|---|---|---|---|---|
| XXVII | বড়বাজার ময়দাপট্টি অঞ্চল | ৪·১৮ | ১৯,০০,০০০ | ২২.৯.১৯২৭<br>১৯৩৪ |
| XXXII | বাঁশতলা স্ট্রিটের একাংশের প্রশস্তকরণ | ০·২৪ | ১৮,০০০ | ১২.১.১৯২৯<br>১৯৩৪ |
| XLII | কালাকার স্ট্রিট প্রশস্তকরণ | ৭·৮৭ | ৪২,৫০,০০০ | ২২.১১.১৯৩৪<br>১৯৪০ |
| XLIII | দরমাহাটা স্ট্রিট (আংশিক) | ০·৮৩ | ২,০০,০০০ | ৩.৯.১৯৩৪<br>১৯৩৯ |

বড়বাজার ময়দাপট্টি প্রকল্পটি সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। এবার বাঁশতলা স্ট্রিটের কথা। এক সময় এ অঞ্চলে প্রচুর বাঁশ জন্মাত, তাই অঞ্চলটির নাম হয় বাঁশতলা। কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা এই রাস্তাটিকে দরমাহাটা স্ট্রিট থেকে দয়েহাটা স্ট্রিট পর্যন্ত ৪০ ফুট চওড়া করেছিলেন। দরমাহাটা স্ট্রিট থেকে নলিনী শেঠ রোড পর্যন্ত রাস্তাটির অংশবিশেষ যান চলাচলের জন্য প্রশস্ত রাখা হয় ২৪ ফুট এবং রাস্তার দু'ধারে ৮ ফুট করে ১৬ ফুট ফুটপাতের ব্যবস্থা আছে। আর নলিনী শেঠ

রোড থেকে দয়েহাটা স্ট্রিট পর্যন্ত রাস্তাটিকে বাড়িয়ে চওড়া করা হয় ২৮ ফুট এবং উত্তর দিকের ফুটপাতের দৈর্ঘ্য হ্রাস করে ৪ ফুট করা হয়। রাস্তাটির মোট দৈর্ঘ্য ৮৫০ ফুট। সে সময় এই রাস্তাটির ধারে ৪৩টি বাড়ি ছিল। এই রাস্তাটি পুরসভা ১১ জুলাই ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে অধিগ্রহণ করেন। এরপর কলিকাতা পুরসভা ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে বাঁশতলা স্ট্রিটের নাম পরিবর্তন করে 'স্যার হরিরাম গোয়েঙ্কা স্ট্রিট' নামাঙ্কন করেন।

হরিরাম গোয়েঙ্কা (১৮৬৩-১৯৩৫) জয়পুর রাজ্যের অধিবাসী। হরিরাম বাল্য বয়সে ব্যবসায়ী পিতা রামচন্দ্র গোয়েঙ্কার সঙ্গে কলিকাতায় আসেন। পরবর্তীকালে রামচন্দ্র ব্যবসা থেকে অবসর গ্রহণ করলে তিনি পিতার প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার হন।

যৌবনকাল থেকেই তিনি কলিকাতার সমাজজীবনে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়ে পড়েন। সে-সময় তিনি বড়বাজারের অবিসংবাদী নেতা ছিলেন। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে ওই এলাকা থেকে পৌরপ্রতিনিধি নির্বাচিত হন এবং ৩৪ বছর ধরে অর্থাৎ ১৯২৪ খ্রিঃ পর্যন্ত ওই এলাকার পৌরপ্রতিনিধি ছিলেন। পরবর্তীকালে মাড়োয়ারি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি, কলিকাতা বন্দরের কমিশনার, বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্সের সহ-সভাপতি, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি, কলিকাতার শেরিফের পদ অলংকৃত করেছিলেন।

দানেও হরিরাম অকৃপণ ছিলেন। তাঁর আমহার্স্ট স্ট্রিটের (রাজা রামমোহন সরণি) মাড়োয়ারি হাসপাতালে ১$\frac{১}{২}$ লক্ষ টাকা, সংস্কৃত শিক্ষা প্রসারে মাড়োয়ারি বিদ্যালয়কে ১$\frac{১}{২}$ লক্ষ টাকা এবং কলিকাতা পিঁজরাপোল সোসাইটিকে ১ লক্ষ টাকা দানে প্রতিষ্ঠানগুলি সমৃদ্ধ হয়েছিল। এ ছাড়া তিনি হাওড়া ব্রিজের কাছে মহিলাদের জন্য স্নানঘর, কালীঘাটে তীর্থযাত্রীদের জন্য ধর্মশালা এবং কালীঘাটের সন্নিকটে পিতার নামে দাতব্য হাসপাতাল নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। সে সময়ের ব্রিটিশ সরকার তাঁকে 'রায় বাহাদুর' ও 'স্যার' খেতাবে ভূষিত করেন।

বাঁশতলা প্রকল্পের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা 'বসাক স্ট্রিট'। কলিকাতার আদি বাসিন্দা শেঠ বসাকদের বাসভবন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এই রাজপথ ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায়। রাস্তাটির বসাক স্ট্রিট নামকরণ এইভাবে সার্থক হয়ে উঠেছে। কলিকাতার ইতিহাসে শেঠ-বসাক পরিবারের বিশেষ সংশ্রব থাকায় এঁদের অবদান সম্যকরূপে অবগত হওয়া দরকার। বসাকদের আদি উপাধি ছিল 'বসুক'। মদনমোহন হালদার তাঁর "বসুক" গ্রন্থে লিখেছেন যে "বসুক" বসাকদের প্রকৃত উপাধি। এই বসুকরা বৈশ্য শ্রেণীভুক্ত। বসুক থেকে বসক, বসক শব্দের অর্থ ধনসম্পত্তি ; এর ভাবার্থ হল কর ও রাজস্ব যা কিনা বৈশ্যের বর্ণগত বৃত্তি। পরবর্তীকালে বসক শব্দ বসাক-এ রূপান্তরিত হয়। বসাকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠী বা শেঠ নামে এক সম্প্রদায় আছে।

বসাকদের আদি বাসস্থান ছিল সপ্তগ্রামে। এর পতনের পর শেঠ ও বসাকগণ বেতোড়ে এসে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করেন। যাদবেন্দ্র বসাক ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে সপ্তগ্রাম ছেড়ে কলিকাতার নিকটে গোবিন্দপুরে বাস করতে আসেন। সেই সময় মুকুন্দরাম শেঠও গোবিন্দপুরে আসেন। সঙ্গে নিয়ে আসেন তাঁর গৃহদেবতা গোবিন্দজীকে। জনপ্রবাদ এই যে শেঠেদের প্রতিষ্ঠিত গোবিন্দজীর নাম থেকে গোবিন্দপুর গ্রামের নামকরণ হয়েছে। গোবিন্দপুরে বসবাস করলেও শেঠ ও বসাকেরা সুতানুটির হাট স্থাপন করেন। উইলসন সাহেব (Wilson) এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, "The foreign market attracted native traders and merchants to the spot and in particular from families of Bysacks and one of Setts, leaving the then rapidly declining city of Satgong came and founded the settlement of Govindapur and established Suttanuti market on the north side of Calcutta."

বেতোড়ের হাটের পতনের সঙ্গে সঙ্গে সুতানুটির হাট জমজমাট হয়ে ওঠে। এই শেঠ-বসাকরাই কলিকাতার জঙ্গল কেটে বসত বানিয়েছেন। এঁদের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রভাব প্রতিপত্তিতে ধীরে ধীরে বিদেশি বণিকেরা ব্যবসাসূত্রে এখানে জমায়েত হন। শেঠ-বসাকরা পর্তুগিজ, ওলন্দাজ, ফরাসি প্রভৃতি বিদেশি বণিকদের সঙ্গে ব্যবসা করতেন। তবে ইংরেজদের সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠতা বেশি ছিল। পরবর্তীকালে এই ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্র ধরে কলিকাতায় ইংরেজদের প্রতাপ প্রতিপত্তি বৃদ্ধি,

পরে বঙ্গদেশ বিজয় ও কলিকাতার পত্তন প্রভৃতি ঘটনাবহুল ইতিহাসের কথা তো সকলেরই জানা। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের পর (অর্থাৎ পলাশী যুদ্ধের পর) গোবিন্দপুরে নতুন ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নির্মাণের জন্য গোবিন্দপুর থেকে জনবসতি উঠিয়ে দিলে সেখানকার শেঠ-বসাক পরিবার কলিকাতার বড়বাজারে গৃহনির্মাণ করে বসবাস শুরু করেন। কলিকাতার ইতিহাসে শেঠ-বসাকদের অবদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

বড়বাজারে শেঠ-বসাক পরিবারের সম্ভ্রান্ত পুরুষদের নামে কয়েকটি রাস্তা আছে। তার মধ্যে শোভারাম বসাক স্ট্রিট প্রাচীন ও গুরুত্বপূর্ণ একটি রাস্তা। এই রাস্তাটি সম্বন্ধে কিছু বলার আগে শোভারাম বসাক সম্বন্ধে দু'চার কথা বলা দরকার।

শোভারাম বসাক অগ্নিঋষি গোত্রীয় বসাক বংশের সন্তান। জাতিতে তিনি তন্তুবায়, পিতা গঙ্গানারায়ণ। ১৬৯০ খ্রিঃ মুর্শিদাবাদে জন্ম। সে সময় মুর্শিদাবাদের নাম ছিল মকসুদাবাদ। শোভারাম বসাক সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্য খুব কমই পাওয়া যায়। এইটুকু জানা যায় যে পিতার সঙ্গে মুর্শিদাবাদ ছেড়ে সপ্তগ্রামের হলদিপুরে এসে তাঁরা বসবাস শুরু করেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে সুতো ও কাপড়ের ব্যবসা করে কোটিপতি হন। পরে সপরিবারে হলদিপুর থেকে উঠে এসে গোবিন্দপুরে শেঠেদের কাছাকাছি বাস করেন। গোবিন্দপুরে তিনি জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। গোবিন্দপুরে দুর্গ নির্মাণের সময় তিনি জগন্নাথদেব ও পরিবারবর্গকে নিয়ে সেখান থেকে উঠে এসে বড়বাজারে আসেন।

বড়বাজারে শোভারাম তাঁর নিজের বাসভবনের পশ্চিমে গঙ্গার তীরে মন্দির নির্মাণ করে জগন্নাথদেবকে সেখানে স্থাপন করেন। নবাব লেন ও মহর্ষি দেবেন্দ্র রোডের ঠিক সংযোগস্থলে জগন্নাথ মন্দির, যার ঠিকানা ১নং নবাব লেন। দু'দিকেই এ মন্দিরের প্রবেশপথ থাকলেও প্রধান ফটক হল নবাব লেনে। কলিকাতা স্ট্র্যান্ডরোডের পুরানো টাঁকশাল (৪৭নং স্ট্র্যান্ড রোড)-এর উত্তরে নবাব লেন। রাস্তাটি স্ট্র্যান্ড রোড ও মহর্ষি দেবেন্দ্র রোডকে সংযুক্ত করেছে।

পলাশী যুদ্ধের পর মীরজাফর খাঁন ইংরেজের সহযোগিতায় বাংলার মসনদে ১৭৫৭ থেকে ১৭৬০ এবং ১৭৬৩ থেকে ১৭৬৫ খ্রিঃ পর্যন্ত উপবিষ্ট ছিলেন। কয়েক মাসের জন্য তিনি কলিকাতায় বসবাস করেছিলেন—সময় ৩ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ ডিসেম্বর ১৭৬৪ খ্রিঃ পর্যন্ত। কলিকাতায় ছিলেন তিনি মিন্টের নিকটবর্তী এক ভবনে। মুর্শিদাবাদের নবাবদের ওই অঞ্চলে অনেক জমিজমা ছিল। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে যখন ওই রাস্তাটি তৈরি হয়, তৎকালীন মুর্শিদাবাদের নবাব রাস্তা নির্মাণের সমস্ত জমি দান করেছিলেন। সম্ভবত এইসব কারণেই রাস্তাটির নাম হয় 'নবাব লেন'।[৫]

নবাব লেনের এই জগন্নাথ মন্দির প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে নানান কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। প্রাণকৃষ্ণ দত্ত তাঁর 'কলিকাতার ইতিবৃত্ত' পুস্তকে বড়বাজারের জগন্নাথ মন্দির নির্মাণ পাইকপাড়ার রাজবাড়ির লালাবাবু অর্থাৎ কৃষ্ণচন্দ্র সিংহের কীর্তি বলে অনুমান করেন।

নগেন্দ্রনাথ শেঠ প্রণীত "কলিকাতাস্থ তন্তুবণিক জাতির ইতিহাস" পুস্তকে শোভারাম বসাককে এই জগন্নাথ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়েছে, যে কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। শোভারাম বসাক ওই মন্দিরের ধারে জগন্নাথদেবের নামে একটি স্নানঘাট নির্মাণ করে দেন, যা পরে জগন্নাথঘাট নামে খ্যাত হয়। পরবর্তীকালে ভাগীরথী নদী আরও পশ্চিমে সরে যাওয়ায় সেই ঘাটটির বিলুপ্তি ঘটে। শোভারাম আড়ম্বরের সঙ্গে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসব পালন করতেন। রথযাত্রা উপলক্ষে বহুদূর থেকে গ্রামবাসীরা এসে মেলায় যোগ দিতেন। সারা বছর ওই রথখানি বৈঠকখানায় বটগাছের তলায় থাকত। রথটির উচ্চতা ছিল ৭০ ফুট। রথযাত্রার সময় রথখানি রথতলা ঘাটে অবস্থান করত বলে ঘাটটি ওই নামে নামাঙ্কিত হয়। পূর্বে ওই ঘাটের নাম ছিল সুতানুটি ঘাট। শুধু মন্দির প্রতিষ্ঠা নয়, মন্দিরের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য শোভারাম ৭ কাঠা জমি দেবোত্তর করে দেন এবং মন্দির সংলগ্ন আরও ৫ কাঠা জমি মুর্শিদাবাদের নবাবের কাছ থেকে দান হিসাবে পাওয়া যায়।

অন্যদিকে ১৮৯৫ খ্রিঃ পূর্ত বিভাগ 'Ancient Monuments in Bengal' নামে একটি পুস্তক প্রকাশ করেন। ওই পুস্তকে সে-সময়ের এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারিক পণ্ডিত হরিমোহন বিদ্যাভূষণের প্রবন্ধ থেকে জানা যায় যে প্রায় দেড়শো বছর আগে কলিকাতার শোভারাম বসাক

স্ট্রিটের বাবু শোভারাম বসাক এই জগন্নাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি যে এই জগন্নাথ মন্দির স্থাপন করেছেন সে সম্বন্ধে তাই আর কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই। পণ্ডিত হরিমোহনের তথ্য অনুসারে জগন্নাথ মন্দিরের নির্মাণকাল আঠারো শতকের মাঝামাঝি ধরা যেতে পারে। বর্তমানে এ মন্দির সেবায়েতগণের কুক্ষিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে।

প্রাচীন জগন্নাথ মন্দিরের পুরানো চেহারা হারিয়ে গেছে। সাবেক মন্দির কোন্ রীতিতে তৈরি হয়েছিল তা আজ জানার কোনও উপায় নেই। পূর্বের মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে মন্দির নতুন করে নির্মিত হয়েছে চুনারের লাল পাথর দিয়ে। মন্দিরের স্থাপত্যরীতিতে উত্তর ভারতের ছাপ আছে। মন্দিরের চারিদিকে অসংখ্য ঘরবাড়ি হওয়ায় মন্দিরের বহিরঙ্গের সৌন্দর্য অনেকখানি ব্যাহত হয়েছে।

আবার ফিরে আসি শোভারামের কথায়। কাশীপুরে তাঁর একটি উদ্যান ছিল। সেখানে তিনি গোপাললাল জীউ-এর বিগ্রহ স্থাপন করেন। শোভারামের শ্যামচাঁদ জীউ-এর নামে শ্যামবাজার হয়। হলওয়েল সাহেব শ্যামবাজারের নাম পরিবর্তন করে চার্লস বাজার রাখেন। পরে শোভারামের অনুরোধে তাঁর আত্মীয় শ্যামচাঁদ বসাকের নামে শ্যামবাজার ও শ্যামপুকুর নামকরণ হয়।[৬]

বর্তমানে যে জায়গায় শোভাবাজার রাজবাড়ি অবস্থিত সে স্থানে শোভারামের উদ্যান ছিল। সেখানে নানাপ্রকার শাকসবজি উৎপন্ন হত। পরে ওই বাগান বাজারে রূপান্তরিত হয় এবং শোভারামের নামানুসারে শোভাবাজার নামে খ্যাত হয়। কালক্রমে সমগ্র স্থানের নাম হয় শোভাবাজার। বস্ত্রাদির একদর রাখার জন্য সুতানুটি বাজার ও শোভাবাজারের ব্যবসা-বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণের ভার শোভারামের হাতে ছিল।

১১৭৪ বঙ্গাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ২৪ পরগনা ও ডিহি ৫৫ গ্রাম বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকার খাজনায় বন্দোবস্ত করার আগ্রহ প্রকাশ করেন ! শোভারাম প্রমুখ শেঠ-বসাকগণ ১০ লক্ষ টাকা জমা দিতে স্বীকৃত হন। কোম্পানি ১২ লক্ষ টাকা না পাওয়ায় নিজ তত্ত্বাবধানে রেখে কালেক্টর নিযুক্ত করেন।

১৭৫৬ খ্রিঃ নবাব সিরাজদৌল্লার কলিকাতা আক্রমণের সময় অনেক বাঙালির ঘরবাড়ি নষ্ট হয়। অনেক ইংরেজ বাসিন্দাদেরও সম্পত্তি বিনষ্ট হয়। পলাশী যুদ্ধের পর মীরজাফর নবাব হয়ে কলিকাতার প্রজাদের ক্ষতিপূরণের জন্য ২০ লক্ষ টাকা দেবার ব্যবস্থা করেন। ওই অর্থ বিতরণের জন্য যে ১৩ জন কমিশনার নিযুক্ত হন, শোভারাম ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তিনি নিজের অংশে ৪ লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হন।

রামকৃষ্ণ শেঠ এবং সেকালের শহর কলিকাতার আরও অনেক এদেশি বাসিন্দারা সরকারের কাছে হিন্দু কমিশনারদের পক্ষপাতের বিরুদ্ধে নালিশ করেন। ৩রা জুলাই ১৭৫৮ খ্রিঃ কোম্পানির বোর্ড রাইডার, জনস্টন ও সিনিয়র নামে তিন সাহেবকে অভিযোগের সত্যাসত্য অনুসন্ধানের ভার অর্পণ করেন। তাঁরা তাঁদের প্রতিবেদনে হিন্দু কমিশনারদের পক্ষপাতের বিষয়টি সমর্থন করেন এবং শোভারাম বসাক সম্বন্ধে বলেন যে তিনি কোনও হিসাব দাখিল না করেই বহু অর্থ আত্মসাৎ করেছেন।

শোভারাম বসাক ১৭৭৩ খ্রিঃ মারা যান। তাঁর বসতবাড়ির সামনের রাস্তাটি তাঁর নামানুসারে শোভারাম বসাক স্ট্রিট নামে খ্যাত। P.W. Simms ১৮৫২ খ্রিঃ কলিকাতার যে মানচিত্র (The City and Environs of Calcutta, 1852-56) প্রকাশ করেন তাতেই প্রথম রাস্তাটির হদিশ পাওয়া যায়। সে সময় রাস্তাটি শোভারাম বসাক লেন নামে নামাঙ্কিত ছিল। পরবর্তীকালে রাস্তাটি লেন থেকে স্ট্রিটের পর্যায়ে উন্নীত হয়। শোভারাম বসাকের নামে মেডিকেল কলেজের কাছে আর দুটি রাস্তা ছিল—শোভারাম বসাক লেন ও শোভারাম বসাক ফার্স্ট লেন। প্রথমটি কলিকাতা পুরসভা ১৯২৮ সালে রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের পুত্র কুমার দেবেন্দ্র মল্লিকের নামে নামকরণ করেন। আর দ্বিতীয় রাস্তাটি দানবীর সাগরলাল দত্ত (১৮২১-১৮৮৬)-এর নামে 'সাগর দত্ত লেন' নামাঙ্কিত করেন। সাগরলাল চুঁচুড়াতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মোহনচাঁদ দত্ত। ১৬/১৭ বছর বয়সে শিক্ষা শেষ করে পিতার ব্যবসায়ে প্রবেশ করেন। পরে পিতার ব্যবসা ছেড়ে কারলাইন নেফিউ কোম্পানির অফিসে মুৎসুদ্দির কাজ করেন। এরপর তিনি নীলের ব্যবসা শুরু করেন। পরে বড় ভাইয়ের সঙ্গে পাটের

ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। এই ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। সে সময় তাঁর পাটের কারবার সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল। পোশাক পরিচ্ছদে শৌখিন হলেও তিনি কখনও সাহেবি পোশাক পরতেন না। স্বগ্রামে ঠাকুরবাড়ি, অতিথিশালা ও উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। কামারহাটিতে একটি হাসপাতাল নির্মাণ করে দেন, সেটি তাঁর নামেই নামাঙ্কিত হয়। এই সব প্রতিষ্ঠানের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মৃত্যুকালে ১৩ লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তি দান করে যান।[৭]

বসাক স্ট্রিট বড়বাজারের একটি পুরানো রাস্তা। খুবই সঙ্কীর্ণ। তখন এটিকে বসাক লেন বলা হত। ১৮৯২ খ্রিঃ রাস্তাটি সংস্কার ও প্রশস্ত করা হয়। কলিকাতা পুরসভা তাঁদের ৩১শে মার্চ ১৮৯২ সালের অধিবেশনে রাস্তাটিকে 'লেন' থেকে 'স্ট্রিট'-এ উন্নীত করেন। নাম হয় 'বসাক স্ট্রিট'। এরপর কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা বড়বাজার উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করার সময় বসাক স্ট্রিটের সংস্কারে তৎপর হন। উন্নয়ন সংস্থা বসাক স্ট্রিটের কিছু অংশ ৪০ ফুট চওড়া আর বাকি অংশ ৩০ ফুট চওড়া করার ব্যবস্থা করেন। এ ছাড়া দরমাহাটা স্ট্রিট (এখন মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড), নলিনী শেঠ রোড ও বসাক স্ট্রিটের সংযোগস্থলে শিশুদের খেলাধূলার জন্য ছোট একটি উদ্যান নির্মাণ করা হয়। বসাক স্ট্রিট ও শিশু উদ্যান পুরসভা ১১ই জুলাই ১৯৩৪ খ্রিঃ কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থার কাছ থেকে গ্রহণ করেন। বড়বাজারে 'বসাক লেন' নামে আরেকটি পথ আছে।

চৈতন্য শেঠ স্ট্রিট বড়বাজারের প্রাচীন পথ। যাদবিন্দু শেঠের প্রপৌত্র চৈতন্যচরণ শেঠের নামে রাস্তাটি নামাঙ্কিত হয়েছে। পথটি দয়েহাটা স্ট্রিট (এখন দিগম্বর জৈন টেম্পল রোড) থেকে আরম্ভ হয়ে পূর্ব দিকে জগমোহন মল্লিক লেনে এসে মিশেছে।

গোবিন্দপুরে দুর্গ নির্মাণের সময় যাদবিন্দু শেঠ, বৈষ্ণবদাস শেঠ, শোভারাম বসাক, বৃন্দাবন বসাক ও কৃষ্ণচন্দ্র বসাক কলিকাতায় এসে বড়বাজার অঞ্চলে বসবাস আরম্ভ করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যাদবিন্দু শেঠ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বেনিয়ান ছিলেন। বৃন্দাবন বসাকের সঙ্গে রপ্তানি বাণিজ্যের কারবার করে প্রচুর অর্থশালী হন এবং শেঠ-বসাক সমাজের মুখপাত্র রূপে পরিচিত হন। শোনা যায়, যাদবিন্দু যখন গোবিন্দপুরে বাস করতেন সে সময় বর্গির হাঙ্গামায় ভীত সন্ত্রস্ত ব্রাহ্মণগণ রাধাকান্ত জীউয়ের এক বিগ্রহ নিয়ে যাদবিন্দুর আশ্রয় নেন। যাদবিন্দু গোবিন্দপুর ত্যাগ করার সময় রাধাকান্ত জীউয়ের বিগ্রহ নিয়ে বড়বাজারে আসেন। পরে ৫ নং বাঁশতলা স্ট্রিটে (এখন স্যার হরিরাম গোয়েঙ্কা স্ট্রিট) ঠাকুরবাড়ি নির্মাণ করে এখানে রাধাকান্ত জীউকে প্রতিষ্ঠা করেন।

যাদবিন্দুর প্রথম পুত্র রামকৃষ্ণ শেঠ। এখন যেখানে মেটকাফ হল অবস্থিত সেখানে তাঁর বাসভবন ছিল। তিনিও পিতার মতো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বেনিয়ান ছিলেন। মুর্শিদাবাদ থেকে বস্ত্রাদি আমদানি করে ইংরেজদের সরবরাহ করতেন। সেকালের কলিকাতায় তিনি একজন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন।

চৈতন্যচরণ রামকৃষ্ণের দ্বিতীয় পুত্র। তিনি ছিলেন ধার্মিক ও দানশীল। সেকালের সমাজে তিনি একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন। রাজা নবকৃষ্ণ ও কলিকাতার নাগরিকবৃন্দ চৈতন্যচরণের দানশীলতা ও অন্যান্য গুণের জন্য তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর নামে নামাঙ্কিত রাস্তার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

রামকৃষ্ণের কনিষ্ঠ পুত্র বৃন্দাবনচন্দ্র শেঠ। তিনিও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বেনিয়ান ছিলেন এবং প্রচুর অর্থের অধিকারী ছিলেন। তাঁর উত্তরপুরুষ কানাইলাল শেঠ। কানাইলালের নামে বড়বাজারে 'কানাইলাল স্ট্রিট' নামে একটি রাস্তা আছে। রাস্তাটি চৈতন্য শেঠ স্ট্রিট থেকে শুরু হয়ে সোজা দক্ষিণে এগিয়ে বটতলা স্ট্রিটে এসে পড়েছে।

কানাইলাল শেঠ স্ট্রিটের পশ্চিম দিকে ঠিক সমান্তরালে দয়েহাটা স্ট্রিট অবস্থিত। সেকালের বড়বাজারে এক এক অঞ্চলে নির্দিষ্ট সব দ্রব্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা ছিল, যা আজও চালু আছে। ওই সব দ্রব্যের নাম থেকে অঞ্চলটি সাধারণের কাছে পরিচিতি লাভ করত। এইভাবে বড়বাজারে চিহ্নিত হয়েছিল সিন্দূরপট্টি, ময়দাপট্টি, রুইহাটা, দয়েহাটা, দরমাহাটা প্রভৃতি অঞ্চল। যে রাস্তার ধারে এই

সব সামগ্রীর সারি সারি দোকান থাকত, সেই রাস্তাগুলিও ওই সামগ্রীর নামে নামাঙ্কিত হত। তাই সিন্দূরপট্টিতে সারি সারি সিঁদুরের দোকান, ময়দাপট্টিতে ময়দার, রুইহাটায় সুতো ও তুলোর দোকান, দয়েহাটায় ছিল দইয়ের দোকান। পরবর্তীকালে শহর কলিকাতায় নগরায়ণের চাপে ওই সব রাস্তার কিছু কিছু বিলুপ্তি ঘটে, আবার কয়েকটি তার প্রাচীন নাম হারিয়ে নতুন নামে চিহ্নিত হয়েছে। বড়বাজারে এমনি এক রাস্তা হল দয়েহাটা স্ট্রিট। রাস্তাটির প্রথম অস্তিত্ব ধরা পড়ে শক সাহেবের (I. P. Schalch) লটারি কমিটির প্রয়োজনে প্রস্তুত কলিকাতার মানচিত্রে (Plan of the City of Calcutta and its Environs, 1825-32)। সে সময় রাস্তাটি ছিল দয়েহাটা লেন। পরবর্তীকালে এটি স্ট্রিটের পর্যায়ে উন্নীত হয়।

বড়বাজারের দয়েহাটা স্ট্রিটের সঙ্গে জড়িয়ে আছে প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বাল্যকালের এক ইতিবৃত্ত, উত্তরকালে যার গভীর প্রভাব পড়েছিল তাঁর জীবনে। সে কাহিনী যেমনি অভিনব তেমনি আকর্ষণীয়।

১৮২৮ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ঈশ্বরচন্দ্র পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কলিকাতা এসে পৌঁছালেন। আশ্রয় নিলেন বড়বাজারের দয়েহাটায় ভাগবতচরণ সিংহের গৃহে। দয়েহাটা বড়বাজারের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। ঈশ্বরচন্দ্র যখন বড়বাজারে এলেন সে সময় বড়বাজারের অবস্থার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক। তখন মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীদের গদিতে বড়বাজারের ব্যবসাকেন্দ্র ছেয়ে যায়নি। বড়বাজার ছিল তখন বাঙালিরই (কবি, অভিনেতা ও নাট্যকার অমৃতলাল বসু তাঁর স্মৃতিকথায় বড়বাজারে একচ্ছত্র বাঙালি ব্যবসায়ীদের এক সুন্দর চিত্র উপহার দিয়েছেন)। কলিকাতার আদি বাঙালি ব্যবসায়ী শেঠ, বসাক, মল্লিক, শীল, বড়াল প্রমুখ পরিবারবর্গের এ অঞ্চলে আধিপত্য ছিল অব্যাহত। এইসব পরিবার বড়বাজারের ব্যবসাকেন্দ্র নিয়ন্ত্রণ করতেন। এঁদের বিশাল চৌহদ্দি ঘেরা তিন চার মহলযুক্ত ভবন বড়বাজাবে ছিল। তাতে ছিল পূজামণ্ডপ, দালান, বাগান, পুকুর সবই। গঙ্গাতীরের ঘাট পর্যন্ত তাঁদের নিজেদের তৈরি পথ ও স্নানের ঘাটও ছিল। তখন বড়বাজারে বাঁশবন ও বাঁশঝাড় ছিল অনেক। আর ছিল অলিগলি, পায়ে হাঁটা সব মেঠো পথ। পরবর্তীকালে শেঠ-বসাক-মল্লিকদের হাত থেকে বড়বাজার কীভাবে অবাঙালিদের কুক্ষিগত হল, সে আরেক কাহিনী।

ফিরে আসি ঈশ্বরচন্দ্রের কলিকাতাবাসের কথায়। ভাগবতচরণ সিংহ তখন জীবিত ছিলেন না। পুত্র জগদ্দুর্লভ সিংহ, বয়স মাত্র পঁচিশ। তিনি তখন বাড়ির কর্তা। তাঁর পরিবারে সে সময় ছিলেন তাঁর স্ত্রী, জ্যেষ্ঠা ভগিনী, তাঁর স্বামী ও দুই পুত্র, এক বিধবা কনিষ্ঠা ভগিনী ও তাঁর এক পুত্র। ঠাকুরদাসকে জগদ্দুর্লভ খুড়োমশায় বলতেন। ঈশ্বরচন্দ্র তাই জগদ্দুর্লভকে দাদা বলতেন। তাঁর বড় বোন ও ছোট বোনকে বড়দিদি ও ছোটদিদি বলে ডাকতেন। রাইমণি ছিলেন তাঁর ছোটদিদি।

দয়েহাটার এই অপরিচিত পরিবেশে এসে বালক ঈশ্বরচন্দ্র প্রথমে নিজেকে খুব অসহায় মনে করতেন। কিন্তু সিংহ পরিবারের আদর যত্নে মা ঠাকুমা ও খেলার সাথীদের বিচ্ছেদ বেদনা ক্রমে ভুলে যেতে লাগলেন। সবার ওপরে ছোটদিদি রাইমণি মায়ের রূপ ধরে তাঁর কাছে এসে দাঁড়ালেন। রাইমণির একমাত্র পুত্র গোপাল, ঈশ্বরচন্দ্রের সমবয়সী। ছোটদিদি রাইমণি কোনও ব্যাপারে গোপালের সঙ্গে ঈশ্বরের কোনও তফাত করতেন না। মা ঠাকুমার স্নেহের অভাব রাইমণি একাই পূর্ণ করে দিলেন। সিংহ পরিবারের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র খুঁজে পেলেন বীরসিংহ গ্রামের নিজ পরিবেশ।

দয়েহাটার এই বাড়িটি বিদ্যাসাগরের জীবনে এক অসামান্য প্রভাব ফেলেছিল। সমাজবিজ্ঞানী বিনয় ঘোষ এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, "... দয়েহাটা নামটি যদি কোন ব্যবসায়ী বা রাজনৈতিক নেতার স্মৃতি রক্ষার্থে লুপ্ত হয়ে না যায়, তাহলে ঐতিহাসিক স্মৃতি সচেতন বাঙালী মাত্রই বড়বাজারের এই পথটিতে ঢুকলে অবশ্যই রোমাঞ্চ বোধ করবেন। দয়েহাটারই এক গৃহের কোণে প্রদীপ জ্বেলে রাত্রে বালক ঈশ্বরচন্দ্র লেখাপড়া করতেন। দয়েহাটা থেকেই হেঁটে গোলদিঘির সংস্কৃত কলেজে তিনি যাতায়াত করতেন। দয়েহাটারই এক গৃহকোণ থেকে রাইমণির স্নেহ মধুর কণ্ঠের 'ঈশ্বর' ডাক শোনা যেত। দেনা পাওনার দৈনন্দিন হৃদয়হীন নির্দয়তার মধ্যে বড়বাজারের এই দয়েহাটা অঞ্চলেই, দয়া

মায়া মমতা ও মাতৃস্নেহের নির্ঝরিণী রাইমণি বাস করতেন। ভগবতী দেবীর স্নেহাশ্রয় থেকে দূরে থেকেও ভাগবতচরণের বিধবা কন্যা রাইমণির এই মাতৃস্নেহের নির্ঝরিণী ধারায় অবগাহন করে, বালক ঈশ্বরচন্দ্র বড়বাজারের বাণিজ্যিক পরিবেশে মানুষের মতো মানুষ হয়ে গড়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছিলেন।"[৮]

ছেলেবেলার এই সিংহ পরিবারের স্মৃতি ঈশ্বরচন্দ্রের মনে তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সঞ্জীবিত ছিল। বিশেষ করে ছোটদিদি রাইমণির স্মৃতি। তাঁর কর্মজীবনে স্ত্রীজাতির প্রতি যে মমত্ববোধ, শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখিয়ে গেছেন, তার উৎস ছিলেন রাইমণি। শেষ বয়সে যে আত্মজীবনী লিখতে আরম্ভ করেছিলেন, তাতে রাইমণিকে যেভাবে চিত্রিত করেছেন, তা থেকে বোঝা যায় রাইমণি ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনে কতখানি প্রভাব ফেলেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র লিখেছেন, "কনিষ্ঠা ভগিনী রাইমণির অদ্ভুত স্নেহ ও যত্ন আমি কস্মিনকালেও বিস্মৃত হইতে পারিব না। তাঁহার একমাত্র পুত্র গোপালচন্দ্র ঘোষ আমার প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। পুত্রের উপর জননীর যেরূপ স্নেহ ও যত্ন থাকা উচিত ও আবশ্যক, গোপালচন্দ্রের উপর রাইমণির স্নেহ ও যত্ন তদপেক্ষা অধিকতর ছিল, তাহার সংশয় নাই। কিন্তু আমার আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাস এই, স্নেহ ও যত্ন বিষয়ে, আমায় ও গোপালে রাইমণির অণুমাত্র বিভিন্ন ভাব ছিল না। ফল কথা, এই স্নেহ, দয়া, সৌজন্য, অমায়িকতা, সদ্বিবেচনা প্রভৃতি সদ্‌গুণ বিষয়ে, রাইমণির সমকক্ষ স্ত্রীলোক এ পর্য্যন্ত আমার নয়নগোচর হয় নাই। এই দয়াময়ীর সৌম্যমূর্ত্তি, আমার হৃদয় মন্দিরে, দেবীমূর্ত্তির ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিরাজমান রহিয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে, তাঁহার কথা উত্থাপিত হইলে, তদীয় অপ্রতিম গুণের কীর্ত্তন করিতে করিতে, অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারি না। আমি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী বলিয়া অনেকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আমার বোধ হয়, সে নির্দ্দেশ অসঙ্গত নহে। যে ব্যক্তি রাইমণির স্নেহ, দয়া, সৌজন্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে, এবং ঐ সমস্ত সদ্‌গুণের ফলভোগী হইয়াছে, সে যদি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী না হয় ; তাহা হইলে, তাহার তুল্য কৃতঘ্ন পামর ভূমণ্ডলে নাই।"[৯]

বিনয় ঘোষ দয়েহাটায় ভাগবতচরণের গৃহটিকে সঠিকভাবে নির্দেশ করার কোনও প্রমাণ খুঁজে পাননি। কিন্তু কলিকাতা গবেষক রাধারমণ মিত্র বিদ্যাসাগরের বড়বাজারের বাসাবাড়ি অনুসন্ধান করে সঠিক নম্বরটি আবিষ্কারে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর নিজের কথায় বলি— "বালক ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে পড়বার সময় বড়বাজারের যে বাড়ির একতলার একটি ঘরে পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে থাকতেন, সে বাড়িতে উত্তর রাঢ়ী কায়স্থ ভাগবত সিংহ, তাঁর পুত্র জগদ্দুর্লভ সিংহ ও কন্যা রাইমণি থাকতেন। যে বাড়িতে ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ভাগবত সিংহের কাছে ২ টাকা মাইনেতে চাকুরি করিতেন, সেই বাড়ি দয়েহাটা স্ট্রিটের ১৩ নম্বর বাড়ি। দয়েহাটা স্ট্রিটের নাম এখন দিগম্বর জৈন টেম্পল রোড হয়েছে। আর বাড়িটির নম্বর হয়েছে ১৩এ, ১৩বি ও ১৩সি। আমি এ বাড়ি আবিষ্কার করি। বাড়ির মালিক ও দু' একজন বাসিন্দা ছাড়া আর কেউ জানতেন না যে বিদ্যাসাগর মশাই ছেলেবেলায় এই বাড়িতে বাস করে গিয়েছেন। বিদ্যাসাগরের কোনও জীবনীতেই এই বাড়ির নম্বর দেওয়া নেই।"[১০]

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বাল্যস্মৃতি বিজড়িত দয়েহাটা স্ট্রিটের কালক্রমে বিলুপ্তি ঘটে সে কথায় এবারে আসছি। ১৯৫৭ খ্রিঃ দিগম্বর জৈন সম্প্রদায় তাঁদের ইষ্টদেব শ্রীশ্রীপরেশনাথ নামে ১নং বসাক লেনে যে জৈন মন্দির আছে, তার নামে দয়েহাটা স্ট্রিটের নাম বদলের এক প্রস্তাব কলিকাতা পুরসভার কাছে পেশ করেন। পুরসভার ১৫ই নভেম্বর ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দের অধিবেশনে ওই প্রস্তাব গৃহীত হয়।

জৈনরা প্রধানত দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত : শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর। জৈন সাধুদের মধ্যে নগ্ন থাকার রীতি প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত থাকলেও শ্বেতাম্বর ও দিগম্বররূপে সংঘ বিভাগ অনেক পরবর্তীকালের। বস্তুত দ্বিতীয় ভদ্রবাহুর দাক্ষিণাত্যে গমন (খ্রিস্টপূর্ব ৪র্থ শতকের মধ্যভাগ) থেকে এই সংঘ বিভাগ আরম্ভ হয়। ভদ্রবাহুর নেতৃত্বে যাঁরা জৈন ধর্ম প্রচারের জন্য দাক্ষিণাত্যে গমন করেন তাঁদের মধ্যে অঙ্গশাস্ত্রের জ্ঞান ক্রমশ লুপ্ত হতে থাকে এবং আচার-ব্যবহারও ভিন্নরূপ ধারণ করে। এইসমস্ত সাধুদের একাংশ খ্রিস্টীয় ১ম বা ২য় শতকে আর্যাবর্তে ফিরে এসে নিজেদের ভিন্ন

আচার-ব্যবহারের সংশোধন না করে এক পৃথক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন। প্রত্যেক সাধুকে নগ্ন থাকতে হবে, স্ত্রীলোকের মুক্তি হতে পারে না, কেবলীরা শরীর ধারণ করলেও আহার গ্রহণ করেন না ইত্যাদি কয়েকটি নতুন মতবাদ গ্রহণ করে তাঁরা নতুন শাস্ত্র রচনায় প্রবৃত্ত হন। এই সম্প্রদায়ই পরবর্তীকালে নগ্নত্বের জন্য দিগম্বর আখ্যায় অভিহিত হন।

কলিকাতা বা বাংলা দেশে যে জৈন বসতি দেখা যায় তাঁরা সকলেই পশ্চিমাগত এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যই এদেশে এসেছিলেন। পলাশী যুদ্ধের পর যখন কলিকাতার বিকাশ হতে থাকে, তখনই এঁরা মুর্শিদাবাদ, বারাণসী, রাজস্থান প্রভৃতি অঞ্চল থেকে এখানে এসে বসতি স্থাপন করেন। জনশ্রুতি অনুসারে জৌহুরীসাথ প্রথম কলিকাতায় আসেন এবং ১৩৯ নম্বর কটন স্ট্রিটে যেখানে জৈন শ্বেতাম্বর পঞ্চায়তী মন্দির রয়েছে তারই কাছাকাছি অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। আর হুলাসিলাল অগ্রবাল ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কলিকাতায় আসেন। ৩৫নং ব্রজদুলাল স্ট্রিটে তাঁর বাসভবন ছিল। নিজের ব্যবহারের জন্য এই বাড়িতে একটি মন্দির নির্মাণ করান। তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। তাঁর মৃত্যুর পর সেই গৃহমন্দির সার্বজনীন মন্দিরের রূপ লাভ করে। দিগম্বর জৈন-সমাজের বুদ্ধিচাঁদ সারোগি মন্দিরের সংস্কার করিয়ে পাথরের মন্দিরে রূপান্তরিত করেন। ঢাকার প্রাচীন জৈন মন্দির থেকে প্রতিমা এনে এখানে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

হুলাসিলাল দিগম্বর জৈন সম্প্রদায়ের বড় মন্দির ১নং বসাক লেনে ১৮২৬ খ্রিঃ নির্মাণ করিয়ে সমাজকে দান করেন। এই মন্দির থেকে কার্তিকী পূর্ণিমায় প্রতি বছর দিগম্বর জৈন সমাজের রথযাত্রার মিছিল বার হয় এবং বেলগাছিয়া দিগম্বর জৈন মন্দিরে যায়। সপ্তম দিনে বেলগাছিয়া থেকে সেই মিছিল পুনরায় এই মন্দিরে প্রত্যাবর্তন করে। কলিকাতা দিগম্বর সমাজের এইটি প্রাচীন মন্দির।[১১]

এই প্রাচীন জৈন মন্দিরের নামে দয়েহাটা স্ট্রিট 'দিগম্বর জৈন টেম্পল রোড' নামাঙ্কিত হল। এইভাবে বিদ্যাসাগরের স্মৃতি বিজড়িত দয়েহাটা স্ট্রিট কলিকাতার বুক থেকে চিরতরে লুপ্ত হয়ে গেল।

গৌরদাস বসাক লেন : সেকালের কলিকাতার বহু গুণান্বিত গৌরদাস বসাকের নামে কলিকাতার একটি রাস্তাকে নামাঙ্কিত করার প্রস্তাব নিয়ে সুধীজনের মধ্যে আলাপ-আলোচনা হতে থাকে। অবশেষে কলিকাতা পুরসভাও এ বিষয়ে তৎপর হন। তাঁদের ২৫শে আগস্ট ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের অধিবেশনে নামকরণের প্রস্তাব নিয়ে বিবেচনার পর স্থির হয় বসাক লেনের যে অংশে গৌরদাস বসাক বাস করতেন তা গৌরদাস বসাক লেন নামাঙ্কিত করা হোক। পুরসভার সিদ্ধান্ত অনুসারে শোভারাম বসাক স্ট্রিট ও বসাক স্ট্রিটের সংযোগকারী বসাক লেনের এক শাখাপথকে 'গৌরদাস বসাক লেন' নামাঙ্কিত করা হয়। এই রাস্তাটি উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত।[১২]

গৌরদাস বসাক (১৮২৬-৯৯) হিন্দু কলেজের কৃতী ছাত্র। মহাকবি মাইকেল মধুসূদনের সহপাঠী, প্রত্নতাত্ত্বিক, সমাজসেবী গৌরদাস বসাক কলিকাতার বড়বাজারের বিখ্যাত বসাক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা রাজকৃষ্ণ বসাক। হিন্দু কলেজ থেকে সিনিয়র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। প্রথমে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে বালেশ্বর, মালদহ, বর্ধমান, হুগলি প্রভৃতি অঞ্চলে গমন করেন। পরিশেষে প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট হন। ওই সকল স্থানে অবস্থানের সময় তথাকার ঐতিহ্য ও প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয়ে তথ্যমূলক অনেক প্রবন্ধ রচনা করেন। সেকালের 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় এই প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হত। গৌরদাসের হাত দিয়ে মাইকেল মধুসূদন তাঁর 'ক্যাপটিভ লেডি' কাব্যগ্রন্থখানি ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনকে উপহার দেন। প্রবাসে থাকাকালীন মধুসূদনকে গৌরদাস নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন।

বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলনের তিনি একজন একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। শুধু তাই নয়, নিজ সমাজের সংস্কারকল্পেও তিনি ছিলেন বিশেষ উৎসাহী। তিনি নাট্যশালারও একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বেলগাছিয়া ভিলায় প্রতিষ্ঠিত নাট্যশালায় অভিনীত 'রত্নাবলীতে' সৌগন্দনারায়ণের ভূমিকায় অভিনয় করেন।

গৌরদাস কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, বিলাতের ফিলসফিক্যাল সোসাইটি, টেকস্ট সোসাইটি, বঙ্গীয় রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য ছিলেন। এশিয়াটিক সোসাইটির জেনারেল সেক্রেটারি রূপেও তিনি কিছুকাল কাজ করেছিলেন। ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর "পারসিভিয়ারেন্স সোসাইটি" নামে সাহিত্য ও সংস্কৃতিমূলক সংস্থা স্থাপিত হয়েছিল। দীর্ঘকাল তিনি এই সোসাইটির সভাপতি ছিলেন। এ ছাড়া বরানগরে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটি ও ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনেরও সদস্য ছিলেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি কলিকাতায় অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ও জে. পি. হন।

বহু পুস্তকের রচয়িতা ছিলেন গৌরদাস। প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেকগুলি গ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন। শেঠ-বসাকগণের ইতিহাস ও কলিকাতার ইতিহাস তাঁর রচনা। সি. আর. উইলসন সাহেব তাঁর কাছ থেকে প্রাচীন কলিকাতার ইতিবৃত্ত জেনে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন।[১৩]

বড়বাজার অঞ্চলের কিছু শিক্ষিত যুবকের উদ্যোগে ১৮৪৭ খ্রিঃ ৩১শে ডিসেম্বর সাহিত্যচর্চা ও সামাজিক হিতসাধনের উদ্দেশ্যে গঠিত 'পারসিভিয়ারেন্স সোসাইটি'তে বিজ্ঞান বিষয়ের প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা হত। সোসাইটির সভাপতি ছিলেন গৌরদাস বসাক। বৈষ্ণবচরণ বসাকের গৃহে প্রতি সোমবার সভার প্রথমদিকের অধিবেশনগুলি অনুষ্ঠিত হত। মেডিকেল কলেজের ছাত্ররাও বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনায় অংশ নেবার জন্য এই সভায় আসতেন। ১৮৫৩ খ্রিঃ ৩১শে ডিসেম্বর ষষ্ঠ অধিবেশন হয় জয়গোপাল সেনের গৃহে। সভাপতি গৌরদাস বসাক সমবেত সুধীবৃন্দকে অর্জিত বিদ্যা সমাজসেবায় নিয়োজিত করার আহ্বান জানান।

ফিরে আসি কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থার কর্মকাণ্ডের কথায়।

কালাকার স্ট্রিট প্রকল্পের অন্তর্গত ছিল তিনটি অতি সঙ্কীর্ণ পথ। এই পথ বড়বাজারের উত্তরাংশ থেকে আরম্ভ হয়ে কটন স্ট্রিটে এসে পড়েছিল। একই রাস্তা তিনটি নামে নামাঙ্কিত—কালাকার স্ট্রিট, জগমোহন মল্লিক লেন ও শ্যামা বাই লেন। এটি বড়বাজারের প্রাচীন রাস্তা। কলিকাতা পুরসভা ১৮৫৪ খ্রিঃ বাংলা সরকারের কাছে কলিকাতার উন্নয়নের বিষয়ে যে প্রতিবেদন দাখিল করেছিলেন তাতে এই তিনটির নাম উল্লেখ আছে।[১৪] কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা তাঁদের প্রকল্পের মাধ্যমে এই রাস্তাটিকে ৬০ ফুট প্রশস্ত করার ব্যবস্থা করেন। এর ফলে রতন সরকার গার্ডেন স্ট্রিট থেকে কটন স্ট্রিট পর্যন্ত রাস্তাটি প্রশস্ত হয়। এই সঙ্গে রাস্তাটিকে সম্প্রসারিত করে হ্যারিসন রোড (মহাত্মা গান্ধী রোড) পর্যন্ত আনা হয়েছিল। কলিকাতা পুরসভা ৩রা জানুয়ারি ১৯৪০ খ্রিঃ কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থার কাছ থেকে রাস্তাটি গ্রহণ করেন। বড়বাজারের ঘিঞ্জি অবস্থানের মধ্যে উত্তর থেকে দক্ষিণে যাবার প্রশস্ত এই রাজপথটি যান চলাচল সুগম করেছিল। কালাকার স্ট্রিট প্রকল্প রূপায়ণের সঙ্গে বড়বাজারের আরও কতকগুলি ছোটখাট রাস্তার সংস্কার ও প্রশস্ত করার ব্যবস্থা হয়।

জগমোহন মল্লিক বড়বাজারের সুবিখ্যাত মল্লিক পরিবারের সন্তান। অর্থকৌলিন্যে, দান ধ্যানে, বাণিজ্যিক কুশলতায় বড়বাজারের মল্লিক পরিবারের সুনাম সর্বত্র সুবিদিত। মল্লিক পরিবারের পূর্ব ইতিহাস পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রিট প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রিটে নয়নচাঁদ মল্লিকের দ্বিতীয় পুত্র নিমাইচরণ মল্লিক ও তাঁর উত্তরসূরিদের কীর্তিকলাপের কথা বলা হয়েছে। এখন বড়বাজারবাসী নয়নচাঁদ মল্লিকের জ্যেষ্ঠ পুত্র গৌরচরণ ও তাঁর উত্তরপুরুষদের সম্বন্ধে দু'চার কথা বলা হবে, কেননা জগমোহন গৌরচরণের তৃতীয় পুত্র। জগমোহন ছাড়াও এ বংশের অন্য পুরুষদের নামেও কলিকাতায় কয়েকটি রাস্তা নামাঙ্কিত আছে।

গৌরচরণ নয়নচাঁদ মল্লিকের জ্যেষ্ঠ পুত্র। মধ্যমভ্রাতা নিমাইচরণের সঙ্গে একত্রে বাণিজ্য ও কুসীদ ব্যবসায়ে বিপুল অর্থ উপার্জন করেন। গৌরচরণ ছিলেন ধার্মিক পুরুষ। কাঁচড়াপাড়ায় শ্রীকৃষ্ণরায় জীউ নামে যে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি সেখানে একটি সুন্দর মন্দির নির্মাণ করে দেন এবং মহাসমারোহে তাঁর প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন করেন। এই বৃহৎ দেবালয়ের ব্যয় নির্বাহের জন্য জমি ও উদ্যান দান করেন। এ ছাড়া ব্যবসায়ের উপস্বত্ব তিনি নানা সৎকাজে ব্যয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। ১২০৬ বঙ্গাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন।

গৌরচরণের চার পুত্র—বিশ্বম্ভর, রামলোচন, জগমোহন ও রূপলাল।

বিশ্বম্ভর ছিলেন ধার্মিক, দাতা এবং অতিশয় উদার। দরিদ্রের দুঃখ দূর করতে মুক্তহস্তে দান করতেন। এ জন্য লোকে তাঁকে 'দাতা বিশ্বম্ভর' বলত। পিতা গৌরচরণ তাঁর উইলে বিশ্বম্ভরকে সামান্য অর্থ দেবার ব্যবস্থা করে যান। পিতার মনোভাব বুঝে তিনি পৈতৃক বিষয়ে নিজের প্রাপ্য অংশ ত্যাগ করেন।

'বিশ্বম্ভর মল্লিক লেন' নামে হাটখোলা অঞ্চলে একটি রাস্তা আছে। এটি একটি প্রাচীন পথ। ১৮৭৬ সালের কলিকাতা পুরসভার স্ট্রিট ডাইরেকটরিতে এই রাস্তাটির উল্লেখ আছে। সম্ভবত গৌর মল্লিকের পুত্র বিশ্বম্ভরের নামেই রাস্তাটি নামাঙ্কিত হয়ে থাকবে।

গৌরচরণের দ্বিতীয় পুত্র রামলোচন মল্লিক। তিনিও দাদার মতো দয়ালু ও ধার্মিক ছিলেন। স্যার হেনরি রাসেল কলিকাতা সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির পদ অলংকৃত করায় সেকালের কলিকাতার ২৮ জন গণ্যমান্য নাগরিক ২৯শে অক্টোবর ১৮০৬ খ্রিঃ তাঁকে একটি মানপত্র প্রদান করেন। এই ২৮ জন নাগরিকদের মধ্যে রামলোচন মল্লিক ছিলেন অন্যতম। অল্প বয়সে ১২১৯ বঙ্গাব্দে দেহত্যাগ করেন। তাঁর স্ত্রী চিত্রা দাসীও ধার্মিক মহিলা ছিলেন। আপন স্ত্রীধন ব্যয় করে তিনি রাধাগোবিন্দ জীউয়ের এক মন্দির এবং হ্যারিসন রোডে একটি পৃথক ঠাকুরবাড়ি তৈরি করে দেন। দেবসেবার জন্য প্রয়োজনীয় জমিজমা ও অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা করেন। এখানে প্রতিদিন ৫০ জনের অন্নদানের এবং শীতকালে ১০০০ জনকে কম্বল দানের ব্যবস্থা ছিল।

রামলোচন মল্লিকের উত্তরপুরুষগণ হ্যারিসন রোড (এখন মহাত্মা গান্ধী রোড) নির্মাণের সময় ৪ বিঘা ৩ কাঠা ৬ ছটাক জমি কলিকাতা পুরসভাকে বিনামূল্যে দান করেন। এই জমির মধ্যে ১ বিঘা ১০ কাঠা ১২ ছটাক ৪ স্কোয়ার ফুট ছিল দেবোত্তর সম্পত্তি যার তখনকার মূল্য ছিল ৬৩,০০০ টাকার মতো। এই দেবোত্তর জমি দানের জন্য কলিকাতা হাইকোর্টের অনুমতি নিতে হয়। এখানেই শেষ নয়, ১৯২০ খ্রিঃ যখন চিৎপুর স্পার (এখন বালমুকুন্দ মক্কর রোড) তৈরি হয় সে সময় রামলোচনের উত্তরসূরিগণ ১ বিঘা ৮ কাঠা ১০ ছটাক ১১ স্কোয়ার ফুটের মতো জমি বিনামূল্যে কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থাকে দান করেন। সে সময় ওই জমির মূল্য ছিল প্রতি কাঠা ১২,০০০ টাকা। রামলোচন মল্লিকের এক পুত্র ৫ লক্ষ টাকা অ্যাডমিনেস্ট্রেটর জেনারেল অফ বেঙ্গলের কাছে দিয়ে যান। এই অর্থ সাগরমেলার তীর্থযাত্রীদের সেবায় ব্যয় করার জন্য।

কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা তারাচাঁদ দত্ত স্ট্রিট থেকে মেছুয়াবাজার স্ট্রিট পর্যন্ত ৮৪ ফুট চওড়া একটি রাস্তা নির্মাণ করেন (C.I.T. Scheme No. 1A)। কলিকাতা পুরসভা তাঁদের ১লা ফেব্রুয়ারি ১৯২৮ সালের অধিবেশনে এই নবনির্মিত রাস্তাটি রামলোচন মল্লিকের নামে 'রামলোচন মল্লিক স্ট্রিট' নামাঙ্কিত করেন।[১৫]

রামলোচনের জ্যেষ্ঠ পুত্র কাশীনাথ মল্লিক। সংস্কৃত শিক্ষা প্রসারে তাঁর অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। বড়বাজারের মল্লিক পরিবার সংস্কৃত শিক্ষা বিস্তারে বহু অর্থ ব্যয় করেছেন। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ তাঁদের দানে পরিপুষ্ট হয়েছে। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের বৃত্তিদানের জন্য বার্ষিক ১৮০০ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। কাশীনাথ তাঁর নিজ ভবনে ছাত্রদের শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়নের জন্য সংস্কৃত দাতব্য বিদ্যালয় ও শ্রীভগবৎ মন্দির স্থাপন করেন। খড়দহের গঙ্গার তীরে গোস্বামী ছাত্রদের জন্য আরেকটি দাতব্য সংস্কৃত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

কাশীনাথ বিষয়কর্মে বিচক্ষণ ছিলেন। আদালতের নির্দেশে অনেক ধনী বাদী-প্রতিবাদীর মামলা মকদ্দমায় সালিশ হয়ে উভয়পক্ষের সন্তোষজনক মীমাংসা করে দিতেন। কাশীনাথ নিঃসন্তান ছিলেন। ৪ঠা মার্চ ১৮৭৮ সালে উইল করে সমস্ত সম্পত্তি দান করে যান। ওই সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করতেন তৎকালীন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর জেনারেল অফ বেঙ্গল।[১৬] কাশীনাথের স্ত্রী রঙ্গনমণি দাসীও তাঁর স্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁর নিজস্ব সমস্ত সম্পত্তি উইল করে দান করে দিয়ে যান। উইলের এক শর্তানুসারে বৃন্দাবনের ব্রজবাসিনী বিধবাগণকে মাসিক সাহায্য দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল।

কাশীনাথ মল্লিকের নামে কলিকাতায় একটি রাস্তা আছে। রাস্তাটি তাঁর পিতার নামে নামাঙ্কিত

রাস্তার পাশেই অবস্থিত। কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা মেছুয়াবাজার স্ট্রিট ও তারাচাঁদ দত্ত স্ট্রিটের মধ্যবর্তী অঞ্চল উন্নয়নের জন্য যে C.I.T. Scheme No 1A প্রণয়ন করেন, তা রূপায়িত হওয়ায় ওই অঞ্চলের সার্বিক উন্নতি ঘটে এবং নতুন কতকগুলি রাস্তা বের হয়। যেমন, চিৎপুর স্পার (পরে বালমুকুন্দ মক্কর রোড), রামলোচন মল্লিক স্ট্রিট প্রভৃতি। কাশীনাথের নামে যে রাস্তাটি নামাঙ্কিত হয়েছে সেটিও এই পরিকল্পনার অন্তর্গত। রাস্তাটি ২৫ ফুট চওড়া এবং রামলোচন মল্লিক স্ট্রিটের পাশ দিয়ে প্রসারিত হয়েছে। কলিকাতা পুরসভা তাঁদের ২৪শে এপ্রিল ১৯২৯ সালের অধিবেশনে এই নবনির্মিত পথটি কাশীনাথের নামে 'কাশীনাথ মল্লিক লেন' নামাঙ্কিত করেন।

গৌরচরণের তৃতীয় পুত্র জগমোহন মল্লিক। তিনি অতিশয় ধার্মিক, দাতা ও জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁর বসতবাড়ি ছিল বড়বাজারের হাঁসপুকুর অঞ্চলে। তাঁর সৎকর্ম ও জনপ্রিয়তার জন্য কলিকাতা পুরসভা তাঁর বাসভবনের নিকট একটি রাস্তা 'জগমোহন মল্লিক লেন' নামাঙ্কিত করেন।[১৭]

গৌরচরণের চতুর্থ পুত্র রূপলাল মল্লিক। তিনি ছিলেন দীর্ঘদেহী ও বলশালী পুরুষ। সঙ্গীতের প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। ৮৪নং আপার চিৎপুর রোডে প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্মাণ করেন। ১৮ই নভেম্বর ১৮২৩ সালে নবনির্মিত ভবনে গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে মহা সমারোহে আনন্দোৎসবের ব্যবস্থা হয়। সেকালের কলিকাতার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সুবিখ্যাত নিকি বাইজী নৃত্যগীত পরিবেশন করেন। এ ছাড়াও কেল্লার ইংরেজি ব্যান্ডবাদন ও অন্যান্য আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা ছিল। এই উৎসবের বিবরণ বিশপ হেবারের স্ত্রী তাঁর স্বামীর পত্রিকাতে (Bishop Heber's Journal, Vol I) প্রকাশ করেন। তাঁর লেখা থেকে জানা যায়—
"Bishop Heber's wife went to Nach, given by one of the wealthy natives, Baboo Rooplall Mallick whose immense house with corinthian pillars, we had observed more than once, in our passage along the Chitpore Road.... I joined Lady Macnaghten and a large party this evening to go to Nach, given by a Rich native Rooplall Mullick on the opening of his new house, the outside was brilliantly illuminated and as the building is a fine one, the effect was extremely good....."
রূপলাল নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং বহু প্রতিষ্ঠান তাঁর দানে উপকৃত হয়েছিল। ২৪শে ডিসেম্বর ১৮২৫ খ্রিঃ কলিকাতার বড়লাট ভবনে রূপলাল মল্লিককে মানপত্র ও খেলাত উপহার দেওয়া হয়। ৪৭ বছর বয়সে রূপলালের মৃত্যু হয়।

রূপলালের প্রথম পুত্র প্রাণকৃষ্ণ মল্লিক। তিনি ছিলেন ধার্মিক, দাতা ও উচ্চাঙ্গসঙ্গীতপ্রেমী। সেকালের বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পীগণ তাঁর আসরে সঙ্গীত পরিবেশন করতেন। তিনি পাঁচালী গানেরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বিখ্যাত পাঁচালীকার পরাণ মিত্রের গানের খুব পক্ষপাতী ছিলেন।

প্রাণকৃষ্ণ তাঁর মাতার 'দানসাগর' শ্রাদ্ধে দু' লক্ষ টাকার অধিক অর্থ ব্যয় করেছিলেন। বড় হাতি, ভাল ঘোড়া, সুন্দর পালকি, সোনা রূপোর জিনিসপত্র, দামি কাশ্মীরি শাল প্রভৃতি দান করেন। কাঙ্গালিদেরও বিপুল অর্থ দান করেন। প্রাণকৃষ্ণের এই দানের কাহিনী সেকালের The Englishman পত্রিকায় (2.12.1846) ফলাও করে প্রকাশ করা হয়েছিল।

প্রাণকৃষ্ণও ছিলেন অপুত্রক, ১২৬০ বঙ্গাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

প্রাণকৃষ্ণের স্ত্রী রানী রাজকুমারী ছিলেন মহীয়সী মহিলা। সমস্ত অর্থ তিনি সমাজসেবায়, সংস্কৃত শিক্ষা প্রসারে, বিবিধ দানধ্যানে ব্যয়ের ব্যবস্থা করেন। যদুলাল মল্লিক তাঁর সম্পত্তির ট্রাস্টি ছিলেন। তাঁর পরামর্শে ও উদ্যোগে রাজকুমারী নিজের স্ত্রীধন ও স্বামীর সম্পত্তির উপস্বত্ব থেকে গঙ্গাতীরে জগন্নাথ ঘাটে স্নানার্থীদের জন্য একটি ঘাট নির্মাণ করে দেন এবং দৈনিক দানেরও ব্যবস্থা করেন। 'প্রাণকৃষ্ণ মল্লিক ফান্ড' প্রতিষ্ঠার জন্য অফিসিয়াল ট্রাস্টির হাতে ৯১,০০০ টাকার গভর্নমেন্ট প্রমিসারি নোট হস্তান্তর করেন। এই বিপুল অর্থের সুদ থেকে প্রতি মাসে ব্রাহ্মণ বালকদের অধ্যয়নের খরচ, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে দান, বিধবাদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা, কাঙ্গালিদের অন্নদান প্রভৃতি ব্যবস্থা করা হয়। রাজকুমারীর এই নিঃস্বার্থ দানশীলতার জন্য রানী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের জুবিলি উপলক্ষে ভারত সরকার তাঁকে 'রানী' উপাধি প্রদান করেন।

রূপলাল মল্লিকের কনিষ্ঠ পুত্র শ্যামাচরণ। তিনি একদিকে যেমন ছিলেন সমাজহিতৈষী, দানশীল, কলিকাতাপ্রেমী, অন্য দিকে তেমনি শৌখিন ও অমিতব্যয়ী। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে ২৫শে ফেব্রুয়ারি ১৮৭০ সালে জলকরের প্রতিবাদে যে সভা হয় শ্যামাচরণ ছিলেন সেই সভার অন্যতম উদ্যোক্তা। কলিকাতার নাগরিক শাসনে অংশগ্রহণ করে এখানকার নাগরিকদের স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। তিনি অনারারী ম্যাজিস্ট্রেটও ছিলেন। ১৮৫৮ খ্রিঃ গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিংকে এদেশবাসীর পক্ষ থেকে যে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়, উদ্যোক্তাদের মধ্যে শ্যামাচরণ ছিলেন অন্যতম।

দানেও শ্যামাচরণ মুক্তহস্ত ছিলেন। মল্লিক পরিবারের গৃহদেবতা সিংহবাহিনী মাতার শারদীয়া পূজার পালায় অর্থ না দেওয়ার জন্য ছোট আদালতের বিচারে যারা দেনদার কয়েদী হয়েছিল, শ্যামাচরণ তাদের দেয় অর্থ পরিশোধ করে জেল থেকে তাদের মুক্ত করেন। দুর্ভিক্ষত্রাণেও প্রচুর অর্থ সাহায্য করেন। এ ছাড়াও প্রতি বছর কলিকাতা মেডিকেল কলেজের একটি মেধাবী ছাত্রকে স্বর্ণপদক দেবার ব্যবস্থা করেন।

শ্যামাচরণ পিতৃপিতামহের ৮৪নং আপার চিৎপুর রোডের প্রাসাদতুল্য অট্টালিকায় বাস করতেন। এইটি পরে শ্যাম মল্লিকের বাড়ি বলে চিহ্নিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে এই ভবনটি পাথুরিয়াঘাটার প্রদ্যুম্নকুমার মল্লিক কিনে নেন। শ্যামাচরণের দমদমে এক সুবিশাল ও অতি সুন্দর উদ্যানভবন ছিল, নাম সাত পুকুরের বাগান (Seven Tanks)। একসময় এখানে বড় বড় মেলা ও সমাবেশ হত। ১৮৭০ সালে ২৭শে ডিসেম্বর এই বাগানে এডিনবারার ডিউককে মহাসমারোহে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

শ্যামাচরণের পুত্র ও উত্তরাধিকারী হলেন নন্দলাল মল্লিক। তাঁর নামে নতুনবাজারের কাছে নন্দ মল্লিক লেন নামে একটি রাস্তা আছে। রাস্তাটি চিৎপুর রোড থেকে শুরু হয়ে পূর্ব দিকে প্রসারিত হয়ে চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউতে এসে পড়েছে। কালক্রমে অবস্থা বিপর্যয়ে শ্যামাচরণের বংশ লোপ পায়।[১৮]

বড়বাজারের 'গাঙ্গুলি লেন' নামে রাস্তাটি কলিকাতা তথা ভারতের এক শিল্প-সংস্কৃতি সম্পন্ন পরিবারের নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিজেকে ধন্য করেছে। পথটি রতন সরকার গার্ডেন স্ট্রিট ও শোভারাম বসাক স্ট্রিটের মধ্যবর্তী অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত। গাঙ্গুলি লেন পশ্চিম দিকে মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড থেকে শুরু হয়ে পূর্ব দিকে বরদা ঠাকুর লেনে এসে পড়েছে। যে বিখ্যাত গাঙ্গুলি পরিবারের নামে রাস্তাটি নামাঙ্কিত হয়েছে, সে পরিবারের ইতিহাস ভারতের চিত্রকলা শিল্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত।

প্রায় দু'শো বছর আগের কথা। কলিকাতা শহরে গাঙ্গুলি বংশের যিনি প্রথম প্রতিষ্ঠাতা, তিনি হলেন বিশ্বেশ্বর গাঙ্গুলি। বিক্রমপুরের বাইঘ বা বাইঘা গ্রাম থেকে গঙ্গাতীরে বসবাস করার জন্য তিনি কলিকাতায় আসেন। সেজন্যে এঁদের 'বেঘের গাঙ্গুলি' বলা হত। বড়বাজারের এই গাঙ্গুলি বংশ তখন কলিকাতায় অতি নিষ্ঠাবান প্রাচীন ব্রাহ্মণ বংশ বলে সুপরিচিত ছিল।

বিশ্বেশ্বর গাঙ্গুলি 'রামসীতা বাড়ীর' ঠাকুর পরিবারের ঘরজামাই হয়ে এসেছিলেন। উত্তরে রতন সরকার গার্ডেন স্ট্রিট এবং দক্ষিণে শোভারাম বসাক স্ট্রিট—এই দুই রাস্তার মধ্যে আছে প্রাচীন রামসীতা মন্দির। তখনকার ঠাকুর বংশের দ্বারা এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই ঠাকুর পরিবারের বসতবাড়ি ছিল ২নং গাঙ্গুলি লেন। বিশ্বেশ্বর গাঙ্গুলি এই বাড়িতেই বাস করতেন। এই পরিবার প্রভূত ধনসম্পত্তির মালিক ছিলেন। এঁরা কিন্তু জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে এক গোত্র নয়। এই পরিবারের এক সন্তানের নামে বড়বাজারে একটি রাস্তা 'বরদা ঠাকুর লেন' নামাঙ্কিত হয়েছে।

বড়বাজারের গাঙ্গুলি পরিবারকে একসময় 'মাথাঘষা গলির গাঙ্গুলি' বলা হত। সে সময় গাঙ্গুলি লেন ও তার আশপাশে একটি আকর্ষণীয় ব্যবসা ছিল 'মাথাঘষা বিক্রি'। মাথার চুল পরিষ্কার করার জন্য সে সময় শ্যাম্পু বা সাবানের ব্যবহার ছিল অজানা। মহিলারা তখন সুগন্ধি মাথাঘষা দিয়ে

কেশচর্চা করতেন। সেই মাথাঘষা বিক্রির সারি সারি দোকান ছিল ঠিক গাঙ্গুলি লেনের পাশেই। গলিটার নামও ছিল মাথাঘষা গলি। এই রাস্তার কাছাকাছি, থাকার জন্য গাঙ্গুলি পরিবার নতুন বিশেষণে ভূষিত হলেন 'মাথাঘষা গলির গাঙ্গুলি'।

বিশ্বেশ্বর গাঙ্গুলির ছয় পুত্রের মধ্যে অবিনাশচন্দ্র সেকালের কলিকাতায় একজন কৃতী পুরুষ ছিলেন। হাইকোর্টের বড়বাবুর পদে তিনি কাজ করতেন। এই থেকেই আর্থিক উন্নতির সূচনা হয়। তিনি ৩নং গাঙ্গুলি লেনে এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্মাণ করেন। বাড়িতে ছিল পাঁচ ফোকরের দালান, তাতে বারো মাসে তেরো পার্বণের উৎসব হত। শারদীয়া দুর্গাপূজা ও কালীপূজার সময় নানা দূর দেশ থেকে পণ্ডিত ব্রাহ্মণদের আমন্ত্রণ করে এনে তাঁদের বিদায় ও মর্যাদা দেওয়া হত। এই প্রথা প্রায় তিন পুরুষ ধরে চলেছিল। অবিনাশ গাঙ্গুলি তাঁর বংশমর্যাদা, হিন্দুধর্মের নৈষ্ঠিক আচরণ এবং প্রচুর অর্থ উপার্জনের জন্য কলিকাতার সমাজে বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন।

অবিনাশ গাঙ্গুলির পুত্র অর্কপ্রকাশ উচ্চ শিক্ষিত না হলেও নিজের চেষ্টায় ইংরেজি ভাষায় ব্যুৎপুত্তি লাভ করেছিলেন। তাঁর ইংরেজি জ্ঞানের বলেই তিনি তাঁর পিতা অবিনাশচন্দ্রের পরে কলিকাতা হাইকোর্টের বড়বাবুর পদটি পেয়েছিলেন। তিনিও কিছুকাল পরে পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে গাঙ্গুলি লেনে ১২/১ নম্বরে নিজে একটি তিনতলা বাড়ি করে উঠে আসেন। ৩ নম্বর বাড়িটি তখন পুরানো বাড়ি বলে অভিহিত হতে থাকে।

অর্কপ্রকাশের চার পুত্র—অনেন্দ্রকুমার, অগেন্দ্রকুমার, অর্ধেন্দ্রকুমার ও অলীন্দ্রকুমার। শেষোক্ত দুই পুত্রের শিল্প-সংস্কৃতি ও চিত্রকলার দিকে বাল্যকাল থেকেই ঝোঁক হয়েছিল। মাতামহ শ্রীনাথ ঠাকুরের চিত্রশিল্পের প্রতি ছিল গভীর আকর্ষণ, নিজেও একজন শিল্পী ছিলেন। দেবদেবীর মূর্তি অঙ্কনে ছিলেন বিশেষ পারদর্শী, সর্বোপরি তাঁর ছিল সহজাত রূপবুদ্ধি ও শিল্পচেতনা। সেকালের কলিকাতায় তিনি বিশিষ্ট ধনীরূপে পরিচিত ছিলেন। জোড়াসাঁকোয় ছিল তাঁর প্রকাণ্ড বাড়ি। প্রসাদদাস বড়ালের কাছে সে বাড়ি পরে বিক্রি হয়ে যায়। শেষ বয়সে গাঙ্গুলি বাড়িতে আশ্রয় নেন। মাতামহের সান্নিধ্যেই দুই ভাইয়ের শিল্প চেতনার উন্মেষ ঘটে।

অর্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলি (১৮৮১-১৯৭৪) এই বংশের শ্রেষ্ঠ সন্তান। অতি অল্পবয়সে আইন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়েও নেশায় তিনি ছিলেন চিত্রকলাপ্রেমী ও চিত্রশিল্পী। তাঁর সুদীর্ঘ কর্মবহুল জীবনের সঙ্গে বাংলার তথা ভারতের শিল্পের ইতিহাস আর প্রগতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে। শিল্পের ইতিহাস আলোচনা ছিল তাঁর জীবনের উজ্জ্বল অংশ। প্রথম জীবনে ইউরোপীয় কলাশিল্প নিয়ে অনুধ্যান ও অনুধাবন করলেও আকস্মিকভাবে তাঁর শিল্পচর্চার জীবনে আসে এক অভাবনীয় পরিবর্তন। ১৯০৪ সালের কথা। এক বন্ধুর পরামর্শে পেন্সিলে রবীন্দ্রনাথের একখানি ছবি এঁকে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে গিয়ে তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন। ছবিটি গ্রহণ করে কবি মন্তব্য করলেন, তাঁর ভাইপো 'অবন' ভারতীয় চিত্রাঙ্কন পদ্ধতিতে এক নতুন শৈলী আবিষ্কার করেছে। তাই শুনে অর্ধেন্দ্রকুমার অবনীন্দ্রনাথের চিত্রাবলী পর্যালোচনায় ব্রতী হলেন। কলাশিল্পের এক নব রাজ্যে প্রবেশ করলেন, শুরু হল তাঁর নতুন জীবন। ভারতীয় চিত্রকলার যে নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য, একটা স্বতন্ত্র ভাষা ও পদ্ধতি আছে সেই উপলব্ধি তিনি নতুন করে অনুভব করলেন। অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাতের প্রবল ইচ্ছা হতে থাকে। অবশেষে জ্যাঠামশাই যজ্ঞেশপ্রকাশ গাঙ্গুলির সূত্রে তিনি অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হলেন। যজ্ঞেশপ্রকাশ ছিলেন অবনীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ পিসেমশাই। তাঁর সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির কন্যার বিবাহ সেকালের সমাজজীবনে ছিল এক আলোড়নকারী ঘটনা।

সেকালের শহর কলিকাতার ধনী ব্রাহ্মণ, কায়স্থ পরিবার চাইতেন সুন্দর সুশ্রী পুরুষের সঙ্গে কন্যাদের বিবাহের ব্যবস্থা। কোথাও কোথাও কৌলীন্য বা বংশ গৌরবও প্রাধান্য পেত। ঠিক এই রকমটি ঘটেছিল বড়বাজারের গাঙ্গুলি পরিবার এবং কাছাকাছি জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের মধ্যে। গাঙ্গুলি বংশ বরাবরই প্রাচীনপন্থী ও রক্ষণশীল, আর ঠাকুর পরিবার চিরকালই আধুনিক ও উদার মতাবলম্বী। শিক্ষা সংস্কৃতি বিষয়ে মেলামেশা থাকলেও বৈবাহিক সম্পর্ক তখনও স্থাপিত হয়নি। সে সময় গাঙ্গুলি বংশের সকলেই ছিলেন সুন্দর ও সুপুরুষ। তার মধ্যে আবার আস্যচন্দ্র গাঙ্গুলির দ্বিতীয় পুত্র যজ্ঞেশপ্রকাশ ছিলেন অসাধারণ রূপের অধিকারী। অবনীন্দ্রনাথের পিতামহ গিরীন্দ্রনাথ

যজ্ঞেশপ্রকাশকে মনে মনে জামাতা পদে বরণ করেন। ফলে গাঙ্গুলি পরিবারের বংশমর্যাদা আঘাত পড়বার সম্ভাবনা দেখা দেয়। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ হওয়ায় সে সময় গঙ্গাস্নান গাঙ্গুলি পরিবারের নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। একদিন গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে তরুণ যজ্ঞেশপ্রকাশ আর বাড়ি ফিরলেন না। চারিদিকে খোঁজ করা হল, ছেলেকে কোথাও পাওয়া গেল না। পরিবারে বিষাদের ছায়া নেমে এল। রাত একটু বেশি হতে ঠাকুরবাড়ি থেকে খবর এল গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যার সঙ্গে যজ্ঞেশপ্রকাশের শুভবিবাহ সম্পন্ন হয়ে গেছে। গাঙ্গুলি পরিবার প্রথমে হতভম্ব, পরে রেগে আগুন। এ ঘটনা তাঁরা কোনওদিন মেনে নিতে পারেননি। তাঁরা যজ্ঞেশপ্রকাশের সঙ্গে আর কোনও সম্বন্ধ রাখেননি। গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর অবশ্য তাঁর জামাতা যজ্ঞেশপ্রকাশকে এত অর্থ ও সম্পত্তি দিয়েছিলেন যে তাঁকে আর পৈতৃক সম্পত্তির মুখাপেক্ষী হতে হয়নি।

অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর দাদা গগনেন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় অর্ধেন্দ্রকুমারের কাছে ভারতের প্রাচীন চিত্রপদ্ধতি ও তার বিভিন্ন শাখাপ্রশাখার রূপ রহস্যের গুপ্ত কপাট খুলে যায়। তিনি তখন তার আলোচনা ও ইতিহাস আবিষ্কারে ব্রতী হন। ধীরে ধীরে তিনি বহু মনীষী ও বহুমানভাজন গুণীজনের সংস্পর্শে আসেন। তাঁরা হলেন ভগিনী নিবেদিতা, স্যার জন উডরফ, তৎকালীন স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার সম্পাদক এস কে. র‍্যাটক্লিফ, কাউন্ট কেসারলিং, বিশ্ববিশ্রুত জাপানি কলা সমালোচক কাকুজো ওকাকুরা, জাপানের চিত্রশিল্পীদ্বয় হিশিদা ও তাইকান এবং আরও অনেক দেশি ও বিদেশি বিদগ্ধজন। সে সময় অবনীন্দ্র প্রদর্শিত নতুন চিত্রকলা আন্দোলন বাংলাদেশ তথা ভারতের অনেক সুরসিক, সমঝদার ও কলাপ্রেমী মানুষকে উদ্বোধিত করেছিল। তাঁরা চেয়েছিলেন একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে তার মাধ্যমে এই চিত্রকলা আন্দোলনকে আরও বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রসারিত করতে। এর ফলে ১৯০৭ সালে কলিকাতায় স্থাপিত হয় "ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্ট"। অর্ধেন্দ্রকুমার প্রথম থেকেই এর কর্মধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। বহু বছর তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারি ছিলেন, পরে উপসভাপতি হয়েছিলেন। আর সভাপতি ছিলেন ভারতপ্রেমী বিচারপতি স্যার জন উডরফ।

১৯১৭ সালে বাংলার গভর্নর হয়ে এলেন লর্ড রোনাল্ডসে। তিনি ছিলেন শিল্পরসিক ও সমঝদার। বাংলার চিত্রকলা শিল্পের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সেই সঙ্গে গগনেন্দ্র ও অবনীন্দ্রের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাঁদের বিশেষ অনুরাগী হয়ে ওঠেন। তিনি ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্টের মুখপত্র হিসাবে একটি উন্নত ধরনের চিত্রকলা বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশের প্রস্তাব দেন। শুধু তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে সরকারি তহবিল থেকে ওই পত্রিকা প্রকাশের জন্য বিশ হাজার টাকা দেবার ব্যবস্থা করেন। গগনেন্দ্রনাথ পত্রিকার নামকরণ করেন 'রূপম' আর সম্পাদনার ভার পড়ল অর্ধেন্দ্রকুমারের ওপর। লর্ড রোনাল্ডসের অর্থানুকূল্যে আর্ট সোসাইটি হগ স্ট্রিটের হিন্দুস্থান বিল্ডিংসের ৬নং সমবায় ম্যানসনের একটি বড় ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে সোসাইটির কাজ ও সঙ্গে সঙ্গে রূপম পত্রিকা প্রকাশনের ব্যবস্থা করেন। পত্রিকাখানি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২০ সালের জানুয়ারি মাসে। পত্রিকাটি ছিল ত্রৈমাসিক। রূপমে কেবলমাত্র প্রাচ্যদেশীয় কলা শিল্প ও প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধীয় আলোচনাই স্থান পেয়েছিল তাই নয়, এই পত্রিকায় প্রাচ্য শিল্প সম্বন্ধে বিদেশের বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞদের প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হত। অর্ধেন্দ্রকুমার এই পত্রিকার সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন যে কাজের সুবিধার জন্য পত্রিকার কার্যালয় তাঁর নিজস্ব সলিসিটার অফিস ৭নং ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিটে নিয়ে আসতে হয়েছিল। রূপম পত্রিকা ছাড়াও ২০ খণ্ডে শিল্প ও সঙ্গীতের ওপর তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থাবলী— Indian Architecture, Art of Rashtrakutas, Indian Terracotta, Arts of Orissa ইত্যাদি আজও শিল্পরসিক ও গবেষকদের কাছে আকর গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হয়।

অনেকের ধারণাই ছিল না যে সৌন্দর্য সাধনার আধার রূপম প্রকাশিত হত অ্যাটর্নির অফিস থেকে। আর সম্পাদক একজন আইনজীবী। রূপমের রূপে ও গুণে মুগ্ধ হয়ে বিদেশের কলা-রসিক, সমঝদার পাঠক বা গ্রাহকদের মধ্যে যাঁরা কলিকাতায় আসতেন এবং খোঁজ নিয়ে রূপমের কার্যালয়ে গিয়ে দেখতেন যে সম্পাদক অর্ধেন্দ্রকুমার আসলে একজন সলিসিটর এবং চারিদিকে ফাইল, ব্রিফ ও মক্কেল বেষ্টিত হয়ে হাইকোর্টের কাজ করছেন, তখন তাঁরা অপার বিস্ময়ে

তাকিয়ে থাকতেন। লব্ধপ্রতিষ্ঠিত আইনব্যবসায়ী হয়ে আইনের সূক্ষ্ম তর্কজালে জড়িয়ে পড়েও ভারতের চিত্রকলার প্রস্ফুটিত পুষ্পের প্রতিটি পাপড়ির সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন অর্ধেন্দ্রকুমার। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর সম্বন্ধে যথার্থ মন্তব্য করেছিলেন, "আধুনিক ভারতে বিজ্ঞানের প্রগতির চর্চায় যেমন জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দর, মেঘনাদ, রামানুজন্, কৃষ্ণন, চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন, বীরবল সাহনী প্রভৃতির নাম বাদ দেওয়া যায় না, তেমনি আধুনিক ভারতে শিল্পের কথা বলতে গেলে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় শিল্প আর বিশ্বের শিল্প নিয়ে ভারতের দর্শন আর সমীক্ষার কথা বিচার করতে গেলে, অবনীন্দ্রনাথ আর নন্দলাল, এঁদের সঙ্গে সঙ্গে অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের নামও এ হিসাবে অপরিহার্য হয়ে ওঠে।" [১৯]

কলিকাতা পুরসভা ১৯৮২ খ্রিঃ 'লী রোড' (Lee Road) রাজপথটি এই শিল্পরসিক সুধী মনীষীর স্মরণে 'ও. সি. গাঙ্গুলি সরণি' নামাঙ্কিত করেন। পূর্বে এই রাস্তাটির নাম ছিল রিজার্ভার রোড সাউথ (Reservoir Road South)। ভবানীপুরে কলিকাতা পুরসভার একটি জলাধার ছিল, তার দক্ষিণ দিকের রাস্তাটি এই নামে চিহ্নিত করা হয়। ১৮৯৫ খ্রিঃ কলিকাতা পুরসভার তৎকালীন চেয়ারম্যান হ্যারী লী (Harry Lee, I.C.S)-এর আকস্মিক পরলোকগমনে পুরসভা রিজার্ভার রোড সাউথ রাস্তাটি নাম বদল করে 'লী রোড' নামাঙ্কিত করেন। হ্যারী লী ১৬ই এপ্রিল ১৮৯০ খ্রিঃ কলিকাতা পুরসভার চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। চেয়ারম্যান থাকাকালীন ১৮৯২ খ্রিঃ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্বাচিত হন। ওই পদে ১৮৯৪ খ্রিঃ পর্যন্ত ছিলেন। ১৮৯৫ খ্রিঃ দুরারোগ্য ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হয়ে কলিকাতায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ছাত্র সমাজের সঙ্গে হ্যারী লী'র ছিল প্রীতির সম্পর্ক। তিনি তাদের খেলাধূলা প্রভৃতি সকল কাজে উৎসাহ দিতেন। তাঁর অকাল মৃত্যুতে কলিকাতার ছাত্র সমাজ শোকাহত হয়। তাই ছাত্রদের উদ্যোগে হ্যারী লী'র স্মৃতির উদ্দেশে ফুটবল খেলায় লী চ্যালেঞ্জ শীল্ড প্রবর্তন করা হয়। [২০]

বড়বাজারের গাঙ্গুলি লেনের উত্তরে রতন সরকার গার্ডেন স্ট্রিট। যাঁর উদ্যানের নামে রাস্তাটি নামাঙ্কিত হয়েছে সেই রতন সরকার সম্বন্ধে নানা কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। ১৬৭৯ খ্রিঃ 'ফ্যাকন' নামে একখানি জাহাজ কলিকাতার গার্ডেনরীচে নঙ্গর করে। কাপ্তেন স্ট্র্যাফোর্ড এই জাহাজের অধ্যক্ষ ছিলেন। এটি একটি বাণিজ্য জাহাজ। মালিক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। কাপ্তেন সাহেবের একজন দোভাষীর প্রয়োজন হয়। নিকটস্থ গ্রামবাসী রতন সরকারকে কাপ্তেনের কাছে নিয়ে আসে। ইংরেজি না জানলেও নিজের বুদ্ধির জোরে রতন সরকার কাপ্তেনের মনের কথা আভাষে ইঙ্গিতে বুঝতে পারেন। পরে রতন সরকার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দোভাষী নিযুক্ত হন। কয়েক বছর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে কাজ করে রতন সরকার প্রচুর বিত্তশালী হয়ে ওঠেন। এই রতন সরকার সম্বন্ধে অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, "বড়বাজারে আর একজন প্রাচীন বিশিষ্ট বাঙালির নাম অদ্যাপি সুপরিচিত। তিনি হলেন ঁ রতন চন্দ্র সরকার। ইনি ছিলেন এক ইংরেজ হৌসের মুৎসুদ্দী এবং প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন। আমাদের বাড়ির ঠিক পেছনে উত্তর দিকে তিনি একটি বাগান বাড়ি নির্মাণ করেছিলেন। সেই বাড়ির স্মৃতি বহন করছে "রতন সরকার গার্ডেন স্ট্রিট"। [২১]

রতন সরকার গার্ডেন স্ট্রিট কলিকাতার একটি প্রাচীন পথ। কলিকাতা পুরসভায় রক্ষিত ১৮২৮ সালের Assessment Register-এ রাস্তাটি নথিভুক্ত আছে। সে সময় রাস্তাটি পশ্চিমে দরমাহাটা স্ট্রিট (মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড) থেকে আরম্ভ হয়ে পূর্ব দিকে চিৎপুর রোড পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। লটারি কমিটির কলিকাতা মানচিত্রে এইভাবে রাস্তাটি দেখানো আছে। বড়বাজারে রতন সরকারের নামে আরও একটি রাস্তা আছে, নাম 'রতন সরকার লেন'।

দরমাহাটা স্ট্রিট কলিকাতার একটি প্রাচীন পথ। আপজন সাহেবের কলিকাতার মানচিত্রে (১৭৯২-৯৩) এই পথটি চিহ্নিত আছে, যদিও সেই মানচিত্রে পথটির কোনও নামাঙ্কন হয়নি। প্রাচীন কলিকাতার এই এলাকায় দরমা বিক্রি হত যা দিয়ে মাদুর প্রভৃতি তৈরি হয়। তাই থেকে এই অঞ্চলের নাম দরমাহাটা এবং সেই সঙ্গে রাস্তাটির নাম হয় দরমাহাটা স্ট্রিট। রাস্তাটি শোভাবাজার স্ট্রিটের পশ্চিম মুখ থেকে শুরু হয়ে সোজা দক্ষিণে এগিয়ে মীরবহর ঘাট স্ট্রিটে এসে মিশেছে।

দরমাহাটা স্ট্রিট কলিকাতার ব্যবসাকেন্দ্র বড়বাজারের সংলগ্ন হওয়াতে এটির গুরুত্ব সমধিক। এই সব বিবেচনা করে পুরসভা কয়েকবার রাস্তাটির সংস্কারে তৎপর হয়েছিলেন। ১৮৯১ খ্রিঃ ৭১৬৫ টাকা খরচ করে রাস্তাটির পূর্ব দিকের ফুটপাত নির্মাণ এবং পশ্চিম দিকে চ্যানেল ও কার্ব স্টোন (channel and kerb stone) বসাবার ব্যবস্থা হয়।[২২] এরপর ১৯১১ খ্রিঃ কলিকাতা পুরসভা জোড়াবাগান স্ট্রিট থেকে নিমতলা ঘাট স্ট্রিটের মধ্যবর্তী দরমাহাটা স্ট্রিটকে ৪০ ফুট প্রশস্ত করার জন্য ৪ জানুয়ারি ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে টাঃ ৪৫১১-১৩-৪ পাই ব্যয়মঞ্জুরী অনুমোদন করেন। তারপর ৮ই নভেম্বর ১৯১১ খ্রিঃ ৯নং নিমতলা ঘাট স্ট্রিটের উপর অবস্থিত একটি বাড়ি ওই রাস্তাটি চওড়া করার জন্য অধিগ্রহণ করা হয়। ইতিমধ্যে কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা স্থাপিত হলে পর তাঁরা এই রাস্তাটি সংস্কার ও প্রশস্ত করার কাজে হাত দেন। তাঁদের তত্ত্বাবধানে দরমাহাটা স্ট্রিট ৫০ ফুট প্রশস্ত করার ব্যবস্থা হয়। তার মধ্যে ৩৬ ফুট যান চলাচলের জন্য এবং ৭ ফুট করে দু'দিকে ফুটপাতের ব্যবস্থা পথচারীর জন্য করা হয়। বড়বাজার এলাকায় জমি অধিগ্রহণের অসুবিধা থাকায় রাস্তা ও ফুটপাতের প্রস্থ সর্বত্র একই মাপে করা সম্ভব হয়নি। কলিকাতা পুরসভা ১১ই অক্টোবর ১৯৩৯ খ্রিঃ কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থার কাছ থেকে দরমাহাটা স্ট্রিটের ভার গ্রহণ করেন।

এরপর দরমাহাটা স্ট্রিটের নামবদলের এক প্রস্তাব পুরসভার হস্তগত হয়। কলিকাতা পুরসভা তাঁদের ১৭ই মে ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের অধিবেশনে রাস্তাটির নাম বদল করে 'মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড' নামকরণ করেন। কলিকাতার এই প্রাচীন রাস্তার নাম বদলের প্রস্তাবে সেদিনকার পৌর অধিবেশনে বিতর্কের ঝড় উঠেছিল। বহু সদস্যই কলিকাতার ইতিহাসকে এইভাবে বদলের আপত্তি জানান। তাঁরা নতুন কোনও রাজপথ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে নামকরণের প্রস্তাব দেন। কিন্তু তা কার্যকর হয়নি। শেষ পর্যন্ত দরমাহাটা স্ট্রিটের নাম বদল করে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড রাখা হয়।

কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থার বড়বাজারের উপর প্রস্তাবিত পরিকল্পনাগুলি রূপায়ণের ফলে বড়বাজারের ঘিঞ্জি পরিবেশের অনেকাংশে উন্নতি হয়েছিল। কিন্তু কলিকাতা পুরসভার সুপারিশগুলি যদি কার্যকর করা যেত, তা হলে বড়বাজারের রাস্তার সংখ্যা বৃদ্ধি পেত। যানচলাচল সহজসাধ্য হত। বাতাস চলাচল বৃদ্ধি পেয়ে শ্বাসরোধকর পরিবেশের যথেষ্ট উন্নতি হত ও আরও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ গড়ে উঠতে সাহায্য করত।

কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থার তত্ত্বাবধানে বড়বাজারের যে রাস্তাঘাটের সংস্কার সাধিত হয়েছিল তারই একটা রেখাচিত্র দেওয়া হল। এই রেখাচিত্রের মাধ্যমে বড়বাজারের রাস্তাঘাটের হাল আমলের চিত্রটি স্পষ্ট হবে।

কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা মধ্য কলিকাতার উন্নয়নকল্পে দুটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, যদিও সেগুলি তিনটি ভাগে দেখানো হয়েছিল।

(১) মিশন রো নামে রাস্তাটিকে চওড়া করার ব্যবস্থা,

(২) মিশন রো এবং ম্যাঙ্গো লেনের সংযোগস্থল থেকে নতুন রাস্তা নির্মাণ করে বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট পর্যন্ত প্রসারিত করা,

(৩) বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট থেকে নতুন রাস্তাটিকে পূর্ব দিকে ওয়েলিংটন স্ট্রিট (নির্মল চন্দ্র স্ট্রিট) পর্যন্ত প্রসারিত করা।

# বড়বাজার অঞ্চলের রেখাচিত্র

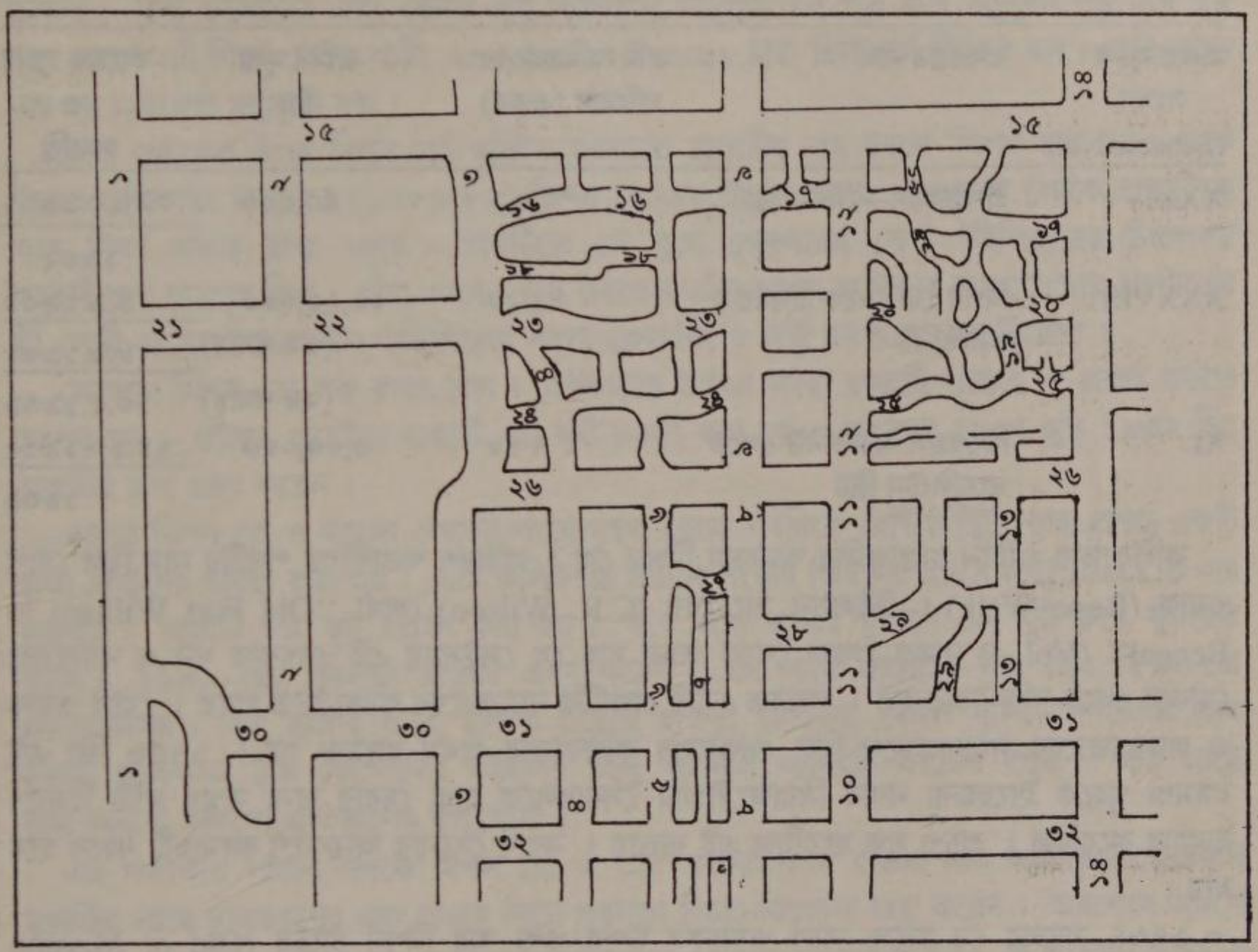

১ স্ট্র্যান্ড ব্যাঙ্ক রোড
২ স্ট্র্যান্ড রোড
৩ মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড
৪ নলিনী শেঠ রোড
৫ রামকুমার রক্ষিত লেন
৬ দয়েহাটা স্ট্রিট
৭ কানাইলাল শেঠ লেন
৮ জগমোহন মল্লিক লেন
৯ কালাকার স্ট্রিট
১০ নারায়ণ বাবু লেন
১১ হাঁসপুকুর লেন
১২ শিবতলা স্ট্রিট
১৩ বাঁশতলা গলি
১৪ চিৎপুর রোড
১৫ কালীকৃষ্ণ ঠাকুর স্ট্রিট
১৬ রতন সরকার গার্ডেন স্ট্রিট
১৭ রাজা ব্রজেন্দ্র স্ট্রিট
১৮ গাঙ্গুলি লেন
১৯ সিকদার পাড়া স্ট্রিট
২০ সিকদার পাড়া লেন
২১ জগন্নাথ ঘাট স্ট্রিট
২২ নবাব লেন
২৩ শোভারাম বসাক স্ট্রিট
২৪ বসাক স্ট্রিট
২৫ শিবু ঠাকুর লেন
২৬ স্যার হরিরাম গোয়েঙ্কা স্ট্রিট
২৭ চৈতন্য শেঠ লেন
২৮ মাধব শেঠ লেন
২৯ হাঁসপুকুর ফার্স্ট লেন
৩০ মীরবহর ঘাট স্ট্রিট
৩১ বটতলা স্ট্রিট
৩২ কটন স্ট্রিট

এই প্রকল্পগুলির সারসংক্ষেপ নিম্নে বর্ণিত হল—

| প্রকল্প সূচক সংখ্যা (Scheme No.) | প্রকল্পের নাম | জমি অধিগ্রহণের পরিমাণ (একর) | জমির মূল্য টাঃ | কাজের সূচনা ও সমাপ্তি |
|---|---|---|---|---|
| XXXIV | প্রশস্তকরণ—মিশন রো | ২·৫২ | ৪০,০০০ | ২৬.৩.১৯৩১ |
| | | | | ১৯৩২ |
| XXXVIII | মিশন রো থেকে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ | ১৪·২৮ | ৩৫,২৫,০০০ (১ম পর্যায়) | ৪.৯.১৯৩৩ |
| | | | | ৮.৬.১৯৩৮ |
| | | | (২য় পর্যায়) | ১০.৫.১৯৩৯ |
| XL | চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ থেকে ওয়েলিংটন স্ট্রিট | ৭·৪৮ | ৫,০০,০০০ | ২৪.১০.১৯৩৫ |
| | | | | ১৯৩৯ |

কলিকাতার প্রাচীন রাস্তাগুলির অন্যতম মিশন রো। অষ্টাদশ শতাব্দীতে পথটির নাম ছিল রোপ ওয়াক (Rope Walk)। উইলসন সাহেবের (C.R. Wilson) লেখা "Old Fort William in Bengal" (Vol. I) নামক পুস্তক থেকে জানা যায় যে সেইসময় এই এলাকায় শন ও নারিকেল ছোবড়া থেকে দড়ি তৈরি হত। সম্ভবত এটিই রাস্তাটির নামকরণের কারণ হতে পারে। রোপ ওয়াক ও লালবাজারের সংযোগস্থলে ছিল সেকালের কলিকাতার প্রথম রঙ্গমঞ্চ গৃহ। ১৭৫৬ খ্রিঃ এই রঙ্গমঞ্চ গৃহকে ইংরেজরা নবাব সিরাজদৌল্লার সৈন্যদলকে বাধা দেবার জন্য সম্মুখ ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করেছিল। প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছিল এই রাস্তায়। নবাব সৈন্যের আক্রমণে রঙ্গমঞ্চটি ধ্বংস হয়ে যায়।

১৭৬৭ সালের মে মাসে রোপ ওয়াকের উপর ওল্ড অর মিশন চার্চের (Old or Mission Church) ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। এই গির্জার প্রতিষ্ঠাতা হলেন পাদ্রি জন জাকেরিয়া কিয়ারন্যান্ডার (John Zachariah Kiernander)। তিনি ছিলেন সুইডেনের অধিবাসী ও প্রোটেস্টান্ট মিশনারি। ১৭৩৯ খ্রিঃ ভারতে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্য মাদ্রাজে পদার্পণ করেন। ১৭৫৮ খ্রিঃ একই উদ্দেশ্যে কলিকাতায় আসেন এবং ওই বছরের ডিসেম্বরে এখানে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বিদ্যালয়টি শীঘ্রই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সেখানে ইংরেজ, আর্মানি, পর্তুগিজ এবং বাঙালি ছাত্ররা বিনা বেতনে অধ্যয়ন করত। এই বিদ্যালয়টি ১৮০০ খ্রিঃ বিখ্যাত ফ্রি স্কুলের সঙ্গে মিলিত হয়। তিনি দ্বিতীয় স্ত্রীর ও পৈতৃক সূত্রে বিপুল অর্থ লাভ করায় কলিকাতায় একটি গির্জা স্থাপনে তৎপর হন। ১৭৬৭ খ্রিঃ গির্জার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। গির্জা নির্মাণে ৬৭,০০০ টাকা ব্যয় হয়েছিল, তার মধ্যে পাদ্রি কিয়ারন্যান্ডার দিয়েছিলেন ৬৫,০০০ টাকা আর তাঁর অনুগামীরা দান করেছিলেন ২০০০ টাকা। এই গির্জা নির্মাণের স্থপতি ছিলেন Dane, Martin Boutant de Mevell, ২৩শে ডিসেম্বর ১৭৭০ খ্রিঃ গির্জার দ্বারোদঘাটন হয়। প্রথমে গির্জার নামকরণ করা হয়েছিল "Beth Tephilla" অর্থাৎ প্রার্থনা গৃহ। সাধারণের কাছে গির্জাটি মিশন চার্চ নামে পরিচিত ছিল। এই গির্জা প্রতিষ্ঠার ১৭ বছর পর অর্থাৎ ১৭৮৭ খ্রিঃ সেন্ট জন গির্জা স্থাপিত হলে মিশন চার্চের নাম হয় ওল্ড চার্চ, আর সেন্ট জন চার্চের নাম হল নিউ চার্চ। তখন থেকেই এই গির্জাকে বলা হতে লাগল Old or Mission Church. সে সময় গির্জাটির রং ছিল লাল। লোকে এটিকে লাল গির্জা বলত। লাল গির্জা ও ট্যাঙ্ক স্কোয়ারের (বর্তমানে বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ) মধ্যবর্তী ভূ-ভাগে কোনও বাড়িঘর ছিল না। সূর্যের কিরণে লাল গির্জার ছায়া ট্যাঙ্ক স্কোয়ারে প্রতিফলিত হয়ে তার জল হয়ে উঠত লাল। অনেকে মনে করেন এই থেকে ট্যাঙ্ক স্কোয়ারের নাম হয়েছিল লালদিঘি। সে যাই হোক, ট্যাঙ্ক স্কোয়ারে যে লাল গির্জার ছায়া প্রতিফলিত হত তার নিদর্শন মিলবে ১৭৯৪ খ্রিঃ বেইলি সাহেবের (Baillie) আঁকা "ট্যাঙ্ক স্কোয়ার" নামে বিশেষ খোদাই চিত্রটিতে। গির্জার সংলগ্ন প্রাঙ্গণে কয়েকজনকে কবর দেওয়া হয়। গির্জার অভ্যন্তরে কয়েকজনের স্মৃতিফলক এখনও বর্তমান। তার মধ্যে রেভাঃ হেনরি মার্টিন, রেভাঃ ডেভিড ব্রাউন, বিশপ ড্যানিয়েল, কবি চার্লস গ্রান্ট, রেভাঃ হেনরি

পী পার্কার প্রভৃতির নাম উল্লেখ্য। বাংলাদেশের এক বিশেষ ঘটনার সঙ্গে মিশন চার্চের নাম জড়িত। হিন্দু কলেজের এবং হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও'র ছাত্র কবি মধুসূদন দত্ত মাত্র ১৯ বছর বয়সে এই গির্জা থেকে পাদ্রী Archdeacon Deattry দ্বারা খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হন। তাঁর নতুন নাম হয় মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

রোপ ওয়াকের উপর মিশন চার্চ স্থাপিত হওয়াতে রাস্তাটির নাম বদলে 'মিশন রো' হয়। মার্ক উডের কলিকাতা মানচিত্রে (১৭৮৪-৮৫) মিশন রো-এর উল্লেখ আছে। সাধারণ লোকে রাস্তাটিকে লাল গির্জা যাবার রাস্তা বলত। পথটিতে সে যুগে কেবলমাত্র ফোর্ট উইলিয়ামের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বাসগৃহ ছিল। যাঁরা এখানে বাস করতেন তাঁরা হলেন অলিভার ক্রমওয়েলের প্রপৌত্রের স্ত্রী লেডী রাসেল, তৎকালীন কাউন্সিলের সদস্য ক্লেভারিং ও জর্জ মনসনের নাম উল্লেখ্য।

সেকালে মিশন রো সরু রাস্তা ছিল। কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা রাস্তাটি সংস্কার ও প্রশস্ত করতে তৎপর হন। তাঁদের প্রচেষ্টায় রাস্তাটি ৬০ ফুট চওড়া করা হয়। পুরসভা ২৮শে জুন ১৯৩২ খ্রিঃ রাস্তাটির ভার গ্রহণ করেন।

এরপর মিশন রো ও ম্যাঙ্গো লেনের সংযোগস্থল থেকে পূর্বদিকে বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট পর্যন্ত প্রশস্ত একটি রাস্তা নির্মাণের ব্যবস্থা করা হয়। এটি কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থার স্কিম নং XXXVIII Block B-এর অন্তর্গত। রাস্তাটি ৮৪ ফুট চওড়া করা হয়। তার মধ্যে রাস্তার দুপাশে ১২ ফুট করে ফুটপাত আছে। ১৯৩৯ খ্রিঃ পুরসভা রাস্তাটি গ্রহণ করেন। সে সময় রাস্তাটির নাম ছিল মিশন রো একস্টেনসন। এই রাস্তার ধারে স্থাপিত হয়েছে হাওড়া মোটরস্, বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স, কলিকাতা ট্রাম কোম্পানির কার্যালয়, হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুইটি ফান্ডের দপ্তর। আর আছে নামী-অনামী অসংখ্য প্রতিষ্ঠানের দপ্তরখানা।

এই শতাব্দীর পাঁচের দশকে মিশন রো ও তার এক্সটেনসন রাস্তার নাম কর্মবীর রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জির নামে নামকরণের এক প্রস্তাব নিয়ে পুরসভা বিচার-বিবেচনা শুরু করেন। অবশেষে ২৬শে আগস্ট ১৯৬০ খ্রিঃ কলিকাতার পুরসভার অধিবেশনে এই প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। ফলে সমগ্র রাস্তাটির নতুন নামকরণ হয় 'রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জি রোড'।

রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৫৪-১৯৩৬) ছিলেন ভারতের একজন যশস্বী শিল্পপতি। ভারতবিখ্যাত শিল্পসংস্থা মার্টিন অ্যান্ড কোম্পানির কর্নধার ছিলেন। কলিকাতার ভিক্টোরিয়া স্মৃতি-সৌধ নির্মাণে তাঁর অপূর্ব স্থাপত্যশিল্প জ্ঞানের পরিচয় মেলে। ১৯১১ খ্রিঃ নাইট উপাধিতে ভূষিত হন। কলিকাতার শেরিফের পদও অলংকৃত করেছিলেন। ১৯৩১ খ্রিঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানিত ডি. এস-সি. উপাধিতে ভূষিত করেন। বিবিধ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থার সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁর বাসভবন ছিল ৭নং হ্যারিংটন স্ট্রিটে (হো চি মিন সরণি)।

গণেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউ কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা দ্বারা নির্মিত সম্পূর্ণ নতুন একটি রাজপথ। এই নবনির্মিত রাস্তা কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থার দুটি প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত—স্কিম নং XXXVIII ও স্কিম নম্বর XL। রাস্তাটি বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট থেকে শুরু হয়ে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউকে ভেদ করে ওয়েলিংটন স্ট্রিটে (নির্মল চন্দ্র স্ট্রিট) এসে পড়েছে। রাস্তাটি নির্মাণের সময় অনেকগুলি বস্তি ভাঙা পড়ে। আর ভাঙা হয়েছিল ওয়েলিংটন পাম্পিং স্টেশন। এই পাম্পিং স্টেশনটি এমন এক শক্ত সিমেন্টের বনিয়াদের উপর নির্মিত হয়েছিল যে এটিকে ভাঙতে উন্নয়ন সংস্থাকে বিশেষ বেগ পেতে হয়েছিল। চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ থেকে ওয়েলিংটন স্ট্রিটের মুখ পর্যন্ত গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউয়ের মধ্যে তিনটি ছোট উদ্যানও নির্মিত হয়েছিল—প্রথমটি হসপিটাল স্ট্রিট ও গণেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউয়ের সংযোগস্থলে, দ্বিতীয়টি মলঙ্গা লেনের মুখে আর তৃতীয়টি ব্যাপারীটোলায়। রাস্তাটির প্রস্থ প্রায় ৮৪ ফুট।

নবনির্মিত রাস্তাটি প্রখ্যাত আইনজীবী ও সমাজসেবী গণেশচন্দ্র চন্দ্রের নামে নামকরণের প্রস্তাব নিয়ে ১৯৩৯ খ্রিঃ পুরসভায় আলোচনা চলতে থাকে। সে সময় ওই রাস্তার অংশবিশেষ অর্থাৎ বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট থেকে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ পর্যন্ত রাস্তায় যানচলাচল শুরু হয়েছিল। বাকি অংশটুকুর

নির্মাণকার্য তখনও শেষ হয়নি। পুরসভা তাঁদের ৩০শে অক্টোবর ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের অধিবেশনে রাস্তার যে অংশটুকু নির্মিত হয়েছে তার নাম গণেশ চন্দ্র চন্দ্রের নামে 'গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ' নামাঙ্কিত করেন। সেই সঙ্গে নির্দেশ থাকে যে বাকি রাস্তার নির্মাণকার্য শেষ হলে ওই অংশটুকুও গণেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউ নামে নামাঙ্কিত হবে।

প্রখ্যাত আইনজীবী, সুবক্তা ও সমাজসেবী গণেশচন্দ্র চন্দ্র (১৮৪৪-১৯১৪) কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা কাশীনাথ চন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন তিনি। প্রথমে বৌবাজারের ডাঃ রাজেন্দ্রলাল দত্তের হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজে পাঠাভ্যাস করার পর চার্লস ডিক্রুজের (Charles D'Cruze) বেঙ্গল অ্যাকাডেমি থেকে ১৮৬০ খ্রিঃ এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ডায়টন কলেজে পাঠরত অবস্থায় ব্যবসায় প্রবেশ করেন। কিছুদিন পরে অর্থাৎ ১৮৬২ খ্রিঃ রমানাথ লাহার সলিসিটার ফার্মে শিক্ষানবিশ হন। শিক্ষা সমাপনে কলিকাতা হাইকোর্টে আইনব্যবসায় শুরু করেন এবং প্রভূত অর্থ ও প্রতিপত্তি অর্জন করেন। ১৮৭২ খ্রিঃ স্বীয় নামে একটি সলিসিটার ফার্ম স্থাপন করেন যা জি. সি. চন্দ্র অ্যান্ড কোং (G.C. Chunder & Co.) নামে পরিচিত।

গণেশ চন্দ্র বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট, প্রথম বাঙালি ডেপুটি শেরিফ, ১৮৭৬ খ্রিঃ থেকে ১৮৯২ খ্রিঃ পর্যন্ত কলিকাতা পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের (বৌবাজার) নির্বাচিত প্রতিনিধি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোনীত ও পরে সম্মানিত সদস্য, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা, জাতীয় কংগ্রেস, ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটি ইত্যাদির সদস্য ছিলেন। সাহিত্যানুরাগী, শিল্পরসিক ও সুবক্তা হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। তাঁর পুত্র রাজ চন্দ্র কলিকাতা পুরসভার কমিশনার হয়েছিলেন। ১৮৯৯ খ্রিঃ কলিকাতা পুরসভায় ম্যাকেঞ্জি অ্যাক্ট আরোপিত হলে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যে ২৮ জন কমিশনার পদত্যাগ করেন রাজ চন্দ্র তাঁদের অন্যতম। পৌত্র নির্মল চন্দ্র ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের পুর আইনে প্রথম মেয়রের পদ অলংকৃত করেছিলেন।

কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থার তত্ত্বাবধানে রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জি রোড ও গণেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউ নির্মিত হওয়াতে ডালহৌসি স্কোয়ারের সঙ্গে ধর্মতলার সরাসরি সংযোগের সূত্রপাত হয়। এর ফলে একদিকে যেমন যান চলাচলের সুবিধা হয়েছিল অন্যদিকে ঘিঞ্জি বস্তি উচ্ছেদ করে প্রশস্ত রাস্তা নির্মিত হওয়াতে স্বাস্থ্যবিধির প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। এই এলাকা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা পাওয়ার জন্য নির্মিত রাস্তার একটা রেখাচিত্র প্রদত্ত হল।

কলিকাতার প্রয়োজনে গণেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউ রাজপথটি নির্মিত হলেও এটি পরবর্তীকালে সুবর্ণবণিক সমাজের ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে গেছে। সে কথায় আমরা এবারে আসছি।

কলিকাতার প্রাচীন অধিবাসীদের মধ্যে সুবর্ণবণিক সম্প্রদায় অন্যতম। কলিকাতার সমাজ-সংস্কৃতিতে এঁদের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। এই সম্প্রদায় তাঁদের সমাজের বহুমুখী কর্মধারাকে বাস্তবায়িত করার জন্য "কলিকাতা সুবর্ণবণিক সমাজ" প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠানটি ৪৭নং গণেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউতে স্থাপিত হয়। এই সংগঠন সম্বন্ধে কিছু বলার আগে সুবর্ণবণিক সম্প্রদায় সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। এঁদের ইতিহাস যেমনই ঘটনাবহুল তেমনি আকর্ষণীয় বটে।

বর্ণ বিন্যাস ভারতীয় সমাজব্যবস্থার ভিত্তি। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই চতুর্বর্ণের কাঠামোর মধ্যে তাঁরা সমস্ত ভারতীয় সমাজব্যবস্থাকে বাঁধতে চেষ্টা করেছিলেন। ঋগবেদের (১০ম মণ্ডল ৯০ সূক্ত) একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে বিরাট পুরুষের ব্রাহ্মণ মুখ ছিলেন, রাজন্য বাহুস্বরূপ এবং বৈশ্য উরু ছিলেন। পাদদ্বয় থেকে শূদ্র হয়েছিলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এগুলি বর্ণ, জাতি নয়। ওই মন্ত্রের সরল ব্যাখ্যা হল, চারিটি বিশেষ গুণসম্পন্ন ও বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত বর্ণের সমাবেশে সমগ্র সমাজদেহ গঠিত হয়েছে। সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের বিভিন্ন মাত্রার সংযোগের ফলে চারি বর্ণের মধ্যে গুণের তারতম্য উদ্ভূত হয়েছে। সুবর্ণবণিক এই বৈশ্য বর্ণের অন্তর্গত।

খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে বা তার পরবর্তীকালে বাংলা দেশে রচিত বলে বিবেচিত 'বৃহদ্ধর্ম পুরাণ'। এই পুরাণে বলা হয়েছে যে ব্রাহ্মণ ছাড়া বঙ্গদেশে যত বর্ণ আছে, সমস্ত সংকর। বর্ণ ও বৃত্তি সমূহকে উত্তম, মধ্যম ও অধম সংকর এই তিন পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। এই পর্যায়ের

গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ ও বৌবাজার অঞ্চলের রেখাচিত্র

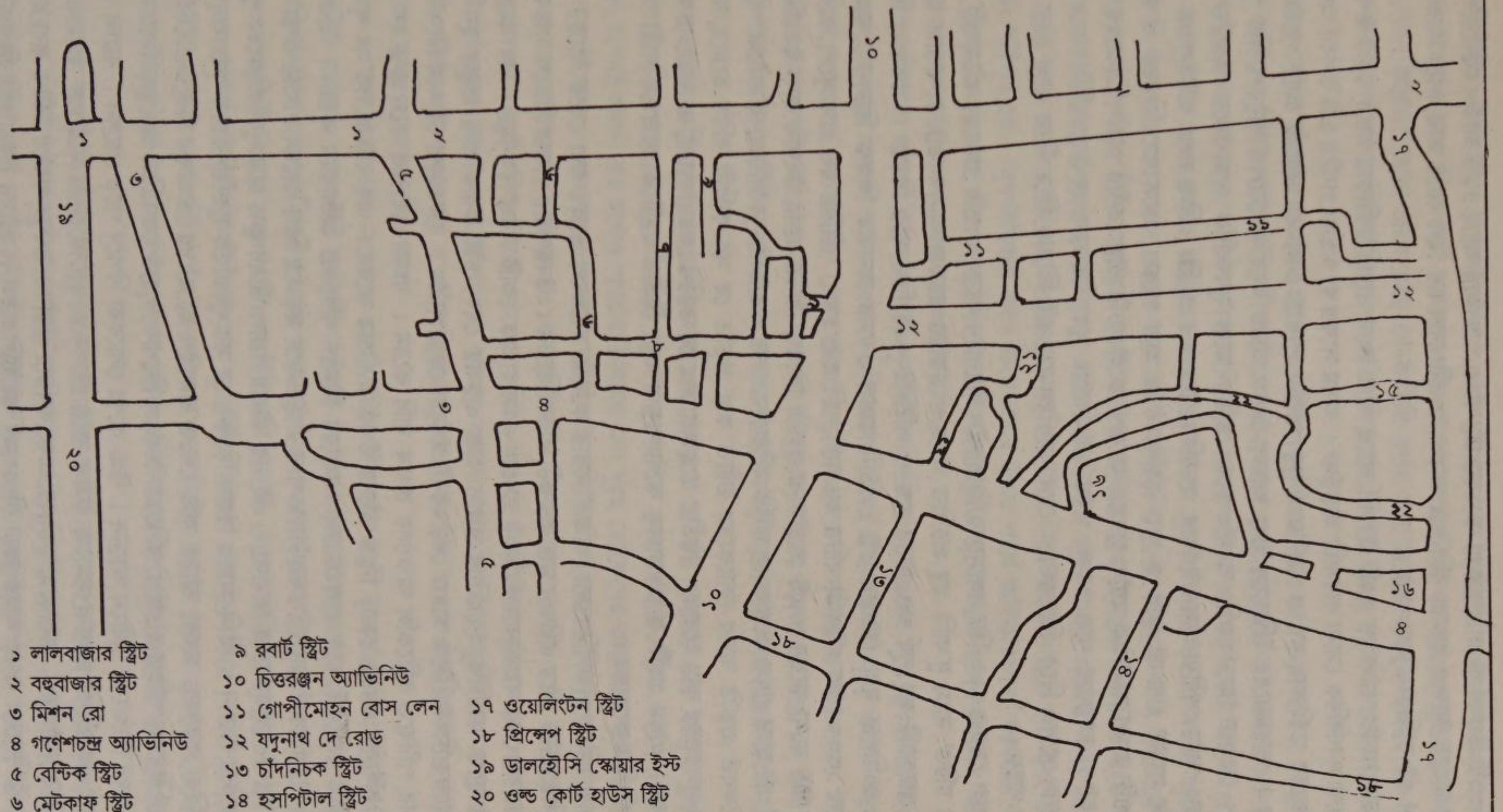

১ লালবাজার স্ট্রিট
২ বহুবাজার স্ট্রিট
৩ মিশন রো
৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ
৫ বেন্টিক স্ট্রিট
৬ মেটকাফ স্ট্রিট
৭ বো স্ট্রিট
৮ কাপালিটোলা লেন
৯ রবার্ট স্ট্রিট
১০ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ
১১ গোপীমোহন বোস লেন
১২ যদুনাথ দে রোড
১৩ চাঁদনিচক স্ট্রিট
১৪ হসপিটাল স্ট্রিট
১৫ শ্রীনাথ দাস লেন
১৬ মলাঙ্গা লেন
১৭ ওয়েলিংটন স্ট্রিট
১৮ প্রিন্সেপ স্ট্রিট
১৯ ডালহৌসি স্কোয়ার ইস্ট
২০ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট
২১ মলাঙ্গা লেন
২২ মদন বড়াল লেন

মধ্যে ৩৬টি উপবর্ণ বা জাতির কথা বলা হয়েছে, যদিও তালিকায় আছে ৪১টি জাত। বঙ্গদেশে জাত সংখ্যা বলতে আজও আমরা বলি ৩৬ জাত। ৩৬টি বোধ হয় ছিল আদি জাত, পরে আরও ৫টি উপবর্ণ এই তালিকায় ঢুকে পড়ে।

উত্তম সংকর তালিকায় ২০টি উপবর্ণ আছে, আর মধ্যম সংকর তালিকায় আছে ১২টি উপবর্ণ। তারমধ্যে সুবর্ণবণিক সোনা ব্যবসায়ী অন্তর্ভুক্ত। অধম সংকর বা অন্ত্যজ পর্যায়ে ৯টি উপবর্ণ আছে।

উপরের তালিকায় বর্ণ ও শ্রেণীর যেটুকু পরিচয় পাওয়া গেল তা একান্তই আদি পর্বের শেষ অধ্যায়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে গুপ্ত আমল থেকে আরম্ভ করে বঙ্গদেশেও অনুরূপ চিত্র পাওয়া যায়। সেখানে অনেকগুলি অর্থোৎপাদক শ্রেণীর মধ্যে সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অন্য শ্রেণীরা হলেন স্বর্ণকার, গন্ধবণিক, তৈলকার প্রভৃতি। কিন্তু সপ্তম অষ্টম শতক থেকে বাঙালি সমাজ প্রধানত কৃষি ও ক্ষুদ্র গৃহশিল্পনির্ভর হয়ে পড়ে। ফলে অর্থোৎপাদক ও শ্রমিক শ্রেণীগুলি ক্রমশ সামাজিক মর্যাদা হারাতে থাকে। ফলে বর্ণের সঙ্গে শ্রেণীর পারস্পরিক সম্বন্ধ ক্রমশ তীব্র হয়। বঙ্গদেশে পাল আমল পর্যন্ত এই বিরোধ খুব তীব্রভাবে দেখা দেয়নি। তবে পাল আমলের শেষের দিকে বিশেষভাবে সেন বর্মণ আমলে এই বিরোধ ধীরে ধীরে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে থাকে।

বল্লাল সেন ১০৬৬ খ্রিঃ বঙ্গদেশের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর রাজত্বের ঘটনাবলী নিয়ে 'বল্লাল চরিত' নামে দু'খানি গ্রন্থ প্রচলিত আছে। একটির গ্রন্থকার আনন্দ ভট্ট, রচনাকাল ১৫১০ খ্রিঃ ; আরেকটি গ্রন্থ পূর্ব খণ্ড, উত্তর খণ্ড ও পরিশিষ্ট—এই তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের রচয়িতার নাম গোপাল ভট্ট। তিনি বল্লাল সেনের অন্যতম শিক্ষক ছিলেন। বল্লালের আদেশে ১৩০০ শকে গ্রন্থখানি রচিত হয় বলে দাবি করা হয়। পরিশিষ্ট খণ্ড প্রায় দুশো বছর পর আনন্দ ভট্ট রচনা করেন। এই গ্রন্থে নানা কুলজি বিবরণ, বিভিন্ন বর্ণের উৎপত্তি কথা ইত্যাদি তো আছেই, তা ছাড়া প্রথম গ্রন্থে বল্লাল কর্তৃক বণিকদের ওপর অত্যাচার, সুবর্ণবণিকদের সমাজে 'পতিত' করা, কৈবর্ত প্রভৃতি বর্ণের লোকেদের উন্নীত করা প্রভৃতি যে সব কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, তারও এখানে পুনরুল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় গ্রন্থে বল্লালের যে তারিখ দেওয়া আছে, তা বল্লালের যথার্থ কাল নয়। প্রথম গ্রন্থটিকে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দ্বিতীয় গ্রন্থটিকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'জাল' বলে অভিহিত করেছেন।

বল্লাল চরিতে সুবর্ণবণিকদের 'পতিত' করার কাহিনী সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে : সেন রাজ্যে বল্লভানন্দ নামে একজন মস্ত বড় ধনী বণিক ছিলেন। উদন্তপুরীর রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বল্লাল সেন বল্লভানন্দের নিকট থেকে একবার এক কোটি 'নিষ্ক' (স্বর্ণমুদ্রা) ধার করেন। বারবার যুদ্ধে পরাজিত হবার পর বল্লাল আর একবার শেষ চেষ্টা করার জন্য প্রস্তুত হন এবং বল্লভানন্দের নিকট থেকে আরও দেড় কোটি স্বর্ণমুদ্রা চেয়ে পাঠান। বল্লভানন্দ ওই অর্থ দিতে রাজি হন, তার পরিবর্তে হরিকেলি অঞ্চলের রাজস্ব দাবি করেন। বল্লাল এই শর্ত শুনে ক্রুদ্ধ হন এবং অনেক বণিকের ধনরত্ন কেড়ে নিয়ে তাঁদের উপর অত্যাচার করেন। এই ঘটনার পর সৎ শূদ্রদের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসে রাজপ্রাসাদে আহারের নিমন্ত্রণ বণিকেরা প্রত্যাখ্যান করেন। ইতিমধ্যে বল্লাল সেনের কানে আসে যে বল্লভানন্দ পাল রাষ্ট্রের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন। তার ওপর মগধ নৃপতি ছিলেন বল্লভানন্দের জামাতা। এই সব ঘটনায় বল্লাল ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে সুবর্ণবণিকদের শূদ্রের স্তরে নামিয়ে দিলেন। তিনি আরও বিধান দিলেন, যে সব পুরোহিত সুবর্ণবণিকদের পূজা অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করবেন, অথবা তাঁদের কাছ থেকে দানগ্রহণ বা তাঁদের শিক্ষাদান করবেন, সেই সব ব্রাহ্মণেরা সমাজে পতিত হবেন। বণিকেরা তখন প্রতিশোধ স্পৃহায় দুগুণ তিন গুণ মূল্য দিয়ে সমস্ত দাসভৃত্যদের নিজেদের অধীনে আনেন। উচ্চ বর্ণের লোকেরা বিপদে পড়ে গেলেন। বল্লাল তখন বাধ্য হয়ে কৈবর্তদের জলচল সমাজে উন্নীত করে দিলেন। তাঁদের নেতা মহেশকে মহামাণ্ডলিক পদে উন্নীত করলেন। মালাকার, কুম্ভকার, এবং কর্মকার এঁদেরও সৎশূদ্র পর্যায়ে উন্নীত করা হল। আর সুবর্ণবণিকদের ওপর আরও কড়া নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হল। তাঁদের পৈতা পরা নিষিদ্ধ হয়ে গেল, অনেক বণিক দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেলেন।

কাহিনীটির ঐতিহাসিক যাথার্থ্য স্বীকার করা কঠিন, তবে একেবারে অলীক কল্পনাপ্রসূত বলে উড়িয়ে দেওয়াও যায় না। সেন বর্মণ আমলে এইরূপ পর্যায় নির্ণয় যে হয়েছে স্মৃতিগ্রন্থগুলিই তার সাক্ষ্য বহন করে। বল্লাল চরিত গ্রন্থে যে কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে অক্ষরে অক্ষরে তা সত্য না হলেও এর মূলে যে সামাজিক ইতিহাসের ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে সে কথা অস্বীকার করা যায় না।

বল্লাল সেনের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সুবর্ণবণিকরা সুবর্ণগ্রাম ত্যাগ করে চলে যান। কিছুসংখ্যক বণিক বর্ধমানের নিকট খড়গেশ্বরী নদীর তীরে কর্জনা নামে নগরীতে এসে বাস করতে লাগলেন। তিন/চারশো বছরের মধ্যে তাঁদের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। তাঁদের একটি সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। আনুমানিক ১৫১৪ খ্রিঃ রাষ্ট্রবিপ্লব ও নানান কারণে সুবর্ণবণিকগণ কর্জনা নগরী ত্যাগ করে কাছাকাছি ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে বাস করতে লাগলেন। সুবর্ণবণিকগণের কয়েকটি শাখা সপ্তগ্রামে বসতি স্থাপন করেন। ধীরে ধীরে সপ্তগ্রাম একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্য স্থান হিসাবে পরিগণিত হয়ে ওঠে। ষোড়শ শতাব্দীর চতুর্থ দশক থেকে গঙ্গার গতিপথ পরিবর্তন হতে থাকায় সরস্বতী নদী স্রোতহীন হয়ে ক্রমশ মজে আসতে থাকে। সপ্তগ্রামের সমৃদ্ধিও ধীরে ধীরে অস্তমিত হয়ে যায় এবং সে স্থান জঙ্গলে পরিপূর্ণ হয়। সুবর্ণবণিকরা ক্রমে ক্রমে গঙ্গার উভয় পার্শ্বে অম্বিকাকালনা, বংশবাটী, হুগলি, বালী, চুঁচুড়া, ফরাসডাঙা, শ্রীরামপুর, নৈহাটি, হালিশহর প্রভৃতি স্থানে বসতি স্থাপন করেন। এইভাবে চলতে লাগল সুবর্ণবণিক সমাজের ভাঙাগড়ার ইতিহাস।

শহর কলিকাতা গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সুবর্ণবণিক সম্প্রদায় ইংরেজদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করার জন্য এখানে এসে বসবাস শুরু করেন। কলিকাতায় এঁদের প্রধান বসতি গড়ে ওঠে—বড়বাজার, ঠনঠনিয়া, বহুবাজার, পটলডাঙা, জোড়াসাঁকো প্রভৃতি অঞ্চলে। সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু উপাধির প্রচলন দেখা যায়, যেমন—শীল, লাহা, দত্ত, রায়, মল্লিক, বড়াল, ধর, চন্দ্র, দে, নন্দী, সেন, আঢ্য, পাল, পাইন প্রভৃতি। কলিকাতার সমাজ-সংস্কৃতির ইতিহাসে এই সম্প্রদায়ের অবদান বিশেষ উল্লেখ্য।

ফিরে আসি কলিকাতা সুবর্ণবণিক সমাজের কথায়। ১৩১৪ বঙ্গাব্দে ৪ঠা ফাল্গুন কুঞ্জবিহারী সেনের নেতৃত্বে পনেরো জন উৎসাহী যুবক 'সুবর্ণবণিক যুবক সমিতি' গঠন করেন। সমাজের কল্যাণ সাধনই প্রধান ব্রত হলেও পণপ্রথা নিবারণ এবং দুঃস্থ লোকেদের কন্যাদায়ে অর্থসাহায্য করাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। প্রাপ্তবয়স্ক সকলেই যাতে এই সমিতির কর্মযজ্ঞে সামিল হয়ে সমাজকল্যাণে সহায়তা করতে পারেন সেইজন্য ১৩১৬ সনের ১লা বৈশাখ (১৯০৯ খ্রিঃ ১৪ই এপ্রিল) সমিতির নাম বদল করে 'সুবর্ণবণিক সমাজ' নামে নামাঙ্কিত করা হয়। কর্মধারা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমাজের একটি মুখপত্রের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ১৩২২ বঙ্গাব্দে (১৯১৬ খ্রিঃ) 'সুবর্ণবণিক সমাচার' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। এই পত্রিকায় সমাজের নানাবিধ সংবাদ প্রকাশিত হতে থাকে এবং সমাজের কর্মতৎপরতাও বৃদ্ধি পায়।

১৩২৮ বঙ্গাব্দে (২৩শে নভেম্বর ১৯২২ খ্রিঃ) সমাজের নতুন নামকরণ করা হয় 'কলিকাতা সুবর্ণবণিক সমাজ'। সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট ১৮৬০ অনুসারে সমাজকে রেজিস্ট্রিকৃত করা হয়।

প্রতিষ্ঠানটি প্রথমে কুঞ্জবিহারী সেনের বাসভবন ২৮নং তারাচাঁদ দত্ত স্ট্রিটে স্থাপিত হয়। পরে রায় বাহাদুর গোকুলচাঁদ বড়াল মহাশয়ের ৮নং হিদারাম ব্যানার্জি লেনের বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়। ওই স্থানে অবস্থান কালেই প্রতিষ্ঠানটি 'কলিকাতা সুবর্ণবণিক সমাজ' নাম ধারণ করে। এরপর গণেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউতে জমি কেনা হয়। সমাজের নিজস্ব ভবন নির্মিত হয়। ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে ২৩শে আষাঢ় রথযাত্রার দিন (১৯৪০ খ্রিঃ) ৪৭নং গণেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউতে নবনির্মিত ভবনের দ্বার উদ্ঘাটন করা হয়।

সমাজের বহুমুখী কর্মধারাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করার জন্য ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন বিভাগের সৃষ্টি করা হয়। ১৩৫৫ বঙ্গাব্দে (১৯৪৯ খ্রিঃ) খোলা হয় 'মহিলা শাখা সমিতি'। সূচীশিল্প বিভাগ এর একটি আকর্ষণীয় অঙ্গ। ১৯৫৭ খ্রিঃ স্থাপিত হয় একটি গ্রন্থাগার, সমাজ ভবনে এল নতুন প্রাণসঞ্চার।

কলিকাতা সুবর্ণবণিক সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান এর বিশাল দানভাণ্ডার। ৪২টি দানভাণ্ডার এর অন্তর্ভুক্ত। এর দ্বারা উপকৃত হচ্ছে সমাজের নানা শ্রেণীর নরনারী—ছাত্র-ছাত্রী, দুঃস্থ বিধবা, অসমর্থ পিতামাতাকে কন্যার বিবাহ উপলক্ষে অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা, আট জন সুবর্ণবণিক ছাত্রকে ডাক্তারি পড়ার খরচ প্রদান প্রভৃতি।

সুবর্ণবণিক সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকে ডঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা, কুমার কার্তিকচরণ মল্লিক, কুমার বিষ্ণুপ্রসাদ রায়, কুমার গোকুলচরণ লাহা, অরুণপ্রসাদ বড়াল, উপেন্দ্রনাথ সেন, নটবর দত্ত প্রমুখ ব্যক্তিদের অকুণ্ঠ সাহায্য ও অক্লান্ত সেবায় এই সমাজ আজ সার্থক হয়ে উঠেছে।

১৯৭৯ খ্রিঃ ২৬শে জানুয়ারি কলিকাতা সুবর্ণবণিক সমাজ পলিক্লিনিকের উদ্বোধন হয়। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে জনসাধারণের সেবার উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয় এই পলিক্লিনিক। ওই বছর ১৪ই অক্টোবর রাসবিহারী দত্ত প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরি স্থাপিত হয়। সমাজের এই পলিক্লিনিকটির সম্প্রসারণ ও একটি নার্সিংহোম স্থাপনের জন্য কালিদাস মল্লিক ৬ লক্ষ টাকা দান করেন। প্রতিষ্ঠানটির বার্ষিক ব্যয় নির্বাহের জন্য তাঁর ট্রাস্ট ফান্ড থেকে প্রতি বছর এক লক্ষ টাকা দেবার অঙ্গীকার করা হয়। সেই প্রতিশ্রুতি পালন করা হয়েছে। ৩০শে আগস্ট ১৯৮০ খ্রিঃ নার্সিংহোমের শিলান্যাস এবং কালিদাস মল্লিক ট্রাস্ট ফান্ড-এর অর্থে ১নং এক্স-রে ইউনিটের উদ্বোধন হয়। কালিদাস মল্লিক প্রদত্ত এক লক্ষ টাকার অধিক ব্যয়ে এই ইউনিটের রূপায়ণ সম্ভব হয়। পলিক্লিনিকে সর্বপ্রকার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে কলিকাতা সুবর্ণবণিক সমাজ দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

কলিকাতা সুবর্ণবণিক সমাজ তাঁদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের সবঙ্গীণ উন্নতির উজ্জ্বল দীপশিখাটি আজও অনির্বাণ রেখেছেন।[২৩]

কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা এরপর সিটি সেন্টারের সঙ্গে নতুন হাওড়া ব্রিজের যোগাযোগে তৎপর হন। দুটি পরিকল্পনা এই উদ্দেশ্যে রচিত হয়। এর ফলে যে নতুন রাজপথটি তৈরি হল সেটি ১০০ ফুট চওড়া এবং ১০৫০ গজ দীর্ঘ। প্রকল্প দুটির বিবরণ এইরূপ—

| প্রকল্প সূচক সংখ্যা (Scheme No) | প্রকল্পের নাম | জমি অধিগ্রহণের পরিমাণ | জমির মূল্য | কাজ আরম্ভ |
|---|---|---|---|---|
| XLV | হাওড়া ব্রিজ অ্যাপ্রোচ : ডালহাউসি স্কোয়ার নর্থ থেকে ক্যানিং স্ট্রিট | ১৬·৬৮ একর | টাঃ ৬৩,০০,০০০ | ৩.১২.১৯৩৬ |
| L | হাওড়া ব্রিজ অ্যাপ্রোচ : ক্যানিং স্ট্রিট থেকে স্ট্র্যান্ড রোড | ১০·২৩ একর | টাঃ ৭৮,২৫,০০০ | ১০.৩.১৯৩৮ |

পরবর্তীকালে এই রাস্তা ব্রাবোর্ন রোড নামে নামাঙ্কিত হয়। রাজপথটি ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়। রাস্তাটি তৈরি করতে প্রায় ২ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছিল। এই শতাব্দীর সাতের দশকে রাস্তাটির পুনরায় নাম বদল করে বিপ্লবী ত্রৈলোক্য মহারাজ সরণি রাখা হয়। রাস্তাটি নির্মিত হওয়ায় হ্যারিসন রোডের উপর যানজটের চাপ উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পায় এবং দক্ষিণ কলিকাতা থেকে হাওড়া স্টেশনের গন্তব্যপথ অনেক সহজসাধ্য হয়।

কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা যখন স্থাপিত হয় সে সময় দক্ষিণ কলিকাতার অধিকাংশ এলাকাই ছিল নিচু জলাভূমি ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ, ভবানীপুরের মতো ঘিঞ্জি অঞ্চলের মধ্য দিয়ে ছিল তার প্রবেশপথ। কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা এই অঞ্চলকে নগরায়ণের মাধ্যমে কলিকাতার ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার পুনর্বাসনের প্রয়াসে যত্নবান হন। এই অঞ্চলে কোনও উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করার পূর্বে সর্বাগ্রে প্রয়োজন জমি পুনরুদ্ধারের বিষয়ে তৎপর হওয়া। এই উদ্দেশ্যে কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা কলিকাতা পৌর এলাকার দক্ষিণ সীমানায় অবস্থিত ১৯০·৭৪ একর জমি বি. অ্যান্ড এ. রেলওয়ের

(বজবজ শাখা) ধারে অবস্থিত দুটি অংশে ক্রয় করেন। বারোজ রোড (Baroj Road) এই দুই জমির সীমানা ছিল। দুটি জমির কাজ এক সঙ্গে আরম্ভ হয়। একটি অংশের জমিতে খননের কাজ শুরু হয়। খননের মৃত্তিকা দিয়ে অন্য অংশের জমি ভরাটের কাজ ত্বরান্বিত করা হয়। কলিকাতার দক্ষিণে এই প্রকল্পগুলি রূপায়ণের ফলে পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত দুটি গুরুত্বপূর্ণ সমান্তরাল রাস্তা নির্মিত হয়েছিল। উভয় রাস্তাই পূর্ব দিকে গড়িয়াহাট রোড এবং পশ্চিমদিকে রসা রোডের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিল। প্রথম রাস্তাটির নাম রাসবিহারী অ্যাভিনিউ। এটি ১২০ ফুট প্রশস্ত, মধ্যে ঘাসে ঢাকা ট্রাম চলাচলের পথ। দু-পাশে যান চলাচলের রাস্তা, আর আছে চওড়া ফুটপাত। এই রাজপথের ভূগর্ভে আছে ৯ ফুট ব্যাসের পয়ঃপ্রণালী। এটি নির্মাণে খরচ হয়েছিল প্রায় ১ কোটি টাকা। প্রথমে এটিকে "মেন সিউয়ার রোড" (Main Sewer Road) বলা হত। এই নামে আপত্তি হওয়ায় কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা এই প্রশস্ত পথটির নতুন নামকরণের এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন : ''Untill the new Main Road in Scheme No. XV B from Gariahat Road to the junction with Lake Road which is generally referred to as Main Sewer Road is taken over and named by the Corpn., it will be described in all documents and correspondence of the Trust as Ballygunge Avenue''. এই নতুন নামকরণে জনসাধারণ সন্তোষ প্রকাশ করেন (Calcutta Municipal Gazette, March 2, 1929 p-668)। কলিকাতা পুরসভা ১৯২৯ খ্রিঃ রাস্তাটির ভার গ্রহণ করেন। ওই বছরই রাস্তাটি লব্ধপ্রতিষ্ঠিত আইনজীবী রাসবিহারী ঘোষের নামে নামাঙ্কিত করার প্রস্তাব পুরসভার বিবেচনার জন্য পেশ করা হয়। পুরসভা ২০শে মে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের অধিবেশনে ওই প্রস্তাব অনুমোদন করেন। বালিগঞ্জ অ্যাভিনিউ নতুন নামে নামাঙ্কিত হল 'রাসবিহারী অ্যাভিনিউ'।

কলিকাতা হাইকোর্টের স্বনামধন্য আইনজীবী, অসাধারণ বাগ্মী ও দানবীর রাসবিহারী ঘোষ (১৮৪৫-১৯২১) বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যশিক্ষা বর্ধমান ও বাঁকুড়ায়। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৮৬৬ খ্রিঃ প্রথম স্থান অধিকার করে এম. এ. পাশ করেন। পরের বছরে প্রথম স্থান অধিকার করে বি. এল. পাশ করেন। কিছুকাল বহরমপুর কলেজে ইংরেজি সাহিত্য ও গণিতের অধ্যাপক হয়েছিলেন। পরে বরিশালে ওকালতি শুরু করেন। ১৮৭২ খ্রিঃ কলিকাতায় ফিরে এসে হাইকোর্টে আইনব্যবসায় আরম্ভ করেন। খ্যাতি, অর্থ ও প্রতিপত্তি তখন থেকেই শুরু। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রসন্নকুমার প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর আইন অধ্যাপকরূপে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন (১৮৭৫-৭৬), তাই পরবর্তীকালে রেহান আইন সম্বন্ধে প্রামাণ্যগ্রন্থ রূপে স্বীকৃতি পেয়েছে। ১৮৮৪ খ্রিঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি. এল. উপাধিতে ভূষিত করেন।

রাসবিহারী জাতীয় কংগ্রেসের সহিত নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের কলিকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে অভ্যর্থনা সভার সভাপতি হয়েছিলেন। ১৯০৭ খ্রিঃ সুরাটে কংগ্রেস অধিবেশনের এবং ১৯০৮ খ্রিঃ মাদ্রাজ অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। এ ছাড়া বঙ্গীয় আইন পরিষদের (১৮৮৩-১৮৯০), কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের (১৮৯১-৯৪ এবং ১৯০৬-০৯ খ্রিঃ) সদস্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট, সিন্ডিকেট ও আইন ফ্যাকাল্‌টির সভ্য হন। ১৯১৫ খ্রিঃ ব্রিটিশ সরকার তাঁকে নাইট খেতাবে ভূষিত করেন।

রাসবিহারী ঘোষ স্বদেশি আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন। ১৯০৫ খ্রিঃ যে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ স্থাপিত হয় তিনি তার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও আজীবন সভাপতি ছিলেন। উইলে জাতীয় শিক্ষা পরিষদকে ১২ লক্ষ টাকা দিয়ে যান। যাদবপুরে এই শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয়, বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় নামে খ্যাত। বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার জন্য ১৯১৩ খ্রিঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ১০ লক্ষ টাকা দান করেন। পরে আরও অর্থ দিয়েছিলেন। এ ছাড়াও বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ (আর. জি. কর. কলেজ) তাঁর দানে সমৃদ্ধ হয়েছিল।

রাসবিহারী ৩৩, জাজেস কোর্ট রোড, আলিপুরে বাস করতেন। বাড়িটির নাম ছিল ''Sau Souci House''.

দ্বিতীয় পথটির নামকরণ হয়েছিল সাদার্ন অ্যাভিনিউ। এটি ১৫০ ফুট প্রশস্ত রাজপথ, মধ্যে

আছে গাছ-গাছালিতে ভরা বুলেভার্ড (Boulevard)। ১৯৪২ খ্রিঃ এটির নির্মাণকার্য সমাধা হয়। এই দুই রাস্তা ছাড়া রসা রোডও প্রশস্ত করার ব্যবস্থা হয়। এই অঞ্চলের উন্নয়ন প্রকল্পগুলির সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হল—

| প্রকল্প সূচক সংখ্যা (Scheme No) | প্রকল্পের নাম | জমি অধিগ্রহণের পরিমাণ | জমির মূল্য | কাজ আরম্ভ / সমাপ্তি |
|---|---|---|---|---|
| XVB | রাসবিহারী অ্যাভিনিউ | ১৫১·২৮ একর | টাঃ ৩৭,০০,০০০ | ১৬.১১.১৯২০ / ১৯২৯ |
| XXXIII | সাদার্ন অ্যাভিনিউ (১ম অংশ) | ১৩৫·৫৩ একর | টাঃ ৭,৭৫,০০০ | ১৯৩০ / ১৯৩৩ |
| XLVII | সাদার্ন অ্যাভিনিউ (পূর্ব অংশ) | ১২০·৭১ একর | টাঃ ১,০০,০০০ | ১৯.৬.১৯৩৭ / ১৯৪২ |

প্রথম রাস্তাটির কথা আগেই বলা হয়েছে। এবার দ্বিতীয় রাস্তাটির কথা। এটি খণ্ডে খণ্ডে তৈরি হয়েছিল। প্রথমে ১২০ ফুট প্রশস্ত করে টালিগঞ্জ থানার বিপরীত দিক পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। কলিকাতা পুরসভা তাঁদের ২৩শে আগস্ট ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের অধিবেশনে এই রাস্তার "সাদার্ন অ্যাভিনিউ" নামকরণ করেন। এই রাস্তার দ্বিতীয় অংশ নির্মিত হলে পুরসভা ২০শে, জুলাই ১৯৩৯ খ্রিঃ কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থার কাছ থেকে রাস্তাটির ভার গ্রহণ করেন। তৃতীয় পর্ব পুরসভার কর্তৃত্বাধীনে আসে ২০শে মে ১৯৪২ খ্রিঃ।

সমস্ত রাস্তাটি "সাদার্ন অ্যাভিনিউ" নামে নামঙ্কিত হয়। রাস্তাটির মোট দৈর্ঘ্য ২৫৬৭ গজ। প্রস্থ ১৫০ ফুট। মাঝখানে ঘাসে ঢাকা বুলেভার্ডের প্রস্থ ৫৮ ফুট, দুদিকে যান চলাচলের জন্য ২৪ ফুট করে ৪৮ ফুট রাস্তা, আর দু-পাশে ২২ ফুট করে প্রশস্ত ফুটপাতের ব্যবস্থা আছে। রাস্তাটির দক্ষিণ দিকে রয়েছে বিস্তীর্ণ লেক এলাকা আর উত্তরে আছে গৃহ নির্মাণের অসংখ্য টুকরো টুকরো জমি। পরবর্তীকালে এই সব জমিতে বহুতল অট্টালিকা নির্মিত হয়েছে। রাস্তাটি নির্মাণে মোট ব্যয় হয়েছিল টাঃ ১১,১৯,১৩৩।

ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময় "সাদার্ন অ্যাভিনিউ"-এর নাম পরিবর্তন করে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানী ড. মেঘনাদ সাহার নামে নামকরণের এক প্রস্তাব আসে। পুরসভা এই প্রস্তাবটি অনুমোদন করেন। সাদার্ন অ্যাভিনিউ এইভাবে 'ড. মেঘনাদ সাহা সরণি' নামাঙ্কিত হয়।

বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ ও দেশসেবক ড. মেঘনাদ সাহা (১৮৯৩-১৯৫৬) ঢাকার অন্তর্গত সেওড়াতলীতে জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা কলেজ থেকে আই. এস-সি.তে তৃতীয় হয়ে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি. এস-সি. ও এম. এস-সি. পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। ১৯১৮ খ্রিঃ বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন। এখানে অধ্যাপনার সঙ্গে গবেষণার কাজও আরম্ভ করেন। পরপর দুই বছরে ডি. এস-সি ও পি. আর. এস. হন। গবেষণার বিষয় ছিল Relativity, Pressure of Light ও Astro-Physics। এরপর ১৯২০ খ্রিঃ Theory of Thermal Ionisation বিষয়ে গবেষণার দ্বারা তিনি যে তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন সেটির ব্যবহারিক প্রয়োগ প্রদর্শনের আমন্ত্রণ পেয়ে লন্ডন ও বার্লিনে গমন করেন। দুই বছর পরে ভারতে ফিরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে "খয়রা অধ্যাপক" নিযুক্ত হন। ১৯২৩ খ্রিঃ এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। শিক্ষক হিসাবে তিনি পৃথিবীজোড়া খ্যাতি পেয়েছিলেন। ১৯৩৮ খ্রিঃ মেঘনাদ সাহা কলিকাতায় ফিরে বিজ্ঞান কলেজে 'পালিত অধ্যাপক' হন, পরে স্থাপন করেন ''Institute of Nuclear Physics''। ১৯৩৪ খ্রিঃ বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি হন। তিনি সর্বপ্রথম ভারতের সার্বিক উন্নতিতে বিজ্ঞান প্রয়োগের কথা বলেন।

ড. সাহা নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটি, ফ্রেঞ্চ অ্যাসট্রোনমিক্যাল সোসাইটি, বোস্টন অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স প্রভৃতির ফেলো, ইন্টারন্যাশনাল

অ্যাসট্রোনমিক্যাল ইউনিয়ন, ভারতীয় বিজ্ঞান সভা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট ও সিন্ডিকেট প্রভৃতির সদস্য ছিলেন। ড. সাহার চেষ্টায় 'Indian Association for the Cultivation of Science' ও 'Glass Ceramic Research Institute' ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

ড. সাহা অসংখ্য প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর রচিত কয়েকটি বিখ্যাত পুস্তক— Principle of Relativity, Treaties on Heat, Treaties of Modern Physics ইত্যাদি।

দিল্লির রাষ্ট্রপতি ভবনে পরিকল্পনা কমিশনের সভায় যাবার পথে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর তাঁর প্রতিষ্ঠিত Instituteএর নামকরণ হয় Saha Institute of Nuclear Physics (সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান)।

এই দুই প্রধান রাজপথ তৈরি ছাড়াও আরও অনেকগুলি শাখাপথ নির্মাণ করে কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা এই গ্রাম্য অঞ্চলের সার্বিক পরিবর্তনের মাধ্যমে একে নগরায়ণের পাদপ্রদীপে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন। রাজপথ ও শাখাপথ ছাড়াও এখানে নির্মিত হয়েছে এক বিরাট সরোবর। এটি ১৯০·৭৪ একর জমির উপর অবস্থিত। সে সময় এটিকে ঢাকুরিয়া লেক বলা হত। পরবর্তীকালে এটির নতুন নাম হয় 'রবীন্দ্র সরোবর'। শুধু তাই নয়, এই অঞ্চলের নবনির্মিত পথগুলির নামকরণের মধ্যে সেকালের কলিকাতা পুরসভার সূক্ষ্ম রুচিবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। নামকরণ প্রয়াসের মাধ্যমে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক স্মৃতি-বিজড়িত শ্রেষ্ঠ পুরুষদের নামে রাস্তাগুলি নামাঙ্কিত করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তবে একটা বিষয়ে আশ্চর্য হতে হয় যে এতগুলি রাস্তার মধ্যে একটিও কোনও মহিলার নামে নামাঙ্কিত করা হয়নি।

এই এলাকার নবনির্মিত রাস্তা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা পাওয়ার জন্য একটা রেখাচিত্রও দেওয়া হল।

কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা এরপর কলিকাতার পূর্বাঞ্চল উন্নয়নের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। অঞ্চলটি মানিকতলা ডিস্ট্রিক্টের অন্তর্গত। সাত স্কোয়ার মাইল জুড়ে এলাকাটির আয়তন। সে সময় অর্থাৎ ১৯৪৮ খ্রিঃ যখন এ অঞ্চলের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তখন এখানকার লোকসংখ্যা ছিল ২,৭০,০০০। ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালীর কোনও ব্যবস্থা ছিল না। ১৯৪৮ খ্রিঃ কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা যখন মানিকতলা উন্নয়নের জন্য এক সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা করেন তখন তাঁদের প্রধান লক্ষ্য ছিল একটি সুপ্রশস্ত উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রসারিত (North-South Corridor) রাস্তার ব্যবস্থা করা। রাস্তাটি উত্তরে উল্টাডিঙ্গি থেকে আরম্ভ হয়ে দক্ষিণে বেলেঘাটায় গিয়ে শেষ হবে। নির্মাণের পর রাস্তাটি কোথাও ১০০ ফুট আবার কোথাও বা ১২০ ফুট চওড়া করা হয়। মাঝখানে ট্রাম চলাচলের জন্য বুলেভার্ডের ব্যবস্থা থাকে।

রাস্তা নির্মাণের সঙ্গে সুষ্ঠু নিকাশী ব্যবস্থার প্রতিও দৃষ্টি দেওয়া হয়েছিল। উল্টাডিঙ্গি ও মানিকতলা অঞ্চলের পয়ঃপ্রণালী ও বর্ষার জল নিষ্কাশনের জন্য ১০ ফুট ব্যাসযুক্ত ইঁটের পয়ঃপ্রণালী এই দীর্ঘ রাস্তাটির অভ্যন্তরে নির্মাণ করা হয়েছিল। এই পয়ঃপ্রণালীর জল সরবরাহকে ধাপা লক পাম্পিং স্টেশনে (Dhapa Lock Pumping Station) নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হয়েছিল। এর জন্য উল্টাডিঙ্গিতে একটি পাম্পিং স্টেশন স্থাপন করা হয়।[২৪]

উন্নয়ন পরিকল্পনা সমাপ্তির পর মানিকতলা, বেলেঘাটা ও নারকেলডাঙা অঞ্চলের আমূল পরিবর্তন হয়ে যায়। সমস্ত বস্তি উচ্ছেদ করে চওড়া রাস্তা, উদ্যান এবং বেলেঘাটায় একটি সরোবর করা হয়। পরবর্তীকালে এই সরোবরের নাম রাখা হয় 'সুভাষ সরোবর'। কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থার পরিকল্পনা রূপায়ণের ফলে মানিকতলা, নারকেলডাঙায় অনেকগুলি নতুন রাস্তা ও উদ্যান তৈরি হয়। একমাত্র আচার্য সত্যেন বসু সরণি ও হেমচন্দ্র নস্কর রোড ছাড়া আর কোনও রাস্তার নামকরণ

১ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ
২ সাদার্ন অ্যাভিনিউ
৩ রসা রোড সাউথ
৪ গড়িয়াহাট রোড
৫ ইস্ট-ইন্ডিয়া রেলওয়ে, বজবজ শাখা
৬ হিন্দুস্থান পার্ক
৭ মনোহরপুকুর রোড
৮ কেয়াতলা রোড
৯ যতীন বাগ্‌চি রোড
১০ যতীন দাস রোড
১১ লেক টেরাস্
১২ লেক রোড
১৩ রাজা বসন্ত রায় রোড
১৪ লেক ভিউ রোড
১৫ ল্যান্সডাউন রোড
১৬ মহারাজা নন্দকুমার রোড
১৭ জনক রোড
১৮ পরাশর রোড
১৯ সর্দার শঙ্কর রোড
২০ শরৎ চ্যাটার্জ্জী অ্যাভিনিউ
২১ লেক টেম্পল রোড
২২ লেক অ্যাভিনিউ
২৩ লেক প্লেস
২৪ এস. আর. দাস রোড
২৫ সাউথএন্ড পার্ক
২৬ বারোজ রোড
২৭ লেক ব্লক এ বি সি ডি
২৮ ডাঃ শরৎ ব্যানার্জি রোড
২৯ আবদুল রসুল অ্যাভিনিউ

বালিগঞ্জ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ এবং লেক অঞ্চলের রেখাচিত্র

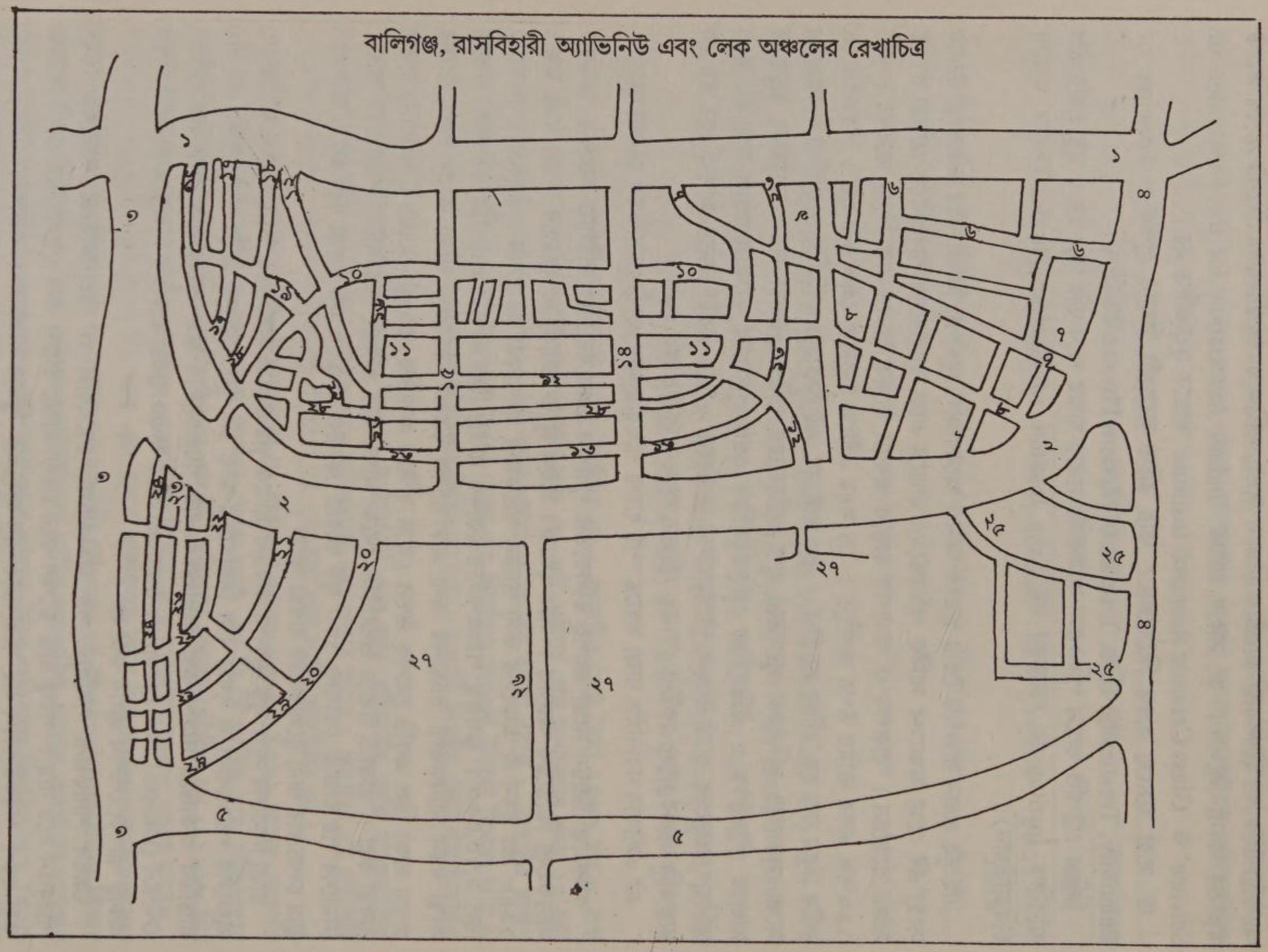

করা হয়নি। ওই রাস্তাগুলি আজও সি. আই. টি. রাস্তা নামে পরিচিত। এলাকাটি সম্বন্ধে সম্যক উপলব্ধির জন্য ওই অঞ্চলের একটি সামগ্রিক রেখাচিত্র দেওয়া হল।

পূর্ব-কলিকাতা অঞ্চল উন্নয়নের রেখাচিত্র

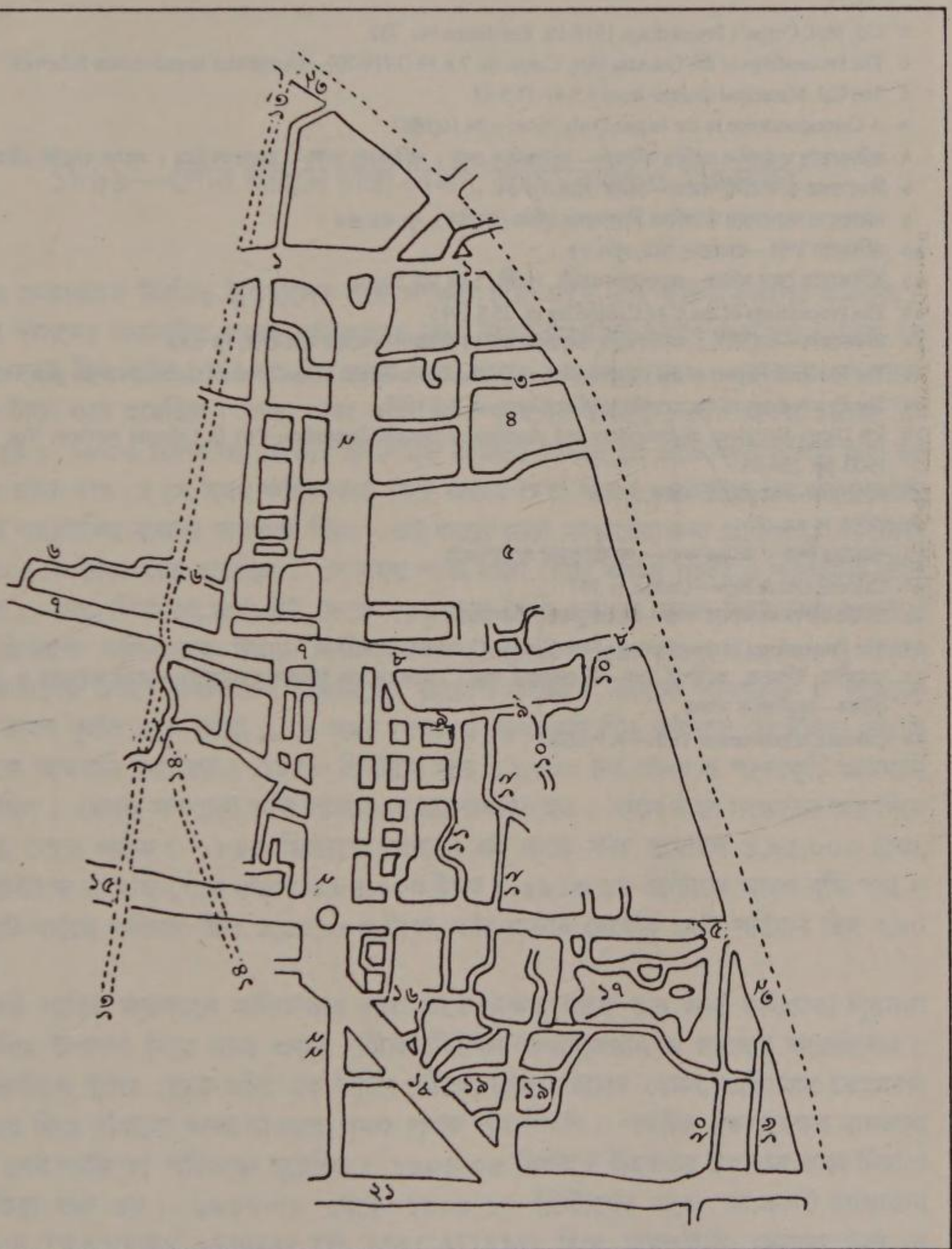

১ বিধাননগর রোড
২ আচার্য সত্যেন বসু সরণি
৩ বিধান শিশু সরণি
৪ বিধান শিশু উদ্যান
৫ কবরখানা
৬ বাগমারি রোড
৭ সতীন সেন সরণি
৮ মানিকতলা মেন রোড
৯ রামকৃষ্ণ সমাধি রোড
১০ যোগোদ্যান রোড
১১ মতিলাল বসাক লেন
১২ শিবকৃষ্ট দাঁ লেন
১৩ ইস্টার্ন রেলপথ
১৪ কাঁকুড়গাছি কর্ড রেলপথ
১৫ মওলানা আবুল কালাম আজাদ সরণি
১৬ সুরেন সরকার রোড
১৭ সুভাষ সরোবর
১৮ হেমচন্দ্র নস্কর রোড
১৯ ডাঃ আশুতোষ শাস্ত্রী রোড
২০ রাধামাধব দত্ত গার্ডেন লেন
২১ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জি রোড
২২ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড
২৩ নিউ কাট ক্যানেল

## তথ্যসূত্র


১ Calcutta Improvement Trust—A profile published by C.I.T.

২ City and Suburban Main Road Projects (1913), Joint Report by James Maden & Albert De Bois Shrosbree, pp. 24-25.

৩ Cal. Mpl. Corpn's Proceedings 1918-19, Resolution No. 752.

৪ The Proceedings of the Calcutta Mpl, Corpn. dt. 7.8.19 (1919-20)—Burrobazar Improvement Schemes.

৫ The Cal. Municipal Gazette from 3.5.47-31.5.47

৬ A Correspondence in the Indian Daily News—24.10.1887.

৭ কলিকাতাস্থ তন্তুবণিক জাতির ইতিহাস—নগেন্দ্রনাথ শেঠ। কলিকাতা দর্পণ— রাধারমণ মিত্র। সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান

৮ বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ—বিনয় ঘোষ, পৃঃ ৫৬

৯ নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত বিদ্যাসাগর চরিত (স্বরচিত), পৃঃ ৩৯-৪০।

১০ কলিকাতা দর্পণ—রাধারমণ মিত্র, পৃষ্ঠা ৪৪।

১১ কলিকাতার জৈন মন্দির—গণেশলালওয়ানী, পুরশ্রী, ১৫ই মার্চ ১৯৮০

১২ The Proceedings of the C.M.C. Meeting dt. 25.8.1915.

১৩ ভারতকোষ—৩য় ভাগ। কলিকাতাস্থ তন্তুবণিক জাতির ইতিহাস—নগেন্দ্র নাথ শেঠ, পৃঃ ১৪৪

১৪ The Eleventh Report of the Commissioners for the Improvement of the Town of Calcutta for the year 1854.

১৫ The Proceedings of the meeting of Cal. Corpn. dt. 1.2.1928.

১৬ Ich Diem, Religious endowments and charities of Bengal Zamindars, Part II, Calcutta Review, Vol. III, Oct 1900, pp. 224-25.

১৭ বংশগৌরব—রাসবিহারী মল্লিক, পৃ ২৯

১৮ তদেব, পৃ ৩৪-৩৭

১৯ ভারতের শিল্প ও আমার কথা— অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

২০ Calcutta Old & New—Cotton, p. 767

২১ ভারতের শিল্প ও আমার কথা—অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ ৫

২২ The Proceedings of the meeting of the General Committee, 1890-91

২৩ বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, ১ম—নীহাররঞ্জন রায়। বাংলাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগে)—রমেশ মজুমদার। আমাদের গৌরব—সুবর্ণবণিক সমাজ

২৪ Calcutta Improvement Trust—A Profile

## ৩১

# ১৮৯৯—পৌর আইনে রাস্তা নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও সাজসজ্জা

রাস্তার ক্রমবর্ধমান উন্নতির ইতিহাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে আছে তার রক্ষণাবেক্ষণের কর্মধারা। কোম্পানি শাসনের অব্যবহিত পরেই কলিকাতায় নতুন নতুন রাস্তাঘাট নির্মাণ শুরু হয়। কিন্তু সে রাস্তাগুলি সবই ছিল কাঁচা। ১৮২০ খ্রিঃ রাস্তা পাকা করার কাজ শুরু হয়। এর জন্য সে বছরে ২৫,০০০ টাকা খরচ হয়েছিল। রাস্তা পাকা করার জন্য পাথরের ব্যবহার ১৮৩৪ অথবা ১৮৩৫ খ্রিঃ প্রবর্তিত হয়। ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দের ফিভার হসপিটাল কমিটির সামনে যে প্রতিবেদন দাখিল করা হয় তা থেকে জানা যায় যে সে সময় কলিকাতায় মোট রাস্তার দৈর্ঘ্য ছিল ১৭০ মাইল, এর মধ্যে অবশ্য কলিকাতা শহরতলির রাস্তাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। ওই বছরে রাস্তা সংস্কারের জন্য প্রায় ৪০,০০০ টাকা থেকে ৫০,০০০ টাকা খরচ হয়েছিল। সে সময় পাকা রাস্তা খোয়া অথবা পাথর ও পাথরকুচি দিয়ে তৈরি হত। রাস্তা নির্মাণের জন্য ইট ভেঙ্গে যে খোয়া তৈরি হত তা ক্রমশ নিম্নমানের হওয়াতে ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতার উন্নয়ন কমিশনারগণ (Improvement Commissioners) খোয়া সরবরাহকারীদের উপরে কতকগুলি বিধিনিষেধ আরোপ করেন। এদিকে পাথরকুচি ও পাথরের সরবরাহ ক্রমশ দুর্লভ হতে থাকে। সে সময় পাথর ও পাথরকুচি চিন, মরিশাস, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে আমদানি করা হত। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে প্রায় ১২,০০০ টন পাথর ও পাথরকুচি আমদানি করা হয়েছিল। দেশজ সম্পদের অতি সামান্য মাত্রায় ব্যবহৃত হত। ফলে রাস্তা সংস্কারের ব্যয় দিনে দিনে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে যেখানে এই খাতে খরচ হয়েছিল ১,৮৫;০০০ টাকা, ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩,৮৪,০০০ টাকা। ১৯১৩-১৪ খ্রিস্টাব্দে আরও বৃদ্ধি পায়। তখন মোট ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৪,৬৫,০০০ টাকা, আর রাস্তার দৈর্ঘ্যের মোট পরিমাণ ছিল ২৯০ মাইল।[১]

মালবাহী গাড়ির ভারবহনে কলিকাতার রাস্তা যাতে অক্ষত থাকে তার জন্য কলিকাতা পুরসভা রাস্তা তৈরির উপাদান নিয়ে নানা প্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা, তথ্যানুসন্ধান ও গবেষণা করেছিলেন। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে স্ট্র্যান্ড রোডে তাঁরা এক বিচিত্র পরীক্ষা চালিয়েছিলেন যেমন, ভারী যান চলাচলের জন্য পাথর দিয়ে বাঁধানো আসা-যাওয়ার পৃথক পৃথক পথ নির্মাণ। পথটির রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়বহুল হওয়াতে শেষ পর্যন্ত তা পরিত্যক্ত হয়েছিল। ১৯০৪-০৫ খ্রিস্টাব্দে উন্নততর উপাদান রাস্তা নির্মাণে ব্যবহার করা শুরু হয়। ১৯০৭-০৮ থেকে ১৯০৯-১০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে অ্যাসফল্ট ম্যাকাডাম (VAL-DE-TRAVERS-ASPHALTE MACADAM) দিয়ে ডালহৌসি স্কোয়ার ইস্ট ও কলেজ স্ট্রিট নির্মিত হয়। এতে রাস্তার উপরিভাগ মসৃণ হলেও তার আয়ু ছিল ক্ষণস্থায়ী। কাজেই এ পরীক্ষাও বাতিল করতে হল।

১৯১০ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা পুরসভা মেসার্স বার্ড কোম্পানির "ধূলিশূন্য রাস্তা নির্মাণের প্রকল্প" (Dustless Road Scheme) নিয়ে বিচার-বিবেচনা শুরু করেন। বার্ড কোম্পানি তাঁদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছিলেন যে এই পদ্ধতি ইংল্যান্ডে ব্যবহার করে সুফল পাওয়া গেছে। এর নির্মাণকৌশল সম্বন্ধে বলা হয়েছিল যে রাস্তায় এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হবে, সেই রাস্তার উপরকার আবরণ ৩" গভীর করে তুলে ফেলে ওই স্থানে বার্ড কোম্পানির আবিষ্কৃত মিশ্রণটি ঢেলে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে

হবে। পরে ভারী স্টিম রোলার চালিয়ে রাস্তাটি মসৃণ করা হবে। রাস্তাটি হবে জলপ্রতিষেধক ও সম্পূর্ণ ধূলিমুক্ত। এই রাস্তার সংস্কার ব্যয় খুব কম, তা ছাড়া রাস্তাটি দীর্ঘস্থায়ী হবে।

কলিকাতা পুরসভা ১৪ জানুয়ারি ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন।[২]

ওই বছরই বার্ড কোম্পানি নতুন আরেকটি প্রস্তাব পেশ করেন। তাতে বলা হয়েছিল ১০০০ গজ রাস্তা লিথোফল্ট ব্লক (Lithofalt Blocks) দিয়ে নির্মাণ করে দেবেন। লিথোফল্ট ব্লক মেসার্স লিমর অ্যাসফল্ট পেভিং কোম্পানি (M/s Limmer Asphalts Paving Co. Ltd) প্রস্তুত করেছিলেন। কলিকাতা পুরসভা তাঁদের ১২ই মার্চ ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের অধিবেশনে এই প্রস্তাব অনুমোদন করেন। এবং রাইটার্স্ বিল্ডিং এর সামনে ডালহৌসি স্কোয়ার নর্থ রাজপথটি লিথোফল্ট ব্লক দিয়ে নির্মাণের আদেশ দেন।[৩]

১৯১০-১১ খ্রিস্টাব্দে মেসার্স বার্ড কোম্পানি নতুন মিশ্রণ দিয়ে ক্লাইভ স্ট্রিটের অংশবিশেষ (ফেয়ারলি প্লেসের দক্ষিণ দিক) ও লায়ন্স রেঞ্জ (নিউচায়না বাজার স্ট্রিটের পশ্চিম দিক) নির্মাণ করেন। এই মিশ্রিত উপাদানটির নাম ছিল গ্লাডওয়েল সিস্টেম (Gladwell System)। পরীক্ষায় এটিও বিফল হয়।[৪]

কলিকাতা পুরসভার তৎকালীন চিফ্ ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ম্যাক্কাবে (Mr. Maccabe) গ্লাডওয়েল সিস্টেমের এক উন্নততর সংস্করণ আবিষ্কার করেন। ম্যাক্কাবের উদ্ভাবিত মিশ্রণটি কলিকাতার রাস্তার পক্ষে খুবই কার্যকর হয়েছিল। এটির নামকরণ হয়েছিল ম্যাক্কাবে সিস্টেম। যদিও সাধারণ ম্যাকাডামের তুলনায় এই মিশ্রণটির প্রাথমিক ব্যয় খুব বেশি, এই মিশ্রণ ব্যবহারের ফলে রাস্তার পরমায়ু দীর্ঘস্থায়ী হয়। প্রথমে লায়ন্স রেঞ্জ, পরে এসপ্লানেড রো ইস্ট, ধর্মতলা স্ট্রিটের মুখ থেকে লিন্ডসে স্ট্রিটের মধ্যবর্তী চৌরঙ্গী অঞ্চল এই প্রক্রিয়ায় নির্মিত হয়। এই খাতে মোট ব্যয় হয় ২৮,৪০০ টাকা। ১৯১৩-১৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ম্যাক্কাবে পদ্ধতিতে ৪২,০০০ বর্গগজ রাস্তা সংস্কারের ব্যবস্থা করা হয়। এর জন্য মোট ব্যয় হয়েছিল ৯৯,০০০ টাকা। কিন্তু ভারী যানবাহনের জন্য উপযুক্ত রাস্তা তখনও পর্যন্ত পুরসভা উদ্ভাবন করতে সমর্থ হননি।[৫]

সে সময় হ্যারিসন রোডে ও স্ট্র্যান্ড রোডে গরু ও মোষের গাড়ির চলাচল ছিল খুব বেশি। ফলে রাস্তাঘাটের অবস্থা হত শোচনীয়। বার্ন কোম্পানি এই সমস্যা সমাধানে রাস্তা নির্মাণের এক নতুন পদ্ধতি নিয়ে এগিয়ে এলেন—সিমেন্ট দিয়ে রাস্তার তলভূমি নির্মাণ করে তার উপর "Wire-cut-brick" সাজিয়ে দেবার পর সিমেন্ট কংক্রিটের ঢালাই-এর ব্যবস্থা করা হয়। ১৯১৪-১৫ খ্রিস্টাব্দে স্ট্র্যান্ড রোডের মুখ থেকে শুরু হওয়া হ্যারিসন রোডের কিছু অংশ বার্ন কোম্পানি তাঁদের নতুন উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে নির্মাণ করে দেন। ৪৮,২৫০ বর্গ গজ রাস্তা নির্মাণে ব্যয় হয়েছিল ৩২৩১ টাকা।[৬]

এরপর ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা পুরসভা নতুন একটি উপাদান দিয়ে রাস্তা নির্মাণে তৎপর হন। এটির ইংরেজি নাম "গ্রানোলিথিক পেভিং" (Granolithic Paving)। এই পদ্ধতিতে কলিকাতার রাস্তা নির্মাণের জন্য ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ের রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার মিঃ জে. আর. ওয়েল্ড (Mr. J.R. Wylde) সুপারিশ করেন। তিনি তাঁর প্রতিবেদনে লিখেছিলেন যে হাওড়া স্টেশনের চতুষ্পার্শে এই পদ্ধতিতে রাস্তা তৈরি করে সুফল পেয়েছেন। পুরসভা তাঁদের ৯ জুন ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের অধিবেশনে এই সুপারিশ গ্রহণ করেন এবং তা কার্যকর করার জন্য কলিকাতার একটি ভারী যানবাহন চলাচলকারী সড়ক নির্বাচন করে এই পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য ১নং ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ারকে নির্দেশ দেন। এই প্রকল্প রূপায়ণের জন্য ১০,০০০ টাকা মঞ্জুর করা হয়। মঞ্জুরীকৃত অর্থ দিয়ে স্ট্র্যান্ড রোড ও ক্রস স্ট্রিট গ্রানোলিথিক পদ্ধতিতে নির্মাণ করা হয়।[৭] প্রথমে স্ট্র্যান্ড রোডে অবস্থিত টাঁকশালের সামনের রাস্তা এই পদ্ধতিতে তৈরি হয় এবং রাস্তাটি যানবাহন চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয় ২৬ মে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে। আর ক্রস স্ট্রিট খোলা হয় ৯ জুন ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে।

রাস্তাকে দীর্ঘস্থায়ী ও মজবুত করে গড়ে তোলার জন্য রাস্তা নির্মাণে উপাদান নির্বাচনের বিষয়ে বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষার আশ্রয় নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতা পুরসভা নতুন একটি উপাদানের সাহায্যে রাস্তা নির্মাণে ব্রতী হন। তা ছিল কলিকাতা শহরের কয়েকটি রাজপথকে কাষ্ঠনির্মিত করার

প্রয়াস। এই প্রকল্পের ইতিহাস যেমন আকর্ষণীয় তেমনি চমকপ্রদ।

১৯০২ খ্রিস্টাব্দের কথা। কলিকাতা পুরসভার তৎকালীন ইঞ্জিনিয়ার মিঃ বল হীল (Mr. Ball Hill) ব্রহ্মদেশের রাজধানী রেঙ্গুন ভ্রমণে যান। রেঙ্গুন পুরসভা সেগুন কাঠের তক্তা দিয়ে সব রাস্তা তৈরি করায় চমৎকৃত হন। এই রাস্তাগুলি সুদৃঢ়, মজবুত ও দীর্ঘস্থায়ী। তিনি সঙ্গে সঙ্গে স্থির করলেন যে কলিকাতার রাস্তায় সেগুন কাঠ দিয়ে রাস্তা নির্মাণের এক পরীক্ষা চালাবেন। সেই মতো ১৯০২-০৩ খ্রিস্টাব্দের শীতকালে ক্লাইভ ঘাট স্ট্রিটের রাস্তায় কাঠ দিয়ে নির্মাণের প্রথম পরীক্ষা শুরু হয়। গ্লাডস্টোন উইলি (Messrs Gladston Wyllie) নামে একটি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কাঠের তক্তা সরবরাহ করেছিল এবং এ. এম. চৌধুরী নামে আরেকটি সংস্থা ওই তক্তা বিছিয়ে রাস্তা তৈরি করেছিলেন। প্রতি বর্গগজ ১৮ টাকা হিসাবে এই রাস্তা নির্মাণে ব্যয় হয়েছিল। কাঠের তক্তার আকার ছিল ৬″ × ৯″ × ৩″। ৬″ খোয়া পিটিয়ে তলদেশ তৈরি করে তার উপর ১″ সিমেন্টের প্রলেপ দেওয়া হয়। পরে তার উপর কাঠের খণ্ড সাজিয়ে রাস্তা তৈরি হয়। কাঠের তৈরি কলিকাতা শহরের প্রথম রাস্তা দীর্ঘ দিন স্থায়ী হয়েছিল।

ওই একই বছরে মিলার কোম্পানি কলিকাতা পুরসভাকে এক প্রস্তাব দিলেন যে ওল্ড কোর্ট হাউসের ১০০ গজ রাস্তা তাঁরা জারা কাঠ (Jarra Wood) দিয়ে বিনামূল্যে নির্মাণ করে দেবেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটি দেউলিয়া হয়ে যাওয়াতে এই প্রস্তাব আর রূপায়িত হয়নি।

১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে পুলিশ আদালতের বিচারকগণ সরকারের কাছে এই মর্মে নালিশ জানালেন যে পাথরের রাস্তার ঘড় ঘড় আওয়াজ আদালতের কাজকর্মের বিঘ্ন ঘটায়। এর একটা সুরাহা হওয়া দরকার। তৎকালীন সরকার প্রস্তাব দিলেন যে পুলিশ আদালতের সম্মুখের পথ কাঠের তৈরি করা হোক। কিন্তু কলিকাতা পুরসভার চিফ্ ইঞ্জিনিয়ার এই প্রস্তাবের তীব্র আপত্তি জানিয়েছিলেন এই কারণে যে গ্রীষ্মকালে কাঠের তৈরি রাস্তা থেকে দুর্গন্ধ বার হবে এবং কাঠের জোড়া মুখ ফাঁক হয়ে বিপদের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করবে। তিনি উল্টে প্রস্তাব দিয়েছিলেন পাথরের রাস্তার বদলে অ্যাসফাল্টামের রাস্তা তৈরি হোক, এই প্রকারের রাস্তা দীর্ঘস্থায়ী হবে এবং আওয়াজ বন্ধ হবে। ফলে সরকারের প্রস্তাব রদ হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে কাঠের রাস্তা নির্মাণের আরও কতকগুলি প্রস্তাব এল—তাতে সুপারিশ করা হয়েছিল ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, গভর্নমেন্ট প্লেস ইস্ট, এসপ্লানেড রো ইস্ট প্রভৃতি রাজপথগুলি কাঠের তৈরির ব্যবস্থা হোক। সম্ভাব্য ব্যয় বরাদ্দের হিসাবও তৈরি হয়েছিল। বাদ সাধলেন চিফ ইঞ্জিনিয়ার। তিনি তাঁর পুরানো মন্তব্যের পুনরাবৃত্তি করলেন। তাঁর সঙ্গে সুর মেলালেন কলিকাতা পুরসভার হেলথ অফিসার। তিনি বললেন, লন্ডনে কাঠের তৈরি রাস্তাতে দুর্গন্ধে টেকা দায়। মাঝে মাঝে লন্ডনের রাস্তা দুর্গন্ধ নিবারক আরক দিয়ে ধুইয়ে দেবার ব্যবস্থা হয়। ওই ব্যবস্থা কলিকাতায় আমদানি করতে নিষেধ করলেন। পুরসভা তখন চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে ক্লাইভ ঘাট স্ট্রিটের কাঠের রাস্তার অবস্থার কথা জানাতে বললেন। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি তাঁর প্রতিবেদনে ক্লাইভ ঘাট স্ট্রিটের কাঠের রাস্তার অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে রাস্তাটির অবস্থা খুবই সন্তোষজনক এবং আরও কয়েক বছর স্থায়ী হবে। সেই সঙ্গে উল্লেখ করতে ভোলেননি যে কাঠের রাস্তার চেয়ে সিমেন্ট কংক্রিটের রাস্তার স্থায়িত্ব বেশি এবং খরচও কম।

১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স কিলবার্ন কোম্পানির চিঠি পুরসভাকে পাঠিয়ে দেবার সময় কলিকাতার রাস্তা কাঠ অথবা অন্য কোন উপযুক্ত উপাদান দিয়ে নির্মাণের পরামর্শ দেন, কেননা বর্তমানে যে উপাদান দিয়ে রাস্তা তৈরি হচ্ছে সে রাস্তা দ্রুত গতিশীল মোটর গাড়ির মতো যানের চাপ সহ্য করতে সমর্থ নয়। ফলে রাস্তাঘাটের অবস্থা ক্রমশ শোচনীয় হয়ে পড়ছে। কলিকাতা শহরের রাস্তা নির্মাণের উপযুক্ত উপাদানের অভাবের যৌক্তিকতা স্বীকার করে নিয়ে চিফ্ ইঞ্জিনিয়ার বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের সুপারিশ মতো কাঠের রাস্তা নির্মাণে দুটি কারণে একমত হতে পারেননি—প্রথমত লন্ডনে কাঠের রাস্তা নির্মাণের পর দুর্গন্ধ নিবারণের জন্য জীবাণুমুক্ত আরক ছিটিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও লন্ডনের বহু অধিবাসী প্রতি গ্রীষ্মকালে গলক্ষত, চক্ষুরোগ প্রভৃতি ব্যাধির শিকার হয়। আর দ্বিতীয় কারণ হল, গ্রীষ্মকালে কাঠের সঙ্কোচনের ফলে জোড়ার মুখ ফাঁক হয়ে

যায়, তাতে ধুলোবালি জমে এবং বর্ষাকালে কাঠের প্রসারণ হলে চাপটা গিয়ে পড়ে কার্ব স্টোনের (kerb stone) উপর, ফলে তার স্থানচ্যুতি ঘটে। এই সব কারণে রাস্তায় পাতা কাঠের খণ্ড তুলে পুনরায় বিন্যাসের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই সমস্ত বিবেচনা করে চিফ্ ইঞ্জিনিয়ার বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের প্রস্তাবে সম্মত হতে পারেননি। ঠিক একই বছরে অর্থাৎ ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকারের বৈদেশিক বিভাগ যানবাহন চলাচলের বিশেষত ট্রামের ঘর্ষণের আওয়াজে দপ্তরের কাজের খুব অসুবিধার কথা কলিকাতা পুরসভার গোচরে আনেন। সেই সময় ওই দপ্তরটি ছিল ৫ ও ৬ নম্বর এসপ্লানেড রো ইস্টে। তাঁরা তাঁদের স্মারকপত্রে রাস্তাটি কাষ্ঠ নির্মাণের প্রস্তাব দেন, পুরসভা তাঁদের ১৯ এপ্রিল ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের অধিবেশনে ওইরূপ রাস্তা নির্মাণের প্রস্তাব যথারীতি বাতিল করে দেন।

এরপর আসছে ব্যয়ের প্রশ্ন। পাথর বাঁধানো রাস্তার খরচ পড়ে ৯ টাকা প্রতি বর্গগজ, জারা কাঠে ১১ টাকা আর ম্যাকাডাম দিয়ে রাস্তা নির্মাণে ব্যয় হয় প্রতি বর্গকাগজে ৯ টাকা। স্থায়িত্বের দিকে পাথর বাঁধানো রাস্তার জুড়ি নেই। ১০ বছর পর্যন্ত এ রাস্তার সংস্কারের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু জারা কাঠের নির্মিত রাস্তা ১০ বছর পরে সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যায়। এই সব বিবেচনা করে পুরসভা ২৭ মার্চ ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের অধিবেশনে ৭৫,০০০ টাকা ব্যয়ে স্ট্র্যান্ড রোড পাথর দিয়ে বাঁধানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স তীব্র আপত্তি জ্ঞাপন করেন। এ ছাড়াও তাঁরা মিঃ মেজ (Mr. Madge)-এর মারফৎ পুরসভায় একটি মোশন দাখিল করেন। তার ভিত্তিতে ছয় সদস্যের এক সাব-কমিটি গঠিত হয়। সদস্যরা হলেন Mr. Silk, Mr. Banks-Gwyther, Mr. Madge, Mr. Bradshaw, Babu Jadunath Sen এবং পুরসভার চেয়ারম্যান। ঠিক হয় সাব-কমিটি সমস্ত বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করে কলিকাতা পুরসভার জেনারেল কমিটির কাছে একটি প্রতিবেদন পেশ করবেন। সাব-কমিটি পাঁচটি অধিবেশনে সমস্ত বিষয়টি বিবেচনা করেন এবং চিফ্ ইঞ্জিনিয়ারের মন্তব্য শ্রবণ করেন, অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে চেম্বার অফ কমার্সের আপত্তি গ্রহণযোগ্য নয়। স্ট্র্যান্ড রোডের পক্ষে কাঠের চেয়ে পাথর বাঁধানো রাস্তা অধিকতর উপযোগী। তবে পাথর বাঁধানো আরও আধুনিক প্রথায় হওয়া দরকার।

স্ট্র্যান্ড রোডের এই ইতিবৃত্তের উপর এখানেই যবনিকাপাত হল না। স্ট্র্যান্ড রোডের পাশে অবস্থিত টাঁকশালের অধিকর্তা সরকারি পূর্তবিভাগকে জানালেন যে পাথরে বাঁধানো স্ট্র্যান্ড রোডে যান চলাচলের আওয়াজে টাঁকশালের সূক্ষ্ম তুলাযন্ত্রের মাপের তারতম্য ঘটে যাচ্ছে। সমস্যা সমাধানের জন্য রাস্তাটি কাঠ দিয়ে নির্মাণের ব্যাপারে পূর্ত বিভাগ ও কলিকাতা পুরসভার মধ্যে এক অধিবেশন হয় ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে। পুরসভা ৩৪২৬ টাকা ব্যয়ে ম্যাকডাম দিয়ে রাস্তাটি সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু যেহেতু এই প্রকার উপাদানে নির্মিত রাস্তা দীর্ঘস্থায়ী নয় তাই এই প্রস্তাব কার্যকর হয়নি।

কাঠের তৈরি রাস্তা নির্মাণের সুপারিশ নিয়ে এবার আসরে নামলেন পুরসভার এক কমিশনার মিঃ প্রাট (Mr.Pratt)। তিনি ছিলেন কলিকাতায় কাঠের রাস্তার উগ্র সমর্থক। ১৯০৫ খ্রিঃ থেকে তিনি তাঁর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ১২ জুলাই ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা পুরসভার ওয়ার্কস কমিটির সভায় (Works Committee) কলিকাতার কয়েকটি রাস্তা কাষ্ঠ নির্মিত করার প্রস্তাব দেন। এই প্রস্তাবের সমর্থনে তিনি মিঃ পি.সি.কাওয়ানের (Mr. P.C. Cowan) প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি সহযোগে উদাহরণ দেন। মিঃ কাওয়ান হলেন ইংল্যান্ডের ডবলিন শহরের চিফ ইঞ্জিনিয়ার। অবশেষে দীর্ঘ আলোচনার পর ওয়ার্কস কমিটি নিম্নলিখিত রাস্তাগুলি কাষ্ঠ নির্মাণে সম্মত হন :

১। কর্নওয়ালিস স্ট্রিট (হ্যারিসন রোডের মুখ থেকে সুকিয়া স্ট্রিট পর্যন্ত)
২। পার্ক স্ট্রিট (চৌরঙ্গী রোড থেকে ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের মুখ পর্যন্ত)

এর জন্য ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছিল ৭৫,০০০ টাকা।* টেন্ডারও আহ্বান করা হয়েছিল। কিন্তু সে সময় কাঠের দাম মহার্ঘ হওয়াতে প্রস্তাবিত প্রকল্পের মূল্য অনেক বৃদ্ধি পায়। কাজেই এই পরিকল্পনা

পরিত্যক্ত হয়।

কাঠের তৈরি রাস্তা নির্মাণের চিন্তা আবার দানা বাঁধতে শুরু হল ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে। টার-ম্যাকাডামে তৈরি রাস্তা পিছল হওয়াতে নানা দুর্ঘটনা ঘটতে থাকে। কাঠের তৈরি রাস্তায় এ সম্ভাবনা কম। সে সময় কাঠের দাম অসম্ভব বৃদ্ধি পাওয়ায় পুরসভা এই প্রকল্প গ্রহণে ইতস্ততঃ করতে থাকেন। মিঃ পীয়ারসন (Mr. Pearson) ছিলেন গভর্নমেন্ট ফরেস্ট ইকনমিস্ট (Govt. Forest Economist)। তিনি একটি আকর্ষণীয় প্রস্তাব পৌর কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করলেন। তাঁর প্রস্তাবে বলা হল যদি পৌর কর্তৃপক্ষ কাঠের রাস্তার পরীক্ষায় পুনরায় অগ্রসর হন, তিনি প্রয়োজনীয় শাল কাঠ বিনামূল্যে সরকারের বন বিভাগ থেকে জোগানের ব্যবস্থা করবেন। এই পরীক্ষা যদি সফল হয়, তবে ন্যায়সঙ্গত মূল্যে ভবিষ্যতে বন বিভাগ থেকে কাঠ সরবরাহ সুনিশ্চিত করতে হবে। একই সময় আরও দুটি ঠিকাদারি সংস্থা এই প্রকল্প রূপায়ণের সাহায্যে এগিয়ে এলেন। এরা হলেন মেসার্স ইউইং কোম্পানি (Messrs. Ewing Co.) এবং মেসার্স বার্ড কোম্পানি (Messrs. Bird Co.)। প্রথম কোম্পানি প্রস্তাব দিলেন যে তারা ২ টাকা ২ আনা প্রতি বর্গফুট হিসাবে আমেরিকান ডগলাস ফার উড (American Douglas Far Wood)জোগান দিতে পারেন। আর দ্বিতীয় কোম্পানির প্রস্তাব আরও উদার ছিল—তাঁরা বললেন "Krabark Block" বিনামূল্যে পুরসভাকে সরবরাহ করবেন। কলিকাতা পুরসভা এই সব সুযোগ গ্রহণে তৎপর হলেন। তাঁরা সর্বপ্রথম কাউন্সিল হাউস স্ট্রিটের মুখ থেকে হেস্টিংস স্ট্রিটের ১২০০ বর্গ গজ কাঠ দিয়ে নির্মাণ করলেন। এই প্রকারের রাস্তা নির্মাণে সর্বসমেত প্রতি বর্গগজে ব্যয় হয় টাঃ ৯·৯৩। পরের বছর হেস্টিংস স্ট্রিটে কাঠের রাস্তার অসুবিধাগুলি মাথা চাড়া দিতে থাকে। পুরসভার চিফ ইঞ্জিনিয়ার পৌর কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মন্তব্য করেন যে কলিকাতার আর্দ্র জলবায়ুতে কাঠের রাস্তা কোনওভাবেই উপযোগী নয়। চিফ ইঞ্জিনিয়ারের এই সতর্কবাণীর পর পুরসভা কাঠের রাস্তা নিয়ে আর কোনও পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অগ্রসর হননি।[৮] উন্নততর টার ম্যাকাডাম ও কোথাও কোথাও সিমেন্ট কংক্রিট রাস্তা নির্মাণের প্রধান উপাদান হিসাবে পরবর্তীকালে ব্যবহৃত হয়েছিল।

শহর কলিকাতার অসংখ্য রাস্তাঘাটের মেরামতি ও উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থাও হয়েছিল। যদিও ১৭৬৬ খ্রিস্টাব্দে প্রথম পথ পরিদর্শক (Road Surveyor) নিযুক্ত করা হয়েছিল ; কিন্তু ১৮২০ খ্রিঃ পূর্ব পর্যন্ত রাস্তা সংস্কারের জন্য নিয়মিত বিভাগ স্থাপিত হয়নি। ১৮৩৫ খ্রিঃ রাস্তার সংস্কার, জঞ্জাল অপসারণ, আলোর ব্যবস্থা, পয়ঃপ্রণালী ও রাস্তায় জল ধোয়া প্রভৃতি ব্যবস্থা তত্ত্বাবধানের জন্য সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ রোডস্ অ্যান্ড কনসারভেন্সি নামে একজন কর্মচারী নিযুক্ত করা হয়েছিল। এই কর্মচারীর বেতন সরকার দিতেন, তিনি ১৮৪৮ খ্রিঃ এর পূর্ব পর্যন্ত বোর্ড অফ কমিশনারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারতেন। পরবর্তীকালে তাঁর কর্মের পরিসরকে পৃথক পৃথক বিভাগে বিভক্ত করার ব্যবস্থা হয়। ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দের আইনে (Act X of 1852) কেবলমাত্র রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কারের ভার তাঁর উপর ন্যস্ত হয়। অ্যাসেসর (Assessor) নামে নতুন এক পদ সৃষ্টি করে সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ রোডসের বাকি কাজের ভার দেওয়া হয়। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে সারভেয়র ও অ্যাসেসরের দপ্তরখানা সংযুক্ত করে নতুন বিভাগের নাম দেওয়া হয় রোডস্ ডিপার্টমেন্ট। এই নতুন বিভাগটি নব নিযুক্ত সুপারিনটেন্ডেন্টের অধীনে রাখা হয়। ক্লার্ক সাহেব (Mr. Clark) যখন পৌর প্রতিষ্ঠানের ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন তিনি বিলেত থেকে মিঃ স্টাবিনস্কে (Mr. Stubbins) এনে ওই নতুন পদে নিযুক্ত করেন। লন্ডনের সড়ক নির্মাণের কাজে মিঃ স্টাবিনস্-এর বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল।

১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে রোডস্ ডিপার্টমেন্ট পয়ঃপ্রণালী ও জঞ্জাল অপসারণ বিভাগের সঙ্গে যুক্ত হয়। এই ব্যবস্থা এক বছরের কম সময়মাত্র স্থায়ী হয়। এর পর ১৮৬৯ খ্রিঃ থেকে ১৮৭৪ এর মধ্যে রোডস্ ডিপার্টমেন্ট চেয়ারম্যানের তত্ত্বাবধানে আসে। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে রোড ডিপার্টমেন্ট এবং জঞ্জাল অপসারণ বিভাগ পুনরায় একত্রিত হয়। সংযুক্ত বিভাগটি একজন ইঞ্জিনিয়ারের অধীনে আসে। তাঁকে সহায়তা করতেন সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ রোডস্। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ রোডসের পদ পরিবর্তন করে অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার করা হয়। এরপর ১৯০১-০২ খ্রিস্টাব্দে

রাস্তা ও জঞ্জাল অপসারণ উভয় বিভাগই ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ারের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।

বর্তমানে সড়ক বিভাগ ও জঞ্জাল অপসারণ বিভাগ দুটি পৃথক বিভাগ এবং দুটি বিভাগ দুজন চিফ ইঞ্জিনিয়ারের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়।

এরপর আসছে রাস্তা ধোয়ার কথা। শহর কলিকাতায় রাস্তা ধোয়ার কাজ প্রথম শুরু হয় ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে। সে সময় কলিকাতায় অসংখ্য পুষ্করিণী, ডোবা চারিদিকে ছড়ানো ছিটানো ছিল। তাই থেকে ভিস্তিরা মশকে করে জল নিয়ে রাস্তা ধুইয়ে দিত। পরে কলিকাতার কয়েকটি রাস্তার ধারে জলপ্রণালী (aquaducts) নির্মিত হয়। এই জলপ্রণালীতে চাঁদপাল ঘাট ও নিমতলা ঘাটে অবস্থিত পাম্পের সাহায্যে জল সরবরাহ করা হত। ভিস্তিরা জলপ্রণালীর জলও রাস্তা ধোয়ার কাজে লাগাত। সাধারণত যে সব রাস্তার বাসিন্দারা রাস্তা ধোয়ার খরচ যোগান দিত, পুরসভা সেই রাস্তাগুলি ধোয়ানোর ব্যবস্থা করতেন। ১৮৩৬-৩৭ খ্রিস্টাব্দে ইউরোপীয় অধ্যুষিত এলাকা থেকে রাস্তা ধোয়ার জন্য ৩৫,০০০ টাকা পাওয়া গিয়েছিল। চিৎপুর রোড ধোয়ার জন্য একটি তহবিল তৈরি করা হয়েছিল। ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে এই তহবিলে ৩১,৮৫০ টাকা জমা পড়েছিল। এই অর্থ থেকে ১১,৮৫০ টাকায় একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী খননে ব্যয় হয়েছিল। বাকি অর্থ থেকে ১০০০ টাকা আয় হত। তাই দিয়ে চিৎপুর রোড ধোয়ার খরচ বহন করা হত। রাসেল স্ট্রিট, থিয়েটার রোড প্রভৃতি রাস্তা বাসিন্দাদের দেয় অর্থে ধোয়ার ব্যবস্থা ছিল।

শহর কলিকাতার যে সব সড়ক পুষ্করিণী বা জলপ্রণালী থেকে দূরে সেই সব রাস্তা কীভাবে ধোয়ানো যায় তাই নিয়েও চিন্তাভাবনা শুরু হয়। ১৮৫৫-৫৬ খ্রিস্টাব্দে জল-গাড়ির (Water cart) ব্যবস্থা করা হয়। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে ১৬½ মাইল দৈর্ঘ্যের ৪৬টি রাস্তা মাসিক ১৮৬৬ টাকা ব্যয়ে ধোয়ার ব্যবস্থা হয়। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে চাঁদপাল ঘাটে ২৫ অশ্বশক্তির উচ্চ মাপের ইঞ্জিন জলপ্রণালীতে জল সরবরাহ উন্নত করার জন্য স্থাপন করা হয়। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে উন্নত ধরনের জলগাড়ির প্রবর্তন করা হয়েছিল।

রাস্তা ধোয়ার ব্যাপারে কলিকাতা পুরসভাকে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।—পুষ্করিণীর মালিকদের অসহযোগিতা, ভিস্তিওয়ালাদের আচমকা অনুপস্থিতি, জলপ্রণালীতে জলাভাব, আর পাম্পগুলি অনবরত বিকল হওয়া প্রভৃতি। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে চাঁদপাল ঘাটের ইঞ্জিনকে আরও শক্তিশালী করার ব্যবস্থা হয় এবং অপরিশ্রুত জল সরবরাহ ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে রাস্তা ধোয়ার কাজের কিছু সুরাহা হয়। এ ছাড়াও বহু রাস্তায় গ্রাউন্ড হাইড্রেন্ট স্থাপন করা হয়। এর ফলে ১৮৭০ থেকে ১৮৮০ খ্রিঃ-এর মধ্যে ৬ মিলিয়ন থেকে ১০ মিলিয়ন বর্গগজ রাস্তা জল দিয়ে ধোয়ার ব্যবস্থা হয়। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে মল্লিকঘাট পাম্পিং স্টেশন স্থাপিত হওয়াতে রাস্তা ধোয়ার সমস্যা অনেকটা দূর হয়। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে ওয়াটগঞ্জ পাম্পিং স্টেশন নির্মিত হলে পর কলিকাতার শহরতলিতে রাস্তা ধোয়ার ব্যবস্থা প্রসারিত হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে শহর কলিকাতার প্রধান সড়কগুলি দিনে তিনবার এবং কম গুরুত্বপূর্ণ পথগুলি দিনে দু'বার এবং ফুটপাত দিনে একবার ধোয়ার ব্যবস্থা ছিল। এই শতাব্দীর ছয়ের দশকে রাস্তা ধোয়ার পাট একেবারে তুলে দেওয়া হয়। শোনা যায় রাস্তাকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য এই ধোয়ার ব্যবস্থা রহিত করা হয়েছে।

শহর কলিকাতায় রাস্তা নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে তাদের ধারে ধারে গাছগাছালি রোপণ করে সুসজ্জিত করার দিকেও নজর দিয়েছিলেন সেদিনের পৌর কর্তৃপক্ষ। সড়কের পাশে প্রথম বৃক্ষরোপণ শুরু হয় ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে। সে সময়ের পুর আইনে বৃক্ষ রোপণ খাতে ব্যয় মঞ্জুরের আইনগত ক্ষমতা না থাকায় ওই প্রয়াস বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরবর্তীকালের আইনে পুরসভাকে এই ক্ষমতা দেওয়া হয়। পুর কর্তৃপক্ষ আইনের সদ্ব্যবহার করে যেসব রাস্তার দু'পাশে বৃক্ষ রোপণের ব্যবস্থা করেন, তাদের মধ্যে লাউডন স্ট্রিটকে সর্বাপেক্ষা সুসজ্জিত করা হয়েছিল। সেকালের কলিকাতায় লাউডন স্ট্রিট ছিল কলিকাতার গর্ব। সড়ক ও উদ্যানের গাছ গাছালির উপর নজর রাখার জন্য ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে একজন কনজারভেটর (Conservator) নিযুক্ত করা হয়েছিল। রয়েল বোটানিক্যাল গার্ডেনের মিঃ লেন (Mr. Lane) ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা শহরে সড়কের ধারে যত বৃক্ষ রোপণ করা আছে তার একটা পরিসংখ্যান গ্রহণ করেন। মিঃ লেনের কতকগুলি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পুরসভা

গ্রহণ করেন। তাঁরই সুপারিশমতো বিদেশ থেকে কয়েক প্রকার বৃক্ষচারা আমদানির ব্যবস্থা করা হয়। সরকার থেকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে মিঃ লেন বছরে দুবার সড়কের ধারের বৃক্ষগুলি পরীক্ষা করবেন। ওই সময় পুরসভা কিছু কর্মী নিযুক্ত করে তাদের উপর বৃক্ষগুলির যত্নআত্তির ও নতুন বৃক্ষ রোপণের ভার অর্পণ করেন। বর্তমানে পুরসভার এক বিশাল কর্মীবাহিনী এ বিভাগের অন্তর্ভুক্ত।

এইখানেই শেষ নয়। কলিকাতা পুরসভার নতুন আইনে (Section 241 of Act II of 1899) শহরে পরিশ্রুত জল সরবরাহের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। আইনের নির্দেশ কার্যকর করার জন্য তৎকালীন পুর ইঞ্জিনিয়ার মিঃ পিয়ার্স (Mr. Peerce) ১৯০১ সালে একটি পরিকল্পনা রচনা করেন। তাঁর এই পরিকল্পনায় জমি থেকে উঁচুতে একটি লৌহনির্মিত জলাধার টালায় নির্মাণের প্রস্তাব দেওয়া হয়। প্রকল্পটি বহুভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষার পর অবশেষে ছাড়পত্র দেওয়া হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী লৌহ জলাধারটি হবে ১৬ ফুট গভীর, ব্যাস ৩২১ স্কোয়ার ফুট। জমি থেকে ১১০ ফুট উঁচুতে ইস্পাতের খুঁটির ওপর অবস্থান করবে। ৯ মিলিয়ন গ্যালন জল সঞ্চয়ের ব্যবস্থা থাকবে এই জলাধারে। এটি চারটি ভাগে বিভক্ত থাকবে। প্রত্যেকটি হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ। প্রয়োজন বোধে যে কোনও একটিকে বন্ধ রেখে অন্যগুলিকে চালু রাখা যেতে পারে। তাতে শহরের জল সরবরাহ বিঘ্নিত হবে না। জলাধারটি ২$\frac{১}{২}$ইঞ্চি মোটা কংক্রিটের চাদর দিয়ে ঢাকা থাকবে। তৎকালে উর্ধ্বে অবস্থিত এই প্রকার জলাধারগুলির মধ্যে টালার জলাধার সর্ববৃহৎ ছিল বলে শোনা যায়।

এই জলাধার নির্মাণের কাজ ১৯ অক্টোবর ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে শুরু হয় এবং ১২ জানুয়ারি ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কাজটি সমাপ্ত হয়। এটির নির্মাণে ব্যয় হয়েছিল ২২,২৫,০৪১ টাকা। জলাধারটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় ১৮ নভেম্বর ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন তৎকালীন বাংলার ছোটলাট স্যার এডওয়ার্ড বেকার (Sir Edward Baker)। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ১৬ মে থেকে জলাধারটি কলিকাতার জল সরবরাহের কাজে ব্যবহৃত হতে থাকে। ফলে শহরের জল সরবরাহ বৃদ্ধি পায়। ১৯১৩-১৪ সালের কলিকাতা পুরসভার প্রতিবেদনে দেখা যায় যে ওই সময় প্রতিদিন ৩৫$\frac{১}{৪}$ মিলিয়ন গ্যালন পরিশ্রুত জল শহরে সরবরাহ করা হত। মাথা পিছু পরিশ্রুত জল সরবরাহের পরিমাণ ছিল ৩২·৮ গ্যালন এবং অপরিশ্রুত জলের পরিমাণ ছিল ২৫·৪ গ্যালন।[৯]

## তথ্যসূত্র


১ Municipal Calcutta—S.W. Goode p. 239
২ The Proceedings of the meeting of the The Cal. Mpl. Corpn. dt. ১৪/১/১৯১০
৩ The Proceedings of the meeting of the Cal. Mpl. Corpn. dt. ১২/৩/১৯১০
৪ C.M.C. Administration Report 1910-11
৫ Municipal Cal.—Goode.
৬ Adm. Report—1914-15
৭ The Proceedings of the meeting of the Cal. Municipal Corpn. dt. 8.12.15
৮ The report of the Chief Engineer relating to the Woodpaving in Calcutta dt. 27.7.1916 (General Committee, 1916-17)
৯ Municipal Calcutta—S.W. Goode, p. 199-203

## ৩২

# ১৮৯৯—পৌর আইনে নতুন নতুন পথের উদ্ভব ও তার ইতিবৃত্ত

১৮৯৯ সালের কলিকাতা পৌর আইন ১৯২৪ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত চালু ছিল। এই সময় ভারতের রাজনৈতিক জীবন নানা আন্দোলনে আবর্তিত হয়। ১৯০৫ থেকে বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশি আন্দোলন শুরু। পরে এই স্বদেশি আন্দোলন ক্রমে রাজনৈতিক মুক্তি আন্দোলনের রূপ নেয়। আরও পরে তা ইংরেজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লবের আকারে দেখা দেয়। কংগ্রেসের মধ্যে প্রকাশ পায় নরমপন্থী ও চরমপন্থীর দ্বন্দ্ব। আর্থিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে স্বাধিকার, সাম্য ও স্বনির্ভর হয়ে ওঠার প্রয়াস চলে। দেশকে মাতৃরূপে কল্পনা করে মাতৃমুক্তির সংকল্প গ্রহণ করা হয়। এই মুক্তি কেবল রাজনৈতিক মুক্তি নয়। এর মধ্যে নিহিত ছিল আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির রূপরেখা। এই সময় ভারতের সংবাদপত্র নতুন ভূমিকায় দেখা দেয়। সরকারের দমন পীড়ন নিষ্পেষণ উপেক্ষা করে ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে তাঁরা সোচ্চার হন। জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি ওঠে। এই পর্বে রাজনৈতিক মঞ্চে গান্ধীজির আবির্ভাবে রাজনৈতিক আন্দোলন ও ক্রিয়াকলাপে নতুনত্ব সূচিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ। মন্টেগু চেমসফোর্ড সংস্কার প্রবর্তিত হল। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় ভারতীয়দের প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়। এদিকে জালিয়ানওয়ালাবাগে চলে নির্মম হত্যাকাণ্ড। রাওলাট আইন পাশ হয়। ১৯২০ খ্রিঃ কংগ্রেস ও গান্ধীজির নেতৃত্বে অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলন। এই সকল ঘটনাবলী ভারতের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে থাকে। এই ঘটনাবহুল পরিস্থিতিতে ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের কলিকাতা পৌর আইনে নির্বাচিত কমিশনারগণ রাজনৈতিক আন্দোলনে আবর্তিত হয়েও কলিকাতার উন্নয়নের বিষয়ে তৎপর ছিলেন। অন্যদিকে কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা তাঁদের বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে ঘন ঘিঞ্জি বস্তি অপসারণ করে এলাকাভিত্তিক উন্নতির দিকে নজর দিয়েছিলেন—সেকথা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। পুরসভা ও উন্নয়ন সংস্থা উভয় প্রতিষ্ঠানের মিলিত প্রয়াসে কলিকাতা শহরে যে সব উন্নত অঞ্চল গড়ে ওঠে সেখানে নতুন নতুন রাস্তা নির্মিত হওয়ায় অঞ্চলের আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। ওই সব জায়গায় পুরানো ও নতুন গড়ে ওঠা সড়ক, পথ ও সরণি সম্বন্ধে দু'চার কথা বলা প্রয়োজন। তার মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে সে যুগের সমাজসংস্কৃতির লুপ্ত ইতিহাস।

বিডন রো রাস্তাটির পূর্ব নাম দর্জিপাড়া স্ট্রিট। এটি কলিকাতার প্রাচীন রাস্তা। শক সাহেবের ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দের কলিকাতার জনগণনার প্রতিবেদনে যে ৪৩৮টি রাস্তা দেখানো আছে, তার মধ্যে দর্জিপাড়া স্ট্রিট অন্যতম। এরও পূর্বে ১৮২৫ সালের কলিকাতা পুরসভার Assessment Register-এ এই পথটির উল্লেখ আছে। দর্জিদের বসতি থেকে এই অঞ্চলের নাম হয়েছিল দর্জিপাড়া। দর্জিপাড়া বাই লেন নামে এই অঞ্চলে আরেকটি রাস্তা আছে।

গভর্নর জেনারেল হেস্টিংস মহারাজা নবকৃষ্ণ দেবকে সুতানুটির তালুকদারি দেন। তালুক সুতানুটির উত্তর সীমা ছিল বাগবাজারের খাল, পূর্ব সীমা মারাঠা ডিচ (এখন সারকুলার রোড,) পশ্চিম সীমা ভাগীরথী নদী, দক্ষিণ সীমা বড়বাজারের রতন সরকার গার্ডেন স্ট্রিট। মহারাজা নবকৃষ্ণ তাঁর নতুন তালুকদারিতে একদিকে যেমন পণ্ডিতদের সমাদর করে নিয়ে এসেছিলেন, অন্যদিকে নানা

পেশার লোকদের বসবাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। এইভাবে সুতানুটি গ্রামে জেলেটোলা, তেলিপাড়া, দর্জিপাড়া, কুমোরপাড়া (পরে কুমোরটুলি) প্রভৃতি গড়ে ওঠে। দর্জিপাড়ার দর্জিরা শোভাবাজারের রাজপরিবারের পোশাক-আশাক তৈরি করে দিতেন। কলিকাতা ধীরে ধীরে নগরায়ণের পথে পদক্ষেপ গ্রহণ করায় এই সব দর্জিরা এখানকার বাস তুলে দিয়ে অন্যত্র চলে যান। এখানে ক্রমে ক্রমে মধ্যবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্তের বসতি গড়ে ওঠে।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে রাস্তাটির নাম বদলের এক স্মারকপত্র পুরসভার বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা হয়। পুরসভা তাঁদের ১ আগস্ট ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের অধিবেশনে রাস্তাটির নাম দর্জিপাড়া স্ট্রিট পরিবর্তন করে 'বিডন রো' নামাঙ্কিত করেন। রাস্তাটি বিডন স্ট্রিটের উত্তর দিক দিয়ে শুরু হয়ে এঁকে বেঁকে এগিয়ে 'রামনারায়ণ ভট্টাচার্য' লেন-এ এসে পড়েছে।[১]

রিচার্ড বিডনের কনিষ্ঠপুত্র, বঙ্গদেশের ছোটলাট, বহু জনহিতকর কর্মের উদ্যোক্তা স্যার সিসিল বিডন ২২ ডিসেম্বর ১৮১৩ ইংল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষা সমাপনের পর ৩১ ডিসেম্বর ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে ভারতে উপস্থিত হন। ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে অনেকগুলি সরকারি পদে অধিষ্ঠিত হন। পরে ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল থেকে আরম্ভ করে ৫ বছরকাল বঙ্গদেশের ছোটলাটের পদ অলংকৃত করেছিলেন। তাঁর শাসনকাল বাংলাদেশের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁরই উদ্যোগে পুরাতন সুপ্রিম কোর্ট, সদর দেওয়ানি আদালত এবং নিজামত আদালত একত্রীকরণ করে বর্তমান হাইকোর্ট স্থাপিত হয়। ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে হাইকোর্ট ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। ১৮৬২-৬৩ খ্রিস্টাব্দে বিডনের উৎসাহে কলিকাতার আলিপুরে কৃষি মেলার (The Agricultural Exhibition) আয়োজন করা হয়। ৭০,০০০ দর্শক এই মেলায় উপস্থিত হয়েছিলেন।

সিসিল বিডনের শাসনকালে কলিকাতা পুরসভার জন্য নতুন আইন প্রণীত হয়। এই আইনে কলিকাতা পুরসভার প্রথম চেয়ারম্যান সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন। কলিকাতা পুরসভার চেয়ারম্যান ও পুলিশ কমিশনারের ক্ষমতা একই ব্যক্তির দ্বারা প্রয়োগ করার অধিকার এই আইনে (The Act VI B.C. of 1863) বিধিবদ্ধ করা হয়। এর উদ্দেশ্য হল পুর প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের মধ্যে সঙ্গতি আনা। উচ্চশিক্ষার প্রসার তাঁর শাসনকালের আরেক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন।

সিসিল বিডনের মৃত্যুতে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে কৃষ্ণদাস পাল লিখেছিলেন, "For the people of this country he cherished a warm sympathy and did everything that lay in his power to elevate their position socially and in the State Service. No member of the Civil Service did more to promote the higher education of our country. men...and for the service he did in improving the Postal Dept. in reducing and equalising the postage rates and in introducing the stamp system he will be long honourably remembered as the Rowland Hill of India."[২]

বিডন রো নামাঙ্কিত হবার পর এটিকে আরও প্রসারিত করার এক প্রয়াস শুরু হয়। দর্জিপাড়া স্ট্রিটের নাম পরিবর্তন হওয়াতে রামনারায়ণ ভট্টাচার্য লেনের বাসিন্দারা তাঁদের রাস্তার নাম পরিবর্তন করে বিডন রো রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁরা এই মর্মে একটি আবেদন পুরসভার জেনারেল কমিটির সভাপতির কাছে দাখিল করেন। জেনারেল কমিটি তাঁদের ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের অধিবেশনে আবেদনটি নাকচ করে দেন।[৩]

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, সিসিল বিডনের নামে কলিকাতার আরও একটি রাস্তা ও উদ্যান নামাঙ্কিত করা হয়েছিল—রাস্তাটি বিডন স্ট্রিট, অন্যটি বিডন পার্ক। পরবর্তীকালে বিডন স্ট্রিটের কিছু অংশ স্বামী অভেদানন্দের নামে অভেদানন্দ রোড এবং বিডন পার্ক বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের নামে 'রবীন্দ্র কানন' নামকরণ করা হয়।

দর্জিপাড়া স্ট্রিট (এখন বিডন রো) নানা কারণে একটি গুরুত্বপূর্ণ পথ। এই পথের ধারে ছিল কয়েকটি বনেদি পরিবারের বাস। এই সব পরিবারের সন্তানগণ সেকালের নানাবিধ সমাজসেবা, শিক্ষামূলক আন্দোলন, স্বদেশি আন্দোলন, ব্যবসাবাণিজ্য সূত্রে বিদেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে

কলিকাতার গৌরব বৃদ্ধি করেছিলেন। তাই তাঁদের সম্বন্ধে কিছু জানতে কার না আগ্রহ হয় ?

৩০, বিডন রো দর্জিপাড়ার মুখোপাধ্যায় পরিবারের বাসভবন। কলিকাতার আদি বনেদি পরিবারগুলির অন্যতম এই পরিবার। রায়বাহাদুর কৈলাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই বংশের সন্তান। এঁদের নামে কলিকাতায় একটি গলিপথ এবং একটি উদ্যান নামাঙ্কিত আছে। এই পরিবারের পূর্বপুরুষ বাসুদেব মুখোপাধ্যায় ফুলিয়া থেকে পলাশী যুদ্ধের পর কলিকাতায় আসেন। আহিরীটোলা নিবাসী ব্যবসায়ী গোপাল হালদারের কন্যাকে বিবাহ করেন এবং স্ত্রীর ইচ্ছায় কলিকাতার সিমুলিয়া গ্রামের অন্তর্ভুক্ত দর্জিপাড়ায় বসবাস শুরু করেন। শোনা যায় তাঁর পত্নীর স্ত্রীধনে ৩০ নম্বরের বাড়িটি কেনা হয়। পরবর্তী বংশধর আনন্দচন্দ্র ব্যবসাসূত্রে বিপুল অর্থ উপার্জন করেন এবং এতে পরিবারের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। আনন্দচন্দ্রের দুই পুত্র—কৈলাশচন্দ্র ও হরচন্দ্র। কৈলাশচন্দ্র ছিলেন হিন্দু কলেজের ছাত্র এবং উচ্চ ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে তৎকালীন ছোটলাটের অফিসের রেজিস্ট্রার নিযুক্ত হন (Judicial, Political & Appointment Dept.)। তিনি সেকালের বহু উচ্চশিক্ষিত বাঙালি যুবকদের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। এই জন্য তাঁকে Deputy Maker বলা হত। পরবর্তীকালে তিনি রায়বাহাদুর খেতাব পান। তিনি একজন রক্ষণশীল ও গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। পুত্র ক্ষেত্রমোহন ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ এবং বিধবা বিবাহ করায় তিনি তাঁকে ত্যজ্যপুত্র করেন। ক্ষেত্রমোহন ছিলেন সেকালের ইংরেজি শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত ও তেজস্বী ব্যক্তি। তিনিও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। পরবর্তীকালে কলিকাতার ডেপুটি কালেক্টর হন। ক্ষেত্রমোহন নকীপুরের জমিদার প্রিয়নাথ রায়চৌধুরীর কন্যাকে বিবাহ করেন। পরে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন এবং প্রথম কংগ্রেস সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিধবা ভাগ্নী বিনোদিনী দেবীকে বিবাহ করেন। এই বিবাহ উপলক্ষে উমেশ ব্যানার্জির মন্তব্য উল্লেখের দাবি রাখে।—"বেশ করেছ। কিন্তু তুমি religion change করতে গেলে কেন ? That's mongrelism, I have no religon but I was born a Hindu and I will die a Hindu.''এই বিবাহের ফলে ক্ষেত্রমোহন পিতৃসম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হন। কৈলাশচন্দ্র তাঁর বিপুল সম্পত্তি ভ্রাতুষ্পুত্র অবিনাশচন্দ্রকে দান করেন। অবিনাশচন্দ্র ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর। কৈলাশচন্দ্র ১৫ এপ্রিল ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।

রায়বাহাদুর কৈলাশ মুখার্জির নামে এই এলাকায় একটি গলিপথ আছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে এই গলিপথটি তৈরি হয়। পূর্বে এটি খোলা পয়ঃপ্রণালী ছিল। ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী নির্মিত হলে এটি রাস্তার আকার নেয়। গলিটি ১৩ নম্বর রামনারায়ণ ভট্টাচার্য লেনের পাশ দিয়ে ব্ল্যাকওয়ার স্কোয়ারে (এখন, রামপ্রসাদ উদ্যান) পড়েছে। ঠিক এর মুখে ছিল—"ছিটে বেড়ার দেওয়াল কাঁচা নিকানো মেঝেতে নারায়ণ পণ্ডিতের পাঠশালা। নারায়ণ পণ্ডিত খুব গৌরবর্ণ রোগা লম্বা চেহারা, গলায় এক গোছা পৈতা, মাথায় লম্বা টিকী, গরমীকালে আদুড় গায়ে থাকতেন, কাঁধে একখানা গামছা শীতকালে কখন বা সুতির দোলাই, বলটুওলা খড়ম পরতেন, কোথাও যেতে আসতে এক জোড়া চটী জুতো, পাড়ার সকলেই পণ্ডিত মশাইকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন।"[৪]

১৯০৯ সালে এলাকার পল্লীবাসীগণ কলিকাতা পুরসভার কাছে এই অনামী গলিটি এই অঞ্চলের সম্মানিত ব্যক্তি রায় কৈলাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাহাদুরের নামে নামাঙ্কিত করার প্রস্তাব দেন। কলিকাতা পুরসভা তাঁদের ১২ই অক্টোবর ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের অধিবেশন গলিটি কৈলাশচন্দ্র মুখার্জির নামে 'কৈলাশ মুখার্জি লেন' নামাঙ্কিত করেন।[৫]

কৈলাশচন্দ্রের ৩০, বিডন রো-এর বাড়ি সেকালের কলিকাতার খ্যাতিমান ব্যক্তিদের আগমনে ধন্য হয়েছিল। এসেছিলেন সেকালের শিক্ষাব্রতী ডেভিড হেয়ার, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কংগ্রেস সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, আর ঠাকুরবাড়ির নামীদামি ব্যক্তি প্রমুখেরা।

৩১, বিডন রো-তে ছিল কৈলাশ মুখার্জির বিরাট বস্তি। বস্তি উঠে গেলে এটি জঙ্গলে পরিণত হয়। প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় এই অঞ্চলের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লিখেছেন, "কৈলাশ মুকুজ্যের মাঠ—তখন জঙ্গলে ভরা। বড় বড় ডুমুর গাছ আর জংলী গাছে ভর্তি। এক পাশে গোবর্ধন গোয়ালার একটা বাড়ি আর শেষের দিকে দু'তিন খানা কাঁচা ঘর, মালিক গোপাল মাল—দুই ছেলে শশী মাল আর তিনে মাল, পাখীর খাঁচা তৈরি করে বিক্রি করতো।...প্রতি বছর দু'চারটে নাগা

সন্ন্যাসী কৈলাশ মুকুজ্যের মাঠের খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করে একটা ধুনী জ্বালিয়ে কোপনী মেরে মাথার জটায় দাড়ি গোঁফ সর্বাঙ্গে ধুনীর ছাই মেখে বসে থাকতো। মূল সন্ন্যাসীর চেহারাটা খুব হৃষ্টপুষ্ট, চোখ লাল জবা ফুল গাঁজার ধমকে সর্বদা তুরীয় ভাব। আশেপাশে খুচরা নাগারা কেউ পা টিপছে, কেউ কোমর ডলছে, কেউ পিট ডলছে। বাবা কিন্তু চুপচাপ বসে আছেন। এই রকম অবস্থা আশপাশে দু'চারটে গাঁজার কলকে উপুড় হয়ে পড়ে আছে।"[৬] সে সময় এই গাঁজার আড্ডা ছিল অলিতে গলিতে। পরে ৩১ নম্বরের এই বিশাল জমি টুকরো টুকরো করে বহু বসত বাড়ি তৈরি হয়।

কাশী বসু লেনের দু'ধারে ছিল কৈলাশ মুখার্জির আরও দুটি প্রকাণ্ড বস্তি। এতে মুসলমানরা বাস করতেন। এ বস্তিও পরে উঠে যায়। তারই কিছু অংশ আর্য মিশন স্কুল কিনে নেন। পরে তাঁরা নিউ ইন্ডিয়ান স্কুলকে ভাড়া দেন। বস্তি জমির কিছু অংশ নিয়ে তৈরি হয়েছিল অনেকগুলি বসত বাড়ি। বাকি অংশ খেলার মাঠ। এটি মুখার্জিদের মাঠ নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তীকালে মাঠটি সুধীর মুখার্জি উদ্যান নামাঙ্কিত হয়। সে প্রসঙ্গে আমরা পরে আসছি।

কৈলাশচন্দ্র তাঁর বিশাল সম্পত্তি ভ্রাতুষ্পুত্র অবিনাশচন্দ্রকে দিয়ে যান, সে কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। অবিনাশচন্দ্রের পুত্র সুরেশচন্দ্র (১৮৭৬-১৯৬৭) ছিলেন উচ্চশিক্ষিত। উচ্চ সরকারি চাকুরির প্রতিশ্রুতিকে প্রত্যাখ্যান করে স্বদেশিয়ানায় অনুপ্রাণিত হয়ে সুরেশচন্দ্র ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন। বাঙালিদের মধ্যে তিনি প্রথম কলিকাতায় যাত্রী পরিবহনের জন্য Oriental Transport Company Ltd. নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। সে সময় কেবলমাত্র Walford Transport Company কলিকাতায় এই ব্যবসায়ে নিয়োজিত ছিল। এ ছাড়াও উড়িষ্যার বালেশ্বরে ১০০০ বিঘা জমি নিয়ে কৃষি খামারও স্থাপন করেছিলেন। পল্লীবাসীর কাছে তাঁর সততা, সাধুতা, গোপন দান ও উচ্চ মনের জন্য আজও তিনি শ্রদ্ধেয়।

সুরেশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র সুধীরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৯০৯-১৯৭৭) ১৯৫২ সালে কলিকাতা পুরসভায় সরকারি পক্ষের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে পুর প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। তিনি ছিলেন উচ্চশিক্ষিত ও পেশায় আইনজীবী। ১৫ বছর তাঁর এলাকার নির্বাচিত পৌর প্রতিনিধি ছিলেন। এই সময় তিনি কলিকাতা পুরসভা থেকে কলিকাতার উন্নয়ন সংস্থার সদস্য নির্বাচিত হন। খেলাধূলায় ছিল তাঁর প্রবল আগ্রহ। তাঁরই আগ্রহে তাঁর তৃতীয় ভ্রাতা বিমান মুখোপাধ্যায় পল্লীর কিছু উৎসাহী যুবকের সহায়তায় পল্লীর মৃতপ্রায় বেঙ্গল স্পোর্টিং ক্লাবকে সঞ্জীবিত করেন। ক্লাবটি ১৯১৮ সালে এই পল্লীতে স্থাপিত হয়েছিল। সেকালের ফুটবল ও ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে এই ক্লাবের গৌরবের স্বাক্ষর আছে। সুধীরচন্দ্র ১৯৪৮ সাল থেকে এই ক্লাবের আজীবন সভাপতি ছিলেন। এ ছাড়াও বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। ফলিত জ্যোতিষ বিচারেও তাঁর ছিল গভীর জ্ঞান। ১৯৭৭ সালে তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর কলিকাতা পুরসভার তৎকালীন প্রশাসক (Administrator) তাঁর ২৫ মার্চ ১৯৮০ এবং ৮ আগস্ট, ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দের আদেশবলে কাশী বসু লেনের খেলার মাঠটি সুধীরচন্দ্র মুখার্জির নামে 'সুধীর মুখার্জি উদ্যান' নামাঙ্কিত করেন।

৩০/১এ, বিডন রো এর মালিক ছিলেন সুধীরচন্দ্র মুখার্জির ভ্রাতা বিমান মুখার্জি। এই বাড়িটি সময় সময় ভাড়া দেওয়া হত। ডাঃ সতীশচন্দ্র দে এক সময় এই বাড়িতে ভাড়া ছিলেন। তিনি ছিলেন কটকের সিভিল সার্জেন। সুপণ্ডিত, শিক্ষাব্রতী, পুথি সংগ্রাহক, বাংলা প্রবাদের অর্থসহ সংকলক সুশীলকুমার দে (১৮৯০-১৯৬৮) ডাঃ সতীশচন্দ্রের পুত্র। ১৯৩০ সাল পর্যন্ত তাঁরা এই বাড়িতে ছিলেন।

এরপর এই বাড়িতে আসেন খেলাধূলা জগতের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক পঙ্কজ গুপ্ত (১৮৯৯-১৯৭১)। এই বাড়িতে থাকাকালীন ১৯৩২ খ্রিঃ লস এঞ্জেলস অলিম্পিক থেকে শুরু করে ইউরোপ ও আমেরিকাসহ বহু দেশে ম্যানেজার, সহ-ম্যানেজার বা ডেলিগেট হিসাবে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। কয়েক বছর থাকার পর এই বাড়ি ছেড়ে পঙ্কজ গুপ্ত চলে যান।

'বিদ্যাভবন' নামে স্থানীয় এক বিদ্যালয় ১৯৪২ সালে এই ভবনে আসে। বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠাতা হলেন প্রফুল্ল বসু ও অনাথ নাথ দে। পূর্বে উভয়েইনিউ ইন্ডিয়ান স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। পরে এই স্কুলের সংশ্রব ত্যাগ করেন এবং নতুন একটি বিদ্যালয় নয়ন চাঁদ দত্ত স্ট্রিটের একটি ভবনে স্থাপন

করেন। স্থানের অকুলান হওয়াতে তাঁরা বিদ্যালয়টিকে ৩০/১এ, বিডন রো-এর বাড়িতে উঠিয়ে আনেন। বিদ্যালয়টি এই বাড়িতে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত ছিল।

বর্তমানে এই বাড়িতে আছেন শিশুসাহিত্যিক, অনুবাদক, রবীন্দ্র গবেষণা পুস্তক (রবীন্দ্রকাব্যে প্রাণীপ্রীতি) প্রণেতা জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী।

জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সেকালের খ্যাতনামা ইঞ্জিনিয়ার শচীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা। তিনি ৩০/২, বিডন রোতে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত বসবাস করে গেছেন। শচীন বন্দ্যোপাধ্যায় "শচীন ব্যান্ডো" নামে সর্বসাধারণের কাছে পরিচিত ছিলেন। একসময় তিনি কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীকালে চিফ্ ইঞ্জিনিয়ার হয়েছিলেন।

রায়বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র (১৮৮০-১৯৬১) প্রায় ১৪ বছর (১৯৩২-৪৬) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ছিলেন। এ ছাড়া তিনি ছিলেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার সম্পাদক, রবিবাসরের সভাপতি, বোম্বাইয়ে ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের সভাপতি এবং আন্তর্জাতিক ভাষা কংগ্রেসে (নরওয়ে ১৯৩৬) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। অনেকগুলি পুস্তক তিনি রচনা করেছিলেন। সঙ্গীতে তাঁর বিশেষ অধিকার ছিল। খগেন্দ্রনাথ ৩৫নং বিডন রো-তে বহু বছর বাস করেছিলেন।

শেরপুরের জমিদার গোপাল দাস চৌধুরী ছিলেন ৩২ নং বিডন রো-এর স্বত্বাধিকারী। এঁদের আদি বাস ছিল এখনকার বাংলাদেশের ময়নমনসিংহ জেলায়। গোপাল দাস চৌধুরী ছিলেন উচ্চশিক্ষিত ও দাতা। বহু প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা তাঁর দানে পুষ্ট হয়েছিল। তিনি ছিলেন শেরপুরের জমিদারের দত্তক পুত্র। তাঁর ভ্রাতা ইন্দুভূষণ সেন ছিলেন বিদ্যাসাগর কলেজের দর্শনের অধ্যাপক। কবিরাজ হেমচন্দ্র সেন ছিলেন আরেক ভাই। ৩২নং বাড়িটির গঠনশৈলী ও নির্মাণকার্য ছিল অতীব চমৎকার। পথচলতি পথিক থমকে দাঁড়িয়ে বাড়ির কারুকার্য দেখে মুগ্ধ হত। ভবনটি নির্মাণের ভার দেওয়া হয়েছিল সেকালের বিশিষ্ট স্থপতি শিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে। হিন্দু আর মুসলিম স্থাপত্যের সমন্বয়ে ১৯২৭ সালে বিডন রো-এর এই বাড়িটি নির্মিত হয়। গোপাল দাস চৌধুরীর এই বাড়িটি ছাড়া আরও অনেকগুলি বাড়ি এর পাশাপাশি ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে ১৪৭নং রাসবিহারী অ্যাভিনিউ-তে জমি কিনে প্রকাণ্ড বাড়ি করেন। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে সরকার রাসবিহারী অ্যাভিনিউ-এর বাড়িটি অধিগ্রহণ করেন এবং এখানে মহিলাদের জন্য বাসন্তীদেবী কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। গোপাল দাস চৌধুরী এরপর নিউ আলিপুরে নতুন বাড়ি করে উঠে যান। ৩২, বিডন রো ও তৎসংলগ্ন সকল বাড়ি পরে বিক্রি করে দেন। বিডন রো-এর এই চোখধাঁধানো অট্টালিকা ভেঙে ফেলে আজ ফ্ল্যাট বাড়ির পত্তন হয়েছে।

সন্তোষের মহারানী জাহ্নবী দেবী বাস করতেন ২৫নং বিডন রো-এর বাড়িতে। তিনি ছিলেন সন্তোষের জমিদারির ছ'আনা অংশীদার। দত্তক নিয়েছিলেন হেমেন্দ্রনাথ ঘোষকে পরে (হেমেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী)। হেমেন্দ্রনাথ ছিলেন কলিকাতা পুরসভার প্রাক্তন মেয়র, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ সতীশচন্দ্র ঘোষের ভাই। হেমেন্দ্রনাথ ছিলেন উচ্চশিক্ষিত ও ঈশান স্কলার। এই শতাব্দীর পাঁচের দশকে বালিগঞ্জ সারকুলার রোডে বহু অর্থ ব্যয়ে সুদৃশ্য ভবন নির্মাণ করে বিডন রো-এর বাড়ি থেকে হেমেন্দ্রনাথের পুত্রেরা চলে যান। পরে এই বাড়িটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভাড়ার ভিত্তিতে গ্রহণ করেন এবং স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য আবাসভবনে রূপান্তরিত করেন। আজও এই ব্যবস্থা চালু আছে। হেমেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী খুব অল্প বয়সে মারা যান।

বিডন রো-এর বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছিল দর্জিপাড়ার মিত্র পরিবারের আবাসভবন। কলিকাতার প্রাচীন ও বনেদি পরিবারগুলির অন্যতম এই মিত্র পরিবার। এই অঞ্চলের বহু ভূসম্পত্তির মালিক হলেও কলিকাতার সমাজ-সংস্কৃতির ইতিহাসে এই পরিবারের অবদান কম নয়।

এ অঞ্চলের তিনটি রাস্তা এই পরিবারের তিন ব্যক্তির নামে নামাঙ্কিত হয়েছে—দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রিট, নীলমণি মিত্র স্ট্রিট ও অবিনাশ মিত্র লেন। রাস্তাগুলির পরিচয় দেবার আগে এই মিত্র পরিবার সম্বন্ধে দু'চার কথা বলা দরকার। এই পরিবারের আদি পুরুষ বেহালার সন্নিকটে বড়িষা গ্রাম ছেড়ে কোন্নগরে

বসবাস আরম্ভ করেন আনুমানিক ১৫০০ খ্রিঃ। কোন্নগর ছেড়ে আড়িয়াদহে বসতি স্থাপন করেন রামচন্দ্র মিত্র। তিনি সেখানে শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, নির্মাণ করে দিয়েছিলেন বুড়ো শিবের ঘাট। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র জগন্নাথপ্রসাদ মিত্র সপ্তদশ শতকের তৃতীয় পাদে (১৬৩৩) ভাগ্যান্বেষণে এসেছিলেন সুতানুটি গ্রামে। তিনি এখানে এসে কী পেশায় নিযুক্ত হন সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। জগন্নাথপ্রসাদের জ্যেষ্ঠপুত্র কৃষ্ণকিঙ্কর ১৬৯৮ খ্রিঃ সুতানুটিতে বাসভবন নির্মাণের জন্য একখণ্ড বড় জমি ক্রয় করেন। তাঁর তৃতীয় পুত্র দুর্গাচরণ (১৭১০-১৭৮৭) ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন এবং যে ক'জন বাঙালি নিজেদের অধ্যবসায় ও কর্মদক্ষতায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে শহর কলিকাতায় প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি লাভ করেন দুর্গাচরণ তাঁদের অন্যতম। তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পাটনা আবগারি মহলে একচেটিয়া ব্যবসা করতেন। তমলুকে তিনি নিজামের দেওয়ানি পান। পরে নবাব সিরাজদৌল্লার কোর্ট-জুয়েলার হন। দুর্গাচরণ তাঁদের ভদ্রাসনের উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত একলপ্তে ১১ বিঘা জমি ক্রয় করেন এবং তার উপর ৪টি পুষ্করিণী সহ সাত মহলা এক বিশাল অট্টালিকা নির্মাণ করেন। ১৭৮৭ সালে দুর্গাচরণের মৃত্যুর পর এই বিশাল ভবন নিলামে ওঠে। মুর্শিদাবাদের দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত সেন এই সম্পত্তির বেশি অংশ খরিদ করেন। ভবনটির অবস্থান ছিল—এখানকার যতীন্দ্র মৈত্র পার্ক, যতীন্দ্রমোহন অ্যাভিনিউ-এর কিছু অংশ এবং দেওয়ান লেনের পূর্বাঞ্চল নিয়ে। পরবর্তীকালে দেওয়ান কৃষ্ণকান্তের নামে এই বাড়ির নাম হয় দেওয়ান বাড়ি। কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা যতীন্দ্রমোহন অ্যাভিনিউ নির্মাণের সময় এই বাড়িটি অধিগ্রহণ করেন। সে সময় স্থানীয় পল্লীবাসীর তরফ থেকে অনুরোধ করা হয় দেওয়ান বাড়ির যে অংশে কবি রামপ্রসাদ সেন বসবাস করতেন সেই অংশটুকু স্মৃতিচিহ্ন রূপে যেন রক্ষা করা হয়। সে আবেদন রক্ষিত হয়নি। তবে রামপ্রসাদ যে অংশে বাস করতেন সেই অংশটুকু উদ্যান হিসাবে রাখা আছে। মহিমেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র এক পত্রের মাধ্যমে কলিকাতা পুরসভাকে ওই উদ্যানটিকে রামপ্রসাদ সেনের নামে নামাঙ্কিত করার অনুরোধ জানান। সে প্রস্তাবও গৃহীত হয়নি।[৭] অবশ্য অনেক পরে রামপ্রসাদের নামে অপর একটি উদ্যান নামাঙ্কিত হয়েছে, সে প্রসঙ্গে পরে আসছি।

দুর্গাচরণ মিত্রের নামে এই অঞ্চলে দীর্ঘ একটি পথ আছে। চিৎপুর রোড থেকে শুরু হয়ে যতীন্দ্রমোহন অ্যাভিনিউকে অতিক্রম করে এঁকে বেঁকে পূর্ব দিকে এগিয়ে হরি ঘোষ স্ট্রিটে এসে পড়েছে। এটি কলিকাতার প্রাচীন পথগুলির অন্যতম। আপজন সাহেবের কলিকাতা মানচিত্রে (১৭৯৩-৯৪) এই রাস্তার কিছু কিছু অংশ চিহ্নিত আছে। ১৮২৫ সালের কলিকাতা পুরসভার Assessment Register-এ এই রাস্তাটির উল্লেখ আছে। কলিকাতা পুরসভা বিভিন্ন সময় কিছু কিছু জমি অধিগ্রহণ করে রাস্তাটি প্রশস্ত করার চেষ্টা করেছেন।

দুর্গাচরণের সেরেস্তায় মুহুরি ছিলেন হালিশহরের কুমারহট্টের ভক্ত কবি রামপ্রসাদ সেন (আনুঃ ১৭২০-১৭৮১)। দারিদ্র্যের জন্য অতি অল্প বয়সে এই চাকুরি গ্রহণ করেছিলেন, উত্তরকালে যিনি সাধক কবি রামপ্রসাদ সেন বলে পরিচিত হন। তিনি সেরেস্তায় কাজের ফাঁকে ফাঁকে শ্যামা সঙ্গীত লিখতেন জমিদারের হিসাবের খাতায়। জমিদারের নায়েব বিষয়টি জমিদার দুর্গাচরণের কর্ণগোচর করলে তিনি হিসাবের খাতায় গান দেখে মুগ্ধ হন। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এই প্রসঙ্গে লিখেছেন—"মনিব ছুটি দিয়ে দিলেন, রামপ্রসাদকে বললেন, তুমি বাড়ি যাও। এখানে যেমন ত্রিশ টাকা মাইনে পেতে তেমনি পাবে তুমি বাড়ি বসে। তুমি মার নামে গান গাও।"[৮] দুর্গাচরণের আনুকূল্যে রামপ্রসাদ সংসার চিন্তা থেকে মুক্ত হন। ভগবৎ সাধনায় মনোনিবেশ করেন। পরবর্তী কালে শক্তি সাধক, কবি ও গায়ক হিসাবে লোকপ্রসিদ্ধ হন। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর ভক্তিপূর্ণ সঙ্গীত শুনে তাঁকে ১০০ বিঘা জমি দান করেন। তাঁর রচিত কালী কীর্ত্তন সঙ্গীত "রামপ্রসাদী সঙ্গীত" নামে পরিচিত। তিনি একখানি বিদ্যাসুন্দর কাব্যও রচনা করেছিলেন। তাঁকে কবিরঞ্জন উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে ওই অঞ্চলের একটি ঘেরা জমিকে কবি রামপ্রসাদ সেনের নামে নামাঙ্কিত করার এক প্রস্তাব কলিকাতা পুরসভার বিবেচনার জন্য পেশ করা হয়। যে কোনও কারণেই হোক সেদিন সে প্রস্তাব অনুমোদিত হয়নি। প্রায় ১৮ বছর পরে এই পল্লীর পৌর প্রতিনিধি

সুধীরচন্দ্র মুখার্জি ১৯৫৬ সালে ব্ল্যাকওয়ার উদ্যানের নাম পরিবর্তন করে সাধক কবি রামপ্রসাদের স্মৃতিরক্ষার্থে সাধক রামপ্রসাদ উদ্যান নামাঙ্কিত করার এক প্রস্তাব দিলেন কলিকাতা পৌরসভায়। প্রস্তাবটি সম্বন্ধে কিছু বলার আগে ব্ল্যাকওয়ার সম্বন্ধে দু'চার কথা বলা দরকার। এই অঞ্চলে ব্ল্যাকওয়ারের নামে উদ্যান ছাড়াও আরও দুটি রাস্তা আছে। সেকালের কলিকাতায় ব্ল্যাকওয়ার ছিলেন খ্যাতিমান পুরুষ। ডব্লু.সি. ব্ল্যাকওয়ার (Mr. W.C. Blacquire) ১৭৫৯ খ্রিঃ ইংল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন। ভারতে আসেন ১৭৭৪ খ্রিঃ। ৬০ বছর ব্যাপী তিনি কলিকাতার প্রধান পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট পদে আসীন ছিলেন। তিনি ছিলেন বহু ভাষাবিদ্ এবং বিভিন্ন বিষয়ে সুপণ্ডিত। জন ক্লার্ক মার্শম্যান কেরি সাহেবের যে জীবনীগ্রন্থ লিখেছেন তাতে ব্ল্যাকওয়ার সাহেবকে "Brahmanised European" বলে অভিহিত করা হয়েছে। মার্শম্যান ওই পুস্তকে আরও মন্তব্য করেছেন "notorious for his hostility to Christianity and his indifferent character"। খ্রিস্টানদের কাছে শ্রদ্ধেয় না হলেও এদেশবাসী তাঁকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করত। এদেশের আচার-ব্যবহার, ভাষা, এখানকার সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁর সম্যক ধারণা ছিল। তিনি স্যার উইলয়াম জোন্সের বন্ধু ছিলেন। ১৫ আগস্ট ১৮৫৩ সালে ব্ল্যাকওয়ার সাহেবের মৃত্যু হলে পরদিন ১৬ই আগস্ট ১৮৫৩ সালের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই শোকসংবাদ প্রকাশ করেন : "খেদ পূর্বক প্রকাশ করিতেছি আমাদিগের নগরের পূর্বতন শান্তিরক্ষক ও সুপ্রিম কোর্টের দোভাষী, বিবিধ বিদ্যা বিশারদ মহামান্য প্রাচীনবর মেং ব্ল্যাকিয়ার সাহেব গত দিবসে প্রাতে লোকান্তর গমন করিয়াছিলেন।"[৯] তাঁকে সেন্ট জন চার্চের আঙ্গিনায় সমাধিস্থ করা হয়।

ডবলু সি ব্ল্যাকওয়ার-এর নামে গলিপথটি ১২ মার্চ ১৯১৯ সালে কলিকাতা পুরসভা ব্ল্যাকওয়ার লেন নামাঙ্কিত করেন। প্রায় ৪০ বছর পরে ঊনবিংশ শতাব্দীর খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ বনমালী মিত্রের নামে ব্ল্যাকওয়ার লেনটির পুনর্নামকরণের এক প্রস্তাব আসে। কলিকাতা পুরসভা তাঁদের ১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৬০ সালের অধিবেশনে ব্ল্যাকওয়ার লেন নামটি বদল করে 'বনমালী মিত্র লেন' নামকরণ করেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর কলিকাতার শিক্ষাজগতের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ছিলেন বনমালী মিত্র। ১৮২৪ সালে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। তাঁর ইতিহাসের উত্তরপত্র এত উচ্চশ্রেণীর ছিল যে তৎকালীন সরকার সেটিকে সেন্ট্রাল রিপোর্ট অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশনে মুদ্রণের ব্যবস্থা করেন।

বনমালী মিত্র ছিলেন রাজনারায়ণ বসু, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামতনু লাহিড়ী প্রমুখ সুধীবৃন্দের সমসাময়িক। শুধু তাই নয়, হিন্দু কলেজে ভূদেব মুখোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত প্রমুখের সহপাঠী ছিলেন। ১৮৪২ খ্রিঃ হিন্দু কলেজে যে জুনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষা হয়েছিল, তার ফল প্রকাশিত হয়েছিল ১৩ই জানুয়ারি ১৮৪২ সালের ফ্রেন্ডস্ অফ ইন্ডিয়া পত্রিকায়। ওই সংবাদপত্রে বৃত্তি প্রাপকদের যে তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল তাতে দেখা যায় ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও মধুসূদন দত্তের সঙ্গে বনমালী মিত্রও সরকারি বৃত্তি লাভ করেছিলেন।

শিক্ষকরূপে কর্মজীবন শুরু করে পরবর্তীকালে বরিশাল, উত্তরপাড়া, হুগলিতে অবস্থিত বিভিন্ন সরকারি বিদ্যালয়ে প্রায় ২০ বছর প্রধান শিক্ষকের পদ অলংকৃত করেছিলেন। তাঁর সুযোগ্য ছাত্রদের মধ্যে প্রথম ভারতীয় সিভিলিয়ান সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর অন্যতম।[১০]

বনমালী মিত্র ছিলেন একজন সমাজসেবী। তাঁর গুণের স্বীকৃতি হিসাবে তাঁকে অবৈতনিক মিউনিসিপ্যাল ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিয়োগ করা হয়।

বনমালী মিত্রের বাসভবন ছিল ৮নং রামনারায়ণ ভট্টাচার্য লেনে। ১৮৩৮ খ্রিঃ তাঁর পিতা হরিশচন্দ্র মিত্র এই ভবনটি ক্রয় করেন। ১ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৭ খ্রিঃ এই ভবনে তিনি দেহত্যাগ করেন।

বনমালীর জ্যেষ্ঠপুত্র ক্ষেত্র মিত্র ছিলেন একজন মেধাবী ছাত্র। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি.এ. পরীক্ষায় প্রথম হন এবং ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকুরি পান। কর্মসূত্রে বর্ধমানে অবস্থানকালে তিনি একজন মুসলমান আসামিকে পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। এ ঘটনার কিছুকাল পরে

জ্যাকেরিয়া স্ট্রিট ধরে যাবার সময় এক আততায়ী ক্ষেত্র মিত্রের মুখে অ্যাসিড নিক্ষেপ করে। তিনি গুরুতর ভাবে আহত হন এবং ৩/৪ দিন পরে পরলোকগমন করেন। বর্তমানে এই বাড়িতে বনমালী মিত্রের উত্তরপুরুষগণ বাস করেন।

দৃষ্টি ফেরাই ব্ল্যাকওয়ার উদ্যানের নামবদলের প্রসঙ্গে।

সুধীর মুখার্জির নামকরণের প্রস্তাবটি ২৯ নভেম্বর ১৯৫৬ সালে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপিত হয়। জনসাধারণের কাছ থেকে প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কোনও আপত্তি না আসায় কলিকাতা পুরসভা তাঁদের ১০ মে ১৯৫৭ সালের অধিবেশনে প্রস্তাবটি অনুমোদন করেন। ব্ল্যাকওয়ার উদ্যান এইভাবে সাধক রামপ্রসাদ উদ্যান নামাঙ্কিত হয়। উদ্যানের তিন দিকের রাস্তা ব্ল্যাকওয়ার স্কোয়ার নামে আজও নামাঙ্কিত আছে।

দুর্গাচরণ মিত্রের তৃতীয় পুত্র শিবচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র অবিনাশচন্দ্র (১৮৪৬-১৯০৫) আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর মুন্সেফের পদ লাভ করেন। পরে সাব-জজ রূপে কাজ করার পর শিয়ালদহ ছোট আদালতের বিচারকের পদে অধিষ্ঠিত হন। উত্তরকালে ওই আদালতের রেজিস্ট্রার রূপে কার্যভার গ্রহণ করেন। অবিনাশচন্দ্র অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। সুশিক্ষিত পুত্রদের উচ্চশিক্ষার জন্য বিলাত গমনের প্রস্তাবে সম্মতি দেননি। অবিনাশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র জ্যোতিশ্চন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, বঙ্গদেশে প্রথম স্থায়ী ভারতীয় Accountant General। অবিনাশচন্দ্রের বাসভবন ছিল ১নং লাল ওস্তাগর লেন।[১১] পরবর্তীকালে লাল ওস্তাগর লেনের নাম বদল করে অবিনাশচন্দ্র মিত্রের নামে অবিনাশ মিত্র লেন রাখা হয়। সে প্রসঙ্গে এবারে আসছি।

মহারাজ নবকৃষ্ণ তাঁর সুতানুটি তালুকদারিতে নানা পেশার লোকদের বসবাসের যে ঢালাও ব্যবস্থা করেছিলেন সেই সুবাদে দর্জিপাড়ায় বসবাস করতেন দর্জিরা ও ওস্তাগরেরা। দর্জিরা ফরমাশ মতো তৈরি করে দিতেন শোভাবাজার রাজপরিবারের পোশাক-আশাক, আর ওস্তাগরেরা সেই পোশাকে হাতের কাজ করে দিতেন। এঁদের মধ্যে যাঁরা খ্যাতিমান ছিলেন তাঁদের নামে সেকালের দর্জিপাড়ায় দু'একটা রাস্তা নামাঙ্কিত হয়েছিল। গুলু ওস্তাগর লেন ও লাল ওস্তাগর লেন এমনই দুটি রাস্তা। গুলু ওস্তাগার লেন আজও আছে, তবে লাল ওস্তাগর লেন নতুন নামে নামাঙ্কিত হয়েছে।

লাল ওস্তাগর লেনটি বহু প্রাচীন। কলিকাতা পুরসভার প্রথম চেয়ারম্যান শক সাহেব ১৮৬৬ সালে কলিকাতার যে জনগণনা করেছিলেন, সেই প্রতিবেদনে এই রাস্তাটির উল্লেখ আছে। তারও আগে ১৮৪৩ সালের কলিকাতা পুরসভার Assessment Register-এ এই রাস্তাটির খোঁজ পাওয়া যায়। রাস্তাটি দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রিট থেকে শুরু হয়ে সোজা দক্ষিণে এগিয়ে বিডন রো'তে এসে পড়েছে।

১৯১২ সালে লাল ওস্তাগর লেন নামটি বদলের এক স্মারকপত্র পুরসভার বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা হয়। কলিকাতা পুরসভা তাঁদের ১৩ নভেম্বর ১৯১২ সালের অধিবেশনে প্রস্তাবটি বিচার-বিবেচনা করে দর্জিপাড়া মিত্র পরিবারের সন্তান অবিনাশ মিত্রের নামে লাল ওস্তাগর লেনের নাম পরিবর্তন করে 'অবিনাশ মিত্র লেন' নামকরণ করেন।[১২]

দুর্গাচরণের পঞ্চম পুত্র তারিণীচরণের (আনুঃ ১৭৭২-১৮৩৭) জন্ম কলিকাতায়। তিনি ছিলেন বিদ্যোৎসাহী ও সুপণ্ডিত। ইংরেজি, উর্দু, আরবি, ফারসি ও হিন্দি ভাষায় তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির সদস্য ছিলেন। ওই সোসাইটিতে তিন বাঙালি সদস্য—রাজা রাধাকান্ত দেব, মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার ও তারিণীচরণ। পরে তারিণীচরণ ওই সোসাইটির সম্পাদক হন। ১৮০১ খ্রিঃ তিনি ফোর্ট উইলয়াম কলেজের হিন্দুস্থানি বিভাগে দ্বিতীয় মুন্‌শির পদে নিযুক্ত হন। ইংরেজ কর্মচারীদের বাংলা ভাষা শেখানোর জন্য প্রধানত লর্ড ওয়েলেসলির চেষ্টায় এই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হয়েছিল। সে সময় কলেজটি ছিল বর্তমান রাইটার্স বিল্ডিং-এ। ১৮০৯ খ্রিঃ তারিণীচরণ হেড মুন্‌শির পদ লাভ করেন এবং ১৮৩০ সাল পর্যন্ত ওই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ১৮২৮ সালে তিনি জুরি নির্বাচিত হন। সরকারি কর্ম থেকে অবসর গ্রহণের পর কাশীরাজের কর্মচারী নিযুক্ত হন। রাধাকান্ত দেব ও রামকমল সেনের সহযোগিতায় ঈশপের গল্প ও নীতিকথার অনুবাদ করেন। সম্ভবত ১৮০৩ খ্রিঃ Oriental Fabulist-এর অনুবাদ বাংলা, ফারসি ও হিন্দুস্থানিতে

প্রকাশ করেন। সংস্কৃত কলেজে বাঙালি ও হিন্দুস্থানি প্রধান ব্যক্তিদের সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত ধর্মসভার (১৮৩৩) সভ্য ছিলেন। সতীদাহ নিবারণ আইনের বিরোধী ছিল এই সভা। তারিণীচরণ সতীদাহের সমর্থনে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। বারানসীতে তাঁর মৃত্যু হয়।[১৩]

তারিণীচরণের উত্তরপুরুষ ব্রজেন্দ্রলাল (১৮৭৫-১৯৪৯) ছিলেন মিত্র বংশের একজন কৃতী পুরুষ। তিনি সর্বসাধারণের কাছে স্যার বি. এল. মিত্র নামে পরিচিত ছিলেন। ১৯০৪ খ্রিঃ ব্যারিস্টার হন। ১৯১২ খ্রিঃ বাংলার স্ট্যান্ডিং কাউন্সিলের সদস্য, ১৯২৫ খ্রিঃ অ্যাডভোকেট জেনারেল, ১৯২৮ খ্রিঃ কেন্দ্রীয় সরকারের আইন সচিব এবং ১৯৩৪-৩৭ খ্রিঃ বাঙলার শাসন পরিষদের সদস্য হন। চাকুরি থেকে অবসর নিয়ে ১৯৩৭ খ্রিঃ বরোদা রাজ্যের দেওয়ান পদ গ্রহণ করেন। স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনার জন্য যে গণ-পরিষদ গঠিত হয়, তাতে তিনি বরোদা রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলিকে ভারতভুক্তির অন্যতম প্রস্তাবক ছিলেন তিনি। বরোদা রাজ্যের ভারতপ্রজাতন্ত্রের অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে সর্দার প্যাটেলকে সাহায্য করেন। ১৯৪৭ খ্রিঃ নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে পশ্চিমবঙ্গের অস্থায়ী রাজ্যপাল এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনাচার তদন্ত কমিটির সভাপতি ছিলেন। এ ছাড়াও তিনি লিগ অফ নেশনস্-এও ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করেছিলেন । তিনি ৪৮/২, বিডন রো-এর বাড়িতে একসময় বাস করতেন।[১৪] প্রখ্যাত শিল্পস্রষ্টা ভাস্কর মিত্র তাঁরই সুযোগ্য পুত্র।

দুর্গাচরণের মতোই মিত্র বংশের আরেক কৃতী পুরুষ হলেন নীলমণি মিত্র। তিনি ১৭২২ খ্রিঃ সিমুলিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দুর্গাচরণের মধ্যম ভ্রাতা মনোহর মিত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নিমক মুৎসুদ্দি ছিলেন নীলমণি। উত্তম জহুরি ছিলেন। এই জ্ঞানের জন্য মুর্শিদাবাদ নবাবের কোর্ট-জুয়েলার হয়েছিলেন। দামি রত্ন কেনাবেচা করে বহু অর্থ উপার্জন করেন। উপার্জিত অর্থে বিরাট বসতবাটি নির্মাণ করেন। নীলমণি ছিলেন পলাশী আমলের লোক। নবাব সিরাজদৌল্লার কলিকাতা লুণ্ঠনের পর শহরবাসীদের ক্ষতিপূরণ নির্ণয়ের জন্য যে কমিশন বসে নীলমণি সেই কমিশনের সদস্য ছিলেন। প্রচুর অর্থ উপার্জন করলেও জীবনসায়াহ্নে আদালতের শমন অগ্রাহ্য করায় আদালতের আদেশে তাঁর বসতবাটি সরকার বাজেয়াপ্ত করেন। ১৭৯৩ খ্রিঃ কাশীধামে তিনি দেহত্যাগ করেন। শোনা যায় তাঁর দুই পত্নী তাঁর সঙ্গে সহমৃতা হন। পরে এই অঞ্চলে রাধাকৃষ্ণ মিত্র যে প্রাসাদসদৃশ অট্টালিকা নির্মাণ করেন তার সম্মুখের পথটি নীলমণি মিত্রের নামে নামাঙ্কিত হয়। সম্ভবত ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এই রাস্তাটি নির্মিত হয়ে থাকবে। ১৮২৫ সালের কলিকাতা পুরসভার Assessment Register-এ এই পথটির উল্লেখ আছে। রাস্তাটির আকার ইংরেজি 'F' অক্ষরের মত। বিডন রো থেকে শুরু হয়ে পশ্চিম দিকে এগোবার সময় যতীন্দ্রমোহন অ্যাভিনিউকে অতিক্রম করে আরও পশ্চিমে এগিয়ে যদু পণ্ডিত রোড ও রামচন্দ্র ঘোষ লেনের সংযোগস্থলে এসে মিশেছে। এরই দুটি শাখাপথ উত্তর দিকে প্রসারিত হয়ে দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রিটে এসে পড়েছে।

নীলমণি মিত্রের পৌত্র রাধাকৃষ্ণ মিত্র পরিবারের হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনেন। তিনি জাহাজ ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করে প্রতিষ্ঠা ও বহু অর্থ উপার্জন করেন। সেকালের খ্যাতনামা জাহাজ ব্যবসায়ী রামদুলাল দে সরকারের জ্যেষ্ঠা কন্যা বিমলাসুন্দরীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। বিবাহে রামদুলাল কন্যা-জামাতাকে প্রচুর ভূসম্পত্তি দান করেন। যৌতুকপ্রাপ্ত জমিতে রাধাকৃষ্ণ বিশাল অট্টালিকা নির্মাণ করেন। বর্তমানে এটিই দর্জিপাড়া মিত্রবাড়ি নামে পরিচিত। রাধাকৃষ্ণ পরবর্তীকালে রামদুলালের জাহাজ ব্যবসা পরিচালনা করতেন। পরে ১৮৩৯ সালে তিনি নিজস্ব জাহাজ ব্যবসা স্থাপন করেন। পুত্র রাজকৃষ্ণের নামের সঙ্গে নিজ নাম যুক্ত করে প্রতিষ্ঠানের নাম দেন "রাধাকৃষ্ণ-রাজকৃষ্ণ মিত্র অ্যান্ড কোম্পানি"। বোস্টন শহরের আর. সি. ম্যাকের (R.C.Maccay) সঙ্গে তাঁর ব্যবসা সম্পর্ক স্থাপিত হয়। রামদুলাল সরকার ভারত-মার্কিন নৌবাণিজ্যের যে সূত্রপাত করেন জামাতা রাধাকৃষ্ণ সেই সম্পর্ককে দৃঢ়ভিত্তির উপর স্থাপন করেন। রাধাকৃষ্ণের মৃত্যুর পর তাঁর দ্বিতীয় পুত্র রাজকৃষ্ণ এই ব্যবসায়ের কর্ণধার হন। জাহাজ ব্যবসা সূত্রে আমেরিকার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে রাজকৃষ্ণের যে গাঢ় সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তার ফলে ওই ব্যবসায়ীগণ

রাজকৃষ্ণের একটি মৃন্ময় মূর্তি বোস্টন নগরীর ১৬ মাইল দূরে সালেমে স্থাপন করেন। আজও সেই মূর্তি সালেমে বিরাজ করছে।[১৫]

রাধাকৃষ্ণ ও রাজকৃষ্ণ উভয়েই ১৯ নম্বর নীলমণি মিত্র স্ট্রিটের ভবনে বাস করতেন। সেকালের বহু জ্ঞানীগুণীর পদধূলিতে ধন্য হয়েছিল এই ভবন।

রাধাকৃষ্ণের এক পৌত্র কুমুদকৃষ্ণ মিত্র কলিকাতা পুরসভার কমিশনার নিযুক্ত হয়েছিলেন। কুমুদকৃষ্ণের এক উত্তরপুরুষ কলিকাতা হাইকোর্টের বর্তমান বিচারপতি নীরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র।

মদনগোপাল লেন :

রাস্তাটির পূর্ব নাম আরকুলি লেন। এটি কলকাতার একটি প্রাচীন পথ। টাউন কলিকাতার অন্তর্ভুক্ত ছিল আরকুলি মৌজা। রাস্তাটি মৌজার মধ্য দিয়ে প্রসারিত হওয়ায় এর নাম হয় আরকুলি লেন।

১৭৯৪ খ্রিঃ ১৪ সেপ্টেম্বর সপারিষদ গভর্নর জেনারেল একটি ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেন। তাতে মারাঠা খাল বেষ্টিত ভূভাগকে শহর কলিকাতার সীমানা করা হয়েছিল। এই সীমানার মধ্যে ছিল ২০টি মৌজা :

১। দি সেটেলমেন্ট (ডিহি কলিকাতার মধ্যে)
২। বাজার কলিকাতা
৩। ডিহি কলিকাতা
৪। সুতানুটি (বটতলা সমেত)
৫। গোবিন্দপুর (বাজার সহ)
৬। চৌরঙ্গী
৭। সিমলা (আংশিক)
৮। মলঙ্গা (গণেশপুর সহ)
৯। হোগোলকুড়িয়া
১০। উল্টাডিঙ্গি (আংশিক)
১১। ঠনঠনিয়া (ডিহি কলিকাতার মধ্যে)
১২। আরকুলি
১৩। মির্জাপুর
১৪। ডিঙ্গাভাঙা (জলা কলিঙ্গ)
১৫। কলিঙ্গ
১৬। তালপুকুর (কলিঙ্গের মধ্যে)
১৭। ডিহি বিরজী (আংশিক)
১৮। মাকুন্দ
১৯। কিসপুরা
২০। আমহাটি

এই ২০টি মৌজার মধ্যে ১২ সংখ্যক মৌজা আরকুলি। পরবর্তীকালে এই সব মৌজা শহর কলিকাতার মধ্যে বিলীন হয়ে নিজেদের বৈশিষ্ট্য হারায়। ওই সব অঞ্চলে মৌজার নামে যে সব রাস্তা নির্মিত হয়েছিল, তাদের মধ্যে কয়েকটি পথ আজও সেই সব মৌজার নামে বহাল আছে। তারাই প্রাচীন মৌজার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কালের গতিতে ওই সব প্রাচীন নাম বদলে নতুন নামকরণ করায় তারা তাদের পুরানো ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলেছে।

আরকুলি লেন কলেজ স্ট্রিট থেকে শুরু হয়ে প্রথমে পূর্বদিকে এগিয়ে পরে মোড় ঘুরে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিটে এসে পড়েছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে রাস্তাটির নাম পরিবর্তনের এক প্রস্তাব আনেন পুর প্রতিনিধি বাবু অমূল্যধন আঢ্য। কলিকাতা পুরসভার ১০ জুলাই ১৯০৭ সালের অধিবেশনে তিনি এই প্রসঙ্গটি তুলে বলেন যে একই এলাকায় আরকুলি লেন ও আরপুলি লেন প্রায় পাশাপাশি অবস্থান করায় এবং রাস্তার নাম দুটির মধ্যে খুবই সাদৃশ্য থাকায় চিঠিবিলি প্রভৃতি বিষয়ে প্রায়শই অসুবিধা দেখা দিচ্ছে। এর প্রতিবিধানের জন্য তিনি আরকুলি লেনের নাম পরিবর্তন করে মদনগোপাল দে'র নামে মদনগোপাল লেন রাখার সুপারিশ করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে, রাস্তাটির উন্নতিবিধানের জন্য মদনগোপাল দে অনেক অর্থ ব্যয় করেছিলেন। কলিকাতা পুরসভা ওই দিনের অধিবেশনে অর্থাৎ ১০ জুলাই ১৯০৭ খ্রিঃ অমূল্যধন আঢ্যের প্রস্তাব মঞ্জুর করেন। আরকুলি লেন হয়ে যায় 'মদনগোপাল লেন'।[১৬] প্রাচীন একটি জনপথ এইভাবে কলিকাতার বুক থেকে মুছে গেল।

মদনগোপাল দে-র আদি বাসস্থান চন্দননগর। তাঁর পিতামহ পিতাম্বর দে চন্দননগর থেকে

কলিকাতায় এসে কলুটোলা শোভারাম বসাক স্ট্রিটে একটি বাড়ি কেনেন। পারিবারিক বিপর্যয়ে ও অর্থের অভাবে মদনগোপাল স্কুলের পড়া শেষ করতে পারেননি। মাসিক ১৬ টাকা বেতনে তিনি গ্রিমবার্ণ কোম্পানির হিসাবপত্র দেখাশোনার কাজ শিখতে শুরু করেন। পরে তিনি মাসিক ৫৫ টাকা বেতনে গ্রেহাম কোম্পানিতে যোগ দিয়েছিলেন। এর পর হিলজার্স কোম্পানির মুৎসুদ্দি তারকনাথ মল্লিকের সহকারী হন। তারকনাথের মৃত্যুর পর ওই কোম্পানির বেনিয়ান বা মুৎসুদ্দি হন। কিছু অর্থ সঞ্চয় হলে পর তিনি ৫/৬ নং আরকুলি লেনে ৭ কাঠা জমি কিনে গৃহ নির্মাণ করেন। গৃহপ্রবেশ করেন ১৮৬৭ খ্রিঃ। পরবর্তীকালে এই গৃহের সম্প্রসারণ হয়। এরপর মদনগোপাল প্রচুর ভূসম্পত্তির মালিক হন।

মদনগোপালের পরিবার খুবই ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন। চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পূজার উত্তরাধিকার এঁরা এখনও বহন করে চলেছেন। মদনগোপাল তাঁর বাসভবনে প্রতিদিন ধর্মগ্রন্থ পাঠের ব্যবস্থা করেছিলেন। পণ্ডিত নীলকান্ত গোস্বামী তাঁকে টানা ১৪ বছর শ্রীমদ্ভাগবত পড়ে শুনিয়েছিলেন। ১৯১৪ সালে একটি দেবীমূর্তি তৈরি করে স্বগৃহে স্থাপন করেন, দেবীর নামকরণ হয় রেবতী। এই রেবতী ঠাকুরানীর সঙ্গে বলরাম জীউয়ের বিবাহে ১৪০০ গোঁসাই নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। ১৯১৪ সালে ঠাকুরের এই বিবাহ ছিল কলিকাতার একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র ছাপা হয়েছিল। আত্মীয়কুটুম্ব ছাড়া ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও গোস্বামীরা খালি পায়ে ঠাকুরকে দোলায় নিয়ে নগর প্রদক্ষিণ করেছিলেন। হাজার হাজার মানুষ রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে সে শোভাযাত্রা প্রত্যক্ষ করেছিল। ধর্মাচরণের বাইরে বহু দানধ্যানে সেকালের কলিকাতায় তিনি বিখ্যাত হয়েছিলেন। মদনগোপালের জীবিতকালেই আরকুলি লেনের নাম বদল করে তাঁর নামে নামাঙ্কিত করা হয়।[১৭]

মদনগোপালের পাঁচ পুত্রের মধ্যে তৃতীয় শশীভূষণ দে সেকালের কলিকাতায় একজন কৃতী পুরুষ ছিলেন। বহুবাজারে তাঁর নামে একটি রাজপথ আছে। বহুবাজারে হুজুরিমল ট্যাঙ্ক লেনের প্রসঙ্গে শশীভূষণের কাহিনী শোনানো হয়েছে।

গঙ্গাপ্রসাদ লেন : গঙ্গাপ্রসাদ লেন একটি সরু রাস্তা। বনমালী সরকার স্ট্রিট থেকে আরম্ভ হয়ে উত্তর-পূর্ব দিকে এগিয়ে কুমারটুলি স্ট্রিটে এসে পড়েছে। পরবর্তীকালে রাস্তাটিকে আরও উত্তরে প্রসারিত করে শক স্ট্রিট (দুর্গাচরণ ব্যানার্জি স্ট্রিট) পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। কলিকাতা পুরসভা ১২ অক্টোবর ১৯০৯ সালে রাস্তাটি সেকালের বিখ্যাত কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের নামে নামাঙ্কিত করেন।

গঙ্গাপ্রসাদ সেন (১২৩১-১৩০২ বঙ্গাব্দ) প্রখ্যাত আয়ুর্বেদশাস্ত্রী ও সমাজসেবী। গঙ্গাপ্রসাদ ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে উত্তরপাড় করমপুর গ্রামে ২ ভাদ্র ১২৩১ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা নীলাম্বর সেন। কবিরাজ হিসাবে নীলাম্বর ছিলেন অত্যন্ত যশস্বী। জীবনের অবশিষ্ট অংশ পবিত্র গঙ্গাতীরে অতিবাহিত করার উদ্দেশ্যে তিনি কলিকাতার কুমারটুলিতে বসবাসের জন্য আসেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁর গভীর জ্ঞান ও কুশলতা সম্পর্কে কলিকাতাবাসী প্রথমে অবহিত ছিলেন না। রাজা রাধাকান্ত দেবের কুমারটুলিতে মুমূর্ষুদের জন্য নির্মিত ভবনে তিনি মানবতার খাতিরে চিকিৎসা করে কয়েকজন মুমূর্ষু রোগীকে নিরাময় করেন। ফলে তাঁর খ্যাতি অতি অল্প সময়ের মধ্যে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

পিতা নীলাম্বর সেনের কাছে গঙ্গাপ্রসাদ আয়ুর্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ১২৪৯ বঙ্গাব্দে তিনি কুমারটুলিতে চিকিৎসা ব্যবসা আরম্ভ করেন। অচিরে অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করেন। তৎকালের ভারতের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁর চিকিৎসাধীনে ছিলেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও তাঁর চিকিৎসায় ছিলেন। তিনি বাংলাদেশে কবিরাজী চিকিৎসার অন্যতম ধারা প্রতিষ্ঠিত করেন। বিদ্যাসাগর, দীনবন্ধু মিত্র, মহেশ ন্যায়রত্ন প্রমুখের সহিত তাঁর গভীর পরিচয় ছিল।

চিকিৎসা ব্যবসায়ে গঙ্গাপ্রসাদ যেমন লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করেছেন, তেমনি উদারভাবে দান করে গেছেন। বহু রোগীকে তিনি বিনামূল্যে ওষুধ দিতেন। গ্রাম থেকে আসা বহু ছাত্র তাঁর বাসভবনে থেকে আয়ুর্বেদ শিক্ষালাভ করত। রানী ভিক্টোরিয়ার "ভারতসম্রাজ্ঞী" পদবি গ্রহণ উপলক্ষে ১ জানুয়ারি ১৮৭৭ খ্রিঃ কলিকাতায় যে দরবার অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে গঙ্গাপ্রসাদ সেন ও

কবিরাজ রমানাথ সেনকে হিন্দু চিকিৎসা শাস্ত্রে অসাধারণ নৈপুণ্যের জন্য সাম্মানিক প্রশংসাপত্রে ভূষিত করা হয়।[১৮]

গঙ্গাপ্রসাদ সেনের সুযোগ্য পুত্র ভগবতীপ্রসন্ন সেন। তিনি ছিলেন একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠিত কবিরাজ ও বহুগুণান্বিত ব্যক্তি। তাঁর মৃত্যুর পর কুমারটুলির অধিবাসীরা ৯/১, কুমারটুলি স্ট্রিট থেকে শক স্ট্রিট (এখন দুর্গাচরণ ব্যানার্জি স্ট্রিট) পর্যন্ত অনামী রাস্তাটি প্রয়াত কবিরাজ ভগবতীপ্রসন্ন সেনের নামে নামাঙ্কিত করার এক প্রস্তাব দেন। কলিকাতা পুরসভা ১৬ নভেম্বর ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের অধিবেশনে রাস্তাটি 'ভগবতী সেন লেন' নামাঙ্কিত করেন।

৯/১, কুমারটুলি স্ট্রিটের বাড়িটি গঙ্গাপ্রসাদ সেন নির্মাণ করেন। এইটি তাঁর আদি বাড়ি। এই বাড়ির দেওয়াল গাত্রের প্রস্তর ফলকে লেখা আছে : "এই বাড়িতে যুগাবতার ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব কয়েকবার শুভাগমন করিয়া ইহাকে পবিত্র ও ধন্য করিয়াছেন।" রামকৃষ্ণদেবের ব্যবহৃত দ্রব্যসামগ্রী এই গৃহে সযত্নে রক্ষিত আছে। এই আদি বাড়ির বিপরীত দিকে আছে গঙ্গাপ্রসাদের নির্মিত ১৭নং কুমারটুলি স্ট্রিটে অপর এক বিরাট প্রাসাদ। বর্তমানে এই বাড়িতে গঙ্গাপ্রসাদের উত্তরপুরুষগণ বাস করেন। এখানে দোল দুর্গোৎসব প্রভৃতি বিভিন্ন পূজা পার্বণ গঙ্গাপ্রসাদের সময় থেকে আজ পর্যন্ত সাড়ম্বরে হয়ে আসছে।

অন্নদাপ্রসাদ স্ট্রিট :

কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অন্নদাপ্রসাদ সেনের নামে কলিকাতায় একটি রাস্তা আছে। সে কথায় আমরা এবারে আসছি। তিনিও দাদার মতো একজন কৃতী কবিরাজ ছিলেন। কুমারটুলির পৈতৃক বাড়ি ত্যাগ করে দর্জিপাড়া অঞ্চলে বাসভবন নির্মাণ করেন। তাঁর উত্তর-পুরুষগণ ১৬/১ বি, তারক চ্যাটার্জি লেনে বাস করেন। আয়ুর্বেদশাস্ত্রে অন্নদাপ্রসাদ ছিলেন সুপণ্ডিত। তিনি স্বয়ং একটি আয়ুর্বেদ শিক্ষালয় পরিচালনা করতেন। এখানে ৩০ জন ছাত্র বিনা বেতনে শিক্ষা, আহার ও বাসস্থান লাভ করত। শুধু তাই নয়, পল্লীর দরিদ্রজনকে বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ওষুধপত্র দান করতেন।

ছাত্রদের সুবিধার জন্য আয়ুর্বেদ পুস্তক "নিদানের" সংক্ষিপ্তসার রচনা করেন। বিজয়রত্ন সেন, কৈলাস চন্দ্র, গিরিশচন্দ্র বিশারদ প্রমুখ সেকালের খ্যাতনামা কবিরাজগণ তাঁর পদপ্রান্তে বসে শিক্ষালাভ করেছিলেন। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, গৌরীপুরের ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী প্রমুখ সেকালের কলিকাতার সর্বজনশ্রদ্ধেয় পুরুষগণ অন্নদাপ্রসাদের বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন।

কলিকাতা পুরসভা ৩০ জুলাই ১৯৩৪ সালে উত্তর কলিকাতায় একটি রাস্তা অন্নদাপ্রসাদের নামে অন্নদাপ্রসাদ স্ট্রিট নামাঙ্কিত করেন। রাস্তাটি জয় মিত্র স্ট্রিটের অংশ, কালী দত্ত স্ট্রিটের অংশ ও বালাখানা স্ট্রিটের অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত। পরবর্তীকালে যতীন্দ্রমোহন অ্যাভিনিউ নির্মাণের সময় বালাখানা স্ট্রিটের অবলুপ্তি ঘটে। বর্তমানে অন্নদাপ্রসাদ স্ট্রিট যতীন্দ্রমোহন অ্যাভিনিউ-এর মুখ থেকে আরম্ভ হয়ে কালী দত্ত স্ট্রিটের পশ্চিম প্রান্তের গা ঘেঁসে দক্ষিণে এগিয়ে মসজিদবাড়ি স্ট্রিট (অক্ষয়কুমার দত্ত সরণি) ও হরি বোস লেনের সংযোগস্থলে এসে পড়েছে।[১৯]

কলিন স্ট্রিট :

এই রাস্তাটির পূর্ব নাম ছিল কলিঙ্গবাজার স্ট্রিট। এলাকার অধিবাসীরা বলত ভিস্তিপাড়া। ১৭৮৪ সালের উড সাহেবের কলিকাতা মানচিত্রে কলিঙ্গবাজারের উল্লেখ আছে। ১৭৮৮ খ্রিঃ ৪নং-এর ফাইলভুক্ত "তৌবাজারী" বা কলিকাতার বাজার সমূহ জমার যে ফিরিস্তি আছে তার মধ্যে কলিঙ্গ বাজারের নাম পাওয়া যায়। বাজারটির মালিক ছিলেন ফ্রান্সিস ডি মেলো। বার্ষিক জমার পরিমাণ ছিল ২৫০ টাকা। প্রত্যেক দোকানের তোলার হার ছিল ১৩ কড়া।[২০] কলিঙ্গ হল চলতি কথা। আসল নাম কলিম্ব। ১৭১৭ খ্রিঃ সম্রাট ফারুকশিয়ারের ফরমান অনুসারে ইংরেজ কোম্পানি যে ৩৮টি গ্রামের জমিদারি লাভ করেছিলেন, তার মধ্যে কলিম্ব (কলিঙ্গ) গ্রাম অন্যতম। কলিম্বের

অধিকাংশ কলিকাতা পরগনার অন্তর্গত ছিল। বার্ষিক খাজনা ছিল টা. ২৭০-৩-৩ আর বাকি অংশ পাইকান পরগনার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ওই অংশের বার্ষিক খাজনা ধার্য ছিল টা. ১১৩-৪-১০। সুতরাং কলিম্বের মোট খাজনা দিতে হত টা. ৩৮৩-৮-১। [২১] কলিঙ্গ গ্রামটি ছিল চৌরঙ্গী গ্রামের ধারে।

জানবাজার স্ট্রিটের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত ছিল কলিঙ্গবাজার স্ট্রিট। [২২] আর কলিঙ্গ পুষ্করিণীটি ছিল ময়দানে, মেসার্স জন স্টোন ও হপম্যানের ভবনের উল্টো দিকে ১৭৯৩ খ্রিঃ প্রকাশিত আপজনের কলিকাতা মানচিত্রে কলিঙ্গ ট্যাঙ্ক (Colenga Tank) বলে উল্লেখ আছে। [২৩]

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে এই অঞ্চলে ইউরোপীয় বসতি গড়ে ওঠে। সেই সময় বেঙ্গল গেজেটের মালিক ও সম্পাদক জেমস অগাস্টাস হিকি, বিচারক লা মেস্টার (Justice Le Maistre) প্রমুখ সেকালের খ্যাতনামা ব্যক্তিরা এখানে বাস করতেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝ বরাবর থেকে ইউরোপীয় ও ইউরেশিয় বারবনিতারা এই রাস্তায় বসবাস শুরু করে। এই নিয়ে সেকালের পত্র-পত্রিকায় অনেক লেখালেখি শুরু হয়। [২৪]

'কলিঙ্গবাজার স্ট্রিট' কলিকাতার প্রাচীন রাস্তা। এর আকার অনেকটা ধনুকের মতো। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোড থেকে শুরু হয়ে সোজা দক্ষিণে এগিয়ে মারকুইস স্ট্রিটকে অতিক্রম করে, পরে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এগিয়ে ওয়েলেসলি স্ট্রিট (রফি আহমেদ কিদোয়াই রোড)-কে ভেদ করে রিপন স্ট্রিটে (মজফ্ফর আহমেদ স্ট্রিটে) এসে পড়েছে।

১৯১২ খ্রিঃ কলিঙ্গবাজার স্ট্রিটের নামবদলের প্রস্তাব নিয়ে পুরসভা বিচার-বিবেচনা শুরু করেন। ১৭ জুলাই ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে পুরসভার অধিবেশনে বিষয়টি আলোচিত হয়। আলোচনা প্রসঙ্গে পুর কমিশনার ডঃ ব্যাঙ্ক (Dr. Bank) প্রস্তাব দেন, রাস্তাটির নাম সম্পূর্ণ মুছে ফেলে নতুন নামকরণের ব্যবস্থা করা হোক। বর্তমান নামের জন্য ওই রাস্তার ধারে অবস্থিত জমি ও বাড়ির মালিকেরা তাঁদের সম্পত্তির উপযুক্ত মূল্য পাচ্ছেন না। আরেক পৌর কমিশনার মিঃ শেলটন (M.G. Shelton) ডঃ ব্যাঙ্কের প্রস্তাবের উপর একটি সংশোধনী জুড়ে দেন। তাতে বলা হয়েছিল Collinga কথার শেষের দুটি অক্ষর G এবং Aকে বাদ দেওয়া হোক। রাস্তাটির নাম হবে 'কলিন স্ট্রিট' (Collin Street)। সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটি ওই দিনের পুরসভায় (১৭/৭/১৯১২) গৃহীত হয়। [২৫] কলিকাতার রাস্তাঘাটের নামকরণের ইতিহাসে এটি একটি চমকপ্রদ সংযোজন।

ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট :

মট লেনের অংশবিশেষ নিয়ে ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট নামাঙ্কিত হয়েছে। ওয়েলেসলি স্ট্রিট থেকে শুরু হয়ে প্রথমে পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে পরে উত্তর দিকে মোড় ঘুরে রাস্তাটি ধর্মতলা স্ট্রিটে এসে পড়েছে। এই রাস্তার একটি শাখা দক্ষিণে এগিয়ে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোডে এসে মিলেছে।

মট লেন কলিকাতার একটি প্রাচীন পথ। আপজনের কলিকাতা মানচিত্রে এই পথটি দেখানো আছে। কিন্তু কোনও নামাঙ্কন নেই। মট ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। গভর্নর হেস্টিংসের সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় ছিল। হেস্টিংসের ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে মিঃ মটের উল্লেখ আছে। ১৭৬৬ খ্রিঃ ক্লাইভের নির্দেশে উড়িষ্যার হীরের খনির সন্ধানে যান, তার একটি বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করেন। পরবর্তীকালে তিনি পুলিশের কাজে নিয়োজিত হন। ১৭৮১ খ্রিঃ প্রচুর ঋণগ্রস্ত হয়ে কারারুদ্ধ হন। উত্তমর্ণদের দয়ায় ১৭৮৩ খ্রিঃ তিনি কারামুক্ত হন। [২৬]

১৯ মার্চ ১৯১৩ খ্রিঃ কলিকাতা পুরসভা ওয়েলেসলি স্ট্রিটের পূর্ব দিকের মট লেনের অংশ সেকালের বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকা ইন্ডিয়ান মিররের নামে 'ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট' নামাঙ্কিত করেন।

সংবাদপত্রের নামে রাস্তার নামকরণ যে কোনও শহরের ইতিহাসে একটি বিরল দৃষ্টান্ত। সেকালের ইন্ডিয়ান মিরর পত্রিকা কলিকাতার সমাজজীবনকে কীভাবে প্রভাবিত করেছিল তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট নামকরণ। ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিটের আবার নাম পরিবর্তন করে অন্য নামে নামাঙ্কিত করার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সেকালের কলিকাতাবাসী এবং কলিকাতার পত্র-পত্রিকা এমনকী The Statesman পত্রিকা পর্যন্ত কিভাবে সোচ্চার হয়েছিল, সে সব কথা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সেকালের পত্র-পত্রিকায়। এককথায় বলা যায় ইন্ডিয়ান মিরর পত্রিকা সেকালের কলিকাতার

সামাজিক ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

মনমোহন ঘোষের উদোগে এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আর্থিক সহায়তায় ১ আগস্ট ১৮৬১ খ্রিঃ ইন্ডিয়ান মিরর পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। এটি ছিল একটি পাক্ষিক পত্রিকা। এরপর ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন এই পত্রিকার পরিচালক হন। সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন। ১৮৬৬ খ্রিঃ অ্যাটর্নিশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নরেন্দ্রনাথ অ্যাটর্নি হন এবং মিররের সংশ্রব ত্যাগ করেন। ১৮৬৯ খ্রিঃ ১ জানুয়ারি কেশবচন্দ্র পত্রিকাটিকে সাপ্তাহিকে পরিণত করেন। ঠিক ২ বছর পরে অর্থাৎ ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি ইন্ডিয়ান মিরর দৈনিকে রূপান্তরিত হয়। সম্পাদনার ভার পুনরায় নরেন্দ্রনাথ সেনের উপর অর্পিত হয়। সহযোগী সম্পাদক ছিলেন কেশবচন্দ্র সেনের অনুজ কৃষ্ণবিহারী সেন। ১৮৭৯ খ্রিঃ পত্রিকাটির স্বত্বাধিকারী হন নরেন্দ্রনাথ সেন। পত্রিকাটি এক সময় ৫৫, ক্রীক রো থেকে প্রকাশিত হত। এটির মূল্য ছিল-২ আনা। পত্রিকাখানির শিরোভূষণ ছিল, "Velutien Speculum"[২৭]

১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা পুরসভার কিছু ক্ষমতাশালী সদস্য ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিটের নাম বদলে পুরণচাঁদ নাহারের নামে রাস্তাটি নামাঙ্কিত করার এক উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পুরণচাঁদ ছিলেন একজন সমাজসেবী এবং তাঁর ভবনে ছিল এক সুদৃশ্য সংরক্ষণশালা। এই নামকরণের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদের ঢেউ কলিকাতার বুকে আছড়ে পড়ে। প্রতিটি সংবাদপত্র প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিলেন—পত্রিকাগুলি ছিল দি স্টেট্সম্যান, স্টার অফ ইন্ডিয়া, হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড, অ্যাডভান্স প্রভৃতি সংবাদপত্র। কলিকাতার খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠান, যেমন—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ব্রাহ্মসমাজ, আর্যসমাজ, বঙ্গীয় বৌদ্ধ সংস্থা প্রভৃতি কলিকাতা পুরসভাকে নাম পরিবর্তনের উদ্যোগ থেকে বিরত থাকার জন্য আবেদন করেছিলেন। অবশেষে কলিকাতা পুরসভা কলিকাতার নাগরিকদের দাবির কাছে নতি স্বীকার করে ওই প্রস্তাব বাতিল করেন।

অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রথম যে প্রতিবাদ ছাপা হয়েছিল (জুলাই ১৯৩৭) পাঠকদের অবগতির জন্য তা এখানে তুলে দেওয়া হল—

"We are surprised to hear that there is a proposal before the Corporation of Calcutta for renaming the Indian Mirror Street as Puran Chand Nahar Street. The Indian Mirror might be a mere name to the present generation but as a contemporary we know what part it played in the last century in the Indian newspaper world. It was one of the most fearless journals and under the distinguished editorship of the Late Narendra Nath Sen it achieved an all India reputation. The proposal, it seems, aims at obliterating the memory of a great journal, and as an institution it always entitled to greater respect than an individual, we consider the attempt to be extremely unfortunate and hope that the City Fathers will sternly set their face against the proposal."[২৮]

অমৃতবাজার পত্রিকা ইন্ডিয়ান মিরর পত্রিকার ঐতিহাসিক পটভূমিকা সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করে নাম পরিবর্তন না করার জন্য পুরপিতাদের কাছে আবেদন করেছিলেন। সে আবেদন রক্ষিত হয়েছিল। আজও ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট বহাল আছে।

এবার ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিটের পথ পরিক্রমায় বার হওয়া যাক। ৮নং বাড়িতে থাকতেন বিখ্যাত বাইজি আগ্রার মালকাজান। খেয়াল, ঠুংরি, দাদরা, গজলে ছিলেন বিশেষ পারদর্শী। তবে খেয়ালেই তাঁর খ্যাতি ছিল বেশি। তিনি ত্রিপুরার রাজা রাজেন্দ্র দেব বর্মার (সিংহাসন লাভ ১৯০৭ সালে) রাজদরবারে ৩/৪ বছর দরবারি গায়িকারূপে ছিলেন। কলিকাতায়ই তিনি নিয়মিত থাকতেন। নানা দরবারে যেতেন না। এখানকার পেশাদার গায়ক-গায়িকা সমাজে তাঁর যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল এবং বাইজি সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনি নেতৃস্থানীয়া ছিলেন। প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন এবং মিতব্যয়ী স্বভাবের জন্য সঞ্চয়ও করেছেন যথেষ্ট। পরিণত বয়সের আগেই সঙ্গীত জীবন থেকে সরে এসে বিবাহ করে গার্হস্থ্য জীবন যাপন করেন। তাঁর কয়েকখানা গ্রামাফোন রেকর্ড আছে। ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিটের নিজের বাড়িতে তাঁর মৃত্যু হয়।[২৯]

ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিটে একমাত্র ব্রাহ্মণ বাড়ি ছিল মুখুজ্যেদের আবাসভবন। শিক্ষা-দীক্ষায়, ত্যাগ-তিতিক্ষায়, দেশসেবায় এই পরিবারের অবদান অবিস্মরণীয়। পরিবারের তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় গত শতাব্দীর ষাটের দশকে কোনও একসময় আদি বাস চব্বিশ পরগনা জেলার হালিশহর থেকে কলিকাতায় এসেছিলেন তাঁর পিতৃব্যের সঙ্গে। লেখাপড়া করেছিলেন, সেকালের কোনও এক সিনিয়র-জুনিয়র পরীক্ষাও দিয়েছিলেন। পরে কর্মজীবনে বাড়ি করেছিলেন পরিচিত তালতলা পাড়ার উত্তর প্রান্তে ১৪, ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিটে। পরবর্তীকালে বাড়ির নামকরণ করা হয়েছিল, 'তিনকড়ি ভবন'। তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শচীন্দ্রনাথ অল্পকাল দেওঘর এবং কলিকাতার স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, পরে ছোট আদালত এবং হাইকোর্টে ওকালতি করেছেন। একসময় অধ্যাপনা করেছেন রিপন আইন কলেজে (সুরেন্দ্রনাথ কলেজ)। সর্বোপরি আজীবন সাহিত্যচর্চা এবং বহু সংবাদপত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় 'চলমান জীবন' গ্রন্থে লিখেছেন—'শচীন্দ্রনাথ বেঙ্গলী পত্রিকায় সুরেন্দ্রনাথের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। আর ইন্ডিয়ান মিরর পত্রিকার শেষ অধ্যায়ে সম্পাদকীয় রচনার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন শচীন্দ্রনাথ। কিছুকাল কংগ্রেস দলভুক্ত হয়ে কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার হয়েছিলেন।

শচীন্দ্রনাথের বন্ধু সমাগমে তিনকড়ি ভবন মুখরিত হত। পুত্র হীরেন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন—"মাস্টারমশাই (নিবারণ মুখোপাধ্যায়), মৌলিক সাহেব, সৎসঙ্গের কর্ণধার প্রভাস মুখোপাধ্যায় (যাঁর একটা M.R.A.S উপাধি নিয়ে নিদারুণ দুর্বলতা ছিল), কবি মুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী এঁরা প্রায় ছিলেন 'habitue', প্রথম দু'জন তো কখনও অনুপস্থিত থাকতেন না। প্রায়ই আসতেন কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-এর জীবনীকার মন্মথনাথ ঘোষ—মাঝে মাঝে আসতেন হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, মৃণালকান্তি বসুর মতো সাংবাদিক। নামের তালিকা বাড়িয়ে কাজ নেই। কিন্তু সেদিনের আড্ডায় প্রায়ই যে অট্টহাস্য উঠত তা যেন আজকালকার বাঙালি জীবন থেকে অন্তর্ধান করেছে।"[৩০]

শচীন্দ্রনাথের পুত্র হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক—একদিকে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা, বিদগ্ধ সংবাদিক, অসাধারণ বাগ্মী, অন্যদিকে উচ্চশিক্ষিত বহুমানভাজন অধ্যাপক ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা। কলিকাতা ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ ডিগ্রি লাভ করে কলিকাতা ও অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস ও রাষ্ট্রনীতির অধ্যাপক হন। পরবর্তীকালে কলিকাতার সুরেন্দ্রনাথ কলেজে তিনি ছিলেন ইতিহাস বিভাগের প্রধান। ১৯৩৬ সালে তৎকালীন ভারতের বেআইনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন। ১৯৩৮-৩৯ খ্রিস্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫২-১৯৭৭ সাল পর্যন্ত তিনি ভারতীয় পার্লামেন্টের সদস্য ছিলেন। অল্প বয়স থেকেই ছাত্র এবং শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেছেন ; তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—India's Struggle for Freedom, মার্কস, গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, নেহরু ও সুভাষচন্দ্রের ওপর লেখা পুস্তকাবলী।

"তিনকড়ি ভবন"-এর পাশেই ছিল ঘোষেদের বাড়ি। এই পরিবার মনীষী মহেন্দ্রলাল সরকারের আত্মীয়। জাতিতে সদগোপ, প্রচুর বিত্তশালী। যে তিন গ্রাম নিয়ে কলিকাতার পত্তন তার পুরানো বাসিন্দা পরিবারের মানুষ—শোনা যায় ইংরেজ নাকি ঘোষ পরিবারের পূর্বপুরুষদের জমি ছাড়তে বলে অন্যত্র গিয়ে যতটা খুশি বেড়া দিয়ে নিজের সম্পত্তি বানিয়ে নেবার হুকুম দিয়েছিল। ঘোষেদের এই জমির মধ্যে ছিল বাগান, গোশালা, শিবমন্দির, রান্নাবাড়ি, কিছু দূরে পুকুর, আর ছিল শতাধিক নানা আকৃতির নানা ছাঁদের ঘর নিয়ে ছড়ানো ঢাউস, অসম্ভব রকম এলোমেলো বাড়ি, যার উঠোনে হত বারোয়ারি যাত্রা, আর বাগানের খানিকটা অংশে মাঝে মাঝে বাড়ির মালিক ও তার বন্ধুদের ঘোড়সওয়ারী মহড়া চলত। সেকালের এই ভগ্নাংশ রেখাচিত্রের মধ্যে দিয়ে গ্রামীণ কলিকাতার চিত্ররূপটি স্পষ্টরূপে ধরা পড়ে। ঘোষেদের জমিতে গড়ে ওঠা বস্তি উঠিয়ে পুকুর বুজিয়ে খানাখন্দ ভরাট করে নাহারদের প্রকাণ্ড সব বাড়ি বানানো শুরু হয় এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে।

ইন্ডিয়ান মিরর পত্রিকার সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন এই রাস্তায় থাকতেন। বাড়ির নাম ছিল 'আর্য কুটির' (৫২, ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট)। পরে এই বাড়ির অনেক অদলবদল হয়। শোনা যায় বহুদিন পূর্বে ড্যাল সাহেব নামে এক সহৃদয় ভারতবন্ধু পাদরির একটি স্কুল এই বাড়িতে ছিল। আজও এই বাড়িটি লক্ষ করার মতো। প্রকাণ্ড গেট, মাথায় সিংহ, অনেকে একে বলে বাঘওয়ালা বাড়ি। বঙ্গীয় সাহা সমিতি ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে এই বাড়িটি ৩৫,০০০ টাকায় ক্রয় করে এখানে একটি ছাত্রাবাস স্থাপন করেন। সেটি আজও আছে।

ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিটের চেহারা বদলে দেওয়ার ব্যাপারে পূর্বে বর্ণিত ধনী, শিষ্ট, জৈন নাহার পরিবারের অবদান প্রচুর। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় (১৯১৪-১৮) মুর্শিদাবাদ জেলার আজিমগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চল থেকে নাহার পরিবার এখানে এসে অনেকগুলি বাড়ি করে বসবাস শুরু করেন। এই সব বাড়ির একটিকে মন্দির বলা হত। যাকে লোকে জানে 'কুমার সিং হল' বলে। বহুদিন এটি কংগ্রেস পার্টির সভাসমিতির স্থান হিসেবে ব্যবহার করা হত। নবাগত নাহার পরিবারের শিক্ষা, সংস্কৃতি বিষয়ে ছিল প্রচুর আগ্রহ। পূরণচাঁদ নাহার (১৮৭৫-১৯৩৬) ছিলেন একজন জাত সংগ্রাহক। তাঁর যে শিল্প সংগ্রহ এখন আশুতোষ মিউজিয়ামে আছে, প্রতি বছর তার প্রদর্শনী হত কুমার সিং হলে।[৩১]

পূরণচাঁদের জন্ম মুর্শিদাবাদের আজিমগঞ্জে। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৮৯৮ সালে এম.এ. পাশ করেন। বাংলার জৈন সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনিই প্রথম এম.এ.। বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করে শিল্প, ভাস্কর্য, মুদ্রা, পুস্তক ও পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে একক প্রচেষ্টায় এক পুরাতত্ত্ব মিউজিয়াম গড়ে তোলেন। ভাণ্ডারকর প্রাচ্য বিদ্যা সংসদের আজীবন সদস্য। বারানসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক সভায় ভারতীয় জৈন শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি ছিলেন। তাঁর রচিত বহু গ্রন্থের মধ্যে জৈন অনুশাসন লিপি (৩ খণ্ড) উল্লেখ্য। পুত্র বিজয় সিং নাহার কংগ্রেসসেবী ও কংগ্রেসের নানা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। একসময় কলিকাতা পুরসভার কাউন্সিলার, পরে অল্ডারম্যান হয়েছিলেন। কংগ্রেসের মন্ত্রিসভায় একসময়ের পশ্চিমবঙ্গের শ্রমমন্ত্রীর পদে আসীন ছিলেন।

ত্রিশের দশকে চেষ্টা হয়েছিল নাহারদের নামেই এই রাস্তাটি পরিচয় করাবার, পুরানো বাসিন্দাদের পক্ষ থেকে প্রবল আপত্তি ওঠায় ইন্ডিয়ান মিরর পত্রিকার সামান্য স্মৃতিটুকু মুছে দেওয়া তাই সম্ভব হয়নি, অবশ্য এই পরিবারের পূরণচাঁদ নাহারের নাম ধারণ করেছে গোয়ালা গলি বস্তি ভেঙ্গে যে প্রশস্ত রাজপথটি নির্মিত হয়েছিল। এটি লেনিন সরণি (ধর্মতলা স্ট্রিট) আর সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোডকে সংযুক্ত করেছে। এই পথটিকে প্রথমে কলিকাতা পুরসভা ১৭ মে ১৯৩৫ খ্রিঃ তালতলা অ্যাভিনিউ নামাঙ্কিত করেন।

তালতলা অ্যাভিনিউ সম্বন্ধে কিছু বলার আগে তালতলা অঞ্চল সম্বন্ধে দু'চার কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তালতলা এলাকা কলিকাতার প্রাচীন অঞ্চলগুলির অন্যতম। সে সময় এই জায়গার নাম ছিল তালপুকুর। মার্ক উডের কলিকাতা মানচিত্রের উপর চোখ বোলালে দেখা যাবে তালপুকুর ও কলিঙ্গ পাশাপাশি অবস্থানে ছিল। এদের উত্তরে ছিল ডিঙ্গাডাঙ্গা আর দক্ষিণে ছিল চৌরঙ্গী। পরে তালপুকুর হয় তালতলা। সে সময় এই অঞ্চলটি ছিল তালবৃক্ষে সজ্জিত একটি নগণ্য গ্রাম। তালতলার নামকরণ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেন লিখেছেন, "গোড়ার দিকে কলকাতা শহরের মধ্যে বসতিহীন ফাঁকা জায়গা অনেক ছিল। এই ফাঁকা জায়গাগুলিতে যখন অল্প অল্প করে বসতি শুরু হয় তখন পাড়াগাঁয়ের প্রচলিত রীতি অনুসারে কোনও স্থানীয় উল্লেখযোগ্য গাছের (অথবা দেবতার অথবা অন্য বস্তুর) নামের সঙ্গে 'তলা' যোগ করে নাম দেওয়া হত। যেমন বটতলা (বড়তলা), চাঁপাতলা, ডালিমতলা, নেবুতলা, আমড়াতলা (বড়বাজার), বাঁশতলা (বড়বাজার), তালতলা...।" পরবর্তীকালে তালতলা অঞ্চলে যখন ঘন বসতি গড়ে ওঠে, সে সময় কয়েকটি রাস্তাও ওই অঞ্চলের নামে নামাঙ্কিত হয়। যেমন, তালতলা বাজার স্ট্রিট, তালতলা লেন, তালতলা লাইব্রেরি রো, তালতলা অ্যাভিনিউ। এ ছাড়াও পার্ক সার্কাস অঞ্চলে আছে তালবাগান লেন। ডিহি শুঁড়া ও ডিহি শিয়ালদহের মধ্যে ছিল তালপুকুর রোড। বিংশ শতাব্দীর সাতের দশকে কলিকাতা পুরসভা ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮ সালে কম্যুনিস্ট শ্রমিক নেতা কে. জি. বসুর নামে তালপুকুর রোডের

নাম পরিবর্তন করে কে. জি. বসু সরণি নামাঙ্কিত করেন।

কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা ওই অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য ১৯২১ খ্রিঃ একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। নাম 'The Scheme No. XX—Dharmatala Street to Corporation Street'। এর জন্য ৩ লক্ষ টাকা ব্যয়বরাদ্দ ধরা হয়েছিল। পরিকল্পনাটি রূপায়িত হলে পর নতুন যে রাস্তা তৈরি হয় ১৯৩৫ সালে তালতলা অ্যাভিনিউ নামে নামাঙ্কিত হয়। এরপর ১৯৩৯ সালে কলিকাতা পুরসভা তালতলা অ্যাভেনিউ-এর নাম পরিবর্তন করে পুরণচাঁদ নাহারের নামে 'পুরণচাঁদ নাহার অ্যাভিনিউ' করেন। সে নাম আজও বহাল আছে।

স্টার লেন : কলিকাতার শ্রেষ্ঠ একটি রঙ্গমঞ্চের নামে নামাঙ্কিত হয়ে ধন্য হয়েছে স্টার লেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে রাস্তাটি তৈরি হলেও তার কোনও নামকরণ হয়নি। এটি গ্রে স্ট্রিট (শ্রী অরবিন্দ সরণি) থেকে আরম্ভ হয়ে রাজাবাগান স্ট্রিট পর্যন্ত প্রসারিত। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে রাস্তাটির নামকরণ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়। কলিকাতা পুরসভার ডিস্ট্রিক্ট কমিটি এই অনামী রাস্তাটি "ডিস্ট্রিক্ট কমিটি লেন" নামাঙ্কিত করার এক প্রস্তাব দেন। প্রস্তাবটির সমর্থনে বলা হয়েছিল, রাস্তাটি এক নম্বর ডিস্ট্রিক্ট অফিসের পিছন দিকে অবস্থিত। কিন্তু পুরসভার আরও অনেকগুলি ডিস্ট্রিক্ট অফিস থাকায় ডাকবিভাগের চিঠি বিলিতে অসুবিধা হতে পারে বিবেচনা করে এ প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়। পরবর্তীকালে ডিস্ট্রিক্ট কমিটি সুবিখ্যাত স্টার থিয়েটারের নামে রাস্তাটির "স্টার লেন" নামকরণের সুপারিশ করেন। কলিকাতা পুরসভা তাঁদের ৩০শে এপ্রিল ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের অধিবেশনে এই নামকরণের সুপারিশ গ্রহণ করেন। যে ঐতিহ্যমণ্ডিত প্রতিষ্ঠানের নামে রাস্তাটি নামাঙ্কিত হয়ে ধন্য হয়েছে, সে সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার।

কলিকাতা তথা ভারতের নাট্য জগতের ইতিহাসে স্টার থিয়েটারের অবদান স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। একদিকে যেমন এই রঙ্গমঞ্চে নাটক নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে, অন্যদিকে নাটকের মাধ্যমে স্বদেশ-চিন্তা, দেশপ্রেম, ত্যাগ, তিতিক্ষা, সমাজের কু-সংস্কার প্রভৃতি দর্শকের সামনে তুলে ধরে তাঁদের চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করেছে। শুধু তাই নয়, এই রঙ্গমঞ্চ উপহার দিয়েছে একদল উত্তম অভিনেতা, অভিনেত্রী, সফল প্রযোজক, পরিচালক ও নেপথ্য শিল্পী, সর্বোপরি বাঙালি জাতির এক অংশকে নাট্য-পিপাসু করেছে।

১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে ৬৮নং বিডন স্ট্রিটে স্টার থিয়েটারের প্রথম পত্তন হয়। নটী বিনোদিনীর মনোবাসনা পূর্ণ করার জন্য গুর্মুখ রায়ের অর্থে এই ভবনটি নির্মিত হয়। প্রথমে ঠিক হয়েছিল নবনির্মিত থিয়েটার ভবন বিনোদিনীর নামে "বি থিয়েটার" নামাঙ্কিত হবে। কিন্তু সেকালের নাট্যজগতের কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তির আপত্তিতে ওই প্রস্তাব প্রত্যাহৃত হয়। পরে নবনির্মিত রঙ্গমঞ্চের নাম হল স্টার থিয়েটার। এর দ্বারোদ্ঘাটন হয়েছিল ২৩ শে জুলাই ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে, ওই দিন মঞ্চস্থ হয়েছিল মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষের লেখা "দক্ষযজ্ঞ" নাটক।

ছ'মাস চালাবার পর গুর্মুখ রায় থিয়েটার ছেড়ে চলে যান। গুর্মুখ রায়ের পর এই থিয়েটারের মালিক হন অমৃতলাল মিত্র, অমৃতলাল বসু, দাসুচরণ নিয়োগী ও হরিপ্রসাদ বসু। সে সময় স্টার থিয়েটার জনপ্রিয় হয়ে পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে চলতে থাকায় মতিলাল শীলের নাতি গোপাললাল শীল থিয়েটার ব্যবসায়ে প্রলুব্ধ হন। স্টার থিয়েটারের জমির মালিক ছিলেন কীর্তি মিত্র। গোপাললাল কীর্তি মিত্রের কাছ থেকে থিয়েটারের জমি কিনে নেন এবং স্টার থিয়েটারের পরিচালক গোষ্ঠীকে ২১,০০০ টাকা দিয়ে রঙ্গমঞ্চ ভবন আসবাব সমেত অধিকার করেন। কিন্তু স্টার থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ তাঁদের goodwill বিক্রি করা থেকে বিরত থাকেন। ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে এই হস্তান্তর ঘটে। গোপাললাল শীলের থিয়েটারের নাম হয় এমারেল্ড থিয়েটার (Emerald Theatre)। এই থিয়েটারে গিরিশচন্দ্র ঘোষ বার্ষিক ২০,০০০ টাকা বোনাসসহ উচ্চ বেতনে নিযুক্ত হন।

বিডন স্ট্রিটের স্টার থিয়েটারে ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে গিরিশচন্দ্র ঘোষের "চৈতন্যলীলা" মঞ্চস্থ হয়। ২১ শে সেপ্টেম্বর ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ "চৈতন্যলীলা" দেখার জন্য থিয়েটার ভবনে পদার্পণ করেন। স্যার এডুইন আর্নল্ড (Sir Edwin Arnold)-এর লেখা ''The Light of Asia'' অবলম্বনে গিরিশচন্দ্র ঘোষ "বুদ্ধদেব চরিত" নাটক রচনা করেন। এই নাটক যখন মঞ্চস্থ হয়, সে

সময় আর্নল্ড সাহেব কলিকাতায় ছিলেন। তিনি ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে স্টার থিয়েটারে এসে এই নাটক দেখে প্রীত হন। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ (তখন নরেন্দ্রনাথ) "বুদ্ধদেব চরিত" ও "বিল্বমঙ্গল" নাটক দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। শোনা যায়, নীলদর্পণে অর্ধেন্দু মুস্তাফির অভিনয় দেখে বিদ্যাসাগর চটিজুতো ছুঁড়ে মেরেছিলেন, যে কাহিনী বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে আছে। কিন্তু ইন্দ্র মিত্র তাঁর 'সাজঘর' পুস্তকে এই ঘটনাকে কষ্টকল্পিত বলে উল্লেখ করেছেন। সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ (বর্তমানে যতীন্দ্রমোহন অ্যাভিনিউ) নির্মাণের সময় ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে পুরাতন স্টার থিয়েটার ভবনটি ভেঙে ফেলা হয়। সে সময় এই রঙ্গমঞ্চের নাম ছিল "মনমোহন থিয়েটার"।

এদিকে পুরানো স্টার থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ নতুন থিয়েটার ভবন নির্মাণে তৎপর হলেন। তাঁরা হাতিবাগান অঞ্চলে ৩০ কাঠার একখণ্ড জমি ২৭,০০০ টাকায় ক্রয় করলেন। এই জমিতে কাগুজি মুসলমানরা বাস করত। অমৃতলাল বসু লিখেছেন, "এদেশের কাগুজি মুসলমানরা পুরনো কাগজ ভিজিয়ে তার মাড় বার করে একরকম কাগজ প্রস্তুত করত, তার নাম ছিল বাঙ্গালা কাগজ ; ছেলেদের পাঠশালে লিখা থেকে কাছারি গদির খাতাপত্র পর্যন্ত সেই কাগজে প্রস্তুত হত। হাতিবাগানে যে জমিতে স্টার থিয়েটার, সেইখানে অনেক কাগুজে মুসলমানের বাসা ও কারখানা ছিল।" তৎকালীন রেলওয়ের ইঞ্জিনিয়ার যোগেন্দ্রনাথ বসু এই রঙ্গমঞ্চ ভবনের নক্সা তৈরি করে দেন। থিয়েটারের ভেতরের অঙ্গসজ্জা ও মঞ্চসজ্জার ভার গ্রহণ করেন সেকালের খ্যাতনামা মঞ্চশিল্পী ধর্মদাস সুর। ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে স্টার থিয়েটারের নতুন ভবনের নির্মাণকার্য শুরু হয়। ৩০ শে ডিসেম্বর ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে স্টেটসম্যান পত্রিকায় নতুন ভবনের নির্মাণকার্য সম্পর্কে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় :—

"Star Theatre : The new building is under construction at 76/3, Cornwallis Street (Grey Street Crossing) where all communications are received and business transactions transacted during the day—Amritalal Basu, Manager."

নির্মাণকার্য সমাপ্ত হলে ২৬ শে এপ্রিল ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে গৃহপ্রবেশ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ওইদিন হাতিবাগানের সকল পণ্ডিতমণ্ডলী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বাড়িটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছিল ১$\frac{১}{২}$ লক্ষ টাকা, আসন সংখ্যা ছিল ১৫০০।[৩২]

২৫ শে মে ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে নবনির্মিত স্টার রঙ্গমঞ্চের দ্বারোদ্ঘাটন হয়। 'সেবক' ছদ্মনামে রচিত গিরিশ ঘোষের পাঁচ অঙ্কের নাটক "নসীরাম" ওইদিন মঞ্চস্থ হয়।

নানান ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে হরিপ্রসাদ বসু অন্যান্য স্বত্বাধিকারীদের অংশ কিনে নিয়ে পূর্ণ স্বত্বাধিকারী হন। পরে স্টার থিয়েটার ভবনটি হাইকোর্টের নিলামে ওঠে। সিমলার অমিয় দে নিলামে এই বাড়িটি কিনে নেন। বর্তমানে এই থিয়েটার ভবনের মালিক এই অমিয় দে'র উত্তরপুরুষেরা।

স্টার রঙ্গমঞ্চ বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠী ও সংস্থার অভিনয়ে ধন্য হয়েছিল। অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, অনঙ্গমোহন হালদার, গিরিমোহন মল্লিক, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিভিন্ন সময়ে নাটক অভিনয়ের জন্য মঞ্চটি ব্যবহার করেছিলেন। শুধু বাংলা নাটক নয়, হিন্দি নাটক মঞ্চস্থ করবারও ব্যবস্থা হয়েছিল। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে এই রঙ্গমঞ্চে "কৃষ্ণ বিলাস" ও "রাম অশ্বমেধ" নামে দুটি হিন্দি নাটক মঞ্চস্থ করা হয়।

সেকালের খ্যাতনামা নাট্যকারদের সাড়া জাগানো নাটক মঞ্চস্থ করে এই থিয়েটার দর্শকমন জয় করেছিল—গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'প্রফুল্ল' (১৮৮৯), ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'প্রতাপাদিত্য' (১৯০৩), নন্দকুমার (১৯০৫), 'পদ্মিনী' (১৯০৫), 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০৬), দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'রাণা প্রতাপ' (১৯০৫) প্রভৃতি।

এদিকে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে শুরু হয় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন। বঙ্গভঙ্গের দিন ধার্য হয়েছিল ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ। সারা দেশ উত্তাল হয়ে উঠেছিল। স্টার থিয়েটারও এতে অংশ নিয়েছিল। অমৃতবাজার পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে ওইদিন অভিনয় বন্ধ রাখা হয়েছিল—

"Mourning at the Star !
Partition of Bengal ! No
Amusement work at
the Star Theatre ! On
Wednesday, 6th September."

এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে স্টার থিয়েটারের জাতীয়তাবোধ সৃষ্টির মহান দায়িত্ব পালনের ভূমিকা ধরা পড়ে।

শুধু বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনই নয়। সামাজিক সমস্যাগুলির প্রতি বঙ্গবাসীদের অবহিত করার জন্য ওই জাতীয় নাটক মঞ্চস্থ করে স্টার থিয়েটার সমাজসংস্কারের ভূমিকা পালন করেছে। ওইসব নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—অমৃতলাল বসুর 'খাস দখল" (১৯১২), তারকনাথ গাঙ্গুলির "স্বর্ণলতা", দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "পরপারে" প্রভৃতি। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রযোজনায় শরৎচন্দ্রের "বিরাজ বৌ" প্রথম মঞ্চস্থ হয় স্টার থিয়েটারে।

এরপর স্টার থিয়েটার শেক্সপিয়ারের নাটক অনুবাদ করে মঞ্চস্থ করার ব্যবস্থা করে—১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে "মার্চেন্ট অফ ভেনিস", ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে "ওথেলো", ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে "ম্যাকবেথ"।

১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে আর্ট থিয়েটার এই রঙ্গমঞ্চের পরিচালনার ভার গ্রহণ করে এবং অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের "কর্ণার্জ্জুন" নাটক মঞ্চস্থ করে থিয়েটারে নতুন যুগের প্রবর্তন করে। এরপর রবীন্দ্রনাথের একটির পর একটি নাটক অভিনীত হতে থাকে এই মঞ্চে। নাটকগুলি হল—'চিরকুমার সভা', 'গৃহপ্রবেশ', 'শোধবোধ', 'রাজা ও রানী', 'পরিত্রাণ', 'বৈকুণ্ঠের খাতা' প্রভৃতি। ২৫ শে জুলাই ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে 'চিরকুমার সভা' এবং ১৯ শে ডিসেম্বর ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে 'গৃহপ্রবেশ' নাটক দেখতে কবি স্বয়ং স্টার থিয়েটারে এসেছিলেন। সঙ্গে এসেছিলেন দিনেন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ—বিশেষ করে নাটকের সঙ্গীত ও দৃশ্যাবলী পর্যবেক্ষণ করতে।

১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে শিশিরকুমার ভাদুড়ি তাঁর "নব নাট্য মন্দির" গোষ্ঠী নিয়ে নাটক পরিচালনায় স্টার রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন, তাঁর প্রযোজনা ও সুযোগ্য পরিচালনায় শরৎচন্দ্রের 'বিজয়া', 'বিরাজ বৌ' ও 'অচলা' মঞ্চস্থ হয়েছিল। এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ'ও অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। শুধু তাই নয়, 'রীতিমত নাটক' অভিনয় করে সকলকে রীতিমত চমকে দিয়েছিলেন।

১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে স্টার থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী হলেন সলিলকুমার মিত্র। তখন তাঁর বয়স মাত্র ২৪ বছর। পিতা উপেন মিত্র মিনার্ভা থিয়েটার পরিচালনা করতেন। মিনার্ভা থিয়েটার আগুনে পুড়ে যাওয়ায় উপেন মিত্র বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। ক্ষতিগ্রস্ত থিয়েটার ভবনকে সংস্কার করে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত মিনার্ভা থিয়েটার পরিচালনা করেন। পরে আর্থিক কারণে তিনি ওই থিয়েটারের সংস্রব ত্যাগ করেন। পুত্র সলিলকুমার লিজের ভিত্তিতে স্টার থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী হন। ১৯৩৮ থেকে ১৯৭১ সাল—এই দীর্ঘ ৩৩ বছর স্টার থিয়েটার তাঁর নিয়ন্ত্রণে ছিল। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে একদিকে যেমন স্টার থিয়েটারের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ঘটিয়ে তাকে আধুনিক নাট্যমঞ্চে রূপান্তরিত করেছিলেন, অন্যদিকে কলিকাতার মৃতপ্রায় নাট্যমঞ্চগুলির প্রাণ সঞ্চারের পথ-প্রদর্শক হয়েছিলেন সলিল মিত্র। সেদিন যদি সলিল মিত্রের মতো ব্যক্তিত্ব নাট্যজগতে না আসতেন তবে বাংলার নাট্যজগতের অকালমৃত্যু কেউ রোধ করতে পারত না। তাই সলিল মিত্রের কর্মধারা এবং সে সময়ের নাট্যজগতের পরিস্থিতি সম্বন্ধে দু-চার কথা বলা দরকার মনে করি।

স্টার থিয়েটারে সলিল মিত্রের স্থিতিকালকে তিনভাগে ভাগ করা যায়।

প্রথম, ১৯৩৮ থেকে ১৯৫২ সাল—এই সময় স্টারের নাট্যকার ও নাটক পরিচালক ছিলেন মহেন্দ্র গুপ্ত। তিনি নানা স্বাদের ঐতিহাসিক নাটক পরিবেশন করে দর্শকদের প্রশংসা কুড়িয়ে ছিলেন। এই সময় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, ৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলন, ৪৩-এর মন্বন্তর, ৪৬-এর সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা প্রভৃতি ঘটনা-প্রবাহ দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর আঘাত হেনেছিল, তেমনি নাট্যজগতে এনেছিল এক বিরাট বিপর্যয়। সে সময় যখন কলিকাতায় একটির পর একটি থিয়েটারের দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল, সলিল মিত্র তাঁর কর্মকুশলতা, সাহস ও ধৈর্য নিয়ে

এইসব বাধা বিপত্তিকে অতিক্রম করে স্টার থিয়েটারকে এক সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।

দ্বিতীয় পর্যায় শুরু ১৯৫২ সাল থেকে—ওই সময়ে নাট্যজগতের অবস্থা আরও অবনতির দিকে যেতে থাকে। সলিল মিত্র বুঝলেন, নতুন ভাবধারা নাট্যজগতে সঞ্চারিত করতে না পারলে নাট্যমঞ্চকে বাঁচানো যাবে না। প্রথমে তিনি নাট্যমঞ্চকে সংস্কার করলেন। সেই সঙ্গে নাট্যমঞ্চকে ঘূর্ণায়মান করার ব্যবস্থা করলেন। যামিনী মিত্র ও শিশির মল্লিকের পরিচালনায় নিরুপমা দেবীর সামাজিক উপন্যাস "শ্যামলী" মঞ্চস্থ করা হয়। নাট্যরূপ দিলেন চিত্র ও মঞ্চ পরিচালক নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্ত। পরবর্তীকালে যামিনী মিত্র ও শিশির মল্লিক স্টার থিয়েটারের সংস্রব ত্যাগ করলে দেবনারায়ণ গুপ্ত থিয়েটারের পরিচালক হন। ছায়াছবির প্রিয় তারকা উত্তমকুমার ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়কে নায়ক-নায়িকার ভূমিকা দেওয়া হয়। ফলে "শ্যামলী" হয়ে গেল এক মঞ্চসফল নাটক। কলিকাতার নাট্য মহলে প্রাণের স্পন্দন এসে গেল। কলিকাতার নাট্যগোষ্ঠী বন্ধ নাট্যমঞ্চগুলি পুনরায় খোলার জন্য তৎপর হলেন। রঙমহল থিয়েটার স্টার থিয়েটারের পদাঙ্ক অনুসরণ করল। রঙমহলের কর্তৃপক্ষ থিয়েটার ভবন সুসংস্কৃত করে ছায়াছবির নায়ক-নায়িকা দিয়ে নতুন নাটক "উল্কা" পরিবেশন করেন। বন্ধ শ্রীরঙ্গম নতুন করে খোলার জন্য ব্যবসায়ী রাসবিহারী সরকার এগিয়ে এলেন। শ্রীরঙ্গমের নতুন নাম হল 'বিশ্বরূপা'। মিনার্ভা থিয়েটারও একই পথের পথিক হয়েছিল। সলিল মিত্রের প্রদর্শিত পথই মুমূর্ষু নাট্যজগতকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

সলিল মিত্র কিন্তু এখানেই থেমে থাকেননি। এরপরে শুরু হল তাঁর তৃতীয় পর্যায়ের কর্মধারা। প্রায় ৫০০ রজনী অভিনীত 'শ্যামলী' নাটক স্টার থিয়েটারকে শক্ত আর্থিক বনিয়াদের উপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। সলিলবাবু স্টার থিয়েটার ভবনের আমূল সংস্কার এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তনে তৎপর হলেন যা কিনা সে সময়ের যে কোনও নাট্যমঞ্চ কর্তৃপক্ষের কাছে অকল্পনীয় ছিল। স্টার থিয়েটার কলিকাতার প্রথম আধুনিক শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত নাট্যমঞ্চ। এই সময়ে দেবনারায়ণ গুপ্তের সুযোগ্য পরিচালনায় অনেকগুলি নতুন স্বাদের মঞ্চসফল সামাজিক নাটক স্টারে অভিনীত হয়েছিল।

শিল্পীদের প্রয়াসকে যথাযথ মর্যাদা দেবার জন্য সলিল মিত্র গুণীজন সম্বর্ধনা ও সকল শিল্পীদের পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা করেছিলেন স্টার থিয়েটারে। প্রতিটি নাটকের শততম রজনীর অভিনয়ের দিন অভিনেতা-অভিনেত্রী, পরিচালক, নেপথ্য শিল্পী, থিয়েটারের সকল কর্মচারীকে পারিতোষিক বিতরণের ব্যবস্থা ছিল। এমনকি ওইদিনের উপস্থিত দর্শকবৃন্দও একটি করে উপহার লাভ করতেন। এখানেই শেষ নয়, শিল্পী ও কর্মীদের সামাজিক নিরাপত্তার জন্য দেবনারায়ণ গুপ্তের পরামর্শে ১৯৬৬ সালে থিয়েটারে প্রভিডেন্ট ফান্ডের প্রচলন হয়েছিল।[৩৩]

এই শতাব্দীর সাতের দশকে থিয়েটারে ক্রমাগত নকশাল হাঙ্গামার সূত্রপাত হয়। অবশেষে নিরুপায় হয়ে সলিল মিত্র ৩০ শে মার্চ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে রঞ্জিতমল কাংকারিয়াকে স্টার থিয়েটার হস্তান্তর করে দেন। সেই সময় থেকে তাঁরই তত্ত্বাবধানে থিয়েটার পরিচালিত হচ্ছে। ১৯৮৮ সালে এই নাট্যমঞ্চের শতবর্ষ পূর্ণ হয়। স্টার থিয়েটারের অবদান স্মরণ করে এই নাট্যমঞ্চে কোনও অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয়নি, কারণ সেই সময় নাট্যমঞ্চে Lockout ঘোষিত হয়েছিল। অবশেষে ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই অক্টোবর এই ঐতিহাসিক রঙ্গমঞ্চ আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায়।

শুধু নাট্যপিপাসুদের মনোরঞ্জনের জন্যেই স্টার রঙ্গমঞ্চ ব্যবহৃত হত তাই নয়, সেকালের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক সভা-সমিতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল এই নাট্যমঞ্চে। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর ২৮ শে এপ্রিল ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে স্টারে শোকসভা হয়, শ্রোতা ও দর্শক হিসাবে 'হিসাবে চারু বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন। সেইদিনই তিনি প্রথম রবীন্দ্রনাথকে দেখেন। তিনি লিখেছেন, "সেইদিন আমি রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখলাম এবং তাঁর মধুর অথচ তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর শুনে ও সুন্দর চেহারা দেখে একটু আকৃষ্ট হলাম।"

আমেরিকা থেকে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনের পর স্বামী বিবেকানন্দকে ৪ঠা মার্চ ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে স্টার থিয়েটারে সংবর্ধনা জানানো হয়। সভাপতি ছিলেন নরেন্দ্রনাথ সেন। সভায় প্রবেশের জন্য

দামি টিকিটের ব্যবস্থা ছিল। তা সত্ত্বেও লোক হয়েছিল যথেষ্ট। সভাপতি নরেন্দ্রনাথ সেন স্বামীজির পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, "আমার বিশ্বাস, আজ সন্ধ্যায় যিনি বক্তা—তিনি আধুনিক ভারতীয় চিন্তাধারার মোড় ঘুরিয়ে দেবার ব্যাপারে, হিন্দুজাতির মধ্যে নবজীবন সঞ্চারের কার্যে, এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে ঘনিষ্ঠ বন্ধনে বাঁধবার প্রচেষ্টায়, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের হস্তের একটি সর্বাধিক শক্তিশালী যন্ত্র হয়ে উঠবেন।..." সেদিন 'স্টার থিয়েটারে'র সভায় স্বামীজি নিজের প্রথম বয়সের ধর্ম সন্ধানের বিষয়ে অংশত জানিয়েছিলেন, "বালক বয়েসে এই কলিকাতা শহরে আমি ধর্মান্বেষণে এখানে ওখানে ঘুরিতাম, আর বড় বড় বক্তৃতা শুনিবার পর বক্তাকে জিজ্ঞাসা করিতাম, আপনি কি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন? ঈশ্বরদর্শনের কথায় সে ব্যক্তি চমকিয়া উঠিতেন। একমাত্র রামকৃষ্ণ পরমহংসই আমাকে বলিয়াছিলেন, 'আমি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছি'। শুধু তাহাই নহে, তিনি আরও বলিয়াছিলেন, 'আমি তাঁহার দর্শন লাভ করিবার পথ তোমাকে দেখাইয়া দিব'।

স্বামীজির এই বক্তৃতা কলিকাতার শিক্ষিত সমাজের মন জয় করে নিয়েছিল। সংবাদপত্রে উচ্ছ্বসিত মন্তব্য করা হয় এই সম্বন্ধে। বিবেকানন্দ কত বড় বাগ্মী তার বিচার করবার চেষ্টাও করা হয়।[৩৪]

স্বামী অখণ্ডানন্দ তাঁর স্মৃতিকথায় এই বক্তৃতা প্রসঙ্গে লিখেছেন যে এরূপ সুদীর্ঘ জ্বালাময়ী বক্তৃতা তিনি বঙ্গদেশে আর কখনও শোনেননি। সেদিন বক্তৃতার রঙ্গমঞ্চে বাগ্মিপ্রবর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, আনন্দমোহন বসু, ডঃ জগদীশচন্দ্র বসু, বিপিন পাল, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ কলিকাতার যাবতীয় গণ্যমান্য সুধীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।[৩৫]

বঙ্গদেশে অসহযোগ আন্দোলনের সময় স্টার থিয়েটারের এক মহতী সভায় সাহিত্যিক পরিমল গোস্বামী উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁর 'স্মৃতিচিত্রণ' পুস্তকে এই সভার এক প্রাণবন্ত বিবরণ দিয়েছেন—

"একদিন স্টার থিয়েটারে সভা। চিত্তরঞ্জন দাশ সভাপতি এবং গান্ধীজি বক্তা। বিজ্ঞপ্তি পড়ে স্টার থিয়েটারে গিয়ে আসন দখল করেছিলাম। চিত্তরঞ্জন দাশ আসতে দেরি করছেন, গান্ধীজির তো কোন খবর নেই, আমরা অধীর হয়ে উঠেছি, এমন সময় সভার উদ্যোক্তারা একটি নতুন জিনিস করলেন। তাঁরা ছাত্রসমাজ থেকে একজনকে সভাপতি করে দিলেন। এই ছাত্র শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

"গান্ধীজির পিঠে এক ভারী চটের থলে, তার ভারে তিনি নুয়ে পড়েছেন। তিনি এসেই ঘোষণা করলেন, তাঁর থলেয় রয়েছে বাঙালি মহিলাদের অলঙ্কারের দান। মহিলাদের এক সভায় তিনি এতক্ষণ বক্তৃতা করছিলেন, তাঁর অসহযোগ আন্দোলনের সাফল্য কামনায় সবাই নিজ নিজ অলঙ্কার খুলে দিয়েছেন গান্ধীজির হাতে। গান্ধীজি মঞ্চে প্রবেশমাত্র তাঁর মুখে স্পটলাইট নিক্ষেপ করা হল নাটকীয় ভঙ্গীতে। সব মিলে বেশ একটা উত্তেজনা। হাততালি আর হর্ষধ্বনিতে প্রেক্ষাগৃহ ফেটে পড়ছে—যেন সত্যি সত্যি একটা নাটকের দৃশ্য।

"আমি পাশের বন্ধুকে চুপে চুপে বলছি—'আসলে গান্ধীজি বাংলাদেশে এসে ডাকাতি করে গেলেন।' অবশ্য এই জাতীয় ডাকাতিতে গান্ধীজি ছিলেন ওস্তাদ। পরে শুনেছি অনেকেই গয়না পরে গান্ধীজির সভায় মেয়েদের যেতে দিতেন না।"

বিবেকানন্দের স্মৃতিসভারও আয়োজন হয়েছিল স্টার থিয়েটারে ২৭শে ফেব্রুয়ারি ১৯২২-এর অপরাহ্ণে। বিবেকানন্দ স্মৃতিসভায় সভাপতিত্ব করার জন্য স্বামী অভেদানন্দ স্টার থিয়েটারে উপস্থিত হয়েছিলেন। সভায় বক্তা ছিলেন মাননীয় নারায়ণ আয়েঙ্গার এবং অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সম্প্রদায়ের মুখপাত্র মিঃ মরেনো (Mr. H.W. Moreno)।[৩৬]

এগুলি ছাড়াও আরও অনেক সভা-সমিতি সেকালের জ্ঞানী-গুণীদের সভাপতিত্বে স্টার থিয়েটারে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। স্টার রঙ্গমঞ্চ এমনিভাবেই বাংলার সমাজ জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে পড়েছিল।

রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস : এই রাজপথটির পুরানো নাম ছিল নিউ চায়না বাজার স্ট্রিট। এই পথটির এবং পরবর্তীকালে যে প্রতিষ্ঠানের নামে রাজপথটি নতুন নামে নামাঙ্কিত হয় উভয়েরই ইতিহাস

যেমন আকর্ষণীয় তেমনি মনোরম। শুধু তাই নয়, এই রাস্তাটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে দ্বিতীয় নাট্যশালার ইতিহাস। প্রথম নাট্যশালাটি ছিল এই রাস্তার খুব কাছাকাছি। তাই তার সম্বন্ধে দু'চার কথা বলা খুবই প্রাসঙ্গিক।

কলিকাতার প্রথম নাট্যশালার জন্ম ১৭৪৫ খ্রিস্টাব্দের কোনও এক সময়। লালদিঘির উত্তর-পূর্ব কোণে লিনটন ওয়াচ কোম্পানির ভবনটি যেখানে, কলিকাতার প্রথম নাট্যশালা সেখানেই অবস্থিত ছিল। নাট্যশালার নাম ছিল "দি প্লে হাউস" (The Play House)। নাট্যশালাটি সম্বন্ধে যৎসামান্য তথ্য জানা গেছে। অপেশাদার অভিনেতারা এখানে অভিনয় করতেন। লন্ডনের লব্ধ-প্রতিষ্ঠিত অভিনেতা ডেভিড গ্যারিক স্বয়ং এঁদের অনেককে অভিনয় শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁর এই ক্লেশ স্বীকারের জন্য তাঁর গুণমুগ্ধ ভক্তরা ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা থেকে "কৃতজ্ঞতার নিদর্শন" স্বরূপ দু' পিপে Madira (একপ্রকার মদ) উপহার পাঠিয়েছিলেন তাঁকে। ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে নবাব সিরাজদ্দৌল্লার কলিকাতা আক্রমণের সময় এই রঙ্গালয়ের প্রাঙ্গণেই কামান বসানো হয়েছিল। কারণ এখান থেকে ইংরেজদের প্রাচীন দুর্গের নিশানা পাওয়া যেত। ওই দুর্গটি জেনারেল পোস্ট অফিস, ক্যালকাটা কালেক্টরেট ও তৎকালীন ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ের প্রধান কার্যালয়ের অধিকৃত স্থান জুড়ে ছিল। কলিকাতার যুদ্ধে এই রঙ্গালয়টি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরে ইংরেজ কোম্পানি কলিকাতা পুনরায় অধিকার করার পর সামরিক বাহিনীকে অভিনন্দন দেবার জন্য রঙ্গালয়টি পুনঃ সংস্কৃত ও সুসজ্জিত করা হয়। পরবর্তীকালে রঙ্গালয়টি আর চালু ছিল কি না জানা যায়নি।

কলিকাতার দ্বিতীয় নাট্যাশালা "ক্যালকাটা থিয়েটার" বা দি নিউ প্লে হাউসের (The New Play House) জন্ম ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দে। জনসাধারণের চাঁদায় এক লক্ষ টাকা ব্যয়ে অভিনয় ভবনটি নির্মিত হয়েছিল। লায়ন্স রেঞ্জের উত্তর-পূর্ব কোণে এক বিশাল ভূখণ্ডের উপর। বর্তমানে ওই জায়গায় মেসার্স ফিনলে মিউর অ্যান্ড কোম্পানির (Messrs Finlay Muir & Co) অফিস। এই রঙ্গমঞ্চ সেকালের নাট্যপিপাসুদের ১৭৭৫ থেকে ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মনোরঞ্জন করেছিল। এর সঙ্গে ছিল একটি নাচঘর, ইংরেজিতে যাকে বলরুম (Ballroom) বলা হত। এখানে অনুষ্ঠিত হত নানা আকর্ষণীয় উৎসব। সেকালের ইংরেজদের এটি ছিল একটি মিলন কেন্দ্র। গভর্নর জেনারেল কর্নওয়ালিস ও ওয়েলেসলির শাসনকালে নানা সরকারি অনুষ্ঠান এবং প্রায়শই প্রাতঃরাশের আয়োজন করা হত এই নাচঘরে। ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস, প্রথম প্রধান বিচারপতি এলাইজা ইম্পে প্রমুখ ইংরেজ রাজপুরুষগণ রঙ্গালয়ের জন্য মুক্তহস্তে দান করেছিলেন। বার্নাড মেসিশ্‌ক নামে এক ইংরেজ এসেছিলেন খাস ইংল্যান্ড থেকে নাট্যশালাটির তদারক করতে। হার্টলি হাউসে এই থিয়েটারের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পাওয়া যায়। নবনির্মিত হাউসটি আকারে লন্ডনের বাথ থিয়েটারের প্রায় সমান, আলোকসজ্জা ইংরেজি কায়দায় পরিকল্পিত এবং পাদপ্রদীপেরও চমৎকার ব্যবস্থা ছিল। কাঁচের আধার দেওয়া বাতিদানগুলি নির্দিষ্ট দূরত্বে অবস্থান করত। রাইটার্স বিল্ডিং-এর অবস্থান দক্ষিণের বাতাস আসার পথ রোধ করত বলে বায়ু চলাচল দ্বারা রঙ্গালয়টি শীতল রাখার জন্য ছাদে ঘুলঘুলির ব্যবস্থা ছিল। এই থিয়েটারের দ্বাররক্ষকরা সকলেই ইউরোপীয় ছিল।

মিসেস ফে'র পত্রাবলীতেও এই নাট্যশালার উল্লেখ আছে। একটি পত্রে তিনি লিখেছেন—"রঙ্গালয়টি সাধারণের চাঁদায় তৈরি এবং অতি নিপুণ হস্তে সজ্জিত। রঙ্গমঞ্চ ও দৃশ্যপটগুলি এ দেশে যতদূর আশা করা যায় তদনুরূপ, অভিনয় যারা করেছেন, তারা কেউ পেশাদার নন, অভিনয় যা হয়েছে তাতে হলপ করে বলতে পারি কোনও ইউরোপীয় রঙ্গমঞ্চের মানহানির কারণ ঘটবে না।"

রঙ্গালয়ের বক্সের টিকিটের মূল্য ছিল এক মোহর, পিটের (pit) দাম ১২ সিক্কা টাকা। আর গ্যালারির জন্য নেওয়া হত ৬ সিক্কা টাকা। এই টিকিটের দামের সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে মিসেস ফে (Mrs. Fay) লিখেছেন, "That a gold Mohur was really too much to bestow upon such a temporary gratification."

কালক্রমে সাহেবপাড়ার আনন্দ উৎসবের কেন্দ্রভূমি লালবাজার এলাকা থেকে ক্রমশ চৌরঙ্গী অঞ্চলের দিকে সরে আসে। ফলে এই নাট্যশালা উপেক্ষিত ও পরিত্যক্ত হয়। পরে ১৮০৮

খ্রিস্টাব্দে গোপীমোহন ঠাকুর এই রঙ্গমঞ্চ ভবন এবং তার আশেপাশের জমি কিনে নিয়ে ওখানে একটা বাজার নির্মাণ করেন। ওই বাজারের নাম হয়েছিল নতুন চিনে বাজার।[৩৭] নতুন এই চিনে বাজারের লাগোয়া জমির এক নিমগাছের তলায় কলিকাতার প্রথম শেয়ার বাজার বসত। পরে নতুন চিনে বাজার উঠে গেলে সেই জায়গার উপর দিয়ে যে রাস্তা হয় তার নাম রাখা হয় নিউ চায়না বাজার স্ট্রিট। The Bengal and Agra Annual Guide & Gazetteer for 1841, Vol. I, Part III থেকে কলিকাতার পথঘাট, হাটবাজার ও বিভিন্ন স্থানের বিবরণ পাওয়া যায়। এই বিবরণে নিউ চিনা বাজার স্ট্রিটের উল্লেখ আছে। রাস্তাটি ছিল লায়নস্ রেঞ্জের উত্তরে, পুরাতন কেল্লার (Old Fort) উল্টো দিকে। আজকের দিনের মতো এই রাস্তাটি তখন এতটা প্রসারিত ছিল না। কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা ব্রেবোর্ন রোড (বিপ্লবী ত্রৈলোক্য মহারাজ সরণি) নির্মাণের সময় এই রাস্তাটিকে প্রসারিত করে ব্রেবোর্ন রোড পর্যন্ত নিয়ে যান। রাস্তাটির উন্নয়নের পূর্বে এখানে স্থাপিত হয়েছিল রয়েল এক্সচেঞ্জ বিল্ডিং। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের সম্পাদক নিউ চায়না বাজার স্ট্রিটের নাম পরিবর্তন করে রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস নামাঙ্কিত করার এক প্রস্তাব কলিকাতা পুরসভার কাছে পেশ করেন। কলিকাতা পুরসভার ডিস্ট্রিক্ট II কমিটি প্রস্তাবটি বিবেচনা করে তা গ্রহণের সুপারিশ করেন। ৩রা ডিসেম্বর ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে পৌর অধিবেশনে এই সুপারিশ গৃহীত হয়। নিউ চায়না বাজার স্ট্রিটের নতুন নাম হয় 'রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস'। রাস্তাটি ক্লাইভ স্ট্রিট (নেতাজি সুভাষ রোড) থেকে আরম্ভ হয়ে সোজা পূর্ব দিকে এগিয়ে ব্রেবোর্ন রোডে এসে পড়েছে। এরই একটা শাখাপথ দক্ষিণে এগিয়ে লায়ন্স রেঞ্জে মিশেছে।

রয়েল এক্সচেঞ্জ ও বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স যে প্রাসাদোপম অট্টালিকায় অবস্থিত, সে জায়গায় ক্লাইভের বাসভবন ছিল।[৩৮] অনেকে বলেন এখন যেখানে মেসার্স গ্রাহাম এ্যান্ড কোম্পানির দপ্তরখানা, সেখানেই ছিল ক্লাইভের বাসভবন।[৩৯] সে যাই হোক, এরপর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাউন্সিলের সদস্য স্যার ফিলিপস্ ফ্রান্সিস এই আবাসভবনের অধিকারী হন। স্যার ফ্রান্সিস্ এই ভবনটি ১৭৭৫ খ্রিঃ ক্রয় করেন এবং ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে মিঃ লিভিয়াসকে (Mr. Livius) ৩০,০০০ টাকায় বিক্রয় করেন।[৪০] পরে এই জায়গা ওরিয়েন্টাল ব্যাঙ্কের অধিকারে আসে। সিপাহি মহাবিদ্রোহের অনেক পূর্বে ওরিয়েন্টাল ব্যাঙ্ক এই স্থানে স্থাপিত হয়েছিল। সিপাহি আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে এই অট্টালিকার দোতলায় মিউটিনি গেট (Mutiny Gate) বসানো হয়েছিল। অবশ্য সে গেটের কোনও প্রয়োজন হয়নি।

এবার রয়েল এক্সচেঞ্জের প্রতিষ্ঠার কথায় আসা যাক। কলিকাতায় যে প্রথম চেম্বার অফ কমার্স স্থাপিত হয়েছিল তার নাম দি ক্যালকাটা চেম্বার অফ কমার্স। এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে। ঠিক এই প্রকারের প্রতিষ্ঠান বোম্বাই ও মাদ্রাজে দু' বছর পূর্বে স্থাপিত হয়। দি ক্যালকাটা চেম্বার অফ কমার্স ছিল বন্ডেড ওয়েরহাউসে (Bonded Warehouse)। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে দি ক্যালকাটা চেম্বার অফ কমার্সের অবলুপ্তি ঘটে। এই বছরের নভেম্বর মাসে দি বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের পত্তন হয়। সে সময় কলিকাতা শহরের ৮৬ জন এবং শহরতলির ১৮ জন সদস্য নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানটি গঠিত হয়। এটিও বন্ডেড ওয়েরহাউসে অবস্থিত ছিল।

দি বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের প্রতিষ্ঠার ৪ বছর বাদে কলিকাতায় ব্যবসা বিনিময় কেন্দ্র (Commercial Exchange in Calcutta) স্থাপনের তোড়জোড় শুরু হয়। ৩০শে নভেম্বর ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গল চেম্বারের সাধারণ সভায় ব্যবসা বিনিময় কেন্দ্র খোলার প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১লা জুন ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে এই বিনিময় কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়। কিন্তু ২৭শে জুন ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের সভায় বিনিময় কেন্দ্রের নাম বদল করে ব্রোকার্স এক্সচেঞ্জ (Broker's Exchange) রাখা হয়। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে যখন স্যার জেমস এল ম্যাকে (Sir James L. Mackay) এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হলেন, তাঁরই উদ্যোগে বর্তমান রয়াল এক্সচেঞ্জ স্থাপিত হয়। ভারতের তৎকালীন ভাইসরয় ও গভর্নর-জেনারেল ল্যান্সডাউনের সুপারিশে রানী ভিক্টোরিয়ার রাজকীয় অনুমতিপত্র পাওয়া গিয়েছিল। এরপর প্রতিষ্ঠানটি ওরিয়েন্টাল ব্যাঙ্কের ভবনটি কেনার জন্য বাজারে ঋণপত্র বিক্রয় করে অর্থের সংস্থানে তৎপর হলেন। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে ওরিয়েন্টাল ব্যাঙ্কের ভবনটি রয়াল এক্সচেঞ্জের

অধিকারে আসে। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে রয়াল এক্সচেঞ্জের গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় এবং বিদায়ী গভর্নর জেনারেল ল্যান্সডাউনকে এই ভবনে ভোজে আপ্যায়িত করা হয়।[৪১]

পুরাতন ভবন ভেঙে ফেলে বর্তমান রয়াল এক্সচেঞ্জ ভবন ৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়েছিল। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলার ছোটলাট লর্ড রোনাল্ডসে (Lord Ronaldsay) এই ভবনের উদ্বোধন করেন। এই ভবনের একতলা দি রয়াল এক্সচেঞ্জের অধিকারে এবং দোতলায় দি বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের দপ্তরখানা।[৪২]

রয়েল এক্সচেঞ্জের সদস্যসংখ্যার বহুল বৃদ্ধিতে কলিকাতায় এই প্রতিষ্ঠানের উপযোগিতা সে সময় প্রমাণিত হয়েছিল। রয়েল এক্সচেঞ্জ স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিনিময়ের ফাটকাবাজি বন্ধ করা। প্রথম মহাযুদ্ধের পর এর প্রয়োজনীয়তা ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। তিনের দশকে যখন সারা পৃথিবীব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয় এবং বিনিময়ের স্বর্ণমুদ্রামান তুলে দেওয়া হয়, তখন থেকেই রয়েল এক্সচেঞ্জের কাজকারবার প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। ভারতের স্বাধীনতার পরবর্তীকালে রয়েল এক্সচেঞ্জের সম্পূর্ণ অবলুপ্তি ঘটে, যদিও ভবনটি অতীতের স্মারকরূপে রয়েল এক্সচেঞ্জ নাম নিয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে। ভবনটির মাথায় শোভা পাচ্ছে রানী ভিক্টোরিয়ার প্রদত্ত রাজকীয় স্মারক চিহ্ন।

এর পরেই আসছে রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেসের নতুন নামকরণের কাহিনী। ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে তাঁদের নতুন ভবন "ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ" নির্মাণে তৎপর হন। ১৮ই মার্চ ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এই ভবনের শিলান্যাস করেন। ভবনটির নক্সা ও নির্মাণকার্যের ভার গ্রহণ করেন কলিকাতার খ্যাতনামা স্থপতি প্রতিষ্ঠান ব্যালার্ডি থমসন অ্যান্ড ম্যাথিউ (Ballardie Thompson & Mathew)। ১৯৫৫-৫৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ বিল্ডিং-এর নির্মাণ কার্য সমাপ্ত হয়।

কলিকাতা পুরসভা তাঁদের ২৪শে আগস্ট ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের অধিবেশনে রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেসের নাম বদল করে 'ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস' নামাঙ্কিত করেন।[৪৩]

গোপীমোহন ঠাকুরের স্থাপিত নতুন চিনে বাজারের লাগোয়া জমির এক নিম গাছের তলায় কলিকাতার প্রথম শেয়ার বাজারের পত্তন হয়েছিল সে কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এখন যেখানে চাটার্ড ব্যাঙ্ক বিল্ডিং সেইখানে ছিল এই নিমগাছ। প্রখর সূর্যতাপ ও বর্ষার ধারাপাতকে উপেক্ষা করে এই গাছের তলায় দাঁড়িয়ে শেয়ারের দরদামের হাঁকাহাঁকি হত। যেহেতু এই প্রতিষ্ঠানটি কলিকাতা তথা ভারতের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক লেনদেনের সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট, এর সম্বন্ধে দু' চার কথা বলা যেতে পারে।

কলিকাতা শেয়ার বাজার বা দি ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ অ্যাসোসিয়েশন ১৫ই জুন ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বাবু বলদেও দাস দুধুওয়ালা এবং মেসার্স প্লেস, সিডনস্ ও গাফ কোম্পানির (M/s. Place, Siddons and Gough Co.) মিঃ ওভারএন্ড (Mr. Overend) প্রমুখ। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়ার অনেক আগে থেকেই কলিকাতায় শেয়ার কেনাবেচা প্রচলিত ছিল। প্রাচীন ইংলিশম্যান পত্রিকার পাতা ওল্টালে এর সাক্ষ্য মেলে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ঋণপত্রের শতকরা বার্ষিক ৪ টাকা, ৫ টাকা ও ৬ টাকা হারে তৎকালীন বাজার দর ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দের ইংলিশম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত হতে দেখা যায়। ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি আইন (The Company Act of 1850) প্রবর্তন এবং পরবর্তীকালে কোম্পানির "দায়বদ্ধ ক্ষমতা" (Limited Liability) বিধিবদ্ধ হওয়াতে কোম্পানির স্টক ও শেয়ারে অর্থ লগ্নি করার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। সে সময় রাউস্যাক অ্যান্ড কোং (Roussac & Co.) "দি ডেইলি মানি মারকেট রিপোর্ট" (The Daily Money Market Report) নামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করতেন। ২রা জানুয়ারি ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দের প্রকাশিত ওই মার্কেট রিপোর্টে ৯১টি জয়েন্ট স্টক কোম্পানির শেয়ারের দরদাম প্রকাশিত হয়েছিল। তার মধ্যে ৩৮টি ছিল চা কোম্পানির। সে সময় ৫০জন ভারতীয় দালাল (broker) এই প্রতিষ্ঠানটিকে নিয়ন্ত্রণ করতেন আর ইউরোপীয়দের সংখ্যা ছিল মাত্র ৪ জন। এই সময় চা, পাট ও কয়লা শিল্পই শেয়ার বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করত।

১৯০২ থেকে ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দ-এর মধ্যে কলিকাতায় কয়লার শেয়ার বাজার খুব তেজি হয়েছিল। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে বরাকর কয়লাখনির শেয়ারের মূল্যমান যেখানে ছিল ৮৫ টাকা, ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে ওই শেয়ারের দাম উঠে ৫৪০ টাকা। এর ফলে শেয়ার বাজারে প্রচণ্ড ফাটকাবাজি শুরু হয়ে যায়। আর্থিক বাজারের উপর এর বিশেষ প্রভাব পড়তে দেখা যায়। এই ফাটকাবাজি নিয়ন্ত্রণের ভাবনা এই সময় থেকেই প্রাধান্য পেতে থাকে। একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে তাতে কিছু নিয়মকানুন আরোপ করে এই ফাটকাবাজি বন্ধ করার উদ্যোগ শুরু হয়।

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে চার্টার্ড ব্যাঙ্ক তাদের বর্তমান ভবন নির্মাণের কাজ আরম্ভ করায় শেয়ারের দালালগণ তাঁদের নিমগাছের তলায় পাতা শেয়ার বাজার তুলে নিয়ে এলেন নিকটেই আরেকটি জায়গায়। এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছে এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের বিশাল ভবন সেখানে স্থাপন করলেন তাঁদের তুলে আনা শেয়ার বাজার। এইভাবে কাজ-কারবার চালাতে গিয়ে শেয়ার দালালদের নানান অসুবিধার মুখোমুখি হতে হয়। অবশেষে ঠিক হয় একটা নির্দিষ্ট জায়গা ভাড়া নিয়ে সেখানেই কাজ-কারবার চালাতে হবে। সেই মতো তাঁরা ৯ নম্বর নিউ চায়না বাজারের বাড়িটির উপরের হলঘরটি ভাড়ার ভিত্তিতে গ্রহণ করেন এবং সেই সঙ্গে বাড়ির উঠান এবং বার বাড়িটি অংশীদারি ভিত্তিতে ব্যবহারের সুযোগ পান। এর জন্য ৩৪ জন সম্ভ্রান্ত সদস্য মাসে ৬০ টাকা চাঁদা দিতে স্বীকৃত হন। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে স্থানীয় জনরোষের স্বীকার হয়ে সদস্যরা নিজস্ব ভবন নির্মাণে কৃতসংকল্প হন।

ঠিক সেই সময় ২ নম্বর নিউ চায়না বাজার-এ জে. সি. গলস্টন (J. C. Galstaun) একটি নতুন বাড়ি নির্মাণ করেছিলেন। বাবু বলদেওদাস দুধুওয়ালা এই বাড়ির একতলা এবং মেজনীন ফ্লোর ২০ বছরের ইজারায় নিজের নামে ভাড়া নেন। এর জন্য তাঁকে মাসিক ১০৮০ টাকা ভাড়া এবং কলিকাতা পুরসভার অকুপায়ার শেয়ারের ট্যাক্স দিতে হত। এই ভবনে ১৫০ জন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানের অভিষেক হয় (১৯০৮)। নতুন প্রতিষ্ঠানের খরচখরচা নির্বাহ করার জন্য ৩৫২৫ টাকা চাঁদা সংগ্রহ করা হয়েছিল। প্রথমে সদস্যদের বিনা শুল্কে নাম নথিভুক্ত করার ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে সদস্যদের প্রবেশ শুল্ক ৫০ টাকা ধার্য করা হয়েছিল। প্রথমে যে কমিটি গঠিত হয়েছিল তাতে পাঁচ জন ইউরোপীয় এবং চার জন ভারতীয় সদস্য ছিলেন। মেসার্স প্লেস, সিডন্‌স্‌ ও গাফ কোম্পানির মধ্য থেকে সভাপতি এবং অবৈতনিক সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। আর বাবু বলদেওদাস হয়েছিলেন প্রথম অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ। এই স্টক এক্সচেঞ্জ অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠার সময় ২৩৬টি কোম্পানির শেয়ার এই এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে কেনাবেচা হত। এদের মধ্যে ১০টি ছিল রেল কোম্পানি, ১৯টি ব্যাঙ্ক, ২৬টি পাটকল, ৬৯টি কয়লাখনি কোম্পানি, ৮১টি চা বাগান কোম্পানি এবং ৩১টি ছিল বিবিধ কোম্পানি।

কয়লার এই তেজি বাজার দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়নি। ১৯০৯ সালে এর পতন শুরু হয়। ফলে বহু দালালের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে এবং তাঁরা এই প্রতিষ্ঠানের সংস্রব ত্যাগ করেন। ১৯১০ সালে স্টক এক্সচেঞ্জ এমন শোচনীয় অবস্থায় এসে দাঁড়ায় যাতে কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানটিকে তুলে দেবার কথা চিন্তা করতে থাকেন। কিন্তু এ যাত্রায় উদ্ধার পেলেও প্রথম মহাযুদ্ধের গোড়ার দিকে অর্থাৎ ১৯১৫ সালে শেয়ার বাজার মন্দা হওয়াতে সাময়িকভাবে প্রতিষ্ঠানটিকে বন্ধ করে দিতে হয়। স্টক এক্সচেঞ্জের উপর এই করাল ছায়া অবশ্য দীর্ঘ দিন থাকেনি। যুদ্ধের দৌলতে শেয়ার বাজার তেজি হয়ে ওঠে। বিশেষত পাটের শেয়ার ফুলে ফেঁপে ওঠে। উদাহরণ স্বরূপ হাওড়া জুট মিলের কথা ধরা যাক। প্রতিষ্ঠানটি ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে কোনও লভ্যাংশ প্রদান করেনি। যুদ্ধের ফলে এর ব্যবসা এতটা বৃদ্ধি পেয়েছিল যাতে ১৯১৫ সালে ১৭%, ১৯১৬ সালে ৫৫%, ১৯১৭ সালে ১২% এবং ১৯১৮ সালে ১৩% লভ্যাংশ ঘোষণা করে। শুধু পাট ব্যবসা নয়, যুদ্ধের ফলে কাগজ, কাপড়, চিনি, লৌহ শিল্প, ময়দা কল প্রভৃতি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলিতে উত্তম ব্যবসা হয়। বাজার তেজি হওয়াতে, স্টক এক্সচেঞ্জের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে এবং সদস্যবৃন্দ প্রতিষ্ঠানটিকে রেজিষ্ট্রি করতে মনস্থ করেন।

মেসার্স অর্‌ ডিগনাম অ্যান্ড কোং (Messrs Orr Dignam & Co.) অ্যাসোসিয়েশনের মেমোর‍্যান্ডাম্‌ এবং আর্টিকেল অফ অ্যাসোসিয়েশন তৈরি করে দেন। ১৫ই ডিসেম্বর ১৯২২ সালে

আহূত এক বিশেষ অধিবেশনে এটি অনুমোদিত হয়। ৭ই জুন ১৯২৩ সালে দায়বদ্ধ সমিতি হিসাবে প্রতিষ্ঠানটিকে রেজিস্ট্রিকৃত করা হয়। এর অনুমোদিত মূলধন ছিল ৩ লক্ষ টাকা, প্রতিটি এক হাজার টাকা মূল্যের ৩০০ শেয়ার এই মূলধনের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এরপর অ্যাসোসিয়েশনের নিজস্ব ভবনের জন্য জমি খোঁজা শুরু হল। ১৯২৬ সালে একটি সুবর্ণ সুযোগ আসে। ৭ নম্বর লায়ন্স রেঞ্জের মালিকগণ নিরোজেন্দ্রনাথ দেব, যতীন্দ্রনাথ দেব, সরোজেন্দ্রনাথ দেব, শ্রীমতী চন্দ্রপ্রভা দেব ২রা সেপ্টেম্বর ১৯২৬ সালে অ্যাসোসিয়েশনকে প্রস্তাব দিলেন যে তাঁরা এই জায়গাটি ৯৯ বছরের জন্য স্টক এক্সচেঞ্জ অ্যাসোসিয়েশনকে ইজারা দিতে ইচ্ছুক। প্রস্তাবটি সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করা হয় এবং ৯ই নভেম্বর ১৯২৬ সালে লিজ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১লা মার্চ ১৯২৭ সালে অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে জে. এম. দত্ত এবং সাগরমল নাথানী জায়গাটি গ্রহণ করেন।

সেকালের পূর্তকার্যে খ্যাতিমান ঠিকাদার ম্যাকিন্‌টস বার্নের উপর নতুন ভবন নির্মাণের ভার দেওয়া হয়। এই ৫ তলা বাড়িটি নির্মাণ করতে প্রায় ১৩ মাস সময় লাগে। ১১ই জুন ১৯২৮ সালে নতুন ভবনে গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বাংলার ছোটলাট স্যার স্ট্যানলি জ্যাকসন (Sir Stanley Jackson) ২রা জুলাই ১৯২৮ সালে এই ভবনের দ্বার উন্মোচন করেন। কেদারনাথ খান্ডেলওয়ালা এর প্রথম ভারতীয় সভাপতি এবং মিত্র ব্যানার্জি অ্যান্ড কোং-এর সত্যরঞ্জন মিত্র এর প্রথম ভারতীয় অবৈতনিক সম্পাদক হয়েছিলেন। কলিকাতার এই স্টক এক্সচেঞ্জ ভবনটি লন্ডন স্টক এক্সচেঞ্জ ভবনের অনুকরণে নির্মিত।

এরপর নানান ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এই অ্যাসোসিয়েশনকে চলতে হয়েছিল। ১৯২৯ সালে আমেরিকার ওয়াল স্ট্রিটের মন্দা বাজার ভারতের শেয়ার বাজারের উপর তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ১৯৩১ সালে ইংল্যান্ড বিনিময় হার থেকে স্বর্ণমুদ্রামানকে বাতিল করায় ভারতের শেয়ার বাজার হু হু করে নেমে যায়। এরপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। ১৯৪৬ সালে কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক হানাহানি, ভারতের স্বাধীনতার পর কাশ্মীরের যুদ্ধ, কোরিয়ার যুদ্ধ, চিন ও পাকিস্তানের যুদ্ধ প্রভৃতি একটির পর একটি ঘটনা শেয়ার বাজারের উপর বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল।

পূর্বে শেয়ার বাজার এক স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠান ছিল। ১৯৫৭ সালের ১০ই অক্টোবর কেন্দ্রীয় সরকার The Securities Contracts Regulation Act নামে একটি আইন প্রণয়ন করেন। বর্তমানে এই আইন অনুযায়ী শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।

২৭ শে জুন ১৯৬৯ সালে ভারত সরকার ফরওয়ার্ড ট্রেডিং বন্ধ করে দেন। প্রতিষ্ঠানের ৬৪৪ জন সদস্য সাধারণত শেয়ারের ফাটকাবাজি প্রশ্রয় দেন না, কিন্তু সময় সময় ফাটকাবাজি প্রাধান্য পেয়ে যায়। তার জন্যে অ্যাসোসিয়েশন শেয়ারে লগ্নিকারী জনসাধারণকে শিক্ষিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

লন্ডন ও নিউইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জে প্রতি বছর 'ইয়ার বুক' প্রকাশিত হত। সেই মতো কলিকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ ইয়ার বুক প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন ২৪শে জুলাই ১৯৩৬ সালে। প্রথম ইয়ার বুক প্রকাশিত হয় ১৯৩৭-এ। ইয়ার বুক ছাড়া এই প্রতিষ্ঠান একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করেছিলেন—নাম ''Investing Scene''। এই পত্রিকা প্রকাশের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল লগ্নিকারীকে সাহায্য করা। ৭ জুন ১৯৮২ সালে তাঁরা একটি নতুন বিভাগের পত্তন করেছিলেন—''A Research and Development Dept.''। এ ছাড়া যারা শেয়ার ব্যবসাকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করতে চায় তার জন্য এই প্রতিষ্ঠান একটি নতুন শিক্ষাক্রম চালু করেছিলেন। এতে হাতেকলমে এবং পুথিগত উভয় প্রকারের শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। শিক্ষাকাল তিন মাসের, শিক্ষান্তে সফল পরীক্ষার্থীকে উপাধিপত্র দেবার ব্যবস্থা আছে।[৪৪]

যে নিমগাছের তলা থেকে একদা এই প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু, আজ তা মহীরুহ হয়ে কলিকাতা তথা ভারতের শেয়ার বাজারের অন্যতম নিয়ামক হয়ে উঠেছে।

এই স্টক এক্সচেঞ্জ অ্যাসোসিয়েশন যে রাজপথের উপর দাঁড়িয়ে আছে সেই লায়ন্স রেঞ্জের ইতিহাস কম আকর্ষণীয় নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে এ

অঞ্চলের ঘরবাড়ি লায়ন্স রেঞ্জের ঠিকানায় চিহ্নিত হত। কারণ নিউ চায়না বাজার স্ট্রিট অনেক পরে নির্মিত হয়েছিল, সে কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, এই কারণে কলিকাতার ইতিহাসে লায়ন্স রেঞ্জের গুরুত্ব অপরিসীম।

লায়ন্স রেঞ্জ কলিকাতার প্রাচীন রাস্তাগুলির অন্যতম। ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত উড সাহেবের (Mark Wood) মানচিত্রে এই রাস্তাটির অবস্থান দেখানো আছে। ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দের একটি প্রাচীন গেজেটিয়ার-এ লায়ন্স রেঞ্জ রাস্তা সম্বন্ধে বলা হয়েছে—"কোম্পানী কেরানী কা বাড়ি কা উত্তর রাস্তা।"[৪৫] সে সময় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কেরানিদের বসবাসের বাড়ি বলতে Writers' Buildings-কে বোঝাত। কেরানি অর্থাৎ Writer-রা থাকত বলে ভবনের নাম হয়েছিল Writers' Buildings। সে সময় এটিতে কোনও সরকারি দপ্তরখানা ছিল না। ১৮৫৪ সালে বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট ছিল ১নং কাউন্সিল হাউস স্ট্রিটে। তার বছর দুই পরে এই দপ্তরখানা হেস্টিংস স্ট্রিট ও স্ট্র্যান্ডের সংযোগস্থলে স্থানান্তরিত হয়। ১৮৭০ থেকে দুটি বাড়িতে সরকারি দপ্তরখানা ছিল, একটি চৌরঙ্গীতে অপরটি সদর স্ট্রিটে। ১৮৮০ সালের পর থেকে বর্তমান রাইটার্স বিল্ডিংসে সরকারি দপ্তরখানা হয়।[৪৬] বাংলার ছোটলাট স্যার অ্যাসলি ইডেনের সময় এই ভবনের আমূল পরিবর্তন করা হয়।

যাঁর নামে লায়ন্স রেঞ্জ, সেই টমাস লায়ন্স পলাশী আমলের লোক ছিলেন। গৃহনির্মাণের ঠিকাদারি ছিল তাঁর পেশা। তিনি Writers' Buildings নির্মাণ করে কলিকাতার ইতিহাসে বিখ্যাত হন। সিরাজের কলিকাতা আক্রমণের সময় পুরাতন রাইটার্স বিল্ডিংসের অস্তিত্ব ছিল না। এটি ছিল এক পতিত জমি। এই পোড়ো জমি টমাস লায়ন্সকে কলিকাতার কালেক্টর ১৮ই নভেম্বর ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির জুনিয়ার কর্মচারীদের বাসগৃহ নির্মাণের জন্য পাট্টা দেন। স্টার্নডেল সাহেবের লেখা কলিকাতা কালেক্টরেটের ইতিহাসে (R.C.Sterndales—History of the Calcutta Collectorate) এই পাট্টা সম্বন্ধে অনেক তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের দলিল থেকে দেখা যায় যে এই সম্পত্তি রিচার্ড বারওয়েলকে হস্তান্তরিত করা হয়েছে। পরবর্তীকালে বারওয়েলের নির্দেশে রাইটার্স বিল্ডিংসের বহুমুখী সম্প্রসারণের ব্যবস্থা হয়। কাজটি লায়ন্সের নেতৃত্বে সম্পন্ন হয়। এর জন্য পারিশ্রমিক বাবদ লায়ন্স সাহেব ৪০,০০০ টাকা পান।

লায়ন্স সাহেব কলিকাতায় কোম্পানির জন্য আরও অনেক বাড়ি নির্মাণ করেছিলেন। তার জন্য মাসিক ১২০০ টাকা বেতন এবং ১০% কমিশন তাঁকে দেওয়া হত। এ ছাড়া ইউরোপীয়দের চিকিৎসার জন্য বহরমপুরে এক হাসপাতাল ভবন তৈরি করেছিলেন। গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিস লায়ন্সের কর্মদক্ষতায় প্রীত হয়েছিলেন।[৪৭]

এই টমাস লায়ন্সের নামে বর্তমান রাইটার্স বিল্ডিংসের উত্তরের রাস্তাটি 'লায়ন্স রেঞ্জ' নামাঙ্কিত করা হয়। আজও এই নামটি বহাল আছে। রাস্তাটি পশ্চিমে চার্নক প্লেস (বর্তমানে নেতাজি সুভাষ রোড) থেকে আরম্ভ হয়ে পূর্বদিকে এগিয়ে পরে মোড় ঘুরে রাইটার্স বিল্ডিংস-এর পূর্বদিক দিয়ে ডালহৌসি স্কোয়ার নর্থে এসে পড়েছে। এই রাস্তার দক্ষিণ দিকে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল রাইটার্স বিল্ডিংস আর উত্তর দিকের বড় বড় অট্টালিকায় রয়েছে অসংখ্য সওদাগরি প্রতিষ্ঠান, ছোট বা মাঝারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি।

বার্ট্রাম স্ট্রিট : নিউ মার্কেট (হগ মার্কেট) নির্মিত হবার পর তার পশ্চিম দিকে চলাচলের সুবিধার জন্য একটি রাস্তা নির্মিত হয়। রাস্তাটি ছিল মাত্র ১৯ ফুট প্রশস্ত। নবনির্মিত বাজারটি ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হয়ে ওঠায় বাজারের পশ্চিমদিকের সঙ্কীর্ণ রাস্তাটি যান চলাচলের বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কলিকাতা পুরসভা নাগরিকদের স্বার্থে রাস্তাটি প্রশস্ত করতে মনস্থ করেন। পুরসভার ১৯০৮-০৯ সালের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রিপোর্টে দেখা যায় রাস্তাটি ১৯ ফুট থেকে বাড়িয়ে ২৪ ফুট করা হয়েছে এবং রাস্তাটির উত্তরদিকের অংশ ৪০ ফুট প্রশস্ত করে চৌরঙ্গী প্লেস পর্যন্ত প্রসারিত করার ব্যবস্থা হয়েছে। তখনও পর্যন্ত রাস্তাটির কোনও নামকরণ হয়নি। সে সময় এটিকে মার্কেট স্ট্রিট ওয়েস্ট বলা হত।

১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের গোড়ার দিকে এই অনামী রাস্তাটির নামকরণ করা নিয়ে পুরসভায় আলোচনা হয়। অবশেষে ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা পুরসভার অধিবেশনে এই মর্মে একটি

প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় যে লিন্ডসে স্ট্রিট ও মিউনিসিপ্যাল অফিস স্ট্রিটের মধ্যে রাস্তাটি পৌরকমিশনার মিঃ জে. আর. বার্ট্রামের নামে নামাঙ্কিত করা হোক। পুরসভার এই সিদ্ধান্তের ফলে এক বিভ্রান্তি দেখা দেয়। মিউনিসিপ্যাল অফিস ভবনের পশ্চিমদিকের চৌরঙ্গী প্লেস বার্ট্রাম স্ট্রিটের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। অবশেষে ১৭ মার্চ ১৯১৫ সালে পুরসভা পূর্বের সিদ্ধান্ত সংশোধন করেন এই মর্মে যে—স্যার স্টুয়ার্ট হগ মার্কেটের পশ্চিমদিকে যে রাস্তাটি মার্কেট স্ট্রিট ওয়েস্ট নামে পরিচিত এবং যেটি লিন্ডসে স্ট্রিট থেকে শুরু হয়ে চৌরঙ্গী প্লেস পর্যন্ত প্রসারিত, সেই রাস্তাকে 'বার্ট্রাম স্ট্রিট' নামাঙ্কিত করা হল।

১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের পৌর আইনের বলে বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স যে চার জন প্রতিনিধি কলিকাতা পুরসভায় প্রেরণ করেন মিঃ জে. আর. বার্ট্রাম (Mr. J. R. Bertram) তাঁদের অন্যতম। পুরসভার প্রতিটি কাজে তিনি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতেন। পুরসভার জেনারেল কমিটি সমেত প্রতিটি কমিটির সদস্য ছিলেন তিনি। হগ মার্কেটের পূর্বদিকে বাজার সম্প্রসারণের যে কার্যসূচি গ্রহণ করা হয় তার শিলান্যাস করেছিলেন বার্ট্রাম সাহেব। তাঁরই প্রচেষ্টায় হগ মার্কেটের পূর্বদিকের নোংরা বস্তি অপসারণ করে সুস্থ পরিবেশ গড়ে তোলা হয়।

পুরসভার কর্মক্ষেত্রের বাইরে তিনি বহু সংস্থার সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। মেসার্স গ্লাডস্টোন উইলিস কোম্পানির (Messrs Gladstone Willis) প্রধান অংশীদার, বেঙ্গল চেম্বার্স অফ কমার্সের সহসভাপতি এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন বার্ট্রাম সাহেব। ১৯৩৩ খ্রিঃ তিনি পরলোকগমন করেন।[৪৮]

বার্ট্রাম স্ট্রিট রাস্তাটি আরও প্রশস্ত করার জন্য হুমায়ুন প্রপার্টিস্ ও চৌরঙ্গী প্রপার্টিস্ তৎপর হন। তাঁরা তাঁদের এই প্রস্তাব ১৯৩৭ খ্রিঃ মেসার্স ট্যালবট কোম্পানির মাধ্যমে পুরসভায় দাখিল করেন। অনেক আলাপ-আলোচনার পর উভয় পক্ষের সম্মতিতে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় :

(১) বার্ট্রাম স্ট্রিট ৫০ ফুট প্রশস্ত করা হবে। কাজটি হুমায়ুন প্রপার্টিস ও চৌরঙ্গী প্রপার্টিস-এর যৌথ উদ্যোগে দু' বছরের মধ্যে সম্পন্ন হবে। দক্ষিণ দিকের ভার নেবেন হুমায়ুন প্রপার্টিস এবং উত্তর দিক রূপায়ণ করবেন চৌরঙ্গী প্রপার্টিস।

(২) হুমায়ুন প্লেসকে দু' বছরের মধ্যে প্রশস্ত করার ব্যবস্থা হবে। রাস্তাটির পশ্চিম দিক হবে ৫৪ ফুট এবং বার্ট্রাম স্ট্রিটের মুখ হবে ৭৪ ফুট। এই রাস্তাটি চওড়া করার জন্য চৌরঙ্গী প্রপার্টিস ও পুরসভার মধ্যে কিছু জমি বিনিময়ের ব্যবস্থা ছিল। হুমায়ুন প্লেস চৌরঙ্গী রোডকে বার্ট্রাম স্ট্রিটের সঙ্গে যুক্ত করেছে।

(৩) হুমায়ুন প্রপার্টিসকে তাঁদের নিয়ন্ত্রণে ৩০ ফুট ও ২০ ফুট প্রশস্ত দুটি রাস্তা নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হল। প্রথম রাস্তাটি উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত হবে আর দ্বিতীয়টি পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত হয়ে প্রশস্ত বার্ট্রাম স্ট্রিটে এবং প্রস্তাবিত ৩০ ফুট রাস্তার সঙ্গে সংযুক্ত হবে।

(৪) হুমায়ুন প্রপার্টিস নিজের খরচে লিন্ডসে স্ট্রিটের অংশবিশেষ, সমগ্র হুমায়ুন প্লেস এবং বার্ট্রাম স্ট্রিটের অংশবিশেষকে চওড়া করার ব্যবস্থা করবেন।[৪৯]

সামান্য কিছু অংশ বাদ দিয়ে প্রায় সমগ্র পরিকল্পনাই রূপায়িত হয়েছিল।

বার্ট্রাম স্ট্রিটের ধারে লাইটহাউস সিনেমা, গ্রান্ড হোটেলের এক অংশ, হগ মার্কেটের পশ্চিমাংশ, আর আছে অসংখ্য বিপণি।

রামকান্ত বসু স্ট্রিট, রামকান্ত বসু ফার্স্ট লেন ও রামকান্ত বসু সেকেন্ড লেন : এই তিনটি রাস্তা সম্বন্ধে কিছু বলার পূর্বে রামকান্ত বসু সম্বন্ধে দু-চার কথা বলা দরকার।

রামকান্ত বসু কাঁটাপুকুর বসুবংশের লোক। কাঁটাপুকুরের বসুবংশ অতি প্রাচীন। রামকান্ত বসু স্ট্রিটের উত্তর দিকে ছিল তাঁদের বিশাল অট্টালিকা, উদ্যান এবং শান বাঁধানো পুষ্করিণী। পরে রামকান্ত বসুর বাড়ির উদ্যানের উপর দিয়ে কাঁটাপুকুর লেন তৈরি হয়। আর রামকান্ত বসুর অট্টালিকার লাগোয়া বিশাল পুষ্করিণীটি কলুটোলার শোভারাম বসাক লেনের দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক কিনে নেন। পরে এটির ভরাট করা জমি খণ্ড খণ্ড করে বিক্রি করা হয়। এই অঞ্চলে যে অসংখ্য বাড়ি তৈরি হয়েছে তা এই ভরাট করা জমির ওপর অবস্থিত।

রামকান্ত বসু সেকালের কলিকাতায় প্রতিপত্তিশালী ও অর্থবান ব্যক্তি ছিলেন। 'রামকান্ত বসু স্ট্রিট' নামে প্রথম যে রাস্তাটি নির্মিত হয়েছিল— সেটি কলিকাতার প্রাচীন পথগুলির অন্যতম। অর্মি'র (Robert Orme) কলিকাতা মানচিত্রে (১৭৫৬-৫৭) রামকান্ত বসু স্ট্রিট এবং রামকান্ত বসুর পূর্বপুরুষের নির্মিত অট্টালিকার চিহ্ন অঙ্কিত আছে। আপজন মানচিত্রেও (১৭৯৩) রাস্তাটি চিহ্নিত আছে, কিন্তু কোনও নামাঙ্কিত করা নেই। প্রাচীন কলিকাতায় রামকান্ত বসু স্ট্রিট শ্যামবাজার স্ট্রিট থেকে শুরু হয়ে চিৎপুর রোডে এসে পড়েছিল। পরবর্তীকালে কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা ভূপেন্দ্র বসু অ্যাভিনিউ নির্মাণ করলে পর শ্যামবাজার স্ট্রিটের কিছু অংশ নতুন রাস্তার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। বর্তমানকালে রাস্তাটি ভূপেন্দ্র বসু অ্যাভিনিউ থেকে আরম্ভ হতে দেখা যায়।[৫০]

রামকান্ত বসু ফার্স্ট লেন : উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত একটি রাস্তা রাজবল্লভ স্ট্রিটকে রামকান্ত বসু স্ট্রিটের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে। কলিকাতা পুরসভার নথিপত্র থেকে জানা যায় যে, রাস্তাটি ১৮৮১ সালে নির্মিত হয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে এই রাস্তাটি 'রামকান্ত বসু ফার্স্ট লেন' নামাঙ্কিত হয়।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের প্রথম দিকে রামকান্ত বসু ফার্স্ট লেনের অধিবাসীবৃন্দ একটি যৌথ স্মারকপত্রের মাধ্যমে কলিকাতা পুরসভার কাছে আবেদন রাখেন যে, রাস্তাটি ওই এলাকার সম্মানিত নাগরিক প্রয়াত লক্ষ্মীনারায়ণ দত্তের নামে নামাঙ্কিত করা হোক। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আরেকদল সোচ্চার হলেন। তাঁরা বর্তমান নামটি রাখার পক্ষে মত প্রকাশ করলেন। তাঁরা একথাও বললেন, যদি একান্তই পুনর্নামকরণ প্রস্তাব বিবেচনা করা হয় তা হলে রামকান্ত বসুর পুত্র হরচন্দ্র বসুর নামে রামকান্ত বসু ফার্স্ট লেন এবং রামকান্ত বসুর পৌত্র ঈশানচন্দ্র বসুর নামে রামকান্ত বসু সেকেন্ড লেনের নতুন নামকরণ করা হোক।

কলিকাতা পুরসভা রামকান্ত বসুর নামে তিনটি রাস্তা থাকার ঐতিহাসিক যাথার্থ্য বিচারে তৎপর হলেন। তাঁরা দেখলেন, ''That there was no apprehension of the historic name of late Babu Ram Kanto Bose being buried in oblivion as it would till be perpetuated by the main street styled after that gentleman.''

অতঃপর লক্ষ্মী দত্তর নামে নামকরণের প্রস্তাব ২০শে মে ১৯১৪ খ্রিঃ পুরসভার বিবেচনার জন্য পেশ করা হয়। প্রস্তাবটি সমর্থন করে সেকালের এক পৌর প্রতিনিধি বাবু পশুপতিনাথ দেব বিষয়টির সংক্ষিপ্তসার সভায় পেশ করেন। ডিস্ট্রিক্ট কমিটি বিষয়টি মীমাংসার জন্য উভয়পক্ষকে আলোচনার টেবিলে আহ্বান করেন। উভয়পক্ষ তাঁদের উকিল ও অ্যাটর্নির মারফৎ তাঁদের বক্তব্য পেশ করেন। ওই আলোচনা সভায় ঠিক হয় রামকান্ত বসু ফার্স্ট লেন লক্ষ্মী দত্তের নামে নামাঙ্কিত হবে। তিনি ওই অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি। ওই রাস্তার দুধারে অবস্থিত ½ অংশের সম্পত্তির মালিক তিনি। এই দত্ত পরিবারের দানশীলতা ও সমাজসেবা সর্বজনবিদিত। লক্ষ্মী দত্তের পুত্রেরা রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত এবং রামকৃষ্ণ অনাথ আশ্রমে তাঁদের পিতার নামে দুটি বিভাগ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করেছেন। এ ছাড়াও দত্ত পরিবার অন্যান্য দাতব্য প্রতিষ্ঠানকেও অর্থ সাহায্য করেছেন।

পশুপতি দেব এই প্রসঙ্গে আরও বলেন যে, রামকান্ত বসু সেকেন্ড লেনের নামও এই সঙ্গে পরিবর্তন করে সর্বজনশ্রদ্ধেয় সিস্টার নিবেদিতার নামে 'নিবেদিতা লেন' নামাঙ্কিত করা হোক।

পশুপতি দেব তাঁর সমাপ্তি ভাষণে বলেন, একই অঞ্চলে একই ব্যক্তির নামে তিনটি রাস্তা থাকায় ডাক বিভাগের চিঠি বিলির ব্যবস্থায় বিপর্যয় ঘটছে। তা দূর করার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন "বাই লেন" দুটির নাম পরিবর্তন করা।

চেয়ারম্যান প্রস্তাবটি সমর্থন করে বলেন যে, লক্ষ্মীনারায়ণ দত্তের উত্তরাধিকারীগণ রাস্তাটির উন্নতি বিধানের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থদানের অঙ্গীকার করেছেন।

অবশেষে কলিকাতা পুরসভার এই অধিবেশনে (২০শে মে ১৯১৪) রামকান্ত বসু ফার্স্ট লেন ও রামকান্ত বসু সেকেন্ড লেনের নাম যথাক্রমে 'লক্ষ্মী দত্ত লেন' ও 'নিবেদিতা লেন' নামাঙ্কিত করেন।

প্রথমে লক্ষ্মী দত্তের কথা। পুরো নাম লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত (১৮৪২-১৯০৫), ঠাকুরদাসের কনিষ্ঠ

পুত্র। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি একেবারে সহায়সম্বলহীন অবস্থায় ২৫ নম্বর বাগবাজার স্ট্রিটের বাড়ির একাংশে কয়েকটি ঘর নিয়ে সপরিবারে বসবাস করতে থাকেন। পরে তিনি ১৬, বোসপাড়া লেনের দয়ালচন্দ্র দে'র বাড়িতে উঠে আসেন। দয়ালচন্দ্রের বাড়িতে থাকাকালীন লক্ষ্মীনারায়ণ বিপত্নীক হন। পরবর্তীকালে রামকান্ত বসু ফার্স্ট লেনে সুধারাম চক্রবর্তীর ১ নম্বর বাড়িটি কেনেন। ১২৯৬ বঙ্গাব্দে এটিকে দ্বিতল গৃহ করা হয়। বর্তমানে এটির নাম 'লক্ষ্মীনিবাস'।

লক্ষ্মীনারায়ণ প্রথমে হাওড়ার ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে অফিসে কর্মজীবন শুরু করেন। পরবর্তীকালে মেসার্স জেমস ফিন্‌লে কোম্পানির (Messrs James Finlay & Co. Ltd.) তত্ত্বাবধানে গোলাবাড়ি প্রেসিং কোম্পানি লিমিটেডে গোলাবাড়ি প্রেস হাউস নামে পাটের কলে কাজ করতে থাকেন। পরে কোম্পানিতে বড়বাবু ও ঠিকাদার নিযুক্ত হন। এই পাটের ঠিকাদারিতে তাঁর আর্থিক স্বচ্ছলতা আসে।

লক্ষ্মীনারায়ণ ছিলেন কবি ও ভগবতপ্রেমী। তাঁর রচিত "উপাসনা" এক মূল্যবান সংকলন। "উপাসনা"র গানগুলিকে শ্যামাসঙ্গীতই বলা যেতে পারে।

লক্ষ্মীনারায়ণের তিন পুত্রের মধ্যে কিরণচন্দ্র দত্তের নাম উল্লেখ্য। কিরণচন্দ্র ছিলেন সেকালের একজন বিশিষ্ট সংগঠক, সাহিত্যসাধক, সমাজসেবী এবং রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের একজন মহান প্রবক্তা।[৫১]

'লক্ষ্মীনিবাস' ভবনটি নানা কারণে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। বাগবাজার সোস্যাল ইউনিয়ন একসময় এখানে স্থাপিত হয়েছিল। বাগবাজার সোস্যাল ইউনিয়ন প্রথমে ৬৭, রামকান্ত বসু স্ট্রিটে ১৯০৮ খ্রিঃ স্থাপিত হয়। পরে এই সোস্যাল ইউনিয়ন ১নং লক্ষ্মী দত্ত লেনে উঠে আসে।

গ্রুপ থিয়েটারের মতনই এই সংস্থা নাট্য-সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চায় আত্মনিয়োগ করে। কিরণচন্দ্র ছিলেন ওই প্রতিষ্ঠানের নাট্যাচার্য এবং নাট্য পরিচালক। নাট্য প্রতিষ্ঠানের প্রথম সভাপতি ছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

সোস্যাল ইউনিয়নের নাটকাভিনয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীগণ উপস্থিত থেকে উৎসাহ দিতেন। এঁদের দশম বার্ষিক অনুষ্ঠানে স্বামী ব্রহ্মানন্দ উপস্থিত ছিলেন।[৫২]

"সঙ্ঘ" নামে একটি হাতে-লেখা পত্রিকা (১৩২৮) লক্ষ্মীনিবাস থেকে প্রকাশিত হয়। স্থায়ী সভাপতি ছিলেন কিরণচন্দ্র দত্ত।[৫৩]

নিবেদিতা লেনের ভগিনী নিবেদিতা সম্বন্ধে এবার দু'চার কথা বলা যেতে পারে।

সিস্টার নিবেদিতা (১৮৬৭-১৯১১)— বিবেকানন্দের মানস কন্যা। ভারতপ্রেমী ভগিনী নিবেদিতার পূর্বনাম মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল। ১৮৬৭ খ্রিঃ ২৮শে অক্টোবর আয়ার্ল্যান্ডের ডনগ্যানন শহরে মার্গারেট জন্মগ্রহণ করেন। পিতা স্যামুয়েল ছিলেন ধর্মযাজক ও জননেতা। ১৮৮৪ খ্রিঃ শিক্ষা শেষ করে এক বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কাজ গ্রহণ করেন নিবেদিতা। আয়ার্ল্যান্ডের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস এবং রাশিয়ার বিপ্লব কাহিনী অধ্যয়ন করে বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হন।

১৮৯৫ খ্রিঃ নভেম্বর মাসে লন্ডনে একটি ঘরোয়া আলোচনাচক্রে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে নিবেদিতা প্রথম পরিচিত হন। বিবেকানন্দের বক্তৃতা তাঁর জীবনে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করে। বিবেকানন্দের আহ্বানে ১৮৯৮ খ্রিঃ জানুয়ারি মাসে মার্গারেট ভারতবর্ষে আসেন। এই বছরের ২৫শে মার্চ তারিখে বিবেকানন্দ তাঁকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করেন। এবং তাঁর নাম দেন নিবেদিতা। এই বছরে কলিকাতায় প্লেগ মহামারী আকারে দেখা দিলে তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীগণের সঙ্গে প্লেগ আক্রান্ত রোগীদের সেবাকার্যে নিজেকে নিযুক্ত করেন।

স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে বিবেকানন্দের পরিকল্পনাকে রূপায়িত করার উদ্দেশ্যে ১৮৯৮ খ্রিঃ ১৩ই নভেম্বর কালীপূজার দিন ১৬নং বোসপাড়া লেনে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন, বর্তমানে যা "রামকৃষ্ণ-সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়" নামে খ্যাত।

১৯০২ খ্রিঃ ৪ঠা জুলাই বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণ ঘটে। এরপরেই ভগিনী নিবেদিতা ভারতের

রাজনৈতিক মুক্তিকেই তাঁর জীবনের প্রথম লক্ষ্য বলে স্থির করলেন। তিনি সতীশচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত ডন সোসাইটি, অনুশীলন সমিতি প্রভৃতি বিপ্লবী সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর বক্তৃতা ও প্রবন্ধাবলী বাংলার যুব চিত্তকে জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশপ্রেমে উদ্বোধিত করেছিল। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে প্রত্যক্ষ এবং সক্রিয় রাজনৈতিক কার্যকলাপে লিপ্ত থাকার জন্য নিবেদিতাকে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হয়। নিবেদিতা ১৯০৫ খ্রিঃ স্বদেশি আন্দোলনে ঝাঁপ দিলেন। ওই বছরে বারানসীতে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে বিলাতি দ্রব্য বর্জনের যুক্তিপূর্ণ ভাষণ দিয়েছিলেন। কংগ্রেসের চরম ও নরম উভয়পন্থী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। সেকালের ভারতীয় মনীষীগণ নিবেদিতার গৃহপ্রাঙ্গণে সদাই আসতেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন নিবেদিতার কাছে সবিশেষ ঋণী।

রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশি-সমাজের পরিকল্পনাকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন। তিনিও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুর মিলিয়ে লিখেছিলেন ভারতের বহু বৈচিত্র্যের মধ্যে নিহিত রয়েছে তার ঐক্য, ভারতবর্ষের জাতীয়তাবোধের মূল ভিত্তি। ভারতীয় কলাবিদ্যার মূলে আধ্যাত্মিকতার বীজ নিহিত আছে, তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল প্রমুখ ভারতীয় শিল্পীদের মনে অসামান্য উদ্দীপনার সঞ্চার করেন।

এদিকে অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের ফলে নিবেদিতার দেহ ভেঙ্গে পড়তে থাকে। ১৯১১ খ্রিঃ অক্টোবর মাসের সূচনাতে জগদীশচন্দ্র বসু ও তাঁর পত্নী অবলা বসুর আমন্ত্রণে বিশ্রামলাভের জন্য নিবেদিতা দার্জিলিং-এ "রায় ভিলা"য় বাস করতে থাকেন। আমাদের দুর্ভাগ্য, কঠিন আমাশা রোগে আক্রান্ত হয়ে ১৩ই অক্টোবর তাঁর জীবনদীপ নির্বাপিত হয়। অনেকগুলি পুস্তক তিনি রচনা করেছেন, তার মধ্যে অন্যতম— কালী দি মাদার, দি মাস্টার অ্যাজ আই স হিম, শিব অ্যান্ড বুদ্ধ, ক্রেডল্ টেলস অফ হিন্দুইজম্।

বিহারী চক্রবর্তী স্ট্রিট : এটি একটি ক্ষুদ্র রাস্তা। নিমতলা ঘাট স্ট্রিট থেকে শুরু হয়ে সোজা দক্ষিণে এগিয়ে বৈষ্ণব শেঠ সেকেন্ড লেন ও ব্রজকুমার শেঠ লেনের সংযোগস্থলে এসে পড়েছে। পূর্বে এই অংশটুকু বৈষ্ণব শেঠ সেকেন্ড লেনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কলিকাতা পুরসভা তাঁদের ২৯শে জুলাই ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের অধিবেশনে বৈষ্ণব চরণ শেঠ সেকেন্ড লেনের যে অংশটুকু নিমতলা ঘাট স্ট্রিট ও ব্রজকুমার শেঠ লেনের মধ্যে অবস্থিত, সেই অংশের নাম পরিবর্তন করে কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর নামে 'বিহারী চক্রবর্তী স্ট্রিট' নামাঙ্কিত করেন।[৫৪] কবি বিহারীলালের এই রাস্তায় বসতবাড়ি ছিল।

বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-৯৪), পিতা দীননাথ চক্রবর্তী। কৈশোরেই তাঁর কাব্য প্রতিভার উন্মেষ ঘটে। 'স্বপ্নদর্শন' (১৮৫৮) তাঁর প্রথম প্রকাশিত রূপক গদ্যকাব্য। বিহারীলালের গদ্য পদ্য প্রভৃতি বিভিন্ন রচনা পূর্ণিমা পত্রিকায় (১৮৫৯) প্রকাশিত হত। এ ছাড়া 'সাহিত্য সংক্রান্তি' মাসিক পত্রে এবং 'অবোধবন্ধু' পত্রিকায় তাঁর প্রসিদ্ধ কয়েকখানি কাব্য অংশত আত্মপ্রকাশ করে। দ্বিতীয় বর্ষের নবম সংখ্যা থেকে বিহারীলাল অবোধবন্ধু পত্রিকার স্বত্বাধিকারী হন।

কৃষ্ণলাল ভট্টাচার্যের "পুরাতন প্রসঙ্গ" থেকে জানা যায় যে বিহারীলাল কেবল কবিই ছিলেন না, তাঁর সংস্কৃত ব্যাকরণ, কাব্য ও নাটক, বায়রনের কাব্যগ্রন্থ, শেক্সপীয়রের নাটকে গভীর ব্যুৎপত্তি ছিল।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে বিহারীলালের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বিহারীলালের কাব্যের রোমান্টিক সুরে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি বিহারীলালকে বঙ্গ সাহিত্য কুঞ্জের ভোরের পাখি বলে অভিহিত করেছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি তাঁকে বঙ্গের "শ্রেষ্ঠ কবি" বলে সম্বোধন করেছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী কাদম্বরী দেবীর প্রিয় কবি ছিলেন বিহারীলাল। তিনি বলতেন বিহারীলালের মতো না লিখতে পারলে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচর্চার প্রয়োজন নেই। বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল' কাদম্বরী দেবীর কণ্ঠস্থ ছিল। কবিকে তিনি মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করে এনে খাওয়াতেন। শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ স্বীয় হস্তে একটি আসন বুনে দিয়েছিলেন। এই আসন

নিয়ে বিহারীলাল পরে তাঁর 'সাধের আসন' কাব্যগ্রন্থ লেখেন।

বিহারীলালের প্রধান কাব্য গ্রন্থগুলি হল— স্বপ্ন দর্শন (১৮৫৮), সংগীত শতক (১৮৬২), বঙ্গ সুন্দরী (১৮৭০), নিসর্গ সন্দর্শন (১৮৭০), বন্ধু বিয়োগ (১৮৭০), সারদামঙ্গল (১৮৭৯) প্রভৃতি। মিস্টিক ভাবরীতির বিশিষ্ট প্রবর্তক এবং ঊনবিংশ শতকের আদি রোমান্টিক কবি হিসাবে তাঁর প্রতিষ্ঠা। তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য সারদামঙ্গল আর্যদর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।[৫৫]

বুদ্ধিস্ট টেম্পল লেন : বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা বা দি বেঙ্গল বুদ্ধিস্ট অ্যাসোসিয়েশন (The Bengal Buddhist Association)-এর সভাপতি ও সহসভাপতি কলিকাতা পুরসভার কাছে এই মর্মে আবেদন করেন যে বো স্ট্রিট (Bow Street) থেকে ললিতমোহন দাস লেনের সংযোগকারী অনামী রাস্তাটি বৌদ্ধ মন্দিরের নামে বুদ্ধিস্ট টেম্পল লেন নামাঙ্কিত করা হোক। পুরসভা এই প্রস্তাব ৫ই এপ্রিল ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের অধিবেশনে মঞ্জুর করেন। এই রাস্তাটির প্রস্থ ছিল ১৬ ফুট।

একই বছরের সেপ্টেম্বর মাসে বৌদ্ধ মন্দিরের কর্তৃপক্ষ ওই মন্দিরের উত্তর দিক দিয়ে ললিতমোহন দাস লেনের একমুখো (Blind Lane) রাস্তাটিও এই বৌদ্ধ মন্দিরের স্মরণে বুদ্ধিস্ট টেম্পল লেন নামকরণের প্রস্তাব দেন। পুরসভা ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯১৬ প্রস্তাবটি অনুমোদন করেন। ললিতমোহন দাস লেনের যে অংশটি বুদ্ধিস্ট টেম্পল লেনের অন্তর্ভুক্ত হল সেটি ওই সময় মাত্র ৮ ফুট চওড়া ছিল।

এরপর কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা এই অঞ্চলটির উন্নয়নে তৎপর হন। তাঁদের নির্ধারিত প্রকল্প রূপায়ণের ফলে ওই এলাকার অনেক পরিবর্তন হয় এবং ললিতমোহন দাস লেনের অবলুপ্তি ঘটে। বুদ্ধিস্ট টেম্পল লেনকে যান চলাচলের জন্য ১৬ ফুট করা হয় ; কোথাও কোথাও ১৭ থেকে ২০ ফুট চওড়া রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল। পশ্চিম দিকে ফুটপাত করা হয়েছিল— এটি ২ ফুট থেকে ৬ ফুটের মতো প্রশস্ত। রাস্তাটি রবার্ট স্ট্রিট (মহিমচন্দ্র দাস সরণি) থেকে আরম্ভ হয়ে সোজা দক্ষিণে এগিয়ে নালন্দা উদ্যানের পাশ দিয়ে কাপালীটোলা লেনে এসে পড়েছে। এই রাস্তার উপরই বৌদ্ধ মন্দিরটি অবস্থিত।

দি বেঙ্গল বুদ্ধিস্ট অ্যাসোসিয়েশন বা বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা একটি বাঙালি প্রতিষ্ঠান। এই সংস্থার প্রাণপুরুষ হলেন কর্মযোগী কৃপাশরণ মহাস্থবির। তিনি ১৮৮২ খ্রিঃ বাঙালি বৌদ্ধদের প্রাণকেন্দ্র-স্বরূপ এই সংস্থাটি স্থাপন করেন।

বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দের ২২ জুন বর্তমান বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার ঊনাইনপুরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৮৫ খ্রিঃ ভিক্ষুধর্মে দীক্ষিত হন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ২০ বছর। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতায় আসেন এবং একটি ভাড়া বাড়িতে বৌদ্ধবিহার স্থাপন করেন। সে সময় বাঙালি বৌদ্ধের সংখ্যা ছিল নামমাত্র। ১৯০০ খ্রিঃ তিনি ৪৫০০ টাকা মূল্যে পাঁচ কাঠা জমি বৌদ্ধবিহার স্থাপনের জন্য ক্রয় করেন। ১৯০৩ খ্রিঃ ধর্মাঙ্কুর বিহার নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়।

মহাস্থবির কৃপাশরণ সেকালের অনেক বাঙালি মনীষীর সংস্পর্শে আসেন। যাঁরা মহাস্থবিরের মহৎ কাজে উৎসাহ ও সক্রিয় সহযোগিতার ব্যবস্থা করেন, তাঁরা হলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, হরিনাথ দে, ইন্ডিয়ান মিরর পত্রিকার সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় ডঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, সাহিত্যিক তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। আরাকান বৌদ্ধ মঠের সঙ্ঘনায়ক উ পুঞ মহাস্থবির কৃপাশরণকে অষ্টধাতু নির্মিত অপরূপ এক বৃহৎ বুদ্ধমূর্তি দান করেন। মূর্তিটি আজও এই বিহারে বিদ্যমান। ধর্মাঙ্কুর সভার এক বিশেষ অধিবেশনে তৎকালীন বাংলার ছোটলাট লর্ড কারমাইকেল ঘোষণা করেন, তক্ষশীলায় প্রাপ্ত বুদ্ধের পূতাস্থি ধর্মাঙ্কুর সভাকে অর্পণ করা হবে। সমাদরণীয় ওই পূতাস্থি সংরক্ষণের জন্য কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ধর্মাঙ্কুর বিহার সংলগ্ন দু' কাঠা জমি দান করেন।

ধর্মাঙ্কুর বিহারে বৌদ্ধ গ্রন্থের সংগ্রহ ও গ্রন্থাগার নির্মাণ মহাস্থবির কৃপাশরণের আরেক মহান কীর্তি। ১৯০৮ খ্রিঃ বিভিন্ন রাজ্য পরিভ্রমণ করে ত্রিপিটক প্রভৃতি দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য বৌদ্ধগ্রন্থাদি

সংগ্রহ করে তিনি এই গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে গ্রন্থাগারটি "গুণালঙ্কার গ্রন্থাগার" নামে পরিচিত। বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার অধীনে একটি কমিটির দ্বারা গ্রন্থাগারটি পরিচালিত হয়।

এরপর বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা একটি পত্রিকা প্রকাশে তৎপর হন। ১৯০৮ খ্রিঃ গুণালঙ্কার মহাস্থবির ও শ্রমণ পূর্ণানন্দ স্বামীর যুগ্ম সম্পাদনায় এবং কৃপাশরণ মহাস্থবিরের পরিচালনায় বাংলায় "ওগেজ্জ্যোতি মাসিক পত্রিকা" প্রকাশিত হয়। অচিরেই এই পত্রিকা সুধীজনের প্রীতি লাভ করে। এতে বৌদ্ধ দর্শনের উপর সারগর্ভ ধারাবাহিক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হত। পরবর্তীকালে বৌদ্ধদর্শনে সুপণ্ডিত শীলানন্দ ব্রহ্মচারীর সম্পাদনায় এবং ধর্মপাল মহাস্থবিরের পরিচালনায় পত্রিকাটি আরও জনপ্রিয়তা অর্জন করে। কয়েক বছর বন্ধ থাকার পর হেমেন্দ্রবিকাশ চৌধুরীর সম্পাদনায় পত্রিকাটি পুনরায় প্রকাশিত হয়েছিল।[৫৬]

শাঁখারিটোলা লেন, শাঁখারিটোলা ইস্ট লেন ও শাঁখারিটোলা ফার্স্ট লেন : ডিঙ্গাভাঙ্গা অঞ্চলে শাঁখারিটোলা পল্লী কলিকাতার একটি প্রাচীন এলাকা। একই বৃত্তিধারী মানুষের একই অঞ্চলে বসবাস করার প্রবণতায় স্বতন্ত্র পাড়া যখন কলিকাতায় গড়ে উঠতে থাকে, শাঁখারিটোলার উৎপত্তি ঠিক সেই সময়। অবশ্য এর জন্য কোম্পানির জমিদার হলওয়েল সাহেবের নির্দেশনামা অনেকটা দায়ী। তিনি ১৭৫২ খ্রিঃ কোম্পানির পক্ষ থেকে এক হুকুমনামা জারি করে বললেন— এখন থেকে দেশি লোকেরা যেখানে খুশি বাস করতে পারবে না, এক বৃত্তিধারী লোকেদের এক জায়গায় বাস করতে হবে। এর ফলে গড়ে উঠল বৃত্তিধারীদের জন্য এক একটি স্বতন্ত্র পাড়া।

কলিকাতার প্রাচীন মানচিত্রে শাঁখারিটোলার উল্লেখ আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে কলিকাতার বিভিন্ন পল্লী ও রাস্তা চিহ্নিত করে প্রথম যে মানচিত্র প্রকাশিত হয় তা মার্ক উডের মানচিত্র নামে খ্যাত। এটি ১৭৮৪ খ্রিঃ প্রকাশিত হয়। এই মানচিত্রে শাঁখারিটোলা অঞ্চলটি স্পষ্টভাবে চিহ্নিত আছে। ওই মানচিত্রে তালিকার ৪৩ নম্বরে শাঁখারিটোলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

শাঁখা সামুদ্রিক শঙ্খ বা শাঁখ থেকে প্রস্তুত হয়। শাঁখা যারা তৈরি করেন তাঁরা হলেন শঙ্খকার বা শাঁখারি। শাঁখারিগণ এই অঞ্চলে বসবাস করতেন এবং নিজ নিজ গৃহে শাঁখা তৈরি করতেন। তাই থেকে এই অঞ্চলের নাম হয় শাঁখারিটোলা। পরবর্তীকালে নগরায়নের চাপে এই সব শাঁখারি এলাকা ছেড়ে চলে যান এবং অন্য বসতি গড়ে উঠে। কিন্তু শাঁখারিটোলা নামের অস্তিত্ব বজায় থাকায় পুরানো কলিকাতার বৈশিষ্ট্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এ অঞ্চলে শাঁখারিটোলার নামে তিনটি রাস্তা আছে— শাঁখারিটোলা লেন, শাঁখারিটোলা ইস্ট লেন ও শাঁখারিটোলা ফার্স্ট লেন। প্রথমে শাঁখারিটোলা লেনের কথা।

শাঁখারিটোলা লেন ওয়েলিংটন স্কোয়ারের (রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার) উত্তর-পূর্ব কোণ থেকে আরম্ভ হয়ে প্রথমে সোজা পূর্বদিকে অগ্রসর হয়, পরে বাঁক ঘুরে দক্ষিণে মোড় নিয়ে ক্রীক রোতে এসে পড়েছে। এই রাস্তার আরেকটি শাখা ধর্মতলা স্ট্রিট থেকে আরম্ভ হয়ে সোজা উত্তরে এগিয়ে শশীভূষণ দে স্ট্রিটের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। রাস্তার এই অংশটুকু অনামী ছিল। কলিকাতা পুরসভা তাঁদের ৮ই জুন ১৯১২ সালের অধিবেশনে এই অনামী অংশকে শাঁখারিটোলা লেন নামাঙ্কিত করেন।

১৯২২ সালের কথা। শাঁখারিটোলা নিবাসী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ কলিকাতা পুরসভার কাছে এক স্মারকপত্র পেশ করেন। তাতে প্রস্তাব করা হয় যে শাঁখারিটোলা লেনের এক অংশ বহুগুণান্বিত ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের নামে মহেন্দ্র সরকার লেন করা হোক। ডাঃ সরকার দীর্ঘদিন ওই এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। কলিকাতা পুরসভা ১৬ই আগস্ট ১৯২২ সালের অধিবেশনে স্মারকলিপিটি বিবেচনা করে ক্রীক রো থেকে নেবুতলা লেন (শশীভূষণ দে স্ট্রিট) পর্যন্ত প্রসারিত শাঁখারিটোলা লেনের অংশবিশেষ ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের নামে 'মহেন্দ্র সরকার লেন' করার প্রস্তাব অনুমোদন করেন। শাঁখারিটোলা লেনের বাকি অংশের পূর্ব নাম বহাল থাকে।

ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্সের প্রতিষ্ঠাতা, ক্যালকাটা জার্নাল অফ মেডিসিনের স্থাপয়িতা, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার প্রবক্তা মহেন্দ্রলাল সরকার (১৮৩৩-১৯০৪)

হাওড়ার পাইকপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ডাঃ সরকার জাতিতে ছিলেন বৈশ্য। শৈশবেই মা-বাবাকে হারান, মামার বাড়ি নেবুতলায় চলে আসেন। দুই মামা ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ ও মহেশচন্দ্র ঘোষের তত্ত্বাবধানে বয়ঃপ্রাপ্ত হন। শিক্ষা প্রথমে ডেভিড হেয়ার স্কুলে, পরে হিন্দু কলেজে। ১৮৫৫ খ্রিঃ মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। চিকিৎসাবিদ্যায় বিশেষ সম্মান পান। ১৮৬৩ খ্রিঃ এম. ডি. পরীক্ষায় তিনি প্রথম হন। ব্রিটিশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন, বাংলা শাখা, স্থাপিত হলে পর ডাঃ সরকার ওই সংস্থার সভ্য, পরে সহ-সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। ওই অ্যাসোসিয়েশনের সভায় তিনি একবার মন্তব্য করেছিলেন যে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা হল হাতুড়ে চিকিৎসা। পরবর্তীকালে হোমিওপ্যাথিক জার্নাল 'অরগান্' পাঠ করে তিনি চমৎকৃত হলেন। হোমিওপ্যাথিক ওষুধের এত শক্তি, তাঁকে বিস্মিত করল। তিনি ব্রিটিশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের চতুর্থ সভায় (১৬ই ফেব্রুয়ারি ১৮৬৭) ভাষণ প্রসঙ্গে বললেন, ''I become satisfied that the cure were really the effects of the medicines, and not the result of the influence of the imagination or of a restricted diet or of the natural progress of the disease, as I used to formerly believe.'' হোমিওপ্যাথিক ওষুধ সম্বন্ধে এই মন্তব্য তাঁর কাল হল, মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন থেকে তিনি বিতাড়িত হলেন।

দেশের উন্নতির জন্য বিজ্ঞানচর্চার বিশেষ প্রয়োজন। এই বিষয়টি তিনি গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন। তারই ফলশ্রুতি, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্সের প্রতিষ্ঠা। এটিকে তিনি ১৮৭৬ খ্রিঃ স্থাপন করেন। ফাদার লাঁফো এই সংস্থা গড়ার কাজে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন। বিজ্ঞানী সি. ভি. রামন এখানে গবেষণা করে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি যাদবপুরে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত।

এই অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠার পূর্বে ১৮৬৪ খ্রিঃ জানুয়ারি মাসে তিনি ক্যালকাটা জার্নাল অফ্ মেডিসিন প্রকাশ করেন। গভীর নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে আমৃত্যু পত্রিকা সম্পাদনা চালিয়ে যান।

সেকালের বহুবিধ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ডাঃ মহেন্দ্রলাল প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, ১৮৮৭ খ্রিঃ কলিকাতা হাইকোর্টের শেরিফ, ১৮৯৩ খ্রিঃ বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সভ্য ও এশিয়াটিক সোসাইটির অন্যতম সদস্য ছিলেন। স্যানিটারি সায়েন্সের জন্য তাঁকে পুরসভার কমিশনার পদে নিযুক্ত করা হয়। তৎকালীন সরকার ১৮৮৩ খ্রিঃ সি. আই. ই. এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৯০ খ্রিঃ সর্বোচ্চ সম্মান 'ডক্টরেট অব্ ল' উপাধিতে ভূষিত করেন।

বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলনের সক্রিয় সমর্থক ছিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণের তিনি চিকিৎসক ছিলেন। ডাঃ সরকারের গভীর মননশীলতার জন্য ঠাকুর তাঁকে "গম্ভীরাত্মা" বলেছিলেন।[৫৭]

ডাঃ সরকারের পরামর্শে তৎকালীন সরকার মেয়েদের বিবাহের বয়স কমপক্ষে ১৬ বছর নির্ধারণ করেছিলেন। ১৮৮৮ খ্রিঃ বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। এই সম্মেলনে আসামের চা শ্রমিকের দুরবস্থা সম্বন্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞান ছাড়াও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও জ্যোতিষে বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল ডাঃ সরকারের।

শাঁখারিটোলা লেন তার অস্তিত্বকে বেশি দিন বজায় রাখতে পারেনি। ১৯৩৬ সালে ওখানকার পল্লীবাসীদের কাছ থেকে আরেকটি স্মারকপত্র আসে। তাতে প্রস্তাব করা হয়, শাঁখারিটোলা লেনের বাকি অংশ রায়বাহাদুর গোকুলচন্দ্র বড়ালের নামে গোকুলচন্দ্র বড়াল স্ট্রিট করা হোক। কলিকাতা পুরসভা ১৫ই জুলাই ১৯৩৬ সালে শাঁখারিটোলা লেনের নাম পরিবর্তন করে 'গোকুল বড়াল স্ট্রিট' নামাঙ্কিত করেন। একই সঙ্গে শাঁখারিটোলা ইস্ট লেনের নাম বদলে 'শাঁখারিটোলা লেন' করা হয়। রাস্তাটি মহেন্দ্র সরকার স্ট্রিট থেকে শুরু হয়ে সুরি লেনে এসে মিশেছে। প্রসঙ্গত, ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পুরসভা শাঁখারিটোলা লেন ও মহেন্দ্র সরকার লেনকে "স্ট্রিটের" পর্যায়ে উন্নীত করেন, অর্থাৎ এবার থেকে ওই দুই পথ 'শাঁখারিটোলা স্ট্রিট' ও 'মহেন্দ্র সরকার স্ট্রিট' নামে নামাঙ্কিত হল।

শাঁখারিটোলা স্ট্রিট নতুন নামে নামাঙ্কিত হয়ে এইভাবে তার প্রাচীন অস্তিত্ব বজায় রাখল।

গোকুলচন্দ্র বড়াল সম্বন্ধে কিছু বলার আগে এই বড়াল পরিবার সম্বন্ধে দু-চার কথা বলা খুবই প্রাসঙ্গিক। এই পরিবারের আদি বাস ছিল সপ্তগ্রামে। এঁরা সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। সপ্তগ্রামের সৌভাগ্যসূর্য অস্তমিত হলে পর রূপচাঁদ বড়াল কলিকাতায় এসে বসতি স্থাপন করেন। রূপচাঁদের তিন পুত্র— ঠাকুরচাঁদ, বীরচাঁদ ও প্রেমচাঁদ। কনিষ্ঠ প্রেমচাঁদ বর্ধমান মহারাজার দেওয়ান ছিলেন। সেকালের কলিকাতায় সম্মানভাজন ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন। বিদ্যাসাগরের বন্ধু ছিলেন এবং বিধবাবিবাহ প্রচলনে বহুভাবে তাঁকে সাহায্য করেন। প্রেমচাঁদ ছিলেন আদি ব্রাহ্মসমাজের অনুরাগী ভক্ত। আদি ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশন হত তাঁর বাসভবনে। সেই সাপ্তাহিক ব্রাহ্ম অধিবেশনে প্রেমচাঁদের পৌত্র বালক লালচাঁদ মাঝে মাঝে ধর্মসঙ্গীত গেয়ে শোনাতেন। ব্রাহ্ম অধিবেশনের মধ্যে দিয়ে বড়াল পরিবারে সঙ্গীতের প্রতি আগ্রহের সঞ্চার হয়। প্রেমচাঁদ বড়াল ১৮৯৫ সালে পরলোকগমন করেন।

প্রেমচাঁদ চাঁপাতলায় নতুন আবাসভবন নির্মাণ করেন। সে সময় রাস্তাটির নাম ছিল চাঁপাতলা ফার্স্ট লেন। পরবর্তীকালে, চাঁপাতলা ফার্স্ট লেন রাস্তাটি প্রেমচাঁদ বড়ালের নামে 'প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিট' নামাঙ্কিত হয়। প্রেমচাঁদ বড়ালের বাসভবন ৯৮, প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিটে। বর্তমানে বাড়িটি প্রেমচাঁদ বড়ালের উত্তরপুরুষদের মধ্যে অনেকগুলি অংশে বিভক্ত হয়েছে।

বড়াল পরিবার ছাড়াও প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিটে আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বাস করতেন। এই রাস্তার ১/৫/১সি, বাড়িতে এক সময় থাকতেন ভারতবিশ্রুত বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন। এই ত্রিতল বাড়ির একটি ঘরের গবেষণাগারে বসে পদার্থ বিজ্ঞানের ওপর একটি মৌলিক গবেষণা তিনি করেন। এর প্রতিপাদ্য— বস্তুর অণুতে আলোকের সংঘাতে আপতিত আলোকের কম্পন সংখ্যার হ্রাস বা বৃদ্ধি হয়ে যে আলোকের বিকিরণ ঘটে, তাই তিনি পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করেন। এই পরীক্ষালব্ধ ফল 'রামন এফেক্ট' নামে খ্যাত। এই আবিষ্কারের ফলে অণুরাজ্যের বহু তথ্য উদ্ঘাটিত হয়। বিকিরণধর্ম, তরঙ্গতত্ত্ব, তাপগতি-বিদ্যা, রসায়ন প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগের গবেষণায় 'রামন এফেক্ট' একটি যুগান্তকারী পদ্ধতিরূপে চিহ্নিত। বর্তমানে তীব্র লেসার রশ্মি আবিষ্কৃত হওয়ায় 'রামন এফেক্ট' প্রয়োগের পরিধি আরও বেড়েছে। এই আবিষ্কারের জন্য তিনি ১৯৩০ খ্রিঃ নোবেল প্রাইজ লাভ করেন।[৫৮] বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী সি. ভি. রামনের গবেষণার কেন্দ্রভূমি ছিল প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিটের এই বাড়িটি। বর্তমানে এই জীর্ণ বাড়িটি অবহেলিত অবস্থায় পড়ে আছে।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বৌদ্ধশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, বহুভাষাবিদ এবং সুলেখক রায়বাহাদুর ঈশানচন্দ্র ঘোষ (১২৬৭-১৩৪২ বঙ্গাব্দ) ১/৩, প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিটের নিজ বাড়িতে বাস করতেন। জন্ম যশোহর জেলার এক দরিদ্র কায়স্থ পরিবারে। ঈশানচন্দ্র মেধাবী ছাত্র ছিলেন। বৃত্তিসহ কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ১৮৮৫ খ্রিঃ সরকারি শিক্ষা বিভাগে যোগ দিয়ে বিভিন্ন স্কুলে প্রধান শিক্ষকতা করার পর স্কুল ইনস্পেক্টর হন। কিছুকাল শিক্ষা বিভাগের সহকারী ডিরেক্টরও হয়েছিলেন। সংস্কৃত, ইংরেজি ও দর্শনশাস্ত্রে ছিল তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য। কয়েকটি স্কুল পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করলেও তাঁর লেখক খ্যাতি পালি থেকে "বৌদ্ধজাতক"-এর অনুবাদক হিসাবে। বৃদ্ধ বয়সে পালিভাষা শিক্ষা করে একক চেষ্টায় ১৬ বছর পরে এই কাজ শেষ করেন।

ঈশানচন্দ্রের ব্যবসাবুদ্ধিও ছিল প্রখর। অনেক ব্যবসায়ী নানা বিষয়ে তাঁর পরামর্শ নিতেন। তিনি নিজে কয়েকটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর ছিলেন। নিজের মাতা-পিতার স্মৃতিরক্ষার্থে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা, পুষ্করিণী খনন, রাস্তা ও মন্দির নির্মাণ করেন। যাদবপুর ও কশৌলী যক্ষা হাসপাতালে অর্থদান করেছিলেন। ইংরেজি সাহিত্যের খ্যাতনামা অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র।

ফিরে আসি প্রেমচাঁদের কথায়। তাঁর ছয় পুত্রের মধ্যে নবীনচন্দ্র ছিলেন জ্যেষ্ঠ। সাহেবি কেতার মানুষ ছিলেন তিনি। কলিকাতা হাইকোর্টের সুপরিচিত অ্যাটর্নি। ৬নং ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিটের টেম্পল চেম্বার্সে ছিল তাঁর বিরাট অফিস— এন সি বড়াল অ্যান্ড পাইন। নবীনচাঁদ ছিলেন কৃতী পুরুষ, আইন ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিটের মুখে পৃথক এক বিশাল বাসভবন নির্মাণ করেন (১নং প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিট)। বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন নবীনচাঁদ।

বহুদিন তিনি প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কলিকাতা পুরসভায় বহু বছরের কমিশনার, বহুবাজার হাই স্কুল এবং কলিকাতা মূক বধির বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, হিতকারী সংস্থার অন্যতম পরিচালক ছিলেন নবীনচাঁদ। এ ছাড়াও বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। ১৪ই জুলাই ১৯১২ সালে তিনি দেহত্যাগ করেন। কলিকাতা পুরসভা ১লা জুন, ১৯৫৬ সালের অধিবেশনে হাড়কাটা গলির নাম পরিবর্তন করে নবীনচাঁদ বড়ালের নামে 'নবীনচাঁদ বড়াল লেন' নামকরণ করেন।[৫৯]

হাড়কাটা গলি কলিকাতার প্রাচীন পথগুলির অন্যতম। ১৮০৬ সালের কলিকাতা পুরসভার Assessment Register-এ এই পথটির খোঁজ পাওয়া যায়। কলিকাতা পুরসভার ১লা জুন ১৯৫৬ সালের প্রতিবেদনে রাস্তাটি সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য করা হয়েছিল : ''That name Harkata Lane has no historical reference attached to it except that the area was inhabited by bonecutters and women of ill repute and was notorious for murder and robbery.'' সমাজবিজ্ঞানী বিনয় ঘোষের মতে, "হীরাকাটা থেকে হাড়কাটা হয়েছে। বউবাজার বহুকাল থেকে স্বর্ণকারদের ব্যবসাকেন্দ্র। স্বর্ণকারদের পাশে হীরাকাটা (Diamond Cutters) শিল্পীদের বসতি স্বাভাবিক।"[৬০] কলিকাতা পুরসভা হাড়কাটা লেনের "হাড়কাটা" শব্দের ব্যুৎপত্তি কিভাবে নির্ণয় করলেন বোঝা গেল না। গলিপথটি বৌবাজার ষ্ট্রিটের উত্তর দিক থেকে আরম্ভ হয়ে অনেকটা 'দ' অক্ষরের আকারে উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিটে এসে পড়েছে। বর্তমানে এই পল্লীতে অনেক ভদ্র আবাসন গড়ে উঠেছে।

দৃষ্টি ফেরানো যাক বড়াল পরিবারের দিকে। নবীনচাঁদের একমাত্র পুত্র খ্যাতনামা সঙ্গীত ও বাদ্যশিল্পী লালচাঁদ বড়াল। জন্ম ১৮৭০ খ্রিঃ কলিকাতায়। লালচাঁদের মাতা, নবীনচাঁদের স্ত্রী ছিলেন বদান্য সাগরলাল দত্তের কন্যা। লালচাঁদের শিক্ষা প্রথমে হিন্দু স্কুলে, পরে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে। ছেলেবেলা থেকেই সঙ্গীতের প্রতি প্রগাঢ় আগ্রহ। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের সান্ধ্য সম্মিলনীতে প্রথম পিয়ানো শিক্ষা শুরু করেন। পিতার অজান্তে এবং মাতার আনুকূল্যে পিয়ানো শিক্ষায় অগ্রসর হন। শীঘ্রই একজন পিয়ানোবাদক রূপে কলেজে খ্যাতিলাভ করেন। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের অধ্যাপকদের অনুরোধে লজ অ্যাঙ্কারের বার্ষিক সম্মেলনে বাজাতে সম্মত হন। কলিকাতায় তখন ফ্রীম্যাসনদের একটি মিলনকেন্দ্র ছিল লজ এ্যাঙ্কার। সরকারি মহলের বড় বড় কর্মচারী, কিছু ব্যবসায়ী ও ইংরেজ বণিকরা ছিলেন তার সভ্য। লজের বার্ষিক অধিবেশন হত রাজকীয় জাঁকজমক ও সুরুচিপূর্ণ ব্যবস্থাপনায়। খানা-পিনার সঙ্গে থাকত ইউরোপীয় সঙ্গীতের ঢালাও ব্যবস্থা। যে বছর লালচাঁদ লজ অ্যাঙ্কারে পিয়ানো বাজাতে এলেন, সে বছর লজের গ্র্যান্ড মাস্টার বা সভাপতি ছিলেন খ্যাতনামা অ্যাটর্নি ও লালচাঁদের পিতা নবীনচাঁদ বড়াল। বিশেষ অতিথি হয়ে এসেছিলেন তৎকালীন ইংরেজ গভর্নর। পিয়ানো বাজাতে বসে লালচাঁদ পিয়ানোতে যে সুরের ঝঙ্কার তুলেছিলেন তাতে সমস্ত শ্রোতৃবৃন্দ মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যায়। গভর্নর উঠে দাঁড়িয়ে লালচাঁদকে তাঁর অপূর্ব পিয়ানো বাজানোর জন্য ভূয়সী প্রশংসা করলেন। যে পিয়ানোতে তিনি সুরলহরী তুলেছিলেন, সেই পিয়ানোটি লালচাঁদকে গভর্নর উপহার দিলেন। পিয়ানো ছাড়াও দেশি বাদ্যযন্ত্র ও কণ্ঠসঙ্গীতে শিক্ষা নিয়েছিলেন লালচাঁদ। মুরারী গুপ্তের কাছে মৃদঙ্গ ; বিশ্বনাথ রাও, জগকরণ রাও, কাশীনাথ মিশ্রের কাছে ধ্রুপদ এবং নান্দে খাঁ ও গুরুপ্রসাদ মিশ্রের কাছে খেয়াল গান শেখেন। জলতরঙ্গ বাজানোতেও তাঁর পারদর্শিতা ছিল। সেকালে তাঁর গাওয়া বহু বাংলা গান রেকর্ড করা হয়। গানগুলি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। রেকর্ড কোম্পানি প্রচুর অর্থ উপার্জন করে। শোনা যায় রেকর্ড কোম্পানি লালচাঁদকে একটি মোটর গাড়ি উপহার দিতে চায়, সেসময় তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত। ৪ঠা অক্টোবর ১৯০৭ সালে লালচাঁদের মৃত্যু হয়।

লালচাঁদের মৃত্যুর পর প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিটের সুরম্য ভবনে প্রতি বছর লালচাঁদ বড়াল স্মারক উৎসব হত। সে এক স্মরণীয় গানের আসর। দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে প্রথম শ্রেণীর সঙ্গীতজ্ঞ ও যন্ত্রশিল্পীরা নিমন্ত্রিত হয়ে এসে কয়েকদিন বড়াল ভবনকে সুর ঝঙ্কারে ও সঙ্গীতের মূর্ছনায় আচ্ছন্ন করে রাখতেন। সেই অনুষ্ঠান বড়াল ভবন থেকে নিয়মিত বেতারে সম্প্রচারিত হত।

প্রখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক রাইচাঁদ বড়াল লালচাঁদের কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি ছিলেন ভারতবিখ্যাত তবলাবাদক। পরে ফিল্মের সঙ্গীত পরিচালক হিসাবে অসামান্য খ্যাতি লাভ করেন। রাইচাঁদ বড়াল রেডিও-র অনুষ্ঠান বিভাগে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অপর দুই পুত্র বিষণচাঁদ ও কিষণচাঁদও সঙ্গীত জগতে সুপরিচিত ছিলেন।[৬১]

প্রেমচাঁদ বড়ালের কনিষ্ঠ পুত্র রায়বাহাদুর গোকুলচাঁদ বড়াল ১৮৬০ খ্রিঃ কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দু স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বাল্যকাল থেকে নিয়মিত ব্যায়াম করে তিনি সুঠাম স্বাস্থ্যের অধিকারী হন।

সেকালের কলিকাতায় গোকুলচাঁদ একজন বিশিষ্ট সমাজসেবী হিসাবে পরিগণিত হতেন এবং নানা জনহিতকর কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। খড়দহের গঙ্গার ধারে অন্নপূর্ণা দেবী ও গৌরনিতাই-এর মন্দির, নাট্যশালা, উদ্যান ও বাসভবন নির্মাণ করে দেন। খড়দহে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্ত্রীর নামে স্থাপন করেন— নাম ক্ষেত্রমণি দাতব্য চিকিৎসালয়। পরিচালনার ব্যয়ভারও নিজেই বহন করতেন। চুঁচুড়ায় একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ১০ কাঠা জমি দেন।

গোকুলচাঁদ ক্রমান্বয়ে একুশ বছর ছিলেন কলিকাতা পুরসভার কমিশনার। পল্লীর উন্নতিতে তাঁর কর্মপ্রচেষ্টা উল্লেখের দাবি রাখে। কলিকাতা পুরসভায় কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড প্রবর্তনে তাঁর অবদান স্মরণীয়।

গোকুলচাঁদ প্রথমে ব্যারাকপুর, পরে কলিকাতায় অবৈতনিক প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন। সরকার তাঁকে 'রায়বাহাদুর' উপাধি প্রদান করেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত সুবর্ণ বণিক সমাজের অন্যতম সহ-সম্পাদক ছিলেন। ১৯৩৩ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

আবার ফিরে চলি শাঁখারিটোলায়। শাঁখারিটোলা লেনের মতো শাঁখারিটোলা ফার্স্ট লেন তার নামের অস্তিত্ব বেশিদিন টিকিয়ে রাখতে পারেনি। রাস্তাটি শাঁখারিটোলা লেন (গোকুল বড়াল স্ট্রিট) থেকে শুরু হয়ে সোজা দক্ষিণে এগিয়ে ক্রীক রো-কে অতিক্রম করে গঙ্গারাম পালিত লেনে এসে মিশেছে। ১৯৪১ সালে ওই রাস্তার অধিবাসীরা এক স্মারকপত্রের মাধ্যমে রাস্তাটির নাম বদল করে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ প্রয়াত নৃসিংহ মুখার্জির নামে নামাঙ্কিত করার এক প্রস্তাব পেশ করেন। নৃসিংহ মুখার্জি ছিলেন সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, শিক্ষাবিদ এবং বহু গ্রন্থ প্রণেতা। তিনি ছিলেন ওই এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা। কলিকাতা পুরসভা ১৯৪১ সালের ২৩ নভেম্বরের অধিবেশনে শাঁখারিটোলা ফার্স্ট লেনের নাম বদল করে পণ্ডিত নৃসিংহ মুখার্জির নামে 'নৃসিংহ মুখার্জি লেন' নামকরণ করেন।[৬২]

কলিকাতার নগরায়ণ ত্বরান্বিত হওয়ায়, শাঁখারিরা ওই অঞ্চল পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে গেলেও শাঁখারিটোলার ঐতিহ্য বহন করে চলেছিল এই তিন রাস্তা— শাঁখারিটোলা লেন, শাঁখারিটোলা ইস্ট লেন, শাঁখারিটোলা ফার্স্ট লেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের চাপে ধীরে ধীরে স্মৃতি বিজড়িত এই সব প্রাচীন রাস্তার অবলুপ্তি ঘটতে থাকে। কেবলমাত্র শাঁখারিটোলা লেনের (এখন শাঁখারিটোলা স্ট্রিট) অংশবিশেষ আজও টিকে থেকে পুরানো দিনের স্মৃতিকে বহন করে চলেছে।

সুকিয়া রো : এই জনপথটি উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত। চালতাবাগান লেন থেকে আরম্ভ হয়ে দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে সুকিয়া স্ট্রিটে এসে পড়েছে। পূর্বে এই রাস্তাটির নাম ছিল নন্দকুমার চৌধুরী সেকেন্ড লেন।

১৯১৬ সালের কথা। নন্দকুমার চৌধুরী সেকেন্ড লেনের বাসিন্দাগণ মিলিতভাবে একটি স্মারকলিপি কলিকাতা পুরসভার কাছে পেশ করে অনুরোধ জানান যে রাস্তাটির নাম পরিবর্তন করে সুকিয়া রো করা হোক। সুকিয়া নামের সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ত করার অভিলাষ নিহিত আছে স্মারকলিপির মধ্যে। কলিকাতা পুরসভা ২৯শে মার্চ ১৯১৬ আবেদনটি মঞ্জুর করেন।[৬৩] রাস্তাটির নতুন নাম হল 'সুকিয়া রো'।

কে এই সুকিয়া ? সেথের প্রণীত আরমানি ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে সুকিয়া বংশের কোনও এক ব্যক্তি বর্তমান বাদুড়বাগানে বাস করতেন (Mesrovb. J. Seth's History of the Armenian in India)। তাঁর সুকিয়া বিবি নামে এক কন্যা ছিল। এই কন্যা বিবাহের দু'বছর পর বিধবা হন।

ইনি পরম দানশীলা মহিলা ছিলেন। তাঁর বাসভবনের নিকট একটি পথ নির্মাণের জন্য বহু অর্থ দান করেছিলেন। সেই পথটিই হল আজকের 'সুকিয়া স্ট্রিট'। এই পুণ্যবতী মহিলার দানে জনসাধারণের চলাচলের সুবিধার জন্য রাস্তাটি নির্মিত হয়। এজরা স্ট্রিটে তাঁর প্রতিষ্ঠিত একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান আছে। কতিপয় আরমানি বংশের লোকের অনুরোধে এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠানের কাজের সুবিধার জন্য আরেকটি পথ তৈরি করে দেন। এই পথটি 'সুকিয়াস লেন' নামে পরিচিত।[৬৪]

সুকিয়া বিবি ১৬৪৯ খ্রিঃ ব্যারাকপুরে জন্মগ্রহণ করেন (Bengal Annual, Vol. 8, 1792)। তাঁর দ্বিতীয় বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তাঁর পিতামহ আড়ম্বরের সঙ্গে এক উৎসব অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছিলেন ; সমাজসেবার জন্যও ২ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছিলেন। সেই অর্থে বহু বৃহৎ উদ্যান নির্মাণ, কূপ খনন, দরিদ্রদের বস্ত্র, উত্তরীয় ও ছত্র দান করা হয়েছিল। এ ছাড়া প্রত্যেক দরিদ্রকে ৪ টাকা নগদ দেওয়া হয়েছিল।[৬৫]

সুকিয়া বিবি ইংরেজদের প্রভূত অর্থ ঋণ দিয়েছিলেন। সেই অর্থ ফিরে পেলে তিনি অসহায়, অনাথ ও দরিদ্র ব্যক্তিদের তা' দান করেন। সে সময় তাঁর নাম ঘরে ঘরে ফিরত।

সুকিয়া বিবির প্রকৃতি ছিল অতি সরল। প্রভূত অর্থ ছিল তাঁর। কিন্তু অনাড়ম্বর জীবনে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। শোনা যায় তাঁর মৃত্যুর পর সমুদয় অর্থ আতুর অনাথ দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল।[৬৬]

সুকিয়া পরিবার সপ্তদশ শতাব্দীর শুরুতে কলিকাতায় বসবাস আরম্ভ করেন। এই পরিবারে পিটার সুকিয়া নামে একজন ধনাঢ্য আরমানি বণিক ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত বাগানবাড়ি ছিল "বৈঠকখানা" অঞ্চলে। কটন সাহেবের মতে এই পিটার সুকিয়ার নাম থেকেই সুকিয়া স্ট্রিট নামাঙ্কিত হয়েছে। এই বক্তব্যের সমর্থন মেলে আরমেনিয়ান লেখক Thaddeus Avertoom-এর লেখা Aramais নামক উপন্যাস গ্রন্থে। পুস্তকটি ১৮৪৬ খ্রিঃ কলিকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। Avertoom আরও বলেছেন যে পিটার সুকিয়াস (Peter Sookeas) আরমেনিয়ান ঘাট নির্মাণ করে দিয়েছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদে এক সরকারি দলিলে একজন পিটার সুকিয়াস-এর নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। ২৪শে মার্চ ১৭৮১ খ্রিঃ দি বেঙ্গল গেজেটের ৯নং সংখ্যায় প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায় যে ভারতবর্ষে প্রথম সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠাতা জেমস্ অগাস্টাস হিকির বিরুদ্ধে গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস আনীত মানহানির মামলার বিচারের জন্য যে ১২ জন সম্মানিত ব্যক্তিদের নিয়ে জুরির দল গঠন করা হয়েছিল, তাঁদের অন্যতম ছিলেন পিটার সুকিয়াস। তা ছাড়া ১৭৯৭-৯৮ খ্রিঃ প্রকাশিত বেঙ্গল ডাইরেক্টরি ও পঞ্জিকা থেকে জানা যায় যে পিটার সুকিয়াস সেকালের কলিকাতায় আর্মেনিয়ান বণিকদের মধ্যে অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ও খ্যাতিমান পুরুষ ছিলেন।

এবার কলিকাতার প্রাচীন মানচিত্রগুলির দিকে তাকানো যাক। মার্ক উডের কলিকাতা মানচিত্রে (১৭৮৪) এই পথটির কোনও চিহ্ন নেই। আপজন মানচিত্রে (১৭৯২) রাস্তাটির নামের কোনও উল্লেখ নেই। কিন্তু ওই মানচিত্রে রাস্তাটি চিহ্নিত আছে। ১৮৩১ সালে সুকিয়া স্ট্রিট নামে পুলিশ থানার অস্তিত্ব ছিল। এ থেকে মনে করা যেতে পারে সুকিয়া স্ট্রিট নামে রাস্তাটি সে সময়ে যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করেছিল। ১৮৩১ সালে কলিকাতার জনগণনা থানাভিত্তিক করা হয়। জনগণনার প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে সে সময়ে কলিকাতায় ৪০টি থানা ছিল। ৭নং থানাটি ছিল সুকিয়া স্ট্রিট থানা। এ থেকে অনুমিত হয় যে সুকিয়াস স্ট্রিট ও সুকিয়াস লেন ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে নামাঙ্কিত হয়ে থাকবে।[৬৭] আর সুকিয়াস রো-এর নামকরণের কথা গোড়াতেই বলা হয়েছে।

সেকালের সুকিয়া স্ট্রিটের চালচিত্রের দিকে একবার তাকাই। আচার্য সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের পৈতৃক বাসভবন ছিল এই সুকিয়া স্ট্রিট অঞ্চলে। তিনি তাঁর বাল্যস্মৃতি রোমন্থন করে সেকালের সুকিয়া স্ট্রিটের এক অনবদ্য রম্যচিত্র উপহার দিয়েছেন। কলিকাতার রাজপথের ইতিহাসে তা এক দলিল হিসাবে গণ্য হয়ে থাকবে। তিনি লিখেছেন—

"চোখ বুঁজে চিন্তা করে দেখলে সে যুগের সুকিয়া স্ট্রিটের ছবি এখন বেশ মনে পড়ে। তখন এখানে ওখানে সেখানে খালি মাঠের ছড়াছড়ি। আর মাঝে মাঝে ছোট ছোট পুকুর আর ডোবা।

কোঠা বাড়ি এত ছিল না, আর বেশিরভাগ কোঠাবাড়ি একতলা, সদর দরজার পাশে একটু রোয়াক। ছোট ছোট জানলা, অনেক সময় জানলার গরাদে কাঠের রং-এর বদলে বেশিরভাগ আলকাতরা দিয়ে রাঙানো জানলা আর দরজা। খোলা চালের বাড়ি এদিকে ওদিকে দু' চারখানা ছিল, কিন্তু গোলপাতার ছাওয়া বাঁখারি আর মাটির দেওয়ালের ঘর তখন চারিদিকে দেখা যেত। সুকিয়া স্ট্রিট রাস্তায় সকলের চোখে পড়ার মতো একটি ইমারত ছিল ; সেটি এখনও আছে। সেটি হচ্ছে মহেশ ঘোষের প্রতিষ্ঠিত শিবালয়। এই মন্দিরের একটু বিশেষত্ব আছে। এটির মধ্যে একই খিলানের ভিতর ঠাকুরের ঘর— যাকে গর্ভগৃহ বলে— আর ঘরের বাইরের দালান তৈরি হয়েছিল। মদন মিত্রের গলির বাঁক থেকেই সাদা শিবের মন্দির, আর তার সামনের কতকগুলি নারকেল গাছ দেখা যেত। এই মন্দিরটি আমার উজ্জ্বল স্মৃতি।

'...মন্দিরের মধ্যে একটি কালো পাথরের বিরাট শিবলিঙ্গ আছে। সেটি খুব পালিশ করা চকচকে। ইচ্ছে হত এই শিবলিঙ্গটির গায়ে একটু হাত বুলিয়ে দিই। পরে একটু বড় হয়ে এই মহেশ ঘোষ সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনেছিলাম। মহেশ ঘোষ আমাদের পাড়ায় সেকালে ছিলেন যাকে ইংরেজিতে বলে একটি character অর্থাৎ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ। মহেশ ঘোষ অশিক্ষিত ছিলেন। পাড়ার লোকেরা তাঁকে সহজভাবে "ময়শা গয়লা" বলে উল্লেখ করত। তিনি জাতিতে সদগোপ ছিলেন আর পেশা ছিল গরু রেখে দুধ বিক্রি। তাঁর এক বিরাট গোয়াল ছিল। বড় বড় হাঁড়ি করে তাঁর দুধ নতুন বাজারে বিক্রি হতে যেত, চিৎপুর রোডের ধারে বিডন স্কোয়ারের সামনে। মহেশ ঘোষ খুব খাঁটি মানুষ ছিলেন, তাঁর একটা গর্বের বিষয় ছিল যে তাঁর দুধে তিনি কখনও জল মেশাতেন না। ... পরে তিনি দুধের ব্যবসা বন্ধ করে দেন, আর সব দামী গরু বিক্রি করে দেন। সঞ্চিত টাকা আর ব্যবসা তুলে নেবার সময় সব গরু বিক্রি করে যে টাকা পান, দুই মিলিয়ে তিনি এই মন্দির করেন।"[৬৮]

সেকালের কলিকাতার বহু সম্ভ্রান্ত বাঙালি পরিবার সুকিয়াস স্ট্রিটের ধারে ধারে নিজেদের আবাস গড়ে তোলেন। ভারতপথিক রাজা রামমোহন রায় দীর্ঘদিন সুকিয়া স্ট্রিটে বাস করেছিলেন। প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর ২৫ বছর এখানে বসবাস করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের বন্ধু, শিক্ষাবিদ্ ও গ্রন্থকার রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি ছিল সুকিয়া স্ট্রিটে। ২৪নং সুকিয়া স্ট্রিট বাড়িতে বিদ্যাসাগর মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন স্থাপন করেন, পরে এটি বিদ্যাসাগর কলেজে রূপান্তরিত হয়। এই ইনস্টিটিউশনে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একদা অধ্যাপনা করতেন। পরে ভবনটি ঠনঠনিয়ার লাহা পরিবারের বিমলাচরণ লাহা কিনে নেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। বর্তমানে ওয়েস্ট বেঙ্গল সেকেন্ডারি এডুকেশন বোর্ডের একটি শাখা অফিস এখানে আছে।

বিদ্যাসাগর ১৮৬৯ খ্রিঃ তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও বিধবাবিবাহের সক্রিয় সমর্থক কৃষ্ণনগর নিবাসী ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়কে সংস্কৃত প্রেস ও প্রেস ডিপজিটরি দান করেন। পরে ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে মতের অমিল হওয়ায় বিদ্যাসাগর ১৮৮৫ খ্রিঃ নিজের লেখা গ্রন্থাদি সংস্কৃত প্রেস ও প্রেস ডিপজিটরি থেকে তুলে নেন। অতঃপর ১৮৮৫ খ্রিঃ ১লা ডিসেম্বর ২৫নং সুকিয়া স্ট্রিটে "দি ক্যালকাটা লাইব্রেরী" (কলিকাতা পুস্তকালয়) নাম দিয়ে একটি পুস্তকের দোকান খোলেন। এর প্রায় ২০ বছর আগে এই ২৫নং সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়িতে ১লা জানুয়ারি ১৮৬৫ খ্রিঃ ক্যাথিড্রাল মিশন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৯৯ খ্রিঃ কলেজের নাম হয় চার্চ মিশনারি সোসাইটি কলেজ, সর্বশেষে সেন্ট পল্‌স ক্যাথিড্রাল কলেজ। ১৮৬৮ সালের এপ্রিল মাসে ক্যাথিড্রাল মিশন কলেজ ২৫নং সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়ি থেকে ২২নং মির্জাপুর স্ট্রিটে (সূর্য সেন স্ট্রিট) উঠে আসে।[৬৯]

১৮৫৬ খ্রিঃ ২৬শে জুলাই বিধবাবিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হলে পর বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে এই সুকিয়া স্ট্রিটে প্রথম বিধবাবিবাহ সুসম্পন্ন হয়েছিল। এই বিবাহের পাত্র প্রসিদ্ধ কথক রামধন তর্কবাগীশের ছোট ছেলে শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। তিনি প্রথমে ছিলেন সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক, পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। কন্যা পতিপুত্রহীনা লক্ষ্মীমণি দেবীর সন্তান কালীমতি। প্রথম আইনসিদ্ধ বিধবাবিবাহ ; সেদিন ছিল ৭ই ডিসেম্বর ১৮৫৬, বাংলার ২৩শে অগ্রহায়ণ, ১২৬৩ বঙ্গাব্দ। বিবাহবাসর ১২নং সুকিয়া স্ট্রিট, ভবনটি প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

শ্রীশচন্দ্র ও কালীমতির যখন বিবাহ হয়, সেই সময় প্রচণ্ড সামাজিক আপত্তি ও প্রতিবাদের মধ্যেও রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সানন্দে নিজের বাড়িতে বিবাহের ব্যবস্থা করেছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, ঠেলাঠেলিতে সুকিয়া স্ট্রিটের খোলা নর্দমায় পড়ে কত লোক যে কর্দমাসিক্ত হলেন তার ইয়ত্তা নেই। বরের পালকির পাশে পাশে হেঁটেছিলেন রামগোপাল ঘোষ, হরচন্দ্র ঘোষ, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, হাইকোর্টের জজ দ্বারকানাথ মিত্র প্রমুখ বিদ্যাসাগরের বন্ধুমণ্ডলী। এঁরা ছাড়াও এই বিবাহবাসরে উপস্থিত ছিলেন রমাপ্রসাদ রায়, রাজা দিগম্বর মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র, মহাভারতের অনুবাদক কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রমুখ সেকালের স্বনামধন্য পুরুষেরা।

সেকালের লব্ধপ্রতিষ্ঠিত কবি ও সাহিত্যিক দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁর ৫নং সুকিয়া স্ট্রিটের বাসভবনে স্থাপন করেছিলেন 'পূর্ণিমা মিলন সভা'। এটি ১৯০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। সাহিত্যিকদের একত্রিত করে তাঁদের মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য গড়ে তোলাই ছিল এর মুখ্য উদ্দেশ্য। তাঁদের আনন্দবর্ধনের জন্য তিনি একটি অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করেন। দেবকুমারকে লিখিত একখানি পত্রে প্রকাশ :

"এক নতুন খেয়াল মাথায় আসিয়াছে। ...আমি (অর্থাৎ আমরা) ইচ্ছা করিয়াছি প্রতি পূর্ণিমায় দেশশুদ্ধু সাহিত্যিসেবী ও সাহিত্যানুরাগীদের একত্র করিয়া এক এক স্থানে এক একবার প্রতি পূর্ণিমা উপলক্ষে মিলন করা যাইবে। নাম হইবে 'পূর্ণিমা মিলন'। ইহাতে কলিকাতাস্থ সমুদয় সাহিত্যিকদের মধ্যে অবারিতভাবে মেলামেশা, ভাববিনিময়, প্রীতিবর্ধন ও পরিচয়াদি হইবে। আর তাহার সঙ্গে সেখানে (যেখানে যখন হইবে) গৃহস্বামীর প্রবৃত্তি ও সামর্থ্যানুসারে অল্প কিছু জলযোগ— এই ধর যেমন চা, সরবৎ প্রভৃতি ও চুরুট তামাকের (সিগারেটেরও !!) ব্যবস্থা থাকিবে। আগামী দোল পূর্ণিমায় সন্ধ্যায় প্রথমে আমার গৃহে এই মিলন। তারপর প্রতি পূর্ণিমায় (যদি কেহ চান তো তাঁর বাড়িতে নইলে আমারই এখানে) মাতৃভাষার সেবকগণ— আমাদের জাতভাইরা একত্র হইবেন।"[৭০]

১৩১২ সনে দোল পূর্ণিমার দিন (ইং ১৯০৫) দ্বিজেন্দ্রলালের সুকিয়া স্ট্রিটের আবাসে পূর্ণিমা মিলনের প্রথম অধিবেশন হয়। ওইদিন রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন এবং স্বরচিত "সে যে আমার জননী" গানটি গেয়ে সকলকে মোহিত করেছিলেন। এই সভায় গান আবৃত্তি প্রবন্ধ গল্প উপন্যাস পাঠ তো ছিলই, আর ছিল মিষ্টিমুখের ঢালাও ব্যবস্থা। পূর্ণিমা মিলন সভার জন্য দ্বিজেন্দ্রলাল যে আমন্ত্রণ লিপি রচনা করেছিলেন সেটি পরে সঙ্গীত হিসাবে খ্যাত হয়। নিমন্ত্রণলিপিটি ছিল এইরূপ—

"এটা নয় ফলার ভোজের নিমন্ত্রণ
শুধু আছে কিছু জলযোগ আর চায়ের মাত্র আয়োজন।
সাহিত্যিক সব ছোট-বড়—এইখানেতে হয়ে জড়,
সবাই, আনন্দে ও ভ্রাতৃভাবে কর্তে হবে কালহরণ।"[৭১]

পূর্ণিমা মিলন সভা অনেকদিন চলেছিল। সেকালের কবি সাহিত্যিকদের এটি একটি আকর্ষণীয় মিলন-কেন্দ্র ছিল।

স্ত্রী-বিয়োগের পাঁচ বছর পর দ্বিজেন্দ্রলাল ২নং নন্দকুমার চৌধুরী লেনে একখানি সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করেছিলেন। পত্নীর নামানুসারে এই ভবনের নামকরণ করেন 'সুরধাম'। ১৩১৬ সনের ১লা বৈশাখ ইংরেজির ১৪ এপ্রিল ১৯০৯ খ্রিঃ গৃহপ্রবেশ করেন। জীবনের বাকি দিনগুলি সুরধামেই কেটেছিল।

পূর্ণিমা মিলন সভার মতো আরেকটি ক্লাবের পত্তন হয়েছিল এই সুকিয়া স্ট্রিটের উপর। এর নাম ছিল তাতাবাবুর "ননসেন্স ক্লাব"। দ্বিজেন্দ্রলালের বাড়ি থেকে মাত্র খানকয়েক বাড়ির পরে ২২নং সুকিয়া স্ট্রিটে পূর্ণিমা মিলন সভা স্থাপনের বছর দশেক পরে এই অভিনব ক্লাবটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই বাড়িটি ছিল তাতাবাবুর সেই সময়ের বাসস্থান।[৭২] ক্লাব সম্বন্ধে বলার আগে তাতাবাবু সম্বন্ধে দু'চার কথা বলা দরকার।

বিখ্যাত শিশু সাহিত্যিক ও সন্দেশ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সর্বগুণান্বিত জ্যেষ্ঠপুত্র তাতাবাবু ওরফে সুকুমার রায়চৌধুরী (১৮৮৭-১৯২৩)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, ম্যাঞ্চেস্টার স্কুল অফ টেকনোলজির ফটোগ্রাফি ও ব্লক নির্মাণে প্রথম স্থানাধিকারী সুকুমার

রায়চৌধুরীর খ্যাতি বাংলাদেশে অন্যতম শিশুসাহিত্যিকরূপে। এ ছাড়া সুগায়ক ও সুঅভিনেতারূপেও তিনি খ্যাতিমান ছিলেন।

১৯০১ সালে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ৩৮/১, শিব নারায়ণ দাসের গলি থেকে উঠে ২২নং সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়িতে বসবাস শুরু করেন। সুকিয়া স্ট্রিটের ইতিহাসে এই বাড়িটির অবদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সে সময় এ বাড়ির পূর্ব অংশের নীচে ছিল কান্তিক প্রেস ও দোতলায় ছিল ভারতী পত্রিকার অফিস ও আড্ডা। আর পশ্চিমদিকের অংশের একতলায় ছিল উপেন্দ্রকিশোরের প্রেস। এই বাড়ির দোতলায় দক্ষিণদিকে তিনি সপরিবারে থাকতেন। এই বাড়িতে এসে উপেন্দ্রকিশোর নিজের ব্যবসার নাম দেন ইউ রায় অ্যান্ড সন্স। এখান থেকেই তিনি ১৯১৩ সালে সন্দেশ পত্রিকা প্রকাশ করেন।[৭৩] এই সন্দেশ পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ায় সুকুমার রায়ের সাহিত্যপ্রতিভা পূর্ণরূপে বিকশিত হয়ে উঠে। সেই সময় তিনি স্থাপন করেন "ননসেন্স ক্লাব", যে কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

পরে প্রতি সোমবার এই ক্লাবের অধিবেশন বসত বলে এর নাম হয়ে যায় "মন্‌ডে ক্লাব"। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-এর নাম দিয়েছিলেন "মন্ডা ক্লাব"—

"আমাদের মনডে সম্মেলন
হারে-রে আমাদের মন্ডা সম্মিলন।
চারুবাবুর দধি, দারু ঘোলের নদী
জংলীভায়ার সরবতে মন মাতালে নিরবধি—"

এই "মন্ডা" ক্লাবের প্রথম বৈঠক বসেছিল ৬৪নং সুকিয়া স্ট্রিটে অমল হোমের বাড়ি।[৭৪] এই মনডে ক্লাবের সম্পাদক ছিলেন শিশিরকুমার দত্তাধিকারী, ডাক নাম ছিল খোদন, তাঁর ছিল ছাগলদাড়ি, সেটা ছিল ক্লাবের এক মস্ত সম্পদ। তিনি থাকতেন ২৫নং সুকিয়া স্ট্রিটে। সভ্যদের নিমন্ত্রণপত্রে তিনি সে কথা ব্যক্ত করেছেন :

আমি অর্থাৎ সেক্রেটারি,
মাস তিনকে কল্‌কেতা ছাড়ি
যেই গিয়েছি অন্য দেশে
অমনি কি সব গেছে ফেঁসে !
বদলে গেছে ক্লাবের হাওয়া,
কাজের মধ্যে কেবল খাওয়া,
চিন্তা নেইক গভীর বিষয়,
আমার প্রাণে এ সব কি সয় ?
এখন থেকে সামলে রাখ
এ সমস্ত চলবে নাকো—
আমি আবার এইছি ঘুরে,
তান ধরেছি সাবেক সুরে।—
শুনবে এস সুবন্ধ
গিরিজার—বিবেকানন্দ
মঙ্গলবার আমার বাসায়*
(আর থেক না ভোজের আশায়)

* ১৪ই মে ২৫নং সুকিয়া স্ট্রিট।[৭৫]

এই মনডে ক্লাবের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করার মতো। চার আনা করে মাসে চাঁদা, গুটি কয়েক লোক নিয়ে আরম্ভ, পরে সদস্যসংখ্যা অনেক বেড়েছিল। অধিবেশন ঘুরে ঘুরে হত এক একজন সভ্যের

বাড়িতে। এর সদস্য ছিলেন সুকুমার রায় (তাতাবাবু), সুবিনয় রায়, প্রভাতকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, অতুলপ্রসাদ সেন, কালিদাস নাগ, অমল হোম, অজিতকুমার চক্রবর্তী, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরণকুমার সান্যাল, প্রশান্ত মহলানবিশদের মতো খ্যাতিমান পুরুষেরা।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মতো তাতাবাবুও আমন্ত্রণলিপি পাঠাতেন ছড়ায়, তা ছিল এইরূপ—

"আসছে কাল, শনিবার
অপরাহ্ন সাড়ে চার
আসিয়া মোদের বাড়ি,
শুভপদ ধুলি ঝাড়ি
কৃতার্থ করিলে সবে
টুলু পুষু খুশি হবে।"

এখানে টুলু হলেন বড় বউ অর্থাৎ সুকুমার রায়ের স্ত্রী সুপ্রভা এবং পুষু হলেন সুবিনয় রায়ের স্ত্রী পুষ্পলতা।[৭৬]

এই সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়ি থেকেই ১৯১৪-১৯১৫ সালের মধ্যে উপেন্দ্রকিশোর নিজের নক্শা অনুযায়ী ১০০নং গড়পার রোডে বাড়ি তৈরি করে উঠে যান।[৭৭] এরপর মনডে ক্লাব কয়েক বছর মাত্র স্থায়ী হয়েছিল।

২২নং সুকিয়া স্ট্রিটে 'ভারতী' পত্রিকার অফিসের কথাও পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। পত্রিকাটির সম্পাদনা ও পরিচালনা করতেন সরলাদেবী। পঞ্জাবের রামভুজ দত্তচৌধুরীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। শ্বশুরবাড়ি পঞ্জাবে যাবার আগে কাগজের স্বত্ব মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে দিয়ে যান। সে সময় এই বাড়ির একতলায় ভারতীর নিজস্ব কান্তিক প্রেস, দোতলায় পত্রিকার দপ্তরখানা এবং তেতলার একটি হলঘরে ভারতীর আড্ডা। প্রেস আর পত্রিকার মালিক হলেন মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি তাঁর সাহিত্যিক বন্ধু সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়কে যুগ্মসম্পাদক করে নবপর্যায়ে ভারতী পত্রিকা প্রকাশ করলেন।

'মৌচাক' সম্পাদক সুধীরচন্দ্র সরকার ভারতী পত্রিকা ও ভারতীর আড্ডা সম্বন্ধে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লিখেছেন, "তারপর এল ভারতীর আড্ডা ১৯১৩-১৪ সালে। একদিন আমি ও হেমেন্দ্রকুমার সুকিয়া স্ট্রিট দিয়ে যাচ্ছি। এমন সময় রাস্তায় দেখা হয়ে গেল মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তিনি আমাদের সুখবর দিলেন যে তিনি ও সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি ভারতীর সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করেছেন। আমরা দুজনে যেন ভারতীকে সব রকম সাহায্য করি। সেই থেকে হেমেন্দ্রকুমার পুরোপুরি ভারতীর একজন স্থায়ী লেখক হয়ে গেলেন।...

"সুকিয়া স্ট্রিটে ভারতী অফিসের পুরনো আড্ডার সঙ্গে সে সময়ের সব সাহিত্যিকই মোটামুটি পরিচিত ছিলেন। সকাল ও সন্ধ্যা দুবেলাই এই অফিসে আড্ডা বসত। বিকাল থেকে রাত নটা দশটা পর্যন্ত সরগরম থাকত, এবং রাত্রিবেলাতেই আসর জমত বেশি। রবিবার প্রায় সমস্ত দিনই আড্ডাধারীরা নানা রকম আলাপ-আলোচনায় আসর জমিয়ে রাখতেন। অনেকদিন খাওয়া-দাওয়া ওইখানেই হত। ভারতীতে নিয়মিত আসতেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, গিরিজাকুমার বসু, চারু রায়, মোহিতলাল মজুমদার ও যতীন্দ্রমোহন বাগচী। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অজিতকুমার চক্রবর্তী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী এঁরাও মধ্যে মধ্যে আসতেন। সাহিত্যরসিক আরও অনেকে আসতেন এখানে।

"সাহিত্য ক্ষেত্রে 'ভারতীর' আড্ডার একটি বিশেষ তাৎপর্য ছিল। তখনকার দিনের বড় বড় সাহিত্যিকদের একটি মিলনকেন্দ্র ছিল এই আড্ডাটি। 'কল্লোল' যুগ বলার মতো এ যুগকে 'ভারতী'র যুগও বলা চলে। অনেক নতুন সাহিত্যিকদের আবির্ভাব এইখান থেকে হয়েছে। সেই জন্যেই আমি বলতে বাধ্য যে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে ভারতীর দান মুখে বলে প্রকাশ করা যায় না। 'ভারতী'র এত উন্নতমানের আড্ডার কৃতিত্ব মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের জন্যই সম্ভব হয়েছিল।

"১৯১৮-১৯ সালে 'ভারতী' অফিসের তিনতলায় একটি সাহিত্যবাসর বসত প্রতি রবিবার বিকালবেলায়। এই সাহিত্যবাসরটির নাম ছিল 'রবিতীর্থ'। এখানে সাহিত্যিকরা নিজেদের রচনা পাঠ করতেন এবং অন্যান্য সাহিত্য আলোচনাও হত। এই 'রবিতীর্থে' মণিলালের দুই সুযোগ্য পুত্র মোহনলাল ও শোভনলাল ছোটদের গল্প পড়েন। সেগুলি সকলের প্রশংসা অর্জন করে। অবনীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী আসতেন এখানে। অবনীন্দ্রনাথ নিজেও এই রবিতীর্থে নিজের লেখা পড়েছিলেন। পরে এ গল্পগুলি 'মৌচাকে' প্রকাশিত হয়েছিল।"[৭৮]

২৭নং সুকিয়া স্ট্রিটের (বর্তমানে ৫৬বি, কৈলাস বোস স্ট্রিট) বাড়িটি ছিল এক সময়ে বিপ্লবের তীর্থক্ষেত্র। ১৯০৫-০৬ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় এই বাড়ির একতলায় ভাড়ায় ছিলেন প্রবাসী মারাঠি শিক্ষক ও স্বদেশপ্রেমী সখারাম গণেশ দেউস্কর। আরেক বিপ্লবী হলেন এই বাড়ির মালিকপুত্র অবনী মুখার্জী। ২৯ বছর বয়স্ক ভারতীয় বিপ্লবী অবনী মুখার্জী হল্যান্ড-বার্লিন হয়ে ১৯২০ খ্রিঃ মস্কোতে উপস্থিত হয়ে মহামতি লেনিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। সে সময়ে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক-এর দ্বিতীয় কংগ্রেস শুরু হয়েছিল। তিনি অন্যতম ভারতীয় প্রতিনিধি হিসাবে ওই কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন।

অবনী মুখার্জীর জন্ম জব্বলপুরে ১৮৯১ সালে। তাঁর দেশ ছিল খুলনার সাতক্ষীরা মহকুমার অন্তর্গত বাবুলিয়া গ্রামে। পিতা ত্রিলোক্যনাথ মুখার্জী ছিলেন সরকারি একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ; মাতা হরিমতী দেবী, শিক্ষালাভ কলিকাতার মেট্রোপলিটন ইন্‌স্টিটিউশনে।

জীবনের প্রথম ১৫-১৬ বছর অবনী মুখার্জী ছিলেন কলিকাতার পৈতৃক বাসভবন ২৭নং সুকিয়া স্ট্রিটে। ওই বাড়িতে তাঁর রাজনীতির দীক্ষা হয় সখারাম গণেশ দেউস্করের কাছে। বিপিন পাল, শ্রীঅরবিন্দ, বারীন ঘোষ প্রমুখ বিপ্লবীদের সংস্পর্শে এসে তিনি বিপ্লবমন্ত্রে অনুপ্রাণিত হন। বন্ধুত্ব হয়েছিল প্রতিবেশী আরেক বিপ্লবী প্রমথ নাথ দত্ত ওরফে দাউদ আলি দত্তের সঙ্গে। তাঁর সম্বন্ধেও দু'চার কথা পরে বলা হবে।

বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করে অবনী মুখার্জী অ্যাসিস্ট্যান্ট উইভিং মাস্টার-এর পদে যোগ দেন। কারখানার শ্রমিকদের শোষণ প্রত্যক্ষ করে তিনি মনে মনে বিক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। ১৯০৮ সালে সারা দেশ যখন আলিপুর বোমার মামলায় উদ্বেলিত, ঠিক এর কিছু পরে অর্থাৎ ১৯১০ সালের গোড়ায় অবনী মুখার্জী বয়ন শিল্পের উচ্চশিক্ষার জন্য জাপানের পথে পাড়ি দিয়েছিলেন। ১৯১১ সালে জাপান হয়ে জার্মানিতে এলেন। জার্মান সমাজতন্ত্রীদের সংস্পর্শে এসে তাঁদের মতাদর্শে উদ্বোধিত হলেন। ওই সময় তিনি জার্মান সরকারের সঙ্গে সংযোগ সাধন করে ভারতীয় বিপ্লবীদের হয়ে সাহায্যের আবেদন করলেন। কিন্তু জার্মান সরকারের কাছ থেকে কোনও আশ্বাস না পাওয়ায় তিনি ১৯১২ সালে ইংল্যান্ড হয়ে দেশে ফিরে আসেন। এরপর বিপ্লবী সংগঠনের কাজে দু বছর ধরে সারা ভারত ঘুরে বেড়ালেন। বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের সঙ্গে ওই সময় তাঁর পরিচয় হয়। ১৯১৫ সালে আবার জাপানের উদ্দেশে রওনা হলেন। এক বছর আগে জার্মানিতে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স কমিটি তৈরি হয়ে গেছে, সংবাদ এসেছিল জার্মানি থেকে ভারতীয় বিপ্লবীরা অস্ত্র সাহায্য পেতে পারে। তাই মানবেন্দ্রনাথ রায় গেলেন বাটাভিয়ায় জার্মানির সঙ্গে যোগাযোগের জন্য, আর অবনী মুখার্জী গেলেন জাপানে— সেখানে বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর সহায়তায় জাপান, চিন ও জার্মানদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে। সেই বছর ফেরার পথে পেনাং-এ ইংরেজদের হাতে অবনী মুখার্জী বন্দি হলেন। তাঁকে সিঙ্গাপুরে নিয়ে গিয়ে প্রাণদণ্ডাদেশ দেওয়া হল। তিনি ১৯১৭ সালে জেল ভেঙে পালালেন। প্রথমে জাভায় ; পরে সেখান থেকে গেলেন ইউরোপ, তারপর হল্যান্ড থেকে বার্লিন হয়ে মস্কো।

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক দ্বিতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের কিছুদিন পরে তাসখন্দে ১৯২০ সালে ১৭ অক্টোবর যে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি জন্মলাভ করে, অবনী মুখার্জী তার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য। তখন তাঁর বয়স মাত্র ২৯ বছর।[৭৯]

সুকিয়া স্ট্রিটে আরও দু-চারটি বাড়ি সম্বন্ধে বলা যায়। বর্তমানে ৩৫এ কৈলাস বসু স্ট্রিটের বাড়িতে

থাকতেন প্রথম ভারতীয় সেরোলজিস্ট, এদেশে ভ্যাশারম্যান টেস্টের আবিষ্কারক রায়বাহাদুর ডঃ গোপাল চন্দ্র মিত্র। একসময় এই বাড়িতে ভাড়া থাকতেন বিখ্যাত বিপ্লবী পুলিনবিহারী দাস, গায়ক জ্ঞান গোস্বামী। কাজী নজরুল ইসলাম বহুবার এ বাড়িতে এসেছিলেন জ্ঞান গোস্বামীর গলায় তাঁর নিজের লেখা একটি শ্যামাসঙ্গীত রেকর্ড করার জন্য। আর থাকতেন খ্যাতনামা ডাঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত। একাধারে ডাক্তার, কবি ও শিল্পী।

মহাকালী পাঠশালা : ৩৫সি সুকিয়া স্ট্রিটে স্থাপিত হয়েছিল মহাকালী পাঠশালা। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মহারানী গঙ্গাবাঈ। কলিকাতার স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে গঙ্গাবাঈ-এর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। তিনি ছিলেন রায়বেলুড়ের রাজা নারায়ণরাও-এর কন্যা। গঙ্গাবাঈ-এর মাসিমা ছিলেন ইতিহাস প্রসিদ্ধা ঝাঁসীর রানী লক্ষীবাঈ। দুইজনেই ছিলেন প্রায় সমবয়স্কা। সিপাহি বিদ্রোহের সময় লক্ষ্মীবাঈ-এর সঙ্গে থেকে অসামান্য সাহস ও তেজস্বিতা দেখিয়েছিলেন গঙ্গাবাঈ। সিপাহি বিদ্রোহ ব্যর্থ হলে তিনি নানাসাহেবের সঙ্গে নেপালে পালিয়ে গিয়ে ত্রিশ বছর আত্মগোপন করেছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর আটের দশকে কলিকাতায় এসে গঙ্গাবাঈ এখানে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। হিন্দু মেয়েদের মনে হিন্দুধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা জাগাবার জন্যই এই বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। গঙ্গাবাঈ সকলের কাছে মাতাজি মহারানী নামে পরিচিত ছিলেন। মাতাজি সবসময় পুরুষের বেশে থাকতেন। পরতেন ধুতি-পাঞ্জাবি, পাগড়ি ইত্যাদি। বোধহয় আত্মগোপনের সময় এই বেশই তিনি গ্রহণ করেছিলেন। ১৮৯৩ সালে ১৯শে এপ্রিল মহাকালী পাঠশালা নামে এক অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়েছিল কাশিমবাজারের মহারানী স্বর্ণময়ী দেবীর আপার সার্কুলার রোডের বাড়িতে। পরবর্তীকালে ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় বিদ্যালয়টি চোরবাগানে রাজেন্দ্র মল্লিকের বাড়ির পূর্বদিকে এক বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়। তারপর সুকিয়া স্ট্রিটে (বর্তমানের কৈলাস বসু স্ট্রিট) ১ বিঘা ১১ কাঠা জমি কিনে বিদ্যালয়ের নিজস্ব ভবন পত্তন করা হয়।

এই বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করার মতো। বার মাসে তের পার্বণ পালন করা, রন্ধন শিক্ষা দেওয়া, বৈশাখ মাসের প্রথম দিন থেকে সারা মাস প্রতি মেয়েকে নিজ হাতে শিবঠাকুর তৈরি করে শিবপূজা করতে হয়। এ ছাড়া আষাঢ় মাসে গুরুপূর্ণিমা উৎসব, দুর্গাপূজা প্রভৃতি পালন করা হয়। সেকালে সফল পরীক্ষার্থীদের পুরস্কার দেওয়া হত সোনার মেডেল, সোনার গহনা, বই, পূজার বাসন, ভাল সিল্কের বস্ত্রসম্ভার প্রভৃতি। এর আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল ছাত্রীরা পরীক্ষা দিক বা না দিক সকলেই পুরস্কার পেত। স্বামী বিবেকানন্দ, নিবেদিতা, দ্বারভাঙার মহারাজা, বর্ধমানের মহারাজা, সেকালের বড়লাট, ছোটলাট প্রমুখ এ বিদ্যালয় পরিদর্শনে এসেছিলেন। মাতাজির বিদ্যালয় আদি মহাকালী পাঠশালা নামে আজও বিরাজ করছে।[৮০]

এই রাস্তার ৩৫ডি বাড়িতে থাকতেন সাহিত্যিক পরিমল গোস্বামী। আর আছে উখরার জমিদার বাড়ি। আরেকটি বিখ্যাত বাড়ি হল চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের বাসভবন— এখানে ১০০ বছর ধরে দুর্গাপূজা হয়ে আসছে।

ময়মনসিং-এর অন্তর্গত গৌরীপুরের জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এক সময় ৫৩নং সুকিয়া স্ট্রিটের ভাড়া বাড়িতে বাস করতেন। পরবর্তীকালে নিজ ভবন ৫৫নং বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের ঠিকানায় শেষ জীবনটা কাটিয়ে গেছেন। সুকিয়া স্ট্রিটের এই ভাড়া বাড়িটি ছিল রাজা প্যারীমোহন রায়ের। ব্রজেন্দ্রকিশোর সেটি ভাড়া করেন।

সুপণ্ডিত, সংগীতজ্ঞ, দেশহিতব্রতী, সমাজসেবী, নাট্যশিল্পী, ক্রীড়াবিদ, মুক্তহস্ত-দাতারূপে সুপরিচিত ব্রজেন্দ্রকিশোর উত্তরবঙ্গের রাজশাহী জেলার অন্তর্গত নওগাঁ মহকুমার মধ্যে বলিহার গ্রামের এক মধ্যবিত্ত, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বংশে ১২৮১ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রজেন্দ্রকিশোরের পিতৃদত্ত নাম ছিল রজনীপ্রসাদ (ভাদুড়ী) ভট্টাচার্য। গৌরীপুরের জমিদার রাজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী অল্প বয়সে মারা গেলে তাঁর বিধবা পত্নী বিশ্বেশ্বরী দেবী চৌধুরানী ৫/৬ বছর বয়সের রজনীপ্রসাদকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। নামও পরিবর্তন করে ব্রজেন্দ্রকিশোর রাখা হয়। কিন্তু আত্মীয়ের

প্ররোচনায় বিশ্বেশ্বরী তাঁর পিতৃকুলের একটি পুত্রকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করার জন্য অস্থির হন। অবশেষে মুক্তাগাছার মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী এবং তৎকালীন ময়মনসিংহের জেলাশাসক, ঐতিহাসিক-ঔপন্যাসিক রমেশচন্দ্র দত্তের সহায়তায় আদালতের মারফত একটা আপস রফা হয়। বিশ্বেশ্বরীদেবী জীবিতকাল পর্যন্ত সম্পত্তির $\frac{১}{৪}$ অংশ ভোগ দখল করবেন এবং ব্রজেন্দ্রকিশোর $\frac{৩}{৪}$ অংশ সম্পত্তির মালিক হবেন। বিশ্বেশ্বরীর অবর্তমানে পুরো সম্পত্তির মালিক হবেন ব্রজেন্দ্রকিশোর।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন ব্রজেন্দ্রকিশোর। মহারাজা সূর্যকান্তের প্রেরণায় এই আন্দোলনে বেপরোয়াভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন ব্রজেন্দ্রকিশোর।

ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ছিলেন জাতীয় শিক্ষা পরিষদের একজন কর্ণধার। তাঁর কলিকাতার সুকিয়া স্ট্রিটের বাসভবন জাতীয়তা আন্দোলনের একটি কেন্দ্র ছিল। এই বাড়িতে একদা রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, বিপিন পাল, ডন সোসাইটির সতীশ মুখোপাধ্যায়, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ সকলেই আসতেন।[৮১]

দানবীর ব্রজেন্দ্রকিশোর জাতীয় শিক্ষা পরিষদ বা National Council of Education-কে ৫ লক্ষ টাকা ও বারানসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়কে ১ লক্ষ টাকা দান করেছিলেন। বিপ্লবী যুগান্তর দল, বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভা, বহু চিকিৎসালয়, শিক্ষালয় তাঁর দানে পুষ্ট হয়েছিল। সংস্কৃত পণ্ডিতদের সাহায্যকল্পে তিনি প্রভূত অর্থ দান করেন। তাঁর মোট দানের পরিমাণ ছিল ৩৫ লক্ষ টাকা।[৮২]

ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত এই দুই রাজপথ— সুকিয়া স্ট্রিট ও সুকিয়া রো নিজেদের অস্তিত্ব দীর্ঘদিন বজায় রাখতে পারেনি। প্রথমে সুকিয়া স্ট্রিটের কথা। কলিকাতা পুরসভা ২০শে জুন ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের অধিবেশনে সুকিয়া স্ট্রিটের কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের (বিধান সরণি) মুখ থেকে আমহার্স্ট স্ট্রিট (রাজা রামমোহন সরণি) পর্যন্ত অংশটুকু নাম পরিবর্তন করে সেকালের খ্যাতনামা চিকিৎসক স্যার কৈলাসচন্দ্র বসুর নামে 'কৈলাস বসু স্ট্রিট' নামাঙ্কিত করেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Faculty of Medicine-এর সভ্য, পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের (Veterinary College) ও কুষ্ঠাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কৈলাস বসু বহুদিন কলিকাতা পুরসভার মনোনীত সদস্য ছিলেন। পুরসভায় তিনি ২০ বছরের অধিককাল সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৮৯৯ সালে তিনি প্রথম পৌর প্রতিনিধি মনোনীত হন এবং ১৯২১ সাল পর্যন্ত ওই পদে বহাল থাকেন। বেশ কয়েক বছর তিনি জেনারেল কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৯১৮ থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত হেলথ স্পেশাল কমিটির চেয়ারম্যান হয়েছিলেন। এ ছাড়া তিনি মাড়োয়ারি হাসপাতাল এবং ক্যালকাটা মেডিকেল ক্লাবের সভাপতিও ছিলেন, কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ ও স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন স্থাপনে তাঁর অগ্রণী ভূমিকা স্মরণীয়।

ডাঃ কৈলাস বসু ১নং সুকিয়া স্ট্রিটে বাস করতেন। ২০শে জানুয়ারি ১৯২৭ খ্রিঃ তিনি পরলোকগমন করেন।[৮৩]

কৈলাস বসু স্ট্রিট নামকরণ হবার পরও আমহার্স্ট স্ট্রিট থেকে আপার সারকুলার রোড পর্যন্ত রাস্তার অংশটুকু পুরানো নাম সুকিয়া স্ট্রিট বহাল থাকে। কিন্তু এইটুকু অংশের নামও বেশিদিন ধরে রাখা গেল না।

কলিকাতা পুরসভা তাঁদের ১১ই ডিসেম্বর ১৯৪৬ সালের অধিবেশনে সুকিয়া স্ট্রিটের বাকি অংশ (আমহার্স্ট স্ট্রিট থেকে আরম্ভ করে আপার সারকুলার রোড পর্যন্ত) ওই অঞ্চলের ধনী বাসিন্দা প্রয়াত মহেন্দ্র শ্রীমানির নামে 'মহেন্দ্র শ্রীমানি স্ট্রিট' নামকরণ করেন। শ্রীমানি পরিবার কর্নওয়ালিস স্ট্রিট ও আপার সারকুলার রোডের ওপর অবস্থিত দুটি বাজারের মালিক। এ ছাড়া তাঁদের ওই এলাকায় প্রচুর বিষয়সম্পত্তি আছে। এই পরিবারের উত্তরপুরুষ শ্রীনন্দকুমার শ্রীমানি এক সময় ওই পল্লীর পৌর প্রতিনিধি ছিলেন।

সুকিয়া স্ট্রিটের এই নাম পরিবর্তন কলিকাতার বিদ্বৎসমাজকে ক্ষুব্ধ করেছিল। অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-এর পৈতৃক ভবন ছিল ৩, সুকিয়া রো'তে। তিনি কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের সম্পাদককে ১৫ই জুলাই, ১৯৪৬ সালের লেখা চিঠিতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন এই বলে যে ১৯২৮ সালে কৈলাস বসু স্ট্রিট নামকরণ প্রসঙ্গে এই এলাকার ইতিহাসমনস্ক ব্যক্তিরা তীব্র

প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছিলেন। চিঠির শেষ অংশে তিনি লিখেছিলেন, ''Now in 1946, it is proposed to obliterate the memory of Sookeas and with it that of the Armenian founders of the commercial half of the street (extending from Amherst Street to Upper Circular Road) a new name celebrating a deceased local gentleman the late Mr. Mahendra Sreemany. The name Sookeas Street evokes historical associations which are too valuable to lose in a city like Calcutta.'' অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের এই আবেদন ছিল অরণ্যেরোদন মাত্র। ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত সুকিয়া স্ট্রিট এইভাবে বিস্মৃতির অন্তরালে চলে গেল।

সুকিয়া স্ট্রিটের মতো সুকিয়া রো তার অস্তিত্বকে বেশিদিন বাঁচিয়ে রাখতে পারেনি। কলিকাতা পুরসভার সড়ক নামকরণ উপদেষ্টা পর্ষদের সুপারিশের ভিত্তিতে পুরসভার তৎকালীন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর তাঁর ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দের আদেশবলে সুকিয়া রো-এর নাম পরিবর্তন করে 'দায়ুদ আলি দত্ত সরণি' নামাঙ্কিত করেন।

কে এই দায়ুদ আলি দত্ত ? পিতৃদত্ত নাম প্রমথনাথ দত্ত। স্বদেশি যুগের একজন সার্থকনামা বিপ্লবী, বিপ্লবের প্রয়োজনে এই ছদ্মনাম গ্রহণ। থাকতেন সুকিয়া স্ট্রিটে, প্রতিবেশি বিপ্লবী অবনী মুখার্জীর সুহৃদ ছিলেন। প্রমথনাথ বিপ্লবের প্রয়োজনে ভারত থেকে পালিয়ে যান এবং ছদ্মনাম গ্রহণ করে তুরস্কের সেনাবাহিনীতে প্রবেশ করেন। সেখানে সামরিক শিক্ষাগ্রহণ করে তুরস্কের সৈন্যদলের হয়ে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। অনেক বাধাবিপত্তি ও সংঘাতের মধ্যে দিয়ে তিনি সোভিয়েত রাশিয়ায় প্রবেশ করেন। নিজ গুণে ও দক্ষতায় তিনি তৎকালীন বার্লিন কমিটির সদস্য হন। প্রমথনাথের উদ্যোগে লেনিনগ্রাড ও মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় বিভিন্ন ভাষা পড়াবার ব্যবস্থা হয়। সোভিয়েত রাশিয়াতে তিনি উচ্চপদে আসীন ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি মস্কোর প্রাচ্য ভাষাতত্ত্ব পরিষদের ডিরেক্টর হয়েছিলেন এবং ওই পদ থেকেই তিনি অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৫৪ সালে মস্কোতে তাঁর মৃত্যু হয়।

এইভাবে উত্তর কলিকাতার বুক থেকে সুকিয়া স্ট্রিট ও সুকিয়া রো-এর অবলুপ্তি ঘটল।

সিমলা স্ট্রিট, সিমলা লেন, সিমলা সেকেন্ড লেন ও সিমলা রোড : সিমলা স্ট্রিট কলিকাতার একটি প্রাচীন রাস্তা। মার্ক উডের (১৭৮৪) ও আপজনের (১৭৯৩) কলিকাতা মানচিত্রে রাস্তাটির কোনও উল্লেখ না থাকলেও সম্ভবত উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রাস্তাটি নির্মিত হয়ে থাকবে। লেফটেন্যান্ট এইচ অ্যাবারক্রম্বি (Lt. H. Abercrombie) এবং ক্যাপ্টেন এইচ. এন. ফরবেস (Capt. H. N. Forbes) মিলিতভাবে ১৮৩৬ খ্রিঃ কলিকাতার যে মানচিত্র প্রস্তুত করেন, তাতে এই পথটি দেখানো আছে। শক সাহেব ১৮৬৬ খ্রিঃ কলিকাতার জনগণনার যে প্রতিবেদন তৈরি করেছিলেন তাতে কলিকাতা শহরের ৪৩৮টি রাস্তার একটি তালিকা দেওয়া আছে। ওই তালিকার মধ্যে ১১৯ নম্বরে সিমলা স্ট্রিটকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সিমলা নামটি কলিকাতার ইতিহাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সম্রাট ফারুকশিয়ারের কাছ থেকে যে ৩৮টি গ্রাম খাজনার ভিত্তিতে লাভ করেন, তার মধ্যে সিমলা গ্রাম অন্যতম। সিমলাকে সে সময়ে ডিহি বা মৌজা উভয় নামেই অভিহিত করা হত। সে সময়ে সিমলার সীমানা ছিল এইরূপ : পরগনা কলিকাতার উত্তরাংশ, সুতানুটির দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্বাংশ মির্জাপুর পর্যন্ত এবং পূর্বে মানিকতলা পর্যন্ত।[৮৪] শহরতলির অন্তর্গত ডিহি সিমলার মধ্যে ছিল দুটি গ্রাম— বাহির সিমলা ও নারিকেলডাঙ্গা।

সে সময় এই গ্রামে তুলোর জন্য শিমুল চাষের প্রচলন ছিল। অঞ্চলটি পরিপূর্ণ ছিল শিমুল গাছে। তাই থেকে এই গ্রামের নাম হয়েছিল সিমুলিয়া বা সিমলা। লোকে কখনও কখনও এই অঞ্চলকে কাপাসডাঙ্গা বলত। কারণ এখানে কার্পাস তুলো গাছের চাষও হত।[৮৫] শিমুল গাছ ছাড়াও এখানে অনেক জায়গায় বড় বড় তেঁতুল, অশ্বত্থ ও নারিকেল প্রভৃতি অনেক প্রকারের গাছ ছিল। সিমলা পল্লীতে কাপাস তুলোর সূতো দিয়ে নানা প্রকারের মূল্যবান ছিট কাপড় তৈরি হত। প্রাণকৃষ্ণ

দত্ত তাঁর "কলিকাতার ইতিবৃত্ত" পুস্তকে এ বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করেছেন : "মেছুয়াবাজার স্ট্রিটে রাজা দিগম্বর মিত্র মহাশয়ের বাটির সম্মুখে যে বাজারটিকে টিকটিকি বা পোড়াবাজার বলে, বহু পূর্বে উহা সিমলা বাজার বলিয়া পরিচিত ছিল। ১৭৮৪ খ্রিঃ-এর ম্যাপে উহাকে পুরাতন সিমলা বাজার এবং বর্তমান সিমলা বাজারকে নতুন সিমলা বাজার বলিয়া লিখিত আছে। এই সিমলায় বিস্তর তন্তুবায় অতি মূল্যবান ছিট বুনিত, তাহার জন্যই এই প্রদেশের সকল গ্রাম অপেক্ষা সিমলা গ্রামের আয় অনেক অধিক ছিল।"

মহেন্দ্রনাথ দত্ত আরেকটি পুরানো সিমলা বাজারের কথা উল্লেখ করেছেন : "পাড়ার বুড়োদের কাছে শুনতাম সিমলা বাজার প্রথমে এখন যেটা মহেন্দ্র গোস্বামীর গলি, তার কোন এক স্থানে ছিল। একটা বড় শিমুল গাছ ছিল, তাহার নীচে বাজার বসত। আমরা কিন্তু ওই শিমুল গাছ দেখিনি এবং ওই স্থানটিতে খোলার ঘর দেখিয়াছি। আমাদের সময় যেটা সিমলার বাজার ছিল সেটা হলো এখনকার বেথুন কলেজের বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ এবং খানিকটায় বেথুন কলেজের পশ্চিম দিককার রাস্তা হইয়াছে। ১৮৮২ খ্রিঃ পূজার পর হইতে শীতকাল পর্যন্ত এই সময় ছাতুবাবুর ফাঁকা মাঠেতে জেলেরা ও তরকারীর ফোড়েরা বসিতে থাকে এবং সেখানে এক নতুন বাজার আরম্ভ হয়। পরে উভয় বাজারের মালিকের সহিত দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইয়া দুই বাজার চলিতে লাগিল। একটা হইল ছাতুবাবুর বাজার আর একটা হইল সিমলা বাজার। পরে বেথুন কলেজ কর্তৃপক্ষ জমিটা খরিদ করায় সিমলার বাজার একেবারেই উঠিয়া গেল।"[৮৬]

প্রাচীন সিমুলিয়া গ্রামের অবস্থা কিরূপ ছিল তার দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক। সে সময় ওই অঞ্চল ছিল জঙ্গলময়। গোবিন্দপুর গ্রাম ভেঙে যখন ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নির্মিত হয় তখন সেখানকার অধিবাসীদের উত্তরে অর্থাৎ ডিহি সুতানুটি, হোগলকুড়িয়া, সিমলা, কলুটোলা প্রভৃতি অঞ্চলে সরকার তাঁদের বসতি স্থাপনে প্ররোচিত করেন। গোবিন্দপুরের স্থানচ্যুত অধিবাসীরা অতঃপর সুতানুটি প্রভৃতি অঞ্চলে এসে বন কেটে জঙ্গল পরিষ্কার করে যিনি যতটা পারেন ততটা পরিমাণ জমি নিয়ে ঘরবাড়ি নির্মাণ করতে থাকেন। সে সময় সরকার জমি, ইট প্রভৃতি বাড়ি তৈরির উপকরণ দিয়ে তাঁদের সাহায্য করেছিলেন।

ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর রচিত "স্বামী বিবেকানন্দ" পুস্তকে সেকালের উত্তর কলিকাতা বিশেষতঃ সিমুলিয়া অঞ্চলে ঘরবাড়ি নির্মাণশৈলীর উপর আলোকপাত করেছেন। সে সময় সঙ্গতিসম্পন্ন লোকেরা অবস্থানুসারে এক বিঘা থেকে ৪/৫ বিঘা বা ততোধিক জমি নিয়ে বসতবাটি নির্মাণ করতেন। এই বসতবাড়ির বহির্ভাগ মোটা থাম বিশিষ্ট, ৫ ফোকরের পাকা ঠাকুর দালান এবং বিস্তৃত প্রাঙ্গণ থাকত। একদিকে থাকত গোয়ালবাড়ি। বাহির বাড়ি ও ভেতর বাড়ি পৃথক হত। বাহিরে ও ভিতরে উভয়স্থলে কুয়া, শৌচাগার থাকত। আবার কারও অন্দরমহলে পুকুর, আবার কারও বা খিড়কীতে পুকুর থাকত। অবস্থাপন্ন লোকেদের বাড়ির পাশে আস্তাবল থাকত। এসব সম্পন্ন পরিবারে বার মাসে তের পার্বণ তো লেগেই থাকত। ধনীদের পৃথক অতিথিশালা থাকত। ব্রাহ্মণ ও কুলীনেরা সেখানে থাকতে পেতেন।

এখন প্রশ্ন হল, বাড়ির এরকম নির্মাণপদ্ধতি কোথা থেকে এল ? এসব ইংরেজি ধরনের নিশ্চয়ই নয়। বহু পরে যাঁরা নতুন ধনী হলেন তাঁরা ইউরোপীয় রেঁনেসা পদ্ধতিতে সারি সারি জানালা, দরজাযুক্ত দক্ষিণ ইউরোপের ধরনে কিছু কিছু বাড়ি তৈরি করেন। কিন্তু সাধারণের বাড়ি নির্মাণের পদ্ধতি এর ব্যতিক্রম হতে দেখা যায়। যাঁরা এ অঞ্চলে বড় বড় বাড়ি তৈরি করতে লাগলেন তাঁরা বাংলার মধ্যযুগীয় নির্মাণপদ্ধতিই প্রচলন করেছিলেন। বর্তমানে মধ্য ও দক্ষিণ কলিকাতায় এ ধরনের বাড়ি বিরল মনে হয়।[৮৭] এরও কারণ আছে। যাঁরা ইংরেজ সংস্পর্শে এসে বিত্তশালী হয়ে কলিকাতায় স্থায়ী বাসিন্দা হলেন তাঁরা নানা কারণে উত্তর কলিকাতায় বসতি স্থাপন করেন এবং গৃহ নির্মাণে বাংলার মধ্যযুগীয় নির্মাণশৈলী অনুসরণ করেছিলেন।

সে সময় সিমলা অঞ্চলে চোর-ডাকাতের প্রাদুর্ভাব ছিল। অধিবাসীরা সন্তর্পণে জীবন-যাপন করত। বর্তমান হেদুয়া পার্ক জায়গায় সে সময় ছিল এক বিরাট বন বা জঙ্গল। তার মধ্যে ছিল একটি ডোবা পুকুর। এই জঙ্গলাকীর্ণ এলাকায় খুনেদের আড্ডা ছিল বলে লোক পরম্পরায় শোনা

যায়। এর মধ্যে লোক খুন হত বলেও প্রবাদ আছে। নিকটবর্তী কোনও এক বাড়ির একটা কুয়োর মধ্যে অনেক নরকঙ্কাল পাওয়া গেছে বলেও শোনা যায়।[৮৮]

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদেও এ অঞ্চলে পুরানো হীন আচারপদ্ধতি প্রচলিত ছিল। তার মধ্যে ভৈরবী চক্রের আড্ডা ছিল প্রধান। সেকালের এই সব হীন আচারপদ্ধতির ওপর মহেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যম ভ্রাতা) এক সুস্পষ্ট ছবি উপহার দিয়েছেন। সিমলা ও কাঁসারীপাড়া এইরূপ ভৈরবী চক্রের আড্ডা ছিল। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত নব্য যুবকদের আক্রমণে ভৈরবী চক্রের দল প্রকাশ্যে কিছু কমেছিল। যুবকদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য এই ভৈরবী চক্রগুলি নাম পরিবর্তন করে বোষ্টমী নামের অন্তরালে "শচীমা ভজা" দল বলে আত্মপরিচয় দিত। এইসব আখড়াগুলিতে অতি বীভৎস কার্য সংঘটিত হত।

সে সময় শিক্ষিত ভদ্রলোকেদের মধ্যে মদ খাওয়ার প্রচলন খুব ছিল। সিমলা ছিল অষ্টবসুর পাড়া অর্থাৎ বিখ্যাত মাতালের পাড়া। মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন : "শিমলা অঞ্চলে সম্ভ্রান্ত বসু মহাশয়গণ বাস করতেন। বসু মহাশয়গণের আটজন একত্রে নেশা করতেন। একটি মাটির গামলাতে মদ ঢালিয়া, উহার চারিদিকে ঘেরিয়া বসিয়া, এই আটজন বন্ধু মুখে খাগড়ার নল দিয়া মদ টানিয়া পান করিতেন। মদের গামলাতে একটি গোলাপ ফুল দেওয়া থাকিত। যিনি ফুলটিকে নিজ নলের মুখে সকলের পূর্বে টানিয়া আনিতে পারিতেন, তিনিই এই পানমণ্ডলীর অধিপতি বা চক্রেশ্বর বলিয়া স্বীকৃত হতেন।"

তিনি আরও লিখেছেন, "রাখাল (শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র ঘোষ, পরবর্তীকালে স্বামী ব্রহ্মানন্দ) ও আমরা সকলে শনিবার সন্ধ্যার সময় লাঠি-সোঁটা লইয়া তৈয়ার হইতাম। তাহার পর মাতালদের ঠেঙানো শুরু হইত। রাস্তার দু ধারে তখন পগার বা নরদমা ছিল। দু একটি ধাঙড় উহা পরিষ্কার করিত। সেই পগারের ভিতর মাতালদের শুইয়া থাকিবার জায়গা ছিল। রবিবার দিন মাতালেরা রাস্তার ধারের এই পগারে, পাঁকের ভিতর, মাথায় ধাঙড়দের ঝোড়া দিয়া বালিশ করিয়া শুইয়া থাকিত ; সোমবার সকালে যে যার কাজে যাইত। তখন প্রচলিত কথাই ছিল :

'হায় রে মজা শনিবার
বড় মজা রবিবার।"

মহেন্দ্রনাথ দত্ত সেকালের দুর্গাপূজার নবমীর দিন পাঁঠা বা মহিষ বলি দিয়ে যে সব বীভৎস কাণ্ড-কারখানা ঘটত তারও মর্মান্তিক বিবরণ দিয়েছেন। বলির মুণ্ডটি কাদা মাখিয়ে মাথায় নিয়ে সকলে রাস্তায় বাহির হত। সেই পূজা-বাড়ির বৃদ্ধ পিতামহ তাঁর পৈতৃক খাতাখানি নিয়ে অশ্লীল গান শুরু করতেন এবং তাঁর পুত্র-পৌত্রাদি সকলে সমস্বরে সেই গান গাইত। এ ছাড়া প্রচলিত ছিল কদর্য ও অশ্লীল পাঁচালী এবং তরজার গান। সে সময় জাত বিচার সমাজে এক দুর্লঙ্ঘ প্রাচীর গড়ে তুলেছিল। লোক মরলে কেউ তাকে দাহ করতে যেত না। এমনকি জ্ঞাতি মরলেও সহজে কেহ সঙ্গে যেত না। সকলেই নিজের জাত বাঁচাতে ব্যস্ত। সর্ব বিষয় প্রবঞ্চনা.করা, মিথ্যা ব্যবহার করা, জালিয়াতি করা, বিধবাকে ঠকানো প্রভৃতি ছিল বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।

হিন্দুদের জাতপাতের গোঁড়ামি, ধর্মের অন্ধ বিশ্বাস প্রভৃতি কুসংস্কারের সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন খ্রিস্টান জেসুইট বা পাদরিরা। তাঁরা এই সুযোগে রাস্তার মোড়ে মোড়ে হেদোর ধারে অথবা রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গির্জার কোণে দাঁড়িয়ে যিশুখ্রিস্টের গল্প করতেন আর হিন্দু সমাজের কুৎসা, অসারতা ইত্যাদি প্রচারের সাথে সাথে হিন্দু দেব-দেবীদের গাল দিতেন। এর ফলে সিমলার যুবকবৃন্দের সঙ্গে পাদরিদের ঝগড়াঝাঁটি কখনও বা মারামারি হবার উপক্রম হত।

পাদরিরা যেমন পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে বক্তৃতা দিতেন, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনও মধ্যে মধ্যে পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে সভা করে হিন্দুধর্ম প্রচার করতে লাগলেন। কেশববাবু প্রথমে ইংরেজিতে বক্তৃতা দিতেন, পরে বাংলায় বক্তৃতা দেওয়া শুরু করেন। সিমলাতে মনোমোহন মিত্র, নন্দ চৌধুরী প্রমুখের বাড়িতে সভা করে বক্তৃতা দিতেন। প্রথম অবস্থায় তিনি খ্রিস্টধর্ম ও হিন্দুধর্মের মাঝামাঝি একটি সেতু তৈরি করতে চেষ্টা করেন, এর ফলে শিক্ষিত লোকের মধ্যে খ্রিস্টান হওয়ায় প্রবণতা কিছু

পরিমাণে কমে গিয়েছিল। অধিকাংশ শিক্ষিত যুবক তখন প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে কেশববাবুর দলে যোগ দিলেন। ফলে সমাজে মদ খাওয়া ও অন্যান্য সামাজিক দুর্নীতি ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেকালের বাঙালি সমাজের কুসংস্কার ও কুপ্রথা দূরীকরণের যে প্রয়াস শুরু করেছিলেন, রামকৃষ্ণদেবের আগমনে তা ত্বরান্বিত হয়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সিমলা অঞ্চলে পদার্পণের ফলে এখানকার সমাজজীবনে এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। কেশবচন্দ্রই রামকৃষ্ণদেবের কথা প্রথম প্রচার করেছিলেন। তখনকার লোকেরা প্রথমে তাঁর প্রতি কিঞ্চিৎ অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধার ভাব দেখিয়েছিল। লোকেরা ব্যঙ্গচ্ছলে পরমহংসকে কৈবর্তদের পূজারী, গ্রেট গূজ (Great Goose) বলত। এই অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা সহ্য করে কীভাবে শ্রীরামকৃষ্ণদেব সিমলার সমাজজীবনে প্রবেশ করলেন সে সম্বন্ধে দু-চার কথা বলা আবশ্যক বলে মনে করি।

ডাক্তার রামচন্দ্র দত্ত স্বামী বিবেকানন্দের মা ভুবনেশ্বরী দেবীর এক আত্মীয় ছিলেন। তিনি ১১নং মধু রায় লেনে বাস করতেন। ১৮৮১ খ্রিঃ রামচন্দ্রের প্রথম কন্যা এবং দুই ভাগনী সাত দিনের মধ্যে মারা যায়। তিনি কেশবচন্দ্রের কাছে রামকৃষ্ণদেবের নাম শুনে দক্ষিণেশ্বরে যান এবং রামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসে মনের শান্তি ফিরে পান। তিনিই প্রথম রামকৃষ্ণদেবকে তাঁর সিমলার বাসভবনে নিয়ে আসেন। রামকৃষ্ণদেব রাম দত্তর বাড়িতে এইরূপ বারকতক আসা যাওয়া করাতে তাঁর প্রতি পাড়ার লোকের বিদ্বেষ ভাব ধীরে ধীরে দূর হতে থাকে। রামকৃষ্ণদেবের আগমন সংবাদ শোনামাত্র শত শত লোক রাম দত্তর বাড়িতে সমবেত হত। লক্ষ্য করার একটি বিষয় হল যে, এই ব্যাপারে কাউকে গিয়ে নিমন্ত্রণ করা হত না। সে সময় সামাজিক রীতি ছিল, বিনা নিমন্ত্রণে কেউ কারও বাড়িতে যেত না। কিন্তু রামকৃষ্ণদেবের আগমনের কথা শোনামাত্র লোকে বিনা নিমন্ত্রণে উপস্থিত হত। শুধু পুরুষ মানুষই নয়, ক্রমে ক্রমে স্ত্রীলোকেরাও রামকৃষ্ণদেবকে দেখতে ও তাঁর কথা শুনতে আসতে লাগলেন। বিবেকানন্দের মাও আসতেন। মেয়েদের বসবার জায়গায় চিক্ বা পর্দা দেওয়া হত না। এইভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের আগমনে মেয়েদের মধ্যে পর্দাপ্রথা রহিত হতে থাকে। রামকৃষ্ণদেবের প্রভাবে সিমলার যুবকবৃন্দের মধ্যে আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়।

সুরেশ মিত্রের মতো দুর্ধর্ষ যুবক, স্পেনসার-মিল-হ্যামিলটন-জন লক প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্র পড়া নরেন্দ্রনাথ দত্তের মতো প্রবল ধীশক্তিসম্পন্ন পাড়ার ছেলেদের সর্দার পর্যন্ত রামকৃষ্ণদেবের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং তাঁর বিশেষ অন্তরঙ্গ হয়েছিলেন সে কথা তো সকলেরই জানা।

রামকৃষ্ণদেবের আগমন সিমলা অঞ্চলে জাতপাত বিচারের উপর নিঃশব্দে কুঠারাঘাত হেনেছিল। সে সময় নিমন্ত্রণ বাড়িতে আলুনি তরকারি রান্না হত। পাতে পাতে নুন দেবার ব্যবস্থা ছিল। সকলে একসঙ্গে আহার করত না। তখনকার দিনে নিমন্ত্রণ বাড়িতে খাওয়াদাওয়া একটা বিষম সমস্যার বিষয় ছিল। রাম দত্তর বাড়িতে রামকৃষ্ণদেব এলেই খাওয়াদাওয়ার ঢালাও ব্যবস্থা থাকত। নুন দেওয়া তরকারি রান্না করা হত এবং সকল শ্রেণী ও সকল বর্ণের লোকেরা একসঙ্গে আহার করত ; আর একটা জিনিস লক্ষ করার ছিল, নিমন্ত্রণ না করলেও অনেকে আসতেন ও আগ্রহ করে আহার করে যেতেন। এমনকি বৃদ্ধ লোকেরাও পরমহংসদেব আসবেন শুনে তাঁকে দর্শন করতে এসে আহারে বসতেন। রামকৃষ্ণদেবের এমন এক আকর্ষণীয় শক্তি ছিল যে অনিমন্ত্রিত হয়েও, কেউ দ্বিধা না করে সকল লোকের সঙ্গে আহার করত। এইরূপ পংক্তি ভোজন সিমলাতে তো ছিলই না, এমনকি কলিকাতার অন্য কোনও স্থানেও ছিল না। কলিকাতায় তখনকার দিনে এই পংক্তিভোজন একটা সাড়া জাগিয়েছিল।

সে সময় প্রণাম করাকে কুসংস্কার জ্ঞান করা হত। লোকে বলত, "ওটা ডৌলের প্রথা, ওটার কোন আবশ্যক নেই।" পরমহংসদেবের সংস্পর্শে এসে সিমলার লোকেরা প্রণাম করতে শিখল।

লোকজন মারা গেলে কেউ সহজে শবদাহ করতে যেত না, সেকথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। নরেন্দ্রনাথ তাঁর কতিপয় সঙ্গী নিয়ে ভিন্ন বর্ণের লোকের শবদাহ করতে যেতেন। এইরূপ সামান্য শুরু থেকেই লোকের ভেতর ভাব বদলাতে লাগল। জাতপাতের কঠোরতা এই সময় থেকে কিঞ্চিৎ কমতে থাকে। সে সময় নরেন্দ্রনাথ ছিলেন সিমলার এক বড়ঘরের ছেলে, যুবকদের নেতা।

এইজন্য নরেন্দ্রনাথের উপর কেউ কথা বলতে বিশেষ সাহস করত না। এসব বিষয় এখন তুচ্ছ বলে মনে হতে পারে কিন্তু তখনকার দিনে এই ব্যাপার গুরুতর বলে বিবেচিত হত। মহেন্দ্রনাথ দত্তের কথায়—

"এইরূপে ধীরে ধীরে অজ্ঞাতসারে পরমহংস মশাই কাজ করিতে লাগিলেন ; কোন তর্ক-যুক্তি বা হুকুম চালাইয়া নয়, কিন্তু তিনি সকলের মন এত উচ্চস্তরে তুলিয়া দিতেন যে, সামাজিক বন্ধন, খুঁটিনাটি—এসব কিছুই মনে থাকিত না। ... পরমহংস মশাই ভালবাসা দিয়া অজ্ঞাতসারে সমাজে এক চেতনা আনিয়া দিয়াছিলেন। তখন ইহা কাহারো চোখে ঠেকে নাই। অপরে তর্ক-যুক্তি ও বক্তৃতা দিয়া যে সকল সামাজিক প্রথা বা আচার-ব্যবহার পরিবর্তন করিতে পারেন নাই, পরমহংস মশাই, ধীরে ধীরে, নিজ প্রভাব দিয়া সেই সকল প্রথা বা আচার-ব্যবহার অনেক পরিমাণে পরিবর্তন করিয়াছিলেন। অথচ, যাঁহারা গোঁড়া লোক ছিলেন, তাঁহারাও ইহার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে পারেন নাই।" [৮৯]

শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব কেবলমাত্র সিমলা অঞ্চলের সমাজজীবনেই গভীর প্রভাব ফেলেছিল তাই নয়, এর প্রভাব সারা কলিকাতার সমাজজীবনে অনুভূত হয়েছিল। বাঙালি জাতি তার কুসংস্কার, জাতপাতের গণ্ডি প্রভৃতি ত্যাগ করে এক নতুন সমাজের পত্তন করেছিল। সিমলাকে তার পথিকৃৎ বলা চলে। পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণদেবের স্নেহধন্য অন্তরঙ্গ শিষ্য সিমলাপাড়ার ছেলে স্বামী বিবেকানন্দ বাংলা তথা ভারতবর্ষের সমাজজীবনের কুসংস্কারের ভিতকে কীভাবে নাড়িয়ে দিয়েছিলেন সে কথা তো সকলেরই জানা।

সেকালের কলিকাতায় প্রাচীন সংস্কৃতির এক অভিনব চিত্ত বিনোদনের ধারা প্রচলিত ছিল—তার নাম সঙ। সাধারণত চড়ক-গাজন প্রভৃতি অনুষ্ঠানে সঙ বার হত। পরবর্তীকালে পূজা-পার্বণ উপলক্ষে সঙ বের করার একটা রেওয়াজ হয়েছিল। এমনকি বিয়ে বাড়ির আমোদ-প্রমোদেও সঙের ব্যবস্থা থাকত। সেকালের মানুষ যাত্রা-পাঁচালী, কবির লড়াই, পুতুলনাচ, মুখোশ নাচ আর সঙের মিছিল দেখে আমোদ আহ্লাদ করত। কলিকাতার বিভিন্ন পল্লী থেকে সঙের মিছিল বের হত। উত্তর কলিকাতার সিমলা অঞ্চল থেকে যে সঙ বের হত তাকে বলা হত "কাঁসারিপাড়ার সঙ"। আর কাঁসারিপাড়া বলতে বোঝাত বর্তমান শ্রীমানি বাজারের কাছ থেকে শুরু করে সিমলা অঞ্চল সহ চিৎপুর পর্যন্ত অলি-গলি যুক্ত বিস্তীর্ণ এলাকা। কাঁসারিপাড়া সঙের মিছিল বের করার জন্য ওই এলাকার পল্লীবাসীরা যথেষ্ট সময় ও অর্থ ব্যয় করতেন। সঙের মিছিল নানা হাস্যকর ছোট ছোট নাটিকা অভিনয় করত। সেই সঙ্গে থাকত গান ও ছড়া।

কাঁসারিপাড়ার সঙ বের হত তারকনাথ প্রামাণিকের উৎসাহে। হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক কৃষ্ণদাস পাল হলেন আরেক উৎসাহী উদ্যোক্তা। পঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, "সেকালে কলিকাতার জেলে পাড়ার সংযাত্রা উৎপত্তির বহু পূর্বে,—প্রতি চৈত্র সংক্রান্তির দিন কাঁসারিপাড়ার প্রসিদ্ধ সংযাত্রা বাহির হইত। এই সংযাত্রা সমবায়ের প্রধান পরিচালক ছিলেন তারকনাথ (প্রামাণিক) ও কৃষ্ণদাস পাল মহাশয়। সংযাত্রা দেখিবার নিমিত্ত সাধারণের এরূপ আগ্রহ ছিল যে, সং বাহির হইবার বহু পূর্ব হইতেই রাজপথের সম্মুখস্থ বারান্দাগুলি দর্শনার্থী জনসংঘ কর্তৃক অধিকৃত হইয়া যাইত। ঐ সকল ভাড়া দিয়া গৃহের মালিকগণ প্রচুর অর্থ লাভ করিতেন। জনসমুদ্র উদগ্রীব হইয়া কৌতুক দেখিবার নিমিত্ত পথের উভয় পার্শ্বে অবস্থান করিত।" [৯০]

বিশেষভাবে নির্মিত এক প্রকার ঘোড়ার গাড়ি করে কাঁসারিপাড়ার সঙ বিভিন্ন পথ ঘুরত। এই গাড়িকে বলা হত "কাটরা গাড়ি"। উত্তম বেশভূষায় সজ্জিত অভিনেতারা যে সব অভিনয় দেখাতেন ও গান গাইতেন তা রসাত্মক ও শিক্ষাপ্রদ বলে গৃহীত হত। ছোট ছোট নাটিকাও এইসব ঘোড়ার গাড়িতে অভিনীত হত।

সেকালের সঙের গানে অশ্লীলতা দোষ দেখে সঙের মিছিল বন্ধ করার যে প্রচেষ্টা হয়েছিল তার উল্লেখ পাওয়া যায় 'নবভারত' পত্রিকায় (মাঘ ১৩১০ সন, পৃষ্ঠা ৫৪২)। একদল যেমন সঙের মধ্যে অশ্লীলতা খুঁজে বেড়াতেন, ঠিক তেমনি আরেকদল সঙের মিছিলে কোনও অশ্লীলতা নেই তা দেখাবার চেষ্টা করতেন। এই প্রসঙ্গে 'বসন্তক' পত্রিকা লিখেছিল (১৮৭২-৭৩ সাল), "কাঁসারী পাড়া

দিয়া তো কাঁসারীদের সং বাহির হয়। সেখানে তো বাবু কৃষ্ণদাস পাল থাকেন, তিনি কি অসভ্য আর অশ্লীল ?"

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য কৃষ্ণদাস পাল ছিলেন, "হিন্দু পেট্রিয়ট" নামে এক বিখ্যাত ইংরেজি পত্রিকার সম্পাদক। তিনি বাস করতেন বারানসী ঘোষ স্ট্রিটে। তাঁর নামে সিমলা অঞ্চলে একটি রাস্তা আছে। আর তারক প্রামাণিকেরও বাসভবন ছিল বারানসী ঘোষ স্ট্রিটে। তাঁর বাড়ির সামনের বারানসী ঘোষ স্ট্রিটের (আংশিক) নাম পরিবর্তন করে তারক প্রামাণিক রোড নামাঙ্কিত করা হয়েছে। এই রাস্তাটি চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ-এর পূর্ব দিক থেকে শুরু হয়ে কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের (বিধান সরণি) পশ্চিম দিকে এসে পড়েছে।

সেকালে সিমলা পল্লীতে সঙের মিছিলের মতো নগর সংকীর্তনেরও এক বিরাট আকর্ষণ ছিল। সে সময় সিমলা কাঁসারিপাড়া অঞ্চলে অনেকগুলি পাঠশালা ছিল। গুরু মহাশয়ের কাছে ছেলেরা লেখাপড়া শিখত। প্রতি বছর মকর সংক্রান্তির দিন পাঠশালার ছাত্ররা দলবদ্ধ হয়ে বাদ্যযন্ত্র এবং নিশানাদি নিয়ে গঙ্গার স্তব গাইতে গাইতে গঙ্গাস্নানে যেত। সেই মিছিলে পল্লীর আবালবৃদ্ধ যুবকেরা যোগ দিতেন। এদিন নগর সংকীর্তনের গানের সুরে পল্লীর চারিদিক মুখরিত হয়ে উঠত।[৯১]

এবার রাস্তার নামকরণের প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। সেকালে গ্রামভিত্তিক শহর কলিকাতায় পল্লীর নামেও এলাকা পরিচিতি লাভ করত। যেমন—হোগলকুড়িয়া, সিমলা (সিমুলিয়া), আরকুলি, উল্টাডিঙ্গি, মির্জাপুর প্রভৃতি। এই সব পল্লীর নাম থেকে অমুক পাড়া, লেন বা রোড প্রভৃতির উৎপত্তি হয়েছিল। গ্রামীণ কলিকাতার নগরায়ণের ফলে ওইসব পল্লীগ্রাম ধুয়ে মুছে গেছে। কিন্তু রাস্তাগুলোর নাম আজও পুরাতন পল্লীর স্মৃতি বহন করে চলেছে।

সিমলা অঞ্চলে সিমলার নাম নিয়ে চারটি রাস্তা ছিল। বাহির সিমলার অন্তর্গত রাস্তাটির নাম 'সিমলা রোড'। এই রাস্তাটি শহর কলিকাতার সীমানার বাহিরে শহরতলির অন্তর্ভুক্ত ছিল, যার জন্য মার্ক উড, আপজনের মানচিত্রে এবং পরবর্তীকালে শহর কলিকাতার মানচিত্রেও এই পথটির খোঁজ পাওয়া যায় না। সিমলা পল্লীর ঐতিহ্য বহন করে আজও টিকে আছে এই পথটি। তবে ১৯৬৬ সালে সিমলা রোডের নাম পরিবর্তন করে ডঃ ফনিভূষণ ব্যানার্জির নামে নামকরণের এক প্রস্তাব কলিকাতা পুরসভার বিবেচনার জন্য ছিল।[৯২] কিন্তু সে প্রস্তাব পৌর অনুমোদন লাভ করেনি। আর সিমলা অঞ্চলে সিমলার নাম নিয়ে আরও তিনটি রাস্তা ছিল—সিমলা স্ট্রিট, সিমলা লেন ও সিমলা সেকেন্ড লেন। প্রথমে সিমলা সেকেন্ড লেনের কথা ; রাস্তাটি ১৯১৩ সালের শেষের দিকে তৈরি হয়। রাস্তাটি খুবই সংকীর্ণ। কোনও গাড়ি চলাচল করতে পারে না। রাস্তাটির আকার এইরূপ—একটি সরলরেখার উপর একটি লম্ব। প্রথম অংশটি বিবেকানন্দ রোড থেকে শুরু হয়ে সিমলা স্ট্রিটের প্রায় সমান্তরাল ভাবে দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে তারক প্রামাণিক রোডে এসে পড়েছে। আর দ্বিতীয় অংশটি পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত হয়ে সিমলা স্ট্রিটের সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করেছে। ১৯১৯ সালে এলাকার অধিবাসীরা সিমলা সেকেন্ড লেনের নাম পরিবর্তনে তৎপর হন। তাঁরা পুরসভার কাছে এক স্মারকপত্রের মাধ্যমে এই মর্মে আবেদন করেন যে, ৬-এর ওয়ার্ডে সিমলা রোড এবং তাঁদের ওয়ার্ডে সিমলার নাম নিয়ে দুটি রাস্তা থাকায় চিঠিপত্র বিলিতে এবং পথ নির্দেশনায় বহু অসুবিধা দেখা দিচ্ছে। তাই তাঁদের অনুরোধ, ওই রাস্তার দুটি অংশ ওই পল্লীর দুজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নামে নামকরণ করা হোক। একজন ওই অঞ্চলের খ্যাতনামা ডাক্তার দয়াল চন্দ্র সোম এবং অন্যজন হলেন নামী শিক্ষাবিদ্ ভোলানাথ পাল। কলিকাতা পুরসভা তাঁদের ২৪শে জুলাই ১৯১৯ সালের অধিবেশনে আবেদনটি মঞ্জুর করেন। সিমলা সেকেন্ড লেনের সরলরেখার অংশটি 'ভোলানাথ পাল লেন' এবং লম্ব অংশটি 'দয়াল সোম লেন' এই নতুন নামে নামাঙ্কিত হয়।

সিমলা লেন কলিকাতার এক প্রাচীন রাস্তা। ওই অঞ্চলে এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রায় একই নামে তিনটি রাস্তা ছিল—সে কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রায় একই নামে তিনটি রাস্তা থাকায় ডাক বিলি এবং রাস্তা নিরূপণে অসুবিধা সৃষ্টি হতে থাকে। তাই ১৯৩৯ সালে সিমলা লেনের একদল বাসিন্দা তাঁদের স্মারকপত্রের ভিত্তিতে রাস্তাটির নাম পরিবর্তন করে স্থানীয় এক রং ব্যবসায়ী হরিপদ দত্তের নামে হরিপদ দত্ত লেন নামকরণের এক প্রস্তাব দেন। হরিপদ দত্ত ১৯৪ নং কর্নওয়ালিস

স্ট্রিটে বাস করতেন, সিমলা লেনের ৫ ও ৬ নং বাড়ির মালিক ছিলেন তিনি। রাধাবাজারে তাঁর একটি রঙের দোকান ছিল। তিনি কলিকাতা পুরসভাকে ১ কাঠা ৪ ছটাক জমি দান করেছিলেন। এ ছাড়া কিছু ব্যক্তিগত দান এবং সমাজসেবামূলক কাজেও অর্থ ব্যয় করেছিলেন হরিপদ দত্ত।

কলিকাতার এই প্রাচীন রাস্তার নাম বদলের প্রস্তাবে সিমলা স্ট্রিটের কতিপয় অধিবাসী ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও কলিকাতা পুরসভা তাঁদের ১৬ই আগস্ট ১৯৩৯ সালের অধিবেশনে সিমলা লেনের নাম বদল করে হরিপদ দত্তের নামে 'হরিপদ দত্ত লেন' নামাঙ্কিত করেন।[৯৩] আজও সে নাম বহাল আছে।

সিমলা স্ট্রিট মানিকতলা স্ট্রিট (রামদুলাল সরকার স্ট্রিট) থেকে আরম্ভ হয়ে সোজা দক্ষিণে এগিয়ে বিবেকানন্দ রোডকে অতিক্রম করে, পরে আরও দক্ষিণ দিকে এগোবার সময় বারানসী ঘোষ স্ট্রিটের (তারক প্রামাণিক রোড) একাংশকে ভেদ করে সরকার বাই লেনে এসে মিশেছে। সে সময় এ রাস্তাটি ছিল খুবই সরু। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে কলিকাতা পুরসভা রাস্তাটি প্রশস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ৫৪ নম্বর মানিকতলা স্ট্রিটে একটি খালি জমি পড়েছিল। কলিকাতা পুরসভা তাঁদের ১২ই আগস্ট ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের অধিবেশনে ওই খালি জায়গাটি ৪০,৮০০ টাকায় ক্রয় করার অনুমোদন দেন। ওই জমির কিছু অংশ দিয়ে সিমলা স্ট্রিট প্রশস্ত করার ব্যবস্থা হয় আর বাকি জমি তিন টুকরো করে গৃহ নির্মাণের জন্য বিক্রয় করে কলিকাতা পুরসভার সিমলা স্ট্রিট প্রশস্ত করার ব্যয়ের অধিকাংশই উঠে আসে।[৯৪]

সিমলা স্ট্রিট তার ঐতিহাসিক স্মৃতিবিজড়িত নামটি বেশি দিন ধরে রাখতে পারেনি। কলিকাতা পুরসভার প্রশাসক তাঁর ১৯ শে জুলাই ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দের এক আদেশবলে সিমলা স্ট্রিটের নাম বদল করে ওই অঞ্চলের খ্যাতনামা সমাজসেবী ডাক্তার নারায়ণ রায়ের নামে 'নারায়ণ রায় সরণি' নামাঙ্কিত করেন।

লব্ধপ্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক, সমাজসেবী ও প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা ডাক্তার নারায়ণ রায় ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ডাক্তার ক্ষেত্রনাথ রায়। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের মেধাবী ছাত্র ছিলেন নারায়ণ রায়। ছাত্রাবস্থায় তিনি বিপ্লবী দলের সংস্পর্শে আসেন। ডালহৌসি স্কোয়ার ও কলিকাতার বোমার কেসে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে তিনি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। সেই সময় তিনি ছিলেন কলিকাতা পুরসভার পৌর প্রতিনিধি। আলিপুর জেলে তিনি কালী সেনের সংস্পর্শে এসে মার্কসবাদে দীক্ষিত হন এবং মার্ক্সীয় দর্শন নিয়ে গভীর অধ্যয়ন করেন। আন্দামান জেলে থাকাকালীন কমিউনিস্ট সংহতি গড়ে তোলার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন নারায়ণ রায়। এ কাজে আব্দুল হালিম, সরোজ মুখার্জি, নিরঞ্জন সেন, সতীশ পাকড়াশি প্রমুখ নারায়ণ রায়ের সহযোগী ছিলেন। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি আন্দামানে পাঠচক্র স্থাপন করেন। পশ্চিমবঙ্গের অনেক কমিউনিস্ট নেতাই এই পাঠচক্রে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে বন্দিমুক্তি আন্দোলনের চাপে সরকার তাঁদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে আন্দামান থেকে ফিরে প্রকাশ্যে কমিউনিস্ট আন্দোলনে যোগ দেন। কমিউনিস্ট পার্টি সে সময় বেআইনি ঘোষিত ছিল।

জনদরদী চিকিৎসক হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন ডাঃ নারায়ণ রায়। বিনা পারিশ্রমিকে নিঃস্ব ও দরিদ্রের চিকিৎসা করে তাঁদের গভীর ভালবাসা, সম্মান ও সমাদর লাভ করেন।

১৯৫২ থেকে ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি উত্তর কলিকাতার বিদ্যাসাগর কেন্দ্র থেকে বিধানসভায় নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিলেন। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে তিনি আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি। তখন থেকে কেবল চিকিৎসা ও জনসেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ভারতীয় রেডক্রশ সোসাইটির আজীবন সদস্য ছিলেন তিনি। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি বিভক্ত হলে পর তিনি কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী)'র সঙ্গে যুক্ত থাকেন। ১লা নভেম্বর ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।[৯৫]

ডাক্তার নারায়ণ রায়ের নামে সিমলা স্ট্রিটের নামকরণের ফলে সিমলা অঞ্চলের শেষ স্মৃতিটুকু এইভাবে মুছে গেল, যদিও বাহির সিমলা অঞ্চলে (বর্তমানে হালসীবাগানে) সিমলা রোডের অস্তিত্ব অতীতের স্মৃতিরূপে আজও জ্বলজ্বল করছে।

টেগোর ক্যাসেল স্ট্রিট : সেকালের কলিকাতার চড়কডাঙ্গা অঞ্চলে বর্তমানের টেগোর ক্যাসেল স্ট্রিট। টেগোর ক্যাসেলের স্মরণেই পথটি এই নামে নামাঙ্কিত হয়েছে। এই ক্যাসেল নির্মাতা মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর পাথুরিয়াঘাটায় বাস করতেন। টেগোর ক্যাসেল সম্বন্ধে কিছু বলার আগে এই অঞ্চল সম্বন্ধে আমাদের অবহিত হওয়া দরকার। চড়কডাঙ্গা, জোড়াবাগান ও পাথুরিয়াঘাটা প্রায় পাশপাশি অবস্থিত। এখানকার সমাজ-সংস্কৃতি এই তিন অঞ্চলকে ঘিরে গড়ে উঠেছে। তাদের পরিপুষ্ট করেছে এই অঞ্চলের কয়েকটি প্রাচীন পরিবার। তাঁরা হলেন শেঠ, বসাক, ঘোষ, মল্লিক, ঠাকুর ও মুখোপাধ্যায় পরিবার। এই অঞ্চলের অধিকাংশ পথ-ঘাট এই সব পরিবারের কৃতী পুরুষের নামে নামাঙ্কিত হয়েছে। এঁদের অবদানের কথা বলার আগে চড়কডাঙ্গা, জোড়াবাগান ও পাথুরিয়াঘাটা সম্বন্ধে দু'চার কথা বলি।

১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের পৌত্র আজীম-উস্‌সানের অনুমতি নিয়ে সুতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর নামে তিনটি গ্রাম দেশীয় জমিদার সাবর্ণ চৌধুরীর নিকট থেকে ক্রয় করেন। চড়কডাঙ্গা, জোড়াবাগান ও পাথুরিয়াঘাটা সুতানুটি গ্রামের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সে সময়ে কলিকাতায় আরও কয়েকটি চড়কডাঙ্গা ছিল। একটি ছিল নারকেলডাঙ্গায়। এখনও সেখানে চড়কডাঙ্গা রোড নামে একটি রাস্তা আছে। ভবানীপুরে পদ্মপুকুরের কাছে ছিল আরেক চড়কডাঙ্গা। সেখানে প্রতি বছর চৈত্র সংক্রান্তির দিন মেলা বসে এখনও। হাজরা রোডে ছিল আরেক চড়কডাঙ্গা।

চড়ক উপলক্ষ করে যে রাস্তাটির নাম হয়েছিল চড়কডাঙ্গা স্ট্রিট, সেখানে কোনও চড়ক হত না। চড়ক হত বিডন উদ্যানে। সে সময় এটি উদ্যান হয়নি। এই জায়গায় ছিল শেঠ-বসাকদের বসতি। ১৭৬৬ খ্রিস্টাব্দে রাসবিহারী ও বিনোদবিহারী শেঠ এই জায়গার কিছু অংশ বিক্রি করে দেন। পরে এখানে শিবের গাজন ও চড়ক হত বলে এই অঞ্চলটির নাম হয় চড়কডাঙ্গা। বহুদূর থেকে গ্রামবাসীরা এখানে এসে মেলায় যোগ দিত। ১৮৬৯ সালে এই জায়গায় বিডন উদ্যান (রবীন্দ্র কানন) তৈরি হলে পর এখানকার চড়ক উঠে আসে ছাতুবাবুর বাজারের মাঠে। চড়ক ও মেলা এখানেই হতে থাকে। আজও তা বহাল আছে।

জোড়াবাগান নাম শুনলেই মনে হয় পাশাপাশি দুই বাগানের অবস্থিতি থেকে এই নামকরণ। এই জোড়াবাগানের মালিক কে ছিলেন এবং জোড়াবাগান কোথায় ছিল—এই প্রশ্ন নিয়ে নানা বিতর্ক দেখা দিয়েছে। সেই সঙ্গে জোড়াবাগান রোড নামধারী রাস্তাটিও এই বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছে। এই প্রসঙ্গে এ. কে. রায় লিখেছেন, ''The Jorabagan Road leading from the river to the twin garden houses of Omichand and Govindaram Mitter and a few others leading to the houses of well-to-do European, Portugues and Armenian merchants'' [৯৬] অর্থাৎ জোড়াবাগান রোড নদীর তীর থেকে আরম্ভ হয়ে উমিচাঁদ ও গোবিন্দরাম মিত্রের পাশাপাশি অবস্থিত জোড়াবাগান এবং কয়েকটি ইউরোপীয়, পর্তুগিজ ও আর্মেনিয়ান সদাগরের বাগান বাড়ি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে রাস্তাটি উমিচাঁদ ও গোবিন্দরাম মিত্রের জোড়াবাগান পর্যন্ত প্রসারিত ছিল বলে একে জোড়াবাগান রোড বলা হত।

প্রাণকৃষ্ণ দত্ত তাঁর গবেষণাধর্মী প্রবন্ধাবলী "কলিকাতার ইতিবৃত্ত" ১৩০৮ বঙ্গাব্দের আশ্বিন থেকে শুরু করে ১৩১০ বঙ্গাব্দের মাঘ পর্যন্ত 'নব্যভারত' পত্রিকায় প্রকাশ করেন। তিনি জোড়াবাগান স্ট্রিট সম্বন্ধে লিখেছেন, "এখনকার নিমতলা ঘাট স্ট্রিট পূর্বে জোড়াবাগান স্ট্রিট বলিয়া পরিচিত ছিল। কিন্তু বহু পূর্বে এই রাস্তাটি সম্পূর্ণ খোলা ছিল না। মধ্যে মধ্যে কাঁচা রাস্তা, আবার খানিক মাঠ বা কৃষিক্ষেত্র, আবার খানিক পথ, খানিক বাগান, আর্মির ম্যাপে এইরূপ দেখা যায়। বেলী সাহেবের ১৭৮২ সালের ম্যাপে রাস্তাটি গঙ্গা তীর হইতে চিৎপুর রাস্তা পর্যন্ত সরলরেখায় নির্মিত এবং জোড়াবাগান স্ট্রিট নামে পরিচিত ছিল।" যে সময় উমিচাঁদ ও গোবিন্দরাম মিত্রের বাগানবাড়ির অস্তিত্ব ছিল সে-সময় জোড়াবাগান স্ট্রিট বা নিমতলা ঘাট স্ট্রিট ওই বাগান পর্যন্ত প্রসারিত ছিল না। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে বিডন স্ট্রিট নির্মিত হলে পর রাস্তাটি গঙ্গার ঘাট থেকে সরাসরি সারকুলার রোড পর্যন্ত প্রসারিত হয়। অতএব এটাই সুস্পষ্ট যে জোড়াবাগান রোড/স্ট্রিট কখনই উমিচাঁদ ও

গোবিন্দরাম মিত্রের বাগানবাড়ি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল না।

নগেন্দ্রনাথ শেঠ তাঁর "কলিকাতাস্থ তন্তুবণিক জাতির ইতিহাস" গ্রন্থে লিখেছেন, "তাঁহার (বৈষ্ণবচরণ শেঠের) বহু ভূসম্পত্তি ছিল। জোড়াবাগানে পাশাপাশি দুটি বাগান তাঁহার ছিল"। তিনি আরও লিখেছেন, "বর্তমান জোড়াবাগান স্কোয়ারের স্থানে পূর্বে শেঠদিগের পাশাপাশি দুটি বাগান ছিল। তাহাতে উহা জোড়াবাগান নামে খ্যাত হয়।... কালক্রমে সমগ্র স্থানের নাম হয় জোড়াবাগান।"

রাধারমণ মিত্র জোড়াবাগানের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নির্ণয় করতে গিয়ে লিখেছেন, "আজ থেকে দেড়শো বছরেরও আগে বৈষ্ণবদাস ওরফে বৈষ্ণবচরণ শেঠের এখানে পাশাপাশি দুটো বাগান থাকায় ওই জায়গাটার নাম হয় জোড়াবাগান। বর্তমান জোড়াবাগান স্কোয়ারের জায়গায় একটা মস্ত ঘিঞ্জি নোংরা বস্তি ছিল। সেই বস্তি উচ্ছেদ করে সেই জায়গায় কলিকাতা কর্পোরেশন জোড়াবাগান স্কোয়ার তৈরি করেছে ১৯০১ থেকে ১৯১১ সালের মধ্যে।"[৯৭]

পাথুরিয়াঘাটা কলিকাতার প্রাচীন পল্লীগুলির অন্যতম। এর আরেক নাম মালাপাড়া। বড়বাজারের উত্তরে একটি খাল মেছুয়াবাজারের রাস্তা দিয়ে বসাক দিঘির (এখনকার মার্কাস স্কোয়ার) মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ছিল। আরেকটি খাল জোড়াসাঁকো থেকে পাথুরিয়াঘাটে ভাগীরথীর সঙ্গে মিশেছিল। পরবর্তীকালে এটিই প্রাচীন কলিকাতা গ্রামের উত্তর সীমা এবং সুতানুটি গ্রামের দক্ষিণ সীমা হয়েছিল। সে-সময় জোড়াসাঁকো খালের উপর পাশাপাশি দুটি সাঁকো থাকায় ওই অঞ্চলের নাম হয় জোড়াসাঁকো। পাথুরিয়াঘাটার এই খালের ধারে মালাই দাঁড়ি মাঝিরা নৌকা রেখে পাড়ার মধ্যে বাস করত। তাই থেকে ওই পাড়ার নাম হয় মালাপাড়া। আজও প্রাচীন বাসিন্দারা পাথুরিয়াঘাটাকে মালাপাড়া বলে। শেঠ, বসাক পরিবারের কিছু অংশ পাথুরিয়াঘাটায় তাঁদের ভদ্রাসন নির্মাণ করেন। সে কথায় আমরা পরে আসছি। পাথুরিয়াঘাটার শেঠ, বসাক পরিবার পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রিটের গঙ্গার দিকে শেষ প্রান্তে একটি পাথর বাঁধানো ঘাট নির্মাণ করে দেন। ওই রাস্তা দিয়ে পাথুরিয়াঘাটে যাওয়া যেত বলে রাস্তাটির নাম হয় পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রিট। এ থেকে সমগ্র অঞ্চলের নাম হয় পাথুরিয়াঘাটা।[৯৮]

হিন্দি ভাষায় পাথুরিয়া মানে বারবনিতা (অহল্যা পাষাণী থেকে)। সুতরাং পাথুরিয়াঘাট মানে বারবনিতা পল্লী বা বারবনিতাঘাট।[৯৯]

আরেক দল মনে করেন গ্রামীণ কলিকাতা থেকে শহরে রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে জোড়াসাঁকো থেকে পাথুরিয়াঘাটের খাল ভরাটের ব্যবস্থা করা হয়। এই ভরাট করা জায়গার ওপর এক পাথর বাঁধানো রাস্তা তৈরি হয়ে যায়। তাঁদের মতে এটি পাথুরিয়াঘাটার উৎপত্তির মূল কথা!

পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রিট কলিকাতার প্রাচীন পথগুলির অন্যতম। আজকের পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রিট সেকালে পাথুরিয়া স্ট্রিট নামে পরিচিত ছিল। মার্ক উডের কলিকাতা মানচিত্রে (১৭৮৪) পথটি ওই নামেই চিহ্নিত আছে। আপজন মানচিত্রে (১৭৯২-৯৩) পথটি একই নামে দেখানো আছে। শক ও প্রিন্সেপ লটারি কমিটির প্রয়োজনে কলিকাতার আরেকটি মানচিত্র প্রকাশ করেন। নাম Plan of the City of Calcutta and its environs, 1825-32। এই মানচিত্রে পথটির পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রিট নামে উল্লেখ আছে। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে রাস্তাটি পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রিট নামাঙ্কিত হয়। চড়কডাঙ্গা, জোড়াবাগান ও পাথুরিয়াঘাটা সম্বন্ধে সম্যক অবগতির জন্য ওই অঞ্চলের রেখাচিত্র এই অধ্যায়ের শেষে সন্নিবেশিত হল।

পাথুরিয়াঘাটা নামের মধ্যে পাথরের সংশ্রব থাকলেও এর মধ্যে নিহিত আছে কলিকাতার সামাজিক ইতিহাসের উষ্ণ প্রস্রবণের ধারা। এক সময় 'সম্বাদ সুধাকর' নামে বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করার জন্য পাথুরিয়াঘাটা থেকে কাঁচড়াপাড়া নিবাসী প্রেমচাঁদ রায় লাইসেন্সের জন্য সরকারের কাছে আবেদন করেন। ২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৮৩১ (১৩ই ফাল্গুন, ১২৩৭) সম্বাদ সুধাকর প্রথম প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকা মধ্যপন্থী ছিল। মাত্র চার বছর চলেছিল।[১০০]

উত্তর কলিকাতায় প্রথম কংগ্রেস অফিস খোলা হয় পাথুরিয়াঘাটায়। ১৯২০ সালের কথা। লালা লাজপত রায় তখন কংগ্রেসের সভাপতি। অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে

কংগ্রেসে। এই সময় বহু জায়গায় নতুন করে কংগ্রেস কমিটির অফিস খোলা হয়। উত্তর কলিকাতায় কংগ্রেসের কোনও অফিস ছিল না। ৬৮, পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রিটে যদুলাল মল্লিকের এক নাতি বৃন্দাবন মল্লিক তার বাড়ির একটি অংশে উত্তর কলিকাতা কংগ্রেস অফিস করতে অনুমতি দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে কংগ্রেস অফিস অন্যত্র উঠে গেলে ঐ জায়গায় সুভাষচন্দ্র বসু ফরওয়ার্ড ব্লকের অফিস করেন।[১০১]

একসময় বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ আত্মগোপন করেছিলেন এই পাথুরিয়াঘাটায়। গোপেন রায় একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে রেখেছিলেন পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রিটের ৭৯ নম্বরে। আত্মগোপনের জন্য যতীন্দ্রনাথ, বিপিন গাঙ্গুলি, নরেন্দ্র ভট্টাচার্য ও মাদারীপুরের কর্মীরা উঠলেন গিয়ে সেই আস্তানায়। ২৪শে ফেব্রুয়ারি হঠাৎ গুপ্তচর নীরদ হালদার হাজির হয়ে "আরে যতীনবাবু আপনি এখানে"—বলে উল্লাসে চিৎকার করে ওঠে। নেতা যতীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সমর্থন পেয়েই নীরেন দাশগুপ্ত তাঁকে গুলি করেন। ভূলুণ্ঠিত নীরদকে ফেলে রেখে ছত্রভঙ্গ হবার নির্দেশ দিলেন যতীন্দ্রনাথ। একদল চলে গেলেন খিদিরপুরের আড্ডায়। অন্যদল বঙ্গবাসী কলেজের মেসে। ফণী চাংড়িপোতা থেকে খবর পেয়ে যতীন্দ্রনাথদের নিয়ে গেলেন তাঁর মীরজাফর লেনের (এখন কলেজ রো) বাড়িতে।[১০২]

পাথুরিয়াঘাটায় বসবাসকারী যে সব পরিবার কলিকাতার সমাজ-সংস্কৃতির ধারাকে পরিপুষ্ট করেছেন তাঁদের কথায় এবারে আসছি। প্রথমে তন্তুবণিক জাতির কথা।

তন্তুবণিক জাতি কলিকাতার আদি বাসিন্দা এবং কলিকাতার ব্যবসা-বাণিজ্যের ইতিহাসে এঁদের পথিকৃৎ বলা যায়। তন্তুবণিক জাতির মধ্যে পাঁচ উপাধির প্রচলন আছে, যথা—শেঠ, দত্ত, মল্লিক, বসাক ও হালদার। এঁরা সকলেই শেঠ বসাক সম্প্রদায় নামে খ্যাত। পূর্বে তন্তু ব্যবসায়ী ও তন্তুবায়-এর মধ্যে বৃত্তিগত ভেদ ছিল। পরবর্তীকালে এই বৃত্তিগত ভেদ দূর হওয়ায় সমাজে তন্তুবণিক জাতি তন্তুবায় আখ্যায় পরিচিত হন।

তন্তুবণিক জাতি প্রধানত রেশম ও কার্পাস বস্ত্রের ব্যবসা করতেন। এছাড়াও তাঁদের মুক্তা, প্রবাল, দামি পাথরের এবং অন্যান্য জিনিসের ব্যবসা ছিল। ১৫২০-৩০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সরস্বতী নদী মজে যাওয়ায় শেঠ বসাক ব্যবসায়ীরা সপ্তগ্রাম থেকে ব্যবসা উঠিয়ে শিবপুরের কাছে বিটোর-এ (বাঁটরায়) পর্তুগীজদের সঙ্গে বস্ত্র ব্যবসা শুরু করেন। সে সময় বিটোর বিদেশি বণিকদের একটি বাণিজ্যকেন্দ্র হয়ে ওঠে। তখন শেঠেদের মধ্যে মুকুন্দরাম ছিলেন সুপরিচিত। তিনি কালিদাস বসাককে সঙ্গে নিয়ে চলে আসেন কালিঘাটের কাছে গোবিন্দপুরে। গোবিন্দপুর তখন ঘন জঙ্গল। মুকুন্দরাম সেই জঙ্গল পরিষ্কার করে বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। গৃহদেবতা গোবিন্দজীউকে সেখানে প্রতিষ্ঠা করেন। গোবিন্দজীউ-এর নামানুসারে ওই স্থানের নাম হয় গোবিন্দপুর। এই জায়গা অস্বাস্থ্যকর হওয়ায় তাঁরা বর্তমান লালদিঘির কাছে বসবাস আরম্ভ করেন এবং সেখানে গোবিন্দজীউকে স্থাপন করেন। গোবিন্দজীউর নামানুসারে এই গ্রামের নামও হয় গোবিন্দপুর।[১০৩] শোনা যায় মুকুন্দরাম শেঠ, কালিদাস বসাক, বাসুদেব বসাক, বারপতি বসাক ও করুণাময় বসাক গোবিন্দপুরে এসে প্রথম বসতি স্থাপন করেন। তাতে তাঁরা শেঠ-বসাক সম্প্রদায় নামে পরিচিত হন।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে প্রথম দিকে একমাত্র শেঠ বসাকরা একচেটিয়া বাণিজ্য করে বিপুল ঐশ্বর্য লাভ করেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ইংল্যান্ড ও ইউরোপে রপ্তানির জন্য যে সব পণ্যদ্রব্য কিনতেন তাকে তখন ইনভেস্টমেন্ট বলা হত। এই ইনভেস্টমেন্ট যাঁরা দাদন দিয়ে কোম্পানিকে সরবরাহ করতেন, তাঁদের বলা হত দাদনি মার্চেন্ট বা দাদনি বণিক। কোম্পানি আমলের সবচেয়ে প্রাচীন ও প্রভাবশালী দালাল ও দাদনি বণিক হলেন শেঠ এবং তাঁদের জ্ঞাতি বসাকরা। সে সময় শেঠেদের অন্তত ১১০ বিঘার একটি বাগান ছিল কলিকাতায়। ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে ১২ই জুন শেঠবাগানের খাজনা বৃদ্ধি করা হয়। জনার্দন শেঠ, গোপাল শেঠ, যাদু শেঠ, বারানসী শেঠ এবং জয়কিষণ শেঠ আপত্তি করায় ১১ই সেপ্টেম্বর ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে (ডায়েরি ও কনসাল্টেশন বুক-এর একটি প্রস্তাব থেকে জানা যায়) শেঠেদের বাগানের খাজনা বিঘা প্রতি আট আনা করে কমিয়ে দেওয়া হয়। শেঠেরা কলিকাতার প্রাচীন বাসিন্দা এবং তাঁরা তাঁদের এলাকাধীন রাস্তাঘাট নিয়মিত সংস্কার করে ঠিক রাখবেন বলে কোম্পানি তাঁদের খাজনা হ্রাস করেছিলেন। পরবর্তীকালে

ইংরেজদের সঙ্গে এই দাদনি ব্যবসার গণ্ডি ধীরে ধীরে ভেঙে যাচ্ছিল, তার কারণও ছিল, সে সময় অন্যান্য জাতি ও পেশার লোকেরা নিজেদের প্রথাসিদ্ধ জাতি-কর্ম ছেড়ে স্বাধীন ব্যবসা ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। তা সত্ত্বেও দালালি ও দাদনি ব্যবসা আঠারো শতকের দিকে যে কলিকাতার শেঠ বসাকদের আয়ত্তে ছিল, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তখনকার বিখ্যাত ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রধান ছিলেন বৈষ্ণবদাস শেঠ, শ্যামসুন্দর শেঠ, গোপীনাথ শেঠ, রামকৃষ্ণ শেঠ, শোভারাম বসাক, লক্ষ্মীকান্ত শেঠ প্রমুখ। যে বিপুল বিত্ত তাঁরা দালালি ও বাণিজ্যের দ্বারা সঞ্চয় করেছিলেন তার কোনও পরিমাণ হয় না।[১০৪]

এই সব ধনী শেঠ বসাক সম্প্রদায়ের এক অংশ জোড়াবাগান পাথুরিয়াঘাটা অঞ্চলে বসবাস শুরু করেছিলেন। মুকুন্দরাম শেঠের উত্তরপুরুষ বৈষ্ণবচরণ শেঠ জনার্দন শেঠের প্রথম পুত্র। জন্ম গোবিন্দপুরে। তিনি বৈষ্ণব দাস শেঠ নামেও পরিচিত। গোবিন্দপুরে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের জন্য স্থানের প্রয়োজন হলে তিনি তাঁদের গৃহদেবতা গোবিন্দজীউকে নিয়ে বড়বাজারে বসতি স্থাপন করেন। তাঁর বসতবাড়ি ছিল ৮ নম্বর দর্মাহাটা স্ট্রিট (এখন, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড)। তাঁর গোবিন্দজীর মন্দির ১৮/১, দর্মাহাটা স্ট্রিটে অবস্থিত। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রথম দালাল ছিলেন উমিচাঁদের ভাই দীপচাঁদ ভাল্লা। তারপর দালাল হন বৈষ্ণবচরণ শেঠ। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে বস্ত্রের ব্যবসা করে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। বহু ভূসম্পত্তি ছিল বৈষ্ণবচরণের। জোড়াবাগানে ছিল পাশাপাশি দুই বাগান, যা থেকে ওই জায়গার নাম হয়েছে জোড়াবাগান। ওই অঞ্চলে তাঁর নামে তিনটি রাস্তা আছে—জোড়াবাগান স্কোয়ারের পূর্ব দিকে বৈষ্ণব শেঠ স্ট্রিট, আর আছে দুটি গলি পথ, 'বৈষ্ণব শেঠ ফার্স্ট' ও 'সেকেন্ড লেন'।

১৮৯০ সালে কলিকাতা পুরসভা জোড়াবাগান বস্তি ভেঙ্গে রাস্তা নির্মাণ করেন। সে সময় এই বস্তি ছিল শেঠেদের অধিকারে। রাস্তা নির্মাণের জন্য প্রায় ৬০,০০০ টাকা মূল্যের সমস্ত জমি শেঠেরা বিনামূল্যে দিয়েছিলেন। সে সময়কার পৌর প্রতিনিধি লালবিহারী বসাক পুরসভাকে অনুরোধ করেন যে শেঠেদের পূর্বপুরুষ খ্যাতনামা বৈষ্ণবচরণ শেঠের নামে নতুন রাস্তাটি বৈষ্ণবচরণ শেঠ স্ট্রিট করা হোক এবং ওই রাস্তার সঙ্গে যে ছোট ছোট গলি পথ আছে তা বৈষ্ণবচরণ শেঠ ফার্স্ট ও সেকেন্ড লেন করা হোক। কলিকাতা পুরসভা তাঁদের ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৮৯০ সালের অধিবেশনে ওই প্রস্তাব অনুমোদন করেন।[১০৫]

ব্যবসায়ে সাধুতার জন্য বৈষ্ণবচরণের খুব সুনাম ছিল। গঙ্গাজল পাত্রে ভরে তাতে নিজের নামের সিলমোহর দিয়ে সোমনাথ, দ্বারকা ও রামনাদের রাজার কাছে পূজার জন্য পাঠাতেন। বৈষ্ণবচরণের সিলমোহর দেখে তাঁরা বুঝতেন যে জল খাঁটি গঙ্গার জল। গঙ্গার জল পাঠানোর ব্যবসা তাঁর প্রপৌত্রদের সময় পর্যন্ত চালু ছিল। ব্যবসায়ে যেমন সাধুতার জন্য প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন, তেমনি দু'হাতে দানও করেছিলেন অকাতরে। বহু ব্রাহ্মণ পরিবার তাঁর দানে প্রতিপালিত হয়েছিল। বিভিন্ন ধর্মস্থানে ও কলিকাতার কয়েকটি স্থানে দিঘি খনন করিয়ে দিয়েছিলেন। বৈষ্ণবচরণ নীলমণি ঠাকুরকে জোড়াসাঁকোতে বসবাসের জন্য কিছু জমি দান করেন। কলিকাতার শাসনকর্তা মহারাজা মানিকচাঁদ বৈষ্ণবচরণের সহোদর ছিলেন।

বৈষ্ণবচরণের প্রপৌত্র ব্রজকুমার শেঠ। তিনি ছিলেন কৃষ্ণমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র। সেকালের কলিকাতার একজন ধনবান পুরুষ। তাঁর দুই পুত্র পন্নগেন্দ্রমোহন ও সুজেন্দ্রমোহন। ব্রজকুমার ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে পরলোকগমন করেন। ব্রজকুমারের নামে চড়কডাঙ্গায় পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত ছোট একটি রাস্তা আছে।

ব্রজকুমারের কনিষ্ঠ পুত্র সুজেন্দ্রমোহন। সাধারণের কাছে মনসা শেঠ নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর নামে জোড়াবাগানে একটি রাস্তা আছে। পথটি বৈষ্ণব শেঠ স্ট্রিট থেকে শুরু হয়ে পশ্চিম দিকে প্রসারিত হয়েছে। ১৯০৫ সালে তিনি দেহরক্ষা করেন।

ব্রজকুমার শেঠ লেন ও সুজেন্দ্র শেঠ লেন : এই দুই রাস্তার ইতিবৃত্ত কম আকর্ষণীয় নয়। কলিকাতা পুরসভার ১৮৮৬-৮৭ সালে প্রকাশিত অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রিপোর্টে জানা যায় যে জোড়াবাগানের শেঠ পরিবার জোড়াবাগান বস্তির মধ্যে দিয়ে নতুন রাস্তা নির্মাণের সময় পুরসভাকে

বিনামূল্যে জমি দিয়েছিলেন। দানের একটি শর্ত ছিল—নতুন যে দুটি রাস্তা তৈরি হবে, তা তাঁদের পরিবারের দু'জনের নামে নামকরণ করতে হবে। রাস্তা যথাসময়ে নির্মিত হলেও নামকরণ নিয়ে উভয়পক্ষই নীরব ছিলেন।

১৯১৪ সালে সুজেন্দ্রমোহনের চতুর্থ ও পঞ্চম পুত্র যথাক্রমে মন্মথনাথ ও হীরালাল শেঠ কলিকাতা পুরসভার কাছে এক স্মারকলিপির মাধ্যমে পুরসভাকে তাঁদের পুরানো শর্তের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। ওই স্মারকপত্রে আরও বলা হয় যে রাস্তা দুটির নাম তাঁদের পিতা ও পিতামহ যথাক্রমে সুজেন্দ্রমোহন ও ব্রজকুমার শেঠের নামে নামাঙ্কিত করা হোক। ওই অঞ্চলের তৎকালীন পুরপ্রতিনিধি শেঠেদের প্রস্তাব সমর্থন করেন।

কলিকাতা পুরসভা তাদের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ১৯১৪ সালের অধিবেশনে শেঠেদের প্রস্তাব অনুমোদন করেন। অতঃপর যে রাস্তাটি জোড়াবাগান স্ট্রিট ও মণ্ডল স্ট্রিটকে সংযুক্ত করেছে তার নাম রাখা হয় 'সুজেন্দ্র শেঠ লেন'। আর যে রাস্তাটি অক্ষয় দত্ত লেনের পূর্ব প্রান্ত দিয়ে প্রসারিত হয়েছে তার নাম হয় 'ব্রজকুমার শেঠ লেন'।[১০৬]

আর যাদুবিন্দু শেঠের উত্তরপুরুষ রাধাকৃষ্ণ শেঠ। পিতা গুরুদাস শেঠ। তিনি বড়বাজারে বাস করতেন। প্রভূত ধনশালী ছিলেন। নতুন বাজারে চড়কডাঙ্গা স্ট্রিটে অবস্থিত জয়নারায়ণ মল্লিকের "চণ্ডেশ্বর মহাদেব" নামে এক শিবলিঙ্গ প্রাপ্ত হন। এই চণ্ডেশ্বর মহাদেবের গাজন ও চড়ক হ'ত বিডন উদ্যানের জায়গায়। নিমতলায় রাধাকৃষ্ণের প্রচুর প্রজাবিলি জমির ওপর কাঠগোলা ছিল। এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে কাঠগোলা পুড়ে যায়। পোড়া জায়গার ওপর দিয়ে নতুন রাস্তা তৈরি হয়। রাধাকৃষ্ণের জমির ওপর দিয়ে রাস্তা হওয়ায় পথটির নাম হয়—রাধাকৃষ্ণ শেঠ স্ট্রিট। রাস্তাটি মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড থেকে শুরু, সোজা পূর্বদিকে এগিয়ে রাম শেঠ রোডে এসে পড়েছে। রাধাকৃষ্ণ শেঠের মানিকতলায় 'পঞ্চবটী ভিলা' নামে এক উদ্যান ছিল। সেখানে মানিক পির নামে এক ফকিরের আস্তানা ছিল। ফকিরের নাম অনুসারে সমগ্র অঞ্চলটির নাম হয় মানিকতলা। রাধাকৃষ্ণ ১৮৭৫ সালে মারা যান।

রাধাকৃষ্ণের পৌত্র রামলাল শেঠ। শেঠ বসাক সমাজে তিনি একজন প্রসিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। তাঁর পিতামহের নামে নামাঙ্কিত রাস্তার অতি সন্নিকটে রামলাল শেঠের নামে রামলাল শেঠ রোড আছে। কামারহাটিতে রামলালের স্থাপিত একটি বাজার আছে। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে অপুত্রক অবস্থায় তিনি পরলোকগমন করেন।

তন্তুবণিক জাতির আরেক শাখা দত্ত। এটিও তাঁদের প্রাচীন উপাধি। বর্তমানে এঁদের তিনটি গোত্র প্রচলিত। গণেশদাস দত্ত (অলম্বুষী গোত্রীয়) দত্ত বংশের একটি শাখার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি হলদিপুরে কাপড় ও সুতার ব্যবসা করতেন। আনুমানিক ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে সেখান থেকে উঠে এসে গোবিন্দপুরে বসবাস শুরু করেন। এই বংশের উত্তরপুরুষ গঙ্গানারায়ণ দত্ত। তিনি অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী ছিলেন। পাথুরিয়াঘাটায় বসবাস করতেন। তাঁর প্রাসাদের সুবৃহৎ ফটক ছিল বলে ভবনটি ফটকওয়ালা বাড়ি নামে পরিচিত ছিল। পাথুরিয়াঘাটায় একটি রাস্তা তাঁর নামানুসারে 'গঙ্গানারায়ণ দত্ত লেন' নামাঙ্কিত হয়েছে। গঙ্গানারায়ণ পাথুরিয়াঘাটায় একটি ঠাকুরবাড়ি নির্মাণ করে লক্ষ্মীনারায়ণ নামে এক নারায়ণ শিলা প্রতিষ্ঠা করেন। পরে যদুলাল মল্লিক রোড নির্মাণের সময় ঠাকুরবাড়ি অধিগ্রহণ করা হয়। নারায়ণ শিলা অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হয়।

প্রাচীনকালে রাজমহলে (পুরাতন রাজগৃহ) বহু সংখ্যক তন্তুবায়ের বাস ছিল। সেখানকার সম্ভ্রান্ত তন্তুবায়গণ মোগল দরবারে নানাবিধ মহার্ঘ বস্ত্রাদি সরবরাহ করে বুশাখ উপাধি প্রাপ্ত হন। প্রাচীন বুশাখ উপাধি মধ্যযুগে বশাখ এবং আধুনিক কালে বসাক নামে পরিচিত। বসাকরা ১৪টি গোত্রে বিভক্ত।

গোবিন্দপুরে যে কয়েক ঘর মুষ্টিমেয় তন্তুবণিক জাতি বসতি স্থাপন করেছিলেন তার মধ্যে বারপতি বসাক অন্যতম। এই বংশের উত্তরপুরুষ ব্রজদুলাল বসাক পাথুরিয়াঘাটায় বাস করতেন। আমদানি-রপ্তানির ব্যবসা করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। ব্রজদুলাল শ্যামপুকুরের জমি শ্যামচাঁদ বসাকের নিকট থেকে ক্রয় করেন। সেখানকার পুষ্করিণীটি ভরাট করে কুটির নির্মাণ করেন।

পরবর্তীকালে ওই জমি কলিকাতার ধনকুবের দুর্গাচরণ লাহা কিনে নেন। বর্তমানে ওই জমি লাহা কলোনি নামে পরিচিত। পাথুরিয়াঘাটার যে অংশে ব্রজদুলাল বাস করতেন সেই রাস্তাটিকে হরি বর্ধনের গলি বলা হত।[১০৭] ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে এই পথটির নাম বদল করে 'ব্রজদুলাল স্ট্রিট' রাখা হয়। লটারি কমিটির কলিকাতার মানচিত্রে (১৮২৫-৩২) ব্রজদুলাল স্ট্রিটের উল্লেখ আছে।

কলিকাতায় প্রথম বাঙালি ধর্মশালা স্থাপনে অগ্রণী ভূমিকায় ছিলেন শেঠ-বসাক পরিবার। কলিকাতায় নবাগত বাঙালি হিন্দুদের অস্থায়ীবাসের জন্য এই ধর্মশালা স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়। এর উদ্যোক্তা ছিলেন শ্রীমতী পূর্ণশশী বসাক।

কলিকাতা বড়বাজারের সুপরিচিত জমিদার ছিলেন দক্ষিণারঞ্জন বসাক। পিতা গিরিশচন্দ্র বসাক। বাদায় তাঁর জমিদারি ছিল। অল্পবয়সে তিনি মারা যান। তাঁর পত্নী শ্রীমতী পূর্ণশশী স্বামীর স্মৃতিরক্ষার জন্য ৫৯নং পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রিটে একটি ধর্মশালা নির্মাণ করেন। ধর্মশালাটি ৭ কাঠা জমির ওপর সুবৃহৎ দোতলা বাড়িতে অবস্থিত। এটি স্থাপনে ব্যয় হয়েছিল ছাপান্ন হাজার টাকা। ধর্মশালাটি নামাঙ্কিত হয়েছিল—দক্ষিণারঞ্জন বসাক ধর্মশালা। এটি স্থাপিত হয় ১০ই পৌষ, ১৩৩২ সনে।[১০৮]

"হাওয়ালাদার" উপাধিধারী শ্রেণী তন্তুবণিক জাতির আরেকটি শাখা। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর সময়ে ১৭২২ খ্রিস্টাব্দে 'হাওয়ালা' নামক জমি বন্দোবস্ত ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। নবাবের জমি যাঁরা হাওলাত নিতেন অর্থাৎ নবাবকে দেয় কর দিয়ে জমি নিতেন তাঁরাই হাওয়ালাদার নামে খ্যাত হন। হাওলাত পারশি শব্দ, অর্থ কর্জ। সে সময় তন্তুবণিক জাতির কিছু পরিবার নবাবের কাছ থেকে হাওলাতে জমি গ্রহণ করেছিলেন। সেই থেকে ওই সব পরিবারের উপাধি হয়েছিল হাওয়ালাদার। পরবর্তী কালে হাওয়ালাদার উপাধি অপভ্রংশ হয়ে হালদার হয়।

যাদবেন্দু হাওয়ালাদার বর্গির অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দে সপ্তগ্রাম থেকে উঠে এসে সুতানুটি গ্রামে বসবাস শুরু করেন। এই বংশের উত্তরপুরুষ নিতাইচরণ হালদার একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ছিলেন। তিনি পাথুরিয়াঘাটার মালাপাড়ায় বাস করতেন। প্রথমে অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা, পরে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করে খ্যাতিমান ও ধনশালী হন। কলিকাতা পুরসভা ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৬ সালে পাথুরিয়াঘাটার একটি রাস্তা ডাক্তার নিতাই হালদারের নামে 'নিতাই হালদার স্ট্রিট' নামাঙ্কিত করেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে তন্তুবণিক সমাজের দাদনি ব্যবসায়ে ভাটা পড়ে। ধীরে ধীরে রপ্তানি বস্ত্রের ওপর শুল্ক আরোপ করা হয় এবং ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে ম্যানচেস্টার থেকে সুলভ বস্ত্র আমদানি আরম্ভ হয়। ফলে ইংরেজদের কলিকাতার বস্ত্র আড়ত উঠে যায়। তখন থেকেই শেঠ বসাকদের ব্যবসা-বাণিজ্য একেবারেই নষ্ট হয়ে যায়। তাঁরা তখন সরকারি চাকুরির দিকে ঝোঁকেন। এইভাবে তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ লাট সাহেবের দেওয়ান, আদালতের জজ, সাবজজ, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, মুনসেফ এবং অন্যান্য উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। কলিকাতার ইতিহাসে তন্তুবণিক জাতির ব্যবসায়ের কৌলীন্য ধীরে ধীরে অস্তমিত হয়।

পাথুরিয়াঘাটার ঘোষ পরিবার কলিকাতার এক বনেদি পরিবার। দান-ধ্যান, সমাজ-সংস্কৃতিতে এঁদের সুনাম আজও অক্ষুণ্ণ আছে। এই পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা রামলোচন ঘোষ। তিনি ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতায় আসেন এবং চিৎপুরে বসবাস শুরু করেন। মাত্র ১৭ বছর বয়সে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেক্রেটারির অফিসে চাকুরিতে প্রবেশ করেন। পরবর্তীকালে ওয়ারেন হেস্টিংস কলিকাতায় এলে পর তিনি তাঁর বেনিয়ান হন। তিনি হেস্টিংসের দ্বিতীয় পত্নী মেরিয়ানেরও দেওয়ান ছিলেন। বালি, বেলুড় ও ব্যারাকপুরে মেরিয়ানের যে কাঠের গুদাম ছিল রামলোচন ছিলেন তার সর্বময় কর্তা। এরপর হেস্টিংস ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে বাংলার গভর্নর হলে পর রামলোচনের সৌভাগ্যসূর্য উদিত হয়। সাধারণভাবে তাঁকে হেস্টিংসেরও দেওয়ান বলা হত। এ ছাড়াও তিনি হেস্টিংসের বাংলা ভাষার শিক্ষক হয়েছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের পূর্ববর্তী বাঙালিদের মধ্যে রামলোচন ঘোষ ছিলেন কৃতীপুরুষ। দোভাষীর কাজ করেছিলেন সুপ্রিম কোর্টে। ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে সুপ্রিম কোর্টে স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিস ও গ্রান্ডের মধ্যে যে মামলা হয় তার দোভাষীর কাজ করেছিলেন

রামলোচন। এ ছাড়া দাদা রামপ্রসাদের সঙ্গে ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। বরাহনগর আলমবাজারে একটি স্নানঘাট ও দ্বাদশ শিব মন্দির নির্মাণ করে দেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাঁর দানে অনুগৃহীত হয়েছিল। তাঁর দানের পরিধিও ছিল বিশাল। ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁর বিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন তাঁর তিন পুত্র—শিবনারায়ণ, দেবনারায়ণ ও আনন্দনারায়ণ।

শিবনারায়ণের তিন পুত্র—কালীপ্রসন্ন, দুর্গাপ্রসন্ন ও গুরুপ্রসন্ন। কালীপ্রসন্নের বংশধরেরা ১নং জোড়াবাগান স্ট্রিটে বাস করতেন। এই বাড়িটি ও ৩নং বাড়ি শিবনারায়ণ নির্মাণ করেন। দুর্গাপ্রসন্নের পুত্র অক্ষয়। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁর স্ত্রী চারুবালা দেবী কালীপ্রসন্নের পৌত্র দেবীপ্রসন্নকে দত্তক গ্রহণ করেন। এঁরা ৩নং জোড়াবাগান স্ট্রিটে বাস করতেন। চারুশীলা দেবী প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী হয়েছিলেন। তার মধ্যে ১০নং ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিটের বিশাল অট্টালিকা অন্যতম। তিনি তাঁর সম্পত্তির অর্জিত অর্থ সৎকাজে ব্যয় করেছিলেন। বহু ব্যক্তি ও সংস্থা তাঁর দানে ধন্য হয়েছিল। দেওঘরে ৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বালানন্দ ব্রহ্মচারীর ও গোপাল ঠাকুরের যুগল-মন্দির নির্মাণ করে দেন। পরবর্তীকালে তিনি তাঁর বিপুল সম্পত্তি অছি পরিষদের হাতে দিয়ে যান।

দেবীপ্রসন্ন ঘোষ পরিবারের কৃতী সন্তান। ছাত্র হিসাবে মেধাবী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ ডিগ্রিধারী। কলিকাতা পুরসভার কমিশনার ও অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিলেন। সঙ্গীতে তাঁর ছিল গভীর অনুরাগ। তবলায় তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ১৯৩৪-৩৫ খ্রিস্টাব্দে এলাহাবাদে সর্বভারতীয় সঙ্গীতের যে প্রতিযোগিতা হয় দেবীপ্রসন্ন তাতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। দেবীপ্রসন্নের ছয় মেয়ে, কোনও পুত্র সন্তান নেই।

দেবনারায়ণের পুত্র খেলাতচন্দ্র সেকালের কলিকাতার একজন খ্যাতিমান পুরুষ ছিলেন। দান, দয়া ও দাক্ষিণ্য তাঁর পরিচিতিকে আরও মহান করেছিল। দীর্ঘকাল তিনি ছিলেন অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট, কলিকাতা পুরসভার জাস্টিস্ অফ পিস। কলিকাতায় জলকষ্ট নিবারণের জন্য টালার ট্যাঙ্ক নির্মাণের ওই জায়গা বিনামূল্যে দান করেছিলেন।

সেকালের কলিকাতায় ধর্ম আন্দোলন ও সমাজ-সংস্কারে ভারতবর্ষীয় সনাতন ধর্মরক্ষণী সভার প্রগতিশীল ভূমিকার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। সভাটি খেলাতচন্দ্র ঘোষের পাথুরিয়াঘাটার বাড়িতে ১২৭৭ বঙ্গাব্দে স্থাপিত হয়। রক্ষণশীল ধর্ম আন্দোলনের সমর্থক শোভাবাজারের রাজা কালীকৃষ্ণ দেব ও তাঁর ভ্রাতা কমলকৃষ্ণ দেব খেলাতচন্দ্র ঘোষের সহযোগিতায় সভাটি স্থাপন করেন। সভার স্থায়ী সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর এবং চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়। কালীকৃষ্ণ দেব ১২৮০ বঙ্গাব্দের ৭ই পৌষ তারিখে উক্ত সভার শেষ সভাপতিত্ব করেন। তাঁর মৃত্যুর পর সহোদর কমলকৃষ্ণ দেব এই সভার স্থায়ী সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত হন।

ভারতবর্ষীয় সনাতন ধর্মরক্ষণী সভার শাখা কলিকাতা ছাড়াও দিনাজপুর ও বিক্রমপুর অঞ্চলে স্থাপিত হয়। ভারতের কয়েকজন বিশিষ্ট রাজা মহারাজা যেমন জয়পুরের মহারাজা, বিজয়নগরের মহারাজা ও নেপালের কর্নেল সমসের জঙ্গ বাহাদুর প্রমুখ এই সভার সদস্য ছিলেন। ১২৭৭ বঙ্গাব্দে, কার্তিক মাসে সনাতন ধর্মরক্ষণী সভার মুখপত্র "সনাতন ধর্ম্মোপদেশিনী" প্রকাশিত হয়। হিন্দুধর্ম ও হিন্দু আচারাদির শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনের প্রবক্তা হলেও এই সভা ধর্মীয় কুসংস্কার ও সংকীর্ণতাকে কখনও প্রশ্রয় দেননি। বহু বিবাহ ও কন্যাপণ রদ করার জন্য সভা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কলিকাতায় প্রথম নলবাহিত পানীয় জল সরবরাহ শুরু হলে রক্ষণশীল হিন্দুদের মধ্যে এই জল ব্যবহারে ধর্মনাশের সম্ভাবনায় যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং তা আন্দোলনের রূপ নেয়। তখন এই সনাতন ধর্মরক্ষণী সভা বাংলাদেশের বিশিষ্ট পণ্ডিতদের মতামত গ্রহণ করে জল সরবরাহের সপক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন।

উনবিংশ শতাব্দীর হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধবাদীরা হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করার জন্য তার সামাজিক কুসংস্কারগুলিকে অস্ত্র হিসাবে বেছে নিয়েছিল। সে সময় সনাতন ধর্মরক্ষণী সভার মতো সংস্কারবাদী আন্দোলনে ব্যাপৃত সভা সমিতিগুলি সমাজ-সংস্কারের মধ্য দিয়ে বিপন্ন হিন্দুধর্মকে রক্ষা করতে এগিয়ে এসেছিলেন।

খেলাতচন্দ্র ঘোষের পরিবারের সঙ্গে বাংলাদেশের এক অরণ্যপ্রেমী মরমী কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষভাবে জড়িত। তিনি এ বাড়িতে প্রথমে সেক্রেটারি ও গৃহশিক্ষক রূপে প্রবেশ করেন। পরে খেলাত ঘোষের এস্টেটের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজাররূপে ভাগলপুরের ভারপ্রাপ্ত হন। সেখানকার ইসলামপুর কাছারিতে বসে তিনি 'পথের পাঁচালি' রচনা করেন। ১৯২৮ সালে পথের পাঁচালি সমাপ্ত হয়। "বিচিত্রা" পত্রিকায় তা ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া তিনি তাঁর বিখ্যাত কয়েকটি গল্প ও উপন্যাস লিখেছিলেন ও অন্য গল্প উপন্যাসের উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন এই ইসলামপুর কাছারিতে বসে। ভাগলপুর থেকে ফিরে এসে বিভূতিভূষণ ১৯৪২ সালের আগে পর্যন্ত খেলাতচন্দ্র মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউশনে শিক্ষকতা করতেন। যুদ্ধের সময় ওখানকার চাকুরি ছেড়ে দেশে চলে যান। ওই সময় থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দেশের গোপালনগর স্কুলে শিক্ষকতা করেন।

খেলাত ঘোষের নামে কলিকাতায় দুটি রাস্তা আছে—একটি তাঁর বাসভবনের কাছে—নাম খেলাত ঘোষ লেন, অন্যটি টালার ট্যাঙ্কের উত্তরে, পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত রাস্তা, খেলাত বাবু লেন।

খেলাত ঘোষের আদর্শকে রূপায়ণের জন্য ১৯৭০ সালে স্থাপিত হয় খেলাত ঘোষ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট।

খেলাত ঘোষ ছিলেন নিঃসন্তান। রামলোচন ঘোষের ভাই রামপ্রসাদ ঘোষের প্রপৌত্র রমানাথ ঘোষকে দত্তক গ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই রমানাথ ঘোষকে খেলাত ঘোষের পুত্র এবং উত্তরাধিকারী রূপে লালনপালনের ব্যবস্থা করা হয়। হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভের সময় রমানাথ সংস্কৃত ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি সংগ্রহে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। খেলাত ঘোষের মতো তিনিও গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। কিন্তু এর জন্য সেকালের সাহেবসুবোদের সঙ্গে মেলামেশায় কোনও বাধা হয়নি। ছোটলাট স্যার ইলিয়ট, আলেকজান্ডার ম্যাকেঞ্জি এবং জন উডবার্নের সঙ্গে তাঁর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। শেষোক্ত দু'জন তাঁর পাথুরিয়াঘাটার বাড়িতে মাঝে মাঝে আসতেন। ছোটলাট স্যার ইলিয়টের পরামর্শে রমানাথ খেলাতচন্দ্র মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউশনকে সুসংস্কৃত করেন এবং এতে একটি ব্যায়ামাগার নির্মাণ করে দেন। কলিকাতা পুরসভার নির্বাচিত প্রতিনিধি, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি, বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রমানাথ ঘোষ। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল নির্মাণের সময় ২৭,০০০ টাকা দান করেছিলেন। ৪৭নং পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রিটের বাড়িতে তিনি বাস করতেন। রমানাথ ঘোষের পৌত্র অসিত ঘোষ বর্তমানে এই বাড়িতে বাস করেন।

রামলোচন ঘোষের কনিষ্ঠ পুত্র আনন্দনারায়ণ। ধর্মতলায় তিনি একটি বাজার প্রতিষ্ঠা করেন। বাজারটি তাঁর নামে নামাঙ্কিত হয়েছিল—আনন্দবাজার। তাঁর প্রপৌত্র ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ (১২৯৩-১৩৪৮ বঙ্গাব্দ) ছিলেন সঙ্গীতপ্রেমী ও সঙ্গীতের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক। এই সঙ্গীতানুরাগীর বাসভবনে ভারতের সকল প্রান্তের গুণী সঙ্গীতজ্ঞগণ সমাদৃত হতেন। বঙ্গীয় সঙ্গীত সম্মিলন ও নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মিলনের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ। ১৯৩৪ সালে যে অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্স স্থাপিত হয়, ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ছিলেন তার প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর পুত্র মন্মথ ঘোষ (১৯০৮-১৯৮৩)। তিনিও ছিলেন পিতার মতো সঙ্গীতানুরাগী। পিতাপুত্রের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় লুপ্ত ও প্রচলিত ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রের এক বিরাট সংগ্রহ তাঁদের বাসভবনে আছে। রাগরাগিণীর শাস্ত্র বর্ণিত রূপের চিত্রাবলীও তাঁদের সংগ্রহশালায় সযত্নে রক্ষিত আছে। সেকালের ভারতের প্রায় সকল শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতশিল্পী তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। ভারতের সঙ্গীতের ইতিহাসে পিতাপুত্রের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

৪৬নং পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রিটে ভূপেন্দ্রকৃষ্ণের আবাসভবন ছিল ভারতের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতশিল্পীদের আশ্রয়স্থল। তাঁরা কলিকাতায় এলে কিছুদিন এ বাড়িতে মহাসমাদরে কাটিয়ে যেতেন। এই বাড়ির এক সঙ্গীতের আসরে এক কীর্তিমান শিল্পীর জীবনে যবনিকাপাত ঘটে, সে ঘটনা যেমনি আকস্মিক তেমনি হৃদয়বিদারক। বাংলা ১৩৪৫ সালের ২৪শে আশ্বিনের (১৯৩৮) কথা। এই ভবনের দোতলার ঘরে সেদিন সন্ধ্যার পর বসেছিল এক গানের আসর। উপস্থিত ছিলেন ধ্রুপদী গোপালচন্দ্র

বন্দ্যোপাধ্যায়, অমরনাথ ভট্টাচার্য, গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী, কৃষ্ণচন্দ্র দে, নাটোরের মহারাজা যোগীন্দ্রনাথ রায়, মৃদঙ্গাচার্য দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য, তবলাগুণী হীরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, অযোধ্যা পাঠক প্রমুখ।

প্রথমে অমরনাথ ভট্টাচার্য তারপর গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের গানের সঙ্গে বাজাবার পর দুর্লভচন্দ্র সুমধুর কণ্ঠশিল্পী ধ্রুপদী ললিতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সঙ্গত আরম্ভ করলেন। দুর্লভচন্দ্র বাজালেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ নিপুণ রীতিতে। ললিতচন্দ্রের মধুর কণ্ঠের সঙ্গে দুর্লভচন্দ্রের পাখোয়াজ মিলে আসর তখন জমজমাট।

যাঁরা দুর্লভ ভট্টাচার্যের সামনে বসেছিলেন তাঁদের হঠাৎ চোখে পড়ল—তিনি শুধু বাঁ হাতে বাজাচ্ছেন। কিন্তু তাঁরা কেউ ভাবতে পারেননি যে দুর্লভচন্দ্রের ডান হাত তখন সম্পূর্ণ বিবশ হয়ে পড়েছে এবং সেইজন্যেই তিনি কেবল বাঁ হাতে ঠেকা দিচ্ছেন। অল্প পরেই তিনি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। ঢলে পড়বার আগে জড়িত স্বরে শেষ কথা উচ্চারণ করেছিলেন—'বাজাও'।

সুরের আনন্দময় আসরে যেন বজ্রপাত হল। ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের আনালেন অবিলম্বে। কোনও কিছুরই ত্রুটি হল না। কিন্তু দুর্লভচন্দ্রের জ্ঞান আর ফিরে এল না। সেখানে ২৮ ঘণ্টা জ্ঞানশূন্য অবস্থায় থাকার পর তিনি অনন্ত সঙ্গীতলোকে যাত্রা করলেন।[১০৯]

এবার বলি পাথুরিয়াঘাটার সুবর্ণবণিকদের কথা। সেকালের কলিকাতায় সুবর্ণবণিকদের প্রাক-পরিচয় পাওয়া যায় প্রাচীন প্রচলিত এক প্রবাদ গাথায়—

'পিরালি কায়েত তাঁতি আর সোনার বেনে,
করলে আবাদ তারা বয়ে ধন এনে।'

এই সোনার বেনেই সুবর্ণবণিক বৈশ্য পরিবার। এঁদের পদবি মল্লিক, ধর, রায়, শীল, দত্ত, দে, পাইন, পোদ্দার, আঢ্য, চন্দ্র, সেন ইত্যাদি। সুবর্ণবণিক পরিবার হুগলির সপ্তগ্রামে বসতি রেখেও কলিকাতায় গঙ্গার ধারে ব্যবসা-বাণিজ্যতেই বেশি ঝোঁক দিয়েছিলেন। আমরা এখানে পাথুরিয়াঘাটায় বসবাসকারী সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের অন্তর্গত মল্লিক বংশের অবদান নিয়ে আলোচনা করব।

এই মল্লিক বংশ দুটি শাখায় বিভক্ত—দে (দেব) মল্লিক ও শীল মল্লিক। দে মল্লিক পরিবারের অযোধ্যার রামগড়ে পরে সুবর্ণগ্রামে, কর্জনানগরে ও সপ্তগ্রামে বাস ছিল। ভারত ইতিহাসের প্রখ্যাত রাজা হর্ষবর্ধনের জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাজা রাজ্যবর্ধন দেব দে মল্লিক পরিবারের আদি পূর্বপুরুষ। রাজা হর্ষবর্ধন বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করলে তাঁর ভ্রাতা রাজা রাজ্যবর্ধন কান্যকুব্জ ত্যাগ করে সপ্তগ্রামে চলে আসেন। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসকার তারানাথের মতে সপ্তগ্রাম বা ত্রিবেণী বাংলাদেশের অতি প্রাচীন বন্দর এবং এই বন্দরের উন্নতি রাজ্যবর্ধনের বংশধর ও আত্মীয়-কুটুম্বের দ্বারা হয়েছিল। যে সব হিন্দু-বীর বঙ্গদেশে পাঠান রাজ্য বিস্তারে সাহায্য করেছিলেন, সম্রাট ইলিয়াস শাহ তাঁদের উপাধি দান করেন। সেই সময় রাজ্যবর্ধনের উত্তরপুরুষগণ 'মল্লিক' উপাধি লাভ করেন। পাঠান রাজত্বকালে এই উপাধি অতি গৌরবের ছিল। পরবর্তীকালে সরস্বতী নদীতে জলাভাব, চারিদিকে বিদ্রোহ দেখা দেওয়ায় মল্লিক পরিবার ব্যবসা ও নিরাপত্তার জন্য কলিকাতায় চলে আসেন। বাণিজ্য ও মহাজনি সূত্রে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে এই পরিবারের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়।[১১০]

কৃষ্ণদাস মল্লিকের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজারাম (১৬৩৬-১৭৩২) প্রথম ত্রিবেণী ত্যাগ করে কলিকাতায় এসে বসবাস শুরু করেন। বাংলা, উর্দু ও ফারসী ভাষায় তাঁর বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। তিনি ছিলেন বনেদি ব্যবসায়ী। জোব চার্নককে কলিকাতায় আসার পরামর্শ দিয়েছিলেন রাজারাম। তাঁর উপদেশ শুনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৬৮৬ খ্রিস্টাব্দে প্রথমে মালদহে রেশমের কারখানা স্থাপন করেন। পরে চার্নক হুগলির কুঠি উঠিয়ে নিয়ে সুতানুটিতে আনেন। এই প্রসঙ্গে স্যার ইভান কট্‌ন (Sir Evan Cotton) লিখেছেন, "The Bengalee Families, which have been so closely associated with British Rule in India, the Seths, the Bysacks, the Mullicks, whose ancester Rajaram of Trivene, advised Charnock, to transfar the Companies' factory from Hoogly to Sutanuti (Calcutta)"[১১১] এই স্থান পরিবর্তনের ফলে নবাবের কর্মচারীদের অত্যাচার থেকে কোম্পানি অনেকটা নিষ্কৃতি লাভ করেন। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ কোম্পানি রাজারামকে

কলিকাতার বড়বাজারে বিনা খাজনায় বসবাসের জমি দেন। পরবর্তীকালে রাজারাম কোম্পানির রাজনৈতিক ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উপদেষ্টা হয়েছিলেন।

রাজারামের দুই পুত্র দর্পনারায়ণ ও সন্তোষ। দর্পনারায়ণের (১৬৭২-১৭৪০) জন্ম ত্রিবেণীতে। বড়বাজারে নিজের উদ্যোগে স্বাধীন ব্যবসা করে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। তিনি কাশী, নবদ্বীপ ও হুগলি জেলায় অনেক মন্দির ও অতিথিশালা নির্মাণ করে দিয়েছিলেন।

রাজারামের কনিষ্ঠ পুত্র সন্তোষ মল্লিক কলিকাতায় সন্তোষবাজার স্থাপন করেন। প্রথমনাথ মল্লিক এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, "কোম্পানীর সেরেস্তার কাগজে সেই সন্তোষবাজারের উল্লেখ আছে ও সন্তোষ মল্লিক অনুরোধ করায় রামভদ্রকে নন্দরাম সেনের বাজারের হিসাব পরিদর্শনাদির ভার দেওয়া হয়। নন্দরাম সেনের নাম কলিকাতার রাস্তা ও শিব প্রতিষ্ঠায় বর্তমান।... ....১৭১১ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে কলিকাতার মণ্ডী বাজার ও সন্তোষবাজারের নামমাত্র পাওয়া যায় তৎপরে বড়বাজার ও লালবাজারের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।"[১১২] আর 'বংশগৌরব' পুস্তকে রাসবিহারী মল্লিক সন্তোষ মল্লিক প্রসঙ্গে লিখেছেন,—"ইনিই কলিকাতার প্রথম বাজার প্রতিষ্ঠা করেন এবং উহাই 'সন্তোষ বাজার' নামে খ্যাত ছিল।.....নন্দরাম সেন কোম্পানীর টাকা ভাঙ্গিলে, রামভদ্র নামক এক ব্যক্তি সন্তোষ মল্লিকের বাক্যে, কোম্পানীর ঐ বাজার পরিদর্শকের চাকরি পাইয়াছিলেন।" সন্তোষ মল্লিক অপুত্রক ছিলেন।

দর্পনারায়ণের একমাত্র পুত্র নয়নচাঁদ মল্লিক (১৭১৩-১৭৭৭)। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় বাংলাদেশের নানাস্থানে ধর্মশালা, পুষ্করিণী প্রভৃতি স্থাপন ও অকাতরে অর্থ ব্যয় করায় 'কমল নয়ান' উপাধি লাভ করেন। এর অর্থ হল নয়নচাঁদের কোমলদৃষ্টি যেখানে পড়ে সেখানে স্বয়ং মা কমলা বিরাজ করেন। তাঁর কলিকাতা বাসস্থানের কাছেই 'কমল নয়ান বেড়' নামে বিশাল অতিথিশালা ও দরিদ্রজনের ভোজনালয় ছিল। বড়বাজারে যেখানে তাঁর বাসভবন ছিল, সে সময় ওই রাস্তার নাম ছিল 'কমলনয়ানের বেড়'। পরবর্তীকালে এই রাস্তাটির নাম হয় 'মল্লিক স্ট্রিট'। পলাশী যুদ্ধের পর কলিকাতা ধ্বংসের ক্ষতিপূরণের অর্থ বিলি করার জন্য যে সব কমিশনার নিযুক্ত হয়েছিলেন তাঁদের অন্যতম ছিলেন নয়নচাঁদ মল্লিক। দেশ বিদেশে ব্যবসা করে নয়নচাঁদ বিপুল অর্থ উপার্জন করেন। লোকে তাঁকে টাঁকশালের কর্তা বলত। তাঁর নামে বাজারে টাকার তোড়া চলত। নিজের নামে গঙ্গার ঘাট তৈরি করে দেন। সেই ঘাটে তাঁর মাল ওঠানামা করত। নদিয়া, হুগলি, ২৪ পরগনায় ছিল তাঁর বিরাট জমিদারি। কলিকাতায় অনেক বাড়ির মালিক ছিলেন নয়নচাঁদ। জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য বড়বাজারে একটি রাস্তা করে দিয়েছিলেন। প্রথমে রাস্তাটির নাম ছিল ক্রস স্ট্রিট, পরে নাম হয় 'যমুনালাল বাজাজ স্ট্রিট'।

নয়নচাঁদ মল্লিকের তিন পুত্র—গৌরচরণ, নিমাইচরণ ও রাধাচরণ। এঁদের মধ্যে নিমাইচরণ সমধিক প্রসিদ্ধ। ১৭৩৬ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতার বড়বাজারে নিমাইচরণের জন্ম হয়। তাঁর বাসভবন ছিল সাত মহলা বিশাল অট্টালিকা। হ্যারিসন রোড (এখন, মহাত্মা গান্ধী রোড) নির্মাণের সময় তাঁর বাড়িটি দু'ভাগে বিভক্ত হয়। বাড়ির মধ্যে দিয়ে হ্যারিসন রোড চলে যায়। উত্তর দিকের বাড়িটি আবার কালাকার স্ট্রিট তৈরি হবার সময় ভাঙ্গা পড়ে। সে সময় ওই দুই বাড়িতে নিমাইচরণের পঞ্চম পুত্র রামমোহনের বংশধরগণ বাস করতেন। নিমাইচরণ সেকালের কলিকাতায় একজন খ্যাতিমান ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন। এ ছাড়া তাঁর দানশীলতা, আইনজ্ঞান প্রভৃতি বিবিধ গুণাবলী প্রশংসার দাবি রাখে। সে সময় কলিকাতা ও বাহিরে তাঁর বহু ভূসম্পত্তি ছিল। ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে স্যার হেনরি রাসেল নিমাইচরণের কাছ থেকে চৌরঙ্গীর প্রাসাদোপম বাগানবাড়ি ক্রয় করেন। পূর্বে এই উদ্যানভবন জেমস ওয়াটসনের সম্পত্তি ছিল। 'রাসেল স্ট্রিট' এই স্যার হেনরি রাসেলের নামে নামাঙ্কিত হয়েছে।

নিমাইচরণ সর্বপ্রথম ইংল্যান্ড ও ইউরোপীয় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করেন। এর ফলে তাঁর আমদানি ব্যবসা সুদূরপ্রসারী হয় এবং বিপুল অর্থ উপার্জন করেন। আইন বিষয়ে তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল, সুপ্রিম কোর্টের অ্যাটর্নি উইলিয়াম হিকি তাঁর স্মৃতিকথায় সে কথা উল্লেখ করেছেন। নানা প্রতিষ্ঠান তাঁর দানে অনুগৃহীত হয়েছিল। এখানেই শেষ নয়। তিনি তাঁর উইলে

৩২ লক্ষ টাকা দানের ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর প্রথম দুই পুত্র সেই ৩২ লক্ষ টাকার প্রায় সমুদয় অংশ মামলা মোকদ্দমায় ব্যয় করেন।

নিমাইচরণ সেকালের আইনসভার সদস্য ছিলেন। তাঁরই উদ্যোগে হিন্দুদের বিষয়-সম্পত্তি ইচ্ছানুযায়ী উইল করার অধিকার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক স্বীকৃত হয়। ব্রিটিশ শাসনে সে অধিকার ইতিপূর্বে হিন্দুদের ছিল না। ২৪শে অক্টোবর ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

নিমাইচরণের আট পুত্র—রামগোপাল, রামরতন, রামতনু, রামকানাই, রামমোহন, হীরালাল, স্বরূপচন্দ্র, মতিলাল ও দুই কন্যা। মৃত্যুর পর পুত্রদের মধ্যে দীর্ঘকাল মামলা-মোকদ্দমা হয়। নিমাইচরণের পুত্রদের মধ্যে রামমোহন মল্লিকই দীর্ঘজীবী ছিলেন। তিনি ৮৫ বছর বেঁচেছিলেন। ১৮৫৫ সালে তিনি পিতার নামে গঙ্গার তীরে একটি ঘাট নির্মাণ করে দেন। এটিই নিমাই মল্লিকের ঘাট, লোকে মল্লিকঘাট বলে। এই ঘাটে কলিকাতা পুরসভার অপরিশোধিত গঙ্গাজল সরবরাহের একটি পাম্পিং স্টেশন আছে। প্রথম হাওড়া পুল নির্মাণের সময় মল্লিক ঘাটকে খানিকটা দক্ষিণে সরিয়ে আনতে হয়।

রামমোহন বাস করতেন বড়বাজারে। তাঁর বড়বাজারের বসতবাড়িতে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে ২৭শে এপ্রিল স্থাপিত হয়েছিল 'বড়বাজার ফ্যামিলি লিটারারি ক্লাব'। উদ্যোক্তা ছিলেন রামমোহনের পৌত্র প্রসাদদাস ও তাঁর বন্ধু গোষ্ঠবিহারী মল্লিক। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কলিকাতার বুকে যতগুলি দেশহিতকর সভা গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানটি অন্যতম। এই ক্লাবের সম্পাদক প্রসাদদাস মল্লিক এবং সহ সম্পাদক ছিলেন গোষ্ঠবিহারী মল্লিক। রেভারেন্ড লঙ ১৮৫৯ থেকে ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এবং ১৮৭১ থেকে ১৮৭২ পর্যন্ত দু' দফায় সভার সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। রেভারেন্ড কে. এস. ম্যাকডোনাল্ড ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের মে থেকে ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাস পর্যন্ত এবং উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ষোড়শ বার্ষিক অধিবেশনে সভার সভাপতিত্ব করেন। প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় নিয়মিতভাবে এই সমাজের সভা বসত। সভায় বাংলা ও ইংরেজিতে সাহিত্য, শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও বিজ্ঞানের প্রসার সম্পর্কে আলোচনা হত। উৎকৃষ্ট প্রবন্ধাদি পুস্তকাকারে ছাপিয়ে বিনামূল্যে সভ্য ও জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হত। প্রসাদদাস এই সংস্থার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করতেন। সভায় বিভিন্ন সময় উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, লালবিহারী দে, বিচারপতি জে. বি. ফিয়ার, আশুতোষ ধর, চন্দ্রনাথ বসু প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

সাহিত্য ও বিজ্ঞানচর্চা ছাড়াও এই প্রতিষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে অভিনন্দন জানানোর প্রথাও প্রচলিত ছিল। ১৮৭২ সালে রেভারেন্ড লং-এর বিলাত যাত্রা উপলক্ষে তাঁকে এই লিটারারি ক্লাবের পক্ষ থেকে এক অভিনন্দনপত্র দেওয়া হয়। ওই বছরই তৎকালীন বড়লাট লর্ড নর্থব্রুককে এই ক্লাবের পক্ষ থেকে অভিনন্দনপত্র পাঠানো হয়। অভিনন্দনপত্রের উত্তরে বড়লাট যে উত্তর দিয়েছিলেন, তা থেকে জানা যায় যে এই প্রতিষ্ঠানটি একটি অ্যাংলো-ভার্নাকুলার স্কুল চালাতেন। তাঁর পত্র থেকে আরও জানা যায়, "His Excellency will always be glad to give his encouragement and support to a Society formed with laudable objects of bringing Europeans and Natives together in close literary union and intellectual sympathy." ভারতীয় ও ইউরোপীয় সাহিত্য সাধনায় বড়বাজার ফ্যামিলি লিটারারি ক্লাব যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন বড়লাটের এই পত্র থেকে তার সমর্থন মেলে।

এই সাহিত্য সমাজের কর্মধারায় আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল বড়বাজার বিদ্যালয়ের ছাত্রদের শিক্ষায় উৎসাহদানের জন্য পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করা। পুরস্কার-প্রাপ্ত ছাত্রদের মধ্যে বাঙালি ও মাড়োয়ারি উভয় সম্প্রদায়েরই ছাত্র ছিল। এ ছাড়াও এই প্রতিষ্ঠান জনসাধারণকে সাহিত্য, বিজ্ঞানে উৎসাহিত করার জন্য প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছিলেন। সে সময় এই প্রকার প্রতিযোগিতা কলিকাতার বুকে যথেষ্ট আলোড়ন তুলেছিল।[১১৩]

আবার ফিরে আসি মল্লিক পরিবারের কথায়। মতিলাল মল্লিক ছিলেন নিমাইচরণ মল্লিকের অষ্টম বা সর্বকনিষ্ঠ পুত্র। তিনি ৬৭নং পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রিটে নতুন বাসভবন নির্মাণ করেন। এই জায়গাটি

ছিল মল্লিক পরিবারের বাণিজ্য কুঠি। এইখানেই ছিল চৈতন্যদেবের পুথিপাঠের ভক্তগৃহ। কাঠের বাক্সে বহু প্রাচীন পুথির সংগ্রহ ছিল। শোনা যায় সেগুলি চৈতন্যদেবের পঠিত পুথি। সে যুগে রাজারাম মল্লিক তার বাণিজ্য কুঠিতে সযত্নে এই সব বৈষ্ণব পুথি রক্ষা করেছিলেন। যখন তিনি বড়বাজারে বাড়ি করেন তখন এই সব পুথি সেখানে নিয়ে যান। নিমাই মল্লিকের ছোট ছেলে মতিলাল মল্লিক যখন পাথুরিয়াঘাটার বাণিজ্য কুঠিতে গৃহনির্মাণ করেন তখন তিনি সংগৃহীত পুথির সিংহভাগ লাভ করেন। অতঃপর তিনি তাঁর নবনির্মিত বাসভবনে ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে রাধা-শ্যামসুন্দর ও রাজরাজেশ্বর শালগ্রাম শিলা প্রতিষ্ঠা করেন।

নিমাই মল্লিক মৃত্যুকালে উইল করে অন্যান্য পুত্রগণের সঙ্গে সমানভাগে মতিলালকে বহু সম্পত্তি ও তিন লক্ষ টাকা নগদ দিয়ে যান। সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়ে যান জ্যেষ্ঠ দুই পুত্রকে। মতিলাল পিতার এই নির্দেশ মেনে নিতে পারেননি। পিতার মৃত্যুর পর পিতার উইলের প্রতিবাদে মামলা রুজু করেন। বহুদিন এই মামলা চলেছিল। মতিলাল ছিলেন অপুত্রক। তিনি তাঁর শ্যালিকাপুত্রকে পোষ্য গ্রহণ করেন। এই পুত্রই যদুলাল মল্লিক। তাঁর গর্ভধারিণী মাতা রাধারানী আঢ্য। পিতা দয়ালচন্দ্র আঢ্য।

যদুলাল মল্লিক (১৮৪৪-১৮৯৪) মল্লিক বংশের শ্রেষ্ঠ সন্তান। তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা, দেশ ও জনহিতৈষী। বাগ্মী পুরুষরূপেও তাঁর খ্যাতি ছিল। পাথুরিয়াঘাটায় মতিলাল মল্লিকের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে ওরিয়েন্টাল সেমিনারি ও পরে ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু স্কুল থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে এন্ট্রাস পাশ করে প্রেসিডেন্সি কলেজে বি. এ. পর্যন্ত পড়েন। কিছুদিন আইনও অধ্যয়ন করেছিলেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সক্রিয় সদস্য, পরে সভাপতি হয়েছিলেন। এ ছাড়াও আরও বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা পুরসভার সদস্য হন, ওই পদে ১২ বছর অধিষ্ঠিত ছিলেন। শিক্ষার ব্যাপারে উৎসাহী যদুলাল দরিদ্র ছাত্রদের জন্য ওরিয়েন্টাল সেমিনারি স্কুলে একটি অবৈতনিক বিভাগ প্রবর্তন করে ১৫০টি ছাত্রের বিনা ব্যয়ে পঠন-পাঠনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করে দিয়েছিলেন। একসময় আর্থিক বিপর্যয়ের ফলে এই স্কুলটি উঠে যাবার উপক্রম হলে প্রচুর অর্থ দিয়ে এটিকে রক্ষা করেন। হিন্দু স্কুল, ডাফ স্কুল প্রভৃতিতে তিনি একাধিক বৃত্তির ব্যবস্থা করেছিলেন। কেশব একাডেমি উঠে যাওয়ার উপক্রম হলে নিজে বাড়িভাড়া নেওয়া বন্ধ করেন। যদুলালের চেষ্টায় ও পৃষ্ঠপোষকতায় কলিকাতা সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন স্থাপিত হয়। তাঁরই প্রচেষ্টায় কলিকাতার জগন্নাথঘাটটির বিশেষরূপে সংস্কার করা হয়। এ ছাড়াও ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটি ও সুবর্ণবণিক চ্যারিটেবল অ্যাসোসিয়েশন তাঁর দানে পুষ্ট হয়।

১৮৮৮ সালে নতুন আইনে বস্তির দেয় ট্যাক্স জমিদারের কাছ থেকে আদায়ের ব্যবস্থা হয়। যদুলাল এই ব্যবস্থার প্রতিবাদে ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করেন। সে সময় কলিকাতা পুরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন স্যার হেনরি হ্যারিসন। তিনি যদুলালের ঘোড়ার গাড়ি ক্রোক করার আদেশ দেন। প্রতিবাদে যদুলাল হাইকোর্টে পুরসভার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেন। বিচারপতি স্যার ট্রাভেলিয়ান (Sir Travelion) যদুলালকে ২৫০০ টাকা খেসারত মঞ্জুর করেন এবং ওই কাজের জন্য পুরসভাকে তীব্র ভর্ৎসনা করেন। কলিকাতা পুরসভার কমিশনার থাকাকালীন পুরসভাকে তীব্র সমালোচনার জন্য চেয়ারম্যান হ্যারিসন সাহেব তাঁকে 'দি ফাইটিং কক' নাম দিয়েছিলেন। অন্যদিকে বাংলার ছোটলাট স্যার চার্লস ইলিয়টের বিশেষ বন্ধু ছিলেন যদুলাল। তিনি যদুলালকে ডাকতেন 'লর্ড' বলে। এইসময় তিনি বিবাহের সম্মতিদানের আইন, জুরির বিচার প্রভৃতি বিষয়ে তুমুল আন্দোলন করেন। যদুলাল সরকারি সম্মানকে ঘৃণা করতেন। দু'বার রাজা উপাধি প্রত্যাখ্যান করেন।

যদুলাল ছিলেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ স্নেহধন্য। ১৮৮৩ সালের ২২শে জুলাই শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের নিয়ে যদুলালের পাথুরিয়াঘাটার বাড়িতে সিংহবাহিনী প্রতিমাদর্শনের জন্য আসেন। এ বিষয় শ্রীম'র লেখা কথামৃত, ৩য় ভাগ, চতুর্থ খণ্ডে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আছে। যদুলালের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠায় তিনি কয়েকবার সেই বাড়িতে পদার্পণ করেছিলেন।

যদুলালের মা শ্রীরামকৃষ্ণকে বাৎসল্যভাবে ভজনা করতেন। যদুলাল ১নং প্রসন্নকুমার ঠাকুর স্ট্রিটে তাঁদের কুলদেবতা শ্রীশ্রীরাধাশ্যামসুন্দর জীউ ও রাজরাজেশ্বর শালগ্রাম শিলার জন্য ঠাকুরবাড়ি নির্মাণ করে দেন।

যদুলাল মল্লিকের তিন ছেলে—অনাথনাথ, প্রমথনাথ ও মন্মথনাথ। অনাথনাথের একমাত্র পুত্র প্রদ্যুম্ন মল্লিক। তাঁর শখ ছিল কলিকাতার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের বিশাল বিশাল অট্টালিকা ক্রয় করা। এইভাবে তিনি প্রসন্নকুমার ঠাকুরের (৯নং প্রসন্নকুমার ঠাকুর স্ট্রিট) বাড়ি, শ্যাম মল্লিকের বাড়ি (৮৪নং আপার চিৎপুর রোড) এবং হরেন্দ্রকৃষ্ণ শীলের (৮৩নং আপার চিৎপুর রোড) বাড়ি ক্রয় করেন। 'টেগোর ক্যাসেল' মহারাজা প্রদ্যুৎকুমার ঠাকুরের নিকট থেকে ক্রয়ের জন্য বায়না করেন। কিন্তু মহারানীর দরখাস্তে কোর্ট অফ ওয়ার্ড (Court of Wards) তা নামঞ্জুর করেন। গোপালচন্দ্র শীলের কলুটোলার বাড়ি কেনারও উদ্যোগ করেছিলেন বলে শোনা যায়। বাড়ি ছাড়াও গাড়ি কেনারও শখ ছিল। সেকালের কলিকাতায় প্রদ্যুম্ন মল্লিকের ৩৫খানি মোটর গাড়ি ছিল, তার মধ্যে ১০টি রোলস রয়েস (একটি গাড়ির সমস্ত অ্যালুমিনিয়ম ও আরেকটি ছিল সমস্ত পিতলের গাত্র)। শিল্পকলারও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন প্রদ্যুম্ন মল্লিক। পৃথিবীর বহু স্থান থেকে সংগ্রহ করা বহু মূল্যবান দুর্লভ বস্তু ক্রয় করে নিজগৃহে সাজিয়ে রাখতেন। এইভাবে বাড়ি, গাড়ি, দুর্লভ শিল্পসম্ভারের জন্য প্রদ্যুম্ন মল্লিক বিশাল ঋণ জালে জড়িয়ে পড়েন। অবশেষে নিজের মান ও সম্ভ্রম রক্ষার্থে মধুপুরের 'মার্বেল হল' নামে উদ্যান বাড়িতে গিয়ে প্রথমে স্ত্রীকে হত্যা করেন, পরে আত্মহননের পথ বেছে নেন (১১ই এপ্রিল, ১৯৪৩)।

অন্য দিকে যদুলাল মল্লিকের মধ্যম পুত্র প্রমথনাথ মল্লিক (১৮৭৬-১৯৪৩) ছিলেন অন্য ধাতুতে গড়া। শিক্ষা হিন্দু স্কুলে, পরে ইংরেজ শিক্ষকের কাছে উচ্চ ইংরেজি শিক্ষা আয়ত্ত করেন। বাংলা, সংস্কৃত ও ধর্মশাস্ত্রে তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। ধনীর পুত্রদের মতো আমোদপ্রমোদে বৃথা কালক্ষয় না করে বিদ্যা ও কাব্য সাহিত্যচর্চা, ধর্মালোচনা প্রভৃতি কর্মে ব্যাপৃত থাকতেন। তিনি ছিলেন গোঁড়া হিন্দু, অনেকগুলি পুস্তক রচনা ও সম্পাদনা করেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—Annus Mirabilis or India's Chastening in the Midst of Joy (1897), Origin of Caste (1899), The Mahabharata, as it was, is and ever shall be—a critical study (1934), কলিকাতার কথা (১ম ও ২য় খণ্ড) প্রভৃতি।

তিনি সুবর্ণবণিক সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক এবং নিখিল ভারত সুবর্ণবণিক সম্মিলনীর সভাপতি ছিলেন। কলিকাতা পুরসভায় সরকার মনোনীত সদস্য হয়েছিলেন। তাঁরই পরামর্শে কাশীমিত্র শ্মশানঘাটে গাদার মড়া পোড়ানো বন্ধ হয়। হুগলি নদীর তীরে অবস্থিত বাড়িটি মাতৃসেবাসদনের জন্য দান করেন।

৬৭নং পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রিটের বাড়ির বাহির মহল কনিষ্ঠ ভ্রাতা মন্মথনাথের অংশভুক্ত হয়। এই বাড়ির অন্দরমহল ৭নং প্রসন্নকুমার ঠাকুর স্ট্রিটে অবস্থিত। এই অংশ প্রমথনাথের পিতৃহীন নাবালক ভ্রাতুষ্পুত্র প্রদ্যুম্নকুমারের অংশে পড়ে। প্রমথনাথ প্রদ্যুম্নকুমারের অভিভাবক হয়ে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই বাড়িতে বাস করেন। ওই বছরে শ্যামবাজার ট্রাম ডিপোর পাশে ১২৯, কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে প্রাসাদোপম ভবন তৈরি করিয়ে বসবাস শুরু করেন। পূর্বে এই জায়গায় এক বিরাট বস্তি ছিল। এই বস্তির গায়ে যে খালি জমি ছিল তার কিছুটা অংশ নিয়ে তৈরি হয়েছিল হৌস বা সাধারণ স্নানাগার। বাকি অংশ ছিল ট্রাম কোম্পানির ঘোড়ার আস্তাবল, ইলিয়ট কোম্পানির অফিস ছিল দোতলায়, আর ছিল ঈগল কোম্পানির লোহা ঢালাই-এর কারখানা। পরে এইগুলি ভেঙে তৈরি হল বর্তমান শ্যামাবাজার ট্রাম ডিপো আর বস্তি ভেঙে তৈরি হল প্রমথনাথের প্রাসাদতুল্য ভবন। বর্তমানে এই বাড়িতে তাঁর উত্তরপুরুষগণ বাস করেন।

যদুলাল মল্লিকের কনিষ্ঠ পুত্র মন্মথনাথ মল্লিক (১৮৭৯-১৯৪৭)-এর শখ ছিল ব্যক্তিগত এক চিড়িয়াখানা স্থাপনের, আর ছিল তাঁর সঙ্গীতের প্রতি গভীর অনুরাগ। শুঁড়োর বাগানবাড়িতে বহুবিধ দামি পশুপাখি এনে এক চিড়িয়াখানা স্থাপন করেন। এ ছাড়াও আলিপুর চিড়িয়াখানা থেকে ছয় হাজার টাকায় এক জোড়া জেব্রা কিনে উপযুক্ত শিক্ষায় গাড়ি টানার উপযোগী করেন। একটি

কেনার পরে মরে যায়। পরে গাড়ির রং জেব্রার রঙে রাঙিয়ে কলিকাতার রাস্তায় পথচারীর চমক সৃষ্টি করে জেব্রা গাড়ি চালিয়েছিলেন। তাই দেখে The Statesman কাগজ লিখেছিলেন, (৩রা এপ্রিল, ১৯৩৬)—''An Indian Gentleman has trained his Zebra, to draw his carriage and is here seen in his strange Equipage, near the Eden Garden Calcutta.''

মন্মথনাথ ছিলেন একজন জাত সঙ্গীতপ্রেমী। গুণী সঙ্গীত শিল্পীদের কাছে নিয়মিত সঙ্গীতচর্চা করতেন। তাঁর ৬৭নং পাথুরিয়াঘাটার বাড়িতে প্রায় প্রতিদিন রাতে গানবাজনার আসর বসত। মল্লিকবাড়ির সাহিত্য-শিল্প-সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগের ধারা পরবর্তী প্রজন্মেও সঞ্চারিত হয়েছে। মন্মথনাথের পৌত্র রমেন মল্লিক পারিবারিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের দীপশিখাটি আজও জ্বালিয়ে রেখেছেন। তাঁরই সম্পাদনায় 'সাহিত্যতীর্থ' সাহিত্য পত্রিকা একটানা ৩৭ বছর প্রকাশিত হয়ে আসছে। এ ছাড়া তিনি কবি ও সাহিত্যিক হিসাবে সুধীমহলে বিশেষভাবে পরিচিত। তিনি সম্প্রতি লোকান্তরিত হয়েছেন।[১১৪]

যদুলাল মল্লিকের ভদ্রাসনের পশ্চিম ধার দিয়ে যদুলাল মল্লিক রোড প্রসারিত। রাস্তাটি কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা নির্মাণ করেন। এই রাস্তা নির্মাণের জন্য তাঁরা একটি প্রকল্প ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে তৈরি করেন—নাম Scheme No XXVI—Darpanarayan Tagore Street to Pathuriaghat Street—portion of proposed public street No XIV''। এর জন্য মোট ব্যয় ধরা হয়েছিল ৫,৮০,১০০ টাকা (জমির জন্য ৪,৫০,০০০ টাকা এবং তৈরি খরচ ১,৩০,১০০ টাকা)। সরকার এই পরিকল্পনা ১৬ই জানুয়ারি ১৯২৮ সালে অনুমোদন করেন। কাজ শুরু হয় ৭ই জানুয়ারি ১৯২৯ সালে। এই পরিকল্পনার মধ্যে অনেকগুলি রাস্তার সম্প্রসারণ ও সংস্কারের ব্যবস্থা ছিল। যদুলালের নামে নামাঙ্কিত রাস্তাটি কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা Road No I নামে চিহ্নিত করেছিলেন। রাস্তাটি ১৯৩৪ সালে তৈরি হয়ে যায়। কলিকাতা পুরসভা ১১ই জুলাই ১৯৩৪ সালে কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থার কাছ থেকে এটির ভার গ্রহণ করেন। রাস্তাটি ৬০ ফুট চওড়া—যান চলাচলের জন্য ৩৬ ফুট এবং দু'দিকে ১২ ফুট করে ফুটপাতের ব্যবস্থা আছে। এই পথটি দর্পনারায়ণ ঠাকুর স্ট্রিটকে পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রিটের সঙ্গে সংযুক্ত করে। এর ফলে মহর্ষি দেবেন্দ্র রোডের সঙ্গে চিৎপুর রোডের (রবীন্দ্র সরণি) উন্নততর যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপিত হয়। কলিকাতা পুরসভা তাঁদের ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৬ সালের অধিবেশনে Road 1-এর নাম 'যদুলাল মল্লিক রোড' নামাঙ্কিত করেন।[১১৫]

কলিকাতার এক বিশিষ্ট সন্তানের নামে নামাঙ্কিত হয়ে যদুলাল মল্লিক রোড যেমন পরিচিতি লাভ করেছে, অন্য দিকে এই রাস্তায় অবস্থিত দুটি বাড়িতে একদিন নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম বিদ্যালয়ের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল। সে প্রসঙ্গে এবারে আসছি।

১৮ এবং ২০নং যদুলাল মল্লিক রোডে রামকৃষ্ণ মিশনের একটি দরিদ্র ছাত্রদের আবাস ছিল। এই ছাত্রাবাস থেকে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম বিদ্যালয়ের স্বপ্ন ও সিদ্ধি। স্বামী লোকেশ্বরানন্দের কথায়—"এই পাথুরিয়াঘাটা থেকেই নরেন্দ্রপুরের জন্ম হয়। ১৮ এবং ২০ নম্বর যদুলাল মল্লিক রোডের বাড়িতে ছিল এই ছাত্রাবাস। আমি যখন এই ছাত্রাবাসটির দেখাশোনার ভার নিলাম তখন ছাত্র সংখ্যা ছিল ৩০। এখানে যারা থাকত তাদের কাছে কোনওরকম টাকা পয়সা নেওয়া হত না। ছাত্রাবাসের বেশির ভাগ ছাত্রই ছিল মেধাবী। ফলও হত ভাল। ১৯৫৪-৫৫ সনে এই ছাত্রসংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১৬৮তে। কিন্তু স্থানাভাবের জন্য ছাত্রাবাসে থাকতে ইচ্ছুক বহু ছাত্রকে প্রতি বছর ফেরত পাঠাতে হত। এদিকে দেশভাগের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) থেকে বহু ছাত্র আসতে শুরু করল। এই অবস্থা দেখে ভাবলাম একটা বড় জায়গা পেলে আরও বেশি সংখ্যক ছাত্রের পড়াশোনার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

"অবশেষে উদ্বাস্তু ও ত্রাণ দপ্তরের Joint Secretary, A.B. Chatterjee, I.C.S.-এর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁরা কতকগুলো অধিগ্রহণ করা জমি দেখানোর ব্যবস্থা করেন। গড়িয়া ব্রিজ ছাড়িয়ে আরও দক্ষিণে একটা জমি দেখানো হল—নাম উকিল পাইকপাড়া। জমি পছন্দ হল। ১০০ বিঘার মত জায়গা এখানে। উদ্বাস্তু দপ্তরের মন্ত্রী মেহেরচাঁদ খান্না ৪ লাখ ৮০ হাজার টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। ১৯৫৫ সালে গড়িয়ার কাছে উকিল পাইকপাড়া হয়ে গেল নরেন্দ্রপুর।

সরকারিভাবে ১৯৫৭ থেকে এখানে নিয়মিত স্কুলের পড়াশুনার সূত্রপাত।" পাথুরিয়াঘাটায় রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম বিদ্যালয়ের যে বীজটি বপন করা হয়েছিল, সেটি আজ মহীরূহ হয়ে শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয়, সারা ভারতবর্ষে একটি আদর্শ বিদ্যালয়রূপে পরিগণিত হয়েছে।

শিক্ষা-সংস্কৃতিতে, জ্ঞানচর্চায়, পরিশীলিত শিল্পকলায় এবং মানসম্ভ্রমে কলিকাতা তথা ভারতের ইতিহাসে ঠাকুর পরিবার একটি সর্বজন পরিচিত নাম। সরস্বতী ও লক্ষ্মীর আশিসবারি অকৃপণ ধারায় বর্ষিত হয়েছে এই পরিবারের ওপর। জোড়াসাঁকো ও পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর পরিবার পৃথক অঞ্চলে বসবাস করলেও এঁরা সকলেই একই বংশের অন্তর্গত। দুই পরিবারের মিলিত ধারা বাংলার শিল্প-সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতিকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে।

এই ঠাকুর পরিবারের ইতিহাসও বেশ বিচিত্র। এই বংশের আদি নিবাস ছিল যশোরের অন্তর্গত চেঙ্গটিয়া পরগনার বারোপাড়ায়। এঁদের বংশগত উপাধি ছিল কুশারী। এঁরা পিরালি ব্রাহ্মণ। যে সব ব্রাহ্মণ অনিবার্যভাবে কিছু মুসলমানী আচারব্যবস্থা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন, তাঁদেরকে পিরালি ব্রাহ্মণ বলে। এই পরিবারের পঞ্চানন কুশারী সর্বপ্রথম কলিকাতায় আসেন এবং গোবিন্দপুরে ভদ্রাসন নির্মাণ করেন। সে সময় গোবিন্দপুরে ব্রাহ্মণের সংখ্যা ছিল কম। সেখানকার অন্য অধিবাসীরা তাঁদের 'ঠাকুর' বলে সম্বোধন করত। এই ঠাকুরই শেষে হয়ে গেল বংশের পদবি। গোবিন্দপুরে এই ঠাকুর পরিবারের ছিল বসতবাড়ি ও শিব মন্দির।

পঞ্চানন ঠাকুরের (কুশারী) দুই পুত্র—জয়রাম ও রামসন্তোষ, অন্যমতে সন্তোষরাম। ১৭০৭ সালে কলিকাতায় প্রথম জরিপের সময় আমিনের পদ পেয়ে যান দুই ভাই। ২৪ পরগনার জমি বিলি ব্যবস্থায় জয়রাম কোম্পানিকে বহুভাবে সহায়তা করেন। এই সব কর্মকুশলতার ফলে জয়রাম প্রচুর বিত্তশালী হন। তাঁর মৃত্যু হয় ১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দে। কারও কারও মতে ১৭৬২ খ্রিস্টাব্দে।

জয়রামের চার ছেলে—আনন্দীরাম, দর্পনারায়ণ, নীলমণি ও গোবিন্দরাম। প্রথম ও চতুর্থ জনের কোনও বংশ নেই। পলাশী যুদ্ধের পর গোবিন্দপুরে কেল্লা নির্মাণের জন্য জয়রামের বসতবাটি ও বাগানবাড়ি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ক্রয় করলে ভাই নীলমণিকে সঙ্গে নিয়ে দর্পনারায়ণ (১৭৩১-৯৩) পাথুরিয়াঘাটায় চলে আসেন। দর্পনারায়ণ ও নীলমণি দুজনে ১১৬৭ বঙ্গাব্দে ১৩ই চৈত্র রামচন্দ্র কলুর ১০ কাঠা জমি ঘরবাড়িসহ ৫২৫ টাকায় কিনে নেন। পাশেই ছিল জগমোহন দাস সাহার ২ বিঘা ৭ কাঠা জমি এবং বাড়ি। ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে ৯০০০ টাকায় ওই জমি, বাড়ি কিনে নেন।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করেন। নীলমণি কোম্পানির উড়িষ্যা কালেকটারের সেরেস্তাদারের চাকুরি নিয়ে চলে যান। এই কাজে তাঁর প্রচুর অর্থাগম হয়। উপার্জিত অর্থ দর্পনারায়ণকে পাঠিয়ে দিতেন। পরে অর্থ নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটে। শেষে মীমাংসা হলে নীলমণি এক লক্ষ টাকার বিনিময়ে পৈতৃক সম্পত্তি ত্যাগ করলেন। সপরিবারে চলে এলেন জোড়সাঁকোতে (১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে)। সঙ্গে নিয়ে এলেন লক্ষ্মী-জনার্দন শিলা।

বড়বাজারের বৈষ্ণবচরণ শেঠ মেছুয়াবাজারে এক বিঘা নিষ্কর জমি নীলমণিকে গৃহ নির্মাণের জন্য দান করেন। ব্রাহ্মণ হয়ে শূদ্রের দান গ্রহণে তিনি অসম্মত হন। বৈষ্ণবচরণ ওই জমি নীলমণির গৃহদেবতা জনার্দনকে দান করেন। এইভাবে ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে জোড়াসাঁকোয় ঠাকুর পরিবারের পত্তন হয়। সে সময় এ অঞ্চলকে মেছুয়াবাজার বলা হত। এরপর নীলমণি আরও কয়েকটি বাড়ি কেনেন, পুরানো বাড়ি ভেঙে নতুন বাড়ি করেন। প্রচুর বিত্তের অধিকারী হলেও সদাচারীরূপে তাঁর খ্যাতি ছিল। দ্বারকানাথ, দেবেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ এই বংশের সুসন্তান। নীলমণি ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে মারা যান।

দর্পনারায়ণ পাথুরিয়াঘাটায় ঠাকুর বংশের সূত্রপাত করেন। সেকালের কলিকাতায় তিনি একজন কৃতবিদ্য সম্ভ্রান্ত পুরুষ। ইংরেজি ও ফরাসি ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। দর্পনারায়ণ প্রথমে ছিলেন চন্দননগরে ফরাসিদের দেওয়ান, পরে হুইলার সাহেবের দেওয়ানি ও নানাবিধ ব্যবসার দ্বারা তিনি বিপুল বিত্তের অধিকারী হন। তালতলা বাজার, রাধাবাজারে তাঁর জমিজমা ছিল। সেই সময়

নাটোরে জমিদারিসমূহ বিক্রি হতে থাকায় দর্পনারায়ণ রংপুরে এক বিশাল জমিদারি ক্রয় করেন। দর্পনারায়ণের সাত পুত্র—রাধামোহন, গোপীমোহন, কৃষ্ণমোহন, হরিমোহন, প্যারীমোহন, লাডলিমোহন আর মোহিনীমোহন। এঁদের মধ্যে রাধামোহন ও কৃষ্ণমোহনকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা হয়।

পাথুরিয়াঘাটায় দর্পনারায়ণের নামে 'দর্পনারায়ণ টেগোর স্ট্রিট' অবস্থিত। রাস্তাটি দর্মাহাটা স্ট্রিট (এখন মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড) থেকে আরম্ভ হয়ে পূর্ব দিকে প্রসারিত হয়ে যদুলাল মল্লিক রোডে এসে পড়েছে। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে আপজনের কলিকাতা মানচিত্রে রাস্তাটি দেখানো নেই। লটারি কমিটির প্রয়োজনে শক সাহেব কলিকাতার যে মানচিত্র (১৮২৫-১৮৩২) প্রকাশ করেন তাতে দর্পনারায়ণ টেগোর স্ট্রিট নামে নামাঙ্কিত পথটি চিহ্নিত আছে। সম্ভবত ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে রাস্তাটি নির্মিত হয়ে থাকবে। সে সময় রাস্তাটি ছিল খুবই সঙ্কীর্ণ। কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা যদুলাল মল্লিক রোড নির্মাণের সময় দর্পনারায়ণ টেগোর স্ট্রিটের পূর্বাংশ প্রশস্ত করার ব্যবস্থা করেন।

দানবীর, যশস্বী, শিক্ষাব্রতী ও সঙ্গীতপ্রেমী গোপীমোহন (১৭৬০-১৮১৯) দর্পনারায়ণের দ্বিতীয় পুত্র। তিনিও পিতার মতো ব্রিটিশ সরকারের অধীনে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এ ছাড়াও ব্যবসা-বাণিজ্য করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। গোপীমোহনের বিদ্যাবত্তা ছিল বহুমুখী। সংস্কৃত, উর্দু, ফারসী, ইংরেজি, ফরাসি ও পতুর্গিজ ভাষায় তাঁর বিশেষ অধিকার ছিল। ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের জন্য হিন্দু কলেজ স্থাপনের সময় এককালীন দশ হাজার টাকা দান করেন এবং ওই কলেজের বংশানুক্রমিক গভর্নর (Hereditary Governor) পদ লাভ করেন। হিন্দু কলেজের কৃতী ছাত্রদের বহুবিধ বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। অনেক দরিদ্র ছাত্র তাঁর ব্যয়ে প্রতিপালিত হত। প্রচুর অর্থব্যয় করে মূলাজোড় গ্রামে দ্বাদশ শিবমন্দির ও ব্রহ্মময়ী দেবী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। অতিথি ভবন ও মন্দিরের ব্যয় নির্বাহের জন্য বহু সম্পত্তি দান করেন।

সঙ্গীতের প্রতি গোপীমোহনের ছিল অসাধারণ অনুরাগ। স্বয়ং গীত রচনা করতেন। সঙ্গীতশিল্পী ও বাদ্য শিল্পীদের প্রতি ছিল তাঁর গভীর শ্রদ্ধা। তাই নিজ বাসভবনে (৬৫নং পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রিট) সৃষ্টি করলেন সঙ্গীতসভা। সে সভা আলো করে বসতেন গায়ক সজ্জু খাঁ, অন্ধগায়ক লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস, মৃদঙ্গাচার্য লালা কেবল কিষণ আর সঙ্গীতাচার্য কালী মির্জা। এই কালী মির্জার নামের মধ্যে লুকিয়ে আছে এক অপঠিত ইতিবৃত্ত।

সেকালের কলিকাতায় কালী মির্জা ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীতশিল্পী। বাংলাভাষায় রাগ সঙ্গীত রচয়িতা, টপ্পা গানে নিধুবাবুর পূর্বসূরি। তাঁর প্রকৃত নাম কালিদাস চট্টোপাধ্যায় (১৭৫০-১৮২০)। পিতা বিজয়রাম চট্টোপাধ্যায়। হুগলি জেলার গুপ্তিপাড়ায় আনুমানিক ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান, সংস্কৃতশাস্ত্র ও সাহিত্য নিয়ে অধ্যয়ন করলেও তাঁর মন বাঁধা পড়েছিল সঙ্গীতে। ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিক্ষালাভের জন্য বারানসী রওনা হন। সেখানে বেদান্ত শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ধ্রুপদ, টপ্পা, ঠুংরি, গজল প্রভৃতি সঙ্গীতের বিভিন্ন শাখায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। কাশী থেকে দিল্লি, সেখান থেকে লক্ষ্ণৌ। ফারসী ও উর্দু ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞদের কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করে স্বগ্রামে ফিরে আসেন। তখন তাঁর নাম কালী মির্জা। ফারসী ভাষায় 'মীরজ' কথার অর্থ হচ্ছে রাজপুত্র ; অভিজাত ও সম্ভ্রান্তদের মীরজ বলা হয়ে থাকে। দিল্লি আর লক্ষ্ণৌতে থাকার সময় নবাবি বেশভূষা, চালচলন ও ফারসীভাষায় দক্ষতার জন্য 'কালী মির্জা' নামে আখ্যাত হন। বাংলাদেশে টপ্পা গানের গায়ক ও রচয়িতা হিসাবে তিনি পথিকৃৎ। বাংলা ভাষায় তিনি প্রথম রাগসঙ্গীত রচনা করেন। তিনি প্রথম গায়ক যাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল বাংলা ভাষায় খেয়াল টপ্পার মধুময় গান। কালী মির্জা ছিলেন বাংলার প্রথম পেশাদার সঙ্গীতজ্ঞ ও সঙ্গীতাচার্য। তিনি রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গীতগুরু ছিলেন।

এর পরে কালী মির্জার দিগ্বিজয়ের পালা। গুপ্তিপাড়া ছেড়ে প্রথমে বর্ধমানের কুমার প্রতাপচন্দ্রের দরবারের সভাগায়ক হয়েছিলেন। পরে চলে আসেন কলিকাতায়। পাথুরিয়াঘাটায় গোপীমোহন ঠাকুরের বাড়িতে জীবনের শেষ কয়েকটা বছর কেটেছিল। জীবনে প্রতিষ্ঠা, সুনাম, অর্থ, স্নেহ, ভালবাসা, সম্মান সবই তিনি পেয়েছিলেন গোপীমোহনের প্রাসাদে বাস করার সময়। গোপীমোহন

ও কালী মির্জার মধ্যে গড়ে উঠেছিল এক গভীর প্রীতির সম্পর্ক। গোপীমোহন তাঁকে মূলাজোড়ের ব্রহ্মময়ীর মন্দিরে মাঝে মাঝে নিয়ে যেতেন বিগ্রহের সামনে গান গাইবার জন্য। কালী মির্জা নিজের লেখা শ্যামাসঙ্গীত প্রাণভরে গাইতেন।

শেষ বয়সে সকল প্রিয়জনকে হারিয়ে কালী মির্জা কাশীবাসী হতে মনস্থ করেন। অবশেষে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে গোপীমোহনের আশ্রয় ও আনুকূল্যে কাশীবাসী হন। সেখানে রামনগরের রাজা উদিতনারায়ণের সভায় বিশিষ্ট গুণীদের সামনে সঙ্গীত পরিবেশন করে সকলকে মুগ্ধ করে রেখেছিলেন। কাশীযাত্রার মাত্র দু'বছর পরে ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে কাশীতে দেহরক্ষা করেন। 'গীতলহরী' কালী মির্জার রচিত। এই পুস্তকে তাঁর দু'শোটি গান আছে।

গোপীমোহনের কথায় আবার ফিরে আসা যাক। অনেক ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, ঘটক তাঁর নির্দিষ্ট বৃত্তিতে নিয়মিত প্রতিপালিত হতেন। ব্যায়ামচর্চার প্রতি তাঁর যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। সেকালের প্রসিদ্ধ লাঠিয়াল ও কুস্তিগীর রাধা গোয়ালা তাঁর বেতনভোগী ছিল।

গোপীমোহনের ছয় পুত্র—সূর্যকুমার, চন্দ্রকুমার, নন্দকুমার, কালীকুমার, হরকুমার ও প্রসন্নকুমার। প্রথম চারজন নিঃসন্তান ছিলেন।

দর্পনারায়ণের চতুর্থপুত্র হরিমোহন সেকালের কলিকাতায় একজন গণ্যমান্য পুরুষ ছিলেন। ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেসে যে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয় তার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হরিমোহন। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এডওয়ার্ড হাইড ইস্ট এবং গভর্নর জেনারেল মারকুইস অফ হেস্টিংস স্বদেশে ফেরার প্রাক্কালে তাঁদের উভয়কে বিদায় সম্ভাষণ ও তাঁদের প্রতিমূর্তি স্থাপনের জন্য টাউন হলে যে সভা হয়েছিল তার অন্যতম আহ্বায়ক হরিমোহন। আদবকায়দায় সাহেবি ভাবাপন্ন হলেও তিনি ছিলেন গোঁড়া হিন্দু। প্রত্যহ তিন চারবার গঙ্গাস্নান করতেন। ধর্মসভার সক্রিয় সদস্য ছিলেন। সতীপ্রথা রোধের জন্য যে আইন প্রণয়ন করা হয় তা বাতিল করার জন্য ধর্মসভা আপিল করতে মনস্থ করেন। সেই আপিল রচনার জন্য যে ১২ জন গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে কমিটি গঠিত হয়, হরিমোহন ছিলেন তার অন্যতম সদস্য। বিলাসব্যসনে বহু অর্থ ব্যয় করলেও জনহিতার্থে নানা আন্দোলনের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। গঙ্গাসাগর উপদ্বীপে লোকবসতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে সরকার থেকে আবাদের ব্যবস্থা করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। হরিমোহন ওই কমিটিতে থেকে প্রকল্প রূপায়ণে তৎপর হন। রাজা গোপীমোহন দেব এবং হরিমোহন উভয়ে মিলিতভাবে সাগরদ্বীপের উত্তর-পশ্চিম কোণে গঙ্গার তীরে আড়াই ক্রোশ জমি নিয়ে আবাদের ব্যবস্থা করেছিলেন।[১১৬] ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি হরিমোহনকে 'রাজা' খেতাব দিয়েছিলেন। হরিমোহনের একমাত্র পুত্র উমানন্দ। তিনি ছিলেন এক্সপোর্ট ওয়েরহাউসের দেওয়ান।

পাথুরিয়াঘাটায় হরিমোহনের নামে 'হরিমোহন টেগোর লেন' নামে একটি গলিপথ আছে। এই পথটি মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড থেকে শুরু হয়ে প্রায় সোজা পূর্ব দিকে এগিয়ে রঘুনন্দন লেনে এসে পড়েছে।

হরকুমার ও প্রসন্নকুমার স্বনামধন্য পুরুষ। হরকুমার ঠাকুর (১৭৯৮-১৮৫৮) গোপীমোহনের পঞ্চম পুত্র। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃত চর্চার পারিবারিক আবহাওয়ায় লালিত হরকুমার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কাছে সংস্কৃত ও বেদান্ত দর্শন অধ্যয়ন করেন। আর ইংরেজি শিক্ষালাভ করেন শেরবোর্ন সাহেবের বিদ্যালয় ও হিন্দু কলেজে। বিভিন্ন শাস্ত্র, পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থাদি থেকে সংকলন করে 'হরতত্ত্বদীধিতি' ও 'পুরশ্চরণ বোধিনী' বিদ্বৎসমাজে হরকুমারের স্থায়ী কীর্তিরূপে সমাদৃত। শব্দকল্পদ্রুম গ্রন্থ সংকলন কালে রাজা রাধাকান্ত দেবকে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। ভারতীয় সঙ্গীত ও রাগরাগিণী বিষয়ে হরকুমারের ছিল গভীর জ্ঞান। বিবিধ রত্ন ও শালগ্রাম শিলার বিশুদ্ধতা বিচারের একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। মূল্যবান রত্ন সংগ্রহ করে একটি সংগ্রহশালা তৈরি করেছিলেন। এ ছাড়াও ছিল পারিবারিক গ্রন্থাগারে অমূল্য দুর্লভ সংস্কৃত পুথির সংগ্রহ। যতীন্দ্রমোহন ও শৌরীন্দ্রমোহন তাঁর দুই কৃতী পুত্র।

হরকুমারের নামে তালতলা অঞ্চলে একটি উদ্যান আছে—নাম হরকুমার টেগোর স্কোয়ার। এটি

১ বিঘা ২ কাঠা ২ ছটাক জমির ওপর অবস্থিত। উদ্যানের চারিধারের রাস্তাও তাঁর নামে নামাঙ্কিত। যতীন্দ্রমোহন ও শৌরীন্দ্রমোহন উদ্যানের সমগ্র জমি দান করেন। এই দানের একটি শর্ত ছিল যে ওই জমির ওপর যে উদ্যান নির্মিত হবে তা অবশ্যই তাঁদের স্বর্গত পিতা হরকুমার ঠাকুরের নামে নামাঙ্কিত করতে হবে। কলিকাতা পুরসভা এই শর্ত মেনে জমি গ্রহণ করে উদ্যান নির্মাণ করেন। শর্ত অনুসারে ৬ই জুন ১৮৮৯ সালের পৌর অধিবেশনে নবনির্মিত উদ্যান এবং তার পাশের রাস্তা হরকুমার ঠাকুরের নামে নামাঙ্কিত করা হয়। উদ্যানটি ৪০নং হরকুমার টেগোর স্কোয়ারে অবস্থিত।

গোপীমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র হলেন প্রসন্নকুমার (১৮০১-৬৮)। শিক্ষা শেরবোর্ন স্কুলে ও হিন্দু কলেজে। দেশীয় স্মৃতি ও পাশ্চাত্য ব্যবহারশাস্ত্রে জ্ঞান থাকায় সদর দেওয়ানি আদালতে ওকালতি শুরু করেন। অল্প দিনে যশ ও অর্থ লাভ করেন। এরপর সরকারি উকিল নিযুক্ত হন। পারিবারিক ব্যবসা ও ভূসম্পত্তির তত্ত্বাবধানের জন্য ১৮৫০ সালে ওই পদ পরিত্যাগ করেন। ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে লর্ড ডালহৌসি ব্যবস্থাপক সভা গঠন করলে প্রসন্নকুমার তার ক্লার্ক অ্যাসিস্ট্যান্ট নিযুক্ত হন। শিক্ষা-বিস্তারেও তাঁর অগ্রণী ভূমিকা ছিল। পারিবারিক সূত্রে হিন্দু কলেজ পরিচালনা (১৮৩২-১৮৫০) ছাড়াও স্কুল সোসাইটি, বেনিভোলেন্ট সোসাইটি ও হিন্দু ফ্রি স্কুলে অর্থ ও পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেন। মেয়েদের স্কুল-কলেজে গিয়ে শিক্ষালাভের পক্ষপাতী ছিলেন না। স্কুলে, কলেজে মেয়েদের শিক্ষালাভের বিরুদ্ধাচরণ করলেও নিজের মেয়ে ও নাতনিদের বাড়িতে অতি উত্তম উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। রক্ষণশীল হিন্দু বলেই রামমোহনের সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনে অংশ নেন, কিন্তু গঙ্গাসাগরে সন্তান নিক্ষেপ ও বহুবিবাহ-এর বিপক্ষে ছিলেন। দ্বারকানাথের সঙ্গে জমিদার সভা ও ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সভা প্রতিষ্ঠা করে তিনি তার সভাপতি হন (১৮৬৭)। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলিকাতা পুরসভার সভ্য ছিলেন। তিনি বাংলা 'অনুবাদক' এবং ইংরেজি 'রিফর্মার' (১৮৩১) পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ছিলেন। বাংলার নাট্যজগতের ইতিহাসে প্রসন্নকুমারের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। তিনি তাঁর শুঁড়োর বাগানবাড়িতে প্রথম বাঙালি রঙ্গমঞ্চ 'হিন্দু থিয়েটার' স্থাপন করেন। এখানেই প্রথম অভিনীত হয় উইলসনকৃত ইংরেজিতে অনুবাদ উত্তররামচরিত এবং শেক্সপীয়ারের জুলিয়াস সীজার (২৮-১২-১৮৩১)।

প্রসন্নকুমারের দান ছিল ব্যাপক। নেটিভ হাসপাতাল (বর্তমান মেয়ো হাসপাতাল)-এর তিনি ছিলেন সক্রিয় গভর্নর। তাঁর উদার ও নিঃস্বার্থ দান না পেলে গরানহাটা শাখা ডিসপেন্সারি বহু পূর্বেই লুপ্ত হয়ে যেত। দিনাজপুর, রংপুর ও বগুড়া জেলায় তাঁর জমিদারি ছিল। এই সব জেলার আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের উন্নতির জন্য করতোয়া নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তিনি লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করেন। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের ১৩ই মে ইস্টার্ন ক্যানেলের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার তাঁর প্রতিবেদনে বলেছিলেন, প্রসন্নবাবু নদীটিকে সারা বছর নাব্য রাখার জন্য যে চেষ্টা করেছিলেন তা সত্যই প্রশংসার্হ। এ ছাড়াও তাঁর বহু দান ছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ৩ লক্ষ টাকা দিয়ে যান। ওই টাকার সুদে আইন অধ্যাপক পদ প্রবর্তিত হয়। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : An Appeal to Countrymen, Table of Succession according to the Hindu Law of Bengal.

প্রসন্নকুমার ঠাকুর ৯নং প্রসন্নকুমার ঠাকুর স্ট্রিটে বাস করতেন। পরবর্তীকালে এই ভবনটি প্রদ্যুম্ন মল্লিক কিনে নেন। প্রসন্নকুমারের বৈঠকখানা বা কাছারি বাড়ি ছিল ১২ ও ১৩ নং প্রসন্নকুমার ঠাকুর স্ট্রিটে। কে. সি. এস. আই. উপাধি পাবার পর মহারাজা যতীন্দ্রমোহন এই বৈঠকখানা বাড়ি ভেঙে ফেলে সেখানে 'টেগোর ক্যাসেল' তৈরি করেন, সে কথায় আমরা পরে আসছি।

প্রসন্নকুমারের দুই কন্যা—সুরসুন্দরী ও মায়াসুন্দরী এবং এক পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর (১৮২৬-১৮৯০)। হিন্দু কলেজে জ্ঞানেন্দ্রমোহনের সহপাঠী ছিলেন রাজনারায়ণ বসু, তরু দত্তের পিতা গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রমুখ। তাঁর প্রথমা স্ত্রী বলসুন্দরী (১৮৩৩-৫২) মারা গেলে তিনি খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত হন ও রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা কমলমণিকে (১৮৩৭-৬৯) বিবাহ করেন। এর গর্ভে জ্ঞানেন্দ্রমোহনের দুই পুত্র প্রসন্নকুমার ও বরেন্দ্রমোহন ও তিন কন্যা নিতেন্দ্রবালা, নগেন্দ্রবালা ও সত্যেন্দ্রবালা জন্মগ্রহণ করেন। পুত্র দুটি ও প্রথমা কন্যা

অকালে মারা যান। শেষের দুই কন্যা জীবিত ছিলেন।

১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে অসুখের চিকিৎসা করাতে জ্ঞানেন্দ্রমোহন সস্ত্রীক ইংল্যান্ডে যান। আরোগ্য-লাভের পর লন্ডন ইউনিভারসিটি কলেজে হিন্দু আইন ও বাংলা ভাষার অধ্যাপক হন। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে লিঙ্কনস্ ইন থেকে ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। জুডিশিয়ারির ইতিহাসে তিনি প্রথম এশিয়ান ব্যারিস্টার।

প্রসন্নকুমার পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহনকে খ্রিস্টান হওয়ায় উইল করে সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেন এবং ভ্রাতুষ্পুত্র যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে যান।

উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গদেশের সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের দিকপাল, ভূস্বামী সমাজের নেতা ও সাহিত্য-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক যতীন্দ্রমোহন (১৮৩১-১৯০৮) হরকুমার ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র। হিন্দু কলেজে পড়া শেষ করে স্বগৃহে ইংরেজ শিক্ষকের কাছে ইংরেজি ও পণ্ডিতের কাছে সংস্কৃত শেখেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংবাদ প্রভাকরে কবিতা ও লিটারারি গেজেটে প্রবন্ধাদি লিখতেন। তাঁরই চেষ্টায় ও উৎসাহে এদেশে থিয়েটার এবং ঐকতান বাদনের সূত্রপাত হয়। সঙ্গীতমনা যতীন্দ্রমোহনের আগ্রহে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর দ্বারা ঐকতান বাদনপ্রণালী এদেশে প্রথম সৃষ্ট হয় (১৮৫৮)। বহু বাদ্যযন্ত্রের কুশলী শিল্পী ছিলেন তিনি। দাতা হিসাবে তাঁর সুনাম ছিল। মেয়ো হাসপাতাল, দাতব্য সভা প্রভৃতিতে এবং বিধবাদের দুঃখ দূর করার জন্য তিনি এক লক্ষ টাকা দান করেছিলেন। এ ছাড়াও বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে অনেক অর্থ দান করেন। তাঁর উদ্যোগে 'Settled Estate Act' এদেশে প্রচলিত হয়। ছোটলাটের শাসন পরিষদের (১৮৭০) ও পরে উপর্যুপরি কয়েকবার বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক ও সভাপতি, শিক্ষা কমিশন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, যাদুঘর প্রভৃতি বহু শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি রাজাবাহাদুর (১৮৭১) ও মহারাজা (১৮৭৭) খেতাব পান। ১৮৯১ সালে এই খেতাব বংশানুক্রমিক বলে স্বীকৃত হয়।

ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষায় যতীন্দ্রমোহনের বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। অল্প বয়সে লিখিত কাব্য ও গল্প সংগ্রহ 'ফ্লাইটস্ অফ ফ্যান্সি', বিদ্যাসুন্দর নাটক এবং স্তব ও সংগীতের সঙ্কলন "গীতিমালা" তাঁর সাহিত্যকীর্তির পরিচায়ক। যতীন্দ্রমোহনের একটি বহুমূল্য গ্রন্থসংগ্রহশালা ছিল। তাঁরই উৎসাহে ও অর্থানুকূল্যে মধুসূদনের 'তিলোত্তমাসম্ভব' প্রকাশিত হয়। নানা জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। যতীন্দ্রমোহন ছিলেন নিঃসন্তান। তিনি তাঁর ভাই শৌরীন্দ্রমোহনের একমাত্র পুত্র প্রদ্যোৎকুমারকে দত্তক গ্রহণ করেন।

চড়কডাঙ্গায় দুর্গ ভবন (Tagore Castle) নির্মাণ যতীন্দ্রমোহনের জীবনে শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য কীর্তি। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে পাথুরিয়াঘাটার আদি ঠাকুরবাড়ির সামনে এই প্রকারের ভবন নির্মাণ করতে মনস্থ করেন যতীন্দ্রমোহন। এটি হবে তাঁর বৈঠকখানা বাড়ি ও গ্রীষ্মাবাস। চেহারা হবে ইউরোপীয় দুর্গের মতো। ম্যাকিন্টশ বার্ন কোম্পানি ইংল্যান্ড থেকে এই বাড়ির নকশা তৈরি করে আনেন। বাড়ির সম্মুখভাগ ও মধ্যেকার চুড়ো হবে ইংল্যান্ডের রাজপ্রাসাদ Windsor Castle-এর মতো। চুড়োটি ১০০ ফুট উঁচু হবে, মাথায় থাকবে পতাকা দণ্ড। এই বাড়ির নির্মাণ সম্বন্ধে ২৪শে অক্টোবর ১৮৯৫ খ্রিঃ The Statesman পত্রিকায় এই প্রকার সংবাদ প্রকাশিত হয় :

"Maharaja Sir Jatindra Mohan Tagore has made a new departure in the way of buildings for his old residence of native noblemen in India having his old Baitakhana or Summer residence changed so as to represent an English Castle. The design and plan have been specially brought from England by Messrs Mackintosh Burn & Co, who have the contract and the work for demolition and construction is being carried out fast. The entire frontage will be a representation of a castle in accordance with the engineer's plan and the entire tower will represent that of Windsor Castle and will be a hundred feet in height with Flag Staff on the top. There will be a clock tower at the entrance with an illuminated chiming clock which

is being brought out by Messrs. Martin and Co. The building is to be named 'Tagore Castle' and will be the summer residence of the Maharaja. When completed 'Tagore Castle' which of course will be appropriately furnished, will be one of the show places of Calcutta.''

১৮৯৬ খ্রিঃ দুর্গভবনের নির্মাণ কার্য সমাপ্ত হয়। এরপর এটি ঠাকুর পরিবারের অতিথিশালা হিসাবে ব্যবহার হতে থাকে। পরবর্তীকালে এই ভবন ঠাকুর পরিবারের জমিদারি দপ্তরখানা হয়। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে এই ভবন মুন্দ্রা পরিবারের অধিকারে আসে। এখনও তাঁদের দখলে আছে।

এই স্থাপত্যশৈলীর স্মরণে কলিকাতার একটি পথকে নামাঙ্কিত করার প্রয়োজন দেখা দেয়। দুর্গভবনের পিছনে ছিল চড়কডাঙ্গা স্ট্রিট। সে সময় চড়কডাঙ্গা স্ট্রিট ছিল অত্যন্ত অপ্রশস্ত। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর রাস্তাটি চওড়া করার জন্য অর্ধেক ব্যয় বহনে সম্মত হন। কলিকাতা পুরসভা আরও অর্ধেক অর্থ দিয়ে রাস্তাটি প্রশস্ত করেন। যতীন্দ্রমোহনের কীর্তির স্মরণে কলিকাতা পুরসভা তাঁদের ২৬শে জুন ১৯০৭ খ্রিঃ অধিবেশনে চড়কডাঙ্গা স্ট্রিটের নাম পরিবর্তন করে 'টেগোর ক্যাসেল স্ট্রিট' নামাঙ্কিত করেন। সে সময় রাস্তাটি নিমতলা ঘাট স্ট্রিট থেকে শুরু হয়ে দক্ষিণে কিছুদূর এগিয়ে বন্ধ হয়ে যায়।

প্রায় এক দশক বাদে ওই অঞ্চলে নতুন একটি রাস্তা নির্মাণের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। প্রস্তাবিত নতুন রাস্তা নির্মাণের জন্য ২৩/১, ২৮/২, ২৮/৩, ৩২/১, টেগোর ক্যাসেল স্ট্রিটের বাড়ির মালিকেরা বিনামূল্যে জমি দিতে অঙ্গীকার করে। রাস্তাটি ২০ ফুট চওড়া হবে। এটি পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত হয়ে টেগোর ক্যাসেল স্ট্রিটকে ব্রজকুমার শেঠ লেনের সঙ্গে সংযুক্ত করবে। জমি দানের সঙ্গে জমির মালিকদের এক শর্ত ছিল যে নবনির্মিত রাস্তাটি টেগোর ক্যাসেল স্ট্রিট নামাঙ্কিত হবে। রাস্তাটি নির্মিত হলে পর ৯ই মে ১৯১৭ সালের পৌর অধিবেশনে এটিকে টেগোর ক্যাসেল স্ট্রিট নামাঙ্কিত করা হয়।[১১৭] এইভাবে কলিকাতার এক প্রাচীন পথ চড়কডাঙ্গা স্ট্রিট কলিকাতার বুক থেকে মুছে গেল।

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের কীর্তির সঙ্গে তাঁর নিজের নামও যুক্ত হয়ে আছে কলিকাতার রাস্তাঘাটের ইতিহাসের সঙ্গে। ১৯০৫ সালের কথা। নিমতলাঘাট স্ট্রিটের অনতিদূরে ছিল জোড়াবাগান বস্তি। এই বস্তির জন্য অঞ্চলটি ছিল অত্যন্ত ঘিঞ্জি। নোংরা ও পুতিগন্ধে ভরা। জনস্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই অস্বাস্থ্যকর ছিল। জনস্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে পুরসভা বস্তি উচ্ছেদে তৎপর হন। ৩রা জুন ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের পৌর অধিবেশনে ১,৮৬,৭৪১ টাকা বস্তিটি উচ্ছেদের জন্য মঞ্জুর করা হয়। এই অর্থে বস্তি উচ্ছেদ করে একটি উদ্যান নির্মাণ করা হবে। বস্তির জমি অধিগ্রহণ করা হলে পর তার মধ্যে যে সব ঘরবাড়ি ছিল, একটি দোতলা বাড়ি রেখে, আব সব মেসার্স ম্যাকেঞ্জি লয়াল অ্যান্ড কোম্পানিকে ১২ই ডিসেম্বর ১৯০৩ খ্রিঃ বিক্রি করে দেওয়া হয়।

ওই পাকা দোতলা বাড়িটি ছিল বস্তির উত্তর দিকে, পুরসভার ইচ্ছে ছিল বাড়িটি সংস্কার করে একটি প্যাভিলিয়ন অথবা সাধারণ গ্রন্থাগার নির্মাণ করা। এই কারণে বাড়িটি রক্ষার ব্যবস্থা হয়েছিল।[১১৮] উদ্যানটি নির্মিত হলে পর এটি জোড়াবাগান পার্ক নামে পরিচিত হয়।

এই পার্কটি নির্মাণের বছর তিরিশ বাদে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নামে নামকরণের এক প্রস্তাব আসে। পুরসভা তাঁদের ২৬শে ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের অধিবেশনে উদ্যানটি 'মহারাজা যতীন্দ্রমোহন টেগোর স্কোয়ার' নামাঙ্কিত করেন।[১১৯] উদ্যানটি ২নং বৈষ্ণব শেঠ স্ট্রিটে অবস্থিত। এর জমির পরিমাণ ৫ বিঘা ১২ কাঠা ১৪ ছটাক। এই উদ্যান থেকে টেগোর ক্যাসেলের দূরত্ব খুব বেশি নয়।

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের জীবনের এক বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘটনা উল্লেখ করে এ কাহিনী শেষ করব। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের একমাত্র পুত্র ছিলেন জ্ঞানেন্দ্রমোহন। রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা কমলমণিকে বিবাহ করেন জ্ঞানেন্দ্রমোহন এবং সেই সঙ্গে খ্রিস্টান হন। প্রসন্নকুমার ঠাকুর পুত্রের এই ধর্মত্যাগ সহ্য করতে না পেরে ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করে সমস্ত বিষয়সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করলেন। ভাই হরকুমার ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র যতীন্দ্রমোহনকে সব দান করলেন।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন এই বঞ্চনা মেনে নিতে পারেননি। সম্পত্তির অধিকারী হয়েও পিতার ক্রোধে

স্বর্ণকুমারী দেবীর মতো সেকালের কলিকাতার অভিজাত নাগরিকগণ এই সমিতির সদস্য হয়েছিলেন। সভ্যদের অনুরোধে তিনি অনেক অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়েছিলেন— সে সব কথা প্রায় সকলেরই জানা।[১২২]

সেকালের গণ্যমান্য বহু ইংরেজ ও বিদেশি রাজপুরুষ যেমন এসেছিলেন, এদেশীয় বহু মানভাজন ব্যক্তিদের আগমনে ধন্য হয়েছিল এই ভবন। পরবর্তীকালে বাংলার সমাজ সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত এমন একটি ঐতিহাসিক প্রাসাদ অবাঙালির কাছে হস্তান্তরিত হয়ে গেল।

পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর পরিবার ছাড়াও জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের কীর্তিমান সুসন্তান প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮১৭-১৯০৫) নামে দীর্ঘ একটি রাজপথ এ অঞ্চলে আছে। পূর্বে রাস্তাটির নাম ছিল দরমাহাটা স্ট্রিট। লটারি কমিটির প্রয়োজনে শক (I.P.Schalch) ও প্রিন্সেপ (Capt. T. Princep) সাহেব শহর কলিকাতার যে মানচিত্র (১৮২৫-৩২) প্রকাশ করেন, তাতে সর্বপ্রথম এই রাস্তাটি চিহ্নিত হতে দেখা যায়। সম্ভবত এই রাস্তাটি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে নির্মিত হয়ে থাকবে।

'দরমাহাটা' নামকরণ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেন লিখেছেন : "বড়বাজারে দরমা হাটায় একদা দরমা অর্থাৎ চাঁচ, চিক, ঝুড়ি প্রভৃতি পেতে বাঁশের তৈরি জিনিসের হাট বসত— তাই থেকে এ অঞ্চলের নাম হয় দরমাহাটা।" এই অঞ্চলের মধ্য দিয়ে রাস্তাটি প্রসারিত হয়েছিল বলে এটির নাম হয়েছিল দরমাহাটা স্ট্রিট। সে সময় দরমাহাটা স্ট্রিটে কোনও ফুটপাত ছিল না। ১৮৯০-৯১ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা পুরসভার জেনারেল কমিটির প্রতিবেদনে দেখা যায় যে এই রাস্তার পূর্ব দিকে নতুন ফুটপাত নির্মাণের জন্য এবং পশ্চিম দিকে চ্যানেল ও কার্ব স্টোন (Channel and Kerb Stone) বসাবার জন্য ৭১৬৫ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করা হয়। প্রথম দিকে দরমাহাটা স্ট্রিট ছিল খুবই অপ্রশস্ত। যেহেতু এই পথটি ব্যবসা-বাণিজ্যের অন্তর্গত ঘিঞ্জি এলাকার মধ্য দিয়ে প্রসারিত, তাই এটিকে প্রশস্ত করার ব্যাপারে নানা বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল পুরসভাকে। ১১ই জুলাই ১৯৩৪ সালের কলিকাতা পুরসভার প্রতিবেদনে দেখা যায় যে বাঁশতলা স্ট্রিট থেকে শোভারাম বসাক স্ট্রিট পর্যন্ত প্রসারিত দরমাহাটা স্ট্রিটকে ৫০ ফুট প্রশস্ত করার অনুমোদন দেওয়া হয়। ওই সঙ্গে উত্তর দিকে কালীকৃষ্ণ টেগোর স্ট্রিট পর্যন্ত দরমাহাটা স্ট্রিটকে প্রশস্ত করারও নির্দেশ দেওয়া হয়। পুরসভার এই নির্দেশের ফলে দরমাহাটা স্ট্রিটের দু' ধারে ৯ ফুট চওড়া ফুটপাত এবং যান চলাচলের জন্য ৩২ ফুট প্রশস্ত রাখার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু বড়বাজার এলাকায় দরমাহাটা স্ট্রিটের প্রস্থ একভাবে রাখা সম্ভব হয়নি। সেখানে অতিরিক্ত জায়গা অধিগ্রহণের অসুবিধার জন্য পূর্বদিকের ফুটপাত খুবই সঙ্কুচিত করা হয়।

১৯৩৬ সালে কলিকাতা পুরসভায় দরমাহাটা স্ট্রিটের নাম পরিবর্তন করে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে নামাঙ্কিত করার এক প্রস্তাব আসে। তৎকালীন পুরসভার কাউন্সিলার ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ ও মিঃ ডি. জি. কোহেন এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মন্তব্য করেন যে দরমাহাটা স্ট্রিট কলিকাতার একটি প্রাচীন পথ। কলিকাতার ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত। এইভাবে রাস্তার নাম পরিবর্তন মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নামে যে কোনও নবনির্মিত রাস্তা নামাঙ্কিত করা যেতে পারে। তাঁদের এই মন্তব্য সত্ত্বেও ১৭ই মে ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের অধিবেশনে কলিকাতা পুরসভা দরমাহাটা স্ট্রিটের নাম বদলে 'মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড' নামকরণ করেন।[১২৩] রাস্তাটি শোভাবাজার স্ট্রিট থেকে শুরু হয়ে মীরবহর ঘাট স্ট্রিট পর্যন্ত প্রসারিত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নামে আরেকটি রাস্তা আছে, নাম 'মহর্ষি লেন'। রাস্তাটি মহর্ষি ভবনের পিছনে অবস্থিত।

ব্রাহ্মসমাজের সুপ্রসিদ্ধ নেতা, ব্রাহ্মধর্মের অন্যতম প্রবর্তক ও রাজা রামমোহন রায়ের স্নেহধন্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর পরিবারের দর্পনারায়ণের ভাই নীলমণির বংশধর। নীলমণির চতুর্থ পুত্র রামলোচন তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামমণির জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বারকানাথকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। দ্বারকানাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র হলেন দেবেন্দ্রনাথ। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে পিতামহীর মৃত্যুতে তাঁর মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়। সেই সময়

থেকে তাঁর মনে ধর্মজিজ্ঞাসা প্রবল হয়ে উঠে এবং বেদান্তচর্চায় ব্রতী হন। বেদান্ত তাঁর অধ্যাত্মচিন্তাকে প্রভাবিত করে। তিনি ধীরে ধীরে ব্রাহ্মধর্মের নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। দেবেন্দ্রনাথের এই অধ্যাত্মচিন্তা তাঁর সামাজিক দায়-দায়িত্বের প্রতি অবহেলা প্রকাশ করতে শিক্ষা দেয়নি। ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে কার ঠাকুর কোম্পানি ও ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হওয়ায় দেবেন্দ্রনাথ পাওনাদারদের যাবতীয় ঋণ তাঁদের সম্মতি নিয়ে কিস্তিতে শোধ দেবার ব্যবস্থা করেন। এর জন্য প্রায় কুড়ি বছর আর্থিক কৃচ্ছ্রতা সহ্য করতে হয়।

দেবেন্দ্রনাথ তাঁর অধ্যাত্মবাদকে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে, লোকহিতকর কাজে প্রয়োগ করেছিলেন। ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে ৬ই অক্টোবর তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠা করেন। এর মাধ্যমে 'বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার প্রচারে' মনোযোগ দেন। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে তিনি তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাও প্রবর্তন করেন। এই পত্রিকায় ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে থেকে ঋগ্‌বেদের অনুবাদ প্রকাশ করেন।

নিরাকার ব্রহ্মের আরাধনায় নিয়োজিত থেকেও দেবেন্দ্রনাথ সেকালের সামাজিক আন্দোলনে অংশ নিতে ইতঃস্তত করেননি। ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টান মিশনারিদের দ্বারা এদেশীয়দের খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করার বিরুদ্ধে তিনি তীব্র আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এর ফলে হিন্দু-হিতার্থী বিদ্যালয় নামে একটি অবৈতনিক উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে ১লা মার্চ স্থাপিত হয়। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দের ২৯শে অক্টোবর কলিকাতায় ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন স্থাপিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ এর প্রথম সম্পাদক হন। তিনি হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ সভারও সভ্য ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় এবং অর্থানুকূল্যে নবগোপাল মিত্র ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে 'ন্যাশানাল পেপার' নামে একখানি সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। নবগোপাল মিত্র যে হিন্দুমেলা নামে একটি স্বদেশি প্রতিষ্ঠানের সূচনা করেন এবং হিন্দুমেলার অন্তর্গত ন্যাশানাল সোসাইটির কাজ শুরু করেন তাতে দেবেন্দ্রনাথের সহানুভূতি ছিল যথেষ্ট। এখানেই শেষ নয়। দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের অনুপ্রেরণায় ব্রাহ্মসমাজ কতকগুলি নতুন সমাজহিতকর কাজে হাত দেন। এর একটি অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা। দেবেন্দ্রনাথের অর্থানুকূল্যে এবং কেশবচন্দ্রের পরিচালনায় ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে ১৫ই আগস্ট ইন্ডিয়ান মিরর পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। এই পত্রিকার প্রথম সম্পাদক পরবর্তীকালে বিখ্যাত ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ। কেশবচন্দ্র সেনের কয়েকটি সমাজসংস্কারমূলক কাজে দেবেন্দ্রনাথের সম্মতি না থাকায় কেশবচন্দ্র তাঁকে পরিত্যাগ করে ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় থেকে দেবেন্দ্রনাথের প্রবর্তিত সমাজ 'আদি ব্রাহ্ম সমাজ' নামে পরিচিত হয়। এটি চিৎপুর রোডে (এখন, রবীন্দ্র সরণি) অবস্থিত।

দানেও দেবেন্দ্রনাথ সিদ্ধহস্ত ছিলেন। পিতা দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর তিনি পিতার প্রতিশ্রুতি মতো এক লক্ষ টাকা সুদ সমেত (১ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা) অন্ধ আতুরদের সেবার জন্য ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটির হস্তে অর্পণ করেন। এ ছাড়াও তিনি প্রচুর অর্থ দান করেন। বাষ্পের সাহায্যে বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য যশোর নিবাসী সীতানাথ ঘোষকে তিনি ৭ হাজার টাকা দেন। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ মন্দির নির্মাণকল্পে একই পরিমাণ অর্থ দান করেন।

পারিবারিক ও ধর্মীয় ব্যাপারে সকল কাজ অপরের হাতে তুলে দিয়ে দেবেন্দ্রনাথ অতঃপর ধর্মচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। ধর্ম উপাসনার একটি প্রকৃষ্ট ক্ষেত্ররূপে বর্তমান শান্তিনিকেতন স্থানটি বাছাই করে নেন। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে ৮ই মার্চ একটি ট্রাস্ট ডিড্ করে শান্তিনিকেতন পরিচালনার সুব্যবস্থা করেন। পরবর্তীকালে পুত্র রবীন্দ্রনাথ যা বিশ্বভারতীতে রূপান্তরিত করেন।

পাথুরিয়াঘাটায় ছিল আরেক খ্যাতিমান কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবারের আবাসভূমি। এই পরিবারের সুসন্তান রাজা বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়। হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম এবং প্রথম সম্পাদক হয়েছিলেন ওই কলেজের। এক হিসাবে তিনি এদেশে জনসাধারণের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের অন্যতম পথিকৃৎ। হিন্দু কলেজ স্থাপনের বিষয়ে বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় এক বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। সে প্রসঙ্গ কম আকর্ষণীয় নয়।

মেজর বামনদাস বসু তাঁর "Education in India under East India Company." পুস্তকে

লিখেছিলেন যে রামমোহন রায়ই হিন্দু কলেজের আদিকল্পক। তাঁর এই উক্তির স্বপক্ষে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড হাইড ঈস্টের একখানি দীর্ঘ পত্রের কিছু অংশ উদ্ধৃত করেছিলেন। পত্রখানি ছিল হিন্দু কলেজ স্থাপনের ইতিহাস সম্পর্কীয়। অংশটুকু এইরূপ—

''...About the beginning of May (1816), a Brahmin of Calcutta, whom I knew, and who is well known for his intelligence and active interference among the principal Native inhabitants, and also intimate with many of our own gentlemen of distinction called upon me and informed me, that many of the leading Hindus were desirous of forming an establishment for the education of their children in a liberal manner...''

এখানে 'a Brahmin of Calcutta whom I knew'' হাইড ঈস্টের পত্রে এই লেখায় বিভ্রান্তি দেখা দেয়। মেজর বামনদাস বসু তাঁর ওই পুস্তকে ''a Brahmin of Calcutta'' বলতে রাজা রামমোহন রায়কে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 'a Brahmin of Calcutta' যাঁর সঙ্গে হাইড ঈস্টের পরিচয় ছিল (whom I knew) তিনি যে রামমোহন রায় নন, তা হাইড ঈস্টের পত্রের নীচের অংশ পাঠ করলে জানা যায়—

''I do not know I observed what Rammohan's religion is...not being acquainted or having had any communication with him.'' পত্রের এই অংশটুকু মেজর বসু তাঁর পুস্তকে উল্লেখ করেননি। এখন প্রশ্ন হাইড ঈস্টের ''a Brahmin of Calcutta whom I knew...'' তবে কে ? হাইড ঈস্টের এই বক্তব্য যে রামমোহন রায়ের আত্মীয় সভার অন্যতম সভ্য রাজা বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়কে (হাইকোর্টের পরলোকগত বিচারপতি অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পিতামহ) উদ্দেশ্য করে লিখেছিলেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। শিবনাথ শাস্ত্রী হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে লিখেছেন :

"আত্মীয় সভার অন্যতম সভ্য বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় এই প্রস্তাব তদানীন্তন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার হাইড ঈস্ট মহোদয়ের নিকট উপস্থিত করেন এবং তাঁহার উৎসাহ ও যত্নে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।" [১২৪]

প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর রচিত 'David Hare' পুস্তকে বৈদ্যনাথ মুখার্জি সম্বন্ধে লিখেছেন, ''Baidyanath Mukherjee in those days used to visit the big officials. When he paid his respects to Sir Hyde East he was requested to ascertain, whether his countrymen were favourable to the establishment of a College for the education of the Hindu Youth, in English literature and science. He sounded the leading members of the Hindu Society and reported to Sir Hyde East that they were agreeable to the proposal.''

এই সকল মন্তব্য থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠায় অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি আদিকল্পক নন। নভেম্বর ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় সেকালের কলিকাতায় একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। এদেশীয় লোকদের বিদ্যানুশীলন ও জ্ঞানোপার্জনের জন্য যে গৌড়ীয় সমাজ স্থাপিত হয়েছিল তিনি তার সক্রিয় সদস্য ছিলেন। তিনি ধর্মসভারও সদস্য ছিলেন। হিন্দু কলেজ স্থাপনের সময় তিনি নানাভাবে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে ওঠায় সাহায্য করেছিলেন। এক সময় এই কলেজের সম্পাদকও হয়েছিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণ মুখার্জির নামে পাথুরিয়াঘাটায় একটি গলিপথ আছে।

লক্ষ্মীনারায়ণের পুত্র বিচারপতি অনুকূলচন্দ্র ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে পাথুরিয়াঘাটায় জন্মগ্রহণ করেন। ৮ বছর বয়সে গোবিন্দ বসাকের বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে বৃত্তিলাভ করেন। ফারসী ও সংস্কৃত ভাষায় তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল।

আর্থিক চাপে লেখাপড়া ত্যাগ করে তাঁকে চাকুরির চেষ্টা করতে হয়। যদিও তাঁর পিতা বিপুল

অর্থ রেখে গিয়েছিলেন, তাঁর জ্যাঠামশাই ফাটকায় সমস্ত অর্থ নষ্ট করেন। সে সময় হাওড়া কালেক্টরের অফিসে নাজিরের পদে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা হয়। অনুকূলচন্দ্র ওই পরীক্ষা দিয়ে প্রথম হয়ে ওই পদ লাভ করেন। তিনি ওই পদে পাঁচ বছর চাকুরি করেছিলেন।

সদর দেওয়ানি আদালতের বিচারক ছিলেন মিঃ অ্যাবারক্রম্বি ডিক (Mr. Abercrombie Dick)। তিনি মুখার্জি পরিবারের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। অনুকূলচন্দ্রকে তিনি আইন অধ্যয়নের পরামর্শ দিলেন। ১৮৫৫-য় তিনি আইন পরীক্ষা দিয়ে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন এবং সদর দেওয়ানি আদালতে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। ধীরে ধীরে আইন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে প্রচুর অর্থ, সম্মান, যশের অধিকারী হন। যে প্রচুর অর্থ তিনি উপার্জন করেছিলেন, তার অধিকাংশই সাধারণের দুঃখদুর্দশা লাঘবে ব্যয় করতেন। ১৮৬৮ সালে ফ্যাকাল্‌টি অফ ল (Faculty of Law)-এর সদস্য নির্বাচিত হন। ওই বছর তিনি সরকারি উকিল নিয়োজিত হন। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হন। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন। জীবনের শেষ ছ' বছর তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। ১৯ আগস্ট ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুর ৬৫ বছর পরে কলিকাতা পুরসভা ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৬ সালের অধিবেশনে পাথুরিয়াঘাটায় একটি রাস্তার নাম তাঁর নামে 'অনুকূল মুখার্জি রোড' নামাঙ্কিত করেন। রাস্তাটি কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা নির্মাণ করেন। এটি পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রিট থেকে শুরু হয়ে দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে নতুন C.I.T. রোডে এসে মিশেছে।[১২৫]

## চড়কডাঙ্গা, জোড়াবাগান ও পাথুরিয়াঘাটা অঞ্চলের রেখাচিত্র

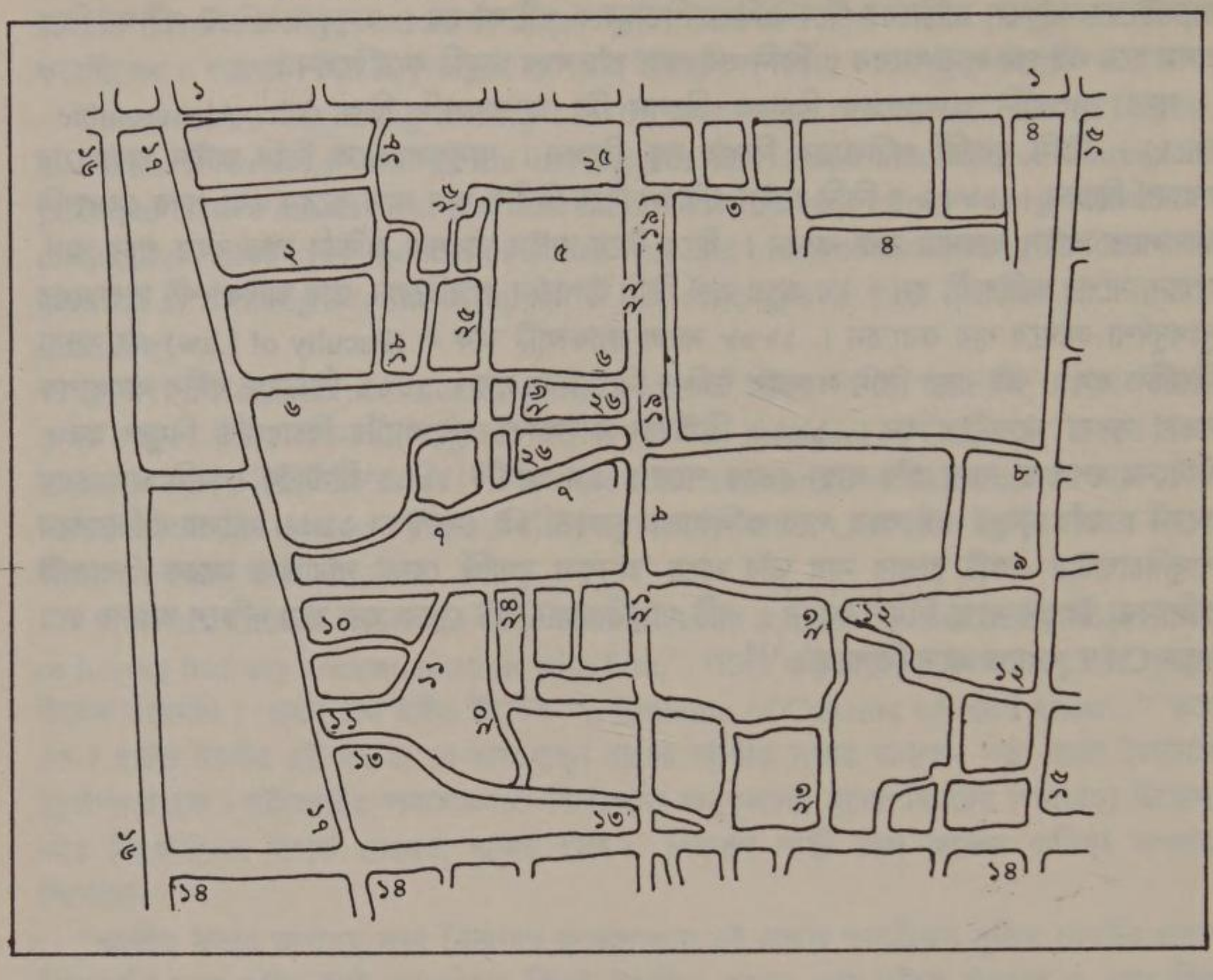

১ নিমতলা ঘাট স্ট্রিট
২ রাধাকৃষ্ট শেঠ লেন
৩ ব্রজকুমার শেঠ লেন
৪ টেগোর ক্যাসেল স্ট্রিট
৫ যতীন্দ্রমোহন টেগোর স্কোয়ার
৬ জোড়াবাগান স্ট্রিট
৭ মণ্ডল স্ট্রিট
৮ প্রসন্নকুমার ঠাকুর স্ট্রিট
৯ পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রিট
১০ হরিমোহন ঠাকুর লেন
১১ রঘুনন্দন লেন
১২ খেলাত ঘোষ লেন
১৩ দর্পনারায়ণ ঠাকুর স্ট্রিট
১৪ কালীকৃষ্ণ ঠাকুর স্ট্রিট
১৫ রবীন্দ্র সরণি
১৬ স্ট্র্যান্ড রোড
১৭ মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড
১৮ রাম শেঠ রোড
১৯ বৈষ্ণব শেঠ ফার্স্ট লেন
২০ যদুনন্দন গোস্বামী লেন
২১ যদুলাল মল্লিক রোড
২২ বৈষ্ণব শেঠ স্ট্রিট
২৩ ব্রজদুলাল স্ট্রিট
২৪ অনুকূল মুখার্জ্জী রোড
২৫ হরলাল দাস লেন
২৬ সুজন শেঠ লেন

## তথ্যসূত্র


১ The Proceedings of the meeting of the C.M.C dt. 1.8.1900
২ Ram Gopal Sanyal, Reminiscenes and Anecdotes of Great Men of India, Calcutta, Vol. II, p. 59-60.
৩ Meeting of the C.M.C. General Committee. dt. 14.9.1900.
৪ আমার দেখা কোলকাতা—প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, পৃ. ১
৫ The proceedings of the meeting of Calcutta Mpl. Corpn. dt. 12.10.1909
৬ আমার দেখা কোলকাতা—প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় এবং অতিরিক্ত তথ্য শ্রীঅরুণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে—
৭ The Cal. Mpl. Gazette-3.9.1938, pp. 512-13.
৮ পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, ২য় খণ্ড, অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত, পৃ ৪৪-৪৫
৯ সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড,—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৪৭৪
১০ The Proceedings of the Meeting of the Calcutta Corpn. dt. 16.9.1960
১১ দর্জিপাড়া মিত্র বংশ পরিচয়ের কয়েক অধ্যায় ।
১২ The Proceedings of the C.M.C meeting dt. 13.11.1912
১৩ সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান
১৪ তদেব ।
১৫ Salient Indians in Salem by John. T. Reid, Span, December 1961.
অতিরিক্ত তথ্য—কেশবেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র ও মন্মথকৃষ্ণ মিত্রের সৌজন্যে ।
১৬ The Proceedings of the meeting of the Calcutta Municipal Corpn. dt. 10.7.1907
১৭ মদন গোপাল দে-এর আত্মজীবনী
১৮ ভারতকোষ, ৩য় খণ্ড ।
১৯ The Proceedings of the meeting of the Cal. Corpn. dt. 30.7.1934.
২০ কলিকাতা সেকালের ও একালের—হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, পৃ ৫১৬ ।
২১ A Short History of Calcutta—A.K. Roy, p. 76
২২ Bengal & Agra Directory of 1850, p.490
২৩ Calcutta Old & New—Cotton p. 246
২৪ The Statesman dt. April 30. 1879
২৫ The Proceedings of the meeting of the C.M.C. dt. 17.7.1912
২৬ Calcutta Old & New—Cotton, p. 240
২৭ প্রবাসী, ১৩৬৪
২৮ The Cal. Mpl. Gazette dt. 31.7.1937, p-426
২৯ সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান
৩০ তরী হতে তীর—হীরেন মুখোপাধ্যায়
৩১ তদেব
৩২ Wednesday, T.S., June 6th 1888
৩৩ সাজঘর—ইন্দ্র মিত্র এবং অতিরিক্ত তথ্য শ্রদ্ধেয় নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্তের সৌজন্যে ।
৩৪ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ (৪র্থ ভাগ) —শঙ্করীপ্রসাদ বসু, পৃ. ১৮১
৩৫ স্মৃতিকথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ, মাসিক বসুমতী, ১৩৪৩ ফাল্গুন
৩৬ স্বামী অভেদানন্দের জীবনস্মৃতি—নারায়ণচন্দ্র গুহ রায় ।
৩৭ Echoes from Old Calcutta—Busteed
৩৮ তদেব ।
৩৯ A Short History of Calcutta—A.K. Roy
৪০ The Calcutta Mpl. Gazette, dt. 5.1.1946
৪১ Calcutta Old & New—Cotton.
৪২ The Calcutta Mpl. Gazette, dt. 5.1.1946
৪৩ The Proceedings of the meeting of Cal. Corpn. dt. 24.8.1956
৪৪ From under a Neem Tree to Lyons Range—Goutam Mukhopadhyay, The Statesman, dt. 20.6.1983
৪৫ The Bengal & Agra Annual Guide and Gazetteer for 1841, Vol I, Part III
৪৬ কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত—বিনয় ঘোষ, পৃ. ৬১০
৪৭ Fort William-India House Correspondence, Vol XX, pp. 222-23
৪৮ The Proceedings of the meetings of C.M.C dt. 8.1.13. 25.2.14, 17.3.15
৪৯ The Proceedings of the meeting of Cal. Corpn. dt. 30.3.37.
৫০ কলিকাতার ইতিবৃত্ত—প্রাণকৃষ্ণ দত্ত,
The Calcutta Municipal Corpn. Adm. Report, 1881

৫১ বিবেকানন্দ পরিকর কিরণচন্দ্র দত্ত— তৎকালীন সমাজ : সনৎ মুখোপাধ্যায় ও মঞ্জু দত্ত
৫২ ঐ
৫৩ ঐ
৫৪ The Proceedings of the meeting of the Cal. Mpl. Corp. dt. 29.7.1914.
৫৫ ভারতকোষ— ৫ম ভাগ।
৫৬ বাঙালি বৌদ্ধদের প্রতিষ্ঠান—অমলেন্দু চৌধুরী
৫৭ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার— চিন্ময় চক্রবর্তী
৫৮ ভারতকোষ—৫ম খণ্ড
৫৯ The Proceedings of the meeting of the Cal. Corp. dt. 1.6.1956.
৬০ কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত—বিনয় ঘোষ
৬১ সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান
৬২ The Proceedings of the meeting of the Cal. Corp. dt. 23.11.1941.
৬৩ The Proceedings of the C.M.C. meeting dt. 29.3.1916.
৬৪ Simms's Report, p-5.
৬৫ Gentleman's Magazine, 1794.
৬৬ সুকিয়া বিবি ও সুকিয়া স্ট্রীট— বিমলাচরণ লাহা, আর্য্যাবর্ত, শ্রাবণ ১৩১৯
৬৭ Sookeas Street and its associations— Prof. Suniti Kr. Chatterjee, C.M. Gazette dt. 18.2.1928.
৬৮ শৈশব স্মৃতি— সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, শারদীয়া বসুমতী, ১৩৫৮
৬৯ কলিকাতা দর্পণ, কলিকাতায় বিদ্যাসাগর— রাধারমণ মিত্র
৭০ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়— ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবাসী ১৩৫৪
৭১ রম্য আমন্ত্রণ— বারিদবরণ ঘোষ, কলেজস্ট্রীট, আশ্বিন ১৩৯২
৭২ তদেব
৭৩ কলিকাতা দর্পণ— রাধারমণ মিত্র
৭৪ সুকুমার রায়— জীবনের কালানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জি সংকলন : সিদ্ধার্থ ঘোষ— এক্ষণ, বার্ষিক সংখ্যা, ১৩৯৩।
৭৫ চিত্রে ননসেন্স ক্লাব— দেশ, ৬/৯/১৯৮৬
৭৬ রম্য আমন্ত্রণ— বারিদবরণ ঘোষ, কলেজস্ট্রীট, আশ্বিন, ১৩৯২
৭৭ কলিকাতা দর্পণ—রাধারমণ মিত্র।
৭৮ আমার কাল আমার দেশ— সুধীরচন্দ্র সরকার, পৃঃ ১০৫-১০৮
৭৯ ঠিকানা কলকাতা— সুনীল মুন্সী
৮০ ৩০০ বছরের কলকাতা—অতুল সুর
৮১ ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী— যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩৬৪
৮২ ভারতকোষ— ৫ম ভাগ
৮৩ Cal. Municipal Gazette, dt. 22.1.1927.
৮৪ কলিকাতার ইতিবৃত্ত—প্রাণকৃষ্ণ দত্ত
৮৫ A Short History of Calcutta—A.K. Roy, p. 111
৮৬ কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা—মহেন্দ্রনাথ দত্ত
৮৭ স্বামী বিবেকানন্দ—ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত
৮৮ " "
৮৯ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান—মহেন্দ্রনাথ দত্ত
৯০ প্রাতঃস্মরণীয় তারকনাথ প্রামাণিক—পঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ, পৃ. ৬৫
৯১ বাংলাদেশের সঙ প্রসঙ্গে—বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়
৯২ C.M. Gazette Notification dt. 2.6.1966
৯৩ The Proceedings of the meeting of Cal. Corpn. dt. 16.8.1939
৯৪ " " " Cal. Municilpal Corpn. dt, 12,8,14
৯৫ সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান
৯৬ A Short History of Calcutta.—A.K. Roy
৯৭ কলিকাতা দর্পণ—রাধারমণ মিত্র, পৃ. ২৭৩
৯৮ কলিকাতাস্থ তন্তুবণিক জাতির ইতিহাস—নগেন্দ্রনাথ শেঠ, পৃ. ৩১, ১০৯
৯৯ কলিকাতা দর্পণ—রাধারমণ মিত্র, পৃ. ২৭৫
১০০ বাংলা সাময়িক পত্র, ১৮১৮-৬৭—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১০১ তথ্য পাথুরিয়াঘাটার রমেন মল্লিক মহাশয়ের সৌজন্যে
১০২ যতীন মুখার্জি ও মানবেন্দ্রনাথ—পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, দেশ ১৩/৬/৮৭
১০৩ Calcutta in the olden time—its localities.—Reverend J. Long.
১০৪ টাউন কলকাতার কড়চা—বিনয় ঘোষ
১০৫ The Proceedings of the meeting of the Calcutta Municipal Corporation. dt. 15.2.1890

১০৬ The Proceedings of the meeting of the Calcutta Municipal Corpn. dt. 4.2.1914
১০৭ কলিকাতাস্থ তন্তুবণিক জাতির ইতিহাস—নগেন্দ্রনাথ শেঠ
১০৮ বাঙালী প্রতিষ্ঠিত ধর্মশালা—প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩৪৩।
১০৯ সঙ্গীতের আসর—দিলীপ মুখোপাধ্যায়
১১০ কলিকাতার কথা—প্রমথনাথ মল্লিক।
১১১ Some Glimpses into Forgotten India—Sir Evan Cotton,
Bengal Past & Present XXIV
১১২ কলিকাতার কথা—প্রমথনাথ মল্লিক
১১৩ সুবর্ণবণিক কথা ও কীর্তি
১১৪ কলিকাতার ইতিবৃত্ত—প্রাণকৃষ্ণ দত্ত। কলকাতা কল্পতরু—রমেন মল্লিক
বংশগৌরব—রাসবিহারী মল্লিক
বৈশ্য ইতিহাস— ঐ
১১৫ The Proceedings of the Meeting of the Cal. Corpn. dt. 9. 9. 1936
১১৬ সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১১৭ The Proceedings of the meeting of the Cal. Municipal Corpn. dt. 9.5.1917.
১১৮ The Proceedings of the meeting of the General Committee dt. 12.10.1906.
১১৯ The Proceedings of the meeting of the Calcutta Corpn. dt. 26.2.1936.
১২০ ভারতকোষ, সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান, সংবাদপত্রে সেকালের কথা— ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১ম ও ২য়)
১২১ The Proceedings of the meeting of the Cal. Corpn. dt 17.5.37.
১২২ কলকাতায় ভূত— সুভাষ সমাজদার
১২৩ The Proceedings of the meeting of the Cal. Corpn. dt. 11.7.1934 & 17.5.1937
১২৪ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী
১২৫ Proceedings of the meeting of the Cal. Corpn. dt. 9.9.36.,
Forgotten Citizen of Calcutta— Onoocool Chandra Mukherjee, Cal. Municipal Gazette, 10.11.36.,
সংবাদপত্রে সেকালের কথা ১ম ও ২য়— ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

## ৩৩

# ১৯২৩— পৌর আইন—পটভূমি ও বৈশিষ্ট্য

১৮৯৯ সালে ম্যাকেঞ্জি আইন গৃহীত হওয়া থেকে ১৯২৩ সালের কলিকাতা পৌরসভা আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার মধ্যবর্তী কালের ব্যবধানে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আকাশে দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। বঙ্গভঙ্গ, স্বদেশি আন্দোলন, বয়কট আন্দোলন, খিলাফত আন্দোলনের ফলে দেশ শাসনের ক্ষমতা ও দায়িত্ব ইংরেজ আমলাতন্ত্রের হাত থেকে অনেকটাই ভারতবাসীদের হাতে ন্যস্ত হয়। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন (মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার আইন) অনুসারে সরকারের কতকগুলি বিভাগের শাসনভার ভারতীয় মন্ত্রীদের হাতে অর্পণ করা হয়। সে সময়ে বাংলা সরকারের জনস্বাস্থ্য ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হলেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, একদা যিনি ১৮৯৯ সালের পৌর আইনের (ম্যাকেঞ্জি অ্যাক্ট) প্রতিবাদে তৎকালীন ২৭ জন পৌর প্রতিনিধিদের সঙ্গে স্বয়ং কলিকাতা পৌরসভার কমিশনারের পদ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। ভারতের ভাগ্যবিধাতার অঙ্গুলি হেলনে তাঁরই হাতে অর্পিত হল বঙ্গদেশের স্বায়ত্তশাসন বিভাগ। সুরেন্দ্রনাথের ঐকান্তিক আগ্রহে এবং আন্তরিক প্রয়াসে ১৯২৩ সালে নতুন কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন বিধিবদ্ধ হয়। এই আইনের বলে কলিকাতার পৌরসভার স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ শুরু হল। তাই স্যার সুরেন্দ্রনাথকে বর্তমান কলিকাতা কর্পোরেশনের জনক বলা হয়।

১৯২৩ খ্রিঃ নতুন কলিকাতা পৌর আইনের বিশেষত্ব হল—ম্যাকেঞ্জির আইনে যেভাবে নির্বাচিত পৌর প্রতিনিধিদের সংখ্যা ও ক্ষমতা হ্রাস করা হয়েছিল, ১৯২৩ খ্রিঃ নতুন আইনে ওই প্রতিনিধিদের সংখ্যা বাড়ানো হয় এবং কর্পোরেশনের কার্য পরিচালনার প্রায় সমস্ত ক্ষমতা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ন্যস্ত করা হয়, যদিও সরকারের হাতে কোনও কোনও বিষয়ে কিছু ক্ষমতা থেকে যায়। এই আইনের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি এইরূপ—

১। কাশীপুর, মানিকতলা, গার্ডেনরীচ মিউনিসিপ্যালিটি এবং টালিগঞ্জ ও বেহালা মিউনিসিপ্যালিটির কিছু অংশ কলিকাতা পৌর এলাকার অন্তর্ভুক্ত হয়।

২। কলিকাতার পুরানো এলাকা ১৮$\frac{৩}{৪}$ বর্গমাইলের সঙ্গে নতুন ১১$\frac{৩}{৪}$ বর্গমাইল যোগ হয়ে নতুন কলিকাতা পৌর এলাকা ৩০$\frac{১}{২}$ বর্গমাইল দাঁড়াল।

৩। ওয়ার্ডের সংখ্যা ২৫ থেকে ৩২ করা হয়।

৪। কর্পোরেশনের সভ্য সংখ্যা ৯০ করা হয়। এঁদের মধ্যে করদাতাদের দ্বারা নির্বাচিত সভ্যসংখ্যা ৬৩ (তার মধ্যে ১৫ জন মুসলমান), সরকার মনোনীত ১০, বেঙ্গল চেম্বার ৬ জন, কলিকাতা ট্রেডস অ্যাসোসিয়েশান ৪ জন ও পোর্ট কমিশনারের ২ জন—মোট ৮৫ জন। এই ৮৫ জন পৌর প্রতিনিধি কলিকাতা পৌরসভার প্রথম মিটিং-এ বাইরে থেকে ৫ জন অল্ডারম্যান নির্বাচিত করবেন। এই ৯০ জন কাউন্সিলার ও অল্ডারম্যান নিয়ে ১৯২৪ সালে কর্পোরেশন গঠিত হয় এবং ১ এপ্রিল ১৯২৪ থেকে তাঁদের কার্য শুরু করেন। পরবর্তী সংশোধিত আইনে পৌরসভার সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৯৮ জন হয়, তার মধ্যে কাউন্সিলার ৯৩ জন ও অল্ডারম্যান ৫ জন। কিং জর্জ ডককে বাদ দিয়ে বাকি গার্ডেনরীচ এলাকা পৃথক গার্ডেনরীচ মিউনিসিপ্যালিটিতে পরিণত হয়।

৫। এই নতুন আইনে কলিকাতা পৌরসভায় মেয়র ও ডেপুটি মেয়র নির্বাচনের ব্যবস্থা হয়। ১৯২৪ খ্রিঃ এপ্রিল মাসে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ কলিকাতার প্রথম মেয়র এবং মিঃ এইচ এস সুরাবর্দী প্রথম ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হন।

৬। এই আইনে কলিকাতা পৌরসভার প্রধান কর্মকর্তা এবং তাঁর অধীনস্থ অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগের ক্ষমতা পৌরসভাকে দেওয়া হয়। কেবল প্রধান কর্মকর্তা, দুইজন সহকারী কর্মকর্তা, হেল্‌থ অফিসার ও চিফ ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ গভর্নমেন্টের সম্মতিসাপেক্ষ। অন্যদিকে ১৮৯৯ সালের আইনে সরকারই কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা নিয়োগ করতেন। নতুন পৌর আইন অনুসারে ১৯২৪ সালের মে মাসে শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু কলিকাতা পৌরসভার প্রথম প্রধান কর্মকর্তা নিযুক্ত হন। ছয় মাসের মধ্যেই তিনি কারারুদ্ধ হন।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে নতুন পৌর আইনে কলিকাতাকে ৩২টি পল্লীতে ভাগ করা হয়। বিভাগীয় কার্য পরিচালনার সুবিধার জন্য এই পল্লীগুলিকে আবার ৪টি জেলায় ভাগ করা হয়েছে :

| জেলা | | পল্লী |
|---|---|---|
| ১নং জেলা (District Office) | | ১নং পল্লী থেকে ৬ নং পল্লী এবং ৩০ নং, ৩১ নং ও ৩২ নং পল্লী |
| ২ নং জেলা | ,, | ৭ নং থেকে ১২ নং এবং ২৮ ও ২৯ নং পল্লী |
| ৩ নং জেলা | ,, | ১৩ নং থেকে ২১ নং পল্লী |
| ৪ নং জেলা | ,, | ২২ নং থেকে ২৭ নং পল্লী |

প্রত্যেক জেলায় একজন করে ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার ও একজন করে ডিস্ট্রিক্ট হেল্‌থ অফিসার নিয়োগ করা হয়। ইঞ্জিনিয়ার ওই জেলার রাস্তাঘাট নির্মাণ, জঞ্জাল ও ময়লা পরিষ্কারের কাজ দেখাশোনা করবেন এবং হেল্‌থ অফিসার ওই জেলার জনস্বাস্থ্যের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবেন।

নতুন আইনটি ১ এপ্রিল ১৯২৪ সালে কার্যকর হয়েছিল এবং এটি ৩১ মার্চ ১৯৫২ সাল পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। এই সময়ের মধ্যে শহরে যে সব উন্নতিমূলক পরিকল্পনা গৃহীত হয়ে কার্যকর হয়েছিল সে সম্বন্ধে দু-চার কথা বলা যেতে পারে।

১৯২২ খ্রিঃ কলিকাতা পৌরসভা পরিশ্রুত ও অপরিশ্রুত জল সরবরাহ বৃদ্ধি করার জন্য মূর ও বেটম্যানের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ২ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৫ বছরে এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হয়। এই প্রকল্প অনুসারে দৈনিক ৭০ মিলিয়ন গ্যালন গঙ্গা জল সরবরাহ করা হত। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের পাম্পিং স্টেশন উঠিয়ে দেওয়া হয়। পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ বৃদ্ধি করে ৭৫ মিলিয়ন গ্যালন করা হয়।

মূর ও বেটম্যানের পরিকল্পনা অনুযায়ী পানীয় জল ও গঙ্গাজল সরবরাহের পরিমাণ বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হওয়ায় এই বর্ধিত জল ও ময়লা নিষ্কাশনের কোনও বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়নি। ফলে প্রচলিত পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা এত অধিক জল ও ময়লা অপসারণে ব্যর্থ হয়। এদিকে যে বিদ্যাধরী নদীও শহরের ময়লা জল সুন্দরবনের নদীর মধ্য দিয়ে বঙ্গোপসাগরে নিয়ে যেত সে নদী ধীরে ধীরে মজে যেতে থাকে। এই দুই সমস্যা দূরীকরণের জন্য কলিকাতা পৌরসভা সেকালের খ্যাতনামা ইঞ্জিনিয়ার ডঃ বি. এন. দে-কে নিয়োজিত করেন। কয়েক বছরের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে ডঃ দে যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন, তাই সরকার ও পৌরসভা সামান্য পরিবর্তন করে অনুমোদন করেন।

ডঃ বি. এন. দে-র পরিকল্পনা রূপায়ণের ফল সংক্ষেপে এইরূপ : এক, দুই ও তিন নম্বর (আংশিক) জেলার জল ও ময়লা পামার্স ব্রিজ পাম্পিং স্টেশন থেকে বড় পয়ঃপ্রণালীতে পড়ে। আবার তিন নম্বর জেলার বাকি অংশ এবং চার নম্বর জেলার ময়লা জল বালিগঞ্জ পাম্পিং স্টেশন থেকে পৃথক পয়ঃপ্রণালীতে এসে পড়ে। পরে উভয় পয়ঃপ্রণালীর জল "পয়েন্ট এ" (Point A) নামক স্থানে এসে মিলিত হয়ে সেখান থেকে একটি খোলা পয়ঃপ্রণালী দিয়ে বানতলায় সেডিমেন্টেশন ট্যাঙ্কে (processed sedimentation tank) এসে জমা হয়। এই ট্যাঙ্কে দেড় ঘণ্টা থিতিয়ে রেখে ময়লা জল থেকে ময়লার ভাগ পৃথক করা হয়। এই পরিশ্রুত জল কাটা খাল দিয়ে কলিকাতা থেকে ১৭ মাইল পূর্ব-দক্ষিণে কুলটি নদীতে গিয়ে পড়ে। এ ছাড়া শহরের ভেতর অনেক

নতুন ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী তৈরি করা হয় এবং পুরানোগুলি বৃহৎ আকারে নির্মাণ করা হয়। এই পরিকল্পনা রূপায়ণে ৭৫ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল। নবনির্মিত পয়ঃপ্রণালী দিয়ে প্রত্যহ কলিকাতা শহর দিয়ে ১৫০ মিলিয়ন গ্যালন জল ও ময়লা নিষ্কাশিত হত।

শিক্ষাক্ষেত্রেও আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের আইনের ৯১ ধারা অনুসারে কলিকাতা কর্পোরেশন ৬ থেকে ১২ বছরের বালক ও ৬ থেকে ১০ বছরের বালিকাদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রতি বছরে অন্তত ১ লক্ষ টাকা ব্যয় করতে বাধ্য থাকবেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের প্রথম মেয়র নির্বাচনের ভাষণে (১৯২৪ খ্রিঃ ১৬ এপ্রিল) অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের কথা প্রথমেই স্থান পেয়েছিল। শিক্ষাক্ষেত্রে কলিকাতা পৌরসভা যেখানে ১৯২৪-২৫ সালে ৪৫,০০০ টাকা ব্যয় করেছিলেন, ১৯৪১-৪২ সালে ওই খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১১,৭৮,০০০ টাকা। নিজেদের পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়াও কলিকাতা পৌরসভা অন্যান্য প্রাথমিক স্কুল, টেকনিকাল স্কুলে যে অর্থ সাহায্য করেছিলেন তার পরিমাণ প্রায় ৪৭ লক্ষ টাকা (১৯২৪ থেকে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে)। এইসময় কলিকাতার বিভিন্ন এলাকায় গ্রন্থাগারগুলি কলিকাতা পৌরসভার কাছ থেকে ৭ লক্ষ টাকার উপর অনুদান পেয়েছিল।

১৯২৩-২৪ সালে পুরানো পৌরসভার মাত্র ১৯টি প্রাথমিক স্কুল ছিল। তাতে ২৪৬৮ জন বালক-বালিকা শিক্ষা পেত। ১৯৩৯-৪০ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২৩৪। ওই বছরে মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৬,৭৪১। তার মধ্যে ছাত্র সংখ্যা ১৯,৯৪৪ জন ও ছাত্রীর সংখ্যা ১৬,৭৯৭। ২৩৪টি স্কুলের মধ্যে মাত্র ১৮টি পৌরসভার নিজস্ব ভবনে অবস্থিত ছিল। বাকি ২১৬টি ভাড়াবাড়িতে ছিল। এর জন্য পৌরসভাকে বার্ষিক ১,৬৯,০০০ টাকা ভাড়া দিতে হত।[১]

নতুন পৌর আইনের বিধানে কলিকাতা পৌরসভা পুরানো রাস্তাঘাটের সংস্কার ও নতুন রাস্তা নির্মাণে বিশেষ যত্নবান হয়েছিলেন। কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা (The Calcutta Improvement Trust) এ বিষয়ে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁরা কলিকাতার দক্ষিণ অঞ্চল অর্থাৎ ভবানীপুর ও বালিগঞ্জ অঞ্চল ঢেলে সাজিয়েছিলেন। এইসময় কলিকাতা পৌরসভা ও কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থার মিলিত প্রয়াসে কলিকাতার রাস্তাঘাটের সার্বিক উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। ওই সময়ে সারকুলার রোডের (আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড এবং আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু রোড) সীমানার মধ্যে যে সব গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার নির্মাণ, সংস্কার ও নতুন নামকরণ হয়েছে তাদের সম্বন্ধে দু-চার কথা পরবর্তী অধ্যায়ে বলা হল।

**তথ্যসূত্র**

১ কলিকাতা ও উহার কর্পোরেশন—উপেন্দ্রনাথ বসু।

## ৩৪

# ১৯২৩—পৌর আইনে নতুন নতুন জনপথ

কলেজ রো : কলেজ রো, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট প্রভতি রাস্তাগুলি প্রাচীন কলিকাতায় মির্জাপুর মৌজার অন্তর্গত ছিল। ৯ জুন ১৭৮৫ খ্রিঃ পুলিশ কমিশনারের ঘোষণায় জানা যায় যে শহর কলিকাতাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার এবং জঞ্জাল অপসারণের জন্য ৩১টি থানায় বিভক্ত করা হয়েছিল। তার মধ্যে পটলডাঙ্গা থানা অন্যতম। ওই পটলডাঙ্গা থানার অন্তর্গত ছিল মির্জাপুর মৌজার অনেক অঞ্চল। তা ছাড়া পটলডাঙ্গা স্ট্রিট নামে এখানে একটি রাস্তা আজও আছে। কলেজ রো, কলেজ স্কোয়ার প্রভৃতি রাস্তা পটলডাঙ্গার অন্তর্গত।

কলেজ রো-এর পূর্ব নাম ছিল মীরজাফর লেন। রাস্তাটি কলেজ স্ট্রিট বাজারের বিপরীত দিক থেকে আরম্ভ হয়ে এঁকে বেঁকে পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটে এসে পড়েছে। রাস্তাটির গড় প্রস্থ হল ১৫ ফুট। ১৯২৬ সালে ওই এলাকার বাসিন্দারা এক স্মারকপত্রের মাধ্যমে রাস্তাটির নাম পরিবর্তন করে কলেজ রো রাখার এক প্রস্তাব কলিকাতা পৌরসভার কাছে পেশ করেন। ওই স্মারকপত্রে বলা হয়েছিল এই সরু রাস্তাটি কলেজ স্ট্রিটের একটি শাখা পথ, কাজেই প্রধান রাজপথের নামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কলেজ রো রাখা হোক। তাঁরা আরও মন্তব্য করেছিলেন এখানে এক মুসলমান পরিবার থাকতেন। তাঁদের নাম থেকেই এই রাস্তার নাম মীরজাফর লেন হয়েছে। কিন্তু অনেক অনুসন্ধান করেও ওই মুসলমান পরিববারের কোনও অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি।

এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আরেক দল তীব্র আপত্তি জানালেন। তাঁরা বললেন নবাব মীরজাফর কলিকাতায় থাকাকালীন এক সময় এই অঞ্চলে বাস করেছিলেন। ক্লাইভ স্ট্রিট, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট প্রভৃতি রাস্তার মতো এই পথটির একটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব অছে। সুতরাং ওই নামের পরিবর্তন কোনওমতেই যুক্তিযুক্ত নয়।

সেকালের বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ও সুপণ্ডিত ডাঃ বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় ১নং মীরজাফর লেনে বাস করতেন। তিনিও এই বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। ১৫ জুলাই ১৯২৫ সালে সেকালের ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা ফরওয়ার্ড-এ নবাব মীরজাফর সম্বন্ধে কিছু ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেশিত হয়। তা থেকে জানা যায় নবাব কলিকাতায় জগন্নাথঘাটের কাছে ময়দাপট্টিতে সর্বপ্রথম অবস্থান করেন। তাঁর অবস্থানের স্মৃতিচিহ্নরূপে সেখানে নবাব লেন ও নবাব ঘাট আজও বিরাজমান। এরপর তিনি ফৌজদারি বালাখানার গোলকুঠিতে কিছুদিন বসবাস করেছিলেন। সেখান থেকে তিনি বেলভেডিয়ার এবং জাজেস কোর্ট রোডের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থান করেন। নবাব জাফর আলি খানের ওই অঞ্চলে বসবাস করার জন্যই এলাকাটির নাম হয়েছিল আলিপুর। ডাক্তার মুখোপাধ্যায় ফরওয়ার্ড পত্রিকায় প্রকাশিত এই প্রতিবেদনটি কেটে পাঠিয়ে দেবার সময় মন্তব্য করেছিলেন—এইরূপ একটি সঙ্কীর্ণ এবং গুরুত্বহীন রাস্তা মহান নবাবের নামে যদি না রাখা হয় তাতে তাঁর প্রতি কোনও অসৌজন্য প্রদর্শন হবে না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, প্রায় একই নামে তিনটি রাস্তা এই এলাকায় অবস্থিত—মীরজাফর লেন, মির্জাপুর স্ট্রিট ও মির্জাপুর ট্যাঙ্ক লেন।

কলিকাতা পৌরসভা নামকরণের বিষয়টি নিয়ে বিচার-বিবেচনা করেন। অবশেষে ২৪ নভেম্বর ১৯২৬ সালের অধিবেশনে মীরজাফর লেনের নাম বদল করে 'কলেজ রো' রাখা হয়। আজও এ

নাম বহাল আছে।

ডাক্তার বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়ের মতো কয়েকজন খ্যাতনামা পুরুষের আবাসগৃহ ছিল এই কলেজ রো'তে। প্রথমে ডাক্তার বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়ের কথা।

প্রথিতযশা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক, স্বদেশপ্রেমী ও জ্ঞানতপস্বী ডাঃ বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় ১৮৭৪ খ্রিঃ ১৩ ফেব্রুয়ারি চন্দননগরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০১ খ্রিঃ কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে এল. এম. এস. পাশ করে একজন কৃতী অ্যালোপ্যাথ হিসাবে পসার জমিয়ে তোলেন। পরে তিনি হোমিওপ্যাথিতে আকৃষ্ট হয়ে অ্যালোপ্যাথি বর্জন করেন এবং তাঁর হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার খ্যাতি সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে।

বারিদবরণের অসাধারণ জ্ঞানপিপাসা তাঁকে সর্ববিষয়ে অধ্যয়নের পথে টেনে নিয়ে যায় এবং তখন থেকেই তিনি গ্রন্থ সংগ্রহ করে জ্ঞানসাধনায় ব্রতী হন। বিশেষ করে অর্থনীতি, দর্শনশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, সাহিত্য ও সঙ্গীতশাস্ত্রের প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করেন। অর্থনীতিতে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন এবং তার স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯১৬ সালে লন্ডনের রয়েল ইকনমিক সোসাইটি তাঁকে আজীবন সদস্য নির্বাচিত করে সম্মানিত করেন। এ ছাড়া ক্যালকাটা হোমিওপ্যাথিক কলেজের অধ্যক্ষ এবং রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গলের সদস্য ছিলেন। ডাঃ বারিদবরণ ১৯৪০ সালের ২৬ অক্টোবর পরলোকগমন করেন।

জীবনব্যাপী জ্ঞানচর্চায় বারিদবরণ এক বিরাট ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার গড়ে তুলেছিলেন যার সংগ্রহ সংখ্যা ছিল প্রায় এক লক্ষ গ্রন্থ। তাঁর মৃত্যুর পর এই গ্রন্থাগারের অধিকাংশ পুস্তক রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারে এবং বাকি তিন হাজার পুস্তক ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগারে দান করা হয়। তাঁর জন্মশতবার্ষিকীর দিন অর্থাৎ ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪ সালে জাতীয় গ্রন্থাগার তাঁর পূত স্মৃতির উদ্দেশে এক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন।

সে সময়ে ২, কলেজ স্কোয়ারে (বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট) অবস্থিত প্রখ্যাত পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক তদানীন্তন ইউ. এন. ধরের শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ধরকে বিশেষ স্নেহ করতেন ডাঃ বারিদবরণ। তিনি তাঁর স্মৃতিচারণ করে বলেন, "ডাক্তার বারিদবরণের মতো Lover of books বা পুস্তকপ্রেমী আজকের দিনে বিরল।" ১৯২৯ সাল থেকে তাঁর সঙ্গে রাজেনবাবুর পরিচয় হয়। প্রতিদিন দুপুরে তাঁদের দোকানে এসে ডাক্তারবাবু বই-এর পর বই-এর পাতা উলটাতেন। পছন্দমত বই-এর উপর চোখ বুলিয়ে নিতেন। অর্থশাস্ত্র, জ্যোতিষ, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি সকল বিষয়ের প্রতি ছিল তাঁর সুগভীর আগ্রহ। যে বই তাঁর পছন্দ হত, তা তিনি যে কোনও মূল্যে সংগ্রহ করতে দ্বিধা করতেন না। অ্যালবার্ট হল (আজকের কফি হাউস)-এর পেছনে শ্যামাচরণ দে স্ট্রিটে ছিল ইউসুফের পুরানো বই-এর দোকান। সন্ধ্যার পর প্রতিদিন ডাক্তারবাবু এই বই-এর দোকানে দাঁড়িয়ে বই দেখতেন, পড়তেন, পছন্দ হলে কিনে ফেলতেন। এইভাবে গড়ে উঠেছিল তাঁর বিশাল পুস্তক সংগ্রহ।

চিকিৎসাবিদ্যায় তিনি ছিলেন সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি। কত দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত তাঁর সুচিকিৎসায় আরোগ্যলাভ করেছে তার ইয়ত্তা নেই। তিনি নেপালের মহারাজার পারিবারিক চিকিৎসক ছিলেন।

রাজেনবাবু সর্বশেষে জানালেন যে "পুস্তকের শোকই" তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়েছিল। তাঁর বিশাল পুস্তক সম্ভারের তালিকা তৈরির জন্য একটি উটকো ছেলেকে নিযুক্ত করেছিলেন। সে সকলের অগোচরে বহু দামি পুস্তক বিক্রি করে দেয়। খোওয়া যাওয়া পুস্তকের অধিকাংশই উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। এই ঘটনার পর বেশিদিন তিনি জীবিত ছিলেন না।

ডাক্তার বারিদবরণের বসতবাড়ি ছিল ১নং মীরজাফর লেন (বর্তমানে কলেজ রো)। তাঁর বাড়ির অংশ হস্তান্তরিত হয়ে গেছে। এখানে এখন কয়েকটি প্রকাশন সংস্থার অফিস ও বিক্রয়কেন্দ্র।

৮বি, কলেজ রো-তে থাকতেন অধ্যাপক তুলসী কর। তিনি শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ভৌতবিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। পরে ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ওই বিষয়ের অধ্যাপক হন। কলেজ স্কোয়ারের থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির সহ-সম্পাদক হয়েছিলেন। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁর গভীর বিশ্বাস ছিল। এ ছাড়া পল্লীর নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন তিনি।

৩৬ নং কলেজ রো-এর বসত বাড়িটি ছিল ভূপতিচরণ বসুর (লিখতেন ভোস)। তিনি ছিলেন বিপ্লবী ও স্বাধীনতাসংগ্রামী। এই বাড়িতে এক সময় আসতেন বিপিনচন্দ্র পাল, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ দেশবরেণ্য নেতৃবৃন্দ। পরে তিনি জাপানের সঙ্গে কাটা কাপড়ের ব্যবসায়ে লিপ্ত হন। আমদানি-রপ্তানির ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। ভূপতিচরণের মধ্যমপুত্র বীরেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন কৃতী ভৌত-বিজ্ঞানী। সেকালে দেশীয় মালমশলা দিয়ে রেডিও ট্রান্সমিটার নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু পেশায় ছিলেন আইনজীবী। আনন্দবাজার পত্রিকার প্রফুল্ল সরকারের প্রথমা কন্যা কল্যাণীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। পরবর্তীকালে ওই পত্রিকার আইন উপদেষ্টা হয়েছিলেন। বরেন বসু হলেন ভূপতিচরণের আরেক পুত্র। বরেন বসুর পুত্র অনুপ ছিল মেধাবী ও শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কৃতী ছাত্র। নকশাল আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করায় পুলিশের গুলিতে নিহত হন। কলেজ স্ট্রিটের মোড়ে নিহত শহীদের যে স্মৃতিফলক আছে তাতে অনুপ বসুর নাম খোদিত আছে।

সেকালের বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক, মা সারদামণির সাক্ষাৎ শিষ্য, ভাটপাড়া নিবাসী গৌরহরি ভট্টাচার্য ৩৭সি, কলেজ রো-তে নিজবাড়িতে বাস করতেন। ছেলেবেলায় 'আনন্দমঠ' পাঠ করে স্বদেশ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সন্ন্যাসী হবার জন্য বেলুড় মঠের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সেখানে রাখাল মহারাজের সান্নিধ্যে আসেন এবং তাঁরই কৃপায় শ্রীমায়ের আশীর্বাদ লাভ করে তাঁর মন্ত্রশিষ্য হন। পরে পিতার অনুরোধে শ্রীমায়ের নির্দেশে বাড়ি ফিরে লেখাপড়া শুরু করেন এবং কলিকাতা ন্যাশনাল মেডিকেল স্কুল থেকে ডাক্তারি পাশ করে এল. এম. এস. ডিপ্লোমা লাভ করেন। এর কিছু পরে ইউনান সাহেব ও বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়ের পরামর্শে তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করে চিকিৎসা ব্যবসা শুরু করেন। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় শীঘ্রই খ্যাতিলাভ করেন এবং বিত্তের সঙ্গে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। চিকিৎসা ব্যবসার ফাঁকে ফাঁকে তিনি নানা সমাজসেবায় নিযুক্ত ছিলেন—ছাত্রদের জন্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'আদর্শ ভ্রাতৃসমাজ'। 'অল বেঙ্গল ফিজিক্যাল কালচার অ্যাসোসিয়েশন'-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এরও প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম সম্পাদক ছিলেন তিনি।

১৯৩৪ সালে গৌরহরি ভট্টাচার্য কলেজ রো-তে জমি কিনে বসত বাটি নির্মাণ করেন।[১]

সান-ইয়াৎ সেন স্ট্রিট : কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক রাস্তাটি নির্মিত হয়েছিল। এই পথটি চিৎপুর রোডকে ছাতাওলা গলির সঙ্গে সংযুক্ত করে। সে সময় ওই এলাকাটি ছিল খুবই ঘিঞ্জি। চিৎপুর রোডের সঙ্গে কেবলমাত্র ছাতাওলা গলির একটি সংকীর্ণ শাখাপথের সঙ্গে অঞ্চলটি সংযুক্ত ছিল। চিৎপুর রোডের সঙ্গে আরেকটি নির্গমন পথ তৈরি করার বিষয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হয়। কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা এ বিষয়ে অগ্রণী হন। কেবলমাত্র এই রাস্তা নির্মাণের জন্য তাঁরা একটি প্রকল্প রচনা করেন (Scheme No. XVII-Chatawala Gullee)। রাস্তাটি নির্মাণের জন্য ২·২৪ একর জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হয়। জমির মূল্য ধরা হয়েছিল আনুমানিক ১৩,৫০,০০০ টাকা, আর নির্মাণ বাবদ ব্যয় ৪০,০০০ টাকা। প্রকল্পটি ১৬ মার্চ ১৯২১ সালে বিজ্ঞাপিত হয়। তৎকালীন বাংলা সরকার ২০ জানুয়ারি ১৯২২ সালে এটি অনুমোদন করেন। কাজ শুরু হয় ১৯২৩ সালে।[২] রাস্তার নির্মাণকার্য শেষ হয় ১৯২৭ সালে। কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা নবনির্মিত রাস্তাটির রক্ষণাবেক্ষণের ভার কলিকাতা পৌরসভাকে ২৪ ডিসেম্বর ১৯২৭ সালে হস্তান্তর করেন।[৩] রাস্তাটি ৪০ ফুট প্রশস্ত করা হয়েছিল।

রাস্তাটি অধিগ্রহণের পর এটির নতুন নামকরণ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়। যেহেতু ওই অঞ্চলে চীনা বাসিন্দার সংখ্যা বেশি, কলিকাতা পৌরসভার অ্যাসেস্‌মেন্ট বিভাগ রাস্তাটির নাম ক্যান্টন স্ট্রিট রাখার সুপারিশ করেন। দুই নম্বর ডিস্ট্রিক্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি চীনদেশের রূপকার ও মহান বিপ্লবী নেতা সান-ইয়াৎ-সেনের নামে সান-ইয়াৎ-সেন স্ট্রিট রাখার সুপারিশ করেন। কলিকাতা পৌরসভা তাঁদের ৪ সেপ্টেম্বর ১৯২৯ সালের অধিবেশনে ওই প্রস্তাব অনুমোদন করেন। নবনির্মিত রাস্তাটির নাম হয় 'সান-ইয়াৎ-সেন স্ট্রিট'।

চীনা প্রজাতন্ত্রের জনক সান-ইয়াৎ-সেন (১৮৬৭-১৯২৫) দক্ষিণ চীনের সুই হেং-তে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ছিলেন দরিদ্র ক্রিশ্চান কৃষিজীবী। হংকং থেকে ডাক্তারি পরীক্ষায় পাশ করার পর ম্যাকাও ও ক্যান্টনে চিকিৎসা ব্যবসা শুরু করেন এবং সেই সঙ্গে প্রজাতন্ত্র দল গঠনের সূত্রপাত করেন। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে চীনা প্রজাতন্ত্রী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর তিনি বিদেশ যাত্রা করেন। সেখানে গিয়ে প্রবাসী চীনাদের সাহায্যে জাতীয় দল গঠন করেন Kuo Min Tang। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবে তিনি নানকিং-এর প্রজাতন্ত্রের সভাপতি হন। কিন্তু দ্বিতীয় বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ায় তিনি নির্বাসিত হন। ১৯১৭ সালে পুনরায় দেশে ফিরে আসেন এবং নানকিং-এ দক্ষিণ চীন প্রজাতন্ত্রের সভাপতি হন ১৯২১ সালে। ইতিমধ্যে জাতীয় দলের মধ্যে সাম্যবাদ ও রক্ষণশীল মতবাদের সূচনা দেখা দেয়। তিনি ১৯২৩ সালে সাম্যবাদীদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে চীনের জাতীয় কর্মসূচী রচনা করেন। কিন্তু চীনের উন্নতির জন্য যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা পূর্ণরূপে বিকশিত হতে পারেনি। তাঁর মৃত্যুর পর জাতীয় দল দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী এই দুই উপদলে বিভক্ত হয়। কিন্তু তাঁর দেশবাসী তাঁকে ভোলেনি। তাঁরা সান-ইয়াৎ-সেনের শিক্ষাকে জাতীয় জীবনের মূলমন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করেন। চীনের ইতিহাসে তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।[৪]

সাহিত্য পরিষদ স্ট্রিট (হোগলকুড়িয়া গলি) : বহু মনীষী ও সুধীজনের প্রাণঢালা প্রয়াসের ফলে বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলনের জন্য যে সারস্বত প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল তাই আজকের "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ" নামে খ্যাত। সর্বগুণান্বিত এই প্রতিষ্ঠানটির নামে হোগলকুড়িয়া গলিটি নামাঙ্কিত করা হয়। রাস্তাটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ঠিক বিপরীত দিকে অবস্থিত। কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের (বিধান সরণি) পূর্ব দিক থেকে শুরু হয়ে আরও পূর্বদিকে প্রসারিত হয়ে আপার সারকুলার রোডে (আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড) এসে পড়েছে।

হোগলকুড়িয়া গলি কলিকাতার একটি প্রাচীন পথ। হোগলকুড়িয়া গ্রামের মধ্যে রাস্তাটি ছিল বলে গ্রামের নামেই রাস্তাটি নামাঙ্কিত হয়। ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সম্রাট ফারুকশিয়ারের কাছ থেকে যে ৩৮টি গ্রাম খাজনার ভিত্তিতে লাভ করেন তার মধ্যে হোগলকুড়িয়া গ্রাম অন্যতম। এই গ্রামে ছিল বড় বড় হোগলার বন। সেকালের কলিকাতায় বসবাসের জন্য হোগলা দিয়ে কুঁড়ে ঘর তৈরি হত। হোগলকুড়িয়া গ্রামের সন্নিকটে ছিল একটি বাজার, এখানে প্রচুর পরিমাণে হোগলা পাতা বিক্রি হত।[৫]

হোগলকুড়িয়া গ্রামের নামকরণ প্রসঙ্গে এ. কে. রায় লিখেছেন, "Hogulkuria was named from the large number of huts that were thatched with the Hogla leaves, the Hogla being a species of elephant grass that grew in abundance in ponds and ditches of the locality."[৬]

সেকালের কলিকাতায় গ্রামের নামে রাস্তার নামকরণের অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়, যেমন সিমলা লেন, সিমলা স্ট্রিট, আরকুলি লেন, মলঙ্গা লেন, পাগলাডাঙ্গা, কাশীপুর রোড, বেলগাছিয়া রোড, উল্টাডিঙ্গি রোড প্রভৃতি। কলিকাতায় নগরায়ণের চাপে এই সব গ্রাম-নামের দ্রুত অবক্ষয় ঘটে। গ্রামগুলি তাদের অস্তিত্ব হারালেও এই পথগুলি তাদের স্মৃতিকে উজ্জ্বল করে রেখেছিল। পরবর্তী প্রজন্মের কাছে এই সব গ্রামভিত্তিক রাস্তার মূল্যবোধ দ্রুত হ্রাস পাওয়াতে তারা দেশের স্বনামধন্য পুরুষ বা প্রতিষ্ঠানের নামে রাস্তাগুলি নামকরণে ব্রতী হয়। এইভাবে কলিকাতার গ্রামভিত্তিক রাস্তাগুলির ধীরে ধীরে অবলুপ্তি ঘটে। আজও ছড়িয়ে ছিটিয়ে যা দু'একটি আছে এই শতাব্দীর সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তারাও হয়তো একদিন কলিকাতার বুক থেকে মুছে যাবে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নিজস্ব ভবন নির্মাণের পর এই খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানের নামে একটি রাস্তা নামাঙ্কিত করার প্রয়োজন অনুভূত হতে থাকে। অবশেষে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে এই মর্মে পৌরসভার কাছে একটি প্রস্তাব আসে। ২৭ মার্চ ১৯৩১ সালের অধিবেশনে কলিকাতা পৌরসভা হোগলকুড়িয়া গলির নাম পরিবর্তন করে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নামে 'সাহিত্য পরিষদ স্ট্রিট' নামাঙ্কিত করেন।[৭] আজও এই নাম বহাল আছে।

এই শতাব্দীর পাঁচের দশকে কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা গোয়াবাগান এলাকা উন্নয়নে তৎপর হলেন। তাঁরা একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন—The C.I.T. Scheme No. LXIV। সে সময় এ অঞ্চলে ছিল গরু, মোষের বড় বড় খাটাল। কলিকাতার দুধ সরবরাহের বড় অংশ এখান থেকে জোগান যেত। কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা খাটাল উচ্ছেদ করে সেই জায়গায় একটি প্রকাণ্ড উদ্যান নির্মাণ করেন। নব-নির্মিত উদ্যানের নাম হয়েছিল গোয়াবাগান সি.আই.টি. পার্ক। কলিকাতা পৌরসভা তাঁদের ৩১ মার্চ ১৯৬৯ সালের অধিবেশনে কলিকাতা পৌরসভার প্রাক্তন মেয়র ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ সতীশচন্দ্র ঘোষের নামে 'সতীশ ঘোষ উদ্যান' নামকরণ করেন। কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা উদ্যানের পাশ্ববর্তী রাস্তাগুলিকে প্রশস্ত করার ব্যবস্থা করেন। এর ফলে সাহিত্য পরিষদ স্ট্রিট প্রশস্ত হয়। রাস্তার ধারে অতিরিক্ত জমি নিলামে বিক্রি করা হয়। ওই জায়গায় গড়ে ওঠে নতুন নতুন আবাসন।

আবার ফিরে আসা যাক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কথায়। যে সারস্বত প্রতিষ্ঠানকে সম্মানিত করে কলিকাতা পুরসভা একটি রাস্তার নামকরণ করেন তার সম্বন্ধে জানবার আগ্রহ স্বাভাবিক। সিভিলিয়ান জন বীমস ১৮৭২ সালে ফরাসি অ্যাকাডেমির আদর্শে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একটি সমিতি বা পরিষদ স্থাপনের প্রস্তাব দেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বঙ্গদর্শন পত্রিকায় (আষাঢ়, ১২৬৯ সন) প্রস্তাবকে স্বাগত জানান। বীমসের প্রস্তাবিত সমিতি সেকালের বাঙালি সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। এর প্রায় ২০ বছর পরে এল. লিওটার্ড নামে বাংলা সাহিত্যানুরাগী এক ফরাসি ভদ্রলোক এবং ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী এই প্রকারের সংসদ স্থাপনে বিশেষ উদ্যোগী হন। এঁদের আগ্রহে শোভাবাজারের রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব এগিয়ে এলেন একটি বাংলা সারস্বত প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে।

১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে ২৩ জুলাই ২/২, রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিটে শোভাবাজারের রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের ভবনে "বেঙ্গল অ্যাকাডেমি অফ লিটারেচার" স্থাপিত হয়। সভাপতি রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব, দু'জন সহ-সভাপতি—এল. লিওটার্ড ও হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সম্পাদক ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী। নামে বেঙ্গল একাডেমি হলেও কার্যবিবরণী লেখা হত ইংরেজি ভাষায়। যে সব প্রবন্ধ পাঠ হত তা সবই ইংরেজি ভাষায় রচিত। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ১৮৯৩ সালে রাজনারায়ণ বসু দেওঘর থেকে এক প্রতিবাদপত্র পাঠালেন। উমেশচন্দ্র বটব্যাল ১৮৯৪ সালে মালদা থেকে এক চিঠির মারফত প্রস্তাব পাঠালেন যে Bengal Academy of Literature এর পরিবর্তে প্রতিষ্ঠানটির নাম রাখা হোক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। ১৮৯৪ সালের ২৯ এপ্রিল (সন ১৩০১, ১৭ বৈশাখ) অ্যাকাডেমির সভাপতি রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের পৌরোহিত্যে "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ" নাম গ্রহণ করা হয় এবং স্থির হয় এখন থেকে সভার কার্য, প্রবন্ধাদি পাঠ প্রভৃতি সর্ব বিষয় বাংলা ভাষার মাধ্যমে হবে। প্রতিষ্ঠানের মুখপত্রের নাম হল 'সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা', সম্পাদক রজনীকান্ত গুপ্ত। ১৭ বৈশাখ ১৩০১ সনকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের জন্মকাল ধরা হয়। ওই দিনেই প্রতিষ্ঠানের প্রথম সভাপতি হন রমেশচন্দ্র দত্ত, সহকারী সভাপতি নবীনচন্দ্র সেন ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । যুগ্ম সম্পাদক লিওটার্ড ও দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। বিবিধ উপায়ে বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের অনুশীলন এবং উন্নতি সাধনই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রধান উদ্দেশ্য বলে বিবেচিত হল। ১৮৯৯ সালের ১৫ এপ্রিল পরিষদ ১৮৬০ সালের আইন অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত হয়। এদিকে পরিষদে কার্য বৃদ্ধি এবং স্থানের অকুলান হওয়াতে পরিষদ কার্যালয় ১৩৭/১, কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের ভাড়া বাড়িতে উঠে আসে (৪ ফাল্গুন, ১৩০৬ বঙ্গাব্দ)।

কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের বাড়িতে অনুষ্ঠিত সাহিত্য পরিষদের এক অধিবেশনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে দীনেশ সেন লিখেছেন, "বহু বছর হইল, একদিন সাহিত্য পরিষদের সভায় বসিয়া আছি, তখন এই সভা শ্যামপুকুর স্ট্রিটের মুখে দক্ষিণ দিকে কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের উপর বসিত। এমন সময় ফড়িং এর মত শীর্ণ দেহ, অতি সামান্য সার্ট গায়ে একটি ভদ্রলোক আসিয়া আমার পার্শ্বে বসিয়া বঙ্গ ভাষা সম্বন্ধে আমাকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। মুখে খোঁচা খোঁচা ছোট ছোট দাড়ি, বোধ হয় খেউড়ি হইবার অবকাশ হয় নাই। কিন্তু আমার মনে হইল পয়সা জুটে নাই। ইহার সঙ্গে আমি অনেকটা আমার নিজ অহঙ্কার বজায় রাখিয়া কথা বলিতে লাগিলাম, অর্থাৎ অতি সংক্ষেপে, কারণ

ইহাকে আমি কোন নগণ্য ব্যক্তি মনে করিয়াছিলাম। এই সময় টাকির জমিদার প্রসিদ্ধ যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় তাঁহার ল্যান্ডো হইতে অবতরণ করিলেন। ইনি দ্বিপ্রহরের সময় ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে গাড়ির দরজা আটিয়া বন্ধ করিয়া চলাফেরা করেন। যতীন্দ্রবাবুর দেহটি বেশ একটু স্থূল, কিন্তু মূর্তি অতি সুদর্শন, বন্ধু বান্ধবের আনন্দদীপ, চোখের সোনার চশমা মুখের গৌরবর্ণকে যেন আরও একটু মনোরম করিয়াছে, ভুড়িটি একটু দোলাইয়া তিনি গৃহে প্রবেশপূর্বক, আমার পাশ্ববর্তী সেই অতি দীন বেশী লোকটিকে দেখিয়া গর্ব প্রীতিফুল্ল নেত্রে অভিবাদন করিয়া হাত ধরিয়া লইয়া গিয়া সভাপতির আসনের নিকটবর্তী একটি ভাল জায়গায়—ভদ্রলোকটি নানাভাবে এড়াইবার চেষ্টা সত্ত্বেও—যেন একটু জোর করিয়াই বসাইলেন। আমি বিস্ময়ের সঙ্গে একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইনি কে? শুনিলাম ইনিই—প্রফুল্লচন্দ্র রায়—অধুনা স্যার উপাধিতে ভূষিত।"[৮] প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন সাহিত্য পরিষদের শুভার্থী ও পৃষ্ঠপোষক।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ১৩১১ সন থেকে একাদিক্রমে আট বছর পরিষদের সম্পাদক ছিলেন। তাঁর কার্যকালে পরিষদের নানা দিকে উন্নতি সূচিত হয়। রামেন্দ্রসুন্দরের উদ্যোগে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নিজস্ব ভবন নির্মাণের আয়োজন শুরু হয়। ১৯০১ সালে কাশিমবাজারের মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী পরিষদকে প্রায় ৭ কাঠা জমি দান করেন। গৃহনির্মাণ সমাপ্ত হলে ১৯০৮ সালের ৬ ডিসেম্বর গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠিত হয়। লালগোলার মহারাজা রাও যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় দ্বিতল নির্মাণের ব্যয় একাই বহন করেন। এরপর মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র ১৩২১ সনে পরিষদকে আরও ৭ কাঠা জমি দান করেন। ১৩৩১ সালে এই ভবনের নির্মাণকার্য শেষ হয়। পরিষদের প্রথম সভাপতি রমেশচন্দ্র দত্তের নামে নতুন ভবনের নামকরণ করা হয় "রমেশ ভবন"। এই ভবনে প্রাচীন মুদ্রা, প্রস্তর মূর্তি, তাম্র শাসন, প্রাচীন দলিল, সাহিত্যিক ও মনীষীদের মূর্তি রাখার ব্যবস্থা হয়।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগার পুস্তক ও পত্র-পত্রিকায় বিশেষ সমৃদ্ধ। তা ছাড়া বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিজস্ব পুস্তকসংগ্রহ গৃহীত হওয়াতে এই গ্রন্থাগার বিশেষভাবে পুষ্ট হয়েছে। এঁদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রমেশচন্দ্র দত্ত, বিনয়কৃষ্ণ দেব ও অক্ষয় কুমার দত্তের পুস্তক সংগ্রহ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া আছে এঁদের প্রকাশনা বিভাগ। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের পুস্তকরাজি প্রকাশ করে বাংলা ভাষার ইতিহাসে যুগান্তর এনে দিয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অ্যাকাডেমি স্থাপনের সময় একদল বুদ্ধিজীবী মত প্রকাশ করেছিলেন, নতুন করে অ্যাকাডেমি স্থাপন না করে এই প্রাচীন প্রতিষ্ঠানটিকে অ্যাকাডেমির মর্যাদা দিয়ে একে নব উদ্দীপনায় সঞ্জীবিত করা হোক। যে কোনও কারণে হোক সরকারের তা মনঃপূত হয়নি। সরকার নতুন করে বাংলা অ্যাকাডেমি স্থাপনে তৎপর হলেন। সে যাইহোক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গবেষক, শিক্ষার্থী, সাহিত্যিক প্রমুখের কাছে সৃজনশিল্পের একটি তীর্থকেন্দ্র।

নবাব আবদুর রহমন স্ট্রিট : বর্তমানে এক বিচক্ষণ বিচারপতির নামে রাস্তাটি নামাঙ্কিত হলেও এর ইতিহাস কম আকর্ষণীয় নয়। রাস্তাটি ওয়েলেসলি স্ট্রিট (বর্তমানে রফি আহমেদ কিদোয়াই রোড) থেকে আরম্ভ হয়ে প্রথমে পূর্বদিকে পরে দক্ষিণ-পূর্বে প্রসারিত হয়ে মার্সডেন স্ট্রিটে (পীম্যান্টেল স্ট্রিট) এসে মিশেছে। প্রাচীন কলিকাতায় এই রাস্তাটির নাম ছিল পীরু খানসামা লেন। খানসামাদের নামে সে সময় অনেকগুলি রাস্তা ছিল সে কথা পূর্বে বলা হয়েছে। সেদিনের ভুঁইফোড় ইংরেজ-নবাবদের রসুইখানার একচ্ছত্র অধিপতি ছিল খানসামারা। বাড়ির ভৃত্যমণ্ডলী সকলে খানসামার হুকুমের অধীনে থাকত। এই সব খানসামার ক্ষমতা ছিল কিংবদন্তির মতো। সেকালের কোনও মুনশী বা বেনিয়ানের চেয়ে সাহেবদের কাছে খানসামার প্রতিপত্তি কম ছিল না। এদের রোজগারও ছিল সেইরূপ। পরবর্তীকালে এদেশের ইংরেজদের নবাবি কায়দায় জীবনযাপন ব্যবস্থা ধীরে ধীরে অস্তমিত হলে পর এই সব খানসামারা চাকুরি খুইয়ে অন্য বৃত্তির ধান্দায় দেশের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে। খানসামারা চলে গেলেও তাদের নামে রাস্তাগুলি থেকে যায়। পরবর্তী কালে নগরায়ণের চাপে এই সব রাস্তা প্রশস্ত ও সংস্কারের ব্যবস্থা করা হয়। এবং সঙ্গে সঙ্গে নতুন নামে নামাঙ্কিত করা হয়। এইভাবে খানসামাদের নামের রাস্তাগুলির ধীরে ধীরে অবলুপ্তি ঘটে।

পীরু খানসামা লেন এই রকমই একটি রাস্তা। ১৮৮২ খ্রিঃ কলিকাতা পুরসভা পীরু খানসামা লেন নাম বদল করে টার্নবুল লেন নামকরণ করেন। রবার্ট টার্নবুল ছিলেন কলিকাতা পুরসভার কর্মসচিব (Secretary to Corporation), তিনি ওই পদে ১৮৫৭ থেকে ১৮৮৮ খ্রিঃ পর্যন্ত বহাল ছিলেন। রাস্তাটির কিন্তু কোনও সুনাম ছিল না। এটি ছিল বারবণিতাদের আবাসভূমি। এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে এই রাস্তা থেকে বারবনিতাদের উচ্ছেদ করা হয়। পুরসভা তখন অ-পুরুষবাচক (impersonal name) নাম দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সেইমতো পুরসভার ১১ ডিসেম্বর ১৯১২ সালের অধিবেশনে টার্নবুল লেন নাম পরিবর্তন করে টার্নার লেন রাখা হয়। কিন্তু টার্নার লেন নামটি দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়নি। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে ৮ জানুয়ারি কলিকাতা পুরসভা পুনরায় রাস্তাটির নাম বদল করে বিচারপতি খান বাহাদুর নবাব আবদুর রহমন-এর নামে 'নবাব আবদুর রহমন স্ট্রিট' নামাঙ্কিত করেন। সে নাম আজও টিকে আছে।

আবদুর রহমন ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষা সমাপন করে ১৮৮০ সালে কলিকাতা হাইকোর্টে আইনব্যবসায়ী রূপে যোগদান করেন, এবং ১৪ বছর ওই ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকেন। পরে তিনি ছোট আদালতের বিচারক হন এবং কিছু পরে ওই আদালতের প্রধান বিচারকের পদে অধিষ্ঠিত হন। কলিকাতার সমাজ-সংস্কৃতিতে তাঁর অবদান উল্লেখের দাবি রাখে। তিনি ছিলেন তালতলা হাইস্কুলের এবং ইলিয়ট হোস্টেলের প্রতিষ্ঠাতা, কলিকাতা পুরসভার প্রতিনিধি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য এবং কলিকাতা মাদ্রাসার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তাঁর চরিত্রে সর্বাপেক্ষা মহৎগুণ ছিল যে তিনি সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদের উর্ধ্বে ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করতে গিয়ে তৎকালীন মেয়র বলেছিলেন : "He was a true type of that old world courtesy and gentleman like and it has been said rightly that the canker of communnalism had not touched him."

বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট : সাহিত্যস্রষ্টা, ঔপন্যাসিক, বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের উদ্‌গাতা এবং ভারতের নবজাগরণের যুগের অন্যতম প্রধান পুরুষ বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়ের নামে রাস্তাটির নাম হয়েছে বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট। রাস্তাটি গোলদিঘিকে (বিদ্যাসাগর উদ্যান) উত্তর ও পূর্ব দিকে বেষ্টন করে দাঁড়িয়ে আছে। পূর্বের নাম ছিল কলেজ স্কোয়ার। কলিকাতার জলকষ্ট নিবারণের জন্য লটারি কমিটি ১৮১৮ থেকে ১৮৩৪ সালের মধ্যে কলিকাতায় ৯টি দিঘি খনন করেন, তার মধ্যে গোলদিঘি বা কলেজ স্কোয়ার অন্যতম। গোলদিঘি নির্মাণের সময় তার উত্তর ও পূর্বদিকের রাস্তা কলেজ স্কোয়ার নামে নামাঙ্কিত হয়ে থাকবে।

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নামে একটা রাস্তার নামকরণের প্রশ্ন কলিকাতা পুরসভায় অনেক দিন ধরে প্রাধান্য পেয়েছিল। কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা সার্দান অ্যাভিনিউ (মেঘনাদ সাহা সরণি) থেকে মুদিয়ালি রোড পর্যন্ত প্রসারিত নতুন একটি রাস্তা নির্মাণ করেন। ১৯৩২ সালে এই নবনির্মিত রাস্তাটি বঙ্কিমচন্দ্রের নামে নামকরণের প্রস্তাব নিয়ে কলিকাতা পুর অধিবেশনে আলোচনা হয়, কিন্তু সে প্রস্তাব গৃহীত হয়নি।[৯] ১৯৩৬ সালে নিম্নলিখিত যে কোনও তিনটি রাস্তার একটি বঙ্কিমচন্দ্রের নামে নামকরণের প্রস্তাব আসে[১০]—

১। কলেজ স্ট্রিটের অংশ বিশেষ (গোলদিঘির দক্ষিণ অংশ থেকে বৌবাজার স্ট্রিট পর্যন্ত)
২। মির্জাপুর স্ট্রিট (সূর্য সেন স্ট্রিট) ও
৩। আমহার্স্ট স্ট্রিট (রাজা রামমোহন সরণি)

কিন্তু তাও গ্রাহ্য হয়নি।

এরপর ১৯৩৭ সালে ডিহি শ্রীরামপুর লেন ছিল ওই রকম আরেকটি প্রস্তাব।[১১] অবশেষে কাউন্সিলার ইন্দ্রভূষণ বিদের প্রস্তাবে ২২ মার্চ ১৯৩৯ সালের অধিবেশনে কলিকাতা পুরসভা কলেজ স্কোয়ার রাস্তাটির নাম বদল করে বঙ্কিমচন্দ্রের নামে 'বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট' নামকরণ করেন।[১২] এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ১৯৩৯ সালের মে মাসে কাউন্সিলার সুধীরচন্দ্র রায়চৌধুরীর উদ্যোগে যে প্রস্তাব পেশ করা হয় তার সারমর্ম বঙ্কিমচন্দ্রের নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা নামাঙ্কিত করা হোক। প্রস্তাবটি

ভোটে বাতিল হয়ে যায়।[১৩]

কলেজ স্কোয়ার রাস্তাটি নানা কারণে কলিকাতার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। একদিকে এই রাস্তার ধারে হিন্দু কলেজ, সংস্কৃত কলেজ, অ্যালবার্ট হল, ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউট, মহাবোধি সোসাইটি প্রভৃতি খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, অন্যদিকে এই রাস্তার উপর অবস্থিত কয়েকটি ভবন ছিল সেকালের বিপ্লবী আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সংস্কৃতির তীর্থক্ষেত্র। এদের সম্বন্ধে দু'চার কথা না বললে কলিকাতার ইতিহাসের অনেকখানি অনধীত থেকে যায়।

১/১, কলেজ স্কোয়ারের বাড়িটি মির্জাপুর স্ট্রিট (সূর্য সেন স্ট্রিট) ও কলেজ স্কোয়ারের সংযোগস্থলে অবস্থিত। বাড়িটির মালিক ঘোষাল পরিবার। বাড়ির কিছু অংশ ভাড়ার ভিত্তিতে ব্যবহার হয়, বাকি অংশে ঘোষাল পরিবার বসবাস করেন। এই পরিবার কলিকাতার বনেদি পরিবারগুলির অন্যতম। আজও এঁদের এই ভবনে সাড়ম্বরে দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই পরিবারের কৃতী সন্তান প্রমোদকুমার ঘোষাল (১৯০৫-১৯৬১)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্র, বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম নেতা প্রমোদকুমার কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা প্রসন্নকুমার ঘোষাল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আই. এস-সি. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে, ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে প্রথম শ্রেণীর অনার্সসহ বি. এস-সি. পাশ করে ওই কলেজে এম.এ. পড়ার সময় ছাত্র সমিতির সম্পাদক হন। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গদেশে অনুষ্ঠিত ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন। এই আন্দোলনের অপর বিশিষ্ট ছাত্রনেতারা হলেন শচীন্দ্রনাথ মিত্র, রেবতী মোহন বর্মন, অক্ষয়কুমার সরকার, অমরেন্দ্রনাথ রায়, বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রমুখ। ওই বছর জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে কলিকাতায় যে ছাত্রসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তিনি হয়েছিলেন তার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। ওই সম্মিলনীতে নিখিল বঙ্গ ছাত্র সমিতি গঠিত হয় (A.B.S.A)। প্রমোদকুমার এই সমিতির প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। নিখিল বঙ্গ ছাত্র সমিতি ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে এবং ১৯৩২-৩৩ খ্রিস্টাব্দে ব্যাপক আইন-অমান্য আন্দোলন শুরু করেন। গঠনমূলক কার্যেও এই সমিতির অবদান আছে। প্রমোদকুমার সমিতির মুখপত্র 'India Tomorrow' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১৯৩০ খ্রিঃ বঙ্গীয় আইন-অমান্য পরিষদের কার্যকরী সমিতির সভ্য থাকার জন্য এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন। সাইমন কমিশন বর্জনকালে ছাত্র আন্দোলনের সূত্রে নেতাজীর সংস্পর্শ লাভ করেন। উত্তরকালে নানাবিধ রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। নাগরিক কল্যাণ সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন প্রমোদকুমার ঘোষাল।[১৪]

৪ নম্বর কলেজ স্কোয়ারের মালিক ছিলেন সতীশচন্দ্র মল্লিক। এই বাড়িতে স্থাপিত হয়েছিল ডিফেন্স অ্যাসোসিয়েশন। এর সভাপতি ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ, সম্পাদক সুকুমার মিত্র, সঞ্জীবনী পত্রিকার সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্রের পুত্র। এই বাড়িতে এক সময় ছিল অ্যান্টিসারকুলার সোসাইটির অফিসের পাশে এক লম্বা কক্ষে ডিফেন্স অ্যাসোসিয়েশনের দপ্তর। আত্মরক্ষার নানা প্রক্রিয়া শিক্ষা দেওয়া হত এখানে। এক পশ্চিম দেশীয় মুসলমান নতুন রকমের লাঠিখেলা শেখাতেন। খালি হাতে কীভাবে আত্মরক্ষা করতে হয় সে বিদ্যাও শিখিয়েছিলেন। রমাকান্ত রায়ের পরিচিত এক জাপানি জুজুৎসু শেখাতেন। তখন এদেশে এ শিক্ষা অজ্ঞাত ছিল। বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাই বক্সিং শেখাতেন। এ সব বিদ্যা শেখার জন্য বহু শিক্ষার্থী এখানে ভিড় করতেন।

কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেন একদিন ডিফেন্স অ্যাসোসিয়েশন দেখতে এসেছিলেন। শিক্ষার্থীর গায়ে লাঠির আঘাতের চিহ্ন দেখে তিনি দু বোতল রাম (Rum) পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর উপদেশ—হঠাৎ আঘাত লাগলে রাম লাগিয়ে মালিশ করলে বেদনা ও স্ফীতির উপশম হয়।

যুগান্তর পত্রিকার মুদ্রাকর রাজদ্রোহের অপরাধে কারাদণ্ড হলে তাঁর পরিবারবর্গের সাহায্যার্থে ডিফেন্স অ্যাসোসিয়েশন এক সাহায্য ভাণ্ডার খোলে। অরবিন্দ তার কোষাধ্যক্ষ হন। প্রাপ্ত অর্থ এক ব্যাঙ্কে রাখা হত। পাশ বই ও চেক বই থাকত অরবিন্দের কাছে। অরবিন্দের গৃহ তল্লাশির সময় ওইগুলি পাওয়া যায়।

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন থেকে ছাত্রদের নিবৃত্ত করার জন্য তৎকালীন বাংলা সরকারের

সেক্রেটারি কার্লাইল ১০ই অক্টোবর এক দমনমূলক সারকুলার জারি করেন। ছাত্রদের পক্ষে স্বদেশি আন্দোলনে যোগদান, বয়কট বা পিকেটিং-এ অংশ গ্রহণ, এমন কি বন্দেমাতরম্ উচ্চারণও নিষিদ্ধ হল। ১৯০৫ খ্রিঃ ৪ নভেম্বর 'কার্লাইল সারকুলার' অমান্য করার জন্য সঞ্জীবনী সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্রের নেতৃত্বে ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে কলেজ স্কোয়ারে (গোলদিঘি) এক ছাত্রসভায় 'অ্যান্টিসারকুলার সোসাইটি' স্থাপিত হয়। কলিকাতা পুরসভার ভূতপূর্ব হিসাব-পরীক্ষক নরেন্দ্রনাথ বসু সহকারী সভাপতি, শচীন্দ্র প্রসাদ বসু এর সম্পাদক এবং সুকুমার মিত্র সহ-সম্পাদক হন। তখনকার দিনে বাংলার অন্যতম উদীয়মান কর্মবীর ছিলেন শচীন্দ্র প্রসাদ বসু। সিটি কলেজে পড়তেন। তাঁর সম্বন্ধে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বিনয় সরকার লিখেছেন, "ডন সোসাইটির সভ্য না হয়ে মাঝে মাঝে এখানে বক্তৃতা করতেন। শচীনবাবু বলতেন, 'নতুন নতুন কল কায়েম করে ধুতি বাজারে ফেলা বাঙালির পক্ষে বড় শীগগির সম্ভব হবে না, স্বদেশি থানের কাপড় তৈরি করা সোজা। বাজারে পাওয়া যায় যখন, তখন যুবক বাংলা ধুতি ছেড়ে, থানের পায়জামা পরতে শুরু করুক। জুতা না থাকে—কুছ পরোয়া নেই। খালি পায়েই পায়জামা পরা বাঙালি চলাফেরা করুক।"

"বাস্তবিক পক্ষে, শচীন একদিন কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় একদল পায়জামা পরা জুতোহীন বাঙালি ছোকরার শোভাযাত্রা বের করেছিল। আমি কলেজ স্ট্রিট হ্যারিসন রোডের মোড়ে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়েছিলাম।"[১৫]

অ্যান্টিসার্কুলার সোসাইটির দপ্তর ছিল প্রথমে ৬ নং কলেজ স্কোয়ারে। এরপর শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের সতীশচন্দ্র মল্লিক তাঁর ৪নং কলেজ স্কোয়ারের বৃহৎ খালি গুদামঘরটি সোসাইটির কার্যালয়ের জন্য বিনা ভাড়ায় ছেড়ে দেন। ১৯০৬ থেকে ১৯০৯ সাল পর্যন্ত ঘরখানি ওই সোসাইটির হাতে ছিল। অরবিন্দ যখন পণ্ডিচেরী চলে যান তখন অ্যান্টিসার্কুলার সোসাইটির কাজ বন্ধ হয়ে যায়।

অ্যান্টিসার্কুলার সোসাইটি কান্তকবি রজনীকান্তের এই গান গেয়ে মিছিল বার করতেন—

'বদলে গেল দেহের আকার বদলে গেল মন,
তবু নয়ন মুদে অচেতন।
যে মাকে তুই হেলা করে বলতিস কুবচন
সেই ক্ষমার ছবি বলছে তোরে ওঠরে যাদু ধন
ও তোর শিয়রে শমন।'

অ্যান্টিসার্কুলার সোসাইটির মিছিলে প্রতিদিন একজন অপরিচিত ও বয়স্ক মুসলমান যোগ দিতেন। প্রথমে কেউ কেউ তাঁকে গুপ্তচর বলে সন্দেহ করত। তাঁর নাম মৌলভি লিয়াকৎ হোসেন। তিনি বিহার প্রদেশের বিহারশরিফ শহরের বাসিন্দা। তিনি বলেছিলেন যে বাংলাদেশে একটা আন্দোলন হচ্ছে শুনে তিনি কলিকাতায় এসে এই আন্দোলনে যোগ দেবার চেষ্টা করেন। একমাত্র তিনি বৎসরাধিক কাল প্রত্যহ বিকালে মিছিল নিয়ে বাহির হতেন ও ৩০শে আশ্বিন ব্রত উদ্‌যাপন করতেন। অরবিন্দের সঙ্গে মৌলভি লিয়াকতের ৬নং কলেজ স্কোয়ারে সাক্ষাৎ ও পরিচয় হয়। কী মহাপ্রাণ ছিলেন এই মৌলভি লিয়াকৎ হোসেন।[১৬]

লিয়াকৎ হোসেন সম্বন্ধে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে শ্রদ্ধেয় ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন, "হেদোয় তখন একটি নিয়মমাফিক স্মরণীয় ঘটনা ছিল সপ্তাহে একদিন বোধহয় শনিবার কি রবিবার দেশপ্রাণ লিয়াকৎ হোসেনের পিছনে শিশুপাল নিয়ে নিয়মিত প্রোসেশন বা পদযাত্রা, হেদো থেকে পূর্ব দিকের ফুটপাত ধরে কলেজ স্কোয়ার পর্যন্ত। সবার আগে পতাকা ধরে থাকতেন লিয়াকৎ হোসেন—ছোটখাট মানুষটি। তাঁর পিছনে যেত ছেলের দল—আট দশ থেকে চোদ্দ পনেরো বছরের। সংখ্যায় তারা বেশী নয়। আমি যখনকার কথা বলছি তখন ছেলের সংখ্যা আন্দাজ কুড়ি-পঁচিশ জন। লিয়াকৎ হোসেনের মতো নিষ্ঠাবান মনস্বীরাই জাতির অক্ষয় শ্রদ্ধার ও স্থায়ী স্মৃতির আসন অধিকারী, বোমাবাজরা নয়। (আমি বোমাবাজদের অবজ্ঞা করছি না। তাঁরা আত্মত্যাগরূপ চরম বীরত্ব দেখিয়েছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁদের অনুকরণে কোন প্রত্যক্ষ লাভ হয়নি, উপরন্তু নৈতিক ডিসিপ্লিন নষ্ট হবার পথ নিয়েছিলেন)।"[১৭]

৪এ, কলেজ স্কোয়ারে মহাবোধি সোসাইটি ও শ্রীধর্মরাজিকা বিহার অবস্থিত। এ দু'য়েরই প্রতিষ্ঠাতা অনাগরিক ধর্মপাল (১৮৬৪-১৯৩০)। একাধারে তিনি সমাজ সংস্কারক, শিক্ষাবিদ, লেখক এবং বাগ্মী, অন্যদিকে আধুনিক সিংহলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতীয়তাবাদী এবং ধর্মীয় নেতা। অনাগরিক ধর্মপাল ভারতবাসীর নৈতিক, আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং শিক্ষা ও শিল্প বিষয়ক জাগরণের জন্য অবিরাম সংগ্রাম করে গেছেন। তাঁরই চেষ্টায় গয়া, বুদ্ধগয়া এবং সারনাথে পান্থশালা নির্মিত হয়। সারনাথে একটি শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কৃতিত্বও তাঁর। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি বৌদ্ধধর্মের প্রতিনিধিরূপে শিকাগো ধর্ম মহাসভায় যোগদান করেন। এখানে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর যে পরিচয় ও বন্ধুত্ব ঘটে তা আজীবন অটুট ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকার তাঁকে কলিকাতায় অন্তরিন করে রাখে।

কলিকাতার মহাবোধি সোসাইটি স্থাপিত হয় ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে। মন্দির তখনও নির্মাণ হয়নি। ১৯১৫ খ্রিঃ মহাবোধি সোসাইটি রেজিস্ট্রিকৃত হয়। এর প্রথম সভাপতি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। মন্দির নির্মাণ শুরু হয় ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে। এই মন্দির নির্মাণের ইতিহাস খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ক্যানিংহাম সাহেব তক্ষশিলায় খনন কার্য চালিয়ে বুদ্ধদেবের কিছু পূতাস্থি উদ্ধার করেন। সে সময় ভারত সরকারের শিক্ষাসচিব ছিলেন স্যার জন মার্শাল (Sir John Marshall)। তিনি ১৯১৭ খ্রিঃ এই মর্মে প্রস্তাব দেন, যদি মহাবোধি সোসাইটি কলিকাতা, সারনাথ ও তক্ষশিলায় উপযুক্ত বিহার নির্মাণ করে পবিত্র পূতাস্থি রক্ষার ব্যবস্থা করেন, তবে ভারত সরকার আবিষ্কৃত পূতাস্থির তিনটি খণ্ড প্রস্তাবিত বিহারগুলিকে দান করবেন। কলিকাতায় বিহার নির্মাণের জন্য কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সারদাচরণ মিত্রের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠিত হয় এবং মন্দির নির্মাণের জন্য ১ লক্ষ টাকা তহবিল গঠনের এক আবেদনপত্র প্রচার করা হয়। অনাগরিক ধর্মপালকে এ বিষয় সাহায্য করার জন্য থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এগিয়ে আসেন। হীরেনবাবুর মধ্যস্থতায় কলেজ স্কোয়ারের বর্তমান জমি ২০,০০০ টাকায় ক্রয় করা হয়। স্যার জন মার্শাল মন্দিরের নক্সাটি অজন্তা মন্দিরের ধাঁচে তৈরি করিয়ে দেন। তৎকালীন কলিকাতা আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ নক্সাটির কিছু অংশ সংশোধন করেন। 'Orissan Architecture' পুস্তক রচয়িতা খ্যাতনামা ইঞ্জিনিয়ার শ্রী এম. গাঙ্গুলি বিনা পারিশ্রমিকে মন্দির নির্মাণকার্য তদারকি করেন। ১৬ই ডিসেম্বর ১৯১৮ খ্রিঃ মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। ছোটলাট লর্ড রোনাল্ডসে (Lord Ronaldsay) ২০শে নভেম্বর ১৯২০ খ্রিঃ মন্দিরের উদ্বোধন করেন। ওই দিন প্রাতঃকালে স্যার আশুতোষ রাজভবনে গিয়ে ছোটলাটের হাত থেকে পবিত্র পূতাস্থির আধারটি গ্রহণ করেন এবং শোভাযাত্রা সহকারে নবনির্মিত মন্দির ভবনে নিয়ে আসা হয়।

সাহিত্যিক বনফুল এই অপূর্ব শোভাযাত্রা দেখে লিখেছিলেন, "যোগদানকারীদের বেশিরভাগ ছাত্র অধ্যাপক। পুরোভাগে নগ্নগাত্র নগ্ন পদে আশুতোষ। তাঁর মস্তকে একটি পাত্র। তার ভিতর ভগবান বুদ্ধের দেহাবসানের স্মারক। সেই পবিত্র বস্তুকে তিনি কলেজ স্কোয়ারে অবস্থিত মহাবোধি সোসাইটিতে স্থাপন করেন।"

বিপ্লবী জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ তাঁর রচিত 'যাঁদের সংস্পর্শে এসেছি' পুস্তকে প্রায় একই বিবরণ দিয়েছেন—"এই ঐতিহাসিক মিছিলের পুরোভাগে নগ্ন পদে আসিতেছিলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, দক্ষিণ পার্শ্বে ধর্মপাল ও বাম পার্শ্বে মিসেস এ্যানি বেসেন্ট। তাঁদের পশ্চাতে আমারও আসিবার পূণ্য হইয়াছিল। এই মিছিলের সুমহান তৈলচিত্র এখনও আশুতোষ কলেজ গৃহে শোভা পাইতেছে।"

ধীরে ধীরে মহাবোধি সোসাইটি ও বিহার বৌদ্ধদের মধ্যে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। দেশ বিদেশ থেকে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও পর্যটক এখানে আসার ফলে বিহারটির সম্প্রসারণ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। তীর্থযাত্রীদের জন্য বাসস্থান, একটি গ্রন্থাগার ও পাঠগৃহ এবং সম্পাদকের আবাসগৃহ নির্মাণের জন্য ১৯২২ সালের মার্চ মাসে এর সম্প্রসারণ কার্য শুরু হয়। পরিকল্পনা রূপায়ণে ব্যয় হয়েছিল ২২,০০০ টাকা। ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯২২ সালে নতুন ভবনের উদ্বোধন হয়। মিসেস মেরি ফস্টারের নামে 'মেরি ফস্টার ভবন' নামাঙ্কিত করা হয়। মিসেস ফস্টার বৌদ্ধধর্মের এক উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ও

হিতকামী ছিলেন। এ ছাড়া এখানে আছে একটি পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্র, শিশু বিদ্যালয় এবং চিকিৎসা কেন্দ্র। সমগ্র প্রতিষ্ঠানটি অনাগরিক ধর্মপাল অছি পরিষদের দ্বারা পরিচালিত।[১৮]

বুদ্ধের পবিত্র পূতাস্থি রাখা আছে একটি আধারে। একে বলা হয় চৈত্য। এটি নিটোল কালো মার্বেল পাথরে তৈরি। গায়ে সূক্ষ্ম কারুকাজ। এখানে অনেকগুলি বুদ্ধ মূর্তি আছে। প্রায় প্রতিটি মূর্তি উপহার সূত্রে পাওয়া। জাপান সম্রাট হিরোহিতো ১৮৯২ সালে ধর্মপালকে একটি বুদ্ধমূর্তি উপহার দিয়েছিলেন। এটি রাখা আছে কাঁচের পাত্রে। আর আছে সাদা মার্বেল পাথরের চমৎকার বুদ্ধ মূর্তি। এটি বর্মা থেকে পাওয়া। এ ছাড়া আছে শ্রীলঙ্কা ও থাইল্যান্ড থেকে পাওয়া সুন্দর সুন্দর বুদ্ধ মূর্তি। এখানকার উপাসনালয়টি প্রশস্ত, এর দেওয়াল গাত্রে আছে ক্যানভাসের উপর আঁকা বুদ্ধদেবের জীবনের নানা ঘটনা প্রবাহের রঙিন চিত্র।

বেঙ্গল থিওসফিক্যাল সোসাইটি ১৮৮২ খ্রিঃ ৪/৩, কলেজ স্কোয়ারে স্থাপিত হয়। পণ্ডিতপ্রবর দার্শনিক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৬৮-১৯৪২) এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণপুরুষ ছিলেন।

গ্রিক দার্শনিক ইয়ামব্লিখস (Iamblichus) সর্বপ্রথম 'থিওসফি' শব্দটি ব্যবহার করেন। তারপর ব্যোমে (Bochme), শেলিঙ প্রমুখ দার্শনিকগণ এর নানা দিক নিয়ে বহু আলোচনা করেছেন। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ম্যাডাম ব্লাভাৎস্‌কি, কর্নেল অল্‌কট (H. S. Olcott) প্রমুখ কয়েকজন মিলে থিওসফিক্যাল সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। এর ফলে থিওসফি আন্তর্জাতিক আলোড়ন সৃষ্টি করে। থিওসফি চর্চার উদ্দেশ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের নিয়মাধীন ৪৭টি স্বয়ংশাসিত সভা আছে। সভার উদ্দেশ্য হল :

১. জগতের নরনারীর মধ্যে সৌভ্রাত্র স্থাপন,
২. ধর্ম দর্শন ও বিজ্ঞানের তুলনামূলক চর্চার উৎসাহ দান,
৩. প্রকৃতির মধ্যে যে সব ঘটনার যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না তার কারণ নির্ণয় এবং মানুষের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত ঐশী শক্তি আছে তার মূল উৎস সন্ধান এবং বৃদ্ধিকরণ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমে থিওসফি মতবাদ শিক্ষিত হিন্দুদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। এর একটি কারণ এই, হিন্দু ধর্মের ও সমাজের প্রতিমা পূজা, জাতিভেদ প্রভৃতি—খ্রিস্টান ও অন্য ধর্ম সম্প্রদায়ের লোকেরা এইসব প্রথাকে নিন্দা করত, কিন্তু থিওসফিস্টগণ নানা যুক্তি ও তর্কের সাহায্যে ওইসব প্রথার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাতেন।

ভারতে থিওসফি মতবাদ প্রচারে অ্যানি বেসান্টের দান উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৯০৭ খ্রিঃ থিওসফিক্যাল সম্প্রদায়ের সভাপতি হন। ভারতে থিওসফি সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্র ছিল মাদ্রাজ শহরের নিকটবর্তী অ্যাডিয়ার নামক শহরতলিতে। বঙ্গদেশের মধ্যে কলিকাতায় এর প্রভাব ছিল। হীরেন্দ্রনাথ দত্তের পৃষ্ঠপোষকতায় বেঙ্গল থিওসফিক্যাল সোসাইটির শ্রীবৃদ্ধি ঘটে।[১৯]

৬ নম্বর কলেজ স্কোয়ার নজর কাড়ার মতো বাড়ি নয়। একেবারে সেকেলে ধরনের সাধারণ দোতলা বাড়ি, সংস্কারের অভাবে খুবই জীর্ণ। উপযুক্ত পরিচিতি না পাওয়াতে বাড়িটি সাধারণের চোখের অন্তরালেই রয়ে গেছে। অথচ একসময় বাংলার বহু মনীষীর চরণধূলায় ধন্য এই ভবন।

এই বাড়ির প্রথম মালিক ছিলেন ডেভিড হেয়ার। ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের অগ্রদূতরা এ বাড়িতে রীতিমত যাওয়া-আসা করতেন। ডেভিড হেয়ারের যুগের পর স্বদেশি যুগের বিখ্যাত পত্রিকা সঞ্জীবনীর সম্পাদক ও ব্রাহ্মনেতা কৃষ্ণকুমার মিত্র থাকতেন এই বাড়িতে।

ভারতে জাতীয় কংগ্রেস স্থাপনের দু' বছর পূর্বে অর্থাৎ ১৮৮৩ সালে কৃষ্ণকুমার মিত্র সঞ্জীবনী পত্রিকা প্রকাশ করেন। প্রথমে সতীশ মল্লিকের ৪নং কলেজ স্কোয়ার থেকে এটি প্রকাশিত হয়। পরে এটিকে ৬ নম্বর বাড়িতে নিয়ে আসা হয় এবং এখান থেকেই নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে। এই সঞ্জীবনী পত্রিকার মাধ্যমে ১৯০৫ থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত ৬ নম্বর বাড়ি হয়ে উঠল বঙ্গভঙ্গ ও বয়কট আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র। কৃষ্ণকুমারের উদ্যোগে ও নেতৃত্বে স্থাপিত হয়েছিল সমাজের হিতকারী নানা সমিতি—অপহৃত নারী উদ্ধার ও আদালতে দুর্বৃত্তদের শাস্তি বিধানের জন্য নারী রক্ষা সমিতি, মদ্যপান নিবারণী সভা, জনকল্যাণের জন্য সুনীতি সঙ্ঘ ইত্যাদি।

কলিকাতায় শ্রীঅরবিন্দের প্রধান আশ্রয় ছিল এই বাড়িটি। বরোদা থেকে কলিকাতায় এলে এই বাড়িতে উঠতেন। এই বাড়ি থেকে বাংলাভাষা অধ্যয়ন ও এতে বুৎপত্তি লাভ করেন। ১৯০৯ সালে মানিকতলার বোমার মামলায় মুক্তি পাবার পর আদালত থেকে সোজা চলে আসেন এই বাড়িতে। ১৯১০ সালে এ বাড়ি থেকেই তিনি চন্দননগর যাত্রা করেন, সেখান থেকে পরে পণ্ডিচেরী চলে যান।

কলিকাতায় গান্ধীজি এলে একবার এ বাড়িতে ঘুরে যেতেন। শুধু গান্ধীজিই নন, ইংল্যান্ডের শ্রমিক দলের নেতা র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড সস্ত্রীক কৃষ্ণকুমারের সঙ্গে এই বাড়িতে এসে দেখা করে গেছেন। মিস্টার মন্টেগু ভারত সফরকালে পদার্পণ করেছিলেন এই বাড়িতে।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র রায়, জগদীশচন্দ্র বসু, বিপিন পাল, যতীন্দ্রমোহন সেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ সুধীবৃন্দ প্রায় এ বাড়িতে আসতেন কৃষ্ণকুমারের কাছে।[২০]

'গ্রন্থ জগৎ' নামে এক পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশন সংস্থা ছিল এই বাড়িতে। এই দোকানে প্রায়ই আসতেন নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী। তিনি আসতেন নাটক পড়তে, রিহার্সাল দিতে, তাঁর আকর্ষণে আসর জমজমাট হত। এখানেই হত নব্য বাংলা নাট্য পরিষদের সাপ্তাহিক অধিবেশন। এই আসরে আসতেন খ্যাতনামা শিল্পী ভোলা চট্টোপাধ্যায়, রসজ্ঞ পণ্ডিত বিনয়কৃষ্ণ দত্ত, ডাঃ রামচন্দ্র অধিকারী, লেখক ও শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, চিত্র ও নাট্য সমালোচক পঙ্কজকুমার দত্ত, সাহিত্যিক জ্যোতির্ময় বসুরায়, শিবনারায়ণ রায়, কুমারেশ ঘোষ, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, গৌরকিশোর ঘোষ, কবি রাম বসু, অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অভিনেত্রী করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামলী চক্রবর্তী প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। শিশিরকুমার ছিলেন এঁদের মধ্যমণি।[২১]

কলিকাতার শিক্ষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট একটি বিশিষ্ট নাম। ৭নং কলেজ স্কোয়ারে এই প্রতিষ্ঠানটি অবস্থিত। কেশবচন্দ্র সেনের অন্যতম অনুগামী প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ছাত্রদের নৈতিক চরিত্র, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য গঠনের উদ্দেশ্য নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনে উদ্যোগী হন। প্রতাপচন্দ্রের উদ্দেশ্য এবং আদর্শ সেকালের সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কলিকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমর্থন লাভ করেছিল।

সে সময় সরকারের শিক্ষা অধিকর্তা আলফ্রেড ক্রফট এ বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল তিনি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে এক সভা আহ্বান করেন। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের ১৩ই আগস্ট সংস্কৃত কলেজ ভবনে ৩১ জন ছাত্র প্রতিনিধি নিয়ে একটি সভা হয়। বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় ছাত্রদের নৈতিক উন্নতি বিধানের জন্য 'সোসাইটি ফর দি ট্রেনিং অফ ইয়ংমেন' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কথা হয়। এতে তিনটি বিভাগ থাকবে স্থির হয় :

১. ব্যায়াম বিভাগ, সভাপতি—এইচ. লী।
২. সাহিত্য বিভাগ, সভাপতি—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
৩. নৈতিক বিভাগ, সভাপতি—প্রতাপচন্দ্র মজুমদার।

১৮৯১ খ্রিঃ ৩১শে আগস্ট টাউন হলে প্রতিষ্ঠানটির উদ্বোধন সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন হাইকোর্টের বিচারপতি এল. আর. টোটেনহাম। এই সভায় বক্তৃতা করেন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মৌলবি আবদুল জব্বর, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। সোসাইটির উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বক্তাগণ ছাত্রসমাজকে এই প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে আহ্বান জানান। সাময়িকভাবে টোটেনহাম এর সভাপতি এবং প্রতাপচন্দ্র সম্পাদক নিযুক্ত হন।

১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে সোসাইটির আনুকূল্যে ও তত্ত্বাবধানে ছাত্রদের সাহায্যার্থে 'কমিটি অফ ইয়ংমেন ফর মিউচুয়াল এড" গঠিত হয়। এর সম্পাদক হন দেবেন্দ্রনাথ সেন। ছাত্ররা যাতে ছাত্রাবাসে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ না করে তার জন্য পরিদর্শক হিসাবে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রায়ই ছাত্রাবাসগুলি পরিদর্শন করতেন এবং তাদের উপদেশ দিতেন।

সেকালের ইংরেজ রাজপুরুষ এবং আমাদের দেশের মনীষীরা ছাত্রদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। ছোটলাট চার্লস ইলিয়টের আহ্বানে বেলভেডিয়ার প্রাসাদে ছাত্র সমাবেশ হয়। তিনি এক স্টিমার পার্টিতেও ছাত্রদের সঙ্গ দেন। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁর মরকতকুঞ্জ উদ্যানে যখন ছাত্রদের আপ্যায়িত করেন সে সময় বড়লাট ল্যান্সডাউন ও ছোটলাট ইলিয়ট উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম দিকে সোসাইটির নিজস্ব কোনো স্থায়ী দপ্তর ছিল না। প্রথমে বরদাপ্রসাদ ঘোষের বাড়িতে, অল্পকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হাউসে দপ্তর স্থাপিত হয়েছিল। সাহিত্য বিভাগের সভা বঙ্কিমচন্দ্রের গৃহে এবং প্রতাপচন্দ্রের বাসগৃহে নৈতিক বিভাগের সভা বসত। পরে হিন্দু স্কুলের কয়েকটি ঘর সোসাইটির ব্যবহারের জন্য সরকারের অনুমতি পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে সরকার থেকে ৩ লক্ষ টাকা অনুদান পাওয়াতে বর্তমান ইনস্টিটিউট ভবনের নির্মাণকার্য আরম্ভ হয়। ছোটলাট লর্ড কারমাইকেল ৬ই এপ্রিল ১৯১৬ সালে এই ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

১৮৯৩ সাল থেকে সোসাইটির কাজ পুরোদমে শুরু হয়। ওই সময় হিন্দুধর্ম ও নীতি, ললিতকলা, প্রাচীন আর্যদের ছাত্রজীবন, বৌদ্ধধর্ম ও জীবন, ইসলামে নীতিবাদ, জাতীয় জীবন ও জাতীয় সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়। সভ্যগণ সাহিত্যের মাধ্যমে জাতীয়তার প্রচারকল্পে ১৮৯৪ সালের জানুয়ারি মাসে 'দি ক্যালকাটা ইউনিভারসিটি ম্যাগাজিন' নামে একখানি ইংরেজি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ 'গান্ধারীর আবেদন' ও 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' সর্ব সমক্ষে পাঠ করেন।

১৮৯৬ খ্রিঃ থেকে সোসাইটির নাম পরিবর্তনের প্রয়াস শুরু হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি নিয়ে ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট একটি বিশেষ সভায় সোসাইটির নাম পরিবর্তন করে 'ক্যালকাটা ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউট' রাখা হয়।

ছাত্রদের মধ্যে আবৃত্তি প্রতিযোগিতার সূত্রপাত হয় ১৮৯৭ খ্রিঃ। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে অভিনয় শুরু হয়। বাংলা নাটক অভিনয়ে নতুন টেকনিক বা শৈলী এখানে সর্বপ্রথম অনুসৃত হয়। গ্রন্থাগারের পাঠাগারে নিয়মিত পঠন-পাঠন হতে থাকে। মার্কাস স্কোয়ার এই প্রতিষ্ঠানের ফুটবল ও ক্রিকেট খেলার মাঠে পরিণত হয়েছিল। টেনিস খেলা হত হিন্দু স্কুলের প্রাঙ্গণে আর গোলদিঘিতে ছিল সন্তরণ ও নৌকা চালাবার ব্যবস্থা।

১৯০৮ সালে ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে দরিদ্র ছাত্রদের সাহায্যের জন্য 'দরিদ্রভাণ্ডার' গঠন করা হয়। এই তহবিল থেকে দুঃস্থ ছাত্ররা নিয়মিত অর্থ সাহায্য পেত।[২২]

১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি। তাঁর উদ্যোগে বয়স্ক-শিক্ষাকেন্দ্র প্রবর্তন করা হয়। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম অনেকটাই সীমিত হয়ে পড়ে। এই শতাব্দীর সাতের দশকে ইনস্টিটিউট ভবনটি অগ্নিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সরকার এটিকে নতুন করে নির্মাণ করে দিয়েছেন।

১৩, কলেজ স্কোয়ারের বাড়িটি সংস্কৃত কলেজের ঠিক বিপরীত দিকে অবস্থিত। এই বাড়িতে বাস করতেন কলিকাতা পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান শ্যামাচরণ দে বিশ্বাস। ওই পদে তিনি ২৫শে জুন ১৮৭৯ থেকে ৯ই জুলাই ১৮৮৩ পর্যন্ত আসীন ছিলেন। শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট নামে এই অঞ্চলের একটি রাস্তা তাঁর নামে নামাঙ্কিত আছে। ওই রাস্তাটি সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পূর্বে দেওয়া হয়েছে।

শ্যামাচরণ দে-র এই কলেজ স্কোয়ারের বাসভবনে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সর্বদা যাতায়াত ছিল। সে সময় শহরের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি এই বাড়িতে আসতেন। পুরসভা থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি কাশীপুরের একটি উদ্যানভবনে বাস করতেন। ১৮৮৪ খ্রিঃ এই কলেজ স্কোয়ার ভবনে দেহরক্ষা করেন।

শ্যামাচরণ দে'-র উত্তরপুরুষ হলেন কবি বিষ্ণু দে। 'কথা ও কাহিনী' নামে পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক সংস্থা এই বাড়িতে অবস্থিত। এর অংশীদার জয়ন্তকুমার দে, শ্যামাচরণ দে'র আরেক উত্তরপুরুষ।

সেকালের কলিকাতা শহরে প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র হিন্দু কলেজ, সংস্কৃত কলেজ ও অ্যালবার্ট হল কলেজ স্কোয়ারের ধারে স্থাপিত হয়েছিল। এই সারস্বত প্রতিষ্ঠানগুলি সম্বন্ধে কলেজ স্ট্রিট রাজপথ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করার ইচ্ছা রইল। শিক্ষার পীঠস্থান হওয়াতে এই বিদ্যাকেন্দ্রগুলির অনতিদূরে পুস্তক বিপণি গড়ে ওঠার যে প্রবণতা দেখা দিয়েছিল সে কথায় আমরা এবারে আসছি। স্কুলের উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তক তৈরির জন্য সরকার 'কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান ১৮১৭ সালে ২৪শে জুলাই স্থাপন করেন। সংস্থাটি হিন্দু কলেজের সংলগ্ন এলাকায় প্রথমে একটি ছাপাখানা স্থাপন করেন। ১৮২৬ সালে এই সংস্থা একটি পুস্তক বিপণিও প্রতিষ্ঠা করেন। এ সম্বন্ধে সোসাইটির প্রতিবেদনে দেখা যায়, ''With a view to promote the purchase of books by the pupils of various institutions for native education in Calcutta, the Committee have established a retail shop near the Hindu College.''

ঊনবিংশ শতাব্দীর পাঁচের দশকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার উভয়ে যৌথভাবে বইয়ের ব্যবসায়ে এগিয়ে এলেন। সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদ ছাড়বার আগেই বোধহয় বিদ্যাসাগর তাঁর বইয়ের ব্যবসা শুরু করেন। অন্তত তার প্রস্তুতিপর্ব শেষ হয়েছিল মনে হয় ১৮৪৬ সালের শেষে অথবা ১৮৪৭ সালের গোড়ার দিকে। তাঁর বইয়ের দোকানের নাম ছিল 'সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটারি'। হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজের অনতিদূরে তিনি বইয়ের দোকান খুলেছিলেন। তখনও এ অঞ্চলে বইয়ের বাজার মোটেই গড়ে ওঠেনি। স্কুল বুক সোসাইটির পর বিদ্যাসাগরই বোধহয় প্রথম এই অঞ্চলে পুস্তক বিপণি স্থাপন করেন।[২৩]

কলেজ স্কোয়ারে ছিল সেকালের এক বিখ্যাত বইয়ের দোকান—নাম 'বুক কোম্পানি'। ১৯১৪ সালে স্থাপিত, গিরীন্দ্রনাথ মিত্র এটির প্রতিষ্ঠাতা। ৪/৩ বি, কলেজ স্কোয়ার ভবনের একতলার এক ঘরে ছিল বুক কোম্পানি। সে সময় কলিকাতায় ছিল সাহেবদের দুটি বিখ্যাত পুস্তকের দোকান—একটি থ্যাকার স্পিঙ্ক, অন্যটি ডব্লু নিউম্যান। এরা ছিল বিদেশি ইংরেজি বইয়ের সবচেয়ে বড় আমদানিকারক। বুক কোম্পানি নিজেদের অধ্যবসায় ও ব্যবসা দক্ষতায় থ্যাকার স্পিঙ্ক-এর মতো প্রতিষ্ঠানকে পুস্তক আমদানি রপ্তানির ব্যবসায়ে পিছনে ফেলে শীর্ষস্থান অধিকার করে। সেকালের শহর কলিকাতার লব্ধপ্রতিষ্ঠিত ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপকবৃন্দ সকলেই আসতেন বুক কোম্পানিতে তাঁদের পছন্দমত বইয়ের খোঁজে। এই দোকানের পিছনে ছিল একটি ছোট্ট ঘর। সেই ঘরে বসত আড্ডার আসর। সেকালের সাহিত্যিক, কবি, দার্শনিক সমবেত হতেন এই আড্ডার আসরে। পরবর্তীকালে দেখাশোনার অভাবে এমন একটি নামী প্রতিষ্ঠান উঠে গেল।

কলেজ স্ট্রিটের প্রখ্যাত পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক ইউ. এন. ধর অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ-এর একসময় এক শাখা ছিল ২নং কলেজ স্কোয়ারে। এই প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রনাথ ধর। তিনি এন. সি. দত্ত অ্যান্ড কোং নামক পুস্তক সংস্থার স্বত্বাধিকারী নারায়ণচন্দ্র দত্তের কাছ থেকে পুস্তক ব্যবসা করার অনুপ্রেরণা পান। নারায়ণবাবুর কাছ থেকে তিনি যথাসাধ্য সাহায্যও পান। ১৯১৪ সালে ৫৮, ওয়েলিংটন স্ট্রিটে (নির্মল চন্দ্র স্ট্রিট) তাঁদের নিজস্ব বাড়িতে (যে বাড়িতে এস. সি. আড্ডির পুস্তকের দোকান ছিল) এই প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন হয়। ১৯৩৭ সাল নাগাদ কলেজ স্ট্রিটের উপর অ্যালবার্ট ইনস্টিটিউট ভবনের একটি ঘরে এই প্রতিষ্ঠানটি উঠে আসে। পূর্বে এই ঘরে এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্সের বইয়ের দোকান ছিল। এই প্রতিষ্ঠান ইউ. এন. ধর অ্যান্ড কোং নাম দিয়ে একটি শাখা স্থাপন করেন ২নং কলেজ স্কোয়ারে। পরে এই শাখা পুস্তকালয়টি উঠে যায়। সে যাই হোক, ইউ. এন. ধর অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ আজও তাঁদের পুস্তক ব্যবসায়ে গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

কলেজ স্কোয়ারের ৫নং ভবনে ছিল আরেকটি বিখ্যাত পুস্তক প্রকাশন সংস্থা—আশুতোষ লাইব্রেরি। এঁদেরই উদ্যোগে প্রকাশিত হত শিশুদের মন মাতানো মাসিক পত্রিকা 'শিশুসাথী'। এই প্রকাশন সংস্থা বর্তমানে আর নেই।[২৪]

সুরেশচন্দ্র মজুমদারের শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস একসময় কলেজ স্কোয়ারের কাছে চিন্তামনি দাস লেনে

ছিল। মৃণালকান্তি ঘোষের পরামর্শে সুরেশচন্দ্র মজুমদার মুদ্রণশিল্পকে বৃত্তিরূপে গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে এরাসমাস জোন্স অ্যান্ড কোম্পানির ছাপাখানায় শিক্ষানবিশ কম্পোজিটররূপে প্রবেশ করেন। যুবকের কর্মতৎপরতায় সন্তুষ্ট হয়ে কর্তৃপক্ষ তাঁকে মুদ্রণশিল্পের সব রকম কাজ শেখার ব্যবস্থা করে দেন। মৃণালবাবু সুরেশচন্দ্রকে নিজস্ব ছাপাখানা স্থাপনের পরামর্শ দেন, এই কাজে তাঁকে অর্থ সাহায্যও করেন। শর্ত ছিল, সুরেশ মজুমদারের কারবারে মৃণালকান্তি অর্ধেক অংশীদার হবেন। এইভাবে শ্যামবাজারের আপার সার্কুলার রোডে 'শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস' স্থাপিত হয়।

মাখনলাল সেন সেই সময় কলেজ স্কোয়ারে (বর্তমান বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট) একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে তাঁর কয়েকটি বিপ্লবী অনুচরের সঙ্গে বাস করতেন। তিনি সুরেশ মজুমদারকে এই বাড়ির তলায় শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসকে উঠিয়ে আনতে বললেন। এইখানে প্রেস আসার পর সুরেশবাবুর ভাগ্যোদয়ের সূত্রপাত হয়। তিনি এই ছাপাখানায় লাইনোটাইপ যন্ত্র স্থাপন করেন। এতে মুদ্রিত পুস্তকের অঙ্গসৌষ্ঠব এত সুদৃশ্য হয় যে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস কলিকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রেস রূপে পরিচিত হল। এই সময় মৃণালবাবু, তাঁর অংশ ত্যাগ করতে মনস্থ করেন। সেসময় সুরেশ মজুমদারের হাতে পর্যাপ্ত অর্থ না থাকায় তাঁর এক বন্ধু গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পরবর্তীকালে গণেন ব্রহ্মচারী নামে খ্যাত) তাঁকে ৪০,০০০ টাকা ঋণ দেন। রামকৃষ্ণ মিশনের পুস্তকাবলী বিশেষত বিবেকানন্দের রচনাবলী শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে মুদ্রণের মাধ্যমে ঋণ শোধের ব্যবস্থা হয়।[২৫]

নতুন বইয়ের দোকানের মতো পুরানো বইয়ের রমরমা ব্যবসা ছিল কলেজ স্কোয়ার নর্থ এবং কলেজ স্ট্রিটে। হিন্দু ও সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কলেজ স্ট্রিটের রাজপথে ছালা বা চট বিছিয়ে ইংরেজি পুরানো বইয়ের ব্যবসা আরম্ভ হয়। তখনও ফুটপাত তৈরি হয়নি। তাই রাজপথের একধারে এইসব বই বিক্রি হত। এই ব্যবসা সাধারণত মুসলমানদের একচেটিয়া ছিল। এখানে অনেক মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য পুস্তকও পাওয়া যেত।

এইসব পুরানো বইয়ের পাঠক ছিলেন প্রধানত সেকালের হিন্দু ও সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রবৃন্দ। মেডিকেল কলেজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রেসিডেন্সি কলেজ স্থাপিত হওয়াতে পুরানো বইয়ের ক্রেতা ও পাঠকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাঁরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা পথের উপর দাঁড়িয়ে পছন্দমত পুস্তকের পাতা উল্টিয়ে রসাস্বাদন করতেন। পছন্দ হলে উচিত মূল্যে কিনে নিতেন। সে সময় কলেজ স্কোয়ার অঞ্চলে ইউসুফের পুরানো বইয়ের দোকান ছিল বিখ্যাত।

মির্জাপুর স্ট্রিট ও কলেজ স্কোয়ারের মুখে ছিল সেকালের বিখ্যাত সরবতের দোকান 'প্যারাগন'। প্যারাগনের সরবতের এত নামডাক ছিল যে দূর দূর থেকে সরবত খেতে লোক আসত। কলেজ স্কোয়ারের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতো এই দোকানটিও বিস্মৃতির অন্তরালে চলে গেছে।[২৬]

সেকালের কলিকাতার বিখ্যাত কবিয়াল ভোলা ময়রার নামে ভোলা ময়রা লেন। এটি একটি বদ্ধ গলিপথ। শ্যামপুকুর স্ট্রিটের কিছু অংশ (৪৮ থেকে ৫২ সংখ্যক বাড়ি) নিয়ে 'ভোলা ময়রা লেন' তৈরি হয়। এই রাস্তাটি সম্বন্ধে কিছু বলার আগে শ্যামপুকুর অঞ্চল সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার।

শ্যামপুকুর কলিকাতার একটি প্রাচীন পল্লী। সুতানুটি, কলকাতা ও গোবিন্দপুর—এই তিন গ্রাম নিয়ে যে শহর কলিকাতা গড়ে উঠেছিল, শ্যামপুকুর এই সুতানুটি গ্রামেরই অন্তর্গত ছিল। শেঠ বসাকরা যখন সুতানুটিতে হাট বসাতে আসেন তখন এই জায়গাটা ছিল ঘোর বন-জঙ্গলময়। পরে জঙ্গল পরিষ্কার করে চাষ-আবাদের ব্যবস্থা করা হয়। সে সময় এখানকার আদি অধিবাসীরা ছিল জাতিতে জেলে ও কৃষক। শেঠ বসাকরা সুতানুটিতে হাট প্রতিষ্ঠা করায় এ স্থান কেনাবেচার প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে। ইংরেজ শাসনাধীনে আসার পর সুতানুটি তার গ্রামীণ আদল হারিয়ে ধীরে ধীরে শহুরে রূপ গ্রহণ করে। সে সময় কলিকাতার সুরক্ষা ও জঞ্জাল অপসারণের সুব্যবস্থার জন্য শহর কলিকাতাকে কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করার যে ব্যবস্থা হয় তার মধ্যে শ্যামপুকুর ছিল এইরূপ একটি অঞ্চল। অষ্টাদশ শতকের আটের দশকে কলিকাতার সুরক্ষা ও জঞ্জাল অপসারণের ব্যবস্থা ভেঙে

পড়ায় কলিকাতার বাসিন্দারা পুলিশের অপদার্থতায় সোচ্চার হয়েছিলেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃপক্ষ (The Governor General in Council) বৃহস্পতিবার ৯ই জুন ১৭৮৫ সালে এই সমস্যা সমাধানের জন্য একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন। তাতে কলিকাতাকে ৩১টি থানায় বিভক্ত করা হয়। প্রতি থানা একজন থানাদারের অধীনে থাকবে। তারাই কলিকাতার সুরক্ষা ও জঞ্জাল অপসারণের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। এই বিজ্ঞপ্তিতে রাস্তার যত্রতত্র জঞ্জাল নিক্ষেপ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কলিকাতার ৩১টি থানার মধ্যে শ্যামপুকুর অন্তর্গত ছিল। এই ব্যবস্থা ১৮৪৫ সাল পর্যন্ত কার্যকর ছিল। ১৮৪৫ সালে কলিকাতার পুলিশি ব্যবস্থা ইংল্যান্ডের ধাঁচে পুনর্গঠনের ব্যবস্থা হয়। সে সময় চিফ ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন মিঃ প্যাটেন (Mr. Patten)। তিনি ৩১টি থানা বাতিল করে কলিকাতাকে তিনটি বিভাগে বিভক্ত করেন—উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ বিভাগ। এই ব্যবস্থা ফলপ্রসূ না হওয়ায় ১৮৫২ সালের আইনের ২০ ধারা অনুসারে তা রহিত হয়। পুনরায় ১৮টি থানা স্থাপিত হয় এবং পরবর্তীকালে এগুলিই আদি কলিকাতার ১৮টি ওয়ার্ডে রূপান্তরিত হয়। ১নং ওয়ার্ডই শ্যামপুকুর ওয়ার্ড ও থানা নামে পরিচিত ছিল।

শ্যামপুকুর এলাকার বিস্তৃতি সুদূরপ্রসারী। এর উত্তরে ভূপেন্দ্র বসু অ্যাভিনিউ, দক্ষিণে গ্রে স্ট্রিট (এখন শ্রীঅরবিন্দ সরণি), পূর্বে কর্নওয়ালিস স্ট্রিট (বিধান সরণি) এবং পশ্চিমে যতীন্দ্রমোহন অ্যাভিনিউ অবস্থিত। এলাকাটি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা পাবার জন্য এই এলাকার একটি রেখাচিত্র দেওয়া হল।

এই চিত্রটির দিকে নজর দিলে দেখা যায় কেবলমাত্র তিনটি রাস্তাই পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রসারিত—বলরাম ঘোষ স্ট্রিট, শ্যামপুকুর স্ট্রিট ও রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিট। এ ছাড়া আছে কয়েকটি ছোটখাট পথ—যেমন, চৌধুরী লেন, ন্যায়রত্ন লেন, শ্রীকৃষ্ণ লেন, তেলিপাড়া লেন, কম্বুলিয়াটোলা লেন, ওল্ড মেয়রস কোর্ট, বরদা মিত্র লেন প্রভৃতি। আর উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রসারিত একটি মাত্র রাস্তাই চোখে পড়ে। সেটি আবার নানা নামে নামাঙ্কিত হয়েছে—প্রথমে মন্মথ ভট্টাচার্য স্ট্রিট, তারপর রামধন মিত্র লেন, এরপর শ্যামপুকুর লেন, সর্বশেষে রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিটের অংশবিশেষ। এ ছাড়া আছে, উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রসারিত ছোট ছোট পথ—যথা, কৃষ্ণরাম বসু স্ট্রিট, পদ্মনাথ লেন, ভোলা ময়রা লেন, অভয় ঘোষ লেন, নবকুমার রাহা লেন, আনন্দ লেন, কালীকৃষ্ণ ফার্স্ট লেন, কালীকৃষ্ণ সেকেন্ড লেন প্রভৃতি। এ অঞ্চলে আছে আর একটি প্রাচীন পথ—উত্তর-পূর্ব দিক থেকে শুরু হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিটে এসে পড়েছে—নাম শ্যামবাজার স্ট্রিট। এইসব পথের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও উন্নতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে শ্যামপুকুর এলাকার সমাজ-সংস্কৃতি ইতিহাসের ক্রমবিকাশের ধারা।

প্রাচীন কলিকাতার যে সব মানচিত্র আছে সেগুলির ওপর একবার দৃষ্টিপাত করলে আমরা শ্যামপুকুর অঞ্চলের রাস্তাগুলির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে অবহিত হতে পারি। প্রথম যে মানচিত্রটির কথা বলব সেটি তৈরি করেছিলেন আপজন সাহেব (A. Upjohn)। মানচিত্রটির পুরো নাম Plan of the territory of Calcutta as marked out in the year 1742, exhibiting likewise the Military operations at Calcutta when attacked and taken by Seraj-ud Dowlah on the 18th of June 1756. Printed and published according to the Act of Parliament, by A. Upjohn, 2nd April, 1794. উপরের এই ভূমিকা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে আপজন সাহেবের এই মানচিত্রে ১৭৪২ সালের কলিকাতার পরিচয় দেওয়া থাকলেও ১৭৫৬ সালে নবাব সিরাজদৌল্লার কলিকাতা আক্রমণকালে সামরিক মহড়ার পদক্ষেপ দেখানো আছে। ইংরেজ আগমনের পর এইটি কলিকাতার প্রথম মানচিত্র। এই মানচিত্রটি পরীক্ষা করলে সেকালের শ্যামপুকুর এলাকার বলরাম ঘোষ স্ট্রিট, শ্যামপুকুর স্ট্রিট, কৃষ্ণরাম বোস স্ট্রিট ও রামধন মিত্র লেনের একটা স্পষ্ট ছবি পাওয়া যায়। এই মানচিত্রে রাস্তাগুলি কিন্তু কোনও নামাঙ্কিত করা নেই। এর পরে সমগ্র কলিকাতার মানচিত্র তৈরি করেন লেঃ কর্নেল মার্ক উড ১৭৮৪-৮৫ খ্রিস্টাব্দে। কলিকাতার এই মানচিত্রে সর্বপ্রথম রাস্তাঘাট নামাঙ্কিত হতে দেখা যায়। মানচিত্রটি উইলিয়াম বেইলি পুলিশ কমিশনারের অনুমতি নিয়ে ১৭৯২

১ ভূপেন্দ্র বসু অ্যাভিনিউ
২ যতীন্দ্রমোহন অ্যাভিনিউ
৩ শ্যামবাজার স্ট্রিট
৪ বলরাম ঘোষ স্ট্রিট
৫ শ্যামপুকুর স্ট্রিট
৬ রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিট
৭ শ্রীঅরবিন্দ সরণি
৮ কৃষ্ণরাম বসু স্ট্রিট
৯ মন্মথ ভট্টাচার্য স্ট্রিট
১০ রামধন মিত্র লেন
১১ শ্যামপুকুর লেন
১২ পদ্মনাথ লেন
১৩ গুরুচরণ লেন
১৪ অভয় ঘোষ লেন
১৫ ন্যায়রত্ন লেন
১৬ মহারাণী হেমন্তকুমারী স্ট্রিট
১৭ চৌধুরী লেন
১৮ গৌরীমাতা সরণি
১৯ তেলিপাড়া লেন
২০ ভোলা ময়রা লেন
২১ রাজা গোপেন্দ্র স্ট্রিট
২২ ওল্ড মেয়রস্ কোর্ট
২৩ কম্বুলিয়াটোলা লেন
২৪ শ্রীকৃষ্ণ লেন
২৫ আনন্দ লেন
২৬ নবকুমার রাহা লেন
২৭ রাজা কালীকৃষ্ণ লেন
২৮ রাজা কালীকৃষ্ণ সেকেন্ড লেন
২৯ কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট
৩০ শিবশঙ্কর মল্লিক লেন
৩১ গোপাল বিশ্বাস লেন

শ্যামপুকুর অঞ্চলের রেখাচিত্র

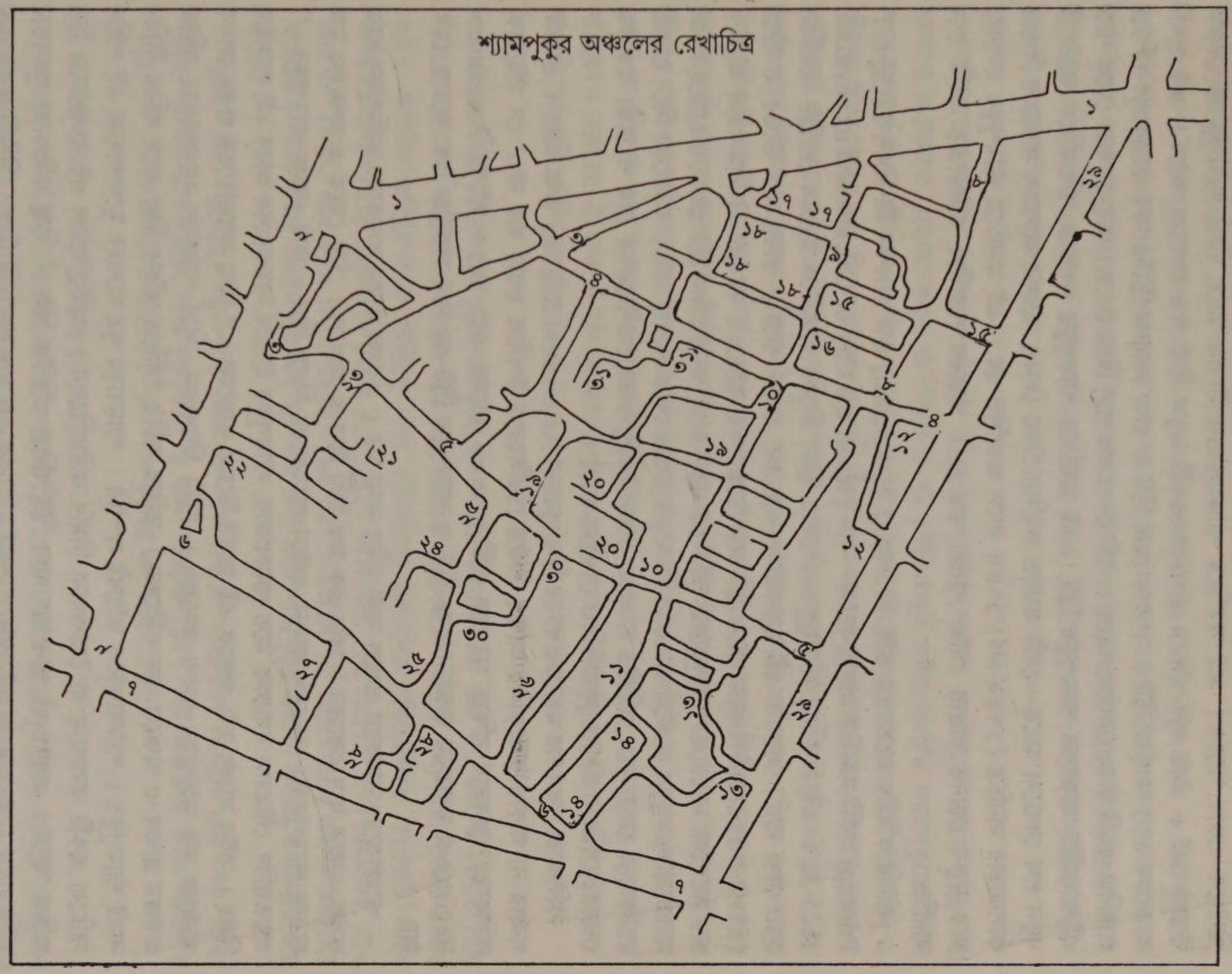

খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করেন। এই মানচিত্রে শ্যামবাজারের উল্লেখ আছে, কিন্তু শ্যামপুকুরের কোনও উল্লেখ নেই। এতে পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত একটি নতুন দীর্ঘ পথ দেখানো আছে। এই পথটি আজকের রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিট। বলরাম ঘোষ স্ট্রিট ও রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিটের মাঝ বরাবর পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত একটি রাস্তা দেখানো আছে। এটি দৈবতলার পাশ দিয়ে গেছে। অনুমান করা যেতে পারে এই রাস্তাটিই আজকের শ্যামপুকুর স্ট্রিট। এই মানচিত্রে শ্যামপুকুর এলাকার পশ্চিমদিকে আরেকটি নতুন পথ দেখানো আছে—সেটি সম্ভবত কম্বুলিয়াটোলা লেন। এরপর আপজন সাহেবের বিখ্যাত কলিকাতার মানচিত্র (১৭৯২-৯৩) ১৭৯৪ সালে প্রকাশিত হয়। এই মানচিত্রে শ্যামপুকুর এলাকার আর নতুন কোনও রাস্তার খোঁজ পাওয়া যায় না। অষ্টাদশ শতাব্দীর কলিকাতার এইটি শেষ মানচিত্র।

লটারি কমিটির প্রয়োজনে আই. পি. শক (I. P. Schalch) এবং ক্যাপ্টেন টি. প্রিন্সেপ (Capt. T. Princep) একটি মানচিত্র প্রস্তুত করেন—নাম Plan of the City of Calcutta and its environs, 1825-32। এই মানচিত্রে শ্যামপুকুর এলাকার উত্তর দিকের রাস্তাটিকে বলরাম দে স্ট্রিট নামাঙ্কিত হতে দেখা যায়। সম্ভবত এটি মুদ্রণপ্রমাদ বলে ধরা যেতে পারে। কারণ মার্ক উডের মানচিত্রে (১৭৮৪-৮৫) রাস্তাটি বলরাম ঘোষ স্ট্রিট বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আজও এই নাম বহাল আছে। শক সাহেবের মানচিত্রে শ্যামপুকুরের পূর্ব দিকে নতুন রাস্তা কর্নওয়ালিস স্ট্রিট দেখানো হয়েছে। এই মানচিত্রে শ্যামপুকুর অঞ্চলে আরও একটি নতুন রাস্তার খোঁজ পাওয়া যায়। আজকের দিনে রাস্তাটি তেলিপাড়া লেন নামে পরিচিত। এতে শোভাবাজার, রাজা গোপীমোহন দেব ও রাজা রাজকৃষ্ণ দেবের বাসভবন ও শ্যামপুকুর দিঘিও দেখানো আছে।

কলিকাতা পুরসভার মহাফেজখানায় কিছু পুরানো Assessment Register রাখা আছে। সেগুলি পরপর না থাকায় রাস্তাগুলির অস্তিত্ব নির্ণয়ে স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। সে যাইহোক, কলিকাতা পুরসভায় রক্ষিত সবচেয়ে প্রাচীন ১৮০৬ সালের এবং ১৮১০ সালের Assessment Register-এ যথাক্রমে রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিট ও শ্যামপুকুর স্ট্রিট-এর নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে দেখা যায়।

শ্যামপুকুরের নামকরণ প্রসঙ্গে নানা মুনির নানা মত। একদল বলেন বসাকদের আদিপুরুষ শ্যাম বসাক এখানে বাস করতেন। তাঁর এক মস্ত দিঘি ছিল এ অঞ্চলে। তাই থেকে এ অঞ্চলের নাম হয়েছে শ্যামপুকুর। অন্যদল বলেন এখানে শ্যামরায়ের বিগ্রহ ছিল। তাই থেকে শ্যামপুকুর।[২৭] প্রত্নতত্ত্ববিদ গৌরদাস বসাকের মতে শ্যামবাজার, শ্যামপুকুর ইত্যাদি নামকরণের কারণ এই শ্যামরায় বিগ্রহ। কটন সাহেব তাঁর পুস্তকে এই মতের উল্লেখ করেছেন।[২৮] কিন্তু নব্যভারতের প্রবন্ধ লেখক প্রাণকৃষ্ণ দত্ত মহাশয়ের ধারণা অন্যরূপ। তিনি লিখেছেন, 'পূর্বে শ্যামচরণ মুখোপাধ্যায় বলিয়া একজন ব্রাহ্মণ এ অঞ্চলে বাস করিতেন। তাঁহার বাটীর সান্নিধ্যে তাঁহার নিজ ব্যয়ে খনিত দীঘির নামই শ্যামপুকুর। শ্যামবাজারও তাঁহারই সম্পত্তি। শ্যামবাবুর পুত্র মনোহর মুখোপাধ্যায় এই পল্লীর সান্নিধ্যে একটি বালাখানা বা বৈঠকখানা নির্মাণ করিয়াছিলেন। অর্মির ম্যাপে এই বালাখানার চিত্র অঙ্কিত আছে। একদা এই স্থান বালাখানা স্ট্রিট বলিয়া পরিচিত ছিল।' কিন্তু কলিকাতা পুরসভার প্রতিবেদনে দেখা যায় যে এই অঞ্চলে শ্যাম মল্লিকের এক মস্ত বড় দিঘি ছিল। দিঘিটি ভরাট করা হলে পর এক বিরাট এলাকা পাওয়া যায়। এলাকাটি তাই থেকে শ্যামপুকুর নামে পরিচিতি লাভ করে।[২৯] লটারি কমিটির প্রয়োজনে শক সাহেব যে মানচিত্র (১৮২৫-৩২) প্রস্তুত করেছিলেন তাতে শ্যামপুকুর দিঘি চিহ্নিত আছে। দিঘিটি অনেক পরে ভরাটের ব্যবস্থা হয়েছিল। কাজেই শ্যামপুকুর দিঘি ভরাট করে শ্যামপুকুর অঞ্চলটি তৈরি হয়েছে, পৌর প্রতিষ্ঠানের এই সিদ্ধান্ত মনে হয় ঠিক নয়। অন্যদিকে শরৎচন্দ্র মিত্র শ্যামপুকুরের নামকরণ প্রসঙ্গে National Magazine-এ যে মন্তব্য করেছিলেন তা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। তিনি লিখেছেন, ''Shambazar and Shampooker are named after the temple of goddess Shyama or Kali which existed there formerly. Shambazar existed in the last (18th) century for it was farmed out by the Government in 1749.''[৩০] 'শ্যামপুকুর' নামকরণ প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র মিত্র শ্যামা বা কালী প্রতিমার

নাম উল্লেখ করে বিষয়টিতে নতুন মাত্রা যোগ করলেন।

সেকালের শ্যামপুকুর অঞ্চল ঘন ঝোপ জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। আর ছিল দিঘি ও মজাপুকুর। এই ঘন অরণ্যে বাস করত হিংস্র শ্বাপদ। ১৮৩৭ সালের সমাচার দর্পণে একটি সংবাদে প্রকাশ যে ওই সময় শ্যামপুকুরে বাঘের উৎপাত হয়েছিল। বাঘ শিকারের জন্য সাহেব শিকারিদের আনা হয়েছিল। পাঠকের কৌতূহল চরিতার্থ করার জন্য ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৮৩৭ সালের সমাচার দর্পণে প্রকাশিত সংবাদ হুবহু তুলে দেওয়া হল—

'কলিকাতায় মৃগয়া—মৃগয়া কার্যানুরক্ত শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ দত্ত ও শ্রীযুক্ত মকান সাহেব ও অন্যান্য কএকজন সাহেবরা কুকুর ও পিস্তল ও দুই চুঙ্গীর বন্দুক লইয়া সম্প্রতি শ্যামপুকুরের দিগে ব্যাঘ্র মৃগয়ার্থ গমন করিলেন। কিন্তু দৃষ্ট হইল যে ঐ স্থানে একটা চিতাবাঘ মাত্র আছে। উক্ত বাবু ও শ্রীযুক্ত স্মিথ সাহেব এক দিগে গেলেন এবং শ্রীযুক্ত মকান সাহেব কুকুর লইয়া অন্য দিগে গেলেন। পথিমধ্যে ঐ কুকুরেরা দুইটি শিয়াল দেখিতে পাইয়া অতি শীঘ্র তাহার দিগকে মারিয়া ফেলিল। কিন্তু বাবুর বড় সৌভাগ্য যেহেতুক তিনি কিঞ্চিৎ দূরে গমন করিলে একটা অতি বৃহৎ চিতা বাঘ তাঁহার অতি নিকটে ঝাপটা মারিয়া চলিয়া গেল। তাহাতে বাবুর সঙ্গি তারল্লোক ঐ চিতা বাঘের পায়ের দাগ দেখিয়া বন মধ্যে অনেক দূর পর্য্যন্ত গেল। কিন্তু পরে অতি গ্রীষ্ম প্রযুক্ত তাহারদের ফিরে আসিতে হইল। অতএব কলিকাতায় যে ব্যাঘ্রের ভয় হইয়াছে সে ঐ চিতা বাঘই ইহার সন্দেহ নাই। শুনা গেল যে শ্রীযুক্ত বাবু ও অন্যান্য কএক ব্যক্তি আগামি শুক্রবারে পূর্ব্বাহ্নে ঐ ব্যাঘ্রের অন্বেষণার্থে যাইবেন। শহরের ঐ অঞ্চলে অত্যন্ত জঙ্গল হইয়াছে এই ক্ষণে কএক দিবসাবধি পোলীসের কএক জন ঐ বন কাটিতে নিযুক্ত হইয়াছে।' [৩১]

এরপর ধীরে ধীরে শ্যামপুকুর অঞ্চলের বন-জঙ্গল পরিষ্কার করা শুরু হয় এবং জনবসতি গড়ে উঠতে থাকে। গভর্নর জেনারেল লর্ড অকল্যান্ডের তত্ত্বাবধানে ফিভার হসপিটাল কমিটি গঠিত হয়। কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এবং কলিকাতার উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি আইন প্রণয়ন করা হয় (The Govt. of India Act XXIV of 1840, The Act of XVI of 1847, The Act of 1848, The Act II of 1848, The Act XXXIX of 1850 etc.) এইসব আইনের সাহায্যে। কলিকাতার উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয় এবং সেই সঙ্গে শ্যামপুকুর এলাকা ক্রমেই জমজমাট হয়ে ওঠে।

পূর্বেই বলা হয়েছে শ্যামপুকুর অঞ্চলে পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত তিনটি মাত্র বড় রাস্তা আছে—বলরাম ঘোষ স্ট্রিট, শ্যামপুকুর স্ট্রিট ও রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিট। এই অঞ্চলের উত্তর সীমানায় আছে পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত আরেকটি পথ, নাম ভূপেন্দ্র বসু অ্যাভিনিউ।

প্রথমে বলরাম ঘোষ স্ট্রিটের কথা।

বলরাম ঘোষ স্ট্রিট পশ্চিমদিকের শ্যামবাজার স্ট্রিট থেকে আরম্ভ হয়ে পূর্ব দিকে এগিয়ে সারকুলার রোডে (এখনকার আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড) এসে পড়েছিল। ১৭৮৪-৮৫ সালে মার্ক উডের মানচিত্রে রাস্তাটি বলরাম ঘোষ স্ট্রিট নামে নামাঙ্কিত আছে। শক ও প্রিন্সেপ সাহেব লটারি কমিটির জন্য যে মানচিত্রটি (১৮২৫-৩২) তৈরি করেছিলেন তাতেও বলরাম ঘোষ স্ট্রিট সারকুলার রোড অবধি প্রসারিত হতে দেখা যায়। অ্যাবারক্রম্বির কলিকাতা মানচিত্রে (১৮৩৬) রাস্তাটি একই অবস্থায় দেখানো ছিল। কিন্তু সীম সাহেবের (P. W. Simms) কলিকাতা মানচিত্রে (১৮৫২-৫৬) এই রাস্তাটি দু'ভাগে দেখানো আছে—বলরাম ঘোষ স্ট্রিট কর্নওয়ালিস স্ট্রিট অবধি প্রসারিত এবং তারপরের অংশটুকু অর্থাৎ কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের পূর্বদিক থেকে সারকুলার রোড পর্যন্ত অংশটুকু ফড়িয়াপুকুর স্ট্রিট এই নতুন নামে চিহ্নিত রয়েছে। কলিকাতা পুরসভায় রক্ষিত ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দের Assessment Register-এ ফড়িয়াপুকুর স্ট্রিট প্রথম নথিভুক্ত হতে দেখা যায়। সম্ভবত ১৮৪০ সালের পর এই নতুন নামকরণ হয়ে থাকবে। ফড়িয়াপুকুর নামকরণ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেন লিখেছেন : 'যারা

জেলের কাছে মাছ কিনে বাজারে মাছ বিক্রেতাদের কাছে পাইকারিভাবে বেচে তাদের বলত 'নিকিরি'। মাছ ছাড়া অন্য বস্তু হলে ফড়ে (ফড়িয়া)। নিকিরিপাড়া বস্তি এখন নিশ্চিহ্ন। তবে কাছেই 'ফড়েপুকুর'। এ পুকুর নিকিরিদের উচ্ছন্ন হবার আগেই ডাঙা হয়ে গিয়েছিল। তবে এখন রাস্তার নামে টিকে আছে।" [৩২]

বলরাম ঘোষ স্ট্রিট কলিকাতার প্রাচীন পথগুলির অন্যতম। এই রাস্তাটির নামকরণ প্রসঙ্গে কলিকাতা পুরসভার মহাফেজখানায় কোনও নথিপত্রের খোঁজ পাওয়া যায়নি। তাই কলিকাতার প্রাচীন মানচিত্রের উপর নির্ভর করেই রাস্তাটির সময়কাল নির্ণয় করতে উদ্যোগী হতে হয়েছে। এর পরেই প্রশ্ন আসে—কে এই বলরাম ঘোষ ? কী তার পরিচয় ? এ বিষয়ে আমাদের কলিকাতার ইতিহাস রচয়িতার উপর নির্ভর করতে হবে। অতুলকৃষ্ণ রায়ের রচিত ''A Short History of Calcutta'' পুস্তকে বলরাম ঘোষ স্ট্রিটের নামকরণ প্রসঙ্গটির কোনও উল্লেখ নাই। প্রাণকৃষ্ণ দত্ত তাঁর 'কলিকাতার ইতিবৃত্ত' শীর্ষক পুস্তকে এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'বলরাম ঘোষের স্ট্রিট নামক রাস্তাটি অতি প্রাচীন। ১৭৮২ সালেও এ নাম ছিল। বোধহয় রামহরি ঘোষের পিতার নামেই নামকরণ হইয়াছিল।' কটন সাহেব (H. E. A. Cotton) তাঁর 'Calcutta Old and New' পুস্তকে প্রাণকৃষ্ণ দত্তের মন্তব্যকেই সমর্থন করেছেন। তিনি আরও লিখেছেন—বলরাম ঘোষ, বারানসী ঘোষ ও হরি ঘোষ একই পরিবারের সন্তান। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে রামহরি ও শ্রীহরি ঘোষের পিতা বলরাম ঘোষের নামেই বলরাম ঘোষ স্ট্রিট নামাঙ্কিত হয়েছে।

অন্য দিকে বলরাম ঘোষ স্ট্রিটে আরেক ঘোষ পরিবারের পরিচয় পাওয়া যায়। মকরন্দ ঘোষ এই পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা। এঁদের আদি বাস হুগলি জেলার পাইতাল গ্রামে। এই পরিবারের ২৩তম পুরুষ তুলসীরাম ঘোষ। নবাব সরকারের অধীনে কর্ম উপলক্ষে ঢাকায় যান। সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় ছোট কাকা বলরাম ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে সুতানুটিতে আসেন এবং শ্যামপুকুর অঞ্চলে বসবাস শুরু করেন। তুলসীরাম ছিলেন নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর দেওয়ান। কিন্তু বলরাম ঘোষ সম্বন্ধে বিশেষ কোনও তথ্য পাওয়া যায় না। শোনা যায় তিনি খুব বিলাসী ছিলেন। ২৪ নম্বর বলরাম ঘোষ স্ট্রিট সংলগ্ন জমিজমার ওপর তাঁর বাসভবন ছিল। তাঁর কোনও উত্তরপুরুষ নেই। তুলসীরামের পৌত্র হরপ্রসাদ মা ভবতারিণীর নবরত্ন মন্দির নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। সে কথায় আমরা পরে আসছি। তুলসীরাম ঘোষের উত্তরপুরুষদের মতে তাঁদের পূর্বপুরুষ বলরাম ঘোষের নামে রাস্তাটির নামকরণ হয়েছে। তাঁদের এই যুক্তির মধ্যে সারবত্তা আছে। কারণ প্রাচীন কলিকাতায় রাস্তার নামকরণ হত স্থানীয় লোকপ্রিয় বাসিন্দার নামে। সেদিক দিয়ে বিচার করলে শ্রীহরি ঘোষের পিতা বলরাম ঘোষ স্থানীয় বাসিন্দা ছিলেন না। তিনি চন্দননগরে বাস করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র শ্রীহরি ঘোষ কলিকাতায় এসে কাঁটাপুকুরে বাড়ি করেছিলেন। কাজেই শ্রীহরি ঘোষের পিতা বলরাম ঘোষের নামে রাস্তার নামকরণ প্রসঙ্গে সন্দেহের ছায়া থেকেই যায়। অন্য দিকে তুলসীরাম ছিলেন স্বনামধন্য পুরুষ, সে তুলনায় বলরাম ঘোষ ছিলেন অনেকাংশেই নিষ্প্রভ। এই বলরাম ঘোষ প্রসঙ্গে প্রাচীন কলিকাতার কোনও পুস্তকে, নথিপত্রে অথবা কলিকাতার কোনও ইতিহাসে কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। সুতরাং তথ্যের দিক থেকে বিচার করলে ঐতিহাসিক প্রাণকৃষ্ণ দত্তের মন্তব্যকেই মূল্য দিতে হয় বেশি। অবশ্য ভবিষ্যতে নতুন কোনও অজানা তথ্য আবিষ্কৃত হলে হয়তো এ বিষয়ের ওপর নতুন আলোকপাত হতে পারে।

দৃষ্টি ফেরাই চন্দননগরের বলরাম ঘোষ প্রসঙ্গে। বলরাম ঘোষ এক বনেদি ঘোষ পরিবারের সন্তান। সেকালের কলিকাতায় এই ঘোষ পরিবারের অর্থ, কৌলীন্য ও প্রতিপত্তি ছিল প্রবল। এই পরিবারের আরও দুই প্রধান পুরুষের নামে কলিকাতায় দুটি রাজপথ আজও আছে—একটি হরি ঘোষ স্ট্রিট, অন্যটি বারানসী ঘোষ স্ট্রিট। বলরামের চার পুত্রের মধ্যে হরি ঘোষ মধ্যম সন্তান। ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে ৯৫ বৎসর বয়সে বলরাম পরলোকগমন করেন। [৩৩]

পূর্বেই উল্লেখ করেছি তুলসীরাম ঘোষ ছিলেন নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর দেওয়ান। যোগবলে সিদ্ধি লাভ করে তিনি তাঁর কর্মস্থান ঢাকা শহরে জঁয়কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সেই মন্দির ও মন্দির সংলগ্ন বাড়ি এক ব্রহ্মচারীকে দান করে ঢাকা শহরের বাস তুলে দেন। পরে কাকা বলরাম ঘোষকে

সঙ্গে নিয়ে সুতানুটি গ্রামে এসে শ্যামপুকুর অঞ্চলে বসবাস শুরু করেন। পরবর্তীকালে তুলসীরামের বাড়ি ২৮নং বলরাম ঘোষ স্ট্রিট রূপে চিহ্নিত হয়। তুলসীরামের দুই পুত্র শিবপ্রসাদ ও ভবানীপ্রসাদ। ভবানীপ্রসাদের পুত্র হরপ্রসাদ স্বপ্নে এই ভবতারিণী মন্দির প্রতিষ্ঠার আদেশ পেয়েছিলেন। ভক্ত হরপ্রসাদ নিজ বাড়ির সম্মুখের এক বিঘা জমির উপর মন্দির নির্মাণের কাজ শুরু করেন। হরপ্রসাদ জীবিতকালে এই মন্দির সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি। মন্দিরের কাজ সম্পূর্ণ করেন হরপ্রসাদের সুযোগ্যা সহধর্মিণী দয়াময়ী দেবী। মূল মন্দির এবং তার দুই পাশের হরেশ্বর এবং হরপ্রসন্ন শিব মন্দিরের নির্মাণকার্য শেষ হয় ১২৯৪ বঙ্গাব্দে। দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দিরের অনুকরণে তৈরি এই নবরত্ন কালী মন্দির। ঠিকানা ২, বলরাম ঘোষ স্ট্রিট। পরবর্তীকালে মন্দির সংলগ্ন জমি কয়েক অংশে ভাগ হওয়ায় মন্দিরের নতুন ঠিকানা হয় ২/২, বলরাম ঘোষ স্ট্রিট। প্রায় এক বছর পরে ১২৯৫ সনের ৫ই বৈশাখ বাসন্তী পঞ্চমীর পূণ্য তিথিতে মা ভবতারিণীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। মূল বিগ্রহ কালো কষ্টিপাথরে গড়া। মা ভবতারিণীর পদতলে যে মহাকাল, তাঁর শরীর গড়া হয়েছে সাদা মার্বেল পাথরে। মন্দিরের সামনে বিরাট নাটমন্দির। তার চারধারে পাকা রাস্তা, পাশে ফুলের মনোরম উদ্যান। সে বাগান আজ আর নেই। কালের প্রবাহে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার একশো বছর পূর্ণ হল ১৯শে চৈত্র, ১৩৯৩ বঙ্গাব্দে।

হরপ্রসাদের স্ত্রী দয়াময়ীর মৃত্যু হয় ইংরেজি ৫ই ফেব্রুয়ারি ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে। মৃত্যুর পূর্বে দেবদেবীর নিত্য পূজা ও অন্যান্য উৎসব নিষ্ঠার সঙ্গে পালনের জন্য একমাত্র পুত্র সারদাপ্রসাদকে সেবাইত করে সমস্ত বিষয়সম্পত্তি দেবোত্তর করে যান। সারদাপ্রসাদ হোর মিলার কোম্পানির বেনিয়ান ছিলেন। তিনি মায়ের নির্দেশমত সমস্ত পূজা অর্চনা আড়ম্বরের সঙ্গে পালন করে গেছেন।

সারদাপ্রসাদের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রদের বিলাসিতা ও দূরদর্শিতার অভাবে প্রায় সমস্ত সম্পত্তি এমনকি বসতবাড়ি (২৮নং বলরাম ঘোষ স্ট্রিট) পর্যন্ত বিক্রি হয়ে যায়। দেবোত্তর সম্পত্তির সবটাই প্রায় বেআইনি দখলকারীদের কবলে চলে যায়। সারদাপ্রসাদের কনিষ্ঠ পুত্র ভূপেন্দ্রপ্রসাদ (১৮৮২-১৯৭১) ছিলেন ভক্তবৎসল। দেবীর পূজা অর্চনার প্রতি ছিল তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। তিনি ছিলেন সঙ্গীতানুরাগী। তাঁরই উৎসাহে 'ভবতারিণী সঙ্গীত সম্মিলনী' নামে একটি প্রতিষ্ঠান ১৯৪০ সালে স্থাপিত হয়। তিনি তার সম্পাদক ছিলেন। প্রতি সন্ধ্যায় মন্দিরের নাটমন্দিরে বহু নামী গায়ক-গায়িকা ছাড়াও এই প্রতিষ্ঠানের সভ্য-সভ্যাগণ সঙ্গীত পরিবেশন করতেন। শিবরাত্রির সময় সারারাতব্যাপী যাত্রা, নাটকের আসর বসত। ১৯৬৬ সালে প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে ভূপেন্দ্রপ্রসাদের পুত্রগণ তাঁদের সীমিত সামর্থ্যে প্রাচীন ঐতিহ্য বজায় রেখে মা ভবতারিণীর পূজা-অর্চনা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে চলেছেন।[৩৪]

কলিকাতা অনাথ আশ্রমটি ১২/১, বলরাম ঘোষ স্ট্রিটে অবস্থিত। এটির প্রতিষ্ঠাতা প্রাণকৃষ্ণ দত্ত (১৮৫১-১৯০৯)। কলিকাতার বাগবাজার অঞ্চলে এক ধনী পরিবারে প্রাণকৃষ্ণের জন্ম হয়। তিনি ছিলেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের অনুরক্ত এবং ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যুক্ত। পরে সরকারি রাজস্ব বিভাগের কর্ম পরিত্যাগ করে কেশবচন্দ্রের 'সুলভ সমাচার' পত্রিকার ভার গ্রহণ করেন। স্বয়ং একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন, নাম 'ভেরী'। ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারব্রত গ্রহণ করেন। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে তিনটি অনাথ বালককে নিয়ে ৮২/১, আপার সারকুলার রোডের ভাড়া বাড়িতে সস্ত্রীক এই অনাথ আশ্রমটি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে নারকেলডাঙায় একটি গোলপাতার বাড়ি লিজের ভিত্তিতে গ্রহণ করেন এবং অনাথ আশ্রমটি এখানে স্থানান্তরিত করেন। সে সময় অনাথ বালকের সংখ্যা ছিল ৯ জন। পরে আশ্রমটি পার্শিবাগানের এক খোলার ঘরে উঠে আসে। এর পর আরও দু' জায়গায় বাড়ি বদল—প্রথমে ঝামাপুকুরের একতলা বাড়িতে, পরে সত্তর টাকা ভাড়ায় বাদুড়বাগানের এক ভাড়া বাড়িতে। আশ্রম প্রতিষ্ঠার দিন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত (১৯০৯ খ্রিস্টাব্দ) প্রাণকৃষ্ণ এই আশ্রমের সম্পাদক ছিলেন। তাঁর এই মহতী কর্মে সহায়তা করতেন তাঁর সাধ্বী স্ত্রী শ্রীমতী ক্ষান্তমণি দত্ত। প্রাণকৃষ্ণ এই আশ্রমটি পরিচালনার জন্য একটি শক্তিশালী নিবহীসভা গঠন করেছিলেন। সভার যুগ্মসম্পাদক ছিলেন স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জি ও যদুনাথ সেন। এরপর প্রাণকৃষ্ণ দত্তের

পৃষ্ঠপোষক হয়ে এগিয়ে আসেন রাজা দিগম্বর মিত্রের পৌত্র ও তৎকালীন কলিকাতার শেরিফ মন্মথনাথ মিত্র। তিনি ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে বলরাম ঘোষ স্ট্রিটের ওপর অবস্থিত ২৩ কাঠা জমি অনাথ আশ্রমকে দান করেন। তৎকালীন বাংলা সরকারের ৫০০০ টাকা অনুদান এবং জনসাধারণের উদার সাহায্যে অনাথ আশ্রমের জন্য ভবন নির্মাণের ব্যবস্থা হয়। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে ছোটলাট স্যার এন্ড্রু ফ্রেজার (Sir Andrew Fraser) অনাথ ভবনের শিলান্যাস করেন। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে গৃহনির্মাণ সম্পূর্ণ হয় এবং 'কলিকাতা অনাথ আশ্রম' (The Calcutta Orphanage) ১২/১, বলরাম ঘোষ স্ট্রিটের নতুন ভবনে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দেই প্রবেশ করে।

কলিকাতা অনাথ আশ্রমের মহতী উদ্যোগ এবং বিশাল কর্মকাণ্ড দেখে লণ্ডনের মিঃ ফ্রেডারিক ব্লিক (Mr. Frederick Blick) এতই মুগ্ধ হন যে তিনি ১৯৪৫ সালে ৫০০০ টাকার অনুদান স্যার রাজেন মুখার্জির স্মৃতিরক্ষার্থে পাঠিয়েছিলেন। এখানেই শেষ নয়। ১৯৫২ সালে লন্ডনের মিসেস হেমিংওয়ের সম্পত্তি (Estate of Mrs. Z. M. I. Hamingway, London) থেকে এই অনাথ আশ্রমের জন্য আরেকটি ২৬,৬০০ টাকার অনুদান পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এইভাবে সকলের আন্তরিক সহানুভূতি ও সহায়তায় 'কলিকাতা অনাথ আশ্রম' জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি সরকারি অনুদানে পরিচালিত হচ্ছে।[৩৫]

রাজা রাধাকান্ত দেব তাঁর নাটমন্দিরে স্ত্রীশিক্ষার যে প্রদীপ শিখাটি জ্বালিয়েছিলেন, তারই আলোকে আলোকিত হয়ে শ্যামপুকুর অঞ্চলে একটির পর একটি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয়ে স্ত্রীশিক্ষাকে করেছে আরও গতিময়। সরস্বতী বালিকা বিদ্যালয় এমনি একটি শিক্ষাকেন্দ্র। ক্ষুদ্র অঙ্কুর অর্ধ শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়ে এক মহীরূহে পরিণত হয়েছে। এই শ্যামপুকুর অঞ্চলে এক মহীয়সী মহিলা নারায়ণী দেবী স্ত্রীশিক্ষার অভাবে মেয়েদের দুঃখ লাঘব করার উদ্দেশ্যে ১৯৩৬ সালের ২রা জানুয়ারি এই বিদ্যালয়ের সূচনা করেন। শুধু বিদ্যাশিক্ষাই নয়, মেয়েদের স্বনির্ভর করে তোলার জন্য নারায়ণী দেবী তাঁতের কাজ, দর্জির কাজ, বিভিন্ন প্রকার সেলাই, ব্যাগ প্রভৃতি চামড়ার কাজ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। এখানে দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়েছিল ৩১নং তেলিপাড়া লেনে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনের সময় নারায়ণী দেবী যাবতীয় আসবাবপত্র, একটি নতুন স্কুল বাস ও প্রায় ২০,০০০ টাকা দান করেছিলেন। অথচ তিনি ছিলেন রক্ষণশীল মধ্যবিত্ত পরিবারের বিধবা। শুধু তাই নয়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বিদ্যালয় যখন চরম আর্থিক অনটনে পড়ে, সে সময় নারায়ণী দেবী তাঁর ব্যক্তিগত অলংকারাদি বন্ধক রেখে প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি ১৫/২, বলরাম ঘোষ স্ট্রিটে বাস করতেন।

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় ছাত্রীসংখ্যা ছিল মাত্র ৫০ জন। দুই বছর পরে শিক্ষালয়টি ২৬নং শ্যামপুকুর স্ট্রিটের বাড়িতে উঠে আসে। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। বিদ্যালয়টিকে আবার স্থানান্তরিত করতে হয় ১৫/২, বলরাম ঘোষ স্ট্রিটে।

স্বাধীনতার পরবর্তী কালে বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় বৃহৎ আয়তনযুক্ত অট্টালিকার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীদের আনুকূল্যে এবং সরকারি সাহায্যে ১৯৫৬ সালে বিদ্যালয়ের নিজস্ব ভবন নির্মাণের জন্য পি-২৭/২, বলরাম ঘোষ স্ট্রিটে অবস্থিত ১০ কাঠা জমি ক্রয় করা হয়। ১৯৬০ সালে ওই জমির ওপর বিদ্যালয়ের নিজস্ব তিনতলা ভবন নির্মিত হয়। পরে আরও দুটি তলা সংযোজিত হয়। ১৯৬৩ সালে নতুন ভবনে বিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হয়। ওই বছরে এই বিদ্যালয়কে একাদশ শ্রেণী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়। কিন্তু ১৯৭৬ সালে দ্বাদশ শ্রেণীর উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রবর্তনের সময় এই বিদ্যালয়ে দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। বর্তমানে সমস্ত বিভাগ মিলিয়ে ছাত্রীর সংখ্যা ১৪০০।

সেকালের কলিকাতার কৃতী আইনজীবী, আইনসভা বিশারদ, ভারতীয় নরমপন্থী (মডারেট) রাজনৈতিক ভাবধারার অন্যতম কর্ণধার, বিশিষ্ট সমাজসেবী ভূপেন্দ্রনাথ বসু (১৮৫৯-১৯২৪) ১৪ নম্বর বলরাম ঘোষ স্ট্রিটের বিশাল ভবনে বাস করতেন। খানাকুল কৃষ্ণনগর ছিল ভূপেন্দ্রনাথ বসুদের

পৈতৃক আবাস। পিতা রামরতন বসু। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদে কলিকাতায় আসেন। দর্জিপাড়া গুহদের সেরেস্তায় কর্মচারী ছিলেন রামরতন । তাঁর নামে কলিকাতায় একটি রাস্তা আছে। রাস্তাটি ১৮৯৫ সালে কলিকাতা পুরসভা নির্মাণ করেন। এটি ২২৭নং আপার সারকুলার রোড (এখন, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড)-এর পাশ দিয়ে পূর্ব দিকে এগিয়ে নীলাম্বর মুখার্জি লেনে এসে পড়েছে। কলিকাতা পুরসভা ১৮৯৬ সালে রাস্তাটি রামরতন বসুর নামে নামাঙ্কিত করেন।

রামরতনের চার ছেলের মধ্যে ত্রৈলোক্যনাথ ছিলেন জ্যেষ্ঠ। কলিকাতা থেকে আইন পাশ করে মজঃফরপুরে ওকালতি করার জন্য গমন করেন। শীঘ্রই আইন ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন এবং বিপুল অর্থ উপার্জন করেন। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতায় ১৪নং বলরাম ঘোষ স্ট্রিটের জমিসমেত বাড়িটি ক্রয় করেন। পরবর্তীকালে তাঁর উত্তরপুরুষগণ বাড়ির আকার ও আয়তনের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। ১৯০৬ খ্রিঃ ত্রৈলোক্যনাথের মত্যু হয়। রামরতনের দ্বিতীয় পুত্র উপেন্দ্রনাথ মুন্সেফ ছিলেন। রামরতনের কনিষ্ঠ পুত্র ভূপেন্দ্রনাথ এই বংশের কৃতী সন্তান। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি.এ. এবং ১৮৮০-তে ইংরাজি সাহিত্যে এম.এ. পাশ করেন। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে অ্যাটর্নিশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। পরে অসামান্য সাফল্যলাভ করেন। রাজনৈতিক জীবনে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের অনুগামী ছিলেন। একসময় কলিকাতা পুরসভার কমিশনারও হয়েছিলেন। কলিকাতা পুরসভার জন্য নতুন পৌর আইন (ম্যাকেঞ্জি আইন) গৃহীত হওয়ায় ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে যে ২৮ জন পুরকমিশনার পদত্যাগ করেন তার মধ্যে ভূপেন্দ্রনাথ ছিলেন অন্যতম। এই উপলক্ষে রসরাজ অমৃতলাল বসু 'সাবাশ আটাশ' নাম দিয়ে একটি প্রহসন নাটিকা রচনা করে এঁদের পদত্যাগকে স্মরণীয় করে গেছেন।

১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে ভূপেন্দ্রনাথ কলিকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে যোগ দেন। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশি আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে এপ্রিল মাসে বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সভার অধিবেশন হয়। মহম্মদ আবদুল রসুল সাহেব সভাপতি নির্বাচিত হন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, অরবিন্দ ঘোষ, সুবোধ মল্লিক প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ওই সভায় যোগ দেবার জন্য বরিশালে যান। পুলিশ সভা ভেঙে দেয়। সুরেন্দ্রনাথ তার প্রতিবাদ করায় পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। অন্যেরা হেনস্থা হন। সুরেন্দ্রনাথের জরিমানা হয়। ওই অনাচারের পর বরিশালেই ভূপেন্দ্রনাথ বসু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে তাঁর ঐতিহাসিক ভবিষ্যৎ বাণী করেন, 'আজ ইংরেজ রাজত্বের শেষ হইল' (It is the beginning of the end of the British Empire)।

ভূপেন্দ্রনাথ ১৯০৪ থেকে ১৯১০ সাল পর্যন্ত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। ভারতীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে যোগ দেন ১৯১০ সালে। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন। ১৯১২-১৩ খ্রিস্টাব্দে রয়াল ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমিশন (Royal Industrial Commission) গঠিত হয়। মদনমোহন মালব্য ও ভূপেন্দ্রনাথ বসু মিলিতভাবে ওই কমিশনের কাছে ভারতের ভবিষ্যৎ শিল্পনীতির পরিকাঠামো ও রূপরেখার প্রতিবেদন পেশ করেছিলেন। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে ভূপেন্দ্রনাথ কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনের সভাপতি হন। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত-সচিবের বেসরকারি পরামর্শদাতারূপে বিলাত যান এবং সেখানে কিছুকাল সহকারী ভারত-সচিবের কাজ করেন। ওই সময় মন্টেগু-চেমসফোর্ডের শাসনসংস্কার আইন প্রণয়নে বিশেষ সহায়তা করেছিলেন। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে তিনি জেনেভা কনফারেন্স এবং পরের বছর রয়াল কমিশনের সদস্য হন। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে গভর্নর লর্ড লিটন নতুন শর্তসাপেক্ষে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ গ্রহণ করতে বলায় তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। তখন ভূপেন্দ্রনাথ বসুকে ওই পদে নিয়োগ করা হয়। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলার হন। ওই পদে থাকাকালীন ভূপেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয় (১৯২৪)।

ভূপেন্দ্রনাথ নানা স্বদেশি শিল্প সংস্থার এবং জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। বহু বিপ্লবী ও তাঁদের প্রতিষ্ঠান তাঁর গোপন দানে পরিপুষ্ট হয়েছিল।

ভূপেন্দ্রনাথ বসুর নামে শ্যামবাজার অঞ্চলে একটি প্রশস্ত রাস্তা আছে। রাস্তাটি শ্যামবাজার পাঁচ

মাথার মোড় থেকে আরম্ভ হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এগিয়ে যতীন্দ্রমোহন অ্যাভিনিউতে এসে মিশেছে। কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা এই সুদৃশ্য রাস্তাটি নির্মাণ করেন। এই রাজপথ নির্মাণের সময় ওই অঞ্চলের বেশ কিছু বস্তি, খাটাল এবং পুকুর ভরাট করা হয় এবং শ্যামবাজার স্ট্রিটের উত্তর-পূর্ব অংশের অবলুপ্তি ঘটে। এই শতাব্দীর চারের দশকে কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা রাস্তাটিকে কলিকাতা পুরসভাকে হস্তান্তরিত করেন। পুরসভা ১৯৪৩ সালে রাজপথটিকে ভূপেন্দ্রনাথ বসুর নামে 'ভূপেন্দ্র বসু অ্যাভিনিউ' নামাঙ্কিত করেন। এরপর ভূপেন্দ্রনাথ বসু মেমোরিয়াল কমিটি ওই নবনির্মিত রাস্তার ধারে ভূপেন্দ্রনাথের একটি আবক্ষ প্রস্তরমূর্তি স্থাপনে তৎপর হন। ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রতিষ্ঠিত বি. এন. বসু অ্যান্ড কোম্পানি এ বিষয়ে মেমোরিয়াল কমিটিকে যথাসাধ্য সাহায্য করেন। কলিকাতা পুরসভা ১৯৬০ সালে মেমোরিয়াল কমিটির আবেদন মঞ্জুর করেন। শ্যামবাজার স্ট্রিট ও ভূপেন্দ্রনাথ বসু অ্যাভিনিউ-এর সংযোগস্থলে ১৯৬৬-৬৭ সালের মধ্যে এই আবক্ষ মূর্তিটি স্থাপিত হয়।

ফিরে আসি বসু পরিবারের কথায়। ত্রৈলোক্যনাথ বসুর চার পুত্রের মধ্যে বর্ণময় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন যতীন্দ্রনাথ বসু (১৮৭২-১৯৪৬)। প্রখ্যাত আইনজীবী (সলিসিটার), সেকালের প্রসিদ্ধ কংগ্রেসসেবী, মোহনবাগান ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ও পরে সভাপতি, যতীন্দ্রনাথ সেকালের উত্তর কলিকাতার প্রায় সমস্ত জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। একসময় কলিকাতা পুরসভার অল্ডারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন। সদস্য হয়েছিলেন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার—১৯২১ থেকে আমৃত্যুকাল। মাত্র একবার সুভাষচন্দ্র বসুর কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। লন্ডনের গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন। সেকালের উত্তর কলিকাতায় তিনি একজন সর্বজনপ্রিয় পুরুষ ছিলেন। ১৯৯০ সালে শ্যামবাজারের পাল স্ট্রিট তাঁর নামে 'যতীন্দ্রনাথ বসু সরণি' নামাঙ্কিত হয়েছে।

যতীন্দ্রনাথ বসুর দ্বিতীয় ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ (১৮৭৪-১৯৩২) পেশায় ব্যারিস্টার হলেও খেলাধুলা, শরীরচর্চা, বয়েজ স্কাউট আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ভার-উত্তোলন প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। একসময় মোহনবাগান ক্লাবের সম্পাদক হয়েছিলেন।

শৈলেন্দ্রনাথ বসু (১৮৭৬-১৯৩১) ছিলেন যতীন্দ্রনাথ বসুর তৃতীয় ভ্রাতা। ৪৯ নম্বর বেঙ্গল রেজিমেন্টে শৈলেন্দ্রনাথ সুবেদার মেজর হয়েছিলেন। কবি কাজি নজরুল ইসলাম এই সৈন্যদলে নিযুক্ত হন। খেলাধুলার প্রতি ছিল শৈলেন্দ্রনাথের তীব্র আকর্ষণ। মুষ্টিযুদ্ধ শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, ব্যায়াম চর্চা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগাযোগ ছিল। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা ফুটবলের আই. এফ. এ.-র শিল্ড ফাইনালের সময় শৈলেন্দ্রনাথ ছিলেন মোহনবাগান ক্লাবের সম্পাদক।

উপেন্দ্রনাথ বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র ডাঃ মণি বসু (১৮৭৩-১৯৫৬) চিকিৎসা জগতের একজন খ্যাতিমান পুরুষ। কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের (এখন, আর. জি. কর মেডিকেল কলেজ) শুরু থেকে তিনি ওই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রথমে প্রফেসর অফ অ্যানাটমি, পরে ওই কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন।

ভূপেন্দ্রনাথ বসুর দুই পুত্র—সত্যেন্দ্রনাথ ও গিরীন্দ্রনাথ। উভয়েই ব্যারিস্টার ছিলেন। গিরীন্দ্রনাথ মাত্র ৩০ বছর বয়সে মারা যান। গিরীন্দ্রনাথের একমাত্র পুত্র কমলকুমার বসু উচ্চশিক্ষিত ও আইনজীবী। এককালে ভারতীয় সংসদের জনপ্রতিনিধি, কলিকাতা পুরসভার মেয়র এবং যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের অন্যতম রূপকার।

কলিকাতার ইতিহাসের বহু স্মৃতিবিজড়িত ঘটনার সাক্ষী এই ১৪ নম্বর বলরাম ঘোষ স্ট্রিটের বাড়িটি। স্বদেশি আন্দোলনের সময় এই ভবনটি ছিল তার অন্যতম কেন্দ্রভূমি। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম সারির নেতৃবৃন্দ এই বাড়িতে বহুবার এসেছেন। এখানে ছিল একটি সুদৃশ্য গেস্টহাউস। সেকালে হোটেলে থাকার প্রচলন ছিল কম। তাই স্বদেশি ও বিদেশি বহু মনীষী কলিকাতায় পদার্পণ করলে এই বাড়িতে অবস্থান করে গেছেন। এমনকি মহাত্মা গান্ধীও কিছুকাল ছিলেন এই বাড়িতে। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে এই ভবনের এক মনোহর স্মৃতিচিত্র উপহার দিয়েছেন। মোহনবাগান ক্লাবের প্রথম দিকের দপ্তরও ছিল এই ভবনে।[৩৬]

এই শতাব্দীর চারের দশকে এই ভবনের সঙ্গে গড়ে উঠেছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির এক

ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। মহিলা সমিতি, কিশোরবাহিনী, সান্ধ্য বিদ্যালয় প্রভৃতি সংগঠন এই বাড়ি থেকে পরিচালিত হত। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসে এই ভবনের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে।

২৩এ, বলরাম ঘোষ স্ট্রিটের এক প্রশস্ত এলাকা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে ডাফ হাই স্কুল ফর গার্লস। উত্তর কলিকাতার বিশিষ্ট বালিকা বিদ্যালয়গুলির অন্যতম। এই শিক্ষায়তন সম্বন্ধে কিছু বলার আগে রেভারেন্ড আলেকজান্ডার ডাফ সম্বন্ধে দু'চার কথা বলা প্রয়োজন।

সুপণ্ডিত, শিক্ষাব্রতী, অসাধারণ বাগ্মী, অনন্য সংগঠক আলেকজান্ডার ডাফ (১৮০৫-১৮৭৮) ১৮৩০ সালের ২৭শে মে কলিকাতায় পদার্পণ করেন। সে সময় তাঁর বয়স মাত্র ২৪ বছর। ২২ বছর বয়সে স্কটল্যান্ডের সেন্ট অ্যান্ড্রুজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. উপাধি গ্রহণ করেন। ১৮২৯ সালে তিনি যাজক বৃত্তি গ্রহণ করেন এবং ভারতবর্ষে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পিত হয়।

ডাফ সাহেবের জীবনে প্রধান তিনটি দিক—ভারতবর্ষের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা, খ্রিস্টধর্ম প্রচারের আকুলতা এবং এদেশে শিক্ষা বিস্তার। ১৮৬৩ সালে শেষবারের মতো ভারতবর্ষ থেকে বিদায় নেওয়ার সময়ে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, ভারতবর্ষের কথা তাঁর মনের মণিকোঠায় সবসময় গাঁথা থাকবে, ভারতবর্ষের মঙ্গলের জন্য কাজ করে যাবেন এবং সব শেষে এই আশা ব্যক্ত করেছিলেন যে তাঁর মৃত্যুর পর স্মৃতিস্তম্ভের ওপর এই পরিচয় লিপিবদ্ধ থাকবে, ''By profession a missionary by his life and labours, the true and constant friend of India.'' খ্রিস্টধর্ম প্রচারের ব্যাপারে তিনি বর্ণহিন্দু ও মধ্যবিত্তের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করে তাদেরকে খ্রিস্টধর্মে আকৃষ্ট করতে চেয়েছিলেন। শিক্ষাবিস্তারের ব্যাপারেও তিনি এই মতাদর্শ গ্রহণ করেছিলেন। বর্ণহিন্দুদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ও সেই সঙ্গে খ্রিস্টধর্মের মূলসূত্রগুলিকে ছাত্রদের মধ্যে প্রচারের নিমিত্ত ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন স্থাপন করেন। নানান ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি আজকের স্কটিশচার্চ কলেজ নামে পরিচিত। ধর্মপ্রচার ও জনহিতকর কাজের জন্য তিনি ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে 'ক্যালকাটা কোয়ার্টার্রলি' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এ ছাড়া দীর্ঘকাল 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি বেথুন সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকাল (১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ) থেকে তিনি তার অন্যতম সদস্য ছিলেন।

আলেকজান্ডার ডাফ এদেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। ১৮৫৭ সালে চিৎপুরের নিকট রামবাগানে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮৫৮ সালে সংবাদ প্রভাকরে সম্পাদকীয় নিবন্ধে এই বিদ্যালয় সম্বন্ধে যে মন্তব্য করা হয়েছিল তা উল্লেখ্য—'আমরা পরমাহ্লাদপূর্বক প্রকাশ করিতেছি যে গত সোমবার দিবসে শিমলানিবাসী স্বর্গবাসী আঁশুতোষ দেব মহাশয়ের ভবনে সুবিখ্যাত সর্বমান্য শ্রীযুক্ত রেবারেন্ড ডব সাহেবের স্থাপিত অভিনব বালিকা বিদ্যালয়ের বিদ্যার্থিনীবৃন্দের প্রথম বাৎসরিক প্রকাশ্য পরীক্ষা ও পারিতোষিক বিতরণের কার্য অতি উৎকৃষ্ট এবং সমারোহপূর্বক সুনির্বাহ হইয়াছে। ওই পরীক্ষা সমাজে কতিপয় সম্ভ্রান্ত সাহেব এবং অনেকগুলীন সম্ভ্রান্তা গুণবতী বিদ্যাবতী বিবি, আর এতদ্দেশীয় বহু সংখ্যক সম্ভ্রান্ত লোকের সমাগম হইয়াছিল।...বালিকারা অঙ্ক, বানান এবং শব্দার্থ প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের সুন্দররূপ পরীক্ষা প্রদানপূর্ব্বক পরীক্ষক ও পরীক্ষাদর্শক সকল ব্যক্তিকেই আশাতীত সীমাশূন্য সন্তোষ সাগরে ভাসমান করিয়াছে, অপিচ তাহারা যে সকল সূচের কার্য করিয়াছে, তদ্দৃষ্টে তাবতেরি নয়ন প্রফুল্ল হইল ; এতদ বিষয়ের জন্য আমরা প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত ডব সাহেবকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়া পরিশেষে শ্রীমতী গুণশালিনী বিবিধ বিদ্যানিপুণা উপদেশদায়িনী মিস টগুড এবং সদ্বিদ্বান সুশীল সদুপদেশক শ্রীযুক্ত বাবু ভবানীচরণ সেন মহাশয়কে মহানন্দে মনের সহিত সাধুবাদ প্রদান করিতেছি।'[৩৭]

আলেকজান্ডার ডাফের ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে ভারতত্যাগের পর স্কটিশ মিশনারিদের মহিলা শাখা ডাফ সাহেবের আরব্ধ কর্ম সম্পাদনে ব্রতী হন। ১৮৭৪ ও ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে মিস ফলকিনর (Miss Falkiner) শ্যামপুকুর ও শ্যামবাজারে আলেকজান্ডার ডাফের নামে দু'টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন

করেন। এর পর ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে মিস র‍্যাক (Miss Warrack) হাতিবাগানে এইরূপ আরেকটি শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে এই বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে স্থানের অকুলান দেখা দেয়। একটি বৃহৎ আয়তনের স্কুলের নিজস্ব অট্টালিকার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে স্থানীয় জমিদারের কাছ থেকে স্কটিশ মিশন বর্তমান স্কুলগৃহের পশ্চিম দিকের অংশ ক্রয় করেন। ১৯১৬ সালে ভবনের নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়। ওই বছরের ১৩ই মার্চ ছোটলাট লর্ড কারমাইকেল বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নতুন স্কুলগৃহের উদ্বোধন করেন। ওই দিনই শ্যামপুকুরের স্কুলটি বলরাম ঘোষ স্ট্রিটের নতুন ভবনে উঠে আসে। সে সময় ওই বিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যা ছিল ২০৪ জন। নতুন ভবনে স্থান সংকুলান না হওয়ায় রামবাগান, হাতিবাগান ও শ্যামবাজারের বিদ্যায়তনগুলিকে পূর্বের স্থানেই রাখা হয়। শিক্ষিকাদের বাসস্থানের জন্য নতুন ভবনের এক অংশে হোস্টেলের ব্যবস্থা ছিল।

স্কুল গৃহের পূর্বদিকে ছিল একটি ডোবা, ধোপাদের বসতি ও খোলা মাঠ। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ধোপারা ডোবায় কাপড় কাচত। শীতের সময় যাযাবর জিপসিদের তাঁবু পড়ত এই খোলা মাঠে। আর মাঝে মাঝে ধোপাদের গৃহপালিত গাধাগুলির চিৎকারে বিদ্যালয়ের পঠনপাঠনের ব্যাঘাত ঘটত। স্কুল কর্তৃপক্ষ অতঃপর ব্যবস্থা গ্রহণে তৎপর হন। ১৯২৫ সালে ওই জমি কিনে, ডোবা ভরাট করে বিদ্যালয় ভবন সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৩০ সালে নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়। ওই বছরই রামবাগান, হাতিবাগান ও শ্যামবাজারের স্কুল বলরাম ঘোষ স্ট্রিটের নবনির্মিত ভবনে চলে আসে। চার বিদ্যালয় মিলেমিশে একাকার হয়ে 'ডাফ হাই স্কুল ফর গার্লস' নামে অভিহিত হয়।[৩৮]

প্রাচীন সুতানুটিতে শ্যামপুকুর স্ট্রিট পশ্চিম দিকে শ্যামাবাজার স্ট্রিট থেকে শুরু হয়ে পূর্বদিকে এগিয়ে সারকুলার রোডের কাছ বরাবর এসে পড়েছিল। মার্ক উডের মানচিত্রে (১৭৮৪-৮৫) এবং শক সাহেবের মানচিত্রে (১৮২৫-৩২) রাস্তাটি একইভাবে দেখানো আছে। কিন্তু সীম সাহেবের কলিকাতা মানচিত্রে (১৮৫২-৫৬) এই রাস্তাটি দু'ভাগে দেখানো হয়েছে—শ্যামপুকুর স্ট্রিট কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের পশ্চিম অবধি প্রসারিত এবং তারপরের অংশটুকু অর্থাৎ কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের পূর্বদিক থেকে সারকুলার রোড পর্যন্ত অংশটুকু সিকদার বাগান স্ট্রিট এই নতুন নামে নামাঙ্কিত হয়েছে। ১৮৪৩ সালের কলিকাতা পুরসভার Assessment Register-এ সিকদার বাগান স্ট্রিট প্রথম নথিভুক্ত হতে দেখা যায়। সম্ভবত ফড়িয়াপুকুর স্ট্রিটের মতো সিকদার বাগান স্ট্রিটেরও ১৮৪০ সালের পর নতুন নামকরণ হয়ে থাকবে।

কলিকাতার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে শ্যামপুকুরের অবদান কম নয়। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে জজ সারদাপ্রসাদ বসু 'হিন্দু বেনাভোলেন্ট ইনস্টিটিউশন' শ্যামপুকুরে প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে বিনা বেতনে শিক্ষা দেওয়া হত। হেয়ার ও ডিরোজিও সাহেব আসতেন। প্রথমে এই বিদ্যালয় প্যারীচাঁদ মিত্রের বাড়িতে ও পরে সারদাপ্রসাদের নিজ বাড়িতে স্থাপিত হয়। হিন্দু স্কুলের তৃতীয় শিক্ষক পাস্কেল সাহেব প্রায়ই ছাত্রদের পরীক্ষা নিতেন। কিশোরীচাঁদ মিত্র, কালীকৃষ্ণ মিত্র, রাজকৃষ্ণ মিত্র এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। স্কুলের অস্তিত্ব বেশিদিন ছিল না। সমাচার দর্পণ বলেন—১৮৩১ সালের ১৫ই মার্চ এই বিদ্যালয় ১৫, শ্যামপুকুরে প্রতিষ্ঠিত হয়। হিন্দু বেনাভোলেন্ট ইনস্টিটিউশনের একটি সহকারী পাঠশালা ১৮৩৭ সালের ১লা জুন তারিখে শ্যামবাজারে ৩১নং বাড়িতে স্থাপিত হয়। প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দেবীপ্রসাদ বসু ও কৃষ্ণহরি বসু।[৩৯]

শ্যামপুকুর পল্লীর সাথে একসময় নিবিড় সম্পর্কে আবদ্ধ ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব। তাঁর পরম ভক্ত নেপালি সন্তান বিশ্বনাথ উপাধ্যায় ২৫ নম্বর শ্যামপুকুর স্ট্রিটের বাড়ির এক অংশ ভাড়া নিয়ে বাস করতেন। বিশ্বনাথকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব 'কাপ্তেন' বলতেন। তাঁর পিতা ইংরেজ ফৌজের সুবেদার ছিলেন। শোনা যায় সুবেদার যুদ্ধক্ষেত্রে একহাতে বন্দুক অন্য হাতে শিবপূজা করতেন। কাপ্তেনেরও হিন্দুশাস্ত্রে গভীর জ্ঞান ছিল। তিনি নেপালের রাজার উকিল ছিলেন এবং রাজার প্রতিনিধিরূপে কলিকাতায় বাস করতেন। প্রথম জীবনে কাপ্তেন হাওড়া জেলার অন্তর্গত লিলুয়াতে নেপালিদের একটি শাল কাঠের কারখানায় গোমস্তার চাকুরি নিয়ে কলিকাতায় আসেন। এই সময়

তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সান্নিধ্যে আসেন। কিছুকাল পরে এক তহবিল তছরূপের দায়ে তাঁর নামে নালিশ হওয়ায় কাপ্তেনকে নেপাল রাজার দরবারে ডেকে পাঠানো হয়। নিরপরাধ কাপ্তেন শ্রীরামকৃষ্ণের শরণাপন্ন হন। তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে কাপ্তেন নেপাল যাত্রা করেন। বলাবাহুল্য, কাপ্তেনের হিসাবপত্র দেখে নেপাল-নরেশ সন্তুষ্ট হন এবং তাঁকে আরও উচ্চ পদ দিয়ে কলিকাতায় প্রেরণ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব কয়েকবার কাপ্তেনের এই শ্যামপুকুরের বাড়িতে পদার্পণ করেছিলেন। সে কাহিনী কয়েকটি প্রামাণিক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, স্বামী অখণ্ডানন্দ রচিত 'স্মৃতিকথা', রামচন্দ্র দত্ত প্রণীত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত' প্রভৃতি পুস্তকে।

২৫ নম্বর শ্যামপুকুর স্ট্রিটের যে বাড়িতে 'কাপ্তেন' বাস করতেন, ওই বাড়ির মালিক ছিলেন রাজা রাধাকান্ত দেবের পৌত্র যতীন্দ্র দেব। তিনিও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একজন বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তাঁরও দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত ছিল। কথামৃত গ্রন্থের ৫ম ভাগে এ কথা উল্লেখ আছে। শ্যামপুকুরে দেবেদের বাড়িটি প্রকাণ্ড। তিনতলা। ভেতরে ছিল কয়েকটি বাগান। সমগ্র বাড়িটি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। ভবন কারুকার্যমণ্ডিত। বর্তমানে শোভাবাজারের দেব পরিবারের এক অংশ এই বাড়িতে বাস করেন।

৩০, শ্যামপুকুর স্ট্রিটের মালিক ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের মন্ত্রশিষ্য, গিরিশচন্দ্র ঘোষের একান্ত সুহৃদ্, স্বামী বিবেকানন্দের 'দানাকালী' ওরফে কালীপদ ঘোষ। তিনিই এই বাড়ি নির্মাণ করেন। প্রথমে এটি ছিল একতলা, পরে এটি তিনতলা করা হয়। ১৮৮৪ সালের নভেম্বর মাসে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পদার্পণে এই বাড়ি ধন্য হয়। তাই রামকৃষ্ণ-ভক্তদের কাছে এই ভবনের বিশেষ গুরুত্ব আছে।

ঘোষ পরিবারের চন্দ্রশেখর ঘোষ প্রথমে গোবিন্দপুর গ্রামে বসবাস শুরু করেন। ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নির্মাণের সময় ঘোষপরিবার কোম্পানির নির্দেশে গোবিন্দপুর ত্যাগ করেন। কোম্পানি তাঁদের শ্যামপুকুরে থাকার বন্দোবস্ত করে দেন। এই ঘোষপরিবার আখনা-কায়স্থ সমাজের অন্তর্গত। কালীপদ ঘোষ (১৮৪৯-১৯০৫) ছিলেন চন্দ্রশেখরের পৌত্র। তাঁর সময় থেকে এই পরিবারের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। তিনি ছিলেন সেকালের বিখ্যাত বিলাতি কাগজ প্রস্তুতকারক জন ডিকিনসন কোম্পানির (Messrs John Dickinson) বড়বাবু। তাঁর সুযোগ্য পরিচালনার গুণে কোম্পানির উত্তরোত্তর উন্নতি ঘটে। সারা ভারতে কোম্পানির শাখা স্থাপিত হয়। সেই সঙ্গে কালীপদর আর্থিক উন্নতি ও খ্যাতিলাভ হয়। তিনি নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্রের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও অনুরাগী ছিলেন। গিরিশচন্দ্র 'শঙ্করাচার্য' পুস্তকখানি তাঁকে উৎসর্গ করেন।

প্রথম জীবনে কালীপদ উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির ছিলেন। তাঁর সহধর্মিণী ছিলেন কৃষ্ণপ্রিয়াঙ্গিনী ঘোষ। তিনি মতিলাল মিত্রের কন্যা। রামধন মিত্রের পৌত্রী। রামধন মিত্রের নামে শ্যামপুকুরে একটি রাস্তা আজও আছে। কৃষ্ণপ্রিয়াঙ্গিনী শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও মা সারদার আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে স্বামীকে গৃহাভিমুখী করার প্রচেষ্টা দীর্ঘ দিন চালিয়েছিলেন। পরে শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে এসে তাঁর কৃপালাভ করে গিরিশ ঘোষের মতো কালীপদও একজন গৃহীশিষ্য ও একান্তসেবক হয়েছিলেন। শ্যামপুকুর বাটিতে শ্রীরামকৃষ্ণ যখন চিকিৎসার জন্য ছিলেন, সে সময় কালীপদ নানাভাবে তাঁর সেবা করেছিলেন। এই সময় তিনি নটী বিনোদিনীকে ছদ্মবেশে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে নিয়ে যান। নটী বিনোদিনীর নিখুঁত ছদ্মবেশ ধারণের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ তারিফ করেন এবং তাঁকে ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখতে বলেন।

কালীপদ ঘোষের জ্যেষ্ঠ পুত্র বরেন্দ্রকৃষ্ণ (১৮৭৫-১৯২২) কর্মবীর ও কৃতীপুরুষ ছিলেন। ১৪ বছর বয়সে জন ডিকিনসন কোম্পানির কাজে প্রবেশ করেন। স্বীয় অধ্যবসায় এবং চরিত্রগুণে ক্রমে ওই প্রতিষ্ঠানের ভারতীয় কর্মচারীদের অধ্যক্ষ হন। পরে ওই চাকুরি ত্যাগ করেন এবং স্বাধীন ব্যবসায় প্রবৃত্ত হন। বরেন্দ্রকৃষ্ণের অক্লান্ত চেষ্টা, যত্ন ও অধ্যবসায়ের ফলেই আমেদাবাদে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিল ও শ্রীবিবেকানন্দ মিল প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল। তিনি কিছুকাল বঙ্গলক্ষ্মী কাপড়ের কলের পরিচালক ছিলেন। এ ছাড়া ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানি স্থাপনে বোম্বাইয়ের ব্যবসায়ী মহলে অগ্রণী বলে গণ্য হন। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। তাঁর চেষ্টায় ভারতের নানা স্থানে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। চিরকুমার বরেন্দ্রকৃষ্ণ এইভাবে দেশের সেবায়, দেশের

শিল্পোন্নতির জন্য আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ৩১ নম্বর শ্যামপুকুর স্ট্রিটের বাড়িটি তাঁরই নির্মিত। সে-কালের কলিকাতার বহু জ্ঞানীগুণীর পদধূলিতে এ বাড়ি ধন্য হয়েছিল।

কালীপদ ঘোষের দ্বিতীয় পুত্র হরেন্দ্রকৃষ্ণ একজন কৃতী শিল্পসংগঠক ছিলেন। ১৯২০ সালে H. K. Ghose & Co. নামে কাগজের ব্যবসা পত্তন করেন। সে কারবার আজও আছে। এ ছাড়া বৃদ্ধ বয়সে কোন্নগরে শ্রীদুর্গা কটন মিল স্থাপন করেন। বর্তমানে ৩০ ও ৩১নং শ্যামপুকুর স্ট্রিটের বাসভবন ঘোষ পরিবারের উত্তরপুরুষদের অধিকারে আছে।[৪০]

বহুমানভাজন সাহিত্যিক, প্রবন্ধকার, সমালোচক, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দৌহিত্র সুরেশ সমাজপতি (১৮৭০-১৯২১) রামধন মিত্র লেনে বাস করতেন। তাঁর মৃত্যুর বছরে গুণমুগ্ধ পল্লীবাসী তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে 'সমাজপতি স্মৃতিসমিতি' লাইব্রেরি প্রথমে রামধন মিত্র লেনে ভদ্রদের বাড়িতে, পরে শ্যামপুকুর স্ট্রিটে স্থাপন করেন। চারুচন্দ্র মজুমদার ৪৭ই, শ্যামপুকুর স্ট্রিটে অবস্থিত তাঁর বাসভবনের একটি ঘর গ্রন্থাগারের জন্য ছেড়ে দেন। পুস্তকের সংগ্রহ ভালই। আজও গ্রন্থাগারটির জয়যাত্রা অব্যাহত।

শ্যামপুকুর পল্লীর সাথে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গভীর সম্পর্কের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। ৫৫, শ্যামপুকুর স্ট্রিটের বাড়ি থেকে তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছিল। রামকৃষ্ণদেবের এই বাড়িতে থাকাকালীন বহু নামী অনামী ব্যক্তির পদধূলি পড়েছিল শ্যামপুকুর স্ট্রিটে। এ ছাড়া তাঁর ভক্ত শিষ্যবৃন্দ কাপ্তেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায়, কালীপদ ঘোষ ওরফে 'দানাকালী', প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ছোট নরেন প্রমুখ এই শ্যামপুকুরে বসবাস করতেন।

শ্যামপুকুরের যে বাড়ি থেকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছিল সেটি আজ 'শ্যামপুকুর বাটী' নামে খ্যাত। ১৮৮৫ সালের জুন মাসে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব গলায় ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হন। সেপ্টেম্বর মাসে ওই রোগ ভয়াবহ আকার ধারণ করে। প্রবীণ ভক্তগণ রামকৃষ্ণদেবের চিকিৎসার জন্য শিবু ভট্টাচার্যের পুত্র গোকুল ভট্টাচার্যের ৫৫নং শ্যামপুকুর স্ট্রিটের বৈঠকখানা বাড়িটি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের থাকার জন্য ভাড়ায় গ্রহণ করেন। শিবু ভট্টাচার্য সেকালের শ্যামপুকুর অঞ্চলের একজন বিত্তশালী ব্যক্তি ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহীভক্ত কবি অক্ষয়কুমার সেন তাঁর রচিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি'তে বাড়িটির কথা এইভাবে উল্লেখ করেছেন :

"শ্যামপুকুরের মধ্যে বাড়ি হইল স্থির।
যাহার পশ্চিমে এক শিবের মন্দির ॥
দ্বিতল মহল বাড়ি, মাস ভাড়া ধার্য।
গৃহস্বামী নামজাদা শিবু ভট্টাচার্য ॥'

শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্যামপুকুরের এই ভাড়াবাড়িতে ১৮৮৫ সালের ২রা অক্টোবর থেকে ১২ই ডিসেম্বর পর্যন্ত ৭০ দিন ছিলেন। একমাত্র কাশীপুর উদ্যানবাটী ছাড়া এককালীন এত দীর্ঘদিন কলিকাতায় কোনও বাড়িতে বাস করেননি। এই বাড়ির সঙ্গে যাঁদের পবিত্রস্মৃতি বিজড়িত, তাঁরা হলেন মা সারদামণি, স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর গুরুভাইরা, প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, ডাঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, কীর্তিমান চিত্রকর অন্নদা বাগচী প্রমুখ। এই বাড়িতেই ১৮৮৫ সালের ৬ই নভেম্বর কালীপূজার দিন ভক্তেরা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ দেবী রূপে পূজা করেছিলেন। আর তিনি সমাহিত অবস্থায় ভক্তদের একহাতে বর অন্য হাতে অভয় প্রদান করেছিলেন। তাই রামকৃষ্ণদেবের স্মৃতিবিজড়িত এই ভবনটি তাঁর ভক্তবৃন্দের কাছে এক পরমতীর্থে পরিণত হয়েছে। পরবর্তীকালে এই বাড়িতে স্থাপিত হয় 'শ্যামপুকুর বাটী শ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণ সংঘ'। সে কথায় আমরা এবারে আসছি।

শ্যামপুকুরের এই বাড়ি থেকে রামকৃষ্ণদেব কাশীপুরে চলে যাবার পর বাড়িটি বহু দিন পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়েছিল। প্রকৃতপক্ষে এটিকে লোকে ভুতুড়ে বাড়ি মনে করত। পরবর্তীকালে প্রয়াত গোকুল ভট্টাচার্যের পরিবারের কাছ থেকে স্থানীয় বাসিন্দা কৈলাস বসু শ্যামপুকুরের এই বাড়িটি কিনে নেন এবং এটিকে দু'ভাগ করেন—৫৫এ এবং ৫৫বি, শ্যামপুকুর স্ট্রিট। ৫৫এ অংশে রামকৃষ্ণদেব বাস করতেন।

কৈলাস বসু শ্যামপুকুর স্ট্রিটের ৮নং বাড়িতে বাস করতেন। সামান্য অবস্থা থেকে স্বীয় অধ্যবসায়, কর্মকুশলতা ও সূক্ষ্ম আইনজ্ঞানের দ্বারা লব্ধপ্রতিষ্ঠিত ব্যবহারজীবীরূপে খ্যাতি ও বিত্তের অধিকারী হন। একসময় তাঁর বর্তমান বসতবাড়িতে পুরানো শ্যামপুকুর থানা অবস্থিত ছিল। কৈলাস বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র কিরণচন্দ্র বসু ছিলেন পিতার মতো খ্যাতনামা আইনজীবী। নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ছিল তাঁর সক্রিয় সম্বন্ধ। তাঁর একমাত্র পুত্র সন্তোষকুমার বসু। তিনি শ্যামপুকুরের ৫৫-এ সংখ্যক ভবনটির তত্ত্বাবধানের ভার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণ সংঘকে অর্পণ করেন।

এই শতাব্দীর সাতের দশকে এই বাড়ির আবাসিকা শ্রীমতী লক্ষ্মী গোস্বামীর উদ্যোগে এবং পল্লীর কয়েকজন উৎসাহী যুবকের অনুপ্রেরণায় ১৯৭৮ সালের ২৭শে আগস্ট 'শ্যামপুকুর বাটী শ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণ সংঘ' স্থাপিত হয়। বাড়ির মালিক সন্তোষকুমার বসুর ইচ্ছায় এই বাড়ির তত্ত্বাবধানের ভার সংঘের উপর ন্যস্ত হয়। সংঘ ভবনটি সুসংস্কৃত করে এবং এই বাড়ির দোতলায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ব্যবহৃত কক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, মা সারদামণি ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতি একটি বেদীর ওপর স্থাপন করে প্রতিদিন পূজা-অর্চনা ও পাঠের ব্যবস্থা হয়। এই সংঘটি পরিচালনা করেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহীভক্তগণ। সংঘের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধু-সন্ন্যাসীগণ এবং রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের প্রব্রাজিকাগণ অংশগ্রহণ করে সংঘকে উৎসাহিত করেন।

এই ভবনের বহির্গাত্রের এক শ্বেত পাথরের ফলকে ইংরেজিতে এই কথা কটি লেখা আছে :

"Here lived for sometime Sri Sri Ram Krishna Paramhangsa Dev"। বাড়ির লাগোয়া প্রাচীন শিবমন্দিরটি আজও আছে।[৪১]

শ্যামপুকুর অঞ্চলের প্রাচীনতম বাড়িগুলির মধ্যে ১নং শ্যামপুকুর স্ট্রিট অন্যতম। পরবর্তীকালে এই বাড়িটি ১, ১/১ ও ১/২ অংশে বিভক্ত হয়। এটি নির্মাণ করেছিলেন বর্তমান মুখার্জি পরিবারের পূর্বপুরুষ কৃষ্ণহরি মুখোপাধ্যায়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তিনি বর্ধমান থেকে স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য কলিকাতায় আসেন। কৃষ্ণহরির তিন পুত্র—বিনয়কৃষ্ণ, জয়কৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্ণ। কনিষ্ঠ বিজয়কৃষ্ণ এই বংশের কৃতী সন্তান। তিনি তখনকার দিনের এল. এম. এস. পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে এই অঞ্চলের উদারহৃদয় ও বিজ্ঞ চিকিৎসকরূপে বিপুল সম্মান ও শ্রদ্ধার অধিকারী হন। ১৯৩৪ সালে ৭৪ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। বিজয়কৃষ্ণের তিন পুত্র—অতুলকৃষ্ণ, অখিলকৃষ্ণ ও অনিলকৃষ্ণ। অতুলকৃষ্ণ ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রগাঢ় জ্ঞান এবং ভবিষ্যৎ দৃষ্টির কথা এই অঞ্চল ছাড়িয়ে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। তাঁর চার পুত্রের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বর্তমানে সঙ্গীতশিল্পী রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত।

বিপ্লবী, স্বাধীনতাসংগ্রামী অনুশীলন সমিতির সদস্য, স্বাধীনতার পরবর্তীকালে পশ্চিমবাংলার মন্ত্রী হেমন্তকুমার বসু (১৮৯৫-১৯৭১) সময় সময় ৪নং শ্যামপুকুর স্ট্রিটে বাস করতেন। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে ভারতে ব্রিটিশ শাসকদের ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসু ও বাঘা যতীনের নেতৃত্বে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানে তিনি অংশগ্রহণ করেন। এ ছাড়া নানা আন্দোলনে যোগদান করে বহুবার কারারুদ্ধ হন। সুভাষচন্দ্রের বন্ধু ও অনুগামী ছিলেন হেমন্ত বসু। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে সুভাষচন্দ্রের নির্দেশে বামদলগুলিকে সংহত করার চেষ্টা করেন। সুভাষচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত ফরোয়ার্ড ব্লকের বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির সাধারণ সম্পাদক হন। সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের পর তাঁকেই দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হয়। ১৯৪৬ সালে বিধানসভার সভ্য হন। ১৯৪৮-এ কংগ্রেস ত্যাগ করে ফরোয়ার্ড ব্লকের প্রার্থীরূপে প্রতিটি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হন। ১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় পূর্তমন্ত্রী হন। তিনি সকলের শ্রদ্ধেয় ও জনপ্রিয় হওয়া সত্ত্বেও শ্যামপুকুর স্ট্রিটের ওপর প্রকাশ্য দিবালোকে একদল যুবকের হাতে খুন হন (১৯শে ফেব্রুয়ারি ১৯৭১)। শ্যামপুকুর স্ট্রিটে যে স্থানে তিনি নিহত হয়েছিলেন সেখানে তাঁর একটি আবক্ষ মূর্তি স্থাপিত হয়েছে। এই শতাব্দীর সাতের দশকে কলিকাতা পুরসভা হেমন্ত বসুর স্মৃতির উদ্দেশে ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, ডালহৌসি স্কোয়ার ইস্ট ও গভর্নমেন্ট প্লেস ইস্ট (আংশিক)-এর নাম পরিবর্তন করে হেমন্ত বসু সরণি নামাঙ্কিত করেন। টালা ব্রিজও তাঁর

নামে নামাঙ্কিত করা হয়েছে।

শ্যামপুকুর স্ট্রিটের ৫ নম্বর ঘটক বাড়ি আভিজাত্যে, স্বদেশিয়ানায় বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে। ভবতোষ ঘটক (১৮৯১-১৯৫৮) ছিলেন এই বাড়ির প্রাণপুরুষ। এঁরা চট্টোপাধ্যায়, কুলীন ব্রাহ্মণ, ঘটক এঁদের উপাধি। পিতা কার্তিকচন্দ্র ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে চন্দননগরে বসবাস শুরু করেন। বাল্যকাল থেকে ভবতোষ ঘটকের ব্যবসার প্রতি অনুরাগ জন্মায়। বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে জীবনের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন এবং লোহার ব্যবসায় প্রবৃত্ত হন। অদম্য উৎসাহ এবং আন্তরিক কর্মকুশলতায় হাওড়ায় 'কুসুমিকা আয়রন ওয়ার্কস' নামে একটি লোহার কারখানা ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে স্থাপন করেন। প্রতিষ্ঠানটি মাতা কুসুমিকা দেবীর নামে নামাঙ্কিত করেন। ভবতোষ ঘটকের সুযোগ্য পরিচালনায় প্রতিষ্ঠানটির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। একসময় বাংলা দেশে অন্যতম শ্রেষ্ঠ লৌহ কারখানারূপে চিহ্নিত হয়। সে সময়ের কলিকাতায় শ্রেষ্ঠ লৌহ ব্যবসায়ীরূপে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন ভবতোষ ঘটক।

ভবতোষ ঘটক একাধারে যেমন ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী অন্যদিকে ছিলেন গভীর স্বদেশপ্রেমী। তাঁর চন্দননগরের বিশাল ভবনে একসময় বিপ্লবীদের আস্তানা ছিল। শ্রীঅরবিন্দের ভ্রাতা বারীন্দ্র একদা আত্মগোপন করেছিলেন এই বাড়িতে। বহু বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী তাঁর গোপন সাহায্য লাভ করেছিলেন। শোনা যায়, সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজকে কলিকাতা থেকে গোপনে অর্থ সাহায্য পাঠিয়েছিলেন ভবতোষ ঘটক।

বসুমতী পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র সতীশচন্দ্রের সঙ্গে ছিল ভবতোষ ঘটকের গভীর সৌহার্দ্য। সতীশচন্দ্র তাই তাঁর দুই কন্যার সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করলেন ঘটক পরিবারের দুই সন্তানকে। একজন ভবতোষ ঘটকের দ্বিতীয় পুত্র স্বনামধন্য সাহিত্যিক প্রাণতোষ ঘটক (১৯২৩-৭০), অন্যজন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র নির্বাণিতোষ ঘটক। একমাত্র পুত্র রামচন্দ্রের অকালমৃত্যুতে সতীশচন্দ্র শোকে ভেঙে পড়েন, অল্পকাল পরেই তাঁর মৃত্যু হয়। বসুমতী পত্রিকা পরিচালনার ভার অর্পিত হল ভবতোষ ঘটকের উপর। তিনি প্রাণতোষকে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে বসুমতী মাসিক পত্রিকার সম্পাদক করেন।

প্রাণতোষ টাউন স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন। এম.এ. ও আইন পড়তে পড়তে মাসিক বসুমতী পত্রিকার সম্পাদক হন। 'পঙ্গপাল' বইটি প্রথম তাঁকে সাহিত্যিকরূপে প্রতিষ্ঠা দেয়। তিনি মাসিক বসুমতীকে নবরূপে প্রকাশিত করেন, বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকদের আমন্ত্রণ করে বসুমতীতে নিয়ে আসেন। এইভাবে বসুমতীতে নতুন প্রাণের জোয়ার এনে দিয়েছিলেন। নিজেও সাহিত্যিকরূপে খ্যাতিলাভ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'আকাশ পাতাল', 'রাজায় রাজায়', 'তিন পুরুষ', 'খেলাঘর' প্রভৃতি। 'রত্নমালা' নামে নতুন একটি অভিধানও প্রণয়ন করেন। সাহিত্যিক প্রাণতোষ ঘটকের কাছে বরেণ্য সমাজসেবী, খ্যাতিমান সাহিত্যিকদের নিয়মিত আনাগোনা ছিল।

বসুমতীর সম্পর্ক ধরে রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে ঘটক পরিবারের গড়ে ওঠে এক অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। ভবতোষ ঘটক স্বয়ং সারদামাতার বিশেষ স্নেহধন্য ছিলেন।

ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্র ধরে ঘটক পরিবারের কলিকাতার সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রথম দিকে ভবতোষ ঘটক চন্দননগর থেকে কলিকাতায় যাওয়া-আসা করতেন। পরবর্তীকালে ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৯২৮ সালে শ্যামপুকুর স্ট্রিটের ৫ নম্বর ভবনটি. কেনা হয়। ঘটক পরিবারের আরেকটি বাড়ি আছে ৮ নম্বর শ্যামপুকুর স্ট্রিটে। কর্মব্যস্ত ব্যবসায়ী হওয়া সত্ত্বেও ভবতোষ ঘটকের বহু সংস্থা ও সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সক্রিয় সংযোগ ছিল। তাই সেকালের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁর শ্যামপুকুরের বাড়িতে প্রায়ই আসতেন—তাঁরা হলেন ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, নলিনীরঞ্জন সরকার, কিরণশঙ্কর রায় এবং আরও অনেকে। দেশ তখনও বিদেশি শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়নি। এইসব বিশিষ্ট ব্যক্তির সমাবেশে দেশ ও দশের সমস্যা আলোচনা হত। ভারত স্বাধীন হবার পর এইসব নেতৃবৃন্দই পশ্চিমবাংলার হর্তা-কর্তা-বিধাতা হয়েছিলেন।

স্যার অতুল চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৪-১৯৫৫) শ্যামপুকুর তথা বাংলাদেশের একজন কৃতী সন্তান। তিনি এক সময় ১৩নং শ্যামপুকুর স্ট্রিটে বাস করতেন। কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে স্নাতক হবার পর ভারত সরকারের বৃত্তি নিয়ে কেমব্রিজের কিংস কলেজে প্রবেশ করেন এবং সেখান থেকে অনার্সসহ গ্রাজুয়েট হন। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে আই.সি.এস. (I.C.S.) পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে যুক্তপ্রদেশে সরকারি চাকুরি গ্রহণ করেন। প্রাদেশিক সরকারের নানা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের পর ভারত সরকারের বোর্ড অব ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যান্ড মিউনিসানস্-এর মেম্বার হন (১৯২০)। পরবর্তীকালে ইন্টারন্যাশনাল লেবার কনফারেন্সে ভারত সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন। ইতিমধ্যে স্যার অতুল ব্রিটেনে হাই-কমিশনার নিযুক্ত হন। তিনি আন্তর্জাতিক লেবার কনফারেন্সের সভাপতির পদও অলংকৃত করেন।

স্যার অতুল চট্টোপাধ্যায়ের সবচেয়ে বড় অবদান লন্ডনে ভারতের হাই-কমিশনারের নিজস্ব ভবন নির্মাণ এবং ভারতীয় শিল্পীদের দ্বারা সেই ভবনের অভ্যন্তরীণ অলংকরণের ব্যবস্থা। স্যার অতুল ১৯২৫ সালে ব্রিটেনে ভারতের হাই-কমিশনার নিযুক্ত হন। ওই পদে তিনি ১৯৩১ সাল পর্যন্ত ছিলেন।

এ কথা সকলেরই জানা আছে ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে ইংল্যান্ডে প্রথম ভারতীয় হাই-কমিশনার পদ সৃষ্টি হয়। প্রথম হাই-কমিশনার স্যার উইলিয়াম মিয়ার (অক্টোবর ১৯২০)। তিনি লন্ডনের একটি ভাড়া বাড়িতে বসে তাঁর কার্য পরিচালনা করতেন। দু' বছর পরে স্যার উইলিয়ামের মৃত্যু হলে স্যার দাদিরা দালাল দ্বিতীয় হাই-কমিশনার নিযুক্ত হন। আঠারো মাস পরে তিনি পদত্যাগ করেন। এরপর তৃতীয় হাই-কমিশনার নিযুক্ত হন স্যার অতুল চ্যাটার্জী। তিনিই প্রথম অনুভব করেন যে হাই-কমিশনারের বিভিন্নমুখী কর্মধারাকে সুসংহত করতে হলে তাঁর নিজস্ব ভবন থাকা একান্ত দরকার। তাঁর উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার ফলে ভারতীয় হাই-কমিশনারের নিজস্ব ভবন নির্মাণের ব্যবস্থা হয়। লন্ডনের অ্যালডুইচে জায়গা নেওয়া হয়। স্থপতি স্যার হারবার্ট বেকারের (১৮৬২-১৯৪৬) পরিকল্পনানুসারে ইন্ডিয়া হাউস নির্মিত হয়। এই হারবার্ট বেকারই ছিলেন ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লির অন্যতম রূপকার।

স্যার অতুল ইন্ডিয়া হাউসকে বাস্তবিকই এক আকর্ষণীয় ভারত ভবন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ভবন নির্মাণের মধ্য দিয়ে যাতে পরিস্ফুট হয়ে উঠতে পারে তার দিকে স্যার অতুলের সজাগ দৃষ্টি ছিল। স্যার হারবার্ট স্যার অতুলের মনের ইচ্ছা জানতেন। তাই ইন্ডিয়া হাউস পরিকল্পনা রূপায়ণের সময় স্যার অতুলের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। ইন্ডিয়া হাউসের সমাপ্তিতে স্যার অতুলের ঈপ্সিত আকাঙ্ক্ষার প্রতিচ্ছবি যথার্থই প্রতিফলিত হয়েছিল।

ইন্ডিয়া হাউসের অভ্যন্তরীণ রূপসজ্জার কর্মসূচী রূপায়ণের ভার নেন স্যার অতুল স্বয়ং। তার কারণও ছিল। ভারতের শিল্পকলার ঐতিহ্য ও তার সমকালীন চিত্রকলা সম্পর্কে স্যার অতুলের ছিল গভীর জ্ঞান। এই জন্য তিনি রণদাচরণ উকিল, ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মন, সুধাংশু চৌধুরী ও ললিতমোহন সেন—এই চারজন ভারতীয় চিত্রশিল্পীকে দিয়ে ফ্রেস্কোর সাহায্যে ভারত ভবনের অভ্যন্তরের অলংকরণের এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই নির্বাচিত শিল্পীরা ভারতীয় শিল্পরীতিতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

শিল্পী সুধাংশু চৌধুরীর লেখা এক চিঠিতে স্যার অতুলের ভারতের শিল্পরীতির প্রতি গভীর অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। পত্রটি তিনি ব্রিটেন থেকে প্রখ্যাত চিত্রসমালোচক ও শিল্পী অর্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলিকে লিখেছিলেন—

"স্যার অতুল আমাদের একদিন চায়ের আসরে নিমন্ত্রণ করেন। কতকগুলি বিশিষ্ট ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার জন্যে। সবাই বিদায় নেবার পর স্যার অতুল বললেন, প্রফেসর রদেনস্টিন যাই বলুন না কেন তোমরা যেন নিজেদের ভুলে যেও না। আমি চাই তোমাদের ছবির ভিতর সত্যকার জ্ঞানী ও ধ্যানী ভারতকে দেখতে, যেন তোমরা এখানকার আবহাওয়ায় পড়ে নিজেদের বিপথে চালিও না, এই হচ্ছে আমার আন্তরিক অনুরোধ।" [৪২]

স্যার অতুলের অবসরজীবন কাটে ইংল্যান্ডের সাসেক্সের বেক্সহিল-অন-সি-তে। আশি বছর

বয়সে সেখানেই তিনি পরলোকগমন করেন।

অনেকগুলি মূল্যবান পুস্তক রচনা করেছিলেন স্যার অতুল—তার মধ্যে Notes on the Industries of the United Province, New India, Short History of India প্রভৃতি উল্লেখ্য।

হোগলকুড়িয়ার (বর্তমান সাহিত্য পরিষদ স্ট্রিট এলাকা) একটা ছোট্ট ঘরে টাউন স্কুলের জন্ম হয়েছিল। তখন নাম ছিল ন্যাশনাল সেমিনারি। প্রথমে এটি একটি পাঠশালা ছিল। এই পাঠশালার নিষ্ঠাবান শিক্ষক কালীপ্রসন্ন চক্রবর্তী ২০ টাকার বিনিময়ে এই পাঠশালা কিনে নিলেন। তারপর শুরু হল অক্লান্ত পরিশ্রম—কীভাবে পাঠশালাটিকে সর্বাঙ্গীণ বিদ্যালয়ে উন্নীত করা যায়। ১৮৯৪ সালে এটির নামকরণ করা হয় 'টাউন স্কুল'। তখন, ৩০ নম্বর কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বেশ কয়েকটি বাড়ি বদল করতে হয়—অবশেষে শ্যামপুকুর স্ট্রিট ও কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের সংযোগস্থলে বর্তমান ভবনে প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্বে এটি একটি প্রকাণ্ড মাঠ ছিল। বালানন্দ ব্রহ্মচারীর শিষ্যা পাথুরিয়াঘাটার চারুশীলা দেবী ছিলেন এই জায়গাটির মালিক। কালীপ্রসন্নের অনুরোধে ব্রহ্মচারী চারুশীলা দেবীকে পরামর্শ দিলেন যে খালি মাঠে একখানা বড় বাড়ি করে টাউন স্কুলকে সুলভে ভাড়া দিতে। চারুশীলা দেবী তাই করলেন। চারু শ্রীমানী স্বেচ্ছায় বাড়ির নকশা করে দিলেন। ১৯১৫ সালে টাউন স্কুল এই বাড়িতে উঠে আসে। নতুন ঠিকানা ৩৩নং শ্যামপুকুর স্ট্রিট। উত্তর কলিকাতার প্রাচীন ও বনেদি স্কুলগুলির অন্যতম টাউন স্কুল।

সেকালের কলিকাতায় কীর্তিমান কর্মবীর, সমাজসেবী দিগম্বর মিত্রের (১৮১৭-১৮৭৯) কৃতী পৌত্র রায় মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর (১৮৭০-১৯৩৪) ৩৪নং শ্যামপুকুর স্ট্রিটের সুদৃশ্য ভবনে বাস করতেন। পিতামহ দিগম্বর মিত্র সামান্য চাকুরি থেকে অসামান্য কর্মকুশলতায় এবং স্বীয় অধ্যবসায়ের ফলে জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। বহু প্রতিষ্ঠান এবং সমাজসেবী সংস্থার সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন। ১৮৭৪ খ্রিঃ কলিকাতার প্রথম বাঙালি শেরিফ হয়েছিলেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর 'মেঘনাদ বধ' কাব্যগ্রন্থটি দিগম্বর মিত্রকে উৎসর্গ করেন। দিগম্বর মিত্রের একমাত্র পুত্র গিরিশচন্দ্র মিত্র। তাঁর দুই পুত্র—মন্মথনাথ ও নরেন্দ্রনাথ। পিতামহের মতো মন্মথনাথও একজন কর্মবীর ছিলেন। আইনজ্ঞানে ছিল তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি। বড় বড় আইনব্যবসায়ী তাঁর কাছে আইনের পরামর্শ নিতেন। বঙ্গভঙ্গ ও সহবাস সম্মতি বিল (Age of Consent Bill) আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। জোড়াসাঁকোর দিনু ঠাকুরের সাহচর্য তাঁকে এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ও বেঙ্গল ল্যান্ডহোলডারস্ অ্যাসোসিয়েশন এই উভয় প্রতিষ্ঠানে সভাপতির পদ অলংকৃত করেছিলেন। সেকালের কলিকাতার ৪নং ওয়ার্ডে দু-বার কলিকাতা পৌরসভার কমিশনার নির্বাচিত হন। ম্যাকেঞ্জি আইন (১৮৯৯) বিধিবদ্ধ হলে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যে ২৮ জন কমিশনার কলিকাতা পৌরসভা থেকে পদত্যাগ করেন, মন্মথনাথও তাঁদের অন্যতম। পিতামহের মতো তিনিও ১৯২৭ সালে কলিকাতার শেরিফের পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, তাঁর পৌত্র ডাঃ মিহির মিত্রও কলিকাতার শেরিফ হয়েছিলেন। ঝামাপুকুরে পৈতৃক বাসভবনের কাছে পিতার নামে একটি দাতব্য আয়ুর্বেদ চিকিৎসালয় স্থাপন করেছিলেন। ১৯০২ খ্রিঃ বলরাম ঘোষ স্ট্রিটে অবস্থিত অনাথ আশ্রমকে ২৩ কাঠা জমি গৃহ নির্মাণের জন্য দান করেন। তিনি ও তাঁর ভ্রাতা নরেন্দ্রনাথ পিতামহের একটি জীবনীগ্রন্থ প্রকাশের জন্য ভোলানাথ চন্দ্রকে ভার দেন। পুস্তকখানি ১৮৯৩ খ্রিঃ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি ভোলানাথের সহপাঠী ও রাজা দিগম্বর মিত্রের অন্যতম সুহৃদ্ মহারাজা দুর্গাচরণ লাহার নামে উৎসর্গ করা হয়।

মন্মথনাথ ছিলেন একজন সুদক্ষ জহুরী। তিনি মণি, মুক্তো, হীরে, জহরত, চুনী, পান্না প্রভৃতি মূল্যবান প্রস্তর চিনতে এবং তার সঠিক মূল্য নির্ধারণ করতে পারতেন।

মন্মথনাথ তাঁর শ্যামপুকুরের বাসভবন ১৯০০ খ্রিঃ আঁটপুরের আর. মিত্রের কাছ থেকে ক্রয় করেন। সে সময় এ বাড়িটি ছিল একতলা। স্থাপত্য-বিজ্ঞানে তাঁর গভীর জ্ঞান থাকায় তিনি তাঁর রুচিমত বাড়িটি সুসংস্কৃত ও সুদৃশ্য করে গড়ে তোলেন। সেকালের বহু জ্ঞানী মনীষীদের পদধূলিতে ধন্য হয়েছিল এই ভবন।[৪৩]

বিংশ শতাব্দীর তিনের দশকে শ্যামপুকুর এলাকার কয়েকজন উৎসাহী তরুণের উদ্যোগে ৬১ নম্বর রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিটের বস্তিবাড়িতে 'শীতলা সমিতি' নামে একটি হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়। সে সময় এটিই ছিল দরিদ্র পল্লীবাসীর একমাত্র চিকিৎসা কেন্দ্র। ভারত-স্বাধীনতার উদয়লগ্নে 'শীতলা সমিতি' নতুন নামে অভিষিক্ত হল—'শ্যামপুকুর পল্লীমঙ্গল সমিতি'। সময় ১৯৪৮ সাল। এই বছরের শেষের দিকে শ্যামপুকুর পল্লীর খ্যাতিমান চিকিৎসক ডাঃ অনিলকুমার ঘোষ এই প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন এবং অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা বিভাগের পত্তন করেন। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং সুচিকিৎসার ফলে 'শ্যামপুকুর পল্লীমঙ্গল সমিতি' দরিদ্র জনগণের মধ্যে নিজের আসন প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছিল। ডাঃ ঘোষকে এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণপুরুষ বলা যায়।

ধীরে ধীরে এই সমিতির কর্মধারা বিস্তারলাভ করে। ১নং আনন্দ লেনের গৃহস্বামী একতলার একখানা ঘর দান করেন। সেইসঙ্গে আরেকটি ঘর ভাড়া নিয়ে মহিলাদের চিকিৎসার প্রবর্তন করা হয়। পরবর্তীকালে ৬১নং রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিটের বস্তিবাড়ির মালিক হীরালাল সাউ পল্লীমঙ্গল সমিতিকে একখানা ঘর দান করেন। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা কেন্দ্রটি তাঁর পিতার নামে "গোবিন্দ সাউ দাতব্য চিকিৎসালয়" নামাঙ্কিত হয়। প্রায় চার দশকের অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং বহু সহৃদয় মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় শ্যামপুকুর পল্লীমঙ্গল সমিতি একটি পূর্ণ বিকশিত হেল্‌থ সেন্টারে রূপান্তরিত হয়—১৪টি বিভাগের সাহায্যে এখানে বহুবিধ রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।

মোহনানন্দ ব্রহ্মচারীর দাক্ষিণ্যে শ্যামপুকুর পল্লীমঙ্গল সমিতি ৫৬/১এ, শ্যামপুকুর স্ট্রিটের বাড়িটি ক্রয় করেন। ১লা ডিসেম্বর ১৯৮৪ সালে ব্রহ্মচারী মহারাজ উক্ত ভবনটির 'শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারী আরোগ্য নিকেতন' নামকরণ করে শুভ উদ্বোধন করেন। পল্লীমঙ্গল সমিতির নিজস্ব ভবন হওয়াতে সকলরকম রোগের চিকিৎসার জন্য সাধারণ ও বিশেষজ্ঞ বিভাগের সংযোজন করা সম্ভব হয়েছে।

শ্যামপুকুর পল্লীমঙ্গল সমিতির আরেকটি অনবদ্য অবদান 'নির্মলনলিনী মহিলা শিল্প শিক্ষাসদন'। পল্লীবাসী মহিলাগণকে স্বনির্ভর করার জন্য ডাঃ অনিলকুমার ঘোষের উদ্যোগে স্থাপিত হয়। ডাঃ ঘোষের ভগিনী শ্রীমতী নির্মলনলিনী বসু মারা গেলে তাঁর স্বামী ডাঃ সখানাথ বসুর অর্থানুকুল্যে ডাঃ অনিল ঘোষের বাড়িতে প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়, পরে এটিকে নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত করা হয়। এখানে প্রতিদিন দুপুরে লেডি ব্রেবোর্নের ডিপ্লোমা ক্লাস পরিচালিত হয়।

বর্তমানে শ্যামপুকুর এলাকা তথা সমগ্র উত্তর কলিকাতায় দরিদ্র, আর্ত ও অসহায় রোগীর সেবা প্রতিষ্ঠান হিসাবে শ্যামপুকুর পল্লীমঙ্গল সমিতি একটি বহু পরিচিত নাম।[৪৪]

শ্যামপুকুর পল্লীর অন্যতম বালক-বালিকার শিক্ষাকেন্দ্র সরস্বতী বিদ্যালয় (এখন শৈলেন সরকার বিদ্যালয় ও গিরিবালা বালিকা বিদ্যালয়) ৬২এ, শ্যামপুকুর স্ট্রিটে অবস্থিত। শোনা যায়, প্যারীচরণ সরকারের পুত্র শৈলেন সরকার এথেনিয়ান ইনস্টিটিউশনের এক শাখা বিদ্যালয় ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে কিনে নেন। সে সময় এই বিদ্যালয় রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিটের উপর রাজা প্রসন্ননারায়ণ বাহাদুরের ভবনে অবস্থিত ছিল। এটিকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় রাজা রাজবল্লভ স্ট্রিটের অ্যাসক্রফ্‌ট হলে। এই সুদৃশ্য ভবনের মালিক ছিলেন কীর্তি মিত্রের পুত্র প্রিয় মিত্র। পরে এই বাড়ির হাতবদল হয়। বিদ্যালয়ের নতুন নাম হয় 'সরস্বতী বিদ্যালয়'। অ্যাসক্রফ্‌ট হলে সরস্বতী বিদ্যালয় ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ছিল। ইতিমধ্যে ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে সেকালের কলিকাতার খ্যাতনামা পাট ব্যবসায়ী প্রবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে ৬২ নম্বর শ্যামপুকুর স্ট্রিটে অবস্থিত জমিসহ বাড়িটি বিদ্যালয়ের জন্য কেনা হয়। পুরানো বাড়ি ভেঙে নতুন বাড়ি করা হয়। ৭ই জানুয়ারি ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যালয়ের গৃহপ্রবেশ হয়, উদ্বোধন করেন স্যার এন. এন. সরকার। উপস্থিত ছিলেন কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মন্মথ মুখার্জি। প্রথমে দোতলা, পরে এটি সম্প্রসারণ করে চারতলা করা হয়।

প্রতিষ্ঠাতা শৈলেন সরকার এই বিদ্যালয়ে ১৯২০ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত আমৃত্যু প্রধানশিক্ষক ছিলেন। জ্যোতির্বিকাশ মিত্র এই বিদ্যালয়ে ১৯২৬ সালে সহকারী প্রধানশিক্ষকরূপে প্রবেশ করেন। শৈলেন সরকারের পর তিনিই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯৬৬ সালে ওই পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ওই বছরই তাঁকে বিদ্যালয়ের রেক্টর করা হয়। ১৯৭৯ সালে তিনি রেক্টর পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

জ্যোতির্বিকাশের সুযোগ্য পরিচালনায় বিদ্যালয়ের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। ভারত সরকার তাঁকে জাতীয় শিক্ষকের মর্যাদা দান করেছেন। তাঁরই উদ্যোগে ১৯৪৮ সালে বিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করে প্রতিষ্ঠাতা শৈলেন সরকারের নামে 'শৈলেন সরকার ইনস্টিটিউশন' করা হয়। ওই বছরই প্রাতঃকালে বালিকা বিভাগের প্রবর্তন করা হয়। শৈলেন সরকারের সহধর্মিণী গিরিবালা সরকারের নামে বালিকা বিদ্যালয়টি নামাঙ্কিত করা হয়। জ্যোতির্বিকাশ বালিকা বিদ্যালয়েরও প্রধানশিক্ষক নিযুক্ত হন।

এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতিত্বের ফল খুবই উজ্জ্বল। প্রবেশিকা পরীক্ষায় দু' বছর প্রথম স্থান অধিকার করেন :

১৯৩৩ সালে—ধীরেন কুণ্ডু
১৯৩৪" —অতুল মুখার্জি

প্রথম জন আণবিক শক্তি নিয়ে গবেষণা করে ডক্টরেট হন। পরে কলিকাতার সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের ডিরেক্টর হয়েছিলেন। দ্বিতীয়জন কমিশনার অফ ইনকাম ট্যাক্স হয়েছিলেন।

খেলাধূলায় এই বিদ্যালয়ের কৃতিত্ব কম নয়। রোটারি ক্লাব পরিচালিত 'Boys & Girls Week', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস-চ্যান্সেলার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রতিষ্ঠা দিবসে খেলাধূলা অনুষ্ঠানে এই বিদ্যালয়ের ছাত্ররা প্রথম স্থান অধিকার করে।

৩০শে নভেম্বর ১৯৭৯ সালে উভয় বিদ্যালয়ের তৎকালীন পরিচালক সভা (গভর্নিং বডি) একটি দানপত্রের মাধ্যমে (Deed of Gift) পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এই বিদ্যালয় দুটি দান করেন। বর্তমানে বিদ্যালয় দুটি সরকারের অনুদানে পরিচালিত হয়।[৪৫]

একসময় শ্যামপুকুর স্ট্রিট সংস্কৃতচর্চার কেন্দ্রভূমি ছিল। বহুগুণান্বিত সংস্কৃত পণ্ডিতগণ এখানে বসবাস করতেন। এঁদের মধ্যে কৃষ্ণধন বিদ্যারত্ন, কালীকান্ত ভট্টাচার্য্য, দুর্গামোহন সাংখ্য বেদান্ততীর্থ প্রমুখ উল্লেখ্য। সংস্কৃতচর্চা ছাড়াও এইসব পরিবারের সন্তানদের সংস্কৃতির অন্য শাখায় কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য বিশিষ্ট পণ্ডিত বংশে জন্মগ্রহণ করেও সুবিখ্যাত মল্লবীর হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। এইসব মহিমান্বিত পণ্ডিতবর্গ ছাড়াও এখানে থাকতেন ক্যালকাটা এরিয়ান স্কুলের প্রধানশিক্ষক (পরে রেক্টর) হরিদাস বসু, পাট ও চটের কারবারি রাজকুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

কলিকাতার ইতিহাসে শ্যামপুকুর স্ট্রিটের বিশিষ্ট ভূমিকা আজও অম্লান।

রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিট নামে দীর্ঘ পথটি সেকালের কলিকাতায় মহারাজা নবকৃষ্ণ নিজ ব্যয়ে নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। সে সময় পথটি আপার চিৎপুর রোড (আজকের রবীন্দ্র সরণি) থেকে আপার সারকুলার রোড (এখন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড) পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। রাস্তাটি মার্ক উডের কলিকাতা মানচিত্রে চিহ্নিত আছে সেকথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তীকালে গ্রে স্ট্রিট (বর্তমান শ্রীঅরবিন্দ সরণি) নির্মিত (১৮৭৩) হলে পর রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিটের বৃহৎ অংশ গ্রে স্ট্রিটের অন্তর্ভুক্ত হয়। ফলে রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিটের অবয়ব হয় অনেক ক্ষুদ্র—এটি তখন চিৎপুর রোড থেকে শুরু হয়ে রাজা নবকৃষ্ণের বিশাল ভবনের সম্মুখ দিয়ে প্রসারিত হয়ে গ্রে স্ট্রিট ও অভয় ঘোষ লেনের সংযোগস্থলে এসে শেষ হয়। সে সময় এই পথের ধারে মহারাজা নবকৃষ্ণের আত্মীয়স্বজনেরাই বাস করতেন।

The New Calcutta Directory 1856-তে সেকালের রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিটের বাসিন্দাদের একটি তালিকা দেওয়া আছে। এই তালিকার বাংলা অনুবাদ দেওয়া হল—[৪৬]

১। কুঁড়েঘর
২। রাজা শিবকৃষ্ণ বাহাদুর
রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর

রাজা দেবীকৃষ্ণ বাহাদুর
রাজা অপূর্বকৃষ্ণ বাহাদুর
রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর
রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর
হরকালী ঘোষ, সদর দেওয়ানি আদালতের উকিল
৩। কৃষ্ণসখা ঘোষ, রাজা শিবকৃষ্ণ বাহাদুরের দেওয়ান
কৃষ্ণজীবন ঘোষ, —ঐ—
৪। গোকুলকৃষ্ণ দেব, ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গলের নায়েব-দেওয়ান
৫। প্রেমনারায়ণ দাসের ডাক্তারখানা
৬। কুঁড়েঘর
৭। দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়, হিন্দু পুরোহিত
৮। গঙ্গারাম গঙ্গোপাধ্যায়, বেনিয়ান
৯। কুঁড়েঘর
১০। নবকুমার তর্কালঙ্কার, গুরুদেব
১১। মধুসূদন সিংহ, জমিদার
১২। শ্যামপুকুর পুষ্করিণী
১৩। নবকৃষ্ণ রাহা, চিফ ইঞ্জিনিয়ারের অফিসের বড়বাবু
১৪। কুঁড়েঘর
১৫। রায় প্রসন্ননারায়ণ বাহাদুর, মুর্শিদাবাদের দেওয়ান
১৬। কুঁড়েঘর
১৭। রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর ও পুত্রেরা
কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ বাহাদুর
কুমার দেবেন্দ্রনারায়ণ বাহাদুর
কুমার মহেন্দ্রনারায়ণ বাহাদুর
১৮। কুঁড়েঘর

উপরের এই তালিকা থেকে সেকালের রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিটের বাসিন্দাদের পেশাগত পরিচয় পাওয়া যায়। এইসব বাসিন্দাদের সম্বন্ধে কিছু বলার আগে রাজা নবকৃষ্ণ সম্বন্ধে দু'চার কথা বলা দরকার।

মহারাজা নবকৃষ্ণ দে (দেব) কলিকাতা শোভাবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কানসোনা বা কর্ণসুবর্ণ গ্রামে এই বংশের আদি বাসস্থান ছিল।

মহারাজা নবকৃষ্ণের প্রপিতামহ রুক্মিণীকান্তকে নবাব বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরীর জমিদার অপ্রাপ্তবয়স্ক কেশবরাম রায়চৌধুরীর বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক পদে নিযুক্ত করেন। নবাব সরকার থেকে তাঁকে 'ব্যবহর্তা' উপাধি দেওয়া হয়। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র রামেশ্বর পৈতৃক পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু তাঁর আমলে নবাব সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব বাকি পড়ায় সাবর্ণ জমিদার কেশবরাম তাঁকে কারারুদ্ধ করেন। রামেশ্বরের দ্বিতীয় পুত্র রামচরণ মুর্শিদাবাদে যান এবং পঞ্চাশ হাজার টাকার অধিক রাজস্ব দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মুক্তাগাছা পরগনার ভার গ্রহণ করেন। অতঃপর রামচরণ পিতাকে কারাগার থেকে মুক্ত করেন। পরে মুক্তাগাছা ত্যাগ করে প্রাচীন কলিকাতার উপকণ্ঠে গঙ্গাতীরে গোবিন্দপুরে বসবাস শুরু করেন। এরপর নবাব তাঁকে হিজলি, তমলুক, মহিষাদল প্রভৃতি স্থানের নিমক মহলের কর সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত করেন। এই কাজে দক্ষতা প্রদর্শন করায় নবাব তাঁকে কটকে সুবেদারের অধীনে দেওয়ানি পদ প্রদান করেন। কটক যাবার পথে পিণ্ডারি দস্যুদের হাতে রামচরণ দেব নিহত হন।

রামচরণের মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা পত্নী তিনটি শিশুপুত্র ও পাঁচটি কন্যা নিয়ে বড় বিপদে পড়েন। কয়েক বছর পরে দুর্গ নির্মাণের জন্য গোবিন্দপুরের জমি প্রয়োজন হওয়ায় কোম্পানি রামচরণের বিধবা পত্নীকে আরপুলিতে কয়েক বিঘা জমি ও কয়েক হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেন। তাঁর বড়

ছেলে রামসুন্দর দেব আরপুলির জমি বিক্রি করে সুতানুটির শোভাবাজারে জমি কিনে বাড়ি করেন। অত্যন্ত আর্থিক কষ্টে দিন যাপন করেও রামচরণ-পত্নী পুত্র তিনটিকে সুশিক্ষিত করতে বিন্দুমাত্রও ত্রুটি করেননি। পরবর্তীকালে জ্যেষ্ঠ রামসুন্দর পঞ্চকোটের দেওয়ান হন। মধ্যম মানিক্যচন্দ্র ১১৭৯ হিজরিতে দিল্লি সম্রাটের নিকট থেকে রায় উপাধি ও এক হাজারি মনসবদারের পদ প্রাপ্ত হন। মহারাজা নবকৃষ্ণ এঁদের কনিষ্ঠ সহোদর।

রাজা নবকৃষ্ণ ১৭৩২ খ্রিস্টাব্দে (১১৩৯ বঙ্গাব্দ) মুক্তাগাছার পৈতৃক বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। কেউ কেউ বলেন গোবিন্দপুরেই তাঁর জন্ম হয়। বাল্যকালে জননীর যত্নে তিনি আরবি, ফারসি ও পরে উর্দু ও ইংরেজি ভাষা শিক্ষা করেছিলেন। ১৭৫৩ খ্রিঃ ওয়ারেন হেস্টিংসের ফারসী শিক্ষক নিযুক্ত হন। নবাব সিরাজদ্দৌলাকে পদচ্যুত করার ষড়যন্ত্রের প্রায় সমস্ত খবরই তিনি জানতেন। এই ষড়যন্ত্রের সমস্ত লেখাপড়া তাঁর দ্বারাই সম্পন্ন হয়েছিল। এরপর তিনি গভর্নর ড্রেকের মুনসি ও ক্রমে পররাষ্ট্রসচিব হন এবং বাংলা দেশে ইংরেজ প্রতিপত্তির বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান সহায়ক হয়ে ওঠেন। ১৭৬৬ খ্রিস্টাব্দে লর্ড ক্লাইভের চেষ্টায় তিনি মহারাজা বাহাদুর উপাধি ও ছ' হাজারি মনসবদারের পদ লাভ করেন। নবকৃষ্ণের কর্মদক্ষতায় প্রীত হয়ে ক্লাইভ তাঁর হাতে আরজবেগি দফতর (আবেদনপত্রাদি গ্রহণ বিভাগ), মালখানা (ধনাগার), ২৪ পরগনার মাল আদালত, ২৪ পরগনার তহশিল দফতর (২৪ পরগনার কালেক্টারি কাছারি) প্রভৃতি বিভাগ অর্পণ করেন। এইসব কাজ তাঁর শোভাবাজারের রাজবাড়ি থেকে সম্পন্ন হত। তিনি মাতৃশ্রাদ্ধে প্রায় ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস গভর্নর হলে তাঁর ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পায় এবং ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে সুতানুটির তালুকদারির সনন্দ ও জাতিমালা কাছারির ভারপ্রাপ্ত হয়ে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। তিনি তৎকালে সমাজপতিরূপে বিভিন্ন সামাজিক কর্ম নিয়ন্ত্রণ করতেন। রাজার জাঙ্গাল নামে খ্যাত বেহালা থেকে কুলপি পর্যন্ত ১৬ ক্রোশ রাস্তা এবং বর্তমান রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিট তাঁরই নির্মিত। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মতো তাঁরও পণ্ডিতসভা ছিল। এই সভার পণ্ডিতদের মধ্যে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন প্রধান ছিলেন। গ্রে স্ট্রিটে (সে সময় রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিট) তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের এনে তাঁদের জমিজমা দিয়ে বসবাসের ব্যবস্থা করেন। এই সব পণ্ডিতগণ সেই সময় ওই রাস্তায় অনেক সংস্কৃত টোল স্থাপন করেছিলেন। কয়েকজন জ্যোতিষী ও কবিরাজেরও বসবাসের ব্যবস্থা করে দেন। তিনি যাত্রা, কবিগান, আখড়াই ও হাফ আখড়াই সঙ্গীত ইত্যাদির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কলিকাতায় উড়িয়া রাঁধুনি বামুন ও পালকি বেয়ারার প্রচলন করেন বলে প্রবাদ আছে। কলিকাতা মাদ্রাসা কলেজ প্রতিষ্ঠার টাকা এবং সেন্ট জেমস চার্চ বা পাথুরে গির্জার জমি তাঁরই দান। ১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।[৪৭]

সমাজবিজ্ঞানী বিনয় ঘোষের মতে ইংরেজ যুগের উত্তর কলিকাতায় তালুকদারি কালচারে রাজা নবকৃষ্ণের অবদান ছিল সবচেয়ে বেশি : "...নবকৃষ্ণের আমলের ক্যালকাটা কালচারের সেই তালুকদারি তথা ফিউডাল বৈশিষ্ট্য আজও অনেকটা বজায় আছে। পরাধীন ঔপনিবেশিক কালচারে তাই থাকবার কথা। কারণ নতুন যুগে এদেশীয় বণিকেরা বাণিজ্য প্রসার বা পণ্য উৎপাদনের সুযোগ পাননি, ইংরেজরা তাতে বাধা দিয়েছিল। তাই আধা মার্কেন্টাইল, আধা ক্যাপিটালিস্ট ও আধা ফিউডাল উপাদান নিয়ে এক বিচিত্র কলিকাতা কালচারের সৃষ্টি হয়েছিল। এই বিচিত্র 'কলিকাতা কালচারের' ফিউডালরূপের অন্যতম প্রবর্তক ছিলেন রাজা নবকৃষ্ণ।"

রাজা নবকৃষ্ণের শোভাবাজার রাজবাড়ি সম্বন্ধে এবার কিছু বলা যায়।

শোভাবাজার রাজবাড়ি, এখন যাকে বলা হয় "বাঘওয়ালা বাড়ি", সেটি ৩৫নং রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিটে অবস্থিত। এটি ১৩ বিঘে ৬ কাঠা ৫ ছটাক জমির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। যে জায়গার ওপর এই বিশাল ভবন, শোনা যায় সেটি এক সময় শোভারাম বসাকের মালিকানায় ছিল। পলাশি যুদ্ধের পর এটি নবকৃষ্ণের হস্তগত হয়। রাজা নবকৃষ্ণ এ বাড়ির আমূল পরিবর্তনের ব্যবস্থা করেন। নহবতখানা, নাচঘর, দেওয়ানখানা, গ্রন্থাগার, ডিনাররুম, তোষাখানা, রাজবাড়ির মহিলাদের জন্য রঙমহল প্রভৃতি নতুন নতুন মহল যুক্ত করে এটিকে প্রাসাদপুরী তৈরি করেন।

এই ঐতিহাসিক প্রাসাদের সঙ্গে আরেকটি নাম যুক্ত আছে। তিনি হলেন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রাজা

স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুর। প্রাসাদসংলগ্ন দেড় বিঘা জমিতে ছিল এক বিশাল পুকুর। ঊনবিংশ শতাব্দীর তিনের দশকে ওই পুকুরের ধারে তিনি নির্মাণ করে দেন এক সুদৃশ্য থামওয়ালা নাটমন্দির। তারই সংলগ্ন নবরত্ন মন্দির। আর ছিল সুন্দর একটি পুষ্প-উদ্যান। পুকুরের ধারে যে বাড়িটি ছিল সেটিকে রাজা রাধাকান্ত দেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহেন্দ্রনারায়ণ ও কনিষ্ঠ দেবেন্দ্রনারায়ণ বেশিরভাগ সময় বৈঠকখানা ঘর হিসাবে ব্যবহার করতেন। নাম ছিল পুকুরপাড়ের বাড়ি। পরে ভাঙা বাড়ি বলে পরিচিত হয়। কালক্রমে পুকুর বুজিয়ে ফেলা হয়। বাগান আজ আর নেই। আর পুকুরপাড়ের বাড়ি ভেঙে টেলিফোন এক্সচেঞ্জের বাড়ি হয়েছে।[৪৮]

রাজা রাধাকান্ত দেবের এই নাটমন্দির সেকালের কলিকাতার সমাজ-সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু ছিল। রাজা স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য ঠাকুরদালানের চতুর্দিকে নিত্যপাঠের ব্যবস্থা করেছিলেন। সেকালে এটি রাজবাড়ি পাঠশালা নামে খ্যাত ছিল। সকল ছাত্রদের সঙ্গে ছাত্রীদেরও পুরস্কার দানের ব্যবস্থা ছিল। এটি বেথুন কলেজ স্থাপনের পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাই এর গুরুত্ব কম নয়। তা ছাড়া এই নাটমন্দিরে এক সময় নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়েছিল। ন্যাশনাল থিয়েটারের উদ্যোগে ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে ১০ই মে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' এবং ওই একই বছরে ন্যাশনাল থিয়েটার 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' শীর্ষক প্রহসন নাটকের অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন।[৪৯] নানা সভাসমিতি একসময় অনুষ্ঠিত হয়েছিল এই নাটমন্দিরে। অনেকের মতে স্বামী বিবেকানন্দ বিদেশ থেকে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনের পর (২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৭) শোভাবাজার রাজবাড়ির নাটমন্দিরে তাঁকে নাগরিক সম্বর্ধনা দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে শঙ্করীপ্রসাদ বসু লিখেছেন, "কলকাতা পৌঁছানোর সাত দিন পরে ২৮শে ফেব্রুয়ারি স্বামীজীকে নগরবাসীদের পক্ষ থেকে প্রকাশ্যে সংবর্ধিত করা হল শোভাবাজার রাজবাড়ির বিস্তৃত প্রাঙ্গণে। স্বামীজীর ইংরেজি জীবনীতে বলা হয়েছে, 'ভারতে ব্রিটিশ সামাজ্যের ঐতিহাসিক নগরীতে এর থেকে বিশিষ্ট ব্যক্তি-সমাবেশ হয়নি।...উপস্থিত ছিলেন রাজা ও মহারাজাগণ, সন্ন্যাসীগণ, একদল বিশিষ্ট ইউরোপীয়, সুপরিচিত বহু পণ্ডিত এবং খ্যাতনামা নাগরিক, এবং শত শত কলেজ ছাত্র।'

"দ্বারভাঙার মহারাজার সভাপতিত্ব করবার কথা থাকলেও তিনি আসতে পারেননি। রাজা বিনয়কৃষ্ণ সভাপতিত্ব করেন। স্বামীজীকে প্রদত্ত মানপত্রটি কেবল রচনাগুণে উৎকৃষ্ট নয়, আন্তরিক আবেগেও স্পন্দিত। 'শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামী'কে 'প্রিয় ভ্রাতা' বলে সম্বোধন করা হয়েছিল, যিনি বৃহৎ পৃথিবীতে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়ে 'কেবল আমাদের ধর্মকেই মর্যাদা দান করেননি, দেশকেও তা' দিয়েছেন, বিশেষভাবে মর্যাদা দিয়েছেন এই প্রদেশকে।'

"সভাপতির ভাষণে রাজা বিনয়কৃষ্ণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু স্বীকারোক্তি করেছিলেন।—বিবেকানন্দের মতো মানুষ কোটিকে গুটিক মেলে। নরকুলে তিনি নরেন্দ্র। বিদেশে তাঁর কর্মসাফল্য স্বদেশে জাতীয় জীবনে বেগসঞ্চার করেছে, জাতীয়তা যার ফল-পরিণতি। তিনি এসেছেন বিজয়ী বীরের মতো, তাঁকে প্রাণভরা অভিনন্দন দিই।

"অভিনন্দনের উত্তরে প্রদত্ত স্বামীজীর ভাষণ 'কলিকাতা অভিনন্দনের উত্তর' নামে বিখ্যাত। স্বামীজীর পূর্বের বক্তৃতার সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তিরা নাকি বলেছিলেন, এটি তাঁর শ্রেষ্ঠ ভাষণগুলির পর্যায়ে ওঠেনি, কি জানি, হয়ত, কিন্তু আমাদের বলতেই হবে—এ সেই ভাষণ যাকে বলা যায় বাণী প্রবাহ, যাকে আশ্রয় করে জাতি জেগে ওঠে। সত্যই এই ভাষণ জাতীয় সংগ্রামের কালে মন্ত্রশক্তির কাজ করেছিল।"[৫০]

সম্প্রতি কলিকাতা পুরসভা ভারত সরকারের সহায়তায় এই নাটমন্দির অধিগ্রহণ করে এটিকে একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্ররূপে চিহ্নিত করার কাজে ব্যস্ত।

এবার রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিটের বাসিন্দাদের তালিকাটির প্রতি নজর দেওয়া যাক। তালিকার ২ নম্বরে রাজা শিবকৃষ্ণ বাহাদুর প্রমুখের নাম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এঁদের পরিচয় দেবার আগে মহারাজা নবকৃষ্ণ সম্বন্ধে আরও দু'চার কথা বলা দরকার। মহারাজা নবকৃষ্ণের সাত পত্নী ছিল। কারও পুত্র না হওয়াতে তিনি তাঁর দাদা রামসুন্দর দেবের তৃতীয় পুত্র গোপীমোহন দেবকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। গোপীমোহনের পুত্র রাজা রাধাকান্ত দেব। অনেক বছর পরে নবকৃষ্ণের এক পত্নীর গর্ভে একটি পুত্র

হয়, তিনি রাজা রাজকৃষ্ণ দেব। এঁর নামে গ্রে স্ট্রিটের দক্ষিণে একটি রাস্তা আছে। নবকৃষ্ণের মৃত্যুর পর তাঁর সম্পত্তি ও জমিদারি সমান ভাগে রাজা গোপীমোহন দেব ও রাজা রাজকৃষ্ণের মধ্যে ভাগ হয়। রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিটের সমস্ত দক্ষিণ ভাগ রাজা রাজকৃষ্ণ পান ও সমস্ত উত্তর ভাগ পান রাজা গোপীমোহন দেব। রাজা রাজকৃষ্ণের আট পুত্রের মধ্যে রাজা শিবকৃষ্ণ বাহাদুর সর্বজ্যেষ্ঠ, অন্যান্য পুত্রদের মধ্যে মহারাজা কালীকৃষ্ণ ও মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন।

রাজা কালীকৃষ্ণ দেব (১৮০৮-১৮৭৪) রাজা রাজকৃষ্ণ দেবের দ্বিতীয় পুত্র। বাংলা, সংস্কৃত, ফারসী, উর্দু ও ইংরেজিতে তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি রাধাকান্ত দেব ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সতীদাহ প্রথা রোধের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন। রাধাকান্ত দেবের মৃত্যুর পর (১৮৬৭) তিনিই রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের নেতা হন। রক্ষণশীল হলেও স্ত্রীশিক্ষা প্রচারে উৎসাহী ছিলেন। সেকালে বহু সংস্থার সঙ্গে তাঁর ছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তিনি সভ্য ছিলেন ল্যান্ড-হোল্ডারস সোসাইটি, সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা, হিন্দু বেনাভোলেন্ট ইনস্টিটিউশন, বেথুন স্কুল, ওরিয়েন্টাল সেমিনারি, বেথুন সোসাইটি প্রভৃতির। ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত 'মেসমেরিক হাসপাতালের' তিনি একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি হন। সাহিত্যক্ষেত্রেও অনুবাদক হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল। 'র‍্যাসেলাস' ও 'গে'জ ফেবলস' বা 'গে সাহেবের ইতিহাস' নামক গ্রন্থ দু'খানি বাংলায় এবং শেষোক্ত গ্রন্থখানি উর্দুতে অনুবাদ করেন। এ ছাড়াও 'সদ্বিদ্যাবলী' নামে শিল্পবিজ্ঞানের নানা প্রসঙ্গের অনুবাদ সংগ্রহ এবং নীতি সঙ্কলন, বিদ্বন্মোদতরঙ্গিনী ও বেতাল পঁচিশির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। লর্ড বেন্টিঙ্ক তাঁকে 'রাজাবাহাদুর' উপাধি দেন এবং জার্মানির সম্রাট, দিল্লীর বাদশাহ, ইংল্যান্ডের রাজা ও বহু মনীষী তাঁকে প্রশংসাপত্র ও পুরস্কার প্রদান করেন। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি জাস্টিস অফ পিস হন।[৫১]

রাজা কালীকৃষ্ণের নামে এই অঞ্চলে দুটি রাস্তা আছে—রাজা কালীকৃষ্ণ লেন, রাজা কালীকৃষ্ণ সেকেন্ড লেন। রাস্তা দুটি রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিটের দক্ষিণ দিক থেকে শুরু হয়ে দক্ষিণে প্রসারিত হয়ে গ্রে স্ট্রিটে (এখন শ্রীঅরবিন্দ সরণি) এসে পড়েছে।

মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর (১৮২২-১৯০৩) রাজা রাজকৃষ্ণ দেবের সপ্তম পুত্র। ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত তিনি হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। ইংরেজি, আরবি, ফারসী, হিন্দুস্থানি ও বাংলা ভাষায় তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। সরকার কর্তৃক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের পদে নিয়োজিত হন। কলিকাতা পুরসভার কমিশনার পদেও নিযুক্ত হয়েছিলেন। পরে সরকারি পদ ত্যাগ করে তৎকালীন রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠাকালে (১৮৬১) সভাপতি ও পরে সহসভাপতিরূপে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সিভিল সার্ভিসে বয়স সম্বন্ধীয় আন্দোলনে যোগ দেন। এ ব্যাপারে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আসোসিয়েশনের সভায় (২৪-৩-১৮৭৭) তিনি সভাপতিত্ব করেন। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে লর্ড লিটনের কাছে তিনি যে প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করেন, তার দাবি ছিল ম্যাঞ্চেস্টারে প্রস্তুত কাপড়ের আমদানি-শুল্ক রহিত না করা। কলিকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতের জাতীয় (২য়) সম্মেলনের শেষ দিনে তিনি সভাপতি হন। ভারতীয় সঙ্গীতসমাজের সভাপতি ছিলেন মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, মেয়ো হাসপাতাল, জাতীয় গ্রন্থাগার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নানাভাবে জড়িত ছিলেন। ডায়মন্ডহারবার হাতীগঞ্জ হাইস্কুলের প্রতিষ্ঠাতা হলেন মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ।[৫২]

মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেবের নামে নামাঙ্কিত রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিটের উপর একটি উদ্যান আছে। যতীন্দ্রমোহন অ্যাভিনিউ নির্মাণের সময় উদ্যানটি তৈরি হয়। এর ঠিকানা P-77, C.I.T. Sch. VII। এটি একটি শিশু উদ্যান।

তালিকার ১৫ নম্বরে মুর্শিদাবাদের দেওয়ান রায় প্রসন্ননারায়ণ দেব বাহাদুরের নাম। রাজা নবকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামসুন্দর দেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণমোহন দেবের পৌত্র হলেন প্রসন্ননারায়ণ দেব। পিতা শ্রীনারায়ণ দেব। ইংরেজি, ফারসী, উর্দু ভাষায় তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল। শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি সরকারি তোষাখানার চাকুরিতে প্রবেশ করেন এবং ১৮৪৭ সালে তোষাখানার সুপারিন্টেন্ডেন্টের পদে অধিষ্ঠিত হন। গভর্নর-জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জের শতদ্রু অবরোধ কালে

প্রসন্ননারায়ণ তাঁর সঙ্গে ছিলেন। প্রসন্ননারায়ণের কর্মকুশলতায় মুগ্ধ হয়ে লর্ড হার্ডিঞ্জ ৩রা জানুয়ারি ১৮৪৮ সালে তাঁকে একটি স্বর্ণপদক প্রদান করেন। এর পর ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি মুর্শিদাবাদের নবাব মনসুর আলির দেওয়ান নিযুক্ত হন। ১৮৫৯ সালে তৎকালীন বাংলা সরকার তাঁকে রাজা উপাধি প্রদান করেন। ওই বছরই বাংলা সরকার তাঁকে পররাষ্ট্র বিভাগের অ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারির পদে (অবৈতনিক) নিয়োগ করেন। ১৮৭০ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিটের ওপর রাজা প্রসন্ননারায়ণের বিশাল ভবনের বৃহৎ অংশ হস্তান্তরিত হয়ে গেছে। অবশিষ্ট অংশে তাঁর দুই প্রপৌত্র রবীন্দ্রকৃষ্ণ দেব ও রমেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বসবাস করেন। রবীন্দ্রকৃষ্ণ কলিকাতা হাইকোর্টের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠিত আইনজীবী এবং বহু সমাজসেবী সংস্থার সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন।

রাজা রাধাকান্ত দেব ও তাঁর পুত্রগণ উপরিউক্ত রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিটের বাসিন্দাদের তালিকায় ১৭ নম্বরে অন্তর্ভুক্ত। রাজা রাধাকান্ত দেব কলিকাতা তথা বাংলাদেশের ইতিহাসে একজন বিতর্কিত পুরুষ। একালে তাঁকে প্রায় সকলেই প্রতিক্রিয়াশীল, পশ্চাদাভিমুখী, প্রগতিবিরোধী, বিলীয়মান জমিদারশ্রেণীর শেষ প্রতিনিধি বলে মনে করেন। সতীদাহ প্রথা বিলুপ্তির ও বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের আন্দোলনের প্রবল প্রতিবাদ তোলায় দেশবাসী তাঁর চরিত্রের সদ্‌গুণগুলি ভুলে গিয়ে তাঁকে প্রাচীনপন্থী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের নেতা বলে ধরে নিয়েছেন। অথচ দেশ ও জাতির কল্যাণের জন্য তাঁর নিরলস সংগ্রাম, অকুণ্ঠ দানশীলতা, গভীর দেশপ্রীতি, অসাধারণ বিদ্যাবত্তা, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে অসীম আগ্রহ এবং প্রগতিমূলক নানা আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সংযোগের কথা আজও আমাদের বিস্মিত না করে পারে না।

রাধাকান্ত দেবের জন্মকাল সম্বন্ধে মতভেদ আছে। যোগেশচন্দ্র বাগলের মতে তাঁর জন্ম ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দের ১০ই মার্চ, কলিকাতায়। অন্যদিকে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন তাঁর জন্ম ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে। সে যাইহোক, তাঁর জীবন বহু বিচিত্র ঘটনায় পূর্ণ। রাধাকান্ত দেব অতি অল্প বয়সেই স্বগৃহে বাংলা, আরবি, ফারসী ও সংস্কৃত শিক্ষালাভ করেন। আবার কানিংহাম সাহেবের ক্যালকাটা অ্যাকাডেমিতে ইংরেজি ভাষার প্রথম পাঠ গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে নিজের চেষ্টায় ও যত্নে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য ভালভাবে আয়ত্ত করেছিলেন। বাংলা ভাষার মাধ্যমে কলিকাতা ও তার উপকণ্ঠে জনশিক্ষা প্রসারের জন্য ১৮১৭-১৮ খ্রিস্টাব্দে 'ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি' ও 'ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়। রাধাকান্ত এই দুটি সমিতির সক্রিয় সদস্য ছিলেন্ এবং স্কুল সোসাইটির তিনি ছিলেন প্রথম দেশীয় সম্পাদক। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু কলেজ পরিচালন কমিটির সদস্য হন। ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে ফারসী ভাষায় হর্টিকালচারাল নিবন্ধের ইংরেজি অনুবাদ ব্রিটেনের রয়াল হর্টিকালচারাল সোসাইটিতে পাঠিয়ে খ্যাতিমান হন। সংস্কৃত শিক্ষা প্রসারের জন্য ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে শোভাবাজারে একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করেন। শিক্ষাক্ষেত্রে খ্রিস্টান মিশনারিদের প্রভাবমুক্ত করার প্রচেষ্টায় হিন্দু চ্যারিটেব্‌ল ইনস্টিটিউশনের একজন প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন। হিন্দু কলেজ পরিচালনা সংক্রান্ত ব্যাপারে সরকারের সঙ্গে মতভেদের জন্য ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে পরিচালন কমিটির সদস্যপদ ত্যাগ করেন। এরপর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মতিলাল শীল, রাজেন্দ্রলাল দত্ত প্রমুখের সঙ্গে ২-৫-১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ স্থাপন করেন। এটিই প্রথম জাতীয় কলেজ। কিন্তু ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে অর্থাভাবে এই প্রতিষ্ঠানটি স্কুলে পরিণত হয়। এ ছাড়াও তিনি নিজ ভবনে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। সেখানে বালিকাদের বাংলা ও ইংরেজি শিক্ষা দেওয়া শুরু হয়। ৪০ বছরের পরিশ্রমে প্রস্তুত ৮ খণ্ডে সম্পূর্ণ 'শব্দকল্পদ্রুম' তাঁর জীবনের অবিস্মরণীয় কীর্তি। রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটি ও ইউরোপের অন্যান্য রাজগণ এই কাজের জন্য তাঁকে সম্মানিত করেন। সরকার তাঁকে কে. সি. এস. আই. (১৮৬৬) এবং রাজা বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করেন। ভারতবর্ষে প্রথম 'স্যার' উপাধিপ্রাপ্ত হলেন রাজা রাধাকান্ত দেব। রাজনীতির ক্ষেত্রে ল্যান্ড হোলডারস্ সোসাইটির সভ্যরূপে তিনি জমির আইন সংক্রান্ত আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। বৃন্দাবনে তাঁর মৃত্যু হয় (১৯-৪-১৮৬৭)। রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে যথার্থই বলেছিলেন—''A man in this respect can only be compared with his

own contemporaries. Judged by such a standard, the Rajah would certainly appear not behind, but in advance of his equals in age.'' [৫৩]

রাজা রাধাকান্ত দেবের নামে আপার চিৎপুর রোডে (এখন রবীন্দ্র সরণি) মদনমোহনতলার কাছে ৫টি রাস্তা আছে। বর্তমানে রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব ফার্স্ট লেনের কোনও অস্তিত্ব নেই। কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা এই শতাব্দীর পাঁচের দশকে মদনমোহনতলা স্ট্রিট নির্মাণের সময় ওই ফার্স্ট লেন অধিগ্রহণ করেন। পরে রাস্তাটি মদনমোহনতলা স্ট্রিটের অন্তর্ভুক্ত হয়ে স্বকীয় সত্তা হারায়।

শোভাবাজার রাজবাড়ির পুরোহিত দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় সম্বন্ধে দু'চার কথা বলা দরকার। দুর্গাচরণের পূর্বপুরুষ কালীসাধক সিদ্ধপুরুষ আত্মরাম চট্টোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন সাবর্ণ চৌধুরীদের পুরোহিতের জামাতা। তাঁর বংশধর রামরাম চট্টোপাধ্যায়। রাজা নবকৃষ্ণ তাঁকে সাদরে সুতানুটিতে নিয়ে আসেন এবং কুলাচার্যের পদে অভিষিক্ত করেন। সুতানুটিতে তাঁকে বসবাসের জমি দেন এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত গৃহদেবতার সেবার ভার রামরাম চট্টোপাধ্যায়ের ওপর অর্পণ করেন। রামরাম চট্টোপাধ্যায় সুতানুটিতে যে গৃহে বাস করতেন আজকের দিনে সে গৃহ ৮৪নং রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিট রূপে চিহ্নিত হয়ে আছে। রাজা নবকৃষ্ণের সময় থেকে একটি প্রথা চলে আসছে যে দুর্গাপূজার সময় কুলাচার্যের গৃহে প্রস্তুত 'শ্রী ও বরণডালা' নানাপ্রকার বাদ্যভাণ্ড সহযোগে শোভাযাত্রা করে পূজামণ্ডপে নিয়ে যেতে হয়। রামরামের পুত্র দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়। তিনিও পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। তাঁর পুত্র শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর তিন পুত্র। প্রথম পুত্রের উত্তরপুরুষ বিখ্যাত সিনেমা পরিচালক কার্তিক চট্টোপাধ্যায়। মধ্যম পুত্র মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর উত্তরপুরুষগণ বর্তমানে তাঁদের আদি বসতবাড়ি ৮৪, রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিটে বসবাস করেন।

রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিটে আর যে সব বাসিন্দার নাম পূর্বোক্ত ওই তালিকায় আছে, তাঁরা প্রায় সকলেই শোভাবাজার রাজপরিবারের আশ্রিত এবং আত্মীয়স্বজন।

'ওল্ড মেয়রস্ কোর্ট' নামে রাস্তাটি রাজা নবকৃষ্ণের আদি বাড়ির পিছনে অবস্থিত। কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা যতীন্দ্রমোহন অ্যাভিনিউ নির্মাণের সময় এই রাজপথটি তৈরি করে কলিকাতা পুরসভাকে এই শতাব্দীর চারের দশকে হস্তান্তরিত করেন। এটি একটি ক্ষুদ্রাকৃতি পথ, যতীন্দ্রমোহন অ্যাভিনিউকে কম্বুলিয়াটোলা লেনের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে। পরে রাস্তাটিকে আরও পূর্ব দিকে প্রসারিত করা হয়। কলিকাতা পুরসভা ৭ই মার্চ ১৯৪৫ সালে এই নবনির্মিত রাস্তাটি ওল্ড মেয়রস্ কোর্ট নামে নামাঙ্কিত করেন।

একথা প্রায় সকলেরই জানা যে লালবাজারে 'অ্যামবাসাডার হাউস'-এ ১৭২৭ খ্রিস্টাব্দে এক রয়াল চার্টার বলে প্রথম মেয়রস্ কোর্ট স্থাপিত হয়। এই কোর্টের সদস্য ছিলেন মেয়র ও তাঁর নয়জন অল্ডারম্যান। এ প্রশ্ন স্বভাবতই মনে জাগে লালবাজারের সন্নিকটে কোনও রাস্তার নাম মেয়রস্ কোর্ট নামাঙ্কিত না হয়ে উত্তর কলিকাতায় রাজা নবকৃষ্ণের বাড়ির কাছের একটি রাস্তার নাম কেন করা হল ? ৭ই মার্চ ১৯৪৫ সালের পৌর অধিবেশনের নামকরণের নথিপত্রে এ বিষয়ের কোনও খোঁজখবর পাওয়া যায়নি। কলিকাতা গবেষক রাধারমণ মিত্র এ প্রসঙ্গে লিখেছেন—রাজা রাধাকান্ত দেবের বিশাল ভবনই হল রাজা নবকৃষ্ণের আদি বাড়ি। এই বাড়ির পিছনে ওল্ড মেয়রস কোর্ট নামে রাস্তাটি অবস্থিত। রাজা নবকৃষ্ণ ক্লাইভ ও হেস্টিংস প্রমুখ ইংরেজ শাসনকর্তাদের এতই প্রিয়পাত্র ছিলেন যে তাঁরা সাতটা দপ্তরের ভার রাজা নবকৃষ্ণের উপর অর্পণ করেছিলেন। সেই দপ্তরগুলি ছিল এইরূপ :

১। মুনশি দপ্তর অর্থাৎ ফারসী সেক্রেটারির দপ্তর।
২। আরজবেগি দপ্তর—সাধারণ লোক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে যে সব আর্জি বা দরখাস্ত করত, তা' গ্রহণ করার অফিস।
৩। কোম্পানির বেনিয়ান ও রাজনৈতিক দেওয়ানের দপ্তর।
৪। কোম্পানির ধনাগার বা খাজনাখানা।
৫। ২৪ পরগনার মাল আদালত বা রাজস্ব কোর্ট।
৬। ২৪ পরগনার তহশিল দপ্তর অর্থাৎ কালেক্টরের কাছারি।

৭। জাতিমালা কাছারি, অর্থাৎ কোনও লোকের জাত সম্পর্কে সন্দেহ বা আপত্তি উঠলে সেই লোকের প্রকৃত জাত সাক্ষীসাবুদ ডেকে বিচার ও মীমাংসা করার আদালত।

মহারাজা নবকৃষ্ণ তাঁর শোভাবাজার রাজবাড়িতে বসে এইসব দপ্তর পরিচালনা করতেন। ৫ ও ৬ নম্বর দপ্তর ছিল রীতিমতো আদালত। মহারাজা নবকৃষ্ণ স্বয়ং ছিলেন ওই আদালতের বিচারক। কিন্তু "জাতিমালা কাছারি" ছিল অন্য ধরনের আদালত। এই আদালত সম্বন্ধে কিছু বলা প্রাসঙ্গিক মনে করি।

কোম্পানি আমলের শুরুতে যে শহর কলিকাতা গড়ে উঠেছিল তাতে হিন্দুধর্মের বর্ণকৌলীন্য তার পুরানো মর্যাদা ধীরে ধীরে হারাতে থাকে। অর্থকৌলীন্য প্রবল প্রতাপে তার আসন দখল করে। লোকে তখন নিজেদের জাত ভাঁড়াত এবং অন্যদের জাত মারবার চেষ্টা করত। ফলে সে যুগে বাঙালির কাছে বিশেষত কলিকাতায় জাতের সমস্যা প্রবল আকারে দেখা দেয়। ধনীরা ব্রাহ্মণ কুলাচার্যদের নগদ দক্ষিণা দিয়ে তাদের বিরুদ্ধপক্ষদের জাতিচ্যুত করত। অন্য দিকে নিচু জাতের ধনিক শ্রেণীরা ব্রাহ্মণ ও ঘটকদের উৎকোচ দিয়ে উঁচু জাতে উঠে যেত। পরস্পরের জাত-মারামারি সে সময় নিত্য-দিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস হিন্দুদের জাতি-বিরোধ দূর করার জন্য জাতিমালা কাছারির প্রবর্তন করেন। এই কাছারি অনেকটা মেয়রস্ কোর্টের ধাঁচে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যেমন মেয়রস্ কোর্টে একজন প্রেসিডেন্ট (মেয়র) ও ৯ জন সদস্য থাকতেন, তেমনি জাতিমালা কাছারিতে একজন প্রেসিডেন্ট ও কয়েকজন সাহায্যকারী বিচারক নিযুক্ত হতেন। ব্রাহ্মণের উপর প্রায় সব জাতির আক্রোশ থাকায় এই কাছারিতে কোনও বিচারক ব্রাহ্মণ হতে পারতেন না। রাজা নবকৃষ্ণ এই জাতিমালা কাছারির প্রথম প্রেসিডেন্ট পদ অলংকৃত করেন। তিনি আমৃত্যু এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মাত্র দু'একবার কাশিমবাজারের কৃষ্ণকান্ত নন্দী ওরফে কান্তবাবু জাতিমালা কাছারির প্রেসিডেন্ট বা প্রধান বিচারপতি হয়েছিলেন। যেহেতু মেয়রস্ কোর্টের ধাঁচে এই জাতিমালা কাছারি স্থাপিত হয়েছিল তাই কলিকাতা পুরসভা রাজা নবকৃষ্ণের আদি বাড়ির পিছনের রাস্তা ইন্ডিয়ান মেয়রস্ কোর্ট নাম না দিয়ে দিলেন ওল্ড মেয়রস্ কোর্ট।[৫৪]

এবার আমরা পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত শ্যামপুকুর অঞ্চলের ছোট ছোট রাস্তাগুলির দিকে নজর দেব। শুরু করা যাক উত্তর দিক থেকে।

প্রথমে চৌধুরী লেনের কথা। রাস্তাটি শ্যামবাজার স্ট্রিট ও ভূপেন্দ্র বসু অ্যাভিনিউ-এর সংযোগস্থল থেকে আরম্ভ হয়ে সোজা পূর্ব দিকে এগিয়ে মন্মথ ভট্টাচার্য স্ট্রিটে এসে পড়েছে। পরে মোড় ঘুরে উত্তরে এগিয়ে ভূপেন্দ্র বসু অ্যাভিনিউতে এসে মিশেছে। রাস্তাটি সম্ভবত ঊনবিংশ শতাব্দীর সাতের দশকে তৈরি হয়ে থাকবে। এর কারণও আছে। ১৮৬৬ সালে তৎকালীন কলিকাতা পুরসভার চেয়ারম্যান শক সাহেব (Mr. V. H. Schalch, C.S.) শহর কলিকাতায় প্রথম জনগণনার সূত্রপাত করেন। এই সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেন—The Report on the Census of Calcutta for the year 1866। এই প্রতিবেদনে সেকালের শহর কলিকাতার ৪৩৮টি রাস্তার নামের উল্লেখ আছে। তার মধ্যে কিন্তু চৌধুরী লেনের নাম নেই। এরপর কলিকাতার পুরসভার কমিশনার বিভার্লি সাহেব (Mr. H. Beverley, C.S.) এর নেতৃত্বে পুনরায় কলিকাতার জনগণনার ব্যবস্থা হয়। তিনিও একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেন—Report on the Census of the town of Calcutta taken on the 6th April 1876। এই প্রতিবেদনেই প্রথম চৌধুরী লেনের খোঁজ পাওয়া যায়। সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দের পরে এবং ১৮৭৬-এর পূর্বে রাস্তাটি নির্মিত হয়ে থাকবে।

কারা এই চৌধুরী পরিবার? ১৯২৪ সালের কথা। শ্যামপুকুর এলাকায় ওই সময় দুটি নতুন জনপথ তৈরি হয়। রাস্তা দুটির নামকরণ নিয়ে কলিকাতা পুরসভা যখন বিচার-বিবেচনা করছিলেন, সেই সময় একটি রাস্তা চৌধুরী পরিবারের নামে নামাঙ্কিত করার এক প্রস্তাব আসে। তাতে চৌধুরী পরিবারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া আছে। এই চৌধুরীরা কলিকাতার বনেদি প্রাচীন পরিবারগুলির অন্যতম। নবাব সিরাজদ্দৌলা প্রদত্ত সনদ তাঁদের অধিকারে আছে। পলাশী যুদ্ধের পর থেকেই

চৌধুরী পরিবার এই শ্যামপুকুরে বসবাস করে আসছেন। চৌধুরী লেন নামে রাস্তাটি নির্মাণের সময় চৌধুরী পরিবার বিনামূল্যে রাস্তার অধিকাংশ জমি দান করেছিলেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে এই পরিবার এখানে তিনটি শিবমন্দির নির্মাণ করে দিয়েছিলেন।[৫৫] এই পরিবারের কৃতীপুরুষ নীলমণি চৌধুরী। কয়লাখনির মালিক ছিলেন। ১৯নং চৌধুরী লেনে বাস করতেন। পরে বাড়িটি সতীশচন্দ্র দে ১৯৩০ সালে কিনে নেন।

কলিকাতা পুরসভা চৌধুরী পরিবারের এই আবেদন গ্রহণ করেননি। তাঁরা রাস্তা দুটি মন্মথ ভট্টাচার্য এবং রানী হেমন্তকুমারীর নামে নামাঙ্কিত করেন। সে কথায় আমরা পরে আসছি।

সুপণ্ডিত, শিক্ষাব্রতী, পুথি সংগ্রাহক, বাংলা প্রবাদের অর্থসহ সংকলক সুশীলকুমার দে (১৮৯০-১৯৬৮) ডাঃ সতীশচন্দ্রের পুত্র। সতীশচন্দ্র কটকের সিভিল সার্জেন ছিলেন। কটক থেকে এসে ৩০/১এ, বিডন রো-এর ভাড়া বাড়িতে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত ছিলেন। পরে তিনি শ্যামপুকুরের চৌধুরী লেনে বাড়ি করে সেখানে উঠে যান।

পুত্র সুশীলকুমার বরাবর কৃতী ছাত্র। কটকের র‍্যাভেন শ' কলেজিয়েট স্কুল থেকে এন্ট্রান্স, কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজিতে বৃত্তিসহ বি.এ. অনার্স, ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজিতে এম.এ. ও পরের বছর বি. এল. পাশ করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক পদ গ্রহণ করে কর্মজীবন শুরু, পরে কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপনা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেবার পরে সেখানকার সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ হন। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের ইতিহাস গ্রন্থ লিখে তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি.লিট. উপাধি পান। ঢাকায় থাকাকালীন তিনি পুথি সংগ্রহের কাজ হাতে নেন এবং প্রায় ২০ হাজার পুথি সংগ্রহ করেন। পরে তা' ২৫ হাজার ছাড়িয়ে যায়। এ ছাড়াও ৯ হাজারের বেশি বাংলা প্রবাদ অর্থসহ সঙ্কলন করেছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪৭ সালে অবসর নেবার পর তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ হন। বাংলা সরকারের প্রধান গবেষক, পুনা ডেকান রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ইতিহাসভিত্তিক সংস্কৃত অভিধান রচনার সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ও লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং লেকচারার ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতির পদ অলংকৃত করেছিলেন। সরকারি ও বেসরকারি নানা প্রতিষ্ঠান তাঁকে বহু সম্মানে ভূষিত করেছিল। তিনি ইংরেজিতে অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন, তার মধ্যে Bengali Literature in the Nineteenth Century, History of Sanskrit Literature, The Early History of Vaisnava Faith and Movement in Bengal প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখের দাবি রাখে। বাংলা গ্রন্থের মধ্যে 'দীনবন্ধু মিত্র' ও কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।

২৫ ও ২৭, চৌধুরী লেনের সেন পরিবার কলিকাতার বিশিষ্ট বৈদ্য পরিবারগুলির অন্যতম। এঁদের আদি নিবাস ছিল আগরপাড়া গ্রামে। অনেকগুলি সুসন্তানের জন্ম এই পরিবারকে গৌরবের আসন দান করেছে। বিদ্যা ও খ্যাতি এঁদেরকে কলিকাতার বিদ্বৎ সমাজে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে।

সেন বংশের কৃতী সন্তান দীননাথ সেন (১৮৪১-৮৪) উচ্চশিক্ষার জন্য কলিকাতায় আসেন এবং বেলেঘাটায় বসবাস শুরু করেন। তিনি শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রথম পরীক্ষার্থীদলের অন্যতম। সসম্মানে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি লাভ করে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে বিভাগে ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত হন। পূর্ব বাংলা (আজকের বাংলাদেশ) ও আসামের বিভিন্ন অঞ্চলে রেললাইন স্থাপনে তাঁর অবদান বিশেষভাবে উল্লেখ্য। আসামের এক দুর্গম অঞ্চলে রেললাইন বসাতে গিয়ে দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে ঢাকা নগরীতে একটি রাস্তা নামাঙ্কিত করা হয়েছে— দীননাথ সেন রোড। দীননাথের চার পুত্র— সুরেন্দ্র, সুশীল, যতীন্দ্র ও নরেন্দ্র। একমাত্র কন্যা চারুশীলা। 'ইন্ডিয়ান মিরর' পত্রিকার সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

দীননাথ সেনের চার পুত্রের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ ও নরেন্দ্রনাথ এই বংশের উজ্জ্বল রত্ন। যতীন্দ্রনাথ ছিলেন বিদ্যানুরাগী, মানবিক বিদ্যার নানা শাখায় অনায়াসে বিচরণ করেছিলেন। সাতটি বিষয়ে সসম্মানে এম. এ. পাশ করেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের তত্ত্বাবধানে রসায়ন শাস্ত্র নিয়ে গবেষণা করে

পি এইচ ডি ডিগ্রি লাভ করেন। চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট হন পরবর্তীকালে। এ ছাড়াও সংস্কৃত-সাহিত্যে ছিল তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য। এরপর তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়নের অধ্যাপক পদ গ্রহণ করেন। কয়েক বছর পর যুক্ত প্রদেশের পুষা কৃষি কলেজের প্রথম ভারতীয় অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ডঃ যতীন্দ্রনাথের পূর্বে এই পদে ইউরোপীয়রাই নিযুক্ত হতেন। পুষা কৃষি কলেজের পর তিনি দেরাদুন কলেজের অধ্যক্ষ হন। তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ভারত সরকার তাঁকে 'চিফ কেমিস্ট অফ ইন্ডিয়া' (Chief Chemist of India) উপাধিতে ভূষিত করেন।

ডঃ যতীন্দ্রনাথের মতো তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা নরেন্দ্রনাথও (১৮৮২-১৯৩৫) ছিলেন বিদ্যানুরাগী। ভৌত বিজ্ঞান নিয়ে এম. এ. পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর অধীনে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় নরেন্দ্রনাথকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী পরীক্ষা-নিয়ামক (Asst. Controller of Examinations) নিযুক্ত করেন। সে সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান পরীক্ষা নিয়ামক ছিলেন অবিনাশচন্দ্র বসু। তিনি অবসর গ্রহণ করার পর নরেন্দ্রনাথ প্রধান পরীক্ষা নিয়ামক হন। এক সময় তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী রেজিস্ট্রার এবং অস্থায়ী ভাইস-চ্যান্সেলারের পদ অলংকৃত করেছিলেন। ভারত সরকার তাঁকে রায়বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করেন।

নরেন্দ্রনাথ ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে হাইকোর্টের নিলাম থেকে ২৫ ও ২৭ নম্বর চৌধুরী লেনের বাড়ি ও জমি ক্রয় করেন। পূর্বে এই জমির মালিক ছিলেন চৌধুরী লেনের নীলমণি চৌধুরী। নরেন্দ্রনাথ ২৭ নম্বরের খালি জমিতে বর্তমান বাসগৃহটি নির্মাণ করে বসবাস শুরু করেন। নরেন্দ্রনাথ ছিলেন ছাত্রবৎসল, বহু ছাত্র তাঁর বাড়িতে থেকে উচ্চশিক্ষা লাভ করেছিল। পল্লীর জনহিতকর বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। খেলাধূলার প্রতি নরেন্দ্রনাথের বিশেষ অনুরাগ ছিল। নিজে একজন ভালো বিলিয়ার্ড খেলোয়াড় ছিলেন। স্ত্রী অমিয়াবালা পল্লীর সমাজসেবার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। গৌরীমাতা ছিলেন তাঁর শুভানুধ্যায়ী। একসময় অমিয়াবালা সারদেশ্বরী আশ্রমের সহ-সভানেত্রীর পদ অলংকৃত করেছিলেন। তিনি ছিলেন ডি. গুপ্তের পৌত্রী।

নরেন্দ্রনাথের পুত্র দিলীপ সেন ও ডঃ প্রতীপ সেন এই ভবনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে জানালেন যে এক সময় বহু মনীষীর পদধূলিতে ধন্য হয়েছিল এই ভবন। তাঁরা হলেন রমাপ্রসাদ ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। অশোকনাথ ও গৌরীনাথ শাস্ত্রী, ইউ. এন. ব্রহ্মচারী, আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শল্য চিকিৎসক সুবোধ দত্ত, ডাঃ সুরেশ সরকার, গৌরীমা, দুর্গামা প্রমুখ। আজও তাঁদের স্মৃতি মনের মণিকোঠায় উজ্জ্বল হয়ে লুপ্তির আড়াল থেকে দীপ্তি বিলোয়।

সেকালের বিখ্যাত পণ্ডিত ও সমাজসেবী মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের (১৮৩৬-১৯০৬) নামে 'ন্যায়রত্ন লেন' নামাঙ্কিত হয়েছে। রাস্তাটি কর্নওয়ালিস স্ট্রিট (এখন, বিধান সরণি) থেকে শুরু হয়ে পশ্চিম দিকে এগোবার সময় কৃষ্ণরাম বসু স্ট্রিটকে অতিক্রম করে মন্মথ ভট্টাচার্য স্ট্রিটে এসে পড়েছে। মন্মথ ভট্টাচার্য স্ট্রিট ন্যায়রত্নের পুত্রের নামে নামাঙ্কিত। মহেশ ন্যায়রত্নের বাসভবন ছিল ন্যায়রত্ন লেনের ধারে।

মহেশচন্দ্রের পৈতৃক বাড়ি হাওড়ার নারীট গ্রামে। ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে মহেশ ন্যায়রত্ন কলিকাতায় আসেন এবং স্থায়ীভাবে শ্যামপুকুরে বসবাস শুরু করেন। শ্যামপুকুরে বিস্তীর্ণ জমি শোভাবাজার রাজ পরিবারের কাছ থেকে টা. ১√১ গণ্ডা বার্ষিক খাজনায় পত্তনি গ্রহণ করেন।

'রত্নধাম' মহেশ ন্যায়রত্নের আদি বাড়ি। এটি ৬ নম্বর ন্যায়রত্ন লেনে অবস্থিত ছিল। পরবর্তীকালে মন্মথ ভট্টাচার্য স্ট্রিট হওয়ায় ভবনটি ৬ ও ১১ নম্বরে বিভক্ত হয়। পরে ৬ নম্বর বাড়িটি হস্তান্তরিত হয়। এই ১১ নম্বর বাড়িতেই ন্যায়রত্ন মহাশয়ের শেষজীবন অতিবাহিত হয়।

মহেশ ন্যায়রত্ন শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীধর স্বামীর বংশধর। পিতা হরিনারায়ণ তর্ক সিদ্ধান্ত। সংস্কৃত শাস্ত্রের কাব্যস্মৃতি, বেদান্ত ও অলংকার শাস্ত্র অধ্যয়ন করে কাশী যান। সেখানে পাঠ করেন বেদ, উপনিষদ ও বেদান্ত শাস্ত্র। এরপর কলিকাতায় জয়নারায়ণ তর্ক পঞ্চাননের নিকট নব্য ন্যায় অধ্যয়ন শেষ করে 'ন্যায়রত্ন' উপাধি লাভ করেন। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে শোভাবাজারের

মহারাজা কমলকৃষ্ণদেবের আনুকূল্যে একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করে অধ্যাপনা শুরু করেন। সেই সঙ্গে ইংরেজি ভাষাও শিক্ষা করেন। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হন এবং ওই পদ থেকে ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন।

সমাজসেবার কাজেও তিনি অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। সাধারণের মধ্যে সংস্কৃত বিদ্যা প্রসারের জন্য সংস্কৃত আদ্য, মধ্য ও উপাধি পরীক্ষার প্রবর্তন করেন। নিজের গ্রামে একটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বর্তমানে বিদ্যালয়টি 'ন্যায়রত্ন ইনস্টিটিউশন' নামে খ্যাত। মহেশ ন্যায়রত্নের ঐকান্তিক চেষ্টা ও উদ্যোগে মার্টিন কোম্পানির হাওড়া-আমতা রেলপথ নির্মিত হয়েছিল।

মহেশ ন্যায়রত্ন জীবনে বহু সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে সরকার তাঁকে সি. আই. ই. এবং ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় উপাধির দ্বারা সম্মানিত করেন।

অনেকগুলি পুস্তক রচনা করেছিলেন মহেশ ন্যায়রত্ন। কাব্যপ্রকাশ গ্রন্থের টীকা এবং ন্যায় কুসুমাঞ্জলির তাৎপর্য বিবরণ ও বাক্য প্রকাশের তাৎপর্য বিবরণ নামে টিপ্পনী গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এ ছাড়া এসিয়াটিক সোসাইটির আনুকূল্যে সায়ণভাষ্য সহ তৈত্তিরীয় সংহিতার ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম খণ্ড এবং শবরভাষ্য সহ মীমাংসা দর্শন সম্পাদন করেন। পঞ্জিকা সংস্কার কার্যে তাঁর উদ্যোগ প্রশংসনীয়। বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পত্রিকার তিনি ছিলেন অন্যতম রূপকার।[৫৬]

এর পর আসছি তেলিপাড়া লেনের কথায়। রাস্তাটির নামের তাৎপর্য তার নামকরণের মধ্যেই নিহিত আছে। সেকালে এ অঞ্চলে তেলিদের বসবাস গড়ে ওঠে। তাই থেকে রাস্তার নাম হয়েছে তেলিপাড়া লেন। রাস্তাটির আকার অনেকটা ইংরেজি অক্ষর 'L'-এর মতো। এটি রামধন মিত্র লেন থেকে শুরু হয়ে প্রথমে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়েছে। পরে মোড় ঘুরে দক্ষিণে এগিয়ে শ্যামপুকুর স্ট্রিটে এসে পড়েছে। রাস্তাটির প্রথম খোঁজ পাওয়া যায় লটারি কমিটির মানচিত্রে। এই মানচিত্রটি (১৮২৫-১৮৩২) শক সাহেব লটারি কমিটির প্রয়োজনে তৈরি করেছিলেন, সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। আর কলিকাতা পুরসভায় এটি নথিভুক্ত হয়েছে ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে Assessment Register-এ। বলরাম ঘোষ স্ট্রিট বা শ্যামপুকুর স্ট্রিটের মতো অত প্রাচীন পর্যায়ের পথ না হলেও অতি অবচীনের পর্যায়ে তেলিপাড়া লেন পড়ে না।

কলিকাতার সমাজ সংস্কৃতিতে তেলিপাড়া লেনের অবদান কম নয়। বহু ভাষাবিদ, শিক্ষাব্রতী, সাহিত্যিক, পত্রিকা সম্পাদক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ একসময় তেলিপাড়া লেনে থাকতেন। এইখান থেকেই তিনি তাঁর মাসিক পত্রিকা 'পঞ্চপুষ্প' সম্পাদনা এবং 'বঙ্গীয় মহাকোষ' গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাঁর পাণ্ডিত্যের আকর্ষণে সেকালে বহু জ্ঞানী-গুণীর আগমন হয়েছিল তেলিপাড়ার এই বাড়িতে।

অমূল্যচরণের (১৮৬৯-১৯৪০) আদি বাড়ি নৈহাটিতে। এঁরা জাতিতে কায়স্থ, আখনার ঘোষ পরিবারের অন্তর্গত। পিতামহ নৈহাটি থেকে কলিকাতায় আসেন এবং স্বীয় উপার্জনে বিডন স্ট্রিটে একটি বসত বাড়ি নির্মাণ করেন। পিতা উদয়চাঁদ ঘোষ মজুমদার। বিডন স্ট্রিটের বাড়িতে অমূল্যচরণের জন্ম হয়। মেধাবী ছাত্র অমূল্যচরণ এন্ট্রান্স পাশ করার পর উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য বারানসীতে গমন করেন এবং সেখানে "বিদ্যাভূষণ" উপাধিতে ভূষিত হন। পরে দেশি-বিদেশি মোট ২৬টি ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। বিভিন্ন ভাষায় চিঠিপত্র অনুবাদের জন্য ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে 'ট্রানস্লেটিং ব্যুরো' স্থাপন করেন। এর পর ভারতে প্রথম বিদেশি ভাষা শিক্ষার জন্য ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে এডওয়ার্ড ইন্‌স্টিটিউশন প্রতিষ্ঠা করেন। এটি প্রথমে কেশব অ্যাকাডেমি ভবনে স্থাপিত হয়েছিল। ভারতে ভাষা শিক্ষার এটিই সর্বপ্রথম স্কুল। ওই বছরের ১লা ফেব্রুয়ারিতে বিদ্যালয়টি ৫৮নং কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে স্থানান্তরিত হয়। এখানে অতঃপর সাধারণ শিক্ষা দেবারও ব্যবস্থা হয়। ১৯০৩ সালে ৬৬নং মানিকতলা স্ট্রিটের একটি বড় বাড়িতে বিদ্যালয়টিকে তুলে আনা হয়। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন অমূল্যচরণ স্বয়ং। শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ দে, ফণীমোহন ন্যায়রত্ন প্রমুখ। সেকালের শিক্ষা অধিকর্তা আলেকজান্ডার পেডলার (Alexandar Pedlar) এই বিদ্যালয়টি সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন "Best Scholl of Calcutta maintained by private enterprise"। বিদ্যালয়টি মাত্র ১৫ বছর চলেছিল।

অমূল্যচরণ ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯০৬-০৭ খ্রিস্টাব্দে ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনের ফ্রেঞ্চ, জার্মান, পালি ও বাংলা ভাষার অধ্যাপক হয়েছিলেন।

অমূল্যচরণের সম্পাদনায় অনেকগুলি পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। আর্থিক অনটনের জন্য বিডন স্ট্রিটের পৈতৃক বাড়ি বিক্রি হয়ে যায়। অমূল্যচরণকে পর পর কয়েকটি ভাড়া বাড়িতে থাকতে হয়। প্রথমে শিবপুর, পরে মানিকতলায়। এখানে থাকার সময় অমূল্যচরণের সম্পাদনায় 'বাণী' মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৩১৯ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকার প্রথম যুগ্ম-সম্পাদক হয়েছিলেন, এরপর তিনি 'ইন্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অফ আর্টস' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ১৯১৭ সালের শেষে অথবা ১৯১৮ সালের গোড়ার দিকে তিনি মানিকতলার বাস উঠিয়ে ২৮বি, তেলিপাড়া লেনের ভাড়া বাড়িতে চলে আসেন। ১৯৩০ সালে এ বাড়ি বদল করে ৩১নং তেলিপাড়া লেনে উঠে আসেন। এখানে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত ছিলেন। এই বাড়ি থেকে তাঁর সম্পাদনায় 'পঞ্চপুষ্প' মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এখান থেকেই তিনি "বঙ্গীয় মহাকোষ" গ্রন্থের মাত্র দুই খণ্ড প্রকাশ করেন। এই মহাকোষ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে আশা প্রকাশ করে অমূল্যচরণকে পত্র দিয়েছিলেন সেটি এখানে তুলে দেওয়া হল :

"পৌষ সংক্রান্তি ১৩৪১

"বঙ্গ সাহিত্যের যে পরিমাণ উৎকর্ষ ও বিস্তার হইলে বঙ্গীয় মহাকোষ প্রকাশের সংকল্প রূপ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইতে পারে তাহা আমাদের গৌরবের বিষয়। এই মহাকোষ সম্পূর্ণ হইলে বাংলাদেশের শিক্ষার পথ প্রশস্ত করিতে পারিবে কল্পনা করিয়া উৎসাহ বোধ করিতেছি। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের নেতৃত্বে এই মহদানুষ্ঠান সিদ্ধিলাভ করিবে আশা করিয়া একান্ত মনে ইহার সফলতা কামনা ও সম্পাদকের প্রতি বঙ্গদেশের নামে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।"

রবীন্দ্রনাথের এই প্রত্যাশা কিন্তু পূরণ হয়নি। অমূল্যচরণ দু' খণ্ড বঙ্গীয় মহাকোষ গ্রন্থের মাধ্যমে স্বরবর্ণের 'অ' অক্ষরের অন্তর্গত শব্দ সমষ্টি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি।

এ ছাড়া চারুচন্দ্র মিত্রের সঙ্গে 'সংকল্প' মাসিক পত্রিকা, জগদীন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে 'সাপ্তাহিক মর্মবাণী', কিরণচন্দ্র দত্তের সঙ্গে 'কায়স্থ' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। 'শ্রীভারতী' পত্রিকা তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল।

অমূল্যচরণের রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ বিলাস, জৈনজাতক, শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃত অন্যতম। ত্রিপুরা রাজবংশের ইতিহাস রচনায় কিছুদিন নিযুক্ত ছিলেন তিনি।

ঘাটশিলায় নিজস্ব ভবনে ১৯৪০ সালে তাঁর দেহান্ত হয়।[৫৭]

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্নেহধন্য ছোট নরেনের বাস ছিল এই তেলিপাড়া লেনে। ছোট নরেনের পুরো নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ মিত্র। তিনি শ্যামপুকুর বিদ্যাসাগর স্কুলের মেট্রোপলিটান শাখার ছাত্র ও কথামৃত প্রণেতা মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের (শ্রীম) ছাত্র। মহেন্দ্রনাথের প্রেরণাতেই ছাত্রজীবনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে ছোট নরেনের সাক্ষাৎ হয়। স্বামী বিবেকানন্দের নামের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকায় রামকৃষ্ণদেব এই ভক্তটিকে 'ছোট নরেন' বলতেন। ছোট বেলায় স্কুল পালিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের আকর্ষণে দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করতেন। পরবর্তীকালে ছোট নরেন বিবাহ করে সংসারী হন এবং আইন ব্যবসায়ে (অ্যাটর্নিরূপে) লিপ্ত হন। ছোট নরেনের বিবাহের খবরে রামকৃষ্ণদেব মনঃক্ষুণ্ণ হন। রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপিত হলে পর ছোট নরেন এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম সেক্রেটারি এবং আইন-উপদেষ্টা হন।

ছোট নরেন শ্যামপুকুরের ৩৩এ, তেলিপাড়া লেনে থাকতেন। কথামৃত ৩য় ভাগ থেকে জানা যায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর পরম ভক্ত ছোট নরেনের বাড়িতে গিয়েছিলেন। পূর্বে এই বাড়িটি একতলা ছিল। পরে এটিকে দোতলা করা হয়। মালিক ছিলেন সারদাচরণ মুখোপাধ্যায়। বর্তমানে তাঁরই প্রপৌত্রীর বংশধরগণ (বন্দ্যোপাধ্যায়) এই বাড়িতে বসবাস করেন।[৫৮]

পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত আনন্দ লেন ও শিবশঙ্কর মল্লিক লেনের সংযোগকারি রাস্তাটির নাম বরদা

মিত্র লেন। বরদা মিত্র ছিলেন শোভাবাজার রাজপরিবারের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। আনন্দ লেন ও শিবশঙ্কর মল্লিক লেনের মধ্যবর্তী অঞ্চলে ছিল তাঁর এক বিরাট বস্তি। ১৯০৬ সালে তিনি বস্তির মধ্যে একটি রাস্তা নির্মাণ করে দেন। পরে বস্তি উঠে গেলে সমস্ত জমি ছোট ছোট খণ্ডে বিক্রি করে দেওয়া হয়। জমির নতুন মালিকেরা পুরসভার কাছে আবেদন করেন এই মর্মে যে রাস্তাটি পুরসভা অধিগ্রহণ করে এটির উন্নয়নের ব্যবস্থা যেন করেন। কলিকাতা পুরসভা তাঁদের ১৬ই আগস্ট ১৯২২ সালের অধিবেশনে রাস্তাটি অধিগ্রহণের প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

এর পরে আসে রাস্তাটির নামকরণের প্রশ্ন। একটি প্রস্তাবে বলা হয় বরদা মিত্র রাস্তাটি নির্মাণের জন্য কলিকাতা পুরসভার কাছ থেকে কোনও মূল্য গ্রহণ করেননি। নিজ ব্যয়ে বস্তিবাসীদের সুবিধার জন্য রাস্তাটি নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। পথটি তাঁর নামে নামাঙ্কিত করা হোক। পুরসভা ২৬শে মার্চ ১৯২৪ সালের অধিবেশনে এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন। রাস্তাটি 'বরদা মিত্র লেন' নামে নামাঙ্কিত হয়।[৫৯]

শ্রীকৃষ্ণ লেন একটি বদ্ধ-গলিপথ। আনন্দ লেন থেকে আরম্ভ হয়ে পশ্চিম দিকে এগিয়েছে। পরে দক্ষিণে মোড় ঘুরে বদ্ধপথ হয়েছে। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত রাস্তাটির কোনও নামকরণ হয়নি। সে সময় পথটি আনন্দ লেনের অংশবিশেষ ছিল। ১৯১৬ সালে গলিটির নামকরণ নিয়ে জোর তোড়জোড় শুরু হয়। কলিকাতা পুরসভার কাছে ওই পথের নামকরণের দুটি প্রস্তাব আসে। একটি প্রস্তাবে জগৎ-দুর্লভ বসুর নামে, অন্যটিতে দয়ালচন্দ্র মুখার্জির নামে নামকরণ করতে চাওয়া হয়। পুরসভার অ্যাসেসর বিষয়টি অনুসন্ধান করার পর ব্যানার্জিপাড়া লেন নামকরণের প্রস্তাব দেন। এতে পল্লীবাসীর মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। অতঃপর বিষয়টির সমাধানের জন্য সকল দলের প্রতিনিধিদের একটি সভা আহ্বান করেন কলিকাতা পুরসভা। তুমুল বাকবিতণ্ডা হবার পরও একটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। অবশেষে চেয়ারম্যান রাস্তাটি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নামে শ্রীকৃষ্ণ লেন রাখার প্রস্তাব দেন। অগত্যা সকল দলই এই প্রস্তাব মেনে নেন। কলিকাতা পুরসভা তাদের ২৯শে মার্চ ১৯১৬ সালের অধিবেশনে এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন।[৬০] রাস্তাটির নতুন নাম হয় 'শ্রীকৃষ্ণ লেন'। সে নাম আজও বহাল আছে।

পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত রাস্তাগুলির পর এবার আমরা দৃষ্টি দেব শ্যামপুকুরের উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত রাস্তাগুলির দিকে। প্রথমে কৃষ্ণরাম বসু স্ট্রিটের কথা।

এই পথটি খুবই প্রাচীন। মার্ক উডের মানচিত্রে পথটি চিহ্নিত আছে। সে সময় রাস্তাটি শ্যামবাজার স্ট্রিট থেকে আরম্ভ হয়ে বলরাম ঘোষ স্ট্রিটে এসে পড়েছিল। ভূপেন্দ্র বসু অ্যাভিনিউ তৈরির সময় শ্যামবাজার স্ট্রিটের উত্তর অংশের অবলুপ্তি ঘটে। ওই অংশটুকু ভূপেন্দ্র বসু অ্যাভিনিউ-এর অন্তর্গত হয়ে যায়। বর্তমানে কৃষ্ণরাম বসু স্ট্রিটের শুরু ভূপেন্দ্র বসু অ্যাভিনিউ থেকে।

কৃষ্ণরাম বসুর পিতা দয়ারাম বসু। বর্গীর হাঙ্গামার সময় (১৭৪২) পিতা ও পুত্র বালি থেকে শ্যামবাজারে এসে বসবাস শুরু করেন। দয়ারাম ছিলেন পলাশী আমলের লোক। নবাব সিরাজদ্দৌলার কলিকাতা আক্রমণের ক্ষতিপূরণস্বরূপ যে এক কোটি সত্তর লক্ষ টাকা পাওয়া যায়, সেই অর্থ বণ্টনের জন্য রবার্ট ক্লাইভ ১৩ জন কমিশনার নিযুক্ত করেন। দয়ারাম ছিলেন তাঁদের অন্যতম। পুত্র কৃষ্ণরাম বসু (১৭৩৩-১৮১১) লবণের ব্যবসায়ে যথেষ্ট ধনশালী হয়ে ওঠেন। কিছুকাল পরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে হুগলির দেওয়ানি লাভ করেন। বিত্তের সঙ্গে সম্মানের অধিকারী হন। বাংলাদেশে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় দেওয়ান কৃষ্ণরাম লাখ টাকার চাল বিতরণ করেছিলেন। বাংলাদেশ ছাড়াও কাশী, কটক, পুরী, ভাগলপুর প্রভৃতি স্থানে দান ও জনহিতকর কাজের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। শ্রীরামপুরে মাহেশের রথ তিনি নির্মাণ করে দেন। তড়াগ্রাম থেকে মথুরাবাটী পর্যন্ত তাঁর নির্মিত পথ "কৃষ্ণ জাঙ্গাল" নামে পরিচিত। এ ছাড়া যশোরে শ্রীশ্রীমদনগোপাল, বীরভূমে শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ মূর্তি, কাশী ও ভাগলপুরে শিবমন্দির এবং গয়ায় রামশিলা সোপানশ্রেণী কৃষ্ণরাম বসু নির্মাণ করে দেন। এ ছাড়াও কটক থেকে পুরী পর্যন্ত একটি

রাস্তা নির্মাণ করে দিয়েছিলেন।

কৃষ্ণরাম বসুর কলিকাতায় আদিবাড়ি ছিল শ্যামবাজার ট্রাম ডিপোর জায়গায়। পরবর্তীকালে তাঁর জ্ঞাতি নবীনচন্দ্র বসু ওই বাড়িটি লাভ করেন। কৃষ্ণরাম বসু তাঁর ভবনে ভৈরব বিগ্রহ এবং বাড়ির সামনে শিবালয় প্রতিষ্ঠা করেন। সে মন্দির আজও আছে। কৃষ্ণরাম তাঁর বসত বাড়িতে শ্যামচাঁদ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। বসু পরিবারের মতে তাঁদের গৃহদেবতা শ্যামচাঁদের নামে শ্যামবাজার স্ট্রিট নামাঙ্কিত হয়েছে।

কৃষ্ণরাম বসুর দুই পুত্র— মদনগোপাল ও গুরুপ্রসাদ। শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর বংশধরের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন গুরুপ্রসাদ। পরে তিনি গৃহদেবতা শ্যামচাঁদ বিগ্রহকে সঙ্গে নিয়ে সপরিবারে উড়িষ্যার অন্তর্গত ভদ্রক জেলার কোঠার গ্রামে চলে যান। সেখানে তাঁদের জমিদারিতে শ্যামচাঁদকে প্রতিষ্ঠা করেন। গুরুপ্রসাদের দুই বিবাহ— দ্বিতীয় পক্ষের উত্তরপুরুষ হলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্য ও রসদদার বাগবাজারের বলরাম বসু।

গুরুপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র কালাচাঁদ কলিকাতায় থেকে যান। তিনি প্রথম পক্ষের সন্তান। তিনি বৃন্দাবন থেকে শিলা আনিয়ে ৮২ নম্বর শ্যামবাজার স্ট্রিটে রাধা-দামোদর প্রতিষ্ঠা করেন। শ্যামবাজার স্ট্রিটের উত্তর অংশ ভূপেন্দ্র বসু অ্যাভিনিউ-এর অন্তর্গত হওয়ায় এই বাড়ির বর্তমান নম্বর ১২, ভূপেন্দ্র বসু অ্যাভেনিউ হয়েছে। রাধা-দামোদরের সেবার জন্য কলিকাতার কিছু ভূসম্পত্তি দেবোত্তর করা আছে।

কালাচাঁদ বসুর পৌত্র কৃষ্ণচন্দ্র বসু (১৮৬০-১৯৪৪) এই পরিবারের একজন কৃতী সন্তান। শিক্ষা হিন্দু স্কুলে, ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে বি. এ. পাশ করেন। কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন একজন সঙ্গীতপ্রেমী ও সঙ্গীতসাধক। নানাপ্রকারের বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পারতেন। ভারতের সেরা সঙ্গীত ও যন্ত্র শিল্পীরা তাঁর বাড়িতে সঙ্গীত পরিবেশন করে গেছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র যোগেন্দ্রচন্দ্রের মাত্র ১৭ বছর বয়সে অকালপ্রয়াণে তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে 'যোগেন্দ্র হোমিওপ্যাথি দাতব্য চিকিৎসালয়' প্রতিষ্ঠা করেন এবং পরে সেটি কলিকাতা পুরসভার হাতে তুলে দেন। চিকিৎসালয়টি তাঁদের বাড়ি ১২, ভূপেন্দ্র বসু অ্যাভিনিউ -এর পাশেই অবস্থিত। কাশীর রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে 'যোগেন্দ্র ওয়ার্ড' তাঁরই অর্থে প্রতিষ্ঠিত। কৃষ্ণচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ অবদান মাহেশের কাঠের রথের বদলে লোহার রথ নির্মাণ করে দেওয়া।

কৃষ্ণচন্দ্র বসুর পুত্র কেশবচন্দ্র (১৯১০-১৯৬৮) দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় A. R. P. Staff Officer হয়েছিলেন। হাতিবাগানে জাপানি বোমা পড়ার সময় আহতের উদ্ধারে যে সাহসিকতা দেখিয়েছিলেন তার জন্য তাঁকে Governor's Medal দিয়ে সম্মানিত করা হয়। পরবর্তীকালে বিশেষ পুলিশ বাহিনীর গ্রুপ কম্যান্ডার (Group Commander) হয়েছিলেন। শ্যামবাজারে বিখ্যাত রেডিওর দোকান 'ট্রেডার্স ব্যুরো'-এর মালিক ছিলেন কেশবচন্দ্র বসু।

কৃষ্ণরাম বসুর উত্তরপুরুষগণ বর্তমানে ১২নং ভূপেন্দ্র বসু অ্যাভিনিউ-এর বাড়িতে বাস করেন।[৬১]

কৃষ্ণরাম বসু স্ট্রিটের ঘোষ পরিবার কলিকাতার প্রাচীন বনেদি পরিবারগুলির অন্যতম। এঁরা বর্তমানে ১/৩, কৃষ্ণরাম বসু স্ট্রিটে 'অতুলভবনে' বাস করেন। জীবনী ও প্রবন্ধকার মন্মথ ঘোষ এই পরিবারের অন্যতম কৃতী সন্তান।

মন্মথনাথ ঘোষের পূর্বপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ ঘোষ সেকালের কলিকাতায় একজন নামজাদা পুরুষ ছিলেন। তিনি ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। পুত্র রামদেব ঘোষ কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে বক্সীর কাজ করে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করেন। রামদেবের পুত্র রামলোচন। রামলোচনের পুত্র কাশীনাথ ঘোষ। সেকালের সুপ্রসিদ্ধ ফারগুসন কোম্পানির চিফ অ্যাসিস্ট্যান্ট বেনিয়ান (Chief Assistant Banian to Fairlie Fergusson & Co.) ছিলেন। এই কাজে তিনি প্রচুর বিত্তের সঙ্গে খ্যাতি লাভ করেন। সেকালের ধনী ব্যবসায়ী রামদুলাল দে সরকার তাঁর পরমবন্ধু ছিলেন। রামদুলালের বাসভবনের নিকটে বিডন স্ট্রিটে ছিল তাঁর প্রাসাদোপম অট্টালিকা। সেটি দু' বিঘা জমির ওপর অবস্থিত ছিল। পরে সেখানে দুটি শিব মন্দির এবং একটি বাগান নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। সেই

বাগানের অস্তিত্ব আজ আর নেই, কিন্তু শিবমন্দির দুটি আজও আছে। ওই অঞ্চলের একটি রাস্তা তাঁর নামে কাশী ঘোষ লেন নামাঙ্কিত হয়ে আছে। কাশী ঘোষের পৌত্র গিরিশচন্দ্র ঘোষ ছিলেন হিন্দু পেট্রিয়ট ও বেঙ্গলি পত্রিকার প্রবর্তক ও প্রধান সম্পাদক। গিরিশচন্দ্রের পুত্র অতুলচন্দ্র বিচার বিভাগে কর্মরত হলেও আজীবন সাহিত্যচর্চা করে গেছেন। দেশি বিদেশি একাধিক ভাষা জানতেন। কয়েকখানি নাটক অনুবাদ করেছিলেন। অতুলচন্দ্রের পুত্র মন্মথনাথ ঘোষ।

১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে ১নং দমদম রোডে মাতুলালয়ে মন্মথনাথের জন্ম হয়। ছেলেবেলা থেকে তিনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বিশুদ্ধ গণিতে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর চাকুরি জীবন শুরু। সার্ভে অব ইন্ডিয়ার পে অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস অফিসে দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত ছিলেন।

অল্পবয়স থেকেই মন্মথনাথ সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। সুরেশচন্দ্র সমাজপতির 'সাহিত্য' পত্রিকায় তাঁর প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়। পরে সাহিত্য, আর্য্যাবর্ত, যমুনা, মানসী ও মর্মবাণী, মাসিক বসুমতী, পঞ্চপুষ্প, ভারতবর্ষ ইত্যাদি পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হতে থাকে। প্রধানত জীবনীকার ও প্রবন্ধ রচয়িতা হিসাবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন।

১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে মন্মথনাথ লন্ডনের রয়াল স্ট্যাটিস্টিক্যাল সোসাইটি এবং রয়াল ইকনমিক সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। কলিকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, রবিবাসর সাহিত্য সভা, ক্রিক রো-এর ডিসেন্ট ক্লাব, মিলন মন্দির (Federation Hall) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

অনেকগুলি জীবনীগ্রন্থ রচনা করেছিলেন মন্মথনাথ— The life of Girish Chunder Ghosh, the founder and first editor of the Hindu Patriot and the Bengalee, মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ, রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র (৩ খণ্ড), মনীষী ভোলানাথ চন্দ্র, রঙ্গলাল প্রভৃতি। এ ছাড়া তিনি লিখেছেন অজস্র প্রবন্ধ যা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে সেকালের বিখ্যাত পত্রপত্রিকার পাতায় পাতায়।[৬২]

পরের রাস্তা 'পদ্মনাথ লেন'। খুবই ছোট রাস্তা। পথটি বলরাম ঘোষ স্ট্রিট থেকে শুরু হয়ে সোজা দক্ষিণে এগিয়ে পরে মোড় ঘুরে কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে এসে পড়েছে। শক সাহেবের মানচিত্রে (১৮২৫-৩২) রাস্তাটি প্রথম চিহ্নিত হতে দেখা যায়। সম্ভবত লটারি কমিটি কর্নওয়ালিস স্ট্রিট নির্মাণের সময় এটি তৈরি করে থাকবেন। রাস্তাটি পদ্মচন্দ্র নাথের নামে নামাঙ্কিত করা হয়। পদ্মচন্দ্র সেকালের কলিকাতায় চিনেবাজারে বিখ্যাত পুস্তকবিক্রেতা ছিলেন। তিনি জাতিতে ছিলেন যুগী।[৬৩]

শ্যামপুকুর এলাকায় উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত একটিমাত্র রাস্তা আছে— সেটি আবার বিভিন্ন নামে নামাঙ্কিত হয়েছে— মন্মথ ভট্টাচার্য স্ট্রিট, রামধন মিত্র লেন, শ্যামপুকুর লেন ও রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিটের অংশবিশেষ। এর মধ্যে রামধন মিত্র লেন ও শ্যামপুকুর লেন প্রাচীনতম অংশ। এই অংশটুকু মার্ক উডের কলিকাতা মানচিত্রে চিহ্নিত আছে। আর রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিটের অংশে ছিল বিরাট বস্তি। এই বস্তি উচ্ছেদ করে লাহা কলোনি তৈরি হয়। আর কলোনির মধ্যেকার রাস্তাই রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিটের অংশবিশেষ।

দৃষ্টি ফেরাই মন্মথ ভট্টাচার্য স্ট্রিটের দিকে। ১৯২৪ সালের গোড়ার দিকে কলিকাতা পুরসভা শ্যামপুকুর এলাকায় বস্তি উচ্ছেদ করে দুটি নতুন রাস্তা নির্মাণ করেন। প্রথমটি বলরাম ঘোষ স্ট্রিট থেকে শুরু হয়ে উত্তর দিকে এগিয়ে চৌধুরী লেনের পূর্ব অংশের সঙ্গে মিলিত হয়। আর দ্বিতীয় পথটি কৃষ্ণরাম বসু স্ট্রিট থেকে আরম্ভ হয়ে পশ্চিম দিকে এগিয়ে পরে মোড় ঘুরে চৌধুরী লেনের পশ্চিম অংশের সঙ্গে মিলিত হয়। নতুন এই রাস্তা দুটির নামকরণ নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হয়। এলাকার কিছু সম্ভ্রান্ত লোক রাস্তা দুটি রানী হেমন্তকুমারীর নামে রানী হেমন্তকুমারী রোড ও পুঁটিয়া রোড নামকরণের সুপারিশ করেন। তাঁরা তাঁদের পত্রে অবগত করান যে রাজশাহী জেলার অন্তর্গত পুঁটিয়ার রানী হেমন্তকুমারী একজন বহুমানভাজন ধার্মিক মহিলা। দরিদ্র ছাত্রদের শিক্ষাবিস্তারের জন্য বহু অর্থ ব্যয় করেছেন। বহু স্কুল কলেজ ও নানা প্রতিষ্ঠান তাঁর দানে সমৃদ্ধ হয়েছে। এ ছাড়া শ্যামবাজারের অনাথ আশ্রম, মেয়ো হাসপাতাল প্রভৃতি নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানও তাঁর দানে

পরিপুষ্ট।

দ্বিতীয় আবেদনপত্রে চৌধুরী লেনের চৌধুরীদের নামে রাস্তা দুটি নামকরণ করতে চাওয়া হয়েছিল সে কথা চৌধুরী লেন প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি।

অন্য আরেকটি পত্রে নতুন একটি রাস্তা মহামহোপাধ্যায় মহেশ ন্যায়রত্নের সুযোগ্য পুত্র মন্মথনাথ ভট্টাচার্যের নামে নামাঙ্কিত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল।

কলিকাতা পুরসভা তিনটি আবেদনপত্র বিচার-বিবেচনা করেন। পৌর কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে রানী হেমন্তকুমারীকে জানানো হয় যে তাঁর বাসভবনের উত্তর-পশ্চিম ধার দিয়ে যে নতুন রাস্তাটি কৃষ্ণরাম বসু স্ট্রিট পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে, সেই পথটি তাঁর নামে নামাঙ্কিত হলে তিনি পথটির উন্নয়নের জন্য ৫০০০ টাকা অনুদান দিতে সম্মত কি-না। উত্তরে রানী পুরসভাকে অবহিত করেন যে তিনি ২০০০ টাকা দেবেন এবং ওই অর্থ জনসেবায় ব্যয় করা যেতে পারে। কলিকাতা পুরসভা তাঁদের ৩১শে মার্চ ১৯২৪ সালের অধিবেশনে ওই রাস্তাটি রানী হেমন্তকুমারীর নামে নামাঙ্কিত করেন।

চৌধুরী পরিবারের নামে চৌধুরী লেন থাকায় কলিকাতায় পুরসভা দ্বিতীয় প্রস্তাবটি বাতিল করেন।

কলিকাতা পুরসভা তাদের একই দিনের অধিবেশনে তৃতীয় প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন। বলরাম ঘোষ স্ট্রিট থেকে শুরু হয়ে চৌধুরী লেনের পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত নবনির্মিত পথটি মন্মথনাথ ভট্টাচার্যের নামে নামকরণ করা হয়। পরবর্তীকালে ভূপেন্দ্র বসু অ্যাভিনিউ তৈরি হলে ওই পথটিকে আরও উত্তরে প্রসারিত করে পূর্ববর্তী অ্যাভিনিউ-এর সঙ্গে সংযুক্ত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়।[৬৪] কিন্তু তা কার্যকর হয়নি।

কীর্তিমান পিতা পণ্ডিত মহেশ ন্যায়রত্নের কৃতী পুত্র মন্মথনাথ ভট্টাচার্য (১৮৬৩-১৯০৮) সংস্কৃত কলেজ থেকে বি.এ.পাশ করে 'বিদ্যারত্ন' উপাধি লাভ করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে গণিতে এম. এ.পাশ করেন। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাজের ডেপুটি কন্ট্রোলার নিযুক্ত হন। পরে সরকারের হিসাব বিভাগে চাকুরি নিয়ে কলিকাতা, মাদ্রাজ, রেঙ্গুন, শিলং, নাগপুর প্রভৃতি স্থানে অবস্থান করেন। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে পঞ্জাবের অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল হন। বাঙালির মধ্যে তিনিই প্রথম এই উচ্চপদ লাভ করেন।

মন্মথনাথ ভট্টাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের সহপাঠী ছিলেন। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে পরিব্রাজক স্বামীজির সঙ্গে ত্রিবান্দ্রামে মন্মথবাবুর দেখা হয় এবং তখনই তিনি স্বামীজিকে নিজের বাসায় এনে তাঁর সঙ্গ লাভ করেন। ৫ই আগস্ট ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে স্বামীজি আমেরিকা থেকে ১২ পাতার একখানি পত্র মন্মথ ভট্টাচার্যকে লেখেন। এই পত্রে তিনি আমাদের দেশের স্ত্রীশিক্ষার সঙ্গে পাশ্চাত্য দেশের স্ত্রীশিক্ষার প্রভেদের বিষয় বিশদ আলোচনা করেছিলেন। পত্রটি বর্তমানে মন্মথ ভট্টাচার্যের উত্তরপুরুষ শ্রীমলয় ভট্টাচার্যের কাছে সযত্নে রক্ষিত আছে। আমেরিকাতে স্বামী বিবেকানন্দের আর্থিক অসুবিধা হওয়াতে তিনি তাঁর বন্ধু মন্মথ ভট্টাচার্যকে লিখে জানান। মন্মথবাবু তখন মাদ্রাজের ডেপুটি কন্ট্রোলার (১৮৯৩)। তিনি ক্ষেত্রী মহারাজার সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং মহারাজা ৫০০ টাকা (১৫০ ডলার) মন্মথ ভট্টাচার্য মারফত স্বামীজিকে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন।[৬৫] এরপর ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলিকাতায় এসে বেলুড়ে স্বামীজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

রামধন মিত্র লেন দৈর্ঘ্যে ক্ষুদ্র হলেও সেকালের শ্যামপুকুর পল্লীর খ্যাতিমান পুরুষদের আবাসভবন ছিল এই রাস্তার ওপর। দেশের সমাজ-সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁদের ছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

প্রথমে রামধন মিত্রের পরিচয় দিয়ে রামধন মিত্র লেনের কথা শুরু করা যাক। মিত্র পরিবারের আদি বাড়ি খানাকুল কৃষ্ণনগরে। এঁরা দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ। রামধনের পিতামহ মনোহর মিত্র অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে কলিকাতায় আসেন। ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করেন। পিতা রাধানাথ মিত্র। রামধন মিত্র জল-পরিবহণ বাণিজ্যের পত্তন করেন। শোনা যায় এই ব্যবসায় তিনি ২০০ গাধাবোট নিয়োগ করেছিলেন। ধীরে ধীরে তাঁর ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন।

এককালে রামধন মিত্র লেনের অধিকাংশ বাড়িই তাঁর মালিকানায় ছিল। রামধন মিত্রের চার পুত্রের মধ্যে নীলমাধব ও দীননাথ মামলা-মকদ্দমা করে বহু সম্পত্তি নষ্ট করেন। তৃতীয় পুত্র মতিলাল জাহাজের কারবার করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জি কোম্পানির নেভাল অ্যাডভাইসর (Naval Advisor) হয়েছিলেন। এ ছাড়া সেকালের বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর সংশ্রব ছিল। মতিলালের দুই পুত্র, চার কন্যা। এক কন্যা কৃষ্ণপ্রিয়াঙ্গিনী গিরিশচন্দ্রের একান্ত সুহৃদ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্নেহধন্য 'দানাকালী' ওরফে কালীপদ ঘোষের স্ত্রী ছিলেন। আরেক কন্যা অরোরা ফিল্মের সত্বাধিকারী অনাদি বসুর মা। মতিলালের দুই পুত্র— মণিলাল ও ফণীলাল— উভয়ই সেকালের বিখ্যাত কাগজ ব্যবসায়ী জন ডিকিনসনের দপ্তরে চাকরি করতেন। পরে চাকুরি ছেড়ে কাগজের ব্যবসার পত্তন করেন। এ ছাড়াও তাদের কোলাঘাটে ইট তৈরির কারখানা ছিল। মণিলালের পুত্র যতীন্দ্রনাথের জুড়িগাড়ি ও ঘোড়ার ব্যবসা ছিল। ঘোড়া কিনে আনতেন বিহারের হরিহরছত্র থেকে। পরে ঘোড়াকে শিক্ষা দিয়ে গাড়িতে জোতার ব্যবস্থা করতেন। পরবর্তীকালে মোটর গাড়ির আমদানির ফলে এই ব্যবসা তুলে দিতে হয়। বর্তমানে ১৮, রামধন মিত্র লেনে যতীন্দ্রনাথের উত্তরপুরুষগণ বসবাস করেন। এই বাড়িতে শ্রীঅরবিন্দের উপাসনালয় আছে।[৬৬]

এরিয়ান ফুটবল ক্লাবের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং কলিকাতার ক্রীড়া জগতের দিকপাল দুঃখীরাম মজুমদার (১৮৭৯-১৯২৯) ২এ, রামধন মিত্র লেনে বাস করতেন। তাঁর প্রকৃত নাম উমেশচন্দ্র মজুমদার। মজুমদার পরিবারের আদি বাস ছিল যশোর জেলায় (এখন বাংলাদেশের মধ্যে)। এঁদের উপাধি ছিল গুহ। নবাবি খেতাব 'মজুমদার'। পিতা গোপাল মজুমদার। তাঁর দুই পুত্র— দুঃখীরাম ও কালীচরণ। উভয় ভ্রাতা স্যানিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্লাম্বিং ব্যবসায়ে নিয়োজিত ছিলেন। ক্রীড়ামোদী মহলে উমেশ মজুমদার 'দুঃখীরাম বাবু' এবং খেলোয়াড় মহলে 'স্যার' নামে পরিচিত ছিলেন। কলিকাতার ফুটবল ও ক্রিকেটের প্রথম যুগের একজন প্রধান উদ্যোক্তা এবং এরিয়ান ক্লাবের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। অকৃতদার। ব্যবসায় অর্জিত অর্থ খেলার জন্য ব্যয় করে গেছেন। ফুটবল খেলার ওপর তাঁর বিখ্যাত পুস্তক 'Hints to the Young Footballers'। এই সব কারণে তাঁকে 'The father of the Indian football' বলা হত।

কালীচরণ মজুমদারের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিখ্যাত ফুটবল ও ক্রিকেট খেলোয়াড় সন্তোষকুমার মজুমদার (১৮৯৮-১৯৭৬)। ক্রীড়াজগতে তিনি 'ছোনে মজুমদার' নামে পরিচিত। জ্যাঠা দুঃখীরাম মজুমদারের কাছে ফুটবল খেলা শিক্ষা। এরিয়ান ক্লাবে ব্যাকে খেলতেন। কিন্তু গোলকিপার থেকে লেফট আউট পর্যন্ত প্রায় সমান দক্ষতায় নিজেকে মানিয়ে নিতে পারতেন। ওই সময়কার সব প্রতিনিধিমূলক খেলায় তিনি খেলোয়াড় ছিলেন। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে আই এফ এ দলের সঙ্গে সিংহলে (এখন শ্রীলঙ্কা), ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকায় ও ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়েছিলেন। ১৯৩৮ সালে ভবানীপুর ক্লাবে খেলেন। ইংরেজ আমলে যে কয়েকজন ভারতীয় ফুটবল খেলোয়াড় বুট পরে খেলতেন তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। জ্যাঠা স্যার দুঃখীরামের মতো তিনিও অকৃতদার।[৬৭]

বর্তমানে ২এ, রামধন মিত্র লেনে ছোনে মজুমদারের ছোট ভাই তারকনাথ মজুমদারের উত্তরপুরুষগণ বাস করেন।

'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক, ক্ষুরধার সমালোচক, প্রবন্ধকার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দৌহিত্র সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (১৮৭০-১৯২১) রামধন মিত্র লেনের ভাড়া বাড়িতে বাস করতেন। পিতা গোপালচন্দ্র ঘোষাল সমাজপতি, মাতা হেমলতাদেবী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জ্যেষ্ঠা কন্যা। সমাজপতিদের আদিবাড়ি ছিল নদিয়া জেলার আইসমালী গ্রামে। অল্পবয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় তিনি ও তাঁর ভাই মাতামহ বিদ্যাসাগরের গৃহে প্রতিপালিত হন। অতি অল্পবয়সে সুরেশচন্দ্রের সাহিত্যচর্চা শুরু। পতাকা, সমাচারচন্দ্রিকা, সুরভির পৃষ্ঠায় বাল্য রচনার সূত্রপাত। মাঘ ১২৯৬ থেকে 'সাহিত্য কল্পদ্রুম' এবং বৈশাখ ১২৯৭ থেকে 'সাহিত্য' মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। এগুলি ছাড়া বসুমতী, সন্ধ্যা, নায়ক ও বাঙ্গালী তাঁর সম্পাদিত সংবাদপত্র। তাঁর দ্বারা সমালোচনা

সাহিত্য বহুল পরিমাণে পুষ্ট হয়েছিল। তীক্ষ্ণ, ব্যঙ্গাত্মক, সরস ও নির্ভীক সাহিত্য সমালোচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাই তাঁকে বলা হত, 'সমাজপতি সত্যই সাহিত্যসমাজের সমাজপতি ছিলেন।' এ ছাড়াও তিনি সাহিত্যসৃষ্টির কাজেও যথেষ্ট প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। কল্কিপুরাণ, সাজি, বনভেরি, ইউরোপের মহাসমর, ছিন্নহস্ত, আগমনী, বঙ্কিম প্রসঙ্গ প্রভৃতি সুরেশ সমাজপতির বিচিত্রধর্মী রচনা। স্বদেশি আন্দোলনের সময় বাগ্মী হিসাবেও যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেন। দীর্ঘকাল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর নিজের সংগ্রহে ছিল এক বিশাল গ্রন্থাগার। তাঁর ২/১, রামধন মিত্র লেনের (অধুনা ৬নং) গৃহটি ছিল সেকালের সাহিত্য রথী মহারথীদের তীর্থক্ষেত্র। বহু জ্ঞানী গুণী মনীষীর আগমনে ধন্য হয়েছিল এই গৃহ।

"আশ্বিনের শারদ প্রাতে বেজে উঠেছে আলোকমঞ্জরী"—মহালয়ার পুণ্যলগ্নে বেতারের মাধ্যমে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের সুললিত কণ্ঠে দেবীবন্দনা আমাদের নিয়ে যায় এক অনির্বচনীয় লোকে। যিনি সমস্ত বাঙালি হৃদয়কে এইভাবে আপ্লুত রেখেছেন তাঁর সম্বন্ধে জানতে কার না আগ্রহ হয়!

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের পিতৃপুরুষদের আদি নিবাস ২৪ পরগনার অন্তর্গত দত্তপুকুরে। বীরেন্দ্রকৃষ্ণের প্রপিতামহ রামচন্দ্র ভদ্র দত্তপুকুরের কায়স্থ সমাজের মধ্যে সম্পন্নশালী গৃহস্থ ছিলেন। রামচন্দ্রের দুই পুত্র ও দুই কন্যা। পুত্রদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র জ্যেষ্ঠ এবং অমরচন্দ্র কনিষ্ঠ। গিরিশচন্দ্র শিক্ষালাভের জন্য কলিকাতায় চলে আসেন এবং বি. এ. পাশ করে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। গিরিশচন্দ্রের বিবাহ প্রসিদ্ধ পাখোয়াজ বাদক ও হাফ-আখড়াই গায়ক যদুনাথ ঘোষের জ্যেষ্ঠা কন্যা যোগমায়া দেবীর সঙ্গে। যোগমায়া দেবী ছিলেন উচ্চশিক্ষিতা। ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষায় তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল। তাঁর দুই পুত্র— কমলকৃষ্ণ ও কালীকৃষ্ণ। ১৮৭৪ সালে কালীকৃষ্ণের জন্ম। আর ছিল তিন বোন। গিরিশচন্দ্রের অকাল-মৃত্যুতে পাঁচ সন্তানকে নিয়ে যোগমায়া দেবী অকূলপাথারে পড়েন। সেই সময় পঞ্জাবের নাভা রাজ্যের মহারানী ও রাজকুমারীদের পড়াবার বিজ্ঞাপন দেখে আবেদন করেন। বেতন ১৫০ টাকা। তাঁর আবেদন মঞ্জুর হয়। যোগমায়া দেবী মহারানী ও রাজকন্যাদের শিক্ষিত করে তোলেন। মহারাজা যোগমায়া দেবীকে 'মাতাজি' বলতেন। যোগমায়া দেবী স্বোপার্জিত অর্থে ১২নং রামধন মিত্র লেনের (এখন ৭নং) বসতবাড়িটি ক্রয় করেন। তখনকার দিনে মহিলাদের পক্ষে এ কাজ ছিল অকল্পনীয়।

কালীকৃষ্ণও পঞ্জাব থেকে এন্ট্রান্স পাশ করে কলিকাতায় আসেন। বিবাহ হয় পুলিশ কোর্টের বিখ্যাত উকিল তারিণীচরণ ঘোষের মধ্যমা কন্যার সঙ্গে। ১৯০৩ সালে কালীকৃষ্ণ ছোট আদালতের ইন্টারপ্রিটারের পদ পান। ১৫টি ভাষায় তাঁর অধিকার ছিল। সুরেশ সমাজপতির সঙ্গে ছিল তাঁর গভীর হৃদ্যতা। সমাজপতির মৃত্যুর পর 'সমাজপতি গ্রন্থাগার' কালীকৃষ্ণের বাড়িতে স্থাপিত হয়। নিজের দেশ দত্তপুকুরে বিদ্যালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন। ১৯২৭ সালে তাঁকে রায়সাহেব উপাধি দেওয়া হয়। ১৯৩৮ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

কালীকৃষ্ণের দুই পুত্র— ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ও বীরেন্দ্রকৃষ্ণ। ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ (১৮৯৩-১৯৬৩) সমাজসেবীরূপে শ্যামপুকুর পল্লীতে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। পল্লীর সকল সমাজসেবামূলক কাজে তিনি ছিলেন অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব।

ভূপেন্দ্রকৃষ্ণের ছোট ভাই বীরেন্দ্রকৃষ্ণের ১৯০৫ সালে আহিরিটোলায় জন্ম। পরে তিনি শ্যামপুকুরে পৈতৃক বাসভবনে চলে আসেন। এই বাড়িতে তিনি আমৃত্যু ছিলেন। ঠাকুমা যোগমায়াদেবীর কাছে সংস্কৃত শিক্ষালাভ করেন। ঠাকুমাই বীরেন্দ্রকৃষ্ণকে শেক্সপীয়ারের নাটকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। টাউন স্কুল থেকে ম্যাট্রিক এবং ১৯২৮ সালে বি. এ. পাশ করেন। একই সঙ্গে চাকুরিও জুটে যায় ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ের ফেয়ারলি প্লেসের অফিসে।

লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে বাড়ির কাছে কম্বুলিয়াটোলায় 'চিত্রা সংসদ' ও সাহিত্যসেবী নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত প্রতিষ্ঠিত 'অর্ধেন্দু নাট্য পাঠাগার'-এ গান বাজনা ও অভিনয়চর্চা করতেন। চিত্রা সংসদের মাধ্যমে বীরেন্দ্রকৃষ্ণের পরিচালনায় বেতারে 'চিকিৎসা সঙ্কট' নাটক ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে পরিবেশিত হয়। অভিনয়ে ছিলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ স্বয়ং, পঙ্কজ মল্লিক, বাণীকুমার, পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, সত্য দত্ত

প্রমুখ। সেই থেকে বীরেন্দ্রকৃষ্ণের যোগাযোগ কলিকাতা বেতারকেন্দ্রের সঙ্গে। ১৯২৮ সালের শেষের দিকে রেলের চাকুরি ছেড়ে রেডিওতে ঢুকলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ। এই বেতারকেন্দ্রই ছিল বীরেন্দ্রকৃষ্ণের প্রধান কর্মক্ষেত্র। প্রযোজনা, নাটক নির্দেশনা ও অভিনয় করেছেন অসংখ্য নামী অনামী নাটকে। তাঁর জনপ্রিয়তম অনুষ্ঠান 'মহিষাসুরমর্দিনী'। এ ছাড়া ছিল 'সবিনয় নিবেদন', 'পঞ্চভূত' প্রভৃতি অনুষ্ঠান এবং বেতারে ধারাবিবরণী প্রবর্তনা। কৌতুক-নক্সা 'রূপ ও রঙ্গ' বিরূপাক্ষ নাম নিয়ে পরিচালনা করে খ্যাতিমান হয়েছিলেন। বেতারের বাইরে ছিল তাঁর বিশাল পরিচিতি। তাঁর উজ্জ্বলরূপটির পরিচয় পাওয়া যায় পেশাদার রঙ্গমঞ্চে, গ্রামাফোন রেকর্ডে, ছায়াছবিতে আর বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাঁর বৈচিত্র্যপূর্ণ লেখনশৈলীতে। ছোটদের জন্য তাঁর কলম থেকে ঝরেছিল নানা স্বাদের গল্প, কবিতা ও গদ্যরচনা। ৩রা নভেম্বর ১৯৯১ খ্রিঃ এই সর্বগুণান্বিত প্রতিভার জীবনাবসান হয়। (তথ্য—শ্রীঅশোক ভদ্রের সৌজন্যে)

প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শ্যামপুকুর নিবাসী আরেক গৃহীভক্ত। ৪০নং রামধন মিত্র লেনে ছিল তাঁর আবাসভবন। কথামৃত ২য় ভাগ থেকে জানা যায় প্রাণকৃষ্ণ জনাই-এর মুখুজ্যে বংশের সন্তান। কলিকাতায় শ্যামপুকুরে তাঁর বাড়ি। ম্যাকেঞ্জি লায়ালের এক্সচেঞ্জ নিলামঘরের কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন। গৃহী হয়েও বেদান্ত চর্চায় তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। নিজের শ্যামপুকুরের বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে নিয়ে গিয়ে মহোৎসব করেছিলেন (১৮৮২ সালের এপ্রিল মাসে)। একটু স্থূলকায় ছিলেন, তাই রামকৃষ্ণদেব তাঁকে মাঝে মাঝে 'মোটা বামুন' বলতেন। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে প্রাণকৃষ্ণের নিয়মিত যাতায়াত ছিল।

প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের শ্যামপুকুরের যে বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভাগমন হয়েছিল, সেই বাড়িটি ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে প্রাণকৃষ্ণের বংশধরগণ বিক্রি করে দেন। গোষ্ঠবিহারী ধর বর্তমানে এই বাড়ির মালিক। বাড়িটি প্রাচীন ও বেশ বড়, রামকৃষ্ণদেব যে ঘরে অবস্থান করেছিলেন সেটি বাড়ির দোতলায়, উত্তর-দক্ষিণ অংশের ডানদিকের ঘর। কথামৃতে এই ঘরকে দোতলার বৈঠকখানা বলা হয়েছে। এই অংশে এককালে কবি ও গৃহী সাধক প্রয়াত সৌরেন্দ্রনাথ গুপ্ত বাস করতেন।

বিশিষ্ট সমাজসেবী, খ্যাতিমান চিকিৎসক, কলিকাতা পুরসভার কাউন্সিলার ডাক্তার ভূপেন্দ্রনাথ বসু (১৮৯০-১৯৮৫) ৪৪/১, রামধন মিত্র লেনে বাস করতেন। পিতা ত্রৈলোক্যনাথ বসু। ডাঃ বসুর পৈতৃক বাড়ি ৪৯নং শ্যামবাজার স্ট্রিটে অবস্থিত। স্থানের অকুলান হওয়ায় ১৯৩৯ সালে রামধন মিত্র লেনের বাড়িটি নির্মাণ করেন এবং এখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তিনি কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ-এর (এখন, আর জি কর মেডিকেল কলেজ) প্রফেসর অফ অ্যানাটমি (Prof. of Anatomy) পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৩৬ সালে কলিকাতা পুরসভার শ্যামপুকুর এলাকার পৌর প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। বহু বছর ওই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এ ছাড়া বহু সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। টাউন স্কুলের গর্ভনিং বডির সভাপতি, অনাথ আশ্রম, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজ, কম্বুলিয়াটোলা দরিদ্র ভাণ্ডারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।[৬৮]

গ্লোব নাশরীর প্রতিষ্ঠাতা অমরনাথ রায়ের আদি বাসস্থান ছিল নদিয়া জেলায় শান্তিপুরের নিকট বাঘআঁচড়া গ্রামে। তাঁর প্রপিতামহ দেশের জমিদারের দ্বারা অপমানিত হওয়ায় উক্ত পৈতৃক ভিটেবাড়ি ত্যাগ করে সপরিবারে কলিকাতায় এসে বসবাস আরম্ভ করেন। অমরনাথের জন্ম ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে। বাংলা ১৩০০ সনে। অমরনাথের পিতা কানাইলাল কলিকাতার লব্ধপ্রতিষ্ঠিত অ্যাটর্নি নিমাই বসুর অফিসে কাজ করতেন। অমরনাথ শৈশবে ঠাকুমার কাছে মানুষ হন। শিক্ষা শুরু শ্যামবাজার বিদ্যাসাগর স্কুলে, পরে সেন্ট্রাল কলেজে।

চাকুরিজীবন শুরু প্রথমে ক্যালকাটা টার্ফ ক্লাবে। পরে সাউথ ইউনিয়ন জুট মিলে কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীকালে নাশরী চাকুরিতে প্রবেশ করেন। এখানে কাজ করার সময় গাছগাছালির প্রতি তাঁর আকর্ষণ জন্মায়। নিজের বাড়ির ছাদে বাগান শুরু করেন। এরপর মানিকতলায় কয়েক বিঘা জমি নিয়ে গাছের ব্যবসা পত্তন করেন। মানিকতলার এই বাগানে একসময় বিপ্লবীদের গোপন আস্তানা ছিল। এর কিছুকাল পরে অমরনাথ স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাত্র ১৮ বিঘা জমি নিয়ে

গৌরীপুরে এক নাশারীবাগান আরম্ভ করেন। নামাঙ্কিত করেন "গ্লোব নাশারী"। পরে এটি ৩০০ বিঘার নাশারীতে পরিণত হয়। গৌরীপুরে স্থানের অকুলান হওয়ায় ১৯৩৯ সালে বনগাঁতে কৃষিজমি নিয়ে এক বিরাট আকারের নাশারী স্থাপন করেন। ফুলের ব্যবসা ছাড়াও নানা প্রকার ফল ও উন্নত জাতের সবজি ফলনে তিনি কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। এর জন্য তিনি বহু পুরস্কার ও পদক লাভ করেছিলেন। তাঁর ফুল ও ফলের গাছের কদর বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি কলিকাতার বিভিন্ন প্রান্তে ও রেল স্টেশনে দোকানের ব্যবস্থা করেন। তাঁর বাগানের গাছগাছালি দেশে ও বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় রপ্তানি করা হয়।

অমরনাথ বহু বিপ্লবী, দেশসেবক ও রাজনীতিকদের সান্নিধ্যে এসেছিলেন। এঁদের অকাতর সাহায্য করতে কুণ্ঠিত হতেন না। বিপ্লবী শ্রীশচন্দ্র ঘোষের শেষ জীবনে মস্তিষ্ক বিকৃত হওয়ায় তাঁকে নিজের বাড়িতে এনে চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা করেন।

খেলাধূলা, সঙ্গীত, সামাজিক কল্যাণমূলক কাজে এবং নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অমরবাবু সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন।

তিনি রামধন মিত্র লেনের ৫ ও ৬ নম্বর বাড়িতে বাস করতেন। এই বাড়িতেই গ্লোব নাশারীর অফিস আছে (বর্তমানে ২৫ নম্বর)।

'কায়স্থ পত্রিকার' উদ্ভব এই শ্যামপুকুরে। এই পত্রিকাটির বিষয়ে কিছু বলার আগে 'কায়স্থ কৌস্তভ' সম্বন্ধে দু-চার কথা বলা দরকার। কায়স্থ সমাজের সর্বপ্রথম মুখপত্রটি 'কায়স্থ কৌস্তভ'। এটির প্রথম প্রকাশ ১৭ই জুলাই ১৮৪৪, বাংলা ৩রা শ্রাবণ ১২৫০ সন। ওই পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় (১২ই মার্চ ১৮৪৫) কায়স্থরা ক্ষত্রিয় কি না সেই প্রসঙ্গটি সর্বপ্রথম আলোচিত হয়েছিল। আর কায়স্থ পত্রিকার প্রথম প্রকাশ ১৩০৯ বঙ্গাব্দে। সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বসু। ৫নং রামধন মিত্র লেন, শ্যামপুকুর থেকে প্রকাশিত হত।

কায়স্থ পত্রিকা স্বতন্ত্র কোনও সাহিত্য পত্রিকা নয়। এটি কায়স্থদের প্রতিনিধিত্বমূলক পত্রিকা। প্রচ্ছদপটে লেখা থাকত— "এটি (এক) ভারতের প্রাচীনতম সামাজিক পত্র। দুই— বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার মুখপত্র"। অর্থাৎ হিন্দু জাতির এক বিশেষ বর্ণের সামাজিক পত্রিকা। কায়স্থ সভা এই পত্রিকাটি চালাত, এই পত্রিকাই ছিল কায়স্থ সভার মুখপত্র।

এক বিশেষ পরিস্থিতিতে 'কায়স্থ পত্রিকা'টির উদ্ভব হয়। সে ইতিহাস কম আকর্ষণীয় নয়। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে লোকগণনায় ইংরেজ সরকার হিন্দু জাতিগুলির উচ্চ নীচ সামাজিক স্থান নির্ণয়ের দায়িত্ব দিয়েছিলেন রিসলী সাহেবের হাতে। তিনি যে তালিকা প্রস্তুত করেন সেখানে কায়স্থদের স্থান দেওয়া হয়েছিল ষষ্ঠে। প্রথম থেকে পঞ্চম স্থানের ক্রম এইরূপ ব্রাহ্মণ, রাজপুত, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, বৈদ্য। প্রকৃতপক্ষে, এই তালিকাই কায়স্থ সমাজের (বিশেষত কলিকাতার কায়স্থ সমাজের) আত্মমর্যাদায় আঘাত করে। কলিকাতার কায়স্থগণ একত্রিত হয়ে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা স্থাপন করেন (২৫শে ডিসেম্বর ১৯০১)। এই সভার মুখপত্র কায়স্থ পত্রিকা।

কায়স্থ সভা ও কায়স্থ পত্রিকার উদ্ভব সেকালের কলিকাতার বুকে এক আলোড়ন তুলেছিল। সরকারও তাঁদের নীতি পরিবর্তনে বাধ্য হয়েছিলেন। তাই পরবর্তী জনগণনার সময় সামাজিক উচ্চ নীচ ভেদ না করে বর্ণানুক্রমিক তালিকা প্রকাশ করা হয়। কিন্তু কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত কায়স্থ জাতির জাতপাতের মর্যাদার প্রশ্নটি অমীমাংসিতই থেকে যায়। পরবর্তীকালে পত্রিকাটি একটি বিশেষ বর্ণের মুখপত্র হলেও সেখানে সাহিত্য, শিক্ষা, ধর্ম ও সামাজিক ইতিহাস সংক্রান্ত অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল।[৬৯]

'শ্যামপুকুর লেন' ছোট্ট একটি রাস্তা হলেও কলিকাতার ইতিহাসে এর তাৎপর্য কম নয়। ১৯০৯ সালে কারামুক্তির পর শ্রীঅরবিন্দ 'ধর্ম' নামে একটি সাপ্তাহিক বাংলা সাময়িক পত্রিকা এবং ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা 'কর্মযোগিন' সম্পাদনা ও প্রকাশনায় ব্যস্ত থাকতেন ৪নং শ্যামপুকুর লেনের একটি বাড়িতে। শ্রীঅরবিন্দ দিনের অনেকটা সময় এখানে ব্যয় করতেন। ধর্ম পত্রিকার সম্পাদকীয় এবং অন্যান্য প্রধান নিবন্ধগুলি তিনি এখানেই রচনা করেন। ভারতীয় সনাতন ধর্ম, শাস্ত্র এবং জাতীয়তা

বিষয়ক শ্রীঅরবিন্দের মূল বাংলা রচনাগুলি অধিকাংশই 'ধর্ম' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল, পরবর্তীকালে এইগুলি গ্রন্থাকারে গ্রথিত হয়েছে। ১৯০৯ সালের আগস্ট থেকে ১৯১০ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ধর্ম পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯শে জুন ১৯০৯ সালে শ্রীঅরবিন্দের সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয় 'কর্মযোগিন' পত্রিকা। প্রথম সংখ্যায় তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের কথা দিয়ে এইভাবে আরম্ভ করেছিলেন— "Ramkrishna and Vivekananda gave more perfect synthesis than Sankaracharya"।

এই দুই পত্রিকা মারফত শ্রীঅরবিন্দ যখন বাঙালি সমাজকে তাঁর গভীর মনন ও চিন্তাশক্তিতে অনুপ্রাণিত করতে শুরু করেছিলেন, ঠিক সেই সময় তাঁর পুনরায় গ্রেপ্তার হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। ভগিনী নিবেদিতা তাঁকে আত্মগোপনের পরামর্শ দেন এবং তাঁর কর্মযোগিন পত্রিকার পরিচালনার ভার নিবেদিতা স্বয়ং গ্রহণ করেন। আত্মগোপনের পূর্বে তিনি সস্ত্রীক উদ্বোধনে এসে সারদামায়ের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করেন (ফেব্রুয়ারি ১৯১০)। এই সময় শ্রীমা তাঁর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদের সময় বলেন,— "আমার বীর ছেলে। এইটুকু মানুষ, একেই কোম্পানীর এত ভয়!" [৭০]

কারামুক্তির পর শ্রীঅরবিন্দের ব্যস্ত কর্মজীবনের অন্যতম প্রধান ঠিকানা ছিল এই ৪নং শ্যামপুকুর লেন। তাঁর কর্মজীবনের প্রধান সহযোগীরাও এই ঠিকানায় তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ এবং সাক্ষাতে বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করতেন।

এই গৃহ থেকেই ১৯১০ সালের মার্চ মাসে শ্রীঅরবিন্দ অন্তরের নির্দেশে সম্পূর্ণ পূর্ব-পরিকল্পনাবিহীনভাবে একাকী প্রথমে নৌকাযোগে চন্দননগর পাড়ি দেন। পরে জাহাজে পণ্ডিচেরি গিয়ে যোগসাধনায় নিবিষ্ট হন।

শ্যামপুকুরের পল্লীবাসীগণ ৪নং শ্যামপুকুর লেনের বাড়ির সম্মুখে শ্রীঅরবিন্দের ধর্ম ও কর্মযোগিন পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশনার স্মরণার্থে একটি শ্বেতপ্রস্তর ফলক সম্প্রতি স্থাপন করেছেন।

অভয় ঘোষ লেন শ্যামপুকুর এলাকার ছোট্ট একটি রাস্তা। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা পুরসভার জন্য নতুন একটি পৌর আইন (The Municipal Consolidation Act II B.C. of 1888) বিধিবদ্ধ হয়। এই সঙ্গে কলিকাতার একটি মানচিত্র প্রকাশিত হয়। ওই মানচিত্রে শ্যামপুকুর এলাকায় দুটি নতুন রাস্তার খোঁজ পাওয়া যায়— (১) অভয় ঘোষ লেন, (২) নবকুমার রাহা লেন। সম্ভবত উনবিংশ শতাব্দীর আটের দশকের প্রথম দিকে রাস্তা দুটি নির্মিত হয়ে থাকবে।

বিংশ শতাব্দীর তিনের দশক পর্যন্ত অভয় ঘোষ লেনের পশ্চিমদিকে ছিল সারি সারি বস্তি বাড়ি। ১৯৪২ সালের প্রচণ্ড ঝড়ে এই বিরাট বস্তি বিধ্বস্ত হয়ে যায়। পরবর্তীকালে এই বস্তি উচ্ছেদ করে আজকের লাহা কলোনির সার সার নতুন বাড়ি তৈরি হয়েছে। বস্তিটি ছিল রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিটের অন্তর্গত।

২নং অভয় ঘোষ লেন-এর বাড়ির মালিক ছিলেন সাহিত্যিক ও প্রবন্ধকার চন্দ্রনাথ বসু। আদি বাড়ি ছিল বারাসাতের আনারপুরে। নৈকষ্য কুলীন ছিলেন তিনি। শোভাবাজারের দেব পরিবারের রাজা প্রসন্ননারায়ণ দেব বাহাদুরের কনিষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করেন। চন্দ্রনাথ বসুর এক কন্যা শরৎকুমারী। মহাভারত অনুবাদক কালীপ্রসন্ন সিংহের (১৮৪০-১৮৭০) প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পর তিনি শরৎকুমারীকে বিবাহ করেন। এঁদের দত্তকপুত্র সেকালের বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক বিজয়চন্দ্র সিংহ। তিনি সাধারণের কাছে মাখন সিংহ নামে পরিচিত ছিলেন। পিতার মতো তিনিও মহাভারতের রাজ-সংস্করণ ছাপিয়ে বিনামূল্যে বিতরণ করেছিলেন।

চন্দ্রনাথ বসু রচনা করেছিলেন 'ভারত রত্নমালা', অনুবাদ করেছিলেন যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ ও শ্রীমদ্ভাগবৎ, আর সম্পাদনা করেছিলেন কথাসরিৎসাগর, অদ্ভুত রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থ। এই বসু বাড়ি পরে হস্তান্তরিত হয়ে যায়। চন্দ্রনাথ বসুর উত্তরপুরুষগণ কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে বসবাস করেন।

নবকুমার রাহা লেনের উৎপত্তির কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। সেকালের খ্যাতনামা অভিনেতা ছিলেন নবকুমার রাহা। রাস্তাটি তাঁর নামে নামাঙ্কিত হয়েছে। তিনি বিডন স্ট্রিটের বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনয় করতেন। বর্তমানে ওই থিয়েটারের কোনও অস্তিত্ব নেই। বিডন স্ট্রিট পোস্ট

অফিস বেঙ্গল থিয়েটারের জায়গায় অবস্থিত।

নবকুমার রাহা লেন একটি নাতিদীর্ঘ পথ। উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত হয়ে শ্যামপুকুর স্ট্রিট ও রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিটকে সংযুক্ত করেছে। রাস্তাটির পূর্ব দিকে ছিল ত্যাওড়ার মাঠ। শোনা যায় এই মাঠে এককালে মোহনবাগান ক্লাবের সদস্যরা ফুটবল খেলত। খেলা ছাড়া মাঝে মাঝে যাত্রাগানের আসর বসত। সময় সময় এখানে সভা সমিতি হতে দেখা গেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই মাঠে সারি সারি বিশাল আকারের গুদামঘর নির্মাণ করা হয়েছিল। যুদ্ধের সময় অসামরিক সরবরাহ ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য এই সব গুদামে চাল গম আটা প্রভৃতি গুদামজাত করার ব্যবস্থা হয়েছিল। যুদ্ধ সমাপ্তির অনেক পরে গুদামগুলি ভেঙে ফেলা হয়।

আনন্দ লেন রাস্তাটির পূর্বনাম ছিল মল্লিক লেন। মল্লিকদের বস্তি ভেঙ্গে রাস্তাটি ১৮৮২ খ্রিঃ নির্মিত হয়েছিল বলে পথটির নামকরণ করা হয় মল্লিক লেন।[৭১] কলিকাতা পুরসভা তাঁদের ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯১৫ সালের অধিবেশনে মল্লিক লেনের নাম পরিবর্তন করে আনন্দমোহন মল্লিকের নামে 'আনন্দ লেন' নামাঙ্কিত করেন।[৭২]

রানী হেমন্তকুমারী স্ট্রিট নামে রাস্তাটির উদ্ভব এবং তার নামকরণের ইতিহাস পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। রানী হেমন্তকুমারী 'মহারানী' উপাধি পাবার পর ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে রাস্তাটির নাম পরিবর্তন করে 'মহারানী হেমন্তকুমারী স্ট্রিট' নামাঙ্কিত করা হয়। তিনি এই রাস্তার ১নং বাড়িতে বাস করতেন। রাজশাহীর অন্তর্গত পুঁটিয়ার মহারানী হেমন্তকুমারীর দানধ্যানের খ্যাতি ছিল।

সাধিকা গৌরীমাতা এই রাস্তার ওপর শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করায় রাস্তাটির গুরুত্ব অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়। আশ্রমটি ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে ব্যারাকপুরে গঙ্গার তীরে কপালেশ্বর গ্রামে স্থাপিত হয়। ১৩১৮ বঙ্গাব্দের প্রথম ভাগে এই আশ্রমের একটি শাখাকেন্দ্র ১০নং গোয়াবাগান লেনের একটি ভাড়া বাড়িতে খোলা হয়। এর পর পরিশ্রুত জল সরবরাহের জন্য সরকার ব্যারাকপুরের আশ্রম জমি দখল করেন। এখানে একসময় সারদামাতার শুভ পদার্পণ ঘটেছিল। ১৩১৮ থেকে ১৩৩১ সন পর্যন্ত ১৪ বছরকাল নানা ভাড়া বাড়িতে আশ্রমের কাজ চলার পর অবশেষে ২৬নং মহারানী হেমন্তকুমারী স্ট্রিটের ত্রিতল ভবনে আশ্রম স্থায়িত্ব লাভ করে। সাধারণ ভক্ত ও দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে গৃহীত অর্থে মোট ৪ কাঠা ৫ ছটাক জমি ক্রয় করে তার উপর বর্তমান আশ্রমভবন নির্মাণ করা হয়। ১৩৩০ বঙ্গাব্দে জগদ্ধাত্রী পূজার দিন গৌরীমা আনুষ্ঠানিকভাবে এই ভবনের ভিত্তি স্থাপন করেন। ২৭শে অগ্রহায়ণ ১৩৩১ বঙ্গাব্দে গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়। এই আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, সারদামাতা ও গৌরীমাতার পূতাস্থি সংরক্ষিত আছে। হিন্দুধর্ম ও সমাজের আদর্শে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের জন্য শিক্ষাব্রতধারিণীদের এক সঙ্ঘ গঠন, দুঃস্থ বালিকা ও বিধবাদের আশ্রয়দান এবং আদর্শ জীবন যাপনে নারীদের সাহায্য করা এই আশ্রমের মূল উদ্দেশ্য। সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা এবং খেলাধূলার ব্যবস্থাও আছে। ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত কয়েকজন শিক্ষার্থিনীদের নিয়ে ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে গৌরীমা 'মাতৃসঙ্ঘ' গঠন করেন। এঁরাই আশ্রমের প্রতিনিধি ও পরিচালক। শিক্ষিতা হিন্দু মহিলাদের নিয়ে তিনি প্রথমে একটি মহিলা সমিতিও গঠন করেন। অবৈতনিক হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়, মাতৃসঙ্ঘ এবং আশ্রম নিয়ে শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম। বিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে গৃহকর্ম, শিল্প বিদ্যা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযোগী শিক্ষাদানেরও ব্যবস্থা আছে। আশ্রমের অন্তেবাসিনীদের তিন বছরব্যাপী আশ্রমবাস বাধ্যতামূলক। এই আশ্রমের অপর দুই শাখা— (১) গিরিডিতে শ্রীমাতৃনিকেতন (১৩৫৪) এবং (২) নবদ্বীপে শ্রীগৌরীনিকেতন (১৩৫৭)।[৭৩]

এই শতাব্দীর ছয়ের দশকে গৌরীমাতার নামে একটি রাস্তা নামকরণের বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হয়। ওই অঞ্চলে কোনও অনামী রাস্তা না থাকায় মহারানী হেমন্তকুমারী স্ট্রিটের খানিকটা অংশ নিয়ে গৌরীমায়ের নামে নামকরণের এক প্রস্তাব আসে। কলিকাতা পুরসভা তাঁদের ১৪ই মার্চ ১৯৬৯ সালের অধিবেশনে চৌধুরী লেন থেকে মন্মথ ভট্টাচার্য স্ট্রিট পর্যন্ত মহারানী হেমন্তকুমারী স্ট্রিটের পশ্চিমদিকের অংশ 'গৌরীমাতা সরণি' নামাঙ্কিত করেন। পূর্বদিকের অংশ অর্থাৎ মন্মথ ভট্টাচার্য স্ট্রিট থেকে কৃষ্ণরাম বসু স্ট্রিট পর্যন্ত পূর্বের নাম মহারানী হেমন্তকুমারী স্ট্রিট বহাল থাকে।

কলিকাতা পুরসভা ১৯৬৮ সালে গিরিশ অ্যাভিনিউ-এর পশ্চিমদিকে কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থার দ্বারা নির্মিত একটি উদ্যানকে গৌরীমাতার নামে 'গৌরীমাতা উদ্যান' নামাঙ্কিত করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্যা, চিরকুমারী সন্ন্যাসিনী, পরিব্রাজিকা আচার্যা গৌরীপুরী দেবী (১২৬৪-১৩৪৪ বঙ্গাব্দ) ভবানীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা পার্বতীচরণ চট্টোপাধ্যায়। মাতা গিরিবালা দেবী ; একাধারে বিদুষী, শক্তিসাধিকা এবং বহু ধর্মসঙ্গীত রচয়িত্রী। গৌরীমা'র বাল্য নাম ছিল মুড়ানী। ১৮ বছর বয়সে সংসার ত্যাগ করে হিমালয়ের দুর্গম তীর্থে ও ভারতের বিভিন্ন তীর্থে কঠোর তপস্যার পর ২৫ বছর বয়সে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে ফিরে আসেন। গুরুর নির্দেশে স্ত্রীজাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৩০১ বঙ্গাব্দে গুরুপত্নীর নামে শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম ও বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর বাগ্মিতা ও শাস্ত্রজ্ঞান ছিল অসাধারণ।

কম্বুলিয়াটোলা অতি প্রাচীন না হলেও অবচীনের পর্যায়ে পড়ে না। কলিকাতার প্রাচীন মানচিত্রে যথা মার্ক উড (১৭৮৪-৮৫), আপজন মানচিত্রে (১৭৯২-৯৩) অথবা লটারি কমিটির প্রয়োজনে প্রস্তুত মানচিত্রে (১৮২৫-৩২) কম্বুলিয়াটোলার কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু সীম সাহেবের মানচিত্রে (The City and environs of Calcutta, 1852-56) কম্বুলিয়াটোলা অঞ্চলটি স্পষ্টরূপে চিহ্নিত আছে— পশ্চিমে চিৎপুর রোড, উত্তরে রাজা রাজবল্লভ স্ট্রিট, দক্ষিণ-পূর্ব দিকে শ্যামবাজার স্ট্রিট এই পরিধির মধ্যে সেকালের কম্বুলিয়াটোলা অবস্থিত ছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা যখন যতীন্দ্রমোহন অ্যাভিনিউ এবং এর কিছু পরে ভূপেন্দ্র বসু অ্যাভিনিউ নির্মাণে তৎপর হন, সেই সময় কম্বুলিয়াটোলা অঞ্চলটির সার্বিক রূপান্তর ঘটে। বর্তমানে কম্বুলিয়াটোলা ছোট্ট একটি রাস্তার নামে নামাঙ্কিত হয়ে তার পুরানো ঐতিহ্যকে বজায় রেখেছে। রাস্তাটি ওল্ড মেয়রস্ কোর্ট থেকে শুরু হয়ে উত্তর দিকে এগিয়ে শ্যামপুকুর স্ট্রিটে এসে পড়েছে।

দৃষ্টি দেওয়া যাক কম্বুলিয়াটোলার নামকরণের দিকে। কলিকাতার যে সব অঞ্চলে নিম্নস্তরের জীবিকা অবলম্বনকারীরা সারি সারি কুঁড়েঘর বা অস্থায়ী আস্তানা নির্মাণ করে বসবাস করতেন সেই অঞ্চলের নাম হত 'টোলা' দিয়ে। শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেন কম্বুলিয়াটোলার নামকরণ প্রসঙ্গে লিখেছেন— "সেখানে ভেড়িওয়ালারা ভেড়ার লোমে মোটা ও রুক্ষ কম্বল ও কম্বলের আসন তৈরি করত। সে বস্তু বাঙালী গৃহস্থ ব্যবহার করতো খুব। এই কম্বল বানানেওলা ও বেচনেওলাকে বলত 'কম্বুলে' (সাধু বাংলা 'কম্বলিয়া' থেকে)। যে অঞ্চলে কম্বুলেদের বস্তি ছিল সে অঞ্চল কম্বুলেটোলা নাম পেয়েছিল।"[৭৪] কলিকাতার এই অঞ্চলে এক সময় কম্বল প্রস্তুতকারক এবং কম্বল বিক্রেতাদের ঘন বসতি গড়ে উঠেছিল। এইসব জীবিকা অবলম্বনকারীরা এই অঞ্চল থেকে ধীরে ধীরে অপসারিত হয়ে কলিকাতার নগরায়ণকে ত্বরান্বিত করেছিল।

কম্বুলিয়াটোলা দরিদ্রভাণ্ডার প্রতিষ্ঠায় কম্বুলিয়াটোলা লেনের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। কম্বুলিয়াটোলার দরিদ্র অধিবাসীদের দুঃখমোচনের উদ্দেশ্যে ১৩২৯ বঙ্গাব্দে স্থাপিত হয়েছিল 'কম্বুলিয়াটোলা দরিদ্র ভাণ্ডার'। সে কাহিনীও কম আকর্ষণীয় নয়। ১৩২৯ সনের কথা। এই পল্লীর এক ভদ্র গৃহস্থ পরিবার এক সময় চরম আর্থিক দুর্দশার জন্য পরিবারের লোকেদের দুবেলা দু' মুঠো অন্ন যোগাতে ব্যর্থ হয়। অথচ মর্যাদার খাতিরে লোকের কাছে হাত পাততে কুণ্ঠিত ছিলেন। বেছে নিয়েছিলেন অনাহার ও উপবাস। পল্লীর তিন তরুণ যুবক— যুগলকিশোর সিংহ, বটকৃষ্ণ নন্দন এবং সৈয়দ নেসার আলি খোন্দকার— এই ঘটনা শোনার পর খুবই বিচলিত হয়ে পড়েন। তাঁরা স্থির করলেন কম্বুলিয়াটোলার পল্লীবাসীদের কাছ থেকে মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ করে ওই পরিবারকে অনাহারের হাত থেকে বাঁচানোর ব্যবস্থা তাঁরা করবেন। কম্বুলিয়াটোলায় ছিল সৈয়দ নেসার আলির পালিশের দোকান। সেই দোকান থেকেই কাজ শুরু করলেন। এইভাবে ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হল। আর এই তিন যুবক হলেন কম্বুলিয়াটোলা দরিদ্র ভাণ্ডারের প্রতিষ্ঠাতা।

এই ভাণ্ডারের প্রথম সভাপতি জীবনধন মুখোপাধ্যায়। থাকতেন ৫নং বলরাম ঘোষ স্ট্রিটে। প্রথম সম্পাদক হলেন বটকৃষ্ণ নন্দন। তিনি থাকতেন ৩২নং শ্যামবাজার স্ট্রিটে। পরে নিজে বাড়ি করেন ২নং কম্বুলিয়াটোলা লেনে।

মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ করে পল্লীর দুঃস্থ পরিবারবর্গকে বিতরণ করা ছাড়াও শারদীয়া পূজায় বিশিষ্ট

ব্যক্তিগণের সহৃদয় সহায়তায় দরিদ্র পল্লীবাসীর পুত্র-কন্যাদের মধ্যে জামাকাপড় প্রভৃতি বিতরণের ব্যবস্থা করা হত এই ভাণ্ডার থেকে।

১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮ সনের সভায় ভাণ্ডারের নিয়মাবলী তৈরি করা হয়। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল এতদিন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটির কোনও নামকরণ করা হয়নি।

**ভাণ্ডারের নিয়মাবলী :**

১। এই প্রতিষ্ঠানকে 'কম্বুলিয়াটোলা দরিদ্র ভাণ্ডার' নামে অভিহিত করা হবে।

২। এর সীমানা—

পূর্ব— কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের পশ্চিম সীমানা ;
পশ্চিম— আপার চিৎপুর রোডের পূর্ব সীমানা ;
উত্তর— বাগবাজার স্ট্রিটের দক্ষিণ সীমানা ;
দক্ষিণ— গ্রে স্ট্রিটের উত্তর সীমানা।

৩। উদ্দেশ্য—পল্লীস্থ নরনারী যাদের গ্রাসাচ্ছাদনের কোনও অবলম্বন নেই তাদেরকে জাতিধর্ম নির্বিশেষে যথাসাধ্য সাহায্য করা হবে।

সরকারি রেশন ব্যবস্থা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কারণে ১৯৪৫ থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড প্রায় বন্ধ ছিল। প্রতিষ্ঠাতা সৈয়দ নেসার আলির আগ্রহ ও প্রচেষ্টায় ভাণ্ডারের কর্মযজ্ঞ পুনরায় শুরু হয়। এর পর থেকে রবীন্দ্রনাথ লাহিড়ী, কিশোরীমোহন ভট্টাচার্য, মণীন্দ্রনাথ মল্লিক, সুনীলানন্দ বসাক, নিখিলানন্দ বসাক প্রমুখের সুযোগ্য পরিচালনায় ভাণ্ডার তার অগ্রগতি অব্যাহত রেখেছিল।

১৯৫৭ সালের ১৪ই আগস্ট প্রতিষ্ঠানটি রেজিস্ট্রি করা হয়। সে সময় সভাপতি ছিলেন সর্বজনশ্রদ্ধেয় হেমন্তকুমার বসু। রেজিস্টার্ড অফিস ৮৫এ, শ্যামবাজার স্ট্রিট।

১৯৬৭ সালে ৭নং কম্বুলিয়াটোলা লেনের মালিক শ্রীঅশোককুমার ঘোষ তাঁর বাড়ির একটি ঘর ভাণ্ডারকে ব্যবহারের জন্য দেন। এই ঘরে প্রথম সাধারণ চিকিৎসা বিভাগ চালু হয়। চিকিৎসা বিভাগ খোলার উদ্যোগী ছিলেন ডাঃ ভোলানাথ মিত্র। তিনি আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অবৈতনিক শিক্ষক ছিলেন, পরে ওই কলেজের অধ্যক্ষ হন। তিনি ৮৭বি, শ্যামবাজার স্ট্রিটে বাস করতেন।

১৯৭২-৭৩ সালে ৭২নং শ্যামপুকুর স্ট্রিটের একটি ঘর ভাড়া নিয়ে কতকগুলি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা বিভাগ চালু করা হয়, যথা নাক, কান, গলার বিশেষ চিকিৎসা বিভাগ, দন্ত বিভাগ, চর্ম বিভাগ, চক্ষু বিভাগ, শল্য চিকিৎসা বিভাগ, শিশু চিকিৎসা বিভাগ, স্ত্রীরোগ চিকিৎসা বিভাগ প্রভৃতি। সামান্য দক্ষিণার বিনিময়ে কলিকাতার বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা এখানে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।

বেশ কয়েক বছর ধরে ভাণ্ডারের কর্তৃপক্ষ নিজস্ব ভবন নির্মাণে তৎপর হন। একটি ভবন নির্মাণ তহবিলও গঠন করেন। অবশেষে তাঁদের স্বপ্ন সার্থক হয়। ১৯৮৭ সালে ৭১বি, শ্যামপুকুর স্ট্রিটের দ্বিতল ভবন ভাড়াটিয়া সমেত ৯০,০০০ টাকায় ক্রয় করা হয়। এখনও এ বাড়ির অধিকার ভাণ্ডারের হস্তগত হয়নি।

বর্তমানে বিশিষ্ট আইনজীবী অজিত বসু ও ডাঃ গণেশ বেদজ্ঞের সুষ্ঠু পরিচালনায় ভাণ্ডার তাঁদের জনসেবামূলক কাজ যথারীতি নির্বাহ করে চলেছেন।[৭৫]

কলিকাতার প্রাচীন রাস্তাগুলির অন্যতম শ্যামবাজার স্ট্রিট। সে সময় রাস্তাটি দমদম থেকে আসা সড়ক পথটির (Road from Dum Dum, পরে বেলগেছিয়া রোড, এখন ক্ষুদিরাম বসু সরণি) সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। আপজন সাহেবের (A. Upjohn) প্রথম কলিকাতা মানচিত্রে এই পথটি দেখানো আছে। সে সময়ের শ্যামবাজার স্ট্রিট আজকের শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার মোড় পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। ওই অঞ্চলে যে বাজার স্থাপিত হয়েছিল সেটিও শ্যামবাজার নামে নামাঙ্কিত হয়েছিল। কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা ভূপেন্দ্র বসু অ্যাভিনিউ তৈরি করার সময় শ্যামবাজার স্ট্রিটের উত্তর অংশ অধিগ্রহণ করেন। পরে ওই অংশটুক ভূপেন্দ্র বসু অ্যাভিনিউ-এর অঙ্গীভূত হয়ে যায়। বর্তমানে

শ্যামবাজার স্ট্রিট চৌধুরী লেন ও ভূপেন্দ্র বসু অ্যাভিনিউ-এর সংযোগস্থল থেকে শুরু হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে প্রসারিত হবার সময় যতীন্দ্রমোহন অ্যাভিনিউকে অতিক্রম করে, পরে আরও এগিয়ে দক্ষিণে মোড় ঘুরে রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিটে এসে পড়েছে।

শ্যামবাজার নামকরণ নিয়ে নানা মতভেদ আছে, সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পূর্বেই করা হয়েছে।

এইসব বিতর্কিত তথ্য থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট যে 'শ্যাম' নাম থেকেই শ্যামবাজার ও শ্যামপুকুরের উদ্ভব হয়েছে— সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই।

বাংলার সমাজ-সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত বহু কীর্তিমান পুরুষের বাসভবন ছিল এই শ্যামবাজার স্ট্রিটে। এঁদের নিয়েই দু-চার কথা বলব।

বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নট ও নাট্যকার, কৌতুকরসের স্রষ্টা রসরাজ অমৃতলাল বসু ১২৬০ বঙ্গাব্দে ৬ই বৈশাখ রামনবমীর দিন জন্মগ্রহণ করেন। এঁরা ধলচিতার বসু পরিবার বলে পরিচিত। অমৃতলালের প্রপিতামহ গঙ্গাচরণ বসু ধলচিতা গ্রাম থেকে এসে কলিকাতায় প্রথম পদার্পণ করেন। শোভাবাজারের রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের বাড়ির সম্মুখে অমৃতলালদের আদি বসতবাড়ি ছিল। তখনও গ্রে স্ট্রিট হয়নি। পরবর্তীকালে এই বসু পরিবার ১৪৯নং শ্যামবাজার স্ট্রিটে উঠে আসেন।

অমৃতলাল বসুর পিতামহের নাম কালীকৃষ্ণ বসু। তিনি অমৃতলালকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। অমিতব্যয়ে তিনি একরকম সর্বস্বান্ত হন। নিজের জন্মদিন উপলক্ষে ১৩১০ বঙ্গাব্দে ৮ই বৈশাখ অমৃতলাল যে কবিতা রচনা করেন, তা থেকে জানা যায় যে অমৃতলালের জন্মের খবর শুনে আনন্দে পিতামহ ঢুলিকে নিজের গায়ের চাদর খুলে দান করেন। অমৃতলাল লিখেছেন—

> "পৌত্র পেয়ে পিতামহ অর্থশোক ভুলে
> দেছেন ঢুলিরে দান গাত্রবস্ত্র খুলে।"

অমৃতলাল তাঁর 'অমৃত মদিরা' কাব্যগ্রন্থখানি পিতামহকে উৎসর্গ করেন।

পিতা কৈলাসচন্দ্র ওরিয়েন্টাল সেমিনারির শিক্ষক ছিলেন। পরে ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হয়েছিলেন। কৈলাসচন্দ্র ইংরেজিতে সুপণ্ডিত ছিলেন। ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে অমৃতলালের শিক্ষালাভ হয়েছিল। ক্যাপ্টেন ডি. এল. রিচার্ডসন, জেফরিশ, ন্যাস প্রমুখ তাঁর ইংরেজি শিক্ষার গুরু ছিলেন। কৈলাসচন্দ্র চমৎকার শেক্সপীয়ার আবৃত্তি করতে পারতেন। পিতার ইংরেজি আবৃত্তি পুত্র অমৃতলালের অভিনয়ের প্রতি আগ্রহের সঞ্চার করেছিল।

অমৃতলালের জীবন নানা ঘটনায় গাঁথা একখানা মালার মতো। নিজের আত্মজীবনীতে বলেছেন, ওরিয়েন্টাল সেমিনারি থেকে ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করেছেন। কিন্তু ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭০ সালে প্রকাশিত ক্যালকাটা গেজেটে দেখা যায় তিনি জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন থেকে ১৮৬৯ সালে এন্ট্রান্স পাশ করেছেন। ছেলেবেলায় জিমন্যাস্টিকের প্রতি খুবই আগ্রহ ছিল। দুর্গাদাস কর, নবগোপাল মিত্র ও শ্যামাচরণ ঘোষের নেতৃত্বে যখন জিমন্যাস্টিক আখড়া স্থাপিত হল, তখন অমৃতলাল পাড়ার নটবর চৌধুরীর বাড়িতে আখড়া স্থাপন করেন। এই আখড়ার মাধ্যমে নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্র ঘোষের সংস্পর্শে আসেন। সতীর্থ বন্ধু অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফিকে অভিনয়ের গুরু বলে স্বীকার করেছেন, আর গিরিশচন্দ্রকে ধর্মগুরুরূপে। ৭ই ডিসেম্বর ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে জোড়াসাঁকোর মধুসূদন সান্ন্যালের বাড়ির প্রাঙ্গণে 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে অভিনেতা জীবন শুরু হয়। এরপর তিনি গিরিশচন্দ্রের ও অর্দ্ধেন্দুশেখর-এর নির্দেশনায় ন্যাশনাল, গ্রেট ন্যাশনাল, বেঙ্গল, স্টার, মিনার্ভা প্রভৃতি নাট্যশালায় বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। নাট্যকার ও নাট্যশালার অধ্যক্ষ হিসাবে তাঁর কৃতিত্ব অবিস্মরণীয়। প্রায় ৪০টি গ্রন্থ রচনা করেছেন, তার মধ্যে নাটকের সংখ্যা ৩৫টি। রস সাহিত্য রচনার জন্য অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শিশিরকুমারের কাছ থেকে প্রেরণা পেয়েছিলেন। শিশিরকুমারকে হিদারাম ব্যানার্জি লেন থেকে বাগবাজারের বাড়িতে নিয়ে আসার মূলে ছিলেন অমৃতলাল। হাস্যরসাত্মক রচনার জন্য তিনি দেশবাসীর কাছ থেকে 'রসরাজ' উপাধিতে ভূষিত হন। 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী'

অভিনয়কালে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার অশ্লীলতা দোষে অভিযুক্ত হয়। থিয়েটারের ডাইরেক্টর ও ওই নাটকের লেখক উপেন্দ্রনাথ দাস (সেকালের বিখ্যাত আইনজীবী শ্রীনাথ দাসের পুত্র), ম্যানেজার অমৃতলাল বসুর এক মাসের কারাদণ্ড হয় (৮ই মার্চ, ১৮৭৬)। অ্যাটর্নি গণেশচন্দ্র চন্দ্র তাঁদেরকে জামিনে মুক্ত করেন। পরে 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটক অশ্লীল প্রমাণিত না হওয়াতে উপেন ও অমৃতলাল অব্যাহতি লাভ করেন (২০-৩-১৮৭৬)। ইতিমধ্যে তাঁরা তিনদিন বিনা শ্রমে জেল খেটেছিলেন।

অভিনয় জগতের বাইরে অমৃতলাল বসুর একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। স্বদেশি যুগে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির সহকর্মীরূপে এবং বিশিষ্ট বাগ্মীরূপেও পরিচিত ছিলেন। এ ছাড়াও শ্যামবাজার অ্যাংলো ভার্নাকুলার স্কুলের সম্পাদক, সাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতি এবং এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্য ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'জগত্তারিণী পদক' দিয়ে সম্মানিত করেন।

পুরাতন প্রসঙ্গ, পুরাতন পঞ্জিকা, ভুবনমোহন নিয়োগী তাঁর আত্মস্মৃতিমূলক রচনা হলেও এ থেকে সেকালের কলিকাতার সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং কলিকাতার ক্রমবিকাশের একটি স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়।

কলিকাতা পুরসভা তাঁদের ৭ই মার্চ ১৯৪৫ সালের অধিবেশনে অমৃতলাল বসুর নামে 'অমৃতলাল বসু স্ট্রিট' নামে কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা নির্মিত একটি রাস্তার নামকরণ করেন। রাস্তাটি যতীন্দ্রমোহন অ্যাভিনিউ-এর পশ্চিমদিক থেকে শুরু হয়ে পরে মোড় ঘুরে দক্ষিণদিকে প্রসারিত হয়ে রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিটে এসে পড়েছে।

রসরাজের মৃত্যু হয় ২রা জুলাই, ১৯২৯।

শ্যামবাজার স্ট্রিটে কম্বুলিয়াটোলায় 'বঙ্গ বিদ্যালয়' নামে একটি বাংলা স্কুল স্থাপিত হয় ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে। বিদ্যালয়টি স্থাপনের জন্য পল্লীর অনেকেই উদ্যোগী হয়েছিলেন। তাঁরা হলেন ধনী রামচন্দ্র মৈত্রের পুত্র বিশ্বম্ভর মৈত্র, রসরাজ অমৃতলাল বসুর পিতা কৈলাসচন্দ্র বসু, শ্যামবাজারের কর পরিবার এবং আরও অনেকে। স্কুলের নাম রাখা হয় 'অ্যাংলো ভার্নাকুলার স্কুল' বর্তমানে যেটি শ্যামবাজার এ. ভি. স্কুল। ১৮৬৪ সালে এই বিদ্যালয় থেকে ছাত্ররা প্রথম এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেয়।

উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক, কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর (১৮৫২-১৯১৮) ১০৭নং (এখন ৬০নং) শ্যামবাজার স্ট্রিটের বাড়িতে বাস করতেন। জন্ম হাওড়ার সাঁতরাগাছিতে। পিতা ডাক্তার দুর্গাদাস কর। তিনি ঢাকা শহরের সরকারি ডাক্তার ছিলেন। তাঁর ঢাকার বাড়িতে নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র প্রায়ই আসতেন। দীনবন্ধু সে সময় ছিলেন ঢাকা ডাকঘরের ইন্সপেক্টর। দুর্গাদাস 'ভৈষজ্যরত্নাবলী' গ্রন্থ রচনা করে বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। 'স্বর্ণশৃঙ্খল' নামে একটি নাটক ঢাকায় থাকাকালীন অবস্থায় রচনা করেন। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে দুর্গাদাস ঢাকা থেকে কলিকাতায় বদলি হন।

ডাক্তার দুর্গাদাসের দুই পুত্র— রাধাগোবিন্দ ও রাধামাধব। রাধাগোবিন্দ মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তখনকার চিকিৎসা শাস্ত্রের পাঠ শেষ করে ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইউরোপে যান। এডিনবরার চিকিৎসাশাস্ত্রে ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহে এবং উৎসাহে কলিকাতায় প্রথম বেসরকারি মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়। তিনি প্রতিষ্ঠানটি তৎকালীন ছোটলাট লর্ড কারমাইকেলের নামে নামকরণ করেন। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে কলেজটি তাঁর নামে 'আর. জি. কর মেডিকেল কলেজ' নামাঙ্কিত হয়। তিনি 'কর প্রেস' নামে একটি ছাপাখানাও স্থাপন করেছিলেন। অনেকগুলি গ্রন্থ রচনাও করেছিলেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য : অ্যানাটমি, কর-সংহিতা, স্ত্রীরোগ চিকিৎসা, গাইনিকোলজি প্রভৃতি। তিনি এই পল্লী তথা সারা কলিকাতার সমাজ-সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

রাধামাধব কর ছিলেন বিখ্যাত অভিনেতা, সঙ্গীতপ্রেমী, নাট্যকার ও ব্যায়ামক্রীড়ায় পারদর্শী। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে 'সধবার একাদশী' নাটকে কাঞ্চনের ভূমিকায় অভিনয় করে প্রশংসা অর্জন করেন। আদি ন্যাশনাল থিয়েটার বিভক্ত হলে তিনি গিরিশচন্দ্রের বিরোধী এমারেল্ড থিয়েটারে যোগ দেন। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'বসন্তকুমারী' নাটক রচনা করেন। ভারত সঙ্গীত সমাজ তাঁকে 'নাট্যাচার্য

উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি ভাল বাঁশী বাজাতে পারতেন এবং শখের কনসার্টের দল গঠন করেছিলেন। এক সময় শ্যামবাজারের বাড়িতে যোগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্যামাচরণ ঘোষ ও রাধামাধব তিন বন্ধু মিলে জিমন্যাস্টিক আরম্ভ করেন।

শ্যামবাজার স্ট্রিটের এই বাসভবন সেকালে বহু মনীষীদের পদধূলিতে ধন্য হয়েছিল। শোনা যায়, রাধাগোবিন্দ কর এই বাড়িটি কারমাইকেল কলেজকে দান করেছিলেন।

জ্যোতিষশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার অন্যতম রূপকার মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১২৩৭-১৩১২ বঙ্গাব্দ) হুগলি জেলার অন্তর্গত নন্দগ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। স্থানীয় একটি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠ শেষ করে সার্ভে শিক্ষা গ্রহণে প্রবৃত্ত হন। শিক্ষা শেষে সুদূর ওড়িশায় চাকুরি নিয়ে চলে যান। সেখানে জ্যোতিষচর্চার সঙ্গে সঙ্গে পঞ্জিকার গণনা পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। প্রচলিত পঞ্জিকার গণনার সঙ্গে আকাশে গ্রহগুলির অবস্থানের বৈষম্য প্রত্যক্ষ করে তা নিরসনে যত্নবান হন। নিজের মতবাদকে দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রথমে জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি পাঠ করেন এবং পরে গ্রহ নক্ষত্রাদির সঠিক অবস্থান পর্যবেক্ষণ করে নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্য কয়েকটি যন্ত্র ক্রয় করেন। একটি যন্ত্র আজও তাঁর উত্তরপুরুষদের কাছে সযত্নে রক্ষিত আছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, পুণা ও কাশীধামের পণ্ডিতগণ বাজারে প্রচলিত পঞ্জিকা মতে সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ দৃকসিদ্ধ না হওয়ায় প্রচলিত পঞ্জিকা সংস্কারে ব্রতী হন। তাঁরা ইউরোপীয় পঞ্জিকার সাহায্যে দেশে শুদ্ধ দৃকসিদ্ধ পঞ্জিকা প্রণয়ন করেন। সেই সময় বঙ্গদেশেও পঞ্জিকা সংশোধন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। তেলিনীপাড়ার জমিদার মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এ বিষয় অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এর অল্প দিন পরে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সংস্কৃত কলেজ ভবনে চলতি পঞ্জিকা সংস্কারের জন্য জ্যোতিষীদের এক মহতী সভা আহ্বান করেন। কিন্তু মহেশচন্দ্রের প্রচেষ্টা ফলবতী হয়নি। সেকালের পত্র-পত্রিকায় বিশেষত 'বঙ্গবাসী' সংবাদপত্রে পঞ্জিকা সংস্কারের সমর্থনে বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল।

অবসর গ্রহণের পর ১২৯৫ বঙ্গাব্দে মাধবচন্দ্র কলিকাতায় ফিরে মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের উৎসাহে এবং আশুতোষ মিত্রের সহায়তায় বিশুদ্ধ পঞ্জিকা প্রকাশে অগ্রসর হন। ১২৯৭ বঙ্গাব্দে বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা প্রকাশিত হয়। বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র এ বিষয়ে সর্বতোভাবে তাঁকে সাহায্য করেন। ওই পঞ্জিকা প্রচারের জন্য মাধবচন্দ্র চেষ্টার ত্রুটি করেননি। বাংলার খ্যাতনামা পণ্ডিত ও মনীষীদের বুঝিয়েছিলেন যে প্রচলিত পঞ্জিকাগুলি ভ্রান্ত। এই ভ্রান্ত পঞ্জিকা অনুসারে ধর্মকর্ম সম্পাদন ফলপ্রদ হয় না। মাধবচন্দ্র ও তাঁর অনুগামীদের বিশেষত বিচারপতি সারদাচরণ মিত্রের পুত্র শরৎকুমার মিত্রের একান্ত আগ্রহ ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা শীঘ্রই জনপ্রিয় হতে থাকে। কিন্তু বাঙালি মানসে ওই পঞ্জিকা আজও "হয় নাই সর্বত্রগামী"।

মাধবচন্দ্র ১২৯৫ বঙ্গাব্দে কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়ে কটক থেকে কলিকাতায় এসে ১০৬, শ্যামবাজার স্ট্রিটের জমি কিনে আবাস ভবন নির্মাণ করেন। ১৩১২ বঙ্গাব্দে এ বাড়িতেই দেহত্যাগ করেন। বর্তমানে এ ভবনের কোনও অস্তিত্ব নেই। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা ভূপেন্দ্র বসু অ্যাভিনিউ নির্মাণের সময় বাড়িটি অধিগ্রহণ করেন এবং পরে ভেঙে ওই রাস্তা নির্মিত হয়। মাধবচন্দ্রের উত্তরপুরুষের এক অংশ বর্তমানে বেলগাছিয়ার বীরেন্দ্রনগরে বসবাস করেন।[৭৬]

৮৫এ, শ্যামবাজার স্ট্রিটে যে বসাক পরিবার বাস করেন তাঁরা সুতানুটির আদি শেঠ-বসাক পরিবারের আলম্বায়ন গোত্রীয়ের অন্যতম শাখা। এ গোত্রের প্রধান হলেন ধনপতি বসাক। ইনি রাঢ় প্রদেশে বসবাস করতেন। ষষ্ঠ পুরুষ সনাতন বসাক। তাঁর পৌত্র রাধাগোবিন্দ বসাক। তিনি রতন সরকার গার্ডেন স্ট্রিটে গৃহ নির্মাণ করে বসবাস শুরু করেন। কালাকার স্ট্রিট নির্মাণের সময় তাঁর বাড়ি ভাঙা পড়ে। মাধবানন্দ বসাক প্রমুখ তাঁর পুত্রেরা কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে স্কটিশ চার্চ স্কুলের বিপরীতে একটি বাড়ি ভাড়া করে উঠে আসেন। পরে ১৯০৯ সালে মাধবানন্দ বসাকের স্ত্রী ১২৫/৪, শ্যামবাজার স্ট্রিটের জমি খড়দার গোঁসাইদের কাছ থেকে খরিদ করেন এবং ওই জমির ওপর

বাড়ি তৈরি করেন। মাধবানন্দ বসাকের স্ত্রী চাঁচরকেশী দাসী স্যার হরিরাম গোয়েঙ্কা স্ট্রিটের নলিনীনাথ শেঠের ভগিনী। যতীন্দ্রমোহন অ্যাভিনিউ নির্মিত হওয়ায় ওই বাড়ির নম্বর বদল হয়ে ৮৫এ, শ্যামবাজার স্ট্রিট হয়।

মাধবানন্দের ছয় ছেলের মধ্যে পুলিনানন্দ বসাক একজন সফল আইন ব্যবসায়ীরূপে প্রতিষ্ঠিতও বিত্তের অধিকারী হয়েছিলেন। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র বিশুদ্ধানন্দ বসাক স্কটিশ চার্চ কলেজের একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন। তিনি একজন দক্ষ ফুটবল খেলোয়াড়ও ছিলেন। শ্যাম স্কোয়ারের শ্যামবাজার স্পোর্টিং ক্লাবের সঙ্গে আমৃত্যু যুক্ত ছিলেন। টাইফয়েড রোগে অকালে মাত্র ২১ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে শ্যামবাজার ক্লাব বিশুদ্ধানন্দ চ্যালেঞ্জ শিল্ড প্রবর্তন করেছে।

পুলিনানন্দ বসাকের অন্যান্য পুত্রেরা পৈতৃক ব্যবসা-বাণিজ্য ও পল্লীর সমাজ-সংস্কৃতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত।

ফিরে আসি ভোলা ময়রা লেনের কথায়।

সেকালের কলিকাতার বিখ্যাত কবিয়াল ভোলা ময়রার নামে ভোলা ময়রা লেন। শ্যামপুকুর স্ট্রিটের ৪৮ থেকে ৫২ সংখ্যক বাড়ির সম্মুখের রাস্তাকে ভোলা ময়রা লেন করার এক প্রস্তাব আসে ১৯৩৬ সালে। শ্যামপুকুর স্ট্রিটের এই অংশটুকু ছিল বদ্ধ রাস্তা। এই প্রস্তাবটির বিরুদ্ধে অধিকাংশ শ্যামপুকুর স্ট্রিট নিবাসী ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং বলেন যে সেকালে খ্যাতিমান পুরুষ শ্যাম মল্লিকের সঙ্গে রাস্তাটির সম্বন্ধ আছে। সুতরাং আংশিক হলেও রাস্তাটির নাম পরিবর্তনের কোনও প্রস্তাবই গ্রহণ করা উচিত নয়। কিন্তু কলিকাতা পুরসভা তাঁদের ৫ই আগস্ট ১৯৩৬ সালের অধিবেশনে শ্যামপুকুর স্ট্রিটের ওই অংশটুকুর নাম পরিবর্তন করে 'ভোলা ময়রা লেন' নামাঙ্কিত করেন। একসময় ভোলা ময়রা শ্যামপুকুর স্ট্রিটের এই অঞ্চলে বাস করেছিলেন। তাঁর বাড়ি ছিল গ্রে স্ট্রিট ও রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিটের মোড়ে।

ভোলা ময়রার পুরো নাম ভোলানাথ মোদক (দে)। ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা রামগোপাল মোদক (অন্যমতে কৃপারাম)— তিনি সিমলায় থাকতেন। বাগবাজারে তাঁর মিষ্টান্নের দোকান ছিল। এই দোকানে সন্দেশ মিঠাই ছাড়াও পুরী, খই, মুড়কি, বাতাসা ইত্যাদি খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করে বিক্রি করতেন। দোকানটি বাগবাজারের বারুদখানার ঠিক দক্ষিণ দিকে অবস্থিত ছিল। উত্তরে মারহাট্টা ডিচ ও চিৎপুর ক্রীক, দক্ষিণে পাউডার মিল রোড (বর্তমানে বাগবাজার স্ট্রিট), পূর্বে হরলাল মিত্র স্ট্রিট এবং পশ্চিমে গঙ্গা ও চিৎপুর রোড— এই চতুঃসীমার অন্তর্গত স্থানকে লোকে পূর্বে বারুদখানা বলত।

ভোলানাথ সিমলার পরে বোসপাড়া লেনে নিজ গৃহ নির্মাণ করেন। তাঁর চার পুত্র ছিল— চিন্তামণি, চন্দ্রনাথ, রসিকলাল ও মাধবচন্দ্র। প্রথম তিনজন ছিলেন নিঃসন্তান। মাধবচন্দ্রের চারপুত্র ও পাঁচ কন্যা ছিল। এক কন্যার বাগবাজারের মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী নবীনচন্দ্র দাসের সহধর্মিনী ছিলেন।

মহারাজা নবকৃষ্ণের জীবনের শেষ ভাগে ভোলানাথের প্রসার ও প্রতিপত্তি শুরু হয়। সেকালের হরুঠাকুর সর্বশ্রেষ্ঠ কবিয়াল ছিলেন। ভোলানাথ হরু ঠাকুরের প্রিয় শিষ্য ছিলেন। তাঁর প্রতিপক্ষ ছিলেন রাম বসু, যজ্ঞেশ্বর দাস প্রমুখ কবিয়ালগণ। কবিয়াল এন্টনি ফিরিঙ্গিও ভোলানাথের সমসাময়িক ছিলেন। হরু ঠাকুর স্বয়ং ভোলানাথকে গান বেঁধে দিতেন।

ভোলানাথ ছিলেন একনিষ্ঠ বৈষ্ণব। কথায় কথায় তিনি কৃষ্ণনামও করতেন। সামান্য লেখাপড়া শিখলেও সংস্কৃত, ফারসী ও হিন্দি ভাষায় তাঁর জ্ঞান ছিল। পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্রেও তাঁর অধিকার ছিল। কবি'র দল গড়ার আগেও তিনি বহু রসোত্তীর্ণ কবিতা রচনা করেছিলেন। সমাজের অসঙ্গতির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে রচিত ভোলানাথের শ্লেষপূর্ণ কবিতার প্রতি মন্তব্য করতে গিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, "বাংলা দেশের সমাজকে সজীব রাখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে রামগোপাল ঘোষের ন্যায় বক্তা, হুতুম পেঁচার ন্যায় লেখক এবং ভোলা ময়রার ন্যায় কবিওয়ালার প্রাদুর্ভাব বড়ই আবশ্যক।" তিনি আরও উল্লেখ করেছিলেন, "ভোলার মত তেজস্বী, বুদ্ধিমান ও উপস্থিত কবি আমি দেখি নাই। ভোলার জুড়ি মেলা ভার।"

১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে ভোলানাথ পরলোকগমন করেন।[৭৭]

ভোলা ময়রা লেন ছোট্ট রাস্তা হলেও কলিকাতার নাট্যমঞ্চের ইতিহাসে এই পথটির গুরুত্ব কম নয়। ভোলা ময়রা লেনের দেব পরিবার কলিকাতার আদি বনেদি কায়স্থ পরিবারগুলির অন্যতম। কলিকাতার নাট্যশালার ইতিহাসে শ্যামপুকুরের এই দেব পরিবারের অবদানের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

দেব পরিবারের আদি বাসস্থান ছিল হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে। এঁদের পদবি ছিল দে সরকার। পলাশী যুদ্ধের পর ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কালোছায়া দেবানন্দপুর গ্রামকে গ্রাস করলে পর দে সরকার পরিবারের ষষ্ঠীচরণ, তাঁর পুত্র নন্দলাল ও পরিবারের সকলকে নিয়ে কলিকাতায় চলে আসেন এবং বড়বাজারে বসবাস শুরু করেন। নন্দলাল গন্ধক ও কর্পূরের ব্যবসা করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। শ্যামপুকুর, কাঁটাপুকুর, কাঁকুড়গাছি, বেহালা প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর জমিজমা কিনে এক বিশাল ভূসম্পত্তির মালিক হন। পুত্র নবীনচন্দ্র (১৮০৮-১৮৮৩) ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছিলেন। ফারসী ও উর্দুতে তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল। প্রথমে ইংরেজদের দোভাষী, পরে মুৎসুদ্দির কাজ করে বিত্তের সঙ্গে প্রতিপত্তি লাভ করেন। পরবর্তীকালে অ্যাটকিনসন টিলটন কোম্পানির বুক-কিপার হয়েছিলেন। নবীনচন্দ্র রাজা রাধাকান্ত দেবের স্নেহভাজন ও কায়স্থসভার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। রাধাকান্তদেবের উদ্যোগে এঁদের পদবি 'দেব' হয়। নবীনচন্দ্র শ্যামপুকুরে পিতার ক্রয় করা জমিতে সুদৃশ্য পাকাবাড়ি নির্মাণ করেন। সে সময় এ অঞ্চল হোগলাবনে পরিপূর্ণ ছিল। বর্তমানে ওই সুদৃশ্য ভবন অনেকগুলি অংশে বিভক্ত হয়েছে— ৩, ৪, ও ৫ নম্বর ভোলা ময়রা লেন ; ৭/১এ, ৭/২এ, ৭/৩এ ও ৮ নম্বর তেলিপাড়া লেন।

নবীনচন্দ্র শিক্ষা প্রসারে উৎসাহী ছিলেন। শ্যামপুকুরে একটি পাঠশালা স্থাপন করেন। নিজ ভবনে গোপালজিকে প্রতিষ্ঠা করেন। বাড়িতে দুর্গাদালান তৈরি করে দেব পরিবারে দুর্গাপূজার প্রবর্তন করেন। সঙ্গীতের প্রতি ছিল গভীর অনুরাগ। এস. লোগো নামে এক গুণী পর্তুগিজ শিল্পীর কাছে পৌত্র নরেন্দ্রকৃষ্ণের (যিনি নন্তিবাবু বলে পরিচিত ছিলেন) পিয়ানো, বেহালা ও ক্লারিওনেট শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেন।

নবীনচন্দ্রের দুই পুত্র— ব্রজনাথ ও দ্বারকানাথ, এক কন্যা প্রমোদিনী। এই প্রমোদিনীর সঙ্গে কবি, নাট্যকার, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মন্ত্রশিষ্য গিরিশচন্দ্র ঘোষের ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে বিবাহ হয়। সে সময় গিরিশচন্দ্রের বয়স মাত্র ১৫ বছর। গিরিশচন্দ্রের বিবাহের দিন কলিকাতায় ঘটেছিল এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। সেকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মঞ্চসফল অভিনেতা দানীবাবু এঁদেরই পুত্র।

শ্যালক ব্রজনাথ দেব (১৮৪০-১৮৮২) গিরিশচন্দ্রকে ছোট ভাই-এর মতো স্নেহ করতেন। নবীনচন্দ্রের পর ব্রজবাবুই অ্যাটকিনসন কোম্পানির বুক-কিপার হয়েছিলেন। গিরিশচন্দ্র ছিলেন তাঁর সহকারী বুক কিপার। গিরিশচন্দ্রের অভিনয়কলা স্ফুরণে ব্রজনাথ খুবই উৎসাহ দিতেন, নানাভাবে সাহায্যও করেছেন। বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটারের সভ্য ছিলেন গিরিশচন্দ্র। এঁদের তত্ত্বাবধানে ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে দুর্গাপূজার সময় বাগবাজারে প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাড়িতে দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী'র প্রথম অভিনয় হয়। প্রায় এক সপ্তাহ পরে কোজাগরি লক্ষ্মীপূজার দিন শ্যামপুকুরে নবীনচন্দ্র দেব (গিরিশচন্দ্রের শ্বশুরবাড়ি)-এর বাড়িতে দ্বিতীয় অভিনয় হয়। আজকের সেই ভবনটি ৪নং ভোলা ময়রা লেন।

শুধু অভিনয়ের ব্যাপারেই নয়, গিরিশচন্দ্র যাতে স্থায়ী রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করতে পারেন তার জন্য পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরবাড়ির মতো একটি স্থায়ী নাট্যশালা স্থাপনের সঙ্কল্প করেন ব্রজনাথ। শ্যামপুকুরে গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাতামহ গোপীনাথ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের বাড়ির উঠোনে নাট্যশালা নির্মাণের ব্যবস্থা করেন। গিরিশচন্দ্রের অনুরোধে ধর্মদাস সুর মঞ্চ নির্মাণে সাহায্য করেন। ব্রজবাবু সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হওয়ায় নাট্যমঞ্চের নির্মাণকার্য বন্ধ হয়ে যায়। পরে ব্রজনাথ অকালে ইহলোক ত্যাগ করেন। ব্রজনাথ দেবের আকস্মিক মৃত্যু না হলে হয়তো বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হত।

ব্রজনাথ দেব শুধু নাট্যামোদীই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ। সঙ্গীতের

প্রতি ছিল তাঁর গভীর অনুরাগ। বিখ্যাত গায়ক ও বাদক জোয়ালাপ্রসাদ, নিমাই অধিকারী (সঙ্গীতাচার্য বেণীবাবুর পিতা) প্রমুখ ওস্তাদের কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করেছিলেন। যখন যে গুণী গায়ক বা বাদক কলিকাতায় আসতেন ব্রজবাবু তাঁদেরকে নিজ ভবনে এনে আদর আপ্যায়ন করতেন এবং তাঁদের সঙ্গে সঙ্গীত নিয়ে আলাপ-আলোচনা করে আনন্দ পেতেন। গিরিশচন্দ্র এই সূত্রে ব্রজবাবুর কাছ থেকে রাগ-রাগিণী, তান, লয় সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করেন। উত্তরকালে এই শিক্ষা নাটক পরিচালনায় কাজে লাগিয়েছিলেন।

ব্রজবাবুই প্রথমে ইংরেজি নোটেশন ও ইংরেজি বাদ্যযন্ত্র থিয়েটারের গানে ব্যবহার করেন। সাহেব শিক্ষকের কাছে বেতন দিয়ে এই শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। স্বয়ং একটি কনসার্ট দল (ঐকতান বাদন) গঠন করেছিলেন। তিনি কনসার্টে প্রথম ক্ল্যারিওনেট বাদনের প্রবর্তন করেন। ন্যাশনাল নবগোপাল মিত্রের উদ্যোগে চৈত্র মেলায় ব্রজবাবুর বাজনার দল প্রথম ঐকতান সঙ্গীত পরিবেশন করেছিলেন।

ব্রজনাথ দেবের পুত্রদের মধ্যে নরেন্দ্রকৃষ্ণ (১৮৫৭-১৯২২) ওরফে নন্তিবাবু ও চুনীলালের (১৮৬৪-১৯২৯) নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। নরেন্দ্রকৃষ্ণ পিতার মতো সঙ্গীতপ্রেমী ছিলেন। বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পারতেন। পিতার কনসার্ট দল তাঁর হাতে আরও উন্নত ও আকর্ষণীয় হয়েছিল। আর চুণীলাল দেব শুধু একজন সার্থক নট ও নাট্যকার ছিলেন তাই নয়, তিনি একজন সফল নাট্যশালার পরিচালকও ছিলেন। মনোমোহন পাঁড়ের কাছ থেকে ৭৫০ টাকা মাসিক ভাড়ায় মিনার্ভা থিয়েটার সাব-লিজে গ্রহণ করেন। তিনি স্বয়ং অধ্যক্ষ ও পরিচালক হয়ে মিনার্ভা থিয়েটারের অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের থিয়েটারের লভ্যাংশ প্রদানের ব্যবস্থা করে থিয়েটার পরিচালনায় নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। মনোমোহন গোস্বামীর সামাজিক নাটক 'সংসার' মঞ্চস্থ করে আর্থিক সাফল্য আসে। থিয়েটার ব্যবস্থাকে উন্নত করে ভাল অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়োগ করে মঞ্চকে দর্শকদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করার জন্য থিয়েটারে এক অভিনব ব্যবস্থার প্রবর্তন করলেন।

চুনীলাল দেব বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় 'অতুল গ্রন্থাবলী' বিনামূল্যে মিনার্ভা থিয়েটারে দর্শকদের উপহার দেবার ব্যবস্থা করেন। নাট্যমঞ্চের দর্শকদের পুস্তক উপহার দেবার ব্যবস্থা এই প্রথম। এই ব্যবস্থা মিনার্ভা থিয়েটারে আর্থিক স্বচ্ছলতা এনে দেয়। আর্থিক উন্নতি হওয়ায় উদ্যমশীল চুনীলাল সেকালে বিখ্যাত নটনটীদের মিনার্ভা থিয়েটারে নিয়ে এসে দর্শক মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা করেন। তাঁরা হলেন অভিনেত্রী তিনকড়ি, তারাসুন্দরী, অভিনেতা অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি, অপরেশ মুখোপাধ্যায়। সবার শেষে গিরিশচন্দ্রকে নিয়ে আসেন। চুনীলাল দেবের পরিচালনায় মিনার্ভা থিয়েটার যখন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করূপে নাট্যজগতে পরিচিতি লাভ করে, ঠিক সেই সময় চুনীলালের সঙ্গে মনোমোহন পাঁড়ের মনোমালিন্য দেখা দেয়। অবশেষে নিজের হাতে গড়া মিনার্ভা থিয়েটার ছেড়ে চলে আসেন।

চুনীলালের পরের ভাই নিখিলেন্দ্রকৃষ্ণ (১৮৬৬-১৯৪০) ছিলেন সেকালের একজন মঞ্চসফল অভিনেতা। নন্তিবাবুর (নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব) বড় ছেলে বিখ্যাত বেহালাবাদক অমলকৃষ্ণ দেব। পিতার কাছে বেহালা শিক্ষা। তরুণ বয়সেই গভীর ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন ইংরেজি স্বরলিপিতে। তাঁর বেহালায় ইংরেজি সুর যেন মূর্ত হয়ে উঠত। সেকালের বিখ্যাত সঙ্গীতপ্রেমী হরেন শীল তাঁর চিৎপুর রোডের বাড়িতে নন্তিবাবুর অর্কেস্ট্রাদলকে সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য একদিন আমন্ত্রণ জানান। নন্তিবাবু পুত্র অমলকৃষ্ণকে বেহালা বাজাবার জন্য সঙ্গে নিয়ে যান। সেদিন অমলকৃষ্ণ তাঁর বেহালায় যে সুরের মূর্ছনা তুলেছিলেন তাতে সমস্ত শ্রোতৃবৃন্দ মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যান। তরুণ শিল্পীর বেহালায় সুনিপুণ দক্ষতা দেখে সঙ্গীতগুণী হরেন শীল চমৎকৃত হয়েছিলেন। সেদিন তিনি নন্তিবাবুর দলের সকল শিল্পীদের ধুতি ও জরির চাদর দিয়ে সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন। আর অমলবাবুকে একটি ইটালিয়ান ভায়োলিন উপহার দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সে প্রতিশ্রুতি তিনি রেখেছিলেন। সেই ভায়োলিন ও জরির চাদর আজও দেব পরিবারের কাছে সযত্নে রাখা আছে।

বর্তমানে ভোলা ময়রা লেনের বাড়িতে দেব পরিবারের উত্তরপুরুষগণ বসবাস করেন।[৭৮]

রাজেন্দ্র দেব রোড : বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামী রাজেন্দ্রচন্দ্র দেবের নামে রাস্তাটি নামাঙ্কিত হয়ে একদিকে যেমন কলিকাতার রাস্তাঘাটের ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছে, অন্যদিকে এই রাস্তার আরেক প্রান্তে শহর কলিকাতার আদি বাসিন্দাদের 'গন্ধবণিক মহাসভা' স্থাপিত হয়ে সেই ইতিহাসকে করেছে আরও ঐতিহ্যমণ্ডিত। পূর্বে এই রাস্তাটি মুক্তারামবাবু স্ট্রিটের একটি শাখাপথ ছিল। কাজেই রাজেন্দ্র দেব রোড সম্বন্ধে কিছু বলার আগে মুক্তারামবাবু স্ট্রিট সম্বন্ধে দু'চার কথা বলা দরকার।

কলিকাতার প্রাচীনতম রাস্তাগুলির অন্যতম মুক্তারামবাবু স্ট্রিট। মুক্তারামবাবুর নামে ওই অঞ্চলে ছয়টি রাস্তা ছিল—মুক্তারাম বাবু স্ট্রিট, মুক্তারামবাবু লেন, মুক্তারামবাবু সেকেন্ড লেন, মুক্তারামবাবু থার্ড লেন, মুক্তারামবাবু ফোর্থ লেন, মুক্তারাম রো। পরবর্তীকালের মুক্তারামবাবু ফোর্থ লেন, মুক্তারাম রো এবং মুক্তারামবাবু স্ট্রিটের কিছু অংশ নিয়ে নতুন নামকরণ হয় যথাক্রমে রমানাথ সাধু লেন, রাজেন্দ্র দেব রোড ও দুধুওয়ালা ধর্মশালা লেন— সে কথায় আমরা পরে আসছি।

মুক্তারামবাবুর পুরো নাম মুক্তারাম দে। সেকালের কলিকাতায় তিনি একজন প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন। কটন সাহেব তাঁর সম্বন্ধে লিখেছেন— "Mooktaram Baboo's Street, another street in ward 6 which runs from Banstollah to Cornwallis Street, derives its name from Mooktaram Dey, who held the office of Dewan of the Supreme Court for many years and retired only when the High court came into existence under the Charter of 1862."[৭৯] হরিসাধন মুখোপাধ্যায় ও আধুনিক যুগের নিশীথরঞ্জন রায় মুক্তারামবাবু সম্বন্ধে একই মন্তব্য করেছেন।[৮০] মার্ক উডের পথঘাট নামাঙ্কিত কলিকাতার মানচিত্রে (১৭৮৪-৮৫) মুক্তারামবাবু স্ট্রিট সুস্পষ্টভাবে নামাঙ্কিত করা আছে। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে মুক্তারামবাবু পলাশী আমলের লোক। কাজেই ১৮৬২ সালে তাঁর কর্ম থেকে অবসর নেওয়ার কথা অসম্ভব বলেই মনে হয়। সেকালের কলিকাতায় তিনি একজন খ্যাতিমান ব্যক্তি ছিলেন সন্দেহ নেই। অন্যেরা যেখানে পদবি গৌরবে পরিচিত হতেন, মুক্তারাম দে 'বাবু' গৌরবে সেকালের কলিকাতায় সুপরিচিত হয়েছিলেন। কলিকাতার রাস্তাঘাটের ইতিহাসে মুষ্টিমেয় যে কয়েকজন 'বাবু' নামে পরিচিতি লাভ করেছেন মুক্তারামবাবু তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

মুক্তারামবাবুর নামে ৬টি রাস্তা যে অঞ্চলে অবস্থিত সেটি প্রাচীন কলিকাতার সিমুলিয়া গ্রামের অন্তর্গত ছিল। এই ছ'টি রাস্তার মধ্যে মুক্তারামবাবু স্ট্রিটই প্রধান পথ। এটি কর্নওয়ালিস স্ট্রিট থেকে শুরু হয়ে পশ্চিম দিকে এগিয়ে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউকে অতিক্রম করে চিৎপুর রোডে এসে পড়েছে। মুক্তারামবাবুর নামে অন্য রাস্তাগুলি মুক্তারামবাবু স্ট্রিটের শাখাপথ। সেকালে মুক্তারামবাবু স্ট্রিট খুবই সংকীর্ণ ছিল, বিশেষত পূর্ব দিকের অংশ। রাস্তার বক্র অংশকে সোজা করা এবং এটিকে আরও প্রশস্ত করার জন্য প্রায় ১৮ কাঠা জমি কলিকাতা পুরসভা অধিগ্রহণ করেন। জমির মোট মূল্য দিতে হয়েছিল ৭২৪৫ টাকা।[৮১] এ ছাড়াও রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক এই রাস্তা এবং মুনশি সদরুদ্দীন লেন প্রশস্ত করার জন্য কলিকাতা পুরসভাকে বিনামূল্যে জমি দান করেছিলেন।[৮২] ১৯৩১-৩২ সালে চিৎপুর রোড ও মুক্তারামবাবু স্ট্রিটের সংযোগস্থলকে প্রশস্ত করার জন্য কলিকাতা পুরসভা ৫৫২৮ টাকা ব্যয় করেছিলেন।[৮৩]

১৯২৫ সালের কথা। মুক্তারামবাবু স্ট্রিটের একটি বদ্ধ গলিপথকে রায় হুজুরিমল দুধুওয়ালা বাহাদুরের নামে নামকরণের এক প্রস্তাব আসে। এই গলির একদিকে ১৩, ১৫ ও ১৭ নম্বর বাড়ি, অন্যদিকে ১৯এ, বি, সি ও ডি নম্বরের বাড়ি অবস্থিত। হুজুরিমল সেকালের কলিকাতায় একজন সদাশয় ও দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। ভারতের বহু তীর্থক্ষেত্রে যথা পুরী, বৈদ্যনাথ, প্রয়াগ, হরিদ্বার, গাড়ওয়াল, লছমনঝোলা, কানপুর প্রভৃতি স্থানে তীর্থযাত্রীদের থাকার সুবিধার জন্য ধর্মশালা ও যাত্রী নিবাস নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। গাড়ওয়াল সরকারকে ৪০০০ ফুট দীর্ঘ পার্বত্য পথ তৈরি করে দেবার জন্য ২০,০০০ টাকা দান করেছিলেন।

কলিকাতার জন্যও হুজুরিমলের অবদান কম নয়। কলিকাতায় মাড়োয়ারি সরস্বতী উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপনের সময় ৩০,০০০ টাকা এবং হ্যারিসন রোডের (এখন মহাত্মা গান্ধী রোড) উপর অবস্থিত একটি প্রকাণ্ড বাড়ি দান করেন। এছাড়া মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষকে ১০,০০০ টাকা এবং

মাড়োয়ারি হাসপাতালকে ৫০,০০০ টাকা, কারাবন্দি সাহায্য প্রকল্পে ৫০০০ টাকা দান করেন। কালীঘাটে আদি গঙ্গার ধারে একটি মনোরম ধর্মশালা নির্মাণ করে কলিকাতা পুরসভার হাতে তুলে দেন। মাড়োয়ারি সম্প্রদায়ের বিবাহ ও শ্রাদ্ধবাসরের জন্য একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্মাণ করে দেন। এটি ১৯এ ও ১৯বি, মুক্তারামবাবু স্ট্রিটে অবস্থিত। এ ছাড়া কলিকাতার বহু প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা তাঁর দানে অনুগৃহীত হয়েছিল।

কলিকাতা পুরসভা তাঁদের ২৬শে আগস্ট ১৯২৫ সালের অধিবেশনে মুক্তারামবাবু স্ট্রিটের উপরিউক্ত বদ্ধ গলিপথটি রায় হুজুরিমল দুধুওয়ালা বাহাদুরের নামে 'দুধুওয়ালা ধর্মশালা লেন' নামাঙ্কিত করেন।[৮৪] এই রাস্তার ওপর রায় বাহাদুর হুজুরিমল দুধুওয়ালার ধর্মশালা অবস্থিত।

১৯৩৫ সালে মুক্তারামবাবু ফোর্থ লেনের নাম পরিবর্তনের এক প্রস্তাব আসে। ওই প্রস্তাবে রাস্তাটির নাম বদল করে, রমানাথ সাধুর নামে রমানাথ সাধু লেন চাওয়া হয়। তিনি ওই অঞ্চলের বিশেষ গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন। কলিকাতা পুরসভা তাঁদের ৫ই জুন ১৯৩৫ সালের অধিবেশনে ওই প্রস্তাব গ্রহণ করেন। অতঃপর মুক্তারামবাবু ফোর্থ লেন রাস্তাটির নতুন নামাঙ্কন হয় 'রমানাথ সাধু লেন'। সে নাম আজও বহাল আছে।

ফিরে আসা যাক রাজেন্দ্র দেব রোডের কথায়। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এই পথটির কোনও নামকরণ হয়নি। কলিকাতা পুরসভা ১৬ই জুলাই ১৯১৩ সালের অধিবেশনে এই অনামী রাস্তাটিকে কালীবাড়ি লেন নামাঙ্কিত করেন।[৮৫] এই রাস্তার ওপর অবস্থিত কলিকাতার বিখ্যাত ঠনঠনিয়া কালীবাড়ি। রাস্তাটির নতুন নামকরণের ফলে অঞ্চলের বাসিন্দাদের মধ্যে প্রবল প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। তাঁরা ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯১৩ সালে বহুজনের স্বাক্ষরযুক্ত এক আবেদনপত্রে এই নামকরণের বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি জানান। এতে বলা হয় যে নিকটেই কালীতলা লেন নামে একটি রাস্তা আছে। অনামী রাস্তাটি কালীবাড়ি লেন নামকরণ করায় দুটি রাস্তার নামের সাদৃশ্য থাকায় রাস্তা শনাক্তকরণ ও ডাক বিলিতে অসুবিধা দেখা দেবে। কলিকাতা পুরসভা স্থানীয় বাসিন্দাদের যুক্তিতে সহমত হয়ে ২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৯১৫ সালে কালীবাড়ি লেনের নাম পুনরায় পরিবর্তন করে মুক্তারাম রো নামাঙ্কিত করেন।[৮৬]

প্রায় তিন দশক পরে মুক্তারাম রো নামটি আবার বদল করার এক প্রস্তাব আসে। তাতে বলা হয় বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কংগ্রেস কমিটির সভাপতি প্রয়াত রাজেন্দ্রচন্দ্র দেবের নামে মুক্তারাম রো-এর নাম বদল করে রাজেন্দ্র দেব রোড নামাঙ্কিত করা হোক। কলিকাতা পুরসভা ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৪৬ সালে এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ফলে মুক্তারাম রো-এর নতুন নাম হয় 'রাজেন্দ্র দেব রোড'।[৮৭]

অগ্নিযুগের বিপ্লবী রাজেন্দ্রচন্দ্র দেব (১৮৮০-১৯৪৩) কলিকাতার ঠনঠনিয়ার প্রাচীন বনেদি ও প্রগতিশীল দেব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা উপেন্দ্রচন্দ্র দেব, হিন্দু কলেজের মেধাবী ছাত্র, ডিরোজিওর শিষ্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ ডিগ্রিধারী ও বহু ভাষাবিদ ছিলেন। আলিপুর কোর্টে ওকালতি করতেন। বিত্তের সঙ্গে সম্মানও অর্জন করেছিলেন। ইন্ডিয়ান পেনাল কোড বাংলায় অনুবাদ করে খ্যাতিমান হন। উপেন্দ্রচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন নগেন্দ্রচন্দ্র। কবি নরেন্দ্র দেব তাঁর একমাত্র পুত্র।

পাঁচ ভাই-এর মধ্যে রাজেন্দ্র ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে আই. এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর রাজেন্দ্রচন্দ্র রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসেন এবং উচ্চশিক্ষার মোহ ত্যাগ করে দেশসেবায় আত্মনিয়োগে উদ্বুদ্ধ হন। পরবর্তীকালে স্বদেশি আন্দোলন বিপিন পাল ও অরবিন্দ ঘোষের নেতৃত্বে বিপ্লবাত্মক পথে অগ্রসর হলে তিনি মডারেট দল ত্যাগ করে গুপ্ত বিপ্লবী দলে যোগ দেন। গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের সময় বিপ্লবের পথ ছেড়ে এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। বহুবার তিনি কারাবরণ করেন। রাজেন্দ্রচন্দ্রের জীবন ছিল বহু বিচিত্রতায় ভরা— স্বাধীনতা সংগ্রামের বহু আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করলেও কখনও তাঁকে সাংবাদিকের ভূমিকায়, কখনও বা শিক্ষাব্রতী, আবার কখনও বা রাজনৈতিক নেতার ভূমিকায় দেখা গেছে। পরবর্তীকালে একসময় বাংলা প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। তিনি অকৃতদার ছিলেন।

১নং মুক্তরাম রো (এখন রাজেন্দ্র দেব রোড) রাজেন্দ্রচন্দ্রের বাসভবন ছিল। সেকালের এই

বাড়িটির ইতিবৃত্ত কম আকর্ষণীয় নয়। উপেন্দ্রচন্দ্র দেবের পিতা কৃষ্ণচন্দ্র দেবের সময় এই বাড়িটি নির্মিত হয়। সে সময় এই বাড়িটি বাগান পুকুর সমেত ৭ বিঘা জমির ওপর অবস্থিত ছিল। বিশাল ছিল এই বাড়ির ঠাকুর-দালান, সব রকম পূজাপার্বণের ব্যবস্থা ছিল। কালের গতিতে এ বাড়ির বেশির ভাগই ধীরে ধীরে হস্তান্তরিত হয়। পরবর্তীকালে উপেন্দ্রচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পৌত্র রবীন্দ্রচন্দ্র দেব পুরানো বাড়ি ভেঙে বর্তমানের বহুতল বাড়ি নির্মাণ করেন।

একসময় এই বাড়িটি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মিলনকেন্দ্র ও সাহিত্য-সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি হয়ে ওঠে। এর মধ্যমণি একদিকে ছিলেন রাজেন্দ্রচন্দ্র অন্যদিকে কবি ও সাহিত্যিক নরেন দেব। সেকালের বহুমানভাজন দেশপ্রেমিক ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পদধূলিতে ধন্য হয়েছিল এ ভবন—এসেছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র বসু, মুসলিম নেতা সৈয়দ সুরাবর্দি প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। অন্যদিকে নরেন দেবের আকর্ষণে সেকালের সকল খ্যাত-অখ্যাত কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, নট ও নাট্যকার, গায়ক ও গীতিকার মিলিত হতেন এই ভবনে। একমাত্র রবীন্দ্রনাথ কখনও পদার্পণ করেননি এই বাড়িতে। সকলের মিলিত আড্ডায় এ বাড়ি প্রাণবন্ত হয়ে উঠত— সাহিত্য সংস্কৃতির নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা ও বিতর্ক সভা হত। কবিতা ও সাহিত্য পাঠের ফাঁকে ফাঁকে গানের আসরও বসত। যেদিন আসরে কবি নজরুল ইসলাম আসতেন, সেদিন আসর ভাঙার কোনও সময়সীমা থাকত না। নজরুল হারমোনিয়াম নিয়ে একটার পর একটা গান গেয়ে যেতেন আর শ্রোতারা মুগ্ধ বিস্ময়ে সঙ্গীত সুধারস পান করতেন। মাঝে মাঝে রবিবাসরের বৈঠক বসত এ বাড়িতে।

আরেকটি বিষয় উল্লেখ না করলে এ প্রসঙ্গ অসমাপ্ত থেকে যায়। আইন ব্যবসায়ের যে উজ্জ্বল দীপ-শিখাটি উপেন্দ্রচন্দ্র প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন তাঁর উত্তরপুরুষ রবীন্দ্রচন্দ্র ও তাঁর পুত্র রথীন্দ্রচন্দ্র এবং ভ্রাতুষ্পুত্র সমরেন্দ্রচন্দ্র প্রমুখ সেই দীপশিখাটিকে উসকে দিয়ে আরও উজ্জ্বলতর করেছিলেন। রথীন্দ্রচন্দ্র কলিকাতা হাইকোর্টের কীর্তিমান ব্যারিস্টার ও একসময় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অ্যাডভোকেট জেনারেল হয়েছিলেন। আর কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হয়েছিলেন সমরেন্দ্রচন্দ্র দেব। তাঁদের প্রতিভার আকর্ষণে বহু আইনবিদ ও আইনজীবী সমবেত হতেন এই ভবনের আঙ্গিনায়।[৮৮]

গন্ধবণিক কলিকাতার একটি প্রাচীন সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায় তাঁদের সমাজের নানাবিধ উন্নতি ও সমাজসংস্কারের পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য 'গন্ধবণিক মহাসভা' স্থাপন করেন ২১সি, রাজেন্দ্র দেব রোডে। প্রতিষ্ঠানটি সম্বন্ধে কিছু বলার আগে গন্ধবণিক সম্প্রদায় সম্বন্ধে দু-চার কথা বলা আবশ্যক।

হিন্দু সমাজে বর্ণের সংখ্যা চার। ঋকবেদে (১০ম মণ্ডল ৯০ সূক্ত) একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে, বিরাট পুরুষের ব্রাহ্মণ মুখ ছিলেন, রাজন্য বাহুস্বরূপ এবং উরু বৈশ্য ছিলেন এবং পাদদ্বয় থেকে শূদ্র হয়েছিলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এগুলি বর্ণ, জাতি নয়। ওই মন্ত্রের সরল ব্যাখ্যা হল, চারিটি বিশেষ গুণসম্পন্ন ও বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত বর্ণের সমাবেশে সমগ্র সমাজদেহ গঠিত হয়েছে। সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের বিভিন্ন মাত্রার সংযোগে-র ফলে চারি বর্ণের মধ্যে গুণের তারতম্য উদ্ভূত হয়েছে। গন্ধবণিক এই বৈশ্য বর্ণের অন্তর্গত।

খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের শেষ ভাগে বা তার পরবর্তীকালে বাংলা দেশে রচিত বলে বিবেচিত "বৃহদ্ধর্ম পুরাণ"। এই পুরাণে বলা হয়েছে যে ব্রাহ্মণ ছাড়া বঙ্গদেশে যত বর্ণ আছে সমস্তই সংকর। বর্ণ ও বৃত্তি সমূহকে উত্তম, মধ্যম ও অধম সংকর এই তিন পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। এই তিন পর্যায়ের মধ্যে ৩৬টি উপবর্ণ বা জাতের কথা বলা হয়েছে। যদিও তালিকায় আছে ৪১টি জাত। বঙ্গদেশে জাত সংখ্যা বলতে আজও আমরা বলি ৩৬ জাত। ৩৬টি বোধ হয় ছিল আদি জাত, পরে আরও ৫টি উপবর্ণ এই তালিকায় ঢুকে পড়ে থাকবে।

উত্তম সংকর তালিকায় ২০টি উপবর্ণ আছে, তার মধ্যে গান্ধিকবণিক (গন্ধদ্রব্য বিক্রয় যে বণিকের বৃত্তি ; বর্তমানের গন্ধবণিক) অন্তর্ভুক্ত। মধ্যম সংকরের মধ্যে ১২টি উপবর্ণ এবং অধম সংকর বা অন্ত্যজ পর্যায়ে ৯টি উপবর্ণ আছে।

উপরের তালিকায় বর্ণ ও শ্রেণীর যেটুকু পরিচয় পাওয়া গেল তা একান্তই আদিপর্বের শেষ অধ্যায়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে গুপ্ত আমল থেকে আরম্ভ করে বঙ্গদেশেও অনুরূপ চিত্র পাওয়া যায়। সেখানে অনেকগুলি অর্থোৎপাদক শ্রেণীর মধ্যে গন্ধবণিক সম্প্রদায়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অন্য শ্রেণীরা হলেন স্বর্ণকার, সুবর্ণবণিক, তৈলকার প্রভৃতি। কিন্তু সপ্তম অষ্টম শতক থেকে বাঙালি সমাজ প্রধানত কৃষি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহশিল্পনির্ভর হয়ে পড়ে। ফলে অর্থোৎপাদক ও শ্রমিক শ্রেণীগুলি ক্রমশ সামাজিক মর্যাদা হারাতে থাকে। ফলে বর্ণের সঙ্গে শ্রেণীর পারস্পরিক সম্পর্ক ক্রমশ তীব্রতর হয়। বঙ্গদেশে পাল আমল পর্যন্ত এই বিরোধ খুব তীব্রভাবে দেখা দেয়নি। তবে পাল আমলের শেষের দিকে বিশেষভাবে সেন-বর্মন আমলে এই বিরোধ ধীরে ধীরে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে থাকে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে (১৭৫২ খ্রিস্টাব্দ) ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে বর্ধমান নগরীতে বিভিন্ন জাতির যে বর্ণনা দিয়েছেন তার সঙ্গে দুশো বছরের পূর্বেকার কবিকঙ্কন চণ্ডীর বর্ণনার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। সুতরাং এই দুই মিলিয়ে বাংলার মধ্যযুগের বিভিন্ন জাতির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথমে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য এই দুই জাতির উল্লেখ আছে। তার পরে আছে—

> "কায়স্থ বিবিধ জাতি দেখে রোজগারি।
> বেনে মণি গন্ধ সোনা কাঁসারি শাঁখারি ॥"

এই দুই পংক্তির মধ্যে গন্ধবণিকের পরিচয় পাওয়া যায়।

গন্ধবণিক, সুবর্ণবণিক প্রভৃতি জাতিগোষ্ঠী বাণিজ্য করে লক্ষপতি হয়ে সেকালের সমাজে খুব উচ্চস্থান অধিকার করেছিলেন। মঙ্গলকাব্যগুলিতে এই শ্রেণীর প্রাধান্য বর্ণিত হয়েছে। সে সময় বাঙালি বণিক সদাগরেরাও ভারতের সর্বত্র এমন কি ভারতের বাইরেও বাণিজ্য করত। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে রচিত জয়নারায়ণের 'হরিলীলা' নামে বাংলা গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে একজন বৈশ্য বণিক নিম্নলিখিত স্থানে বাণিজ্য করতে যেতেন : "হস্তিনাপুর, কর্ণাট, বঙ্গ, কলিঙ্গ, গুর্জর, বারানসী, মহারাষ্ট্র, কাশ্মীর, পঞ্চাল, কাম্বোজ, ভোজ, মগধ, জয়ন্তী, দ্রাবিড়, নেপাল, কাঞ্চী, অযোধ্যা, অবন্তী, মথুরা, কাম্পিল্য, মায়াপুরী, দ্বারাবতী, চীন, মহাচীন, কামরূপ।" 'চন্দ্রকান্ত' নামে প্রায় সমসাময়িক আর একখানি বাংলা গ্রন্থে লেখা আছে যে চন্দ্রকান্ত নামে মল্লভূমি নিবাসী একজন গন্ধবণিক সাতখানি তরী বাণিজ্য দ্রব্যে বোঝাই করে গুজরাটে গিয়েছিলেন। গন্ধবণিক, সুবর্ণবণিক প্রভৃতি সম্প্রদায়ের আর্থিক উন্নতি দেখে যাতে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য প্রভৃতি উচ্চবর্ণেরা অর্থলালসায় কুলোচিত ধর্ম বিসর্জন দিয়ে বণিকবৃত্তি অবলম্বন না করে তার জন্য সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ করেছিলেন স্মার্ত রঘুনন্দন। কিন্তু বণিকেরা যে এই নিষেধ না মেনে সমুদ্রপথে বাণিজ্য করতেন মঙ্গলকাব্যে তার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। এ ব্যাপারে বাস্তবের সঙ্গে আদর্শের প্রভেদ অত্যন্ত বিস্ময়কর বলে মনে হয়।

গন্ধবণিক জাতি নিজেদের কেবল ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যেই নিয়োজিত রেখেছিলেন তাই নয়। এঁদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষারও প্রচলন ছিল। ষষ্ঠীধর সেন, গঙ্গাদাস সেন প্রমুখ গ্রন্থ রচনাও করেছেন।[৮৯] পরবর্তীকালে ইংরেজ শাসন আমলে এবং বিদেশি শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত প্রতিযোগিতামূলক এক নতুন উৎপাদন ব্যবস্থা প্রচলনের ফলে কলকারখানা নির্মাণ, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রকৃতিতে আমূল পরিবর্তন, জনসংখ্যার বৃদ্ধি এবং ব্যক্তি বিকাশের সহায়ক পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের ফলে সুবর্ণবণিক ও গন্ধবণিকের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রায় একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে আসতে থাকে এবং অন্য বৃত্তির অনুসরণকারীরা ব্যবসা-বাণিজ্যে আকৃষ্ট হয়। গন্ধবণিকদের ব্যবসায়ে প্রাধান্য এইভাবে লুপ্ত হতে থাকে। এঁদের মধ্যে অনেকে তখন সরকারি চাকুরি, শিক্ষকতা প্রভৃতি অন্যান্য বৃত্তি গ্রহণ করেন।

কলিকাতায় ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসাসূত্রে গন্ধবণিক সম্প্রদায়ের কলিকাতায় আগমন ঘটে। কলিকাতার নানাস্থানে এঁদের বসতি ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলেও প্রধান বসতি গড়ে ওঠে ঠনঠনিয়ার চোরবাগান, শোভাবাজার, পটলডাঙ্গা, জোড়াসাঁকো, ভবানীপুর, বরানগর প্রভৃতি অঞ্চলে। গন্ধবণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু উপাধির প্রচলন দেখা যায়, তার মধ্যে প্রধান হল— দে,

দত্ত, দাস, হালদার, দাঁ, লাহা, খাঁ, বণিক, বিদ, মাহিন্দর, চন্দ্র, পাল প্রভৃতি।

আবার ফিরে আসি 'গন্ধবণিক মহাসভার' কথায়। ডাঃ অবিনাশচন্দ্র দাশের ঐকান্তিক আগ্রহে এবং উদ্যোগে এটি স্থাপিত হয়। প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনের জন্য প্রভাত দত্ত বিনামূল্যে জমি দিয়েছিলেন। গৃহের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয় ১৬ই বৈশাখ, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে। গন্ধবণিক সম্প্রদায়ের সমষ্টিগত দানে গৃহ নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়। ভবনটি তিনতলা। অফিস একতলায়। বাড়ির অন্য দুই তলায় গন্ধবণিক ছাত্রাবাস অবস্থিত। এখানে গন্ধবণিক সম্প্রদায়ের ৩০ জন ছাত্র থাকতে পারে। ছাত্রদের বৃত্তিদানের ব্যবস্থাও আছে। ভবনের পাশেই গন্ধেশ্বরী দেবীর মন্দির। অষ্টধাতুর প্রতিমা আছে মন্দিরে। এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় ১৪ই বৈশাখ ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে। মন্দিরের নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয় ১৩৪৬ সনে। মন্দিরের সামনেই প্রশস্ত নাট মন্দির। বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন বিশেষ পূজাঅর্চনার ব্যবস্থা আছে।

গন্ধবণিক মহাসভার উদ্যোগে গন্ধবণিক সম্মেলন প্রতি তিন-চার বছর অন্তর অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে গন্ধবণিকরা এতে যোগদান করেন।

'গন্ধবণিক দাতব্য সভা'— গন্ধবণিকদের আরেকটি প্রতিষ্ঠান। এর বয়স প্রায় ১০০ বছর। এই সম্প্রদায়ের অভাবী ও দুঃস্থ ব্যক্তিদের নানা প্রকার সাহায্য দেওয়া হয়। এ ছাড়াও এই সম্প্রদায়ের অসহায়, অনাথা বিধবা মহিলাদের মাসিক ৩০ থেকে ৫০ টাকা ভাতা দেবার ব্যবস্থা আছে।

গন্ধবণিক সম্প্রদায়ের আরেকটি প্রতিষ্ঠান— 'গন্ধবণিক শিক্ষা সমিতি'। ১৯৪৪ সালে এটি স্থাপিত হয়। গিরীন্দ্রকুমার লাহা এটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ১৬, সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটে সুবল দত্তের 'দত্ত ভবনে' অবস্থিত ছিল। বর্তমানে ৭, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউতে আছে। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান কাজ— গন্ধবণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার, উচ্চশিক্ষা লাভেচ্ছু ছাত্রছাত্রীদের জন্য সমিতির প্রদেয় বৃত্তিদানের ব্যবস্থা, স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি-অনুদানাদির ব্যবস্থা, বাৎসরিক শিক্ষামূলক ভ্রমণ, সেই সঙ্গে খেলাধূলা ও বিভিন্ন পুরস্কার প্রদান ইত্যাদি। এ ছাড়াও আছে ব্যবসাসংক্রান্ত বিষয়সমূহের পরামর্শদানের ব্যবস্থা। এই শিক্ষা সমিতি আটটি কেন্দ্রের মাধ্যমে তাঁদের কার্যক্রম ও পরিকল্পনা রূপায়ণের ব্যবস্থা করেন। কেন্দ্রগুলি— (১) খাঁটোরা কেন্দ্র, (২) খিদিরপুর কেন্দ্র, (৩) চোরবাগান (জোড়াসাঁকো কেন্দ্র), (৪) ভবানীপুর কেন্দ্র, (৫) শিবপুর কেন্দ্র, (৬) শোভাবাজার কেন্দ্র, (৭) বরাহনগর কেন্দ্র ও (৮) পটলডাঙ্গা কেন্দ্র।

গন্ধবণিক সম্প্রদায়ের মুখপত্র 'গন্ধবণিক পত্রিকা'। গন্ধবণিক পাবলিশিং সোসাইটি এই পত্রিকাটি প্রকাশ করে থাকেন। পত্রিকাটি ৭১ বছর ধরে প্রকাশিত হয়ে আসছে। পূর্বে কেবলমাত্র গন্ধবণিক সম্প্রদায়ের লেখক-লেখিকাদের সাহিত্যকর্ম এই পত্রিকায় প্রকাশিত হত। বর্তমানে এই নীতি শিথিল করে অন্যান্য সম্প্রদায়ের কবি সাহিত্যিকদের লেখাও এই পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে। পত্রিকার প্রচার সংখ্যা ৯০০ মতো। পাবলিশিং সোসাইটি ২১সি, রাজেন্দ্র দেব রোডে অবস্থিত। গন্ধবণিক মহাসভা তার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গন্ধবণিক সম্প্রদায়ের সবাঙ্গীণ উন্নতির উজ্জ্বল দীপশিখাটি আজও অনির্বাণ রেখেছেন।

হেমেন্দ্র সেন স্ট্রিট : হেমেন্দ্র সেন স্ট্রিট এক সময় মসজিদ বাড়ি স্ট্রিটের অংশ ছিল। এর সম্বন্ধে কিছু বলার আগে মসজিদ বাড়ি স্ট্রিট সম্বন্ধে দু-চার কথা বলা আবশ্যক।

সোনাগাজি অর্থাৎ গাজি সোনাউল্লার বিখ্যাত মসজিদ চিৎপুর রোড (রবীন্দ্র সরণি) ও দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রিটের সংযোগস্থলের কিছুটা ভিতরে অবস্থিত। সোনাগাজির মসজিদ কবে তৈরি হয়েছিল তা সঠিক কারও জানা নেই। এই মসজিদের ইমামের কাছ থেকে যতটুকু জানা যায় তার সারমর্ম এরূপ— সোনাগাজির পুরো নাম গাজি সোনাউল্লা শাহ চুস্তি রহমতউল্লা আলে। তিনি এক সময়ে একাই ইরান থেকে ভারতে আসেন। তাঁর চেহারা ছিল সুন্দর। তিনি ছিলেন ভাল ঘোড়সওয়ার। ভারতের নানান স্থান ঘুরে অবশেষে কলিকাতায় আসেন। উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম ধর্ম প্রচার। চিৎপুরে তিনি বসতি স্থাপন করেন। এই জায়গাটি ছিল এক বিরাট গোরস্থান। এর ব্যাপ্তি ছিল বর্তমান চার্লস অ্যালেন মার্কেট থেকে যতীন্দ্রমোহন অ্যাভিনিউ পর্যন্ত। এর আশেপাশে ছিল মুসলমানদের বসতি। এখন যেখানে অ্যালেন মার্কেট, সেখানে ছিল এক বিশাল পুষ্করিণী। এই

পুকুরের সামনেই সোনাগাজি তাঁর মসজিদ নির্মাণ করেন। পরবর্তীকালে মসজিদটি পরিত্যক্ত হলে পুষ্করিণীটি মজে যায়। ১৮১৭ সালে লটারি কমিটি এটিকে সংস্কার করে পানোপযোগী করেন। এর বহু পরে পুকুরটি ভরাট করা হয়। ওই জায়গায় প্রথমে ঘোড়ার আস্তাবল এবং পরে এই শতাব্দীর শুরুতে চার্লস অ্যালেন মার্কেট নির্মিত হয়। মসজিদের অভ্যন্তরে রয়েছে সোনাগাজির কবর। শোনা যায়, এই মসজিদ ছিল এক সময় খুব সুন্দর— চার মিনারের মাঝে সুদৃশ্য বিরাট গম্বুজ। মসজিদের ভিতরে ছিল ইরানি শিল্পরীতির সূক্ষ্ম কারুকার্য। বর্তমানে এর কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। ১৯৪৬-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় এ সবই নষ্ট হয়ে গেছে। পরে মসজিদটি নতুন করে নির্মিত হয়।

সোনাগাজির মসজিদ সম্বন্ধে আরেকটি কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। সোনাউল্লা নামে এক দুর্দান্ত মুসলমান সোনাগাছি অঞ্চলে বাস করতেন। লাঠালাঠি, মারামারি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা তাঁর উপজীবিকা ছিল। সংসারে তাঁর আপন বলতে বৃদ্ধা জননী ছাড়া আর কেউ ছিল না। কথিত আছে, সোনাউল্লা মারা যাবার পর তাঁর প্রেতাত্মা সোনাগাজি নামে নিজেকে জাহির করে এবং তাঁর মাকে বলেন যে, এখন থেকে সে লোকের সর্ব প্রকার উপকার করবে। এই কথা রাষ্ট্র হবার পর ব্যাধিগ্রস্ত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সোনাগাজির কবরে ধর্না দিয়ে রোগমুক্ত ও বিপদমুক্ত হয়। এতে করে তাঁর মায়ের বহু অর্থাগম হয়। সোনাগাজির মা বহু অর্থ ব্যয়ে একটি সুন্দর মসজিদ নির্মাণ করেন। এই মসজিদ সোনাগাজির মসজিদ নামে পরিচিত ছিল। এই মসজিদের নাম অনুসারে মসজিদ বাড়ি স্ট্রিটের নাম হয়েছে।[৯০]

সোনাগাজির মা মারা যাবার পর মসজিদের অলৌকিক কাণ্ড বন্ধ হয়ে যায়। মসজিদ আগাছা ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ হল। টেকচাঁদ ঠাকুর তাঁর 'আলালের ঘরে দুলাল' পুস্তকে নির্বাসিত সোনাগাজির মসজিদের এক মর্মান্তিক বর্ণনা দিয়েছেন— "সোনাগাজীর দরগায় কুনী বুনী বাসা করিয়াছিল— চারিদিকে শেওলা ও বোনাজে পরিপূর্ণ— স্থানে২ কাকের ও সালিকের বাসা—বাড়িতে আধার আনিয়া দিতেছে— পিলে চি২ করিতেছে— কোনখানেই এক ফোঁটা চূন পড়ে নাই— রাত্রি হইলে কেবল শেয়াল কুকুরের ডাক শোনা যাইত ও সকল স্থানে সন্ধ্যা দিত কিনা তাহা সন্দেহ। মতিলালের শুভাগমনাবধি সোনাগাজীর কপাল ফিরিয়া গেল। একেবারে 'ঘোড়ার চিহি, তবলার চাটি, লুচি-পুরির খচাখচ।' উল্লাসের কড়াংধুম রাতদিন হইতে লাগিল আর মণ্ডা মিঠাই, গোলাপফুলের আতর ও চরস, গাঁজা, মদের ছড়াছড়ি দেখিয়া অনেকেই গড়াগড়ি দিতে আরম্ভ করিল। কলিকাতার লোক চেনাভার— অনেকেই বর্ণচোরা আঁব।" এই বিবরণে একদিকে যেমন সোনাগাজির পোড়ো মসজিদের ক্ষয়িষ্ণু চিত্রটি পরিস্ফুট করা হয়েছে অন্যদিকে ওই এলাকার তৎকালীন সামাজিক চিত্রটি স্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হয়েছে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে সোনাগাজির মসজিদের জন্যই রাস্তাটির নাম হয়েছিল মসজিদ বাড়ি স্ট্রিট। এটি কলিকাতার প্রাচীন পথগুলির অন্যতম। অর্মির ১৭৫৬ সালের কলিকাতার মানচিত্রের এই রাস্তার কিছু কিছু অংশ দেখানো আছে। ওই রাস্তার কতক অংশে খালি জমির পর একটি বৃহৎ মসজিদের চিত্র আছে। মার্ক উড (১৭৮৪) এবং আপজন সাহেব (১৭৯৩) উভয়েরই কলিকাতা মানচিত্রে রাস্তাটি চিহ্নিত আছে। কিন্তু কোনও নাম দেওয়া নেই। ১৮১২ খ্রিঃ কলিকাতা পুরসভার Assessment Register-এ এই রাস্তার খোঁজ পাওয়া যায়। ১৮৬৬ খ্রিঃ কলিকাতা পুরসভার প্রথম চেয়ারম্যান কলিকাতার জনগণনার ব্যবস্থা করেছিলেন। ওই প্রতিবেদনের সঙ্গে ৪৩৮টি রাস্তার তালিকা দেওয়া আছে। তার মধ্যে ২৫ সংখ্যক রাস্তাটি মসজিদ বাড়ি স্ট্রিট। রাস্তাটি চিৎপুর রোডের পূর্বদিক থেকে আরম্ভ হয়ে এঁকে বেঁকে পূর্বদিকে এগিয়ে হরি ঘোষ স্ট্রিটে এসে পড়েছে। এখান থেকে কর্নওয়ালিস স্ট্রিট পর্যন্ত মসজিদ বাড়ি স্ট্রিটের সম্প্রসারিত অংশের কথায় পরে আসছি। সেকালের কলিকাতায় মসজিদ বাড়ি স্ট্রিট একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা ছিল। রাস্তাটি প্রাচীন হলেও এর চেহারা সুদৃশ্য ছিল না— অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, আঁকাবাঁকা, প্রস্থ সর্বত্র একরকম নয়।

কলিকাতা পুরসভা রাস্তাটি প্রশস্ত করবার ও মারাত্মক বাঁকগুলি নিবারণের জন্য যে প্রয়াস চালিয়েছিলেন তার একটি তালিকা দেওয়া হল—

১) ১৮৮২-৮৩ সালে গুলু ওস্তাগর লেন এবং মসজিদ বাড়ি স্ট্রিটের সংযোগস্থলকে প্রশস্ত করার

জন্য ২৮ সংখ্যক বাড়ির বিপরীত দিকের জমি অধিগ্রহণ করা হয়।[৯১]

২) ১৮৮৩-৮৪ সালে মসজিদ বাড়ি স্ট্রিটের উপর অবস্থিত ১৪৩ ও ২২ সংখ্যক বাড়ির বাগান জমি অধিগ্রহণ করে রাস্তাটি প্রশস্ত করার ব্যবস্থা হয়। এর জন্য ব্যয় হয়েছিল ২৩৪৭ টাকা।[৯২]

৩) ক— মসজিদ বাড়ির স্ট্রিটের উপর অবস্থিত ১৭, ১৮, ১৯ ও ২১ সংখ্যক বাড়ি সম্মুখের ৫ ফুট জায়গা রাস্তার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে এই অংশে রাস্তার প্রস্থ ১০ ফুট থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৫ ফুটে দাঁড়ায়।

খ— ২৯ সংখ্যক বাড়িটির উত্তর-পশ্চিম কোণের অংশটুকু গোলাকার করার ব্যবস্থা হয়। মারাত্মক বাঁকের জন্য যান চালাচলের যে অসুবিধা হয়েছিল তা দূর হয়।

গ— ১৪২ এবং ১৪৯ সংখ্যক বাড়ির বিপরীত দিকে যে পোড়ো জমি পড়ে ছিল তা অধিগ্রহণ করা হয় এবং তা রাস্তার অন্তর্গত করা হয়। এতে রাস্তার প্রস্থ বৃদ্ধি পায় এবং মারাত্মক বাঁকের জন্য যান চলাচলের অসুবিধা দূর হয়।

মসজিদ বাড়ি স্ট্রিট খুব গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা হলেও এটি খুবই আঁকাবাঁকা এবং এর প্রস্থ সর্বত্র একরকম নয়। রাস্তাটির প্রয়োজনীয় সংস্কার এবং উন্নতি করতে গেলে অনেক মূল্যবান জমি অধিগ্রহণ করা প্রয়োজন, যা কলিকাতা পুরসভার বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতিতে সম্ভব নয়।[৯৩]

কলিকাতা পুরসভা মসজিদ বাড়ি স্ট্রিটকে প্রশস্ত করার প্রচেষ্টা চালালেও এই রাস্তার ধারে অবস্থিত বস্তিগুলির স্বাস্থ্যবিধির উন্নতি বিধানে বিশেষ তৎপর হননি। গত শতাব্দীর শেষের দিকে অর্থাৎ ১৮৯৮ খ্রিঃ কলিকাতা যখন ভয়ঙ্কর প্লেগ মহামারীতে আক্রান্ত হয়, সে সময় বস্তিবাসীদের দুর্দশা হয়েছিল সর্বাধিক। মৃতের সংখ্যা ছিল সেখানে সর্বোচ্চ।

কলিকাতা শহরে তখন চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা, সরকারি ব্যবস্থা সম্বন্ধে জনসাধারণের কোনও রকম আস্থা নেই, প্লেগের স্বাস্থ্যবিধি সম্বন্ধেও স্পষ্ট ধারণা নেই। চারিদিকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বেধেছিল। সেকালের পত্র-পত্রিকায় কলিকাতার প্লেগ রোগ এবং এখানকার অধিবাসীদের আতঙ্কের কথা ফলাও করে ছাপা হচ্ছিল। ইংল্যান্ডেও কলিকাতার প্লেগ রোগ নিয়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল। স্যার ব্রাডফোর্ড লেসলি লন্ডন টাইমস কাগজে কলিকাতার প্লেগ দমন ব্যবস্থার বিষয় সমালোচনা করে চিঠি লেখেন। তৎকালীন ছোটলাট স্যার আলেকজান্ডার ম্যাকেঞ্জি সরকারি ব্যবস্থার প্রশস্তি করে উত্তর দিয়েছিলেন। প্লেগ রোগ দমন নিয়ে সরকারি পর্যায়ে যখন চাপানওতোর চলছিল, ঠিক এমনি এক পরিস্থিতিতে স্বামী বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও ভক্তগণকে প্লেগ রোগীদের সেবা করার আহ্বান জানালেন। তাঁর দুই মন্ত্রশিষ্য সদানন্দ ও সিস্টার নিবেদিতা প্লেগ রোগীদের সেবায় শহরের জঘন্যতম বস্তি অঞ্চলে কাজ শুরু করেন। সিস্টার নিবেদিতার সেবাপরায়ণতা সম্বন্ধে সকলেরই জানা। সদানন্দ সম্বন্ধে দু-চার কথা বলা প্রাসঙ্গিক মনে করি।

সদানন্দ ছিলেন স্বামীজির প্রথম সন্ন্যাসী শিষ্য। পূর্ব নাম শরৎচন্দ্র গুপ্ত। জন্ম কলিকাতায়। শৈশব থেকেই প্রবাসী, লেখাপড়া শিখেছিলেন হিন্দি, উর্দুতে। প্রবাসী হওয়ায় বাংলা ভাল বলতে পারতেন না। হরিদ্বারের কাছে হাথরাশের স্টেশনমাস্টার হয়েছিলেন শরৎচন্দ্র। ওই স্টেশনে সন্ন্যাসী নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয়, পরিশেষে রেলের চাকুরি ছেড়ে ছাই মেখে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে সন্ন্যাসী নরেন্দ্রনাথের সহযাত্রী হলেন শরৎচন্দ্র। দুই সন্ন্যাসী অতঃপর দুর্গম বন্ধুর পথে হাঁটতে লাগলেন— দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। পথশ্রমে শিষ্য শরৎচন্দ্র যখন ক্লান্ত, নিজের বোঁচকার ভার বহনে অসমর্থ, গুরু নরেন্দ্রনাথ মাথায় তুলে নিলেন শিষ্যের বোঁচকা— তার মধ্যে ছিল শরৎচন্দ্রের এক জোড়া মিলিটারি বুট জুতো। পরবর্তীকালে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে সদানন্দ বলেছেন, "আরে, এ না হলে কি স্বামীজী আমার গুরু হতে পারতেন ? আমি unknown নরেন দত্তের চেলা, আমেরিকান গ্ল্যামার দেখে আসিনি। আমি স্বামী বিবেকানন্দকে বুঝতে পারি না ; তিনি যশস্বী, শক্তিমান, পণ্ডিত— যে লোককে আমার ভয় করে। আমি বুঝি আমার গরীব নরেন্দ্র দত্তকে, যে খালি পায়ে হেঁটে হেঁটে বেড়াত। তাঁর সঙ্গে গাছতলায় শুয়ে থাকতুম, যেদিন যা জুটত তাই খেতুম।"

আবার মসজিদ বাড়ি স্ট্রিটের কথায় ফিরে আসা যাক। ৪৪ নম্বর মসজিদ বাড়ি স্ট্রিটে

কাটমার-বাগান বস্তি। সেটি আজও আছে। কলিকাতায় প্লেগ মহামারীর কালে স্বামী সদানন্দ ওই বস্তিতে গিয়েছিলেন সেবাকার্যে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন কুমুদবন্ধু সেন। তিনি সেই সেবাকার্যের বিশদ বিবরণ দিয়েছিলেন 'উদ্বোধন' পত্রিকায় (আশ্বিন, ১৩৬৫)। এই থেকে সেকালের কাটমারবাগান বস্তির অস্বাস্থ্যকর অবস্থার এক সুস্পষ্ট ছবি পাওয়া যায়। কুমুদবাবু লিখেছেন—

"স্বামী সদানন্দ মহারাজার সঙ্গে আমার... ...ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ হয় কলিকাতায় প্লেগের সেবাকার্যের সময়। রামকৃষ্ণ মিশনের প্লেগের সেবাকার্যের ইতিহাসে স্বামী সদানন্দের নাম চিরস্মরণীয়। প্রকৃতপক্ষে এই সেবাকার্যের তিনি প্রাণস্বরূপ ছিলেন। আমি প্রতিদিন বাগবাজারে বলরাম মন্দিরে যাইতাম। এই সেবাকার্য প্রবর্তনের জন্য স্বামীজীর আবেগপূর্ণ উৎসাহ বাক্য, কার্যের নির্দেশ এবং প্রতিরোধকল্পে তাঁর প্রাণের ব্যাকুলতা নিরীক্ষণ করতাম ; তবুও আমি সেবাকার্য করিতে আরম্ভ করি নাই। স্বামী সদানন্দই আমাকে তাঁহার সহিত কার্য করিতে আহ্বান করেন এবং তাঁহার সঙ্গে আমিও সেবাকার্য করিয়া নিজেকে ধন্য জ্ঞান করি।

... ... ... ...

"পরদিন তিনি আমাদের দর্জিপাড়ায় যাইতে বলিলেন, সেখানেও সেই এক অবস্থা। ধনী লোকেরা হাসিয়া উড়াইয়া দেয়। গুপ্ত মহারাজ শুনিয়া বলিলেন, 'কাল বস্তিগুলি দেখতে হবে। চলো, কাটমার বাগানে কাল ভোরে কাজ করতে হবে— আমিও তোমাদের সঙ্গে কাজ করবো।'

"অতি প্রত্যূষে মেথর জমাদার যোগাড় করিয়া তিনি আমাকে ডাকিলেন। কাটমার বাগানের বস্তি প্রকাণ্ড বস্তি— মসজিদ বাড়ি স্ট্রিটে। বাইরে মুদিখানা আর খাবারের দোকান ইত্যাদি। ভিতরের দৃশ্য ভয়াবহ দুর্গন্ধময়। আর দরিদ্র শ্রমজীবীদের দারুণ দারিদ্র্যের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইয়াছিল। যেদিকে উৎকট দুর্গন্ধ, গুপ্ত মহারাজ সেইখানে আমাদের ডাকিয়া লইলেন। বস্তির সংলগ্ন একটা সংকীর্ণ খালি জমি— সেখানে স্তূপাকার আবর্জনা। এই খালি জমির পাশেই দ্বিতল, ত্রিতল অট্টালিকা শ্রেণী, যত কিছু আবর্জনা সব পচিয়া দুর্গন্ধ।

"গুপ্ত মহারাজ দুঃখ ও ক্রোধ প্রকাশ করিয়া হিন্দীতেই বলিতে লাগিলেন— উক্ত অট্টালিকাবাসীদের উদ্দেশ্য করিয়া গালিগালাজ দিয়া বলিলেন— দেখছ, এই তো ভদ্র সমাজের কাণ্ড ! এইসব রোগের বীজ এই গরীবদের বাসস্থানে ফেলে মহামারীর বীজ ছড়াচ্ছে। প্লেগ, বসন্ত, কলেরা— যতকিছু ব্যায়রাম এই আবর্জনা পচে হয়।

"মেথরদের তিনি কোদাল ঝুড়ি নিয়ে ময়লাগুলি বড় রাস্তায় ফেলিয়া দিতে আদেশ করিলেন। তাহারা উহা পরিষ্কার করিতে অস্বীকার করিল। গুপ্ত মহারাজ তখন তাহাদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বেশ ভেইয়া, তোমরা বসে বসে দেখ, আমি সাফ করছি।"

কুমুদবন্ধু সেনের এই লেখা থেকে একটা বিষয় খুবই স্পষ্ট যে, কলিকাতার এই সব বস্তিতে জঞ্জাল অপসারণের কোনও বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা ছিল না, যদিও সে সময়ের ছোটলাট স্যার আলেকজান্ডার ম্যাকেঞ্জি সরকারি ব্যবস্থার প্রশস্তি গেয়েছিলেন। বস্তিবাসীদের সুস্বাস্থ্যের প্রতি শুধু সরকারই নন, এদেশীয় দ্বিতল-ত্রিতল অট্টালিকাবাসীরাও ছিল সম্পূর্ণ উদাসীন।

সেকালের বিখ্যাত খেয়াল ও টপ্পা গায়ক সাতকড়ি মালাকার বাস করতেন মসজিদ বাড়ি স্ট্রিটের এই কাটমারবাগান । তাঁর আদি বাড়ি ছিল বর্ধমানের অন্তর্গত ভেজে গ্রামে। সঙ্গীতজ্ঞ সাতকড়ির জন্ম এক দরিদ্র পরিবারে। জীবিকার সন্ধানে তাঁর পিতা সপরিবারে কলিকাতায় এসে কাটমার বাগানে বসবাস করতে থাকেন। শৈশবেই পিতৃবিয়োগ হওয়ায় লেখাপড়ার সুযোগ তেমন হয়নি। উপরন্তু বসন্ত রোগে চিরদিনের জন্য দৃষ্টিশক্তি হারান। ছেলেবেলা থেকেই কাকার সঙ্গে পারিবারিক পেশা— সোলার ও ফুলের কাজ করে দিন চলত। তাঁদের বংশে কখনও সঙ্গীতচর্চা দেখা যায়নি।

মসজিদ বাড়ি স্ট্রিটে সাতকড়ি মালাকারের বাড়ির পাশে থাকতেন বীরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় নামে এক ভদ্রলোক। তাঁর এক আত্মীয় তুলসীদাস চট্টোপাধ্যায় মাঝে মাঝে তাঁর বাড়িতে আসতেন, তুলসীবাবু ছিলেন স্বনামধন্য যদুভট্টের সঙ্গীতগুরু গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের পৌত্র। তুলসীবাবু সাতকড়ির গান শুনে বুঝলেন, এই ছেলে উচিত শিক্ষা পেলে একদিন প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ হতে পারে। তিনি সাতকড়িকে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রধান সভাগায়ক ধ্রুপদ, খেয়াল ও টপ্পাগুণী

গোপালচন্দ্র চক্রবর্তীর অধীনে গান শেখাবার ব্যবস্থা করলেন। পরে শোভাবাজারের মণীন্দ্রকৃষ্ণ দেব মালাকারকে সেকালের খ্যাতনামা গায়িকা যাদুমণির কাছে সঙ্গীত শিক্ষার সুযোগ করে দেন। পরে তিনি লক্ষ্মীনারায়ণ বাবাজীর কাছেও সঙ্গীত শিক্ষা করেছিলেন।

ধ্রুপদী গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাই মালাকার মহাশয়ের পরিণত বয়সের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে দুঃখ করে বলতেন, "বাংলাদেশের একটা সম্পদ। এত বড় গুণী এখন বাংলায় আর কোথায় ? একে কেউ চিনলে না।"

সুদীর্ঘ ১৫-১৬ বছরের সাধনায় সঙ্গীতে পারদর্শী হয়ে উঠলেও উপযুক্ত সম্মান ও প্রসিদ্ধি লাভ করতে পারেননি সাতকড়ি মালাকার। গুণীর মর্যাদা তো পেলেনই না, এমন কি বাস্তব জীবনের কোনও সুখভোগও তাঁর ভাগ্যে মেলেনি। এই সম্পদহীন অন্ধ গুণী বেশির ভাগই ঘরোয়া কিংবা ছোটখাটো আসরে বিনা পারিশ্রমিকে সঙ্গীত পরিবেশন করে গেছেন। বড় আসরের মধ্যে ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ স্থাপিত ও পরিচালিত নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনে সঙ্গীতের মধ্যে সুরের মায়াজাল বিস্তার করে শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করেছিলেন।

আমৃত্যু নিষ্ঠায় দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে বিদায় নিয়েছিলেন ইহজগৎ থেকে সাতকড়িবাবু। তাঁর শেষ জীবনের বিড়ম্বনা ও লাঞ্ছনার কথা মনে করে তাঁর এক অনুরাগীশ্রোতা অতি দুঃখে বলেছিলেন, "সাতকড়িবাবুর কথা ভাবলে মনে হয় এদেশে যেন কেউ গান না শেখে।"[৯৪]

প্লেগ মহামারির বেশ কয়েক বছর পর কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা কলিকাতার উন্নয়নে তৎপর হলেন। তাঁরা অনেক বস্তি উচ্ছেদ করে নতুন নতুন রাস্তা নির্মাণ করলেন। তাঁদেরই উদ্যোগে নির্মিত হল সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ (বর্তমানে যতীন্দ্রমোহন অ্যাভেনিউ ও চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ)। এই প্রশস্ত রাস্তাটি নির্মাণের ফলে মসজিদ বাড়ি স্ট্রিটের অনেকগুলি বাড়ি ভাঙা পড়ে এবং রাস্তাটি দুটি অংশে বিভক্ত হয়। প্রথম অংশ চিৎপুর রোড (রবীন্দ্র সরণি) থেকে শুরু হয়ে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ (যতীন্দ্রমোহন অ্যাভিনিউ)-এর পশ্চিম দিকে পড়েছে। অন্য অংশটি সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ-এর পূর্ব দিক থেকে আরম্ভ হয়ে হরি ঘোষ স্ট্রিটে এসে পড়েছে।

মসজিদ বাড়ি স্ট্রিটের প্রথম অংশে প্রধানত বারবনিতাদের বাস। দ্বিতীয় অংশে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্রলোকদের বাসস্থান বেশি। এঁদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন খ্যাতিমান পুরুষ, আর ছিল নামী প্রতিষ্ঠান। তাঁদের সম্বন্ধে কিছু কথা বলা যেতে পারে।

সেকালের কলিকাতায় বিখ্যাত লেখার কালি, প্রসাধন সামগ্রী, ডাইরেক্টরি পঞ্জিকা প্রভৃতি প্রস্তুতকারক পি. এম. বাগচি অ্যান্ড কোং ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে ৩৮ ও ৩৮/১, মসজিদ বাড়ি স্ট্রিটে স্থাপিত হয়েছিল। প্রতিষ্ঠানটির পূর্ব নাম ছিল দর্জিপাড়া কেমিক্যাল ওয়ার্কস্ এবং ঠিকানা ছিল ৫/১, কৈলাশ দাসের লেন, মসজিদ বাড়ি স্ট্রিট। প্রতিষ্ঠাতা কিশোরী মোহন বাগ্‌চি (বঙ্গাব্দ ১২৭৩-১৩৩০), পিতা প্যারীমোহন বাগচি। তিনি পরে পিতার নামে প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করেন। দরিদ্র পরিবারে জন্ম। নিজ প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করে বিলিতি কালির বদলে স্বদেশি কালি নির্মাণে তৎপর হন। এই প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত পুস্তিকা থেকে জানা যায়, "এনিলাইন (রাসায়নিক) কালি প্রথম আবিষ্কৃত হয় ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে জার্মানিতে, আর চার বছর পরে ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষে প্রথম বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় কালি প্রস্তুত করেন পি. এম. বাগচি অ্যান্ড কোং।"

প্রথম জীবনে টমাস উড কনসার্নে কর্মরত ছিলেন কিশোরীমোহন। কালি প্রস্তুতে সফলতা লাভ করলেও অবসর সময় বাড়িতে বসে কালি তৈরি করতেন। তাঁর পত্নী এ কাজে তাঁকে সাহায্য করতেন। ব্যবসায়ে উন্নতি হওয়াতে রবার স্ট্যাম্প নির্মাণের ব্যবসা আরম্ভ করেন। তখন কারবারের নাম হয় দর্জিপাড়া কেমিক্যাল ও রবার স্ট্যাম্প ওয়ার্কস। পরে ব্যবসা আরও সম্প্রসারিত হয় এবং নতুন নতুন দ্রব্য নির্মাণে ব্রতী হন—শীলমোহর, পুষ্পসার প্রস্তুত এবং পঞ্জিকা প্রকাশনা প্রভৃতি।

সম্ভবত, ১৮৮৮ সালে প্রথম পি.এম. বাগচি পঞ্জিকা দু'খণ্ডে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় খণ্ডে ছিল ডাইরেক্টরি। এতে পাওয়া যেত কলিকাতার পথঘাট এবং সেই সঙ্গে পথঘাটে বসবাসকারীদের স্থাপিত প্রতিষ্ঠান সমূহের তালিকা, বসবাসকারীদের নাম ঠিকানা প্রভৃতি। আজকাল এমন বিপুল তথ্য সম্বলিত পঞ্জিকা প্রকাশিত হয় না।

বর্তমানে কিশোরীমোহনের উত্তরপুরুষ জয়ন্ত ও তরুণকুমারের পরিচালনায় প্রতিষ্ঠানটি শতায়ু হয়ে আরও দীর্ঘ পথ সসম্মানে অতিক্রম করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

৪৬নং মসজিদ বাড়ি স্ট্রিটে বাস করতেন প্রখ্যাত ছন্দযাদুকর কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২)। পিতামহ অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬) ছিলেন বাংলা সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের প্রবর্তক এবং ব্রাহ্ম আন্দোলনের অন্যতম নেতা। সত্যেন্দ্রনাথের মানস প্রকৃতিতে পিতামহের প্রভাব ছিল। পরবর্তীকালে মসজিদ বাড়ি স্ট্রিটের দ্বিতীয় অংশের নাম পরিবর্তন করে অক্ষয়কুমার দত্ত সরণি রাখা হয়—সে কথায় আমরা পরে আসছি। পিতা রজনীনাথ দত্ত। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে সেন্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৯০১ অবধি জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশনে বি.এ. পর্যন্ত পড়েন। মাতুলের আদেশে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। পরে ব্যবসা ছেড়ে সাহিত্যসেবায় ব্রতী হন।

সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন ভারতী পত্রিকা গোষ্ঠীর অন্যতম কবি। সাহিত্য পত্রিকায় তাঁর প্রথম জীবনের কয়েকটি রচনা প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রযুগের খ্যাতিমান কবি হয়ে রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে গুরু বলে মানতেন। বাংলা ভাষার ধ্বনি নিয়ে নতুন ছন্দ-বিজ্ঞান সৃষ্টি তাঁর কবি প্রতিভার মৌলিক কীর্তি। স্বদেশের প্রতি অসীম প্রীতি তাঁর বহু কবিতায় পরিস্ফুট। অপর দিকে বিদেশি ভাষার কবিতা অনুবাদে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। বেশ কয়েকখানি কবিতার বই লিখে গেছেন, আজও তাদের জনপ্রিয়তা কম নয়।

মসজিদ বাড়ি স্ট্রিটের এই বাড়িতেই সত্যেন্দ্রনাথের দেহান্ত হয়।

৫০/২এ, মসজিদবাড়ি স্ট্রিটে অস্থায়ীভাবে বাস করেছিলেন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। এইখানে থাকাকালীন তাঁর প্রথম সন্তান বুলবুলের মৃত্যু হয়। শোনা যায়, সেই সময়েই "শূন্য এ বুকে পাখি মোর" গানটি রচনা করেন।

সেকালের সিভিল সার্জেন যাদবকৃষ্ণ সেন বাস করতেন ৬১ নং মসজিদ বাড়ি স্ট্রিটে। তিনি ১৯০১ খ্রিঃ কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করেন। সেন পরিবার এই অঞ্চলের প্রাচীন বাসিন্দা। এঁদেরই এক জ্ঞাতি সাতকড়ি সেন মসজিদ বাড়ি স্ট্রিটে জোড়া শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। শোনা যায়, মন্দিরটি প্রায় দেড়শো বছরের প্রাচীন। শিব মন্দিরের দেখাশোনা এবং নিত্য পূজা যাদবকৃষ্ণের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হত। যাদবকৃষ্ণ তাঁর বসত বাড়িতে শ্রীগোপাল জীউ-এর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন, প্রতিষ্ঠিত দেবতার নিত্যসেবার জন্য পাঁচ পুত্রকে তাঁর অর্জিত সম্পত্তির অছি (Trustees) করে যান। পুত্রেরা গোপাল জীউর নিত্যসেবার সঙ্গে মহেশ্বরেরও নিত্যপূজার ব্যবস্থা করেন।

যাদবকৃষ্ণের পুত্রদের মধ্যে ধীরেন্দ্রনাথ সেন সেকালের জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতা এ.কে. এইচ. গজনভীর সেক্রেটারি এবং লাইব্রেরিয়ান কনসাল ছিলেন।

৬৪ নম্বর মসজিদ বাড়ি স্ট্রিটের বাড়িটি সেকালের বেথুন সোসাইটির সদস্য, ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটির সভাপতি ঈশ্বরচন্দ্র মিত্রের (১৮৩০-১৯০৪) আবাসগৃহ ছিল। তাঁদের আদি বাড়ি ছিল বেহালায়। পিতামহ হরিশচন্দ্র মিত্র কলিকাতায় এসে ১৮৩৮ খ্রিঃ ৮নং রামনারায়ণ ভট্টাচার্য লেনের বাড়িটি ক্রয় করেন এবং কলিকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। পিতা মধুসূদন মিত্র। ঈশ্বরচন্দ্র মেধাবী ছাত্র ছিলেন। হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভ এবং ১৮৪৬-৪৭ সালের সর্বশেষ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। তাঁর সহপাঠী ছিলেন জগদীশনাথ রায়, প্যারীচরণ সরকার, রাজনারায়ণ বসু, মধূসূদন দত্ত, ভূদেব মুখার্জি প্রমুখেরা। পাঠ সমাপ্তির পর সরকারি চাকুরি গ্রহণ করেন এবং ১৮৫৫ সালে তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর পদে উন্নীত হন। ১৮৭৭-৭৮ সালে বাংলা ব্যবস্থাপক সভায় দু'বছরের জন্য সদস্য নির্বাচিত হন। ১৮৮২-৮৩ সালে তিনি প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ গ্রহণ করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র নানা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। বিধবা এবং নিঃসহায়দের ভরণপোষণের জন্য কয়েক সহস্র মুদ্রা দান করেছিলেন—বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানটির নাম ক্যালকাটা চ্যারিটেবল সোসাইটি। তিনি ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনেরও সক্রিয় সদস্য ছিলেন।

১৮৭০ সালে ৬৪ নম্বর মসজিদ বাড়ি স্ট্রিটের বাড়িটি ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র ক্রয় করেন এবং পৈতৃক বাড়ি ৮ নং রামনারায়ণ ভট্টাচার্য লেন থেকে নতুন বাড়িতে উঠে আসেন।

পরবর্তীকালে বাড়িটি দুটি ভাগে বিভক্ত হয়—সামনের দিকে পুরনো নম্বর বহাল থাকে এবং পিছনের অংশ ৮ নম্বর জগন্নাথ সুর লেন হয়। সামনের অংশ রামকৃষ্ণ মিশনকে দান করে দেওয়া হয়। রামকৃষ্ণ মিশন বাড়িটি নিলামে বিক্রি করেন। এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে আশুতোষ রায় বাড়িটি নিলামে কিনে নেন। বড়বাজারে তাঁর সূতার কারবার ছিল। বর্তমানে বাড়িটি তাঁর উত্তরপুরুষদের অধিকারে আছে।

৮ নম্বর জগন্নাথ সুর লেনের অংশ পুনরায় দু'ভাগে বিভক্ত হয়—৮/১ ও ৮/২, জগন্নাথ সুর লেন। ঈশ্বরচন্দ্র মিত্রের কনিষ্ঠ পুত্রের জামাই ডাঃ আদিত্য বসুমল্লিক এই বাড়ি দুটির মালিক হন। ডাঃ বসুমল্লিক চিকিৎসা ব্যবসার ফাঁকে ফাঁকে সমাজসেবাও করতেন। তিনি একসময়ে এই পল্লীতে অবস্থিত মাতৃজাতি সেবক সমিতি নামে বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পাদক ছিলেন।

কলিকাতা পুরসভা তাঁদের ১০ মে ১৯৫৭ সালের অধিবেশনে ঈশ্বর মিত্রের নামে তাঁর বাসভবনের পিছন দিকের অনামী গলিটির নাম 'ঈশ্বর মিত্র লেন' নামকরণ করেন। ফলে আদিত্য বসুমল্লিকের বাড়ির ক্রমিক সংখ্যা পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়ায় ১ ও ২ নং ঈশ্বর মিত্র লেন।

মসজিদ বাড়ি স্ট্রিটের গুহ পরিবার অতি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বংশ। এঁদের বৈশিষ্ট্য হল, একদিকে যেমন বংশ পরম্পরায় বাঙালিদের ব্যায়াম চর্চায় লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছেন অন্য দিকে এই পরিবারের এক সুসন্তান মল্লক্রীড়ায় ইউরোপ ও আমেরিকার মল্লবীরদের পরাজিত করে ভারতের গৌরব বাড়িয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, এই পরিবার সঙ্গীতেরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কাজেই গুহ পরিবারের ইতিহাস যেমন আকর্ষণীয় তেমনি চমকপ্রদ।

যশোহরের মহারাজা প্রতাপাদিত্যের পূর্বপুরুষ দশরথ গুহ এই বংশের আদি পুরুষ। আনুমানিক ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে কৃষ্ণরাম গুহ (১৭৪০-৮০) যশোর জেলার ইচিন্দা গ্রাম থেকে ব্যবসা উপলক্ষে কলিকাতায় আগমন করেন। তাঁর পুত্র ব্রজরাম গুহ ১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দে মসজিদ বাড়ি স্ট্রিটের অনতিদূরে বৃন্দাবন বসু লেনে নিজ বাসভবন নির্মাণ করেন। ব্রজরাম গুহের তৃতীয় পুত্র শিবচরণের জন্ম ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে। শিবচরণের মাধ্যমে (১৭৯৩-১৮৭৪) গুহ বংশের সমৃদ্ধি ও প্রতিষ্ঠা লাভ হয়। কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের বেনিয়ান হবার পরে তিনি নিজেই একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এই ব্যবসা থেকে তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে শিবচরণ বৃন্দাবন বসু লেনে শিবমন্দির এবং ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে তৎসংলগ্ন একটি কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই দেবালয় শিবু গুহের কালীবাড়ি বলে খ্যাত। তিনি ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সভার সদস্য এবং কলিকাতা পৌরসভার একজন জাস্টিস অফ পিস ছিলেন। ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে তিনি মসজিদ বাড়ি স্ট্রিটে সুবৃহৎ বাসভবন নির্মাণ করেন এবং বৃন্দাবন বসু লেনের আবাস ছেড়ে নতুন ভবনে উঠে আসেন। পরবর্তীকালে গুহ পরিবারের আদি ভবন বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হয়, যথা—৬৫, ৬৬, ৬৬/১, ৬৭, ৬৮, মসজিদ বাড়ি স্ট্রিট। পরে এঁরা এই রাস্তার উপর অবস্থিত অনেকগুলি বাড়ির অধিকারী হয়েছিলেন।

শিবচরণের দুই পুত্র—অভয়চরণ ও তারাচরণ। অভয়চরণ (১৮২১-১৮৯৮) পিতার মতো ব্যবসায়ে সমৃদ্ধি লাভ করেন। তিনি সাতটি বিলিতি অফিসের মুৎসুদ্দি ছিলেন। লোকহিতার্থে বঙ্গের নানা স্থানে পিতার নামে জলাশয় প্রতিষ্ঠা, সাধারণের স্নান ও পূজাদির জন্য বরানগরে গঙ্গার তীরে 'গুহ ঘাট' এবং কাশী মিত্র ঘাট সংলগ্ন গঙ্গাযাত্রীদের জন্য বিশ্রামভবন নির্মাণ করেছিলেন।

কলিকাতা পুরসভা ১৯৩১ সালে হরি ঘোষ স্ট্রিট ও কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের মধ্যে সংযোগকারী নতুন একটি রাস্তা নির্মাণ করেন। রাস্তাটি ৪০ ফুট প্রশস্ত। অঞ্চলটি সে সময় হোগলকুড়িয়া নামে পরিচিত ছিল। অভয় গুহের পৌত্র সত্যচরণ গুহ রাস্তা নির্মাণের জন্য কলিকাতা পুরসভাকে ৪ কাঠা ৬ ছটাক জমি বিনামূল্যে দান করেন। নব-নির্মিত রাস্তার ধারে অবস্থিত অনেকগুলি ভবন গুহ পরিবারের ছিল। কলিকাতা পুরসভা অতঃপর তাঁদের ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৩১ সালের অধিবেশনে নব-নির্মিত রাস্তাটি 'অভয় গুহ রোড' নামকরণ করেন।[১৫]

অভয়চরণের দুই পুত্র—ভবানীচরণ ও অম্বিকাচরণ। ভারত বিখ্যাত মল্লবীর অম্বিকাচরণ

(১৮৪৩-১৯০০) সাধারণের নিকট অম্বুবাবু বা রাজাবাবু বলে পরিচিত। সেকালের ভারতবিখ্যাত মল্লবীরদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়ে অম্বু বা রাজাবাবু নামে খ্যাত হন। ৮/৯ বছর বয়সে সাংঘাতিক আঘাত পেয়ে ডাক্তারের পরামর্শানুসারে বাড়িতে পড়াশোনা শুরু করেন। অধ্যয়নের ফাঁকে ফাঁকে ব্যায়াম চর্চা ও ঘোড়ায় চড়া শুরু করেন। কুস্তি শিক্ষা করেন মথুরার কালীচরণ চৌবের কাছে। পিতামহ শিবচরণের উৎসাহে নিজ বাড়ি ৬৬নং মসজিদ বাড়ি স্ট্রিটে ১৮৫৭ সালে কুস্তির আখড়া স্থাপন করেন। মল্লবিদ্যায় যুবক নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ) ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় তাঁর শিষ্য ছিলেন। অম্বিকাচরণের উৎসাহে সেকালের শিক্ষিত বাঙালি সমাজ ব্যায়ামে উৎসাহী হয়েছিলেন। তাঁর দৃষ্টান্তে ও অনুপ্রেরণায় সেকালের কলিকাতায় বেশ কয়েকটি অভিজাত পরিবারের বাসভবনে কুস্তির আখড়া তৈরি হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, পাইকপাড়ার লালাবাবুর বাড়ি, ঝামাপুকুরের মিত্রভবন প্রভৃতি। কুস্তি ছাড়াও আরও নানা গুণের সমাবেশ অম্বিকাচরণের চরিত্রে দেখা যায়। তিনি ছিলেন একজন সৌখিন সেতার শিল্পী। সুদক্ষ অশ্বারোহী হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল।

অম্বিকাচরণের ছয় পুত্রের মধ্যে হরিচরণ বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। লালবাজার স্ট্রিটের উপর অবস্থিত মার্কেনটাইল বিল্ডিংস নামে সুবৃহৎ সৌধ তাঁরই উদ্যোগে নির্মিত হয় এবং তিনি এর একমাত্র মালিক ছিলেন। এ বাড়িতে বেরিনী কোম্পানির যে ওষুধের দোকান ছিল তাই কলিকাতায় আদি ও প্রধান হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়।

অপর পুত্রদ্বয় ক্ষেত্রচরণ ও রামচরণ উভয়েই পিতার নিকট মল্লবিদ্যা শিক্ষা করেন। ক্ষেত্রচরণ পাশ্চাত্য মল্লবিদ্যার কয়েকটি কৌশল দেশীয় মল্লবিদ্যায় প্রবর্তন করে এর যথেষ্ট উন্নতিসাধন করেন। রামচরণের একমাত্র পুত্র যতীন্দ্রচরণ (১৮৯২-১৯৭২) সাধারণের কাছে গোবর গুহ নামে খ্যাত। তিনি ছিলেন ভীষণ মোটাসোটা। পিতামহ অম্বিকাচরণ নাতিকে আদর করে গোবর বলে ডাকতেন। তিনিই ছিলেন তাঁর কুস্তি জীবনের প্রেরণার উৎস। ব্যায়াম চর্চা শুরু হয় পিতামহ অম্বিকাচরণের কাছে। পরে জ্যাঠামশাই ক্ষেত্রচরণের কাছে কুস্তি শিখতে আরম্ভ করেন। ক্ষেত্রচরণের অকাল মৃত্যুতে পিতার কাছে কিছুদিন মল্লবিদ্যা শিক্ষা করেন। তারপর গুহবাড়ির মাহিনা করা ভারতবিখ্যাত পালোয়ান খোলসা চৌবে, রহমনী পালোয়ান, বাগলা খলিফা প্রমুখের কাছে শিক্ষায় তাঁর নাম সৌখিন পালোয়ান মহলে ছড়িয়ে পড়ে।

৬ ফুট ১ ইঞ্চি লম্বা, ৪৮ ইঞ্চি বুকের ছাতি ও ২৯০ পাউন্ড ওজনের দুর্লভ স্বাস্থ্যশ্রীর অধিকারী এই বঙ্গবীরের পেশাদারি কুস্তি অভিজ্ঞতা শুরু ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে। গোবর গুহর প্রথম কুস্তির লড়াই হয় পঞ্জাবের নাওরাং সিং-এর সঙ্গে। তিনি ছিলেন ত্রিপুরা মহারাজার পালোয়ান। জয়-পরাজয় অমীমাংসিত থাকে। এর পর তিনি কয়েকবার ইউরোপ সফরে যান। ১৯১২ সালে ইংল্যান্ডে গিয়ে ব্রিটিশ এম্পায়ার চ্যাম্পিয়নশিপ ও ইউরোপীয়ান চ্যাম্পিয়ানশিপ প্রতিযোগিতায় যোগ দেন। ১৯১৩ সালের ২৭ আগস্ট স্কটল্যান্ডের চ্যাম্পিয়ন জিমি ক্যাম্বেলকে (Jimmy Cambell) পরাজিত করে স্কটিশ চ্যাম্পিয়ন হন।

এরপর শুধু একটির পর একটি জয়ের পালা—ব্রিটিশ এম্পায়ার চ্যাম্পিয়ানশিপে জনি এসেন (Johny Essen)-এর সঙ্গে এডিনবরায় প্রতিযোগিতায় নামলেন। ৩৫ মিনিটের মধ্যে তিনি জনিকে পরাজিত করেন। কিন্তু বিচারকের হঠকারিতায় পুনরায় জনির সঙ্গে লড়াইতে নামতে হয়। এবারেও বিজয়লক্ষ্মী বরমাল্য তাঁর গলায় পরিয়ে দিলেন। গোবরবাবু হলেন ব্রিটিশ এম্পায়ার চ্যাম্পিয়ান।

ইংল্যান্ডের পর ১৯১৪ সালে গোবরবাবু এলেন ফ্রান্সের প্যারি নগরীতে। ওই বছরে প্যারি নগরীর বিশ্বপ্রদর্শনী ও অন্যান্য কয়েকটি স্থানে জো স্টেচার, জিবিস্কো, জিমি লন্ডার্স, টনি ড্রাক প্রমুখ নামীদামি কুস্তিগীরদের অনায়াসে পরাজিত করেন। এরপর প্রথমে বেলজিয়াম চ্যাম্পিয়ান হ্যানসন (Hanson) এবং জার্মানির শ্রেষ্ঠ মল্লবীর কার্ল স্যাফ্‌ট (Carl Saft)-কে পরাজিত করে ইউরোপ-বিজয়ী মল্লবীরের সম্মান লাভ করেন।

১৯২০ খ্রিস্টাব্দে তৃতীয়বার বিদেশ সফরে যান এবং প্রায় সাড়ে ছয় বছর ওই সব দেশে অবস্থান করে ইউরোপ ও আমেরিকার মল্লবীরদের পরাজিত করে বিপুল যশ ও অর্থ লাভ করেন।

স্কটল্যান্ডের প্রসিদ্ধ মল্লবীর সিমিত্রসনকে পরাজিত করেন। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে ২৪শে আগস্ট তিনি তৎকালীন পৃথিবীর লাইট হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ান Ed. Strangler Lewis-কে সানফ্রান্সিসকো শহরে পরাজিত করে পৃথিবীর লাইট হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন আখ্যা লাভ করেন।

বিদেশে বহু মল্লপ্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করলেও তুলনায় এদেশে গোবরবাবুর প্রতিযোগিতার সংখ্যা কম। এর প্রধান কারণ, যৌবনের অধিকাংশ সময় তিনি বিদেশে অতিবাহিত করেছেন। ভারতেও তিনি কয়েকটি লড়াইতে অংশ নিয়েছিলেন। তার মধ্যে গনপু ও ছোট গামার সঙ্গে মল্লপ্রতিযোগিতা উল্লেখ্য। প্রথম জনের সঙ্গে লড়াইতে কোনও মীমাংসা হয়নি। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে পার্ক সার্কাস কংগ্রেস মণ্ডপে ছোট গামার সঙ্গে লড়াই-এর সময় গোবরবাবু হঠাৎ দড়ির ওপর পড়ে যান। ছোট গামা তখন গোবরবাবুকে পরাজিত করেছেন বলে দাবি করেন। মল্লযুদ্ধের দুই বিচারক মুর্শিদাবাদের নবাব এবং সূর্যকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এই মল্লযুদ্ধ পুনরায় অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ইতিমধ্যে এই জয়-পরাজয় নিয়ে এমন এক বিতর্ক সৃষ্টি হয় যার ফলে গোবরবাবু পুনরায় মল্লযুদ্ধের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এর কিছুদিন পরে মাত্র ৩৭ বছর বয়সে মল্ল প্রতিযোগিতা থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

কুস্তি জীবন থেকে অবসর নিয়ে শিক্ষিত বাঙালি যুব সমাজের শরীর গঠনের দিকে মনোনিবেশ করেন গোবরবাবু। ১৯৩৬ সালে ১৯নং গোয়াবাগান স্ট্রিটে স্থাপন করেন তাঁর বিখ্যাত ব্যায়ামাগার। তাঁর প্রদর্শিত মল্লশিক্ষা অনুসরণে তৈরি হয়েছিল একদল বিখ্যাত মল্লবীর যাঁরা এককালে ভারতবিখ্যাত হয়েছিলেন। কবি সুধীন দত্ত এক সময় গোবরবাবুর আখড়ায় ব্যায়াম চর্চা করেছিলেন। মল্লক্রীড়া জগতের এই প্রাণপুরুষ তাঁর নিজ আখড়ার মাটিতেই ১৯৭২ সালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠানের উজ্জ্বল দীপশিখাটি তাঁর তিন পুত্র রতনচরণ, মানিকচরণ (প্রয়াত) ও জহর আজও প্রজ্জ্বলিত রেখেছেন।

পিতামহ অম্বিকাচরণের মতো গোবরবাবুর চরিত্রেও বহুগুণের সমন্বয় ঘটেছিল। বিখ্যাত লাঠিয়াল অতুলচন্দ্র ঘোষের কাছে বছর তিনেক লাঠি খেলা শিখেছিলেন। সঙ্গীতের প্রতি ছিল তাঁর গভীর অনুরাগ। ভারতবিখ্যাত রেওয়াজি সরোদবাদক ওস্তাদ কৌকব খাঁ ও করমতউল্লার কাছে তালিম নিয়েছিলেন একসময়। তাঁর ৫২ নম্বর বিডন রো-এর বাড়িতে যেমন অনেক উঁচুদরের গানবাজনার আসর বসেছে, তেমনি অনেক সঙ্গীতজ্ঞদেরও পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন।

অম্বিকাচরণের আরেক পৌত্র (সত্যচরণের পুত্র) শ্রীশচন্দ্র (১৮৯০-১৯৪৮) কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি গ্রহণ করার পর ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে সিঙ্গাপুরে গিয়ে আইন ব্যবসা শুরু করেন এবং ব্যবহারজীবীরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। বহির্বিশ্বে যে মুষ্টিমেয় বঙ্গসন্তান কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁদের মধ্যে শ্রীশচন্দ্র অন্যতম। আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল তাঁর। তিনি ছিলেন সিঙ্গাপুরের ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি। তাঁর সম্বন্ধে জানার আগ্রহ হওয়াই স্বাভাবিক।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে ১৯২৭ সালে মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং ইন্দোচিনে ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। সে সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিশ্বভারতীর কলাভবনের সহকারী অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ কর, ওই কলাভবনের শিক্ষক ও ত্রিপুরা মহারাজার আত্মীয় বীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেবশর্মা এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। এই ভ্রমণের ওপর সুনীতিকুমার এক তথ্যসমৃদ্ধ পুস্তক রচনা করেছিলেন। ওই পুস্তক থেকে জানতে পারি রবীন্দ্রনাথ ২৭ জুলাই ১৯২৭ সালে সকালবেলায় জাহাজে মালাক্কা শহরে এসে পৌঁছান। কবিকে স্বাগত অভ্যর্থনা জানাতে জাহাজঘাটে এসেছিলেন স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার ডড্‌স (Mr. Dodds) আর মালাক্কার অধিবাসীদের তরফ থেকে মালাক্কার লব্ধপ্রতিষ্ঠিত আইনজীবী শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র গুহ। সুনীতিকুমারের লেখা থেকে শ্রীশচন্দ্র সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন, "মালাক্কায় প্রথম দেখলুম কতকগুলি বাঙালি ব্যারিস্টার, বিদ্যাবুদ্ধিতে, চারিত্র্যে স্থানীয় তামিল, চীনা, মালাই, ইউরোপীয়দের মধ্যে বেশ সম্মানজনক স্থান একটু করে নিতে পেরেছেন। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র গুহ কলিকাতার বিখ্যাত গুহ পরিবারের বংশধর। এঁরই এক ভ্রাতুষ্পুত্র হচ্ছেন স্বনামধন্য বিখ্যাত বলী

গোবর গুহ। এঁরা নিজ পদবী ইংরেজিতে Goho রূপে লেখেন। এখানে ইনি একটি এর্টনী আর ব্যারিস্টারের অফিসের মালিক। কয়েক বৎসর পূর্বে ইনি এক চীনা ব্যবহারজীবীর কাজে, অংশীদার হয়ে এদেশে আসেন। এখন তাঁর অংশীদারের অবর্তমানে সমস্ত ব্যবসা এঁর হাতে এসেছে। মালাক্কার আশেপাশে আরও কতকগুলি ছোট ছোট শহরে এঁর অফিস আছে। যখন জজেরা শহর থেকে শহরে ঘুরে ঘুরে বিচার করে বেড়ান, তখন ৬০/৭০/১০০/১৫০ মাইল পর্যন্ত দিনে মোটরে ঘুরে ঘুরে এঁকেও কেস করে বেড়াতে হয়।" সুনীতিবাবুর লেখা থেকে আরও জানা যায় যে শ্রীশচন্দ্র কতকগুলি বাঙালি ব্যারিস্টারকে দেশ থেকে আনিয়ে এই অঞ্চলে বসিয়েছেন। এঁরা হলেন বরেন্দ্র বসু, শচীন্দ্রনাথ দত্ত, সুধীর দাস প্রমুখ।

এখানেই শেষ নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে জাপান কর্তৃক সিঙ্গাপুর অধিকৃত হবার ঠিক পূর্বে ব্রিটিশ সরকার শ্রীশচন্দ্রকে সিঙ্গাপুরে ভারত সরকারের এজেন্ট নিযুক্ত করেন। সে সময় তিনি "The Central Indian Association of Malaya"-এর সহ-সভাপতি ছিলেন। জাপানিদের সিঙ্গাপুরের আক্রমণের সময় শ্রীশচন্দ্র ভারতীয় নারী ও শিশুদের রক্ষার জন্য যেভাবে সাহায্য করেছিলেন, তাঁর সেই কর্মকুশলতার ভূয়সী প্রশংসা করে সিঙ্গাপুর থেকে স্টেট সেটেলমেন্টের গভর্নর Sir S. Thomas ভারত সরকারকে যে তারবার্তা পাঠিয়েছিলেন তা ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪২ সালে হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড দৈনিক পত্রিকায় এইভাবে প্রকাশিত হয়েছিল :

"I have much pleasure in bringing to the notice of the Government of India the valuable services rendered by Mr. S.C. Goho of Singapore in the evacuation of Indian women and children and the fine example of courage and determination which he has set to his countrymen and indeed to us all."

সিঙ্গাপুরের ওপর জাপানি আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সিঙ্গাপুরবাসীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা না করে সে দেশ ত্যাগ করেন। শ্রীশচন্দ্র ব্রিটিশ সরকারের এই প্রকারের ব্যবহারে বিশেষ ক্ষুব্ধ হন। পরে জাপানিরা তাঁকে সাইগনে নিয়ে গেলে সেখানকার বেতার থেকে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করে বক্তৃতা দেন। সে সময় জাপানিরা কলিকাতাকে বোমায় বিধ্বস্ত করার এক পরিকল্পনা গ্রহণ করে। বিষয়টি পূর্ব থেকে আঁচ করে শ্রীশচন্দ্র জাপানি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে এই ধ্বংসাত্মক পরিকল্পনা রূপায়ণে বিরত থাকার জন্য বিশেষ চাপ সৃষ্টি করেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা কিছুটা সফল হয়।[১৬] ১৯৪৫ সালে জাপানিদের পরাজয়ের পর ২২ অক্টোবর ১৯৪৫ সালে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করে তাঁর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনেন। সিঙ্গাপুরের একটি বিশেষ আদালতে তাঁর বিচারের ব্যবস্থা হয়। তাঁকে সিঙ্গাপুরের পার্ল হিল (Pearl Hill) জেলে রাখা হয়। শ্রীশচন্দ্রের গ্রেপ্তারের খবর ভারতে পৌঁছলে জনমানসে তুমুল আলোড়ন ওঠে। শরৎচন্দ্র বসু, জওহরলাল নেহরু প্রমুখ ভারতীয় নেতৃবৃন্দ তাঁর মুক্তির জন্য তীব্র আন্দোলন শুরু করেন। পরে মহাত্মা গান্ধীর হস্তক্ষেপে তিনি বিনাশর্তে মুক্তি পান।

শ্রীশচন্দ্র নেতাজি সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ বাহিনীকে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। ১৯৪৫ সালে সুভাষচন্দ্রকে 'কুইস্‌লিং' প্রতিপন্ন করার জন্য ভারতের একটি রাজনৈতিক দল ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে যখন হাত মিলিয়েছিল, সেই সময় শ্রীশচন্দ্র সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে 'সিলোন অবজার্ভার' পত্রিকার সমর সংবাদদাতার কাছে যে মন্তব্য করেছিলেন ৫ আশ্বিন ১৩৫২ সনের আনন্দবাজার পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় এইভাবে প্রকাশিত হয়েছিল—"কলম্বো ২১শে সেপ্টেম্বর : শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু কুইসলিং ছিলেন না, তাহার স্বদেশপ্রেম তীব্র ও অকপট ছিল। তিনি ব্রিটিশবিরোধী ছিলেন বটে, কিন্তু জাপানেরও পক্ষপাতী ছিলেন না, তবে ভারতবর্ষে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য জাপানকে একটি প্রধান শক্তি হিসাবে ব্যবহার করিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন ; ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য চরম পন্থা অবলম্বন করিতে মহাত্মা গান্ধীর মত কুণ্ঠিত ছিলেন না ; সিঙ্গাপুরের যুদ্ধপর্বে বিশিষ্ট ব্যবহারজীবীদের অন্যতম মিস্টার শ্রীশচন্দ্র গুহ এরূপ মত পোষণ করেন বলিয়া সিলোন অবজার্ভার পত্রের সিঙ্গাপুরের সমর সংবাদদাতা জানাইয়াছেন।"

১৯৪৮ সালে সিঙ্গাপুরের প্রথম ব্যবস্থাপক সভায় তিনি বিপুল ভোটে জয়লাভ করে জনপ্রতিনিধি

নির্বাচিত হন। ওই বছরেই কিছুদিনের জন্য তিনি তাঁর স্বদেশভূমি কলিকাতায় আসেন। ২৪ জুলাই ১৯৪৮ সালে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যান।

অম্বিকাচরণের অন্য এক পৌত্র সুধীরচন্দ্র ছিলেন সারমেয় বিশেষজ্ঞ। ৬৮এ, মসজিদ বাড়ি স্ট্রিটের একতলা বাড়িতে বিলিতি কুকুর রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর শিক্ষাপ্রাপ্ত বহু কুকুর Governor's Cup, মেডেল প্রভৃতি বহুবিধ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিল। সেকালের কলিকাতার দেশি বিদেশি বহু সারমেয়প্রেমী সুধীরচন্দ্রের বাড়িতে সমবেত হতেন।[৯৭]

প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী, লেখক এবং তন্ত্রাভিলাষী প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৮৫-১৯৭৯) এক সময় ৭১ নম্বর মসজিদ বাড়ি স্ট্রিটে বাস করতেন। তার আগে ২২ নম্বর চাষা ধোপা পাড়া স্ট্রিটে (এখন গিরিশ পার্ক নর্থ) থাকতেন। ১৯১৯ সালে এই বাড়ি থেকে মসজিদ বাড়ি স্ট্রিটের বাড়িতে উঠে আসেন।

প্রমোদকুমারের জন্ম কলিকাতায়। পিতা রাজেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়। প্রমোদকুমার সরকারি আর্ট কলেজের কৃতী ছাত্র ছিলেন। পরে কিছুকাল বরোদা আর্ট কলেজে অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁর আঁকা উল্লেখযোগ্য চিত্রাবলীর মধ্যে ঊষা ও বরুণ, হর পার্বতী, শিবনৃত্য, চন্দ্রশেখর, মনসা প্রভৃতি প্রধান। এক সময় তিনি অন্ধ্র কলা বিদ্যালয়েরও অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। শিল্পীজীবনের বাইরে তন্ত্রের গূঢ় রহস্য এবং তান্ত্রিকের সন্ধানে এক বিচিত্র যাযাবর জীবনযাপন করেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে ভারত ও তিব্বতের বহু দুর্গম স্থানে ভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর বিচিত্র জীবনের অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ কাহিনীগুলি তাঁর শক্তিশালী লেখনীতে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। এদের মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত 'তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ' বইটি। এর পরের বিখ্যাত পুস্তকটি "হিমালয় পারে কৈলাস ও মানস সরোবর"। এ ছাড়াও তাঁর রচিত আরও কয়েকটি গ্রন্থ আছে। চিত্রশিল্পে তার অবদানের জন্য তাঁকে অ্যাকাডেমি পুরস্কার দেওয়া হয়। ১৯৫৩ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত পণ্ডিচেরি আশ্রমে ছিলেন।[৯৮]

শৈলেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমোদকুমারের আরেক ভ্রাতা। সঙ্গীতে ছিল তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি। তাঁরই প্রেরণায় তাঁর কন্যা মীরা চট্টোপাধ্যায় (পরে বন্দ্যোপাধ্যায়) তাঁরই কাছে সঙ্গীতশিক্ষা শুরু করেন। পরবর্তীকালে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতশিল্পী রূপে সর্বসাধারণের কাছে পরিচিতা হন।

প্রায় বছর পনেরো মসজিদ বাড়ি স্ট্রিটের বাড়িতে থাকার পর প্রমোদ চট্টোপাধ্যায় টালিগঞ্জে বাড়ি করে চলে যান। পরবর্তীকালে এই বাড়িটি কিনে নেন লব্ধপ্রতিষ্ঠিত হোমিও চিকিৎসক সন্তোষকুমার দাস। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাশাস্ত্রে এম. বি. উপাধিধারী। মহাভারতের অনুবাদক কালীপ্রসন্ন সিংহের পুত্র বিজয় সিংহের সান্নিধ্যে আসেন সন্তোষকুমার। সেকালের কলিকাতায় বিজয় সিংহ একজন সম্মানীয় হোমিও চিকিৎসক ছিলেন। সন্তোষ দাস বিজয় সিংহের হোমিও চিকিৎসায় অনুপ্রাণিত হয়ে অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা ত্যাগ করেন এবং সম্পূর্ণভাবে হোমিও চিকিৎসায় আত্মনিয়োগ করেন। এতে তিনি প্রভূত প্রতিষ্ঠা ও বিপুল অর্থ উপার্জন করেন। এক সময় তিনি ভারত প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের চিকিৎসক নিযুক্ত হয়েছিলেন। বর্তমানে তাঁর পুত্র সমীর দাস হোমিও চিকিৎসায় নিয়োজিত আছেন।

শিক্ষাব্রতী, খ্যাতিমান সাংবাদিক, ভারতীয় সংসদের প্রবীণ সদস্য চপলাকান্ত ভট্টাচার্য (১৯০১-১৯৮৯) এই মসজিদ বাড়ি স্ট্রিটে আমৃত্যু বসবাস করেছিলেন। তিনি বাংলা দেশের এক সংস্কৃত অধ্যাপক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা কালীকান্ত ভট্টাচার্য একজন খ্যাতনামা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। চপলাকান্তের শিক্ষাজীবন প্রথম থেকেই কৃতিত্বপূর্ণ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. পরীক্ষাতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। পরবর্তীকালে আইন পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হন। অনেকগুলি ভাষায় তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল। ১৯২১ সালে গান্ধীজির আহ্বানে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। ছাত্রজীবনে তিনি নেতাজির সংস্পর্শে আসেন।

চপলাকান্তের সাংবাদিক জীবন খুবই উজ্জ্বল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ প্রতিষ্ঠিত দৈনিক ফরোয়ার্ড পত্রিকায় তাঁর সাংবাদিক জীবন শুরু। পরবর্তীকালে সুরেশ মজুমদারের মাধ্যমে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রবেশ করেন এবং ১৯৪৪ থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত ওই পত্রিকায় সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পরে আনন্দবাজার পত্রিকা ছেড়ে জনসেবক পত্রিকার সম্পাদক হন। কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা শিক্ষার প্রবর্তনে তিনি অগ্রণী ছিলেন এবং প্রথম থেকেই অবৈতনিক সেক্রেটারিরূপে ওই বিভাগটি পরিচালনা করেন। ১৯৬১ ও ১৯৬৩ সালে নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সঙ্ঘের সভাপতির পদ অলংকৃত করেছিলেন। ১৯৫৭ সালে ভারতীয় সংসদে নির্বাচিত সদস্য হন এবং ১৯৭১ পর্যন্ত ওই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় চপলাবাবু কতগুলি গ্রন্থও রচনা করেছিলেন—তার মধ্যে 'র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদের বিচার' একটি গবেষণাগ্রন্থ হিসাবে উল্লেখের দাবি রাখে। সংস্কৃত ভাষা ও ভারতীয় সংস্কৃতির তিনি ছিলেন একজন প্রধান প্রবক্তা।

৮৫বি, মসজিদ বাড়ি স্ট্রিটে ছিল তাঁর নিজস্ব বাসভবন। মসজিদ বাড়ি স্ট্রিটের অংশবিশেষ নিয়ে হেমেন্দ্র সেন স্ট্রিট নতুন নামকরণ হলে বাড়িটির নম্বরের পরিবর্তন ঘটে। নতুন নম্বর হয় ২৪এ, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রিট।

বাংলা সাহিত্যের খ্যাতনামা গবেষক, গ্রাম বাংলার লুপ্তপ্রায় অপ্রকাশিত প্রাচীন বাংলা পুথি সংগ্রাহক দীনেশচন্দ্র সেন (১৮৬৬-১৯৩৯) এক সময় তাঁর মাতুলালয় ৮৫/২, মসজিদ বাড়ি স্ট্রিটের বাড়িতে চিকিৎসার জন্য আসেন। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' রচনার পর তিনি দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। তাঁর দুই মামা, চন্দ্রমোহন সেন ও শ্রীমোহন সেন, মসজিদ বাড়ি স্ট্রিটের এই বাড়িটি ভাড়া করে বাস করতেন। এই প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র লিখেছেন, "এইভাবে কলিকাতায় ৮৫/২, মসজিদ বাড়ি স্ট্রিটে মাতুলালয়ে আসিয়া পড়িলাম। বাড়িখানি বেশ বড় এবং এত সুন্দর যেন একখানা ছবির ন্যায়। উপরকার হলটি মারবেল দেওয়া, নানারূপ আসবাবপূর্ণ, সেই ঘরে স্থান পাইলাম, মাতুল চন্দ্রমোহন ও শ্রীমোহন তখন উভয়েই কলিকাতায়, তখন তাঁহাদের ঋণ দশ লক্ষ টাকার উপরে উঠিয়া সর্বস্ব যায় যায়। যেন ভরা গাঙে ঝড় উঠিয়াছে, নৌকাখানি ডুবুডুবু।"

দীনেশ সেন যখন মসজিদ বাড়ি স্ট্রিটের মাতুলালয়ে চিকিৎসার জন্য এসেছিলেন, সে সময়ে কলিকাতার খ্যাতিমান লেখকেরা আসতেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। তাঁরা হলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, 'গীতায় ঈশ্বরবাদ' প্রণেতা হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, 'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক সুরেশ সমাজপতি, 'বিশ্বকোষ' প্রণেতা নগেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ। কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের উপর অবস্থিত সেন্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুলের অধ্যক্ষ ক্ষুদিরাম বসু দীনেশচন্দ্রকে ওই কলেজের উপরের শ্রেণীতে ইংরেজি সাহিত্য পড়ানোর জন্য নিযুক্ত করতে চেয়েছিলেন। স্বাস্থ্যের কারণে এই পদ গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। দেড় মাস মামার বাড়িতে থাকার পর পৃথক একটি ভাড়া বাড়িতে থাকা মনস্থ করলেন। সেই মতো মাসিক ২২ টাকা ভাড়ায় ১৪ নম্বর, রাজাবাগান জংশন রোডের ভাড়া বাড়িতে উঠে গেলেন।[১১]

১০০ নম্বর মসজিদ বাড়ি স্ট্রিটে বাস করতেন বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের প্রথম মহিলা নৃত্য পরিচালিকা ও নৃত্যগীত পটীয়সী অভিনেত্রী কুসুমকুমারী। মিনার্ভা থিয়েটারে তিনি প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। 'আলিবাবা' গীতিনাট্যে মর্জিনার ভূমিকায় নৃত্যগীত ও অভিনয়ে অসামান্য কৃতিত্ব দেখান। গিরিশচন্দ্র রচিত 'অভিশাপ' নাটকাভিনয়ে (১৯০১) নৃত্য পরিচালনা করেন। তিনি থিয়েটারের প্রথম নারী নৃত্যশিক্ষিকা। কুসুমকুমারীর অভিনীত অন্যান্য বিখ্যাত ভূমিকা : ভ্রমর নাটকে ভ্রমর, সরলা নাটকে সরলা, প্রতাপাদিত্যে ফুলমণি। এ ছাড়াও গ্রান্ড, স্টার, কোহিনুর প্রভৃতি নাট্যমঞ্চের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কুসুমকুমারী। ১৯ নভেম্বর ১৯৪৮ সালে তিনি পরলোকগমন করেন।

কবি ও সাংবাদিক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯) এই মসজিদ বাড়ি স্ট্রিটে বাস করতেন। তিনি যে বাড়িতে বাস করতেন আজ তা খণ্ডিত হয়ে ১০১এ, বি, সি এবং ১০৭/১এ এবং ১০৭/১বি, মসজিদ বাড়ি স্ট্রিট হয়েছে। এখন যে বাড়ির নম্বর ১০১এ, সেখানে তাঁর ছাপাখানা প্রভাকর প্রেস প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং সেখান থেকেই 'সংবাদ প্রভাকর' প্রকাশিত হত। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে সংবাদ প্রভাকরে কবিতা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাহিত্যচর্চায় ব্রতী হন। মসজিদ বাড়ি স্ট্রিটের এই বাড়িতে বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদনের মতো কবি ও সাহিত্যিকবৃন্দ ঈশ্বর গুপ্তের কাছে প্রায়শই আসতেন।

ঈশ্বরচন্দ্র সারা জীবনে মোট চারটি পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ (১৮০৫-৬৭)-এর উৎসাহে ও আনুকূল্যে ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে ২৮ জানুয়ারি

'সাপ্তাহিক সংবাদ প্রভাকর' প্রকাশিত হয়। ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে ঈশ্বরচন্দ্র এর সম্পাদনার ভার ত্যাগ করেন। ২ আগস্ট ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে আন্দুলের জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক 'সংবাদ রত্নাবলী' বার করেন। মহেশচন্দ্র পাল ছিলেন নামমাত্র সম্পাদক। ঈশ্বরচন্দ্রই এর লিপিকর্ম করতেন। কিছুকাল পরে এই কাজ ছেড়ে তিনি পুরী যাত্রা করেন। প্রায় তিন বছর বাদে ফিরে এসে পাথুরিয়াঘাটার কানাইলাল ঠাকুরের চেষ্টায় ১০ আগস্ট ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে সংবাদ প্রভাকরের পুনঃ প্রকাশ করেন। ১৪ জুন ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে পত্রিকাটি দৈনিকে পরিণত হয়। ঈশ্বরচন্দ্রের তৃতীয় পত্রিকা 'পাষণ্ড পীড়ন' (২০ জুন ১৮৪৬)। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের 'রসরাজ' পত্রিকার সঙ্গে কবিতা যুদ্ধ চালাবার জন্যই এই পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় চতুর্থ পত্রিকা 'সংবাদ সাধুরঞ্জন', শেষের দুটি পত্রিকাই ছিল সাপ্তাহিক।

বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বরচন্দ্র যুগসন্ধির কবি বলে সুপরিচিত। তিনি বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনে খণ্ড কবিতা রচনার আদর্শ প্রবর্তন করেন। ব্যঙ্গ বিদ্রূপই ছিল তাঁর রচনারীতির বিশেষত্ব। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। যা শুনতেন তা সহজে আয়ত্ত করতে পারতেন। ভাষা ও ছন্দের উপর তাঁর অধিকার ছিল বিস্ময়কর, 'বোধেন্দু বিকাশ' নাটকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ঈশ্বরচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি ভারতচন্দ্র, নিধুবাবু ও কবিওয়ালাদের লুপ্তপ্রায় জীবনী উদ্ধার। তাঁর দ্বিতীয় কীর্তি—বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু মিত্র, রঙ্গলাল প্রমুখ ভবিষ্যৎ লেখকদের প্রস্তুত করা। ঈশ্বরচন্দ্রের কাব্যরীতি অনুসৃত না হলেও বাংলা সাহিত্যের জন্য তাঁর গঠনমূলক অবদান চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।[১০০]

ঈশ্বরচন্দ্রের দৌহিত্র মনীন্দ্র গুপ্ত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহী-সন্ন্যাসী শিষ্য ছিলেন। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের বাড়িতে বাস করতেন। রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা বহুবার এ বাড়িতে পদধূলি দিয়েছেন।

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' দৈনিক পত্রিকাখানি উত্তরাধিকার সূত্রে মনীন্দ্রের পিতা গোঁসাই দাসগুপ্তের মালিকানায় আসে। মনীন্দ্র গুপ্ত কোনও চাকুরি করতে রাজি না হওয়ায় এই দৈনিক পত্রিকাখানির সম্পাদনা ও তত্ত্বাবধান তাঁর ওপর ন্যস্ত হয়। এই সুযোগে তিনি সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ও অক্ষয়কুমার বড়াল প্রমুখ অনেকের সঙ্গে পরিচিত হন। মনীন্দ্র গুপ্তের হাতে সংবাদ প্রভাকরের উন্নতি না হয়ে বরং অবনতি হতে থাকে। তিনি তখন অভিনয় করা ও নাটক রচনার দিকে মনোনিবেশ করেন এবং মনোমোহন পাঁড়ে, অপরেশ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের সঙ্গে পরিচিত হন। কিন্তু তাঁর নাট্য প্রতিভারও তেমন স্ফুরণ ঘটেনি। কাজেই তাঁর সাংসারিক অবস্থা ক্রমশ শোচনীয় হয়ে পড়ে এবং সংবাদ প্রভাকরের অবস্থাও দিন দিন খারাপ হতে থাকে। পরে স্বামী বিবেকানন্দের অর্থ সাহায্যে তাঁর আর্থিক অনটনের কিছুটা সুরাহা হয়।[১০১]

বামাচরণ ভড়ের ঠাকুরবাড়ি এ অঞ্চলের একটি বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। পল্লীর বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ সন্ধ্যাবেলায় এখানে জমায়েত হতেন। তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক নির্মল দে, ডাক্তার সন্তোষ দাস, ডাক্তার কৃপাবিন্দু চক্রবর্তী, ডাক্তার পূর্ণচন্দ্র আঢ্য, অধ্যাপক কমল মুখোপাধ্যায় প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। আড্ডা, গল্প, গানে আসর সর্বদা মুখরিত থাকত। পরবর্তীকালে এই ঠাকুরবাড়িতে স্থাপিত হয়েছিল 'ব্রজকিশোর সঙ্ঘ'। এই সঙ্ঘ সম্বন্ধে কিছু বলার আগে বামাচরণ ভড় সম্বন্ধে দু-চার কথা বলা দরকার।

বামাচরণ ভড় হুগলি জেলার অন্তর্গত হরিপালে এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এই দরিদ্র বালকটিকে হরিপালের জমিদার স্নেহ করতেন। তিনি শ্যামবাজারের নিকট একটি দর্জির দোকানে বামাচরণের কাজ ঠিক করে দেন। এই কারবারে ব্যুৎপত্তি লাভ করার পর বৌবাজারে এক ইউরোপীয়ান পরিচালিত তৈরি পোশাকের কারখানায় অংশীদারী ভিত্তিতে নিযুক্ত হন। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে আফ্রিকায় বুয়োর যুদ্ধ শুরু হলে ওইখানে তৈরি পোশাক রপ্তানি করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। ইউরোপীয় মালিক অবসরের প্রাক্কালে নির্দিষ্ট মাসোহারার বিনিময়ে দোকানের পূর্ণ স্বত্ব বামাচরণকে দিয়ে যান। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দশকে বামাচরণ মসজিদ বাড়ি স্ট্রিটের উপর পুষ্করিণী উদ্যান সমেত বৃহৎ এলাকাযুক্ত একটি বাড়ি ক্রয় করেন। পরবর্তীকালে এই বাড়ির একাংশ নীলমণি সরকার লেনের অন্তর্গত হয়। এই অংশটুকু ভড়েদের ঠাকুরবাড়ি নামে পরিচিত। এর

গঠনশৈলী অনুপম। বামাচরণ এই বাড়িতে রাধা-কৃষ্ণের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন, নাম দেন ব্রজকিশোর। ব্রজকিশোরের নিত্য সেবার জন্য বৌবাজারের পোশাকের দোকান ও অন্যান্য সম্পত্তি বিক্রি করে অছি পরিষদ গঠন করে দেন। তাঁর কোনও পুত্র সন্তান না থাকায় ভাই গোষ্ঠবিহারীর উত্তরপুরুষেরা বর্তমানের অছি।

বামাচরণ তাঁর নিজগ্রাম হরিপালে একটি বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, একটি খাল খনন করে জলসেচের ব্যবস্থা করেছিলেন। এ ছাড়া কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ (আর.জি.কর মেডিকেল কলেজ)-কে ১০,০০০ টাকা দান করেছিলেন। তিনি মসজিদ বাড়ি স্ট্রিটে (বর্তমানে ১১৪এ, সংখ্যক ভবনে) পল্লীর বালক-বালিকাদের বিনামূল্যে শিক্ষার জন্য একটি পাঠশালাও স্থাপন করেছিলেন।

আবার ব্রজকিশোর সঙ্ঘের কথায় ফিরে আসা যাক। এই সঙ্ঘের কীর্তন গান, জুড়ি গান এই পল্লীতে বিখ্যাত ছিল। দোলের সময় এ অঞ্চলের বালক-বালিকা ও যুবকদের নিয়ে সঙ্ঘের উদ্যোগে যে জুড়িগানের দল পল্লীর রাস্তায় রাস্তায় সঙ্গীত পরিবেশন করত তা পল্লীবাসীদের প্রীতিলাভে ধন্য হত। আজকাল জুড়িগান বন্ধ করে কালীকীর্তন প্রাধান্য পেয়েছে।

স্বদেশি যুগে মসজিদ বাড়ি স্ট্রিটের ভূমিকা কম নয়। ১৯১৫ সালের ২১ অক্টোবরে এক স্বদেশি বিপ্লবীর আঘাতে এই মসজিদ বাড়ি স্ট্রিটের উপর পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর গিরীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাণ হারান এবং আর এক সাব-ইন্সপেক্টর উপেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আহত হন।[১০২] এই রাস্তার উপর আরেকটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল ১৯৭০ সালের এক কালীপূজা জলসার রাত্রিতে। 'নেতাজি ব্রিগেড' নামে স্থানীয় ক্লাব কালীপূজার পর বিশিষ্ট শিল্পীদের নিয়ে গানের জলসার আয়োজন করত। এবারেও যথারীতি ব্যবস্থা হয়েছিল। গান চলাকালীন গানের আসরে সর্বসমক্ষে পুলিশ নক্‌শাল নেতা শ্রীবীরেন্দ্র দেবনাথকে গুলি করে হত্যা করে। উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ ভয়ে ও মর্মবেদনায় বোবা হয়ে গিয়েছিল।

নানান স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহ্যমণ্ডিত মসজিদ বাড়ি স্ট্রিট তার নামের গৌরবকে বেশি দিন ধরে রাখতে পারেনি। তার দীর্ঘ দেহের কিছু অংশ নিয়ে নতুন নামকরণ করা হল সেকালের কলিকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা আইনজীবী, স্বাধীনতাসংগ্রামী এবং কাঁচ ও পোর্সিলিন শিল্প স্থাপনের অগ্রদূত হেমেন্দ্রচন্দ্র সেনের নামে 'হেমেন্দ্র সেন স্ট্রিট'।

মসজিদ বাড়ি স্ট্রিটের এই অংশটুকু হরি ঘোষ স্ট্রিট থেকে আরম্ভ হয়ে এঁকে বেঁকে পূর্ব দিকে এগিয়ে কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে এসে পড়েছে। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এই রাস্তাটির কোনও অস্তিত্ব ছিল না। তবে মসজিদ বাড়ি স্ট্রিটের সম্প্রসারণ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত ছিল এই প্রসারিত পথটি। হরি ঘোষ স্ট্রিটের ৪৫, ৪৫/১, ৪৫/২, ৪৬ এবং ৪৭ সংখ্যক বাড়িগুলি ছিল এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত। ১৯২২ সালের মধ্যে এই বাড়িগুলি অধিগ্রহণ করা হয়। কলিকাতা পুরসভা তাঁদের ১২ ডিসেম্বর ১৯২৪ সালের অধিবেশনে নতুন রাস্তাটি নির্মাণের জন্য ৬৮,৩৯৯ টাকা ব্যয়বরাদ্দ অনুমোদন করেন। রাস্তাটি সম্পূর্ণ করার জন্য আরও একটি বাড়ি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। মঞ্জুরীকৃত অর্থ থেকে জমি ও বাড়ি অধিগ্রহণের জন্য ৫৭,২০০ টাকা এবং রাস্তা নির্মাণের জন্য ১১,১৯৯ টাকা ব্যয় ধরা হয়।[১০৩] ১৯২৫ সালের মধ্যে হরি ঘোষ স্ট্রিট থেকে কর্নওয়ালিস স্ট্রিট (বিধান সরণি) পর্যন্ত রাস্তাটি নির্মিত হয়ে যায়। এই নতুন রাস্তাকে মসজিদ বাড়ি স্ট্রিটের সম্প্রসারিত অংশ হিসাবে নামাঙ্কিত করা হয়।

১৯৩১ সালে মসজিদ বাড়ি স্ট্রিটের এই সম্প্রসারিত অংশ নতুন নামকরণের এক প্রস্তাব আসে, হেমেন্দ্রচন্দ্র সেনের নামে হেমেন্দ্র সেন স্ট্রিট করার। ২৭ মার্চ, ১৯৩১ সালের অধিবেশনে কলিকাতা পুরসভা ওই প্রস্তাব অনুমোদন করেন।[১০৪]

হেমেন্দ্রনাথ সেন (১৮৬৩-১৯২৯) কলিকাতা হাইকোর্টের একজন খ্যাতনামা আইনজীবী ছিলেন। এর আগে বহরমপুর কোর্টে ১০ বছর আইনব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিলেন। বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশি আন্দোলনেও তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৯৩১ সালে কলিকাতায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়েছিল, তার সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছিলেন হেমেন্দ্রনাথ সেন। স্বদেশি আন্দোলনকে সার্থক করার জন্য স্বদেশি শিল্প স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। বাংলাদেশে কাঁচ ও পোর্সিলিন শিল্প

স্থাপনে তিনি ছিলেন পথিকৃৎ। তাঁরই উদ্যোগে নিউ ইন্ডিয়ান গ্লাস ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত হয়। এই রাস্তার ধারেই ছিল তাঁর আবাসভবন। কলেরায় তাঁর মৃত্যু হয়।

এরপর কলিকাতা পুরসভা সুদীর্ঘ মসজিদ বাড়ি স্ট্রিটের উপর একটি উদ্যান নির্মাণে তৎপর হন। এই উদ্দেশ্যে কলিকাতা পুরসভা ২১/১, মসজিদ বাড়ি স্ট্রিটের খালি জায়গাটি অধিগ্রহণ করে একটি উদ্যানে রূপান্তরিত করেন। উদ্যানটি ৪ বিঘা ১ কাঠা ১২ বর্গফুট এলাকা জুড়ে অবস্থিত। ১৯৩৬ সালে উদ্যানটির নামকরণের প্রস্তাব নিয়ে বিচার-বিবেচনা শুরু হয়। অবশেষে কলিকাতা পুরসভার ৭ অক্টোবর ১৯৩৬ সালের অধিবেশনে উদ্যানটি সেকালের বিখ্যাত পণ্ডিত ও কবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের নামে 'বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার উদ্যান' রাখার প্রস্তাব গৃহীত হয়।[১০৫]

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার। বর্ধমান জেলার গুপ্তিপাড়া গ্রামের প্রসিদ্ধ শুভাকরের বংশধর। পিতা রামদেব তর্কবাগীশ। ইনি বিভিন্ন সময়ে নদিয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র, বর্ধমানের মহারাজা চিত্র সেন ও কলিকাতার মহারাজা নবকৃষ্ণের সভাপণ্ডিত ছিলেন। ১৭৪৪ খ্রিস্টাব্দে চিত্র সেনের 'এক মৃগয়া কাহিনী' অবলম্বনে 'চিত্রচম্পূ' কাব্য রচনা করেন। এই কাব্যে বর্গীর হাঙ্গামার বহু বিবরণ পাওয়া যায়। ওয়ারেন হেস্টিংস যে ১১ জন পণ্ডিতের সাহায্যে 'বিবাদার্ণবসেতু' নামে বৃহৎ ধর্মশাস্ত্র সংগ্রহ রচনা করেন, তিনি তাঁদের অন্যতম। এই গ্রন্থটি ব্রিটিশ আমলে হিন্দু আইনের আদি গ্রন্থ এবং দীর্ঘকাল সুপ্রিম কোর্টের একমাত্র আইন গ্রন্থ ছিল। ফারসী অনুবাদের মারফত তার ইংরেজি অনুবাদ 'জেন্টুল' নামে প্রচারিত হয়। পরবর্তীকালে স্যার উইলিয়াম জোন্স এই পুস্তকখানি সংস্কার এবং উন্নত করেন।

জয় মিত্র স্ট্রিটে বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের আবাসগৃহ ছিল। জায়গা দিয়েছিলেন মহারাজা নবকৃষ্ণ। এই গৃহেই তিনি শেষজীবন অতিবাহিত করেন। বর্তমানে তাঁর উত্তরপুরুষেরা এই গৃহে বসবাস করেন।[১০৬]

এই শতাব্দীর আটের দশকে মসজিদ বাড়ি স্ট্রিটের আরেক অংশের পুনর্নামকরণের এক প্রস্তাব আসে। শ্রীশ চন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ সৌম্যেন সরকার কলিকাতা পুরসভার কাছে মসজিদ বাড়ি স্ট্রিটের যে অংশ যতীন্দ্রমোহন অ্যাভিনিউ থেকে হরি ঘোষ স্ট্রিট পর্যন্ত প্রসারিত সেই অংশটুকু কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পিতামহ অক্ষয়কুমার দত্তের নামে নামকরণের এক প্রস্তাব বিবেচনার জন্য পেশ করেন। সে সময়ের কলিকাতার পুরশাসক তাঁর ৩ ডিসেম্বর ১৯৮২ সালের আদেশবলে মসজিদ বাড়ি স্ট্রিটের এই অংশের নাম বদল করে 'অক্ষয়কুমার দত্ত সরণি' বলবৎ করেন। এইভাবে কলিকাতার এক গুরুত্বপূর্ণ প্রাচীন রাস্তার অনেকাংশই অবলুপ্ত হয়ে গেল। কেবলমাত্র চিৎপুর রোড থেকে যতীন্দ্রমোহন অ্যাভিনিউ পর্যন্ত প্রসারিত অংশটুকুই মসজিদ বাড়ি স্ট্রিটের ঐতিহ্য বহন করে আজও দাঁড়িয়ে আছে।

বাংলা গদ্যসাহিত্যে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের প্রবক্তা, বাংলার নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬) নবদ্বীপের নিকটবর্তী চুপী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। দারিদ্র্য, বাল্যে পিতৃবিয়োগ, দীর্ঘকাল ব্যাপী অসহ্য পীড়া প্রভৃতি নানা বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও তাঁর শিক্ষার আগ্রহ ও জ্ঞানস্পৃহা কখনও হ্রাস পায়নি, সারা জীবনই তিনি অধ্যয়ন করেছেন। বিবিধ বিষয়ে এবং ফরাসি, জার্মান প্রভৃতি বিভিন্ন বিদেশি ভাষায় গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। মাত্র ১৪ বছর বয়সে তিনি 'অনঙ্গমোহন' নামে একখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। যৌবনের শুরুতে সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদক কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্রের প্রস্তাবে তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হন। ১৮৪০ সালে দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতায় তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপন করলে অক্ষয়কুমার এখানে শিক্ষক নিযুক্ত হন। পাঠশালায় শিক্ষকতাকালে ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে জুন মাসে প্রসন্নকুমার ঘোষের সহযোগিতায় তিনি 'বিদ্যাদর্শন' নামে এক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে ১৬ আগস্ট দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রযোজনায় এবং তাঁর সম্পাদনায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম সংখ্যা আত্মপ্রকাশ করে এবং ১৮৫৫ সাল পর্যন্ত তিনি এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁর সম্পাদনায় পত্রিকাটি বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সাময়িকপত্রে পরিণত হয়। ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে ২১ ডিসেম্বর তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অপর ১৯ জন বন্ধুসহ

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিকট ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মসমাজে এই প্রথম দীক্ষিত ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের পত্তন হল। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে ১৫ ডিসেম্বর কাশীপুরে কিশোরীচাঁদ মিত্রের ভবনে যে "সমাজোন্নতি বিধায়িনী সুহৃৎ সমিতি" স্থাপিত হয়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অক্ষয়কুমার দত্ত যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক নিযুক্ত হন।

অক্ষয়চন্দ্রের লেখনী ছিল দুর্বার। একদিকে যেমন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলন সমর্থন করে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় একটির পর একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, অন্যদিকে নীলকর সাহেবদের অত্যাচার এবং জমিদারগণের নিষ্ঠুর প্রজাপীড়নের বিরুদ্ধে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় লেখনীচালনা করেন। এ ছাড়াও খ্রিস্টান ধর্মযাজকগণ যখন বলপূর্বক হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করছিলেন, তা থেকে হিন্দুদের পরিত্রাণের তাগিদে শিক্ষিত হিন্দুসমাজকে একত্রীকরণের জন্য দেবেন্দ্রেনাথের উদ্যোগে হাত মিলিয়েছিলেন অক্ষয়কুমার। রাজা রামমোহনের চিন্তাধারায় ভক্তিবাদ ও যুক্তিবাদের যে সমন্বয় দেখা দিয়েছিল, পরবর্তীকালে ব্রাহ্মসমাজের চিন্তাধারায় এই দুটি পৃথক বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। অক্ষয়কুমার মূলতঃ রামমোহনের জীবনদর্শনের এই যুক্তিবাদী দিকটাই ফুটিয়ে তুলেছিলেন। সংস্কৃত ভাষার বদলে বাংলা ভাষায় ঈশ্বর উপাসনার প্রবর্তন অক্ষয়কুমারের জীবনের আরেক কীর্তি। ব্রাহ্ম হয়েও তিনি প্রার্থনার আবশ্যকতা স্বীকার করতেন না। শেষ জীবনে তিনি অনেকটা অজ্ঞেয়বাদী হয়ে ওঠেন।

বাংলা ভাষাকে তিনি নানাভাবে পরিপুষ্ট করেছেন। বাংলাভাষায় বিজ্ঞানচর্চার সার্থক সূত্রপাত করে তিনি আধুনিক বাংলা গদ্যরীতিকে আধুনিকতার মর্যাদা দিয়েছিলেন। 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' নামক অসাধারণ পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা গ্রন্থটি তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি বলা যায়। [১০৭]

মানিকতলা স্ট্রিট (এখন রমেশ দত্ত স্ট্রিট, রামদুলাল সরকার স্ট্রিট ও শিশির ভাদুড়ী সরণি) :

ব্রিটিশ আগমনের বহু পূর্ব থেকে মানিকতলার অস্তিত্ব ছিল। [১০৮] মানিকতলা স্ট্রিট কলিকাতার একটি প্রাচীন পথ, মানিক পীরের নাম মাহাত্ম্যে অঞ্চলটি যেমন মানিকতলা নামে পরিচিত হয়, তেমনি রাস্তাঘাটের নামকরণেও তার ছোঁয়া লাগে। মানিকতলা স্ট্রিট, মানিকতলা রোড প্রভৃতি নামের রাস্তাগুলি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

মানিকতলার মানিক পীর সেকালের কলিকাতার এক বিখ্যাত সন্ত। আপার সারকুলার রোড ও মানিকতলা মেন রোডের (অধুনা সতীন সেন সরণি) সংযোগস্থলে মানিক পীরের সমাধি আছে। এটি ২৫৫নং আপার সারকুলার রোডে অবস্থিত। বর্তমানে হতাদরে জীর্ণদশায় লোকচক্ষুর অন্তরালে এক ধারে পড়ে রয়েছে।

কলিকাতায় মুসলমানদের উপাসনার প্রাচীনতম স্থান কোনটি তা নিয়ে মতান্তর আছে। কলিকাতার নানা জায়গায় আছে দরগা, মাজার ইত্যাদি। অনেকের মতে মানিকতলার মানিক পীরের দরগাটি কলিকাতার মুসলমানদের প্রাচীনতম উপাসনাস্থল।

মানিকতলার এই মানিক পীর কলিকাতায় কখন এসেছিলেন তা জানা যায় না। মানিক পীরের পুরো নাম পীর সৈয়দ হোসেনউদ্দীন সাহ। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ থেকে এসে এই স্থানে ধর্মসাধনা আরম্ভ করেন। সাধারণের মধ্যে তিনি 'মানিক পীর' বলে পরিচিত হন। এই স্থানে তাঁর দেহাবশেষ রক্ষিত আছে। তাঁর সম্বন্ধে আর বিশেষ কোনও তথ্য পাওয়া যায় না। তবে এই মসজিদটি যে শতাধিক বছরের পুরানো সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই। [১০৯]

মানিক পীরের 'পীর' শব্দটি ফারসী কথা। এর আভিধানিক অর্থ বৃদ্ধ বা প্রাচীন। আধ্যাত্মিক গুরু হিসাবে এই শব্দটিকে অভিহিত করা হয়। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছে এঁরা শ্রদ্ধার্হ। সংস্কারমুক্ত উদার মনোভাবের জন্য এঁরা সকলের কাছে প্রিয় ছিলেন।

মানিক পীরের পাঁচালী সেকালের কলিকাতায় সর্বত্র শোনা যেত। এই প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন—

"অল্পকাল আগেও রামায়ণ গানের মত মানিক পীরের গান পথে ঘাটে এবং তাঁর পাঁচালী পীরের আস্তানায় শোনা যাইত। এই গানে গায়ক ও বাদক প্রায় মুসলমান। গায়ক চামর ধরে, বাদকেরা খোল ও মন্দিরা বাজায়।"

শোনা যায় সন্ত মানিক পীরের স্মরণেই এই অঞ্চলের নাম মানিকতলা। প্রাচীন কলিকাতার শুঁড়া, কাঁকুড়গাছি, বাগমারী, গৌরীবাড়ি, সিমলা প্রভৃতি অঞ্চলের হিন্দু-মুসলমান বাসিন্দারা মানিক পীরের থানকে দেবতা বা সন্ত জ্ঞানে পূজা করত। নিজেদের প্রিয় বস্তু মানিক পীরকে উৎসর্গ না করে গ্রহণ করত না। সে সময়ের কলিকাতায় মানিক পীর সম্বন্ধে একটি দোঁহা প্রচলিত ছিল—

"মানিক পীরের চরণ বন্দি পালা শেষ করি,
মুসলমানে আমিন বলেন, হিন্দুরা বলেন হরি।"

সন্ত মানিক পীরের নামেই যে মানিকতলা নামাঙ্কিত হয়েছে, এ কথা কলিকাতার পার্শি সম্প্রদায় মানেন না। তাঁরা দাবি করেন যে মানেকজি রুস্তমজির (১৮১৫-৯১) নাম থেকেই অঞ্চলটির নাম মানিকতলা হয়েছে। মানেকজি ছিলেন রুস্তমজি কাওয়াসজির পুত্র। তিনিও পিতার মত কলিকাতার পার্শি সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন।[১১০] এ দাবি কিন্তু তথ্যনির্ভর নয়, মানেকজি রুস্তমজি জন্মাবার পূর্ব থেকেই মানিকতলার অস্তিত্ব ছিল।

মানিক পীরের দরগা এক সময় বাকি খাজনার দায়ে নিলামে ওঠে। স্বামী বিবেকানন্দের পিতা বিশ্বনাথ দত্ত এই দরগা ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চল স্বামীজির মা ভুবনেশ্বরী দেবীর নামে নিলাম-খরিদ করেন। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত 'স্বামী বিবেকানন্দ' শীর্ষক গ্রন্থে এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। তা থেকে জানা যায় যে তাঁর মাতৃদেবী প্রত্যহ ৫ টাকা থেকে ৮ টাকা প্রণামী পেতেন। বিশ্বনাথ দত্ত এই সম্পত্তি তাঁর বড় ছেলের জন্য রাখতে চেয়েছিলেন যাতে এর আয় থেকে তাঁর হাতখরচ চলতে পারে। পরে মুসলমান প্রজাদের অনুরোধে মাতৃদেবী খাজনা মকুবের আদেশ দিলেন। তখন থেকে প্রজারা খাজনা দেওয়া বন্ধ করে।

সেকালের কলিকাতার মানচিত্রগুলি পর্যবেক্ষণ করলে মানিকতলা স্ট্রিটের প্রাচীনত্ব ধরা পড়ে। আপজন সাহেবের ১৭৪২ খ্রিস্টাব্দে প্রস্তুত করা কলিকাতা মানচিত্রে এই রাস্তাটি দেখানো আছে। ওই মানচিত্রে কিন্তু রাস্তার নামের কোনও উল্লেখ নেই। মার্ক উড ১৭৮৪-৮৫ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতার আরেকটি মানচিত্র তৈরি করেন। এই মানচিত্রেও মানিকতলা স্ট্রিট দেখানো আছে। তার পাশেই সিমলা বাজারেরও নাম উল্লেখ আছে। অথচ মানিকতলা স্ট্রিটের নাম লেখা নেই। আপজন সাহেবের ১৭৯২-৯৩ সালের কলিকাতা মানচিত্রে মানিকতলা স্ট্রিট এই নাম লেখা আছে। এই মানচিত্রে রাস্তাটির বক্রগতি দেখানো আছে।

কলিকাতা পুরসভা বিভিন্ন সময়ে মানিকতলা স্ট্রিটের উন্নতির দিকে নজর দিয়েছিলেন। তার ফলে রাস্তাটির আঁকা-বাঁকা অংশ বহুলাংশে সোজা হয়। এরপর কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা মানিকতলা অঞ্চলের উন্নয়নে তৎপর হলেন। ৬ই জানুয়ারি ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁরা একটি পরিকল্পনা প্রকাশ করেন (Manicktolla Spur—The Scheme No. VIIC)। এই পরিকল্পনাটি রূপায়ণের ফলে মানিকতলা স্ট্রিটের কিছু অংশের সংস্কার ও প্রশস্ত করার ব্যবস্থা হয়। পূর্বে মানিকতলা স্ট্রিট আপার সারকুলার রোড পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থার সংস্কারের ফলে এই রাস্তার কিছু অংশ বিবেকানন্দ রোডের অন্তর্ভুক্ত হয়। মানিকতলা স্ট্রিট এখন বিবেকানন্দ রোডে এসে শেষ হচ্ছে, আপার সারকুলার রোডে (অধুনা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড) নয়। কলিকাতা পুরসভা ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে অন্যান্য রাস্তাগুলির সঙ্গে মানিকতলা স্ট্রিটকেও কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থার কাছ থেকে গ্রহণ করেন।[১১১]

মানিকতলা স্ট্রিটের উপর ছিল সিমলাবাজার, সে কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। মার্ক উডের মানচিত্রে দুটি সিমলাবাজারের খোঁজ পাওয়া যায়—একটি মানিকতলা স্ট্রিটের উপর, অপরটি ঝামাপুকুর অঞ্চলে। ঝামাপুকুরের সিমলাবাজার অতি প্রাচীন। মেছুয়াবাজার স্ট্রিটের উপর রাজা দিগম্বর মিত্রের ভবনের সম্মুখে যে বাজারটিকে টিকটিকি বাজার বা পোড়াবাজার বলা হত সেটিই পুরাতন সিমলাবাজার। বেলীর কলিকাতা মানচিত্রে এই বাজারকে পুরানো সিমলাবাজার এবং বর্তমান সিমলাকে নতুন সিমলাবাজার বলে উল্লেখিত আছে।[১১২]

মহেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর রচিত 'কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা' পুস্তকে আরেকটি

সিমলাবাজারের উল্লেখ করেছেন :

"পাড়ার বুড়োদের কাছে শুনিতাম সিমলার বাজার প্রথমে—এখন যেটা মহেন্দ্র গোস্বামীর গলি, তার কোন এক স্থানে ছিল। একটা বড় শিমুল গাছ ছিল, তাহার নীচে বাজার বসিত। আমরা কিন্তু ঐ শিমূল গাছ দেখিনি এবং ঐ স্থানটিতে খোলার ঘর দেখিয়াছি, আমাদের সময় যেটা সিমলার বাজার ছিল সেটা হল এখানকার বেথুন কলেজের বাড়ির দক্ষিণ পশ্চিম অংশ এবং খানিকটায় বেথুন কলেজের পশ্চিম দিককার রাস্তা হইয়াছে।"

ছাতুবাবুর বাজার মানিকতলা স্ট্রিটের উপর অবস্থিত। এই বাজারটি সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য বিডন স্ট্রিট রাজপথের কাহিনী বিবৃত করার সময় পেশ করার ইচ্ছা রইল।

মানিকতলা স্ট্রিটের পথ পরিক্রমার মধ্য দিয়ে এই পথের প্রচ্ছন্ন অন্তরাত্মাকে ধরা-ছোঁয়া যায়। এই রাস্তার ধারে একদা রাজা রামমোহন রায় একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। এখানে পড়তে আসতেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই পথের ধারে দাঁড়িয়ে আছে রেভারেন্ড আলেকজান্ডার ডাফের ডাফ চার্চ ও রেভারেন্ড কেষ্ট বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্রাইস্ট চার্চ, যদিও শেষোক্ত চার্চটি কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের (বিধান সরণি) নম্বরে অবস্থিত। এর প্রধান ফটক মানিকতলা স্ট্রিটের উপর। খ্রিস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে চার্চ দুটি স্থাপিত হলেও পরবর্তীকালে বাংলা দেশের শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে এদের ভূমিকা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। এই পথের ধারে আছে উত্তর কলিকাতার বিখ্যাত মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারকদের সারি সারি বিপণি। এদের মধ্যে নকুড় নন্দীর সন্দেশের দোকান খ্যাতির শীর্ষে। আর মানিকতলার দত্ত, নান ও দে পরিবার তো ইতিহাসখ্যাত। দত্ত পরিবারের রসময় দত্ত, রমেশ দত্ত কলিকাতা তথা ভারতের ইতিহাসের স্বনামধন্য পুরুষ। রমেশ দত্তের প্রথমা কন্যা কমলার বিবাহবাসরে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কণ্ঠের মালা রবীন্দ্রনাথের গলায় পরিয়ে উদিত কবিকে বরণ করেছিলেন।

আর নান পরিবারে বাসভবনে থাকতেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। ব্রহ্মচর্য আশ্রম স্থাপনের বিষয় আলোচনা করার জন্য এখানে ছুটে আসতেন রবীন্দ্রনাথ। তা ছাড়া বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় নানদের বাড়ি তো একটি প্রধান কেন্দ্রভূমি হয়েছিল। দে পরিবারের নির্মল দে বিনাশর্তে লক্ষ লক্ষ টাকা তুলে দিয়েছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের হাতে, সুতরাং এদের সম্বন্ধে দু-চার কথা নিবেদন করতেই হয়।

২৭নং মানিকতলা স্ট্রিটে ইঞ্জিনিয়ার যোগেন্দ্রচন্দ্র আইচ ও তাঁর ভাই ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ আইচ-এর বসতবাড়ি ছিল। এই বাড়িটি ছাড়াও পাশাপাশি আরও কয়েকটি বাড়ি ছিল তাঁদের অধিকারে। এঁরা হলেন সরশুনার খ্যাতনামা আইচ পরিবার। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা সীতারাম আইচ। তাঁর উত্তরপুরুষ গোবিন্দপুরে এসে বসবাস শুরু করেন। গোবিন্দপুর দুর্গ নির্মাণকালে তাঁর বংশের রামগোপাল আইচ ও জগন্নাথ আইচ ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে পটলডাঙ্গার বিশাল জমি পেয়ে তাতে বাসভবন নির্মাণ করেন। পটলডাঙ্গার ঘোষালদের বাড়ি আইচ ভবনের সংলগ্ন ছিল। পরবর্তীকালে মির্জাপুর স্ট্রিট নির্মাণের সময় আইচদের বাড়ি ভাঙা পড়ে, তার ওপর দিয়ে মির্জাপুর স্ট্রিট তৈরি হয়। রাস্তার দক্ষিণের জমিও তাঁদের ছিল। যোগেন্দ্র আইচ ও দেবেন্দ্র আইচ রামগোপাল আইচের পঞ্চম পুরুষ। সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ (চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ) তৈরির সময় আইচদের মানিকতলা স্ট্রিটের বাড়িগুলি ভাঙা পড়ে। এরপর তাঁরা ভবানীপুরে বসবাস শুরু করেন।

৫৪নং মানিকতলা স্ট্রিটের বাড়িটি নানা কারণে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ—একদিকে যেমন এটি দানশীলতায় গৌরবের স্বাক্ষর রেখেছে, অন্যদিকে একদা পল্লীসেবার কেন্দ্রভূমি ছিল এই ভবনটি। এটি দে পরিবারের বাসভবন। এঁদের আদি বাড়ি ছিল হুগলিতে। দ্বারিকানাথ দে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সিমলা অঞ্চলে এই বাসভবন নির্মাণ করেন। সে সময় বাড়িটি ছিল বর্তমানের সিমলা স্ট্রিট ও বিবেকানন্দ রোডের সংযোগস্থলে। কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা বিবেকানন্দ রোড নির্মাণের সময় বাড়িটি অধিগ্রহণ করেন। ৫৪নং মানিকতলা স্ট্রিটের জমি ১৯০৩ সালে কেনা ছিল। এই জমিতে বর্তমান বসতবাড়ি নির্মিত হয়।

ব্যবসায়ে দ্বারিকানাথের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে এবং তাই থেকে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। তাঁর চার পুত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রতাপচন্দ্রের বংশধরগণ এই মানিকতলা স্ট্রিটের ভবনে বসবাস করেন।

প্রতাপচন্দ্রের দুই পুত্র—শরৎচন্দ্র ও বসন্তকুমার। শরৎচন্দ্র ছিলেন নিঃসন্তান। বসন্তকুমারের তিন পুত্র—অমিয় দে, নির্মল দে ও গোবিন্দ দে।

এই পরিবারের সুসন্তান নির্মল দে কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিস্টার ছিলেন। তিনি ৩০ লক্ষ টাকা রহড়া রামকৃষ্ণ আশ্রম ও রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত রাঁচির যক্ষা হাসপাতালকে দান করেন। সে সময়ের ৩০ লক্ষ টাকা আজকের দিনের কোটি টাকাকে ছাড়িয়ে যায়। নির্মল দের মতো এই প্রকার নিঃস্বার্থ দানের বিধান পালন করতে হলে দৃঢ় বীর্য এবং কঠিন অধ্যবসায় আবশ্যক। তার জন্য বহুব্যাপী সুদীর্ঘ কর্মপ্রণালী অনুসরণ করে চলতে হয়। এ কেবল ক্ষণকালের আত্মত্যাগের দ্বারা প্রবৃত্তির উচ্ছ্বাস নিবৃত্তি এবং হৃদয়ের ভার লাঘব করা নয়, তা দীর্ঘ সাধনায় নানা উপায়ে নানা বাধা অতিক্রম করে দুরূহ উদ্দেশ্যসিদ্ধির সার্থকতায় সমুজ্জ্বল হয়।

নির্মল দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোবিন্দ দে একজন ব্যবসায়ী, সমাজসেবী ও পল্লীর একজন বিশিষ্ট সংগঠক। তিনি ১৯৬৭ ও ১৯৬৮ সালে দু'বার কলিকাতার মেয়রের পদ অলংকৃত করেন। ১৯৬৭ সালে শ্যামপুকুর এলাকার বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। বর্তমানে মোহনবাগান ক্লাবের কোষাধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত আছেন। এ ছাড়া নানা সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তিনি সংশ্লিষ্ট।

কর্নওয়ালিস স্ট্রিট (বিধান সরণি) থেকে শুরু করে সিমলা স্ট্রিট (ডঃ নারায়ণ রায় সরণি) পর্যন্ত মানিকতলা স্ট্রিটের এই অংশটুকুর মধ্যে আছে উত্তর কলিকাতার বিখ্যাত সন্দেশ-পাড়া। একে সিমলার সন্দেশপাড়াও বলা হয়। এই অঞ্চলের নকুড়ের কড়াপাক কলিকাতার সন্দেশ রসিকদের কাছে একটি চিরপরিচিত নাম। এই বিখ্যাত সন্দেশের দোকানের নাম গিরীশচন্দ্র দে/নকুড়চন্দ্র নন্দী। এঁদের তৈরি জলভরা-তালশাঁস সন্দেশ মিষ্টান্নরসিকের কাছে পরম উপাদেয়। নকুড়ের নাম নিয়ে কড়াপাক সন্দেশ খ্যাত হলেও দোকানটির প্রতিষ্ঠাতা কিন্তু নকুড় নন্দী নন, এই দোকানের প্রতিষ্ঠাতা তাঁর শ্বশুরমশাই গিরীশচন্দ্র দে। ১২৫১ বঙ্গাব্দে, ইংরেজির ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে গিরীশচন্দ্র হুগলি থেকে কলিকাতায় এসে সিমলা পাড়ায় দোকান খোলেন। সে সময় মানিকতলা স্ট্রিটে একটি চালাঘরে ছিল তাঁর দোকান। অল্পদিনেই তাঁর সন্দেশের সুনাম সিমলা পাড়া ছাড়িয়ে সারা উত্তর কলিকাতায় ছড়িয়ে পড়ে।

গিরীশচন্দ্রের একমাত্র মেয়েকে বিয়ে করেন নকুড় নন্দী, মিষ্টান্ন শিল্পে শ্বশুরের কাছে হাতেখড়ি। যোগ্য শিক্ষকের কাছে উপযুক্ত শিক্ষালাভ করে গিরীশের পরে এই দোকানের হাল ধরলেন নকুড় নন্দী। মানিকতলা স্ট্রিটের উপর নতুন জায়গা কিনলেন। সেখানে পাকা বাড়ি নির্মাণ করে দোকান তুলে আনলেন। পরবর্তীকালে বাড়িটি সংস্কার ও সুউচ্চ করার ব্যবস্থা হয়। বর্তমানে দোকান ও কারখানা এই বাড়িতে, ঠিকানা ৫৬, মানিকতলা স্ট্রিট। নকুড়ের পরে এই দোকানের কর্ণধার হলেন তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র অনুকূলচন্দ্র।

গিরীশচন্দ্রের নাম নিয়ে ভবানীপুরে আরেকটি দোকান আছে। এই দোকানটি স্থাপন করেন নকুড়ের মধ্যম পুত্র দুর্গাচরণের পুত্রেরা। দোকানের নাম নিয়ে পারিবারিক বিতর্ক শুরু হয়ে যায়। অবশেষে সমাধান সূত্র পাওয়া গেল—আদি দোকান অর্থাৎ গিরীশচন্দ্র দে/নকুড়চন্দ্র নন্দী নামের দোকান মধ্য কলিকাতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে এবং গিরীশচন্দ্র দে নামধারী দোকান দক্ষিণ কলিকাতা ছেড়ে মধ্য কলিকাতায় প্রবেশ করতে পারবে না, সে সূত্র আজও বলবৎ আছে।

অনুকূলচন্দ্রের একমাত্র পুত্র পরেশচন্দ্র অকালে দেহত্যাগ করেন। বর্তমানে দোকানটি পরেশচন্দ্রের পুত্রদের কর্তৃত্বাধীনে আছে।

নানা বিপর্যয়ের ঢেউ এই দোকানের উপর দিয়ে বয়ে গেছে। দুগ্ধ নিয়ন্ত্রণ আইন বলবৎ হওয়াতে ছানা তৈরি বন্ধ হয়ে যায়। ফলে বহু দিন দোকানটি বন্ধ থাকে। ষাটের দশকে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম বৃদ্ধির বিরুদ্ধে দমদম দাওয়াই প্রয়োগের সময় কিছু লোক কলিকাতার কয়েকটি মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠানের উপর হামলা করে। সে সময় এই দোকানটিও তার শিকার হয়। এই দোকানটি তার পুরনো গৌরব আজও বজায় রেখেছে।

৮ নম্বর কৃষ্ণ সিংহ লেনে (এখন বেথুন রো) মানিকতলা নান পরিবারের আদি বাড়ি। এই বাড়ির

সদর ছিল মানিকতলা স্ট্রিটের উপর। নানেরা জাতিতে তন্তুবণিক সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। আদিবাড়ি রাজবল-হাট। রামসুন্দর নানের পিতা অষ্টাদশ শতাব্দীতে কলিকাতায় এসে সিমুলিয়া গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। রামসুন্দরের পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র নান ছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির স্টিভেডর। এই ব্যবসা থেকে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন এবং বসতবাড়ি সম্প্রসারণ করেন। মানিকতলা স্ট্রিট ও আজকের বেথুন রো-এর সংযোগস্থল থেকে আরম্ভ হয়ে পশ্চিম দিক পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল তাঁর বসতবাড়ি। পরবর্তীকালে বেথুন রো নির্মাণের সময় এই বাড়ির কিছু অংশ অধিগ্রহণ করা হয়। ফলে বেথুন রো মানিকতলা স্ট্রিট ও বিডন স্ট্রিটের সংযোগকারী পথ হিসাবে চিহ্নিত হয়। এতে নানদের বসতবাড়িও দুটি ভাগে বিভক্ত হয়। ৮ নম্বর বাড়িটি অন্দরমহল এবং ১৮ নম্বর বাড়িটি বহির্মহল রূপে ব্যবহার হতে থাকে। পরবর্তীকালে ৮ নম্বর বাড়িটি জীর্ণ হওয়াতে এটিকে হস্তান্তরিত করা হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র নান ১২৭২ বঙ্গাব্দে রথের দিনে কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এটি মানিকতলা নানদের কালীবাড়ি নামে বিখ্যাত। বর্তমানে এটি ২৫ নম্বর বেথুন রোতে অবস্থিত। মন্দিরের পূজা নির্বাহের জন্য ৭ই জানুয়ারি ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র অছি পরিষদ গঠন করেন। কালীমন্দির প্রতিষ্ঠার পূর্বে ঈশ্বরচন্দ্র দুর্গাপূজার প্রবর্তন করেন। সে পূজা আজও চলে আসছে। ঈশ্বরচন্দ্রের দুই পুত্র—মতিলাল ও শ্যামলাল। মতিলাল তাঁর অংশের পৈতৃক অর্থ নানা ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োগ করে প্রচুর ধন উপার্জন করেন। ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে ৩৬ নম্বর বেথুন রো-এর বাড়িটি ক্রয় করেন। পরে এই বাড়িটি ভাগ হলে এর এক অংশ ১৪৬নং মানিকতলা স্ট্রিট নামে চিহ্নিত হয়। এই দুই বাড়িতে মতিলালের উত্তরপুরুষেরা বাস করেন।

১৮ নম্বর বেথুন রো-এর বাড়িটি শ্যামলালের অধিকারে আসে। শ্যামলাল একসময় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সংস্পর্শে আসেন। তাঁর তেজস্বিতা, পাণ্ডিত্য ও চরিত্রের দার্ঢ্যে মুগ্ধ হয়ে তিনি ব্রহ্মবান্ধবকে পুত্র কার্তিকচন্দ্রের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেন। পরবর্তীকালে শ্যামলালের এই বাড়িতে ব্রহ্মবান্ধব কার্তিকচন্দ্রের পুত্র সুধীরকুমার ও কয়েকজন ছাত্রকে নিয়ে একটি আদর্শ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এই বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ আসতেন ব্রহ্মবান্ধবের সঙ্গে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের বিষয় আলাপ-আলোচনা করতে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "....এই পরিচয় উপলক্ষ্যেই তিনি জানতে পেরেছিলেন আমার সংকল্প, এবং খবর পেয়েছিলেন যে, শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাবে আমি পিতার সম্মতি পেয়েছি। তিনি আমাকে বললেন, এই সংকল্পকে কার্যে প্রতিষ্ঠিত করতে বিলম্ব করবার কোন প্রয়োজন নেই। তিনি তাঁর কয়েকজন অনুগত ছাত্র ও শিষ্যকে নিয়ে আশ্রমের কাজে প্রবেশ করলেন। তখনই আমার তরফে ছাত্র ছিল রথীন্দ্রনাথ ও তাঁর কনিষ্ঠ শমীন্দ্রনাথ। আর অল্প কয়েকজনকে তিনি যোগ করেছিলেন।"[১১৩]

কার্তিকচন্দ্র ব্রহ্মবান্ধবকে দেবতার মতো ভক্তি করতেন। বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে কার্তিকচন্দ্র শিক্ষাগুরুর পত্রিকা পরিচালনার দায়দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে তুলে নেন। ব্রহ্মবান্ধব অনেকগুলি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন—স্বরাজ, করালী, সন্ধ্যা প্রভৃতি। এই সব পত্রিকার আর্থিক দায়িত্ব পালনে কার্তিকচন্দ্র কোনও কার্পণ্য করেননি। কার্তিকচন্দ্র ছিলেন একজন জাত শিল্পী। ব্রহ্মবান্ধব যখন শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্য আশ্রমে আসেন, কার্তিকচন্দ্রকে চারুশিল্পের শিক্ষকরূপে সঙ্গে নিয়ে যান। কার্তিকচন্দ্রের পুত্র সুধীরকুমার ছাত্ররূপে শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্য আশ্রমে ভর্তি হন। যে কয়েকজন মুষ্টিমেয় ছাত্র নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মচর্য আশ্রম শুরু করেন, সুধীরকুমার তাঁদের মধ্যে অন্যতম। পরবর্তীকালে ব্রহ্মবান্ধব ব্রহ্মচর্য আশ্রমের সংশ্রব ত্যাগ করায় কার্তিকচন্দ্র ও সুধীরকুমার কলিকাতায় ফিরে আসেন।

কার্তিকচন্দ্র এক সময় শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় এক বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। ১৩৪০ সালের শ্রাবণ মাসের প্রবাসী পত্রিকায় 'বিবিধ প্রসঙ্গে' শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের বিষয়ে রোমান ক্যাথলিকদের মন্তব্য ও অমিয় চক্রবর্তী মারফত রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য প্রকাশিত হয়। কার্তিকচন্দ্র শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের সঙ্গে প্রারম্ভেই যুক্ত ছিলেন। সে সব দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে একটি দীর্ঘ পত্র লেখেন। রবীন্দ্রনাথও সে চিঠির

প্রাপ্তি স্বীকার করে উত্তর দিলেও কার্তিকচন্দ্রের প্রশ্নের জবাব কিন্তু সে পত্রে পাওয়া যায়নি। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে প্রবাসীতে 'বিবিধ প্রসঙ্গে' প্রকাশিত সংবাদ, অমিয় চক্রবর্তীর চিঠি, কার্তিকচন্দ্রের রবীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠি এবং রবীন্দ্রনাথের প্রাপ্তিস্বীকার পত্র তুলে দেওয়া হল :—

"শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয়ের উৎপত্তি—প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৪০

আমরা সবাই জানি শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম নাম দিয়ে বিদ্যালয় স্থাপন করেন রবীন্দ্রনাথ এবং তাহাতে তাঁহার পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্মতি ছিল। কয়েক বছর পূর্বে অধুনালুপ্ত ক্যাথলিক হেরাল্ড অব ইন্ডিয়া নামক রোমান ক্যাথলিকদের কাগজে লিখিত হয় যে, উহা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় স্থাপন করেন। এইরূপ কথা সম্প্রতি আবার 'রিনাসেন্ট ইন্ডিয়া" (Renascent India) "নবজাত ভারত" নামক একখানি পুস্তকে লিখিত হইয়াছে। উহার রোমান ক্যাথলিক গ্রন্থকার ডক্টর জ্যাকারিয়াস লিখিয়াছেন—''They [ Brahmabandhav Upadhyaya and Animananda] started in Calcutta a school for high caste Hindues,...and after a few months were joined there by a third companion, Rabindra Nath Tagore, son of the famous Maharsi Debendra Nath Tagore, and of the same age as Upadhyaya. Rabindra Nath prevailed upon them to train for their school to a country-seat of his father near Bolpur and then began Santiniketan.''

"শান্তিনিকেতনের উৎপত্তির এই বৃত্তান্ত ঠিক নয় জানিতাম। তথাপি রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য জানিবার জন্য চিঠি লিখিয়াছিলাম। রবীন্দ্রনাথ দুর্বল থাকায় তাঁহার সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তী লিখিয়াছেন—

"রবীন্দ্রনাথ সংক্ষেপে এই কথা জানাইতে বলিলেন যে শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইবার পর উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের সহিত তাঁহার কলিকাতায় সাক্ষাৎ হয়। উপাধ্যায় কিছু দিন ধরিয়া রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য' ও অন্যান্য গ্রন্থ সম্বন্ধে নানা পত্রিকায় অতি নিপুণ বিচক্ষণ সমালোচনা প্রকাশ করিতেছিলেন। তাহা পাঠ করিয়া রবীন্দ্রনাথ পূর্বেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন। রবীন্দ্রনাথের সহিত যখন উপাধ্যায়ের কলিকাতায় সাক্ষাৎ হয় তখন তিনি কবির নিকট প্রস্তাব করেন যে তিনি এবং তাঁহার এক বন্ধু (অনিমানন্দ) কবির আশ্রমে যোগ দিতে ইচ্ছুক, যেহেতু আশ্রমের কাজ সম্বন্ধে তাঁহাদের পূর্বেই অভিজ্ঞতা আছে এবং দুই জনেই শান্তিনিকেতন আশ্রমের আদর্শ ও কর্ম সম্বন্ধে বিশেষ শ্রদ্ধাবান, রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের দুই জনকে বিশেষ আনন্দের সহিত আহ্বান করেন। অনিমানন্দকে তিনি জানিতেন না। যতদিন তাঁহারা শান্তিনিকেতনে ছিলেন কর্মব্যবস্থার দিক হইতে এবং অন্যান্য নানা বিষয়ে তাঁহাদের সাহায্য বিশেষ কুশলপ্রদ হইয়াছিল।"

প্রবাসীর বিবিধ প্রসঙ্গে এই সংবাদ ভাষ্য ও অমিয় চক্রবর্তীর পত্র পাঠ করে কার্তিকচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে এই পত্র লেখেন—

ওঁ

কলিকাতা ৬।৮।৩৩
১৮ বেথুন রো

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

বহুকাল পরে আপনাকে পত্র লিখ্‌ছি—যেন একটা যুগ অতিবাহিত হোয়ে গেছে। তবে এক সময়ে যথেষ্ট পরিচয় ও পত্র বিনিময় ছিল বলে আশা করি আমাকে স্মরণ করতে বিলম্ব হবে না।

গত ৩০ বৎসরে অনেক পরিবর্তন হোয়েছে যা সব থেকে আমি প্রায় সম্পূর্ণরূপে পৃথক হোয়ে আছি। ঘটনাক্রমে শ্রাবণের 'প্রবাসী'তে বিবিধ প্রসঙ্গে বোলপুর শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে রোমান-ক্যাথলিকদের মন্তব্য ও শ্রীমান অমিয়চন্দ্রের মারফতে আপনার বক্তব্য পাঠ করে মনে হলো এ বিষয়ে আপনারও ঘটনাগুলির পারম্পর্য্য ঠিক মনে নাই ও সেগুলি আপনাকে স্মরণ করিয়ে

দেওয়া আমার কর্ত্তব্য।

উপাধ্যায় মহাশয় Sophia ও Twentieth Century পত্রে আপনার কবিতার সমালোচনা কালে আপনাকে সর্বপ্রথম World Poet আখ্যা প্রদান করেন। ইহা বোধ হয় আজ খুব কম লোকই জানেন—আজ প্রায় ৩০ বৎসর পূর্বে। সেই সময়ে বা কিছু পরে তাঁহার সহিত আপনার সাক্ষাৎ কালে আপনি তাঁহাকে ও আমাদের শান্তিনিকেতনে যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া যান। ইহার কিছুদিন পরেই উপাধ্যায় মহাশয়, আমার এক আত্মীয়, আমি ও আমার পুত্র সুধীর ২।১ দিনের মধ্যে বোলপুরে আপনার অতিথি হই। তখন শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ছিল না। উপাধ্যায় মহাশয় ব্রহ্মাচর্য্যাশ্রমের প্রস্তাব উত্থাপন করিলে আপনি বলেন আপনারও ঠিক সেইরূপ অভিপ্রায় অনেক দিন ধরিয়া আছে। কিন্তু কার্যে পরিণত হয় নাই। আপনাদের মিলিত উৎসাহে তখনই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা সুরু হয়। সে এক অপূর্ব সমাবেশ—একজন বিশ্বকবি ও আর একজন আজীবন ব্রহ্মচারী। দুইজনই দুজনার গুণে মুগ্ধ। কলিকাতায় ফিরিয়া উপাধ্যায় মহাশয়ের ছাত্র সংগ্রহ করিতে বিলম্ব হইল না—কারণ সীমলা স্ট্রিটে তখন তাঁহার একটি বিদ্যালয় ছিল—সেইটি ভাঙ্গিয়া দিলেন ও আমার পুত্র সুধীর, ভাগিনেয় রাজেন ও তাহার বন্ধুপুত্র গোরা, কালা, নন্দ ও আরও গুটিকতক ছাত্র লইয়া উপাধ্যায় মহাশয় ও আমি বোলপুর গেলাম। উপাধ্যায় মহাশয়ের শিষ্য রেবাচাঁদ (এখন অনিমানন্দ) ২।১ দিন পরে আরও কয়েকটি ছাত্র লইয়া উপস্থিত হইল। আপনিও ওদিকে ২।৩ জন শিক্ষক আরও জনকয়েক ছাত্র ও অন্য সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন ও রেবাচাঁদ পৌঁছিবামাত্র তাহাকে প্রধান শিক্ষকের ভার অর্পণ করিলেন। উপাধ্যায় মহাশয়েরই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া আপনি তখন বর্ণাশ্রমের ভিত্তির উপর আশ্রমটি গঠিত করেন। ছাত্রদের বর্ণ হিসাবে প্রাতসন্ধ্যার নিমিত্ত সাদা বেগুনি, লাল ও হরিদ্রা রং-এর পট্টবস্ত্রের ব্যবস্থা হয় ও আপনিই তাহাদের গুরুদেব পদে অধিষ্ঠিত হন। সকলকেই গায়ত্রী পাঠের ও বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের অধিকার দেওয়া হয়। শান্তিনিকেতনের এক প্রান্তে একটি মাত্র তিন কক্ষ পাকা গৃহে আশ্রম প্রথম স্থাপিত হয়। আমিও কিছুদিন শান্তিনিকেতনে অবস্থান করিয়াছিলাম। আপনার হয়ত মনে থাকিতে পারে মীরা ও সমীকে কিঞ্চিৎ চিত্রবিদ্যা শিখাইতাম তবে তাহারা আশ্রমের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল না। রথী ও সন্তোষ তখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দেয় নাই।

আমার বক্তব্য এই আপনাদের দুইজনের মিলিত প্রচেষ্টায় ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের প্রথম উৎপত্তি হয়। উপাধ্যায় মহাশয়ের কলিকাতার বিদ্যালয়ে আপনি যোগদান করিয়াছিলেন তাহা ভিত্তিহীন ও আপনার প্রতিষ্ঠিত আশ্রমে উপাধ্যায় মহাশয় যোগ দেন তাহাও ঠিক নহে। এ বিষয়ে আপনি যদি প্রবাসী ও Modern Review পত্রিকায় একটু পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া দেন তাহা হইলে বোধহয় সকল দিক দিয়া ভাল হয়। আপনি আমার যথাবিহিত প্রণাম গ্রহণ করিবেন। ইতি ২১ শ্রাবণ ১৩৪৩

ভবদীয়
শ্রীকার্তিকচন্দ্র নান

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু,

তোমার চিঠি পেয়ে অনেকদিনের অনেক কথা মনে পড়ে গেল। তোমার বক্তব্য সম্বন্ধে আমার যা বক্তব্য আছে তা যথাসময়ে কাগজেপত্রে দেখতে পাবে। শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত বলে কাজের দায়িত্ব নিতে অক্ষম হয়েছি। ইতি ৮ অগস্ট ১৯৩৩

শুভাকাঙ্ক্ষী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ের উপর কোনও আলোকপাত করেননি। বিষয়টির এখানেই ইতি ঘটে।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় কার্তিকচন্দ্রের ১৮ নম্বর বেথুন রো-এর বাড়িতে থাকতেন। শোনা যায় ইংরেজ সরকার এই বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করেন। বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাল গঙ্গাধর তিলক প্রমুখের পদধূলিতে ধন্য হয়েছিল এই ভবনটি। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্রভূমি ছিল এই ভবনটি। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের স্মরণে এই ভবনগাত্রে যে প্রস্তর ফলকটি প্রোথিত আছে তাতে লেখা আছে—

> "ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় স্মৃতিভবন
> ধর্মবীর উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব
> খ্রিস্টাব্দ ১৮৬১-১৯০৭, সন ১২৬৮-১৩১৪
>
> তাঁর প্রিয়তম ছাত্র ঁ কার্তিকচন্দ্র নান মহাশয়ের এই বাসভবনে অবস্থানকালে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে নানারূপ ধর্ম্মালোচনাদি দ্বারা ও সন্ধ্যা স্বরাজ করালী প্রভৃতি বিখ্যাত লোকপ্রিয় পত্রিকা প্রচারের সাহায্যে স্বদেশবাসীকে সর্বদা ভগবৎ প্রেমে উদ্দীপ্ত ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে রাখতেন।"

বর্তমানে এই বাড়িতে সুধীরকুমারের পুত্র সচ্চিদানন্দ নান বসবাস করেন।

মানিকতলা স্ট্রিটের উপর অনেকগুলি বাড়ির মালিক ছিলেন রামবাগানের দত্ত পরিবার। সেগুলি হল ১০, ১১, ১৭১, ১৭২, ১৮০, ১৮১ মানিকতলা স্ট্রিট। এ ছাড়াও রাজা গুরুদাস স্ট্রিটে আছে ৭ ও ৮ নম্বর বাড়ি। রামবাগানের দত্ত পরিবার শিক্ষাদীক্ষায়, জ্ঞানে গরিমায়, সাংস্কৃতিক অবদানে কলিকাতার একটি বিশিষ্ট পরিবার। পলাশি যুদ্ধের বহু পূর্বে এই পরিবারের পূর্বপুরুষ নীলমণি দত্তের পিতা বর্ধমানের আজারপুর গ্রাম থেকে কলিকাতায় এসে রামবাগানে বসবাস শুরু করেন। তিনিই রামবাগানের দত্ত পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা।

রামবাগান এলাকার মালিক ছিলেন রাম দত্ত। তাঁর নামে ওই অঞ্চলে একটি বাজার ছিল—নাম রামবাজার। এ ছাড়া রামবাগান লেন নামে একটি রাস্তাও আছে। পরে বাজার উঠে গেলে ওই জমিতে প্রকাণ্ড বস্তি গড়ে উঠে। আজও ওই অঞ্চলকে রামবাগান বলা হয়।

নীলমণি দত্তের জন্ম ৩রা জানুয়ারি ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে। কোম্পানি আমলে নীলমণি একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর মানিকতলা স্ট্রিটের বাসভবনে মহারাজা নন্দকুমার, মহারাজা নবকৃষ্ণ প্রমুখ সেকালের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ প্রায়ই আসতেন। উইলিয়াম কেরীর স্ত্রীর অসুখের সময় নীলমণি দত্তের বাড়ি থেকে তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

নীলমণি দত্তের তিন পুত্র—রসময়, হরিশ ও পীতাম্বর। রসময় দত্ত (১৭৭৯-১৮৫৪)-কে দত্ত পরিবারের প্রাণপুরুষ বলা যেতে পারে। তাঁর সময় থেকে দত্ত পরিবার কলিকাতার সমাজজীবনে গৌরবের আসন অধিকার করে। তিনি ছিলেন বহুভাষাবিদ। একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কেরানি হিসাবে জীবন শুরু করে পরে ছোট আদালতের বিচারক হন। এই বিচারালয়ে তিনিই প্রথম বাঙালি বিচারক। ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনে ও হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠায় অন্যতম পুরোধা ছিলেন। কাউন্সিল অফ এডুকেশন এবং সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক ছিলেন। পরে কলেজের সহকারী সম্পাদক পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ ঘটায় তিনি বিদ্যাসাগরকে কার্যভার বুঝিয়ে দিতে বাধ্য হন। গভর্নর জেনারেল লর্ড অকল্যান্ড Fever Hospital and Municipal Enquiry Committee নামে যে কমিটি গঠন করেন, তার ভারতীয় সদস্য ছিলেন চারজন—দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রসময় দত্ত ও রুস্তমজি কাওয়াসজি। কলিকাতার স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সকল বিষয়ই এই কমিটি ব্যাপক ভাবে অনুসন্ধান করেন। এ ছাড়া রসময় দত্ত সেকালের বাংলার শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজজীবনের সহিত সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি ১০ নম্বর ও ১৭১ নম্বর মানিকতলা স্ট্রিটের বাড়িতে বাস করতেন। প্রথম বাড়িটি বহির্মহল আর পরের বাড়িটি ছিল অন্দরমহল। দুই বাড়ি

একটি সেতুর দ্বারা সংযুক্ত ছিল।

১৭১ নম্বর বাড়িটি পরবর্তীকালে রসময় দত্তের পৌত্র উমেশচন্দ্রের অধিকারে আসে। তাঁর পিতা কৈলাসচন্দ্র হিন্দু পাইওনিয়ার (Hindu Pioneer) নামে সাহিত্যপত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন আবগারি বিভাগের সুপারিন্টেন্ডেন্ট, কলিকাতার ডেপুটি কালেক্টর, পরে কালেক্টর হন। পিতার একমাত্র পুত্র উমেশচন্দ্র (১৮৩৬-১৯১২) হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভ করেন। প্রথম জীবনে মেসার্স ডেভিডসন অ্যান্ড কোং-এর বুককিপার পরে কোর্ট অফ রিকোয়েস্টের (The Court of Requests) কমিশনার হন। বহুদিন তিনি কলিকাতা পুরসভার সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন—প্রথমে কমিশনার, পরে কিছু সময়ের জন্য ভাইস-চেয়ারম্যানের পদে কার্য করেন। এরপর বহুদিন কলিকাতা পুরসভার কালেক্টরের পদে আসীন ছিলেন, এ ছাড়া তিনি ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট। জার্মান ও ফরাসি ভাষায় তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল। ওই সব ভাষার অনেক কবিতা ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। সেকালের The Calcutta Literary Gazette, The Bengal Magazine এবং Mukherjee's Magazine নামে পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হত। তিনি খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন।

কলিকাতা পুরসভা উমেশচন্দ্র দত্তের নামে একটি গলিপথ নামকরণ করেন। রাস্তাটি বিডন স্ট্রিট থেকে আরম্ভ হয়ে মিনার্ভা থিয়েটারের পাশ দিয়ে দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে মানিকতলা স্ট্রিটে এসে পড়েছে।

উমেশচন্দ্রের চার পুত্র—যোগেন্দ্র, দ্বিজেন্দ্র, বিনয় ও বিনোদ। দ্বিজেন দত্ত কলিকাতা পুরসভার কালেক্টর পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

যোগেন্দ্রচন্দ্র দত্ত (১৮৬২-১৯২৯) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র। এম. এ. পরীক্ষায় এবং অ্যাটর্নিশিপ পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। পরে আইন ব্যবসায়ে ব্রতী হন। আইনের কাজের ফাঁকে ফাঁকে তিনি নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, ইনকরপোরেটেড ল সোসাইটির সদস্য, কলিকাতা পুরসভার কাউন্সিলর, ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটির সদস্য প্রভৃতি। তিনি ছিলেন বহুভাষাবিদ—ফরাসি, জার্মান, ইটালি, সংস্কৃত, ফারসী প্রভৃতি ভাষায় তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল। তাঁর কাব্যপ্রতিভাও কম ছিল না। সেকালের পত্র-পত্রিকায় তাঁর অনেক কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল, সংস্কৃত ও ফারসী ভাষায়ও অনেক কবিতা রচনা করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর কলিকাতা পুরসভা ১৬ই জুলাই ১৯৩০ সালের অধিবেশনে মানিকতলা স্ট্রিট থেকে শুরু করে নন্দলাল মল্লিক লেন পর্যন্ত রামবাগান লেনের অংশবিশেষ যোগেন্দ্রচন্দ্র দত্তের নামে যোগেন দত্ত লেন নামকরণ করেন।

রামবাগান লেন সম্বন্ধে এই প্রসঙ্গে দু'চার কথা বলা দরকার। রামবাগান লেন কলিকাতার একটি প্রাচীন রাস্তা। রামবাগানের মালিক ছিলেন রাম দত্ত। তাঁর নামে একটি বাজার ছিল—সে কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। রামবাগান লেন মানিকতলা স্ট্রিটের দক্ষিণ দিক থেকে আরম্ভ হয়ে সোজা দক্ষিণে এগিয়ে বলরাম দে স্ট্রিট ও বিন্দু পালিত লেনের সংযোগস্থলে এসে পড়েছে। রামবাগান লেনের অংশ নিয়ে যোগেন দত্ত লেন হওয়াতে পূর্ববর্তী রাস্তার দৈর্ঘ্য হ্রাস পায়। বর্তমানে নন্দ মল্লিক লেন থেকে বিন্দু পালিত লেন পর্যন্ত এই পথটি বিস্তৃত।

রামবাগানে আছে বিরাট বস্তি। বস্তির অধিকাংশ বাসিন্দা অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে সমাজের নিম্নশ্রেণীর মানুষ—ডোম সম্প্রদায়ভুক্ত। এই সম্প্রদায় জাতশিল্পী, এদের হাতে বাঁশের তৈরি শিল্পকর্ম আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছে। বস্তির পাশেই পতিতা পল্লী, নানা অসামাজিক ক্রিয়াকর্মের কেন্দ্রভূমি। এই বস্তির অধিবাসীদের পুনর্বাসনের জন্য যে বিশাল কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে, কলিকাতার সামাজিক ইতিহাসে তার গুরুত্ব অপরিসীম। এই ডোম সম্প্রদায়ের সামাজিক ও আর্থিক উন্নতিকল্পে রামকৃষ্ণ মিশন এক বহুমুখী পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে এলেন। ১৯৫২ সালে রামকৃষ্ণ মিশন একটি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করে কর্মকাণ্ডের যে প্রদীপটি প্রজ্জ্বলিত করেছেন, তার আলোতে গড়ে উঠেছে প্রাথমিক ও নার্সারি বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র, সেলাই, বয়ন, বাঁশ ও বেতের কাজের প্রশিক্ষণকেন্দ্র, অঙ্কন শিক্ষাকেন্দ্র, গ্রন্থাগার প্রভৃতি। রামকৃষ্ণ মিশন

লোকশিক্ষা পরিষদের তত্ত্বাবধানে এই প্রকল্প পরিচালনা করছেন স্থানীয় বাসিন্দাদের সংগঠন 'জনকল্যাণ সমিতি'। রামবাগানের বস্তির বাসিন্দাদের পুনর্বাসনের জন্য আবাসন প্রকল্পটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ—২২টি ব্লকে এটি সম্পূর্ণ হবে। প্রতি ব্লকে ১৬টি করে দু'ঘরের ফ্ল্যাট থাকবে। ধাপে ধাপে কাজ হচ্ছে—ইতিমধ্যে ৬টি ব্লকে ৯৬টি ফ্ল্যাট সম্পূর্ণ হয়েছে। সমগ্র পরিকল্পনার আর্থিক দায়িত্ব বহন করছেন রামকৃষ্ণ মিশন। দেশ-বিদেশ থেকেও সাহায্য এসেছে। এ ছাড়া কলিকাতা পুরসভা, পশ্চিমবঙ্গ সরকারও সহায়তা করেছেন। বস্তিবাসীরা এই প্রকল্প রূপায়ণে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন। যে ৬টি ব্লকের ৯৬টি ফ্ল্যাটের নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়েছে, ৬ই মে ১৯৯০ সালে হেদুয়াতে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বস্তিবাসীদের হাতে ওই ফ্ল্যাটের চাবি তুলে দেন। পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে রূপায়িত হলে পর এ অঞ্চলের চেহারা বদলে যাবে।

আবার দত্ত বাড়ি প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। ১৭১ নম্বর মানিকতলা স্ট্রিটের বাড়িটি ডোমপাড়ার কর্মীবৃন্দকে হস্তান্তরিত করা হয়। আর ১০ নম্বর বাড়িটি পেলেন রসময় দত্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র কিসানচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র চারুচন্দ্র। তিনি ছিলেন ব্যারিস্টার, সোনার পদক পেয়েছিলেন লন্ডনের লিঙ্কন ইন (Lincoln's Inn) থেকে। বর্তমানে চারুচন্দ্রের উত্তরপুরুষ প্রতুলচন্দ্রের অধিকারে আছে এই ভবনটি, তিনি বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসে কর্মরত ছিলেন। আর কিসানচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র হেমচন্দ্র পেলেন ১১ নম্বর বাড়িটি। সেটি পরে হস্তান্তরিত হয়।

১৭২, মানিকতলা স্ট্রিটের বাড়িটি রসময় দত্তের তৃতীয় পুত্র হরচন্দ্র দত্তের অধিকারে ছিল। তাঁর দুই পুত্র—বরুণচন্দ্র ও মিলনচন্দ্র। বরুণচন্দ্র স্কটিশ চার্চ কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। এই বাড়িটি পরে জলি চ্যাপ আইসক্রিম কোম্পানি কিনে নেয়।

১৮০, মানিকতলা স্ট্রিটের বাড়িটির মালিক ছিলেন গোবিন্দচন্দ্র দত্ত। তিনি রসময় দত্তের চতুর্থ পুত্র। গোবিন্দচন্দ্র খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হন। তাঁর তিনটি সন্তান—তরু, অরু ও আবজু। তরু ও অরু দুই বোনই ছিলেন স্বভাবকবি। তরু দত্তের (১৮৫৬-১৮৭৭) প্রতিভা সেকালের বিদ্যোৎসাহী সমাজকে মুগ্ধ করেছিল। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে পরিবারের সঙ্গে ফ্রান্সে যান এবং নীসের একটি পাঁসিয়ানাতে ও পরে কেম্‌ব্রিজে শিক্ষাগ্রহণ করেন। ১৮৭৩ সালে দেশে ফিরে আসেন। কলিকাতায় এসে সংস্কৃত শিক্ষায় মন দেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা 'Lelonte de lisle', এটি ফরাসি কবির কাব্য আলোচনা, বেঙ্গল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়। বহু ফরাসি কবির কবিতা ইংরেজিতে অনুবাদ করে তিনি 'A Sheaf Gleaned in French Field' নামে গ্রন্থটি ১৮৭৬ সালে প্রকাশ করেন। এই বই-এর আটটি কবিতা অনুবাদ করেছিলেন তাঁর অনুজা অরু দত্ত। এর ফলে তাঁর কবি-খ্যাতি বিখ্যাত ইংরেজ ও ফরাসি সমালোচকদের প্রশংসা লাভ করে। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Ancient Ballads and Legends of Hindusthan' ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই কাব্যগ্রন্থ ভারতে ইংরেজি ভাষায় লেখা কবিতার ইতিহাসে নতুন যুগের সূচনা করে। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে 'Binaca' নামে তাঁর একটি উপন্যাস বেঙ্গল ম্যাগাজিন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। অপর বিখ্যাত উপন্যাস 'Le Journal de Mademoiselle d' Arvers' তাঁর মৃত্যুর পর প্যারি শহর থেকে ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। জার্মান ভাষায় তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল। মাত্র ২১ বছর বয়সে যক্ষ্মা রোগে তাঁর মৃত্যু হয়। গোবিন্দচন্দ্রের এই বাড়িটিও পরবর্তীকালে হস্তান্তরিত হয়ে যায়।

রসময় দত্তের কনিষ্ঠ পুত্র গিরিশচন্দ্র। তিনি ১৮১ নং বাড়ির মালিক ছিলেন। তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। এ বাড়িটিও পরে হস্তান্তরিত হয়।

রসময় দত্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হলেন পীতাম্বর দত্ত। তাঁর দুই পুত্র—শশীচন্দ্র ও ঈশানচন্দ্র। কবি, প্রবন্ধকার, গ্রন্থ প্রণেতা শশীচন্দ্র (১৮২৪-১৮৮৫) একজন তেজস্বী ব্যক্তি ছিলেন। হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভের পর সরকারি ট্রেজারিতে সামান্য কেরানিরূপে প্রবেশ এবং পরে হিসাব বিভাগের বড়বাবু পদে উন্নীত হন। কিন্তু তৎকালীন ছোটলাট জর্জ ক্যাম্পবেল তাঁর উচ্চপদ লাভের অন্তরায় হলে প্রতিবাদে স্বেচ্ছায় চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। 'রেমিনিশেন্স অফ এ কেরানিজ লাইফ' শীর্ষক এক প্রবন্ধ মুখার্জিস ম্যাগাজিনে প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধে তিনি সরকারি পদপূরণের ঘৃণিত প্রক্রিয়াকে উদ্‌ঘাটন করেন। 'শঙ্কর—এ টেল অফ দি ইন্ডিয়ান মিউটিনি' গ্রন্থে সিপাহি বিদ্রোহ

সম্বন্ধে তাঁর নিজ অভিজ্ঞতার এক বিস্তারিত বর্ণনা প্রকাশ করেন। এ ছাড়াও 'বার্টন' ছদ্মনামে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ইংরেজিতে কবিতা, গল্প, প্রবন্ধাদি লিখতেন। তাঁর কলমে স্পষ্টবাদিতার সুর ধ্বনিত হওয়াতে অ্যাশলি ইডেন, এরস্কাইন প্যারী প্রমুখ সেকালের ইংরেজ রাজপুরুষবৃন্দ তাঁর উপর ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। এ সত্ত্বেও সরকার তাঁকে 'রায় বাহাদুর' খেতাব দিয়েছিলেন। তাঁর রচিত আরেকটি গ্রন্থ হল 'Vision of Sumerie'। তিনি ছিলেন ঈশানচন্দ্রের পুত্র, প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক রমেশচন্দ্রের অভিভাবক।

রমেশচন্দ্র স্বয়ং ৮, রাজা গুরুদাস স্ট্রিটের ভবনে বাস করতেন। রাজা গুরুদাস স্ট্রিট একটি ছোট রাস্তা। এটি কলিকাতার প্রাচীন রাস্তাগুলির অন্যতম। বিডন স্ট্রিটের মিনার্ভা থিয়েটারের পাশ দিয়ে আরম্ভ হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এগিয়ে মানিকতলা স্ট্রিটে এসে পড়েছে। ১৮২৫ সালের কলিকাতা পুরসভার Assesment Register-এ রাস্তাটি রাজা গুরুদাস লেন নামে উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তীকালে রাস্তাটি প্রশস্ত হলে লেন থেকে স্ট্রিটের পর্যায়ে উন্নীত হয়। মহারাজ নন্দকুমারের একমাত্র পুত্র ছিলেন রাজা গুরুদাস। তিনি মুর্শিদাবাদের পঞ্চম নবাব মোবারকউদ্দৌলার দেওয়ান ছিলেন। সুতানুটির চড়কডাঙ্গায় তাঁর আবাসভবন ছিল। কেউ কেউ মনে করেন বিডন উদ্যানই (এখন রবীন্দ্র কানন) ছিল তাঁর বাসগৃহ। তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। ৫ই ডিসেম্বর ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে জঙ্গীপাড়ায় মারা যান।

রমেশচন্দ্রের এই বাড়ির গাত্রে এক প্রস্তর ফলকে লেখা আছে—"A distinguished man of letters lived in this house from 1848-1878" এরপর তিনি বিডন স্ট্রিটে বাড়ি করে উঠে যান। বর্তমানে যেখানে Holy Child Institute-এর স্কুল ভবনটি আছে ওইখানে ছিল তাঁর নতুন ভবন। এখানেও তিনি দীর্ঘ দিন বাস করেন। এই ভবনেই তাঁর কন্যা কমলার বিবাহ হয়। এ বাড়ি ছেড়ে ৯/২, হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রিটে (এখন পিকাসো বীথি) চলে আসেন। বর্তমানে এই বাড়িতে আছে Enforcement Dept.-এর অফিস। এই হাঙ্গারফোর্ডের বাড়ি থেকে তিনি বরোদায় চলে যান। ৮ নম্বর রাজা গুরুদাস স্ট্রিটের বাড়িতে রমেশ দত্তের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যোগেশচন্দ্রের উত্তরপুরুষেরা বাস করেন।

৭নং রাজা গুরুদাস স্ট্রিটে দত্ত পরিবারের আরেক শরিক বাস করেন। এঁরা সকলে নামের পরে 'কৃষ্ণ' ব্যবহার করেন। এই পরিবারের উপেন্দ্রকৃষ্ণের পুত্র হলেন ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা-সভ্য রজনী পাম দত্ত (১৮৯৬-১৯৭৪)। উপেন্দ্রকৃষ্ণ ১৮৭৮ সালে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য লন্ডনে যান এবং কেম্‌ব্রিজে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। গরিবের চিকিৎসকরূপে খ্যাতিলাভও করেন।

রজনী পাম কেম্‌ব্রিজ স্কুল থেকে বৃত্তিসহ সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। ১৯১৫ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সৈন্যদলে যোগ দেন। যুদ্ধবিরোধী মতবাদ প্রকাশ করায় কারারুদ্ধ হন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সময় তিনি 'সোশ্যালিস্ট সোসাইটি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এই সংস্থা রুশ বিপ্লবকে সমর্থন জানালে তিনি অক্সফোর্ড থেকে বিতাড়িত হন। পরের বছর পরীক্ষা দেবার অনুমতি পেলে তিনি ৮টি বিষয়ে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ৩১শে জুলাই ১৯২০ সালে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট ইউনিটি কন্‌ভেনশনের তিনি প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ১৯২১ সালে 'লেবার মান্থলি' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক থাকায় বহুদিন (১৯২৪-১৯৩৬) তাঁকে নানা স্থানে আত্মগোপন করে থাকতে হয়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জন্য 'দত্ত-ব্রাডলে থিসিস্' তাঁর তত্ত্বাবধানে ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে ব্রাসেলস্ শহরে লিখিত হয়। তিনি ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরোর সভ্য, পার্টির মুখপত্র 'ডেইলি ওয়ার্কার' এবং লেবার মান্থলি পত্রিকার সম্পাদক ও সিঙ্কম্যান পপুলার ফ্রন্ট কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৯৩৯-১৯৪১ পর্যন্ত পার্টির সাধারণ সম্পাদক রূপে কাজ করেন। ডেইলি ওয়ার্কার পত্রিকার জন্য কেবিনেট মিশন সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য ১৯৪৬ সালে ভারতে আসেন। অসুস্থতার কারণে ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে পার্টি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। অনেকগুলি পুস্তক রচনা করেছিলেন—তাদের মধ্যে Socialism and the Living Wage, Life of Lenin, The International প্রভৃতি উল্লেখ্য। ক্লেমেন্স দত্ত তাঁর সহোদর।

বর্তমানে গিরীন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত ৭ নম্বর বাড়িতে বসবাস করেন।[১১৪]

১২৭ মানিকতলা স্ট্রিটের (এখন শিশির ভাদুড়ি সরণি) উপর এক প্রশস্ত এলাকা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে ডাফ চার্চ। এই চার্চের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণপুরুষ আলেকজান্ডার ডাফ।

শিক্ষাব্রতী, সুপণ্ডিত আলেকজান্ডার ডাফ (১৮০৫-১৮৭৮) সম্পর্কে বলরাম ঘোষ স্ট্রিটে অবস্থিত ডাফ-হাইস্কুল ফর গার্লস প্রসঙ্গে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে আমরা তাঁর খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্য গির্জা নির্মাণ ও পরবর্তীকালে শিক্ষা বিস্তারে তাঁর ভূমিকার উপর আলোকপাত করতে চাই।

ডাফ সাহেবের বিশ্বাস ছিল বর্ণহিন্দু ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় খ্রিস্টধর্মের প্রতি যদি আকৃষ্ট হয় তবে তা ধীরে ধীরে সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে যাবে। তাঁর পূর্ববর্তী প্রচারকগণ খ্রিস্টধর্ম প্রচার শুরু করেছিলেন সমাজের নীচের তলার জনসমাজের মধ্যে। শিক্ষা-বিস্তারের ব্যাপারে তিনি তাঁর নিজস্ব মতাদর্শ গ্রহণ করেছিলেন। ডাফ সাহেবের কলিকাতা আগমনের অনেক পূর্বেই বর্ণহিন্দুদের জন্য হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় সেকালের কলিকাতায় ইংরেজি স্কুল ছিল খুবই কম, বর্ণ হিন্দু সমাজের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ও সেই সঙ্গে খ্রিস্টধর্মের মূল সূত্রগুলিকে ছাত্রদের মধ্যে প্রচারের নিমিত্ত ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন স্থাপন করেন।

জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন স্থাপিত হবার পর ডাফ সাহেব একটি গির্জা নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমেই স্থির করেছিলেন, সাধারণ গির্জার মতো তাঁর প্রতিষ্ঠিত গির্জায় নিয়মনীতির কড়াকড়ি থাকবে না। ১৮৪৮ সালের নভেম্বর মাসে ডাফ সাহেবের উদ্যোগে যে সভা (Congregation) হয়, তাতে প্রস্তাবিত চার্চের ফ্রি মিশন চার্চ (Free Mission Church) নামকরণের সিদ্ধান্ত হয়। গির্জা নির্মাণে কাউন্টেস এফিনগাম্ (Countess Effinghum) মুক্তহস্তে সাহায্য করেছিলেন। প্রথমে এই জায়গায় চ্যাপেল ও যাজকের বাসস্থান (Manse) নির্মিত হয়। ১৮৫৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই ভজনালয়ের দ্বারোদঘাটন হয়। প্রথম যাজক ছিলেন ডঃ ডেভিড ইওয়ার্ট (Dr. David Ewart)। প্রথম দিকে জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশনের অধ্যাপকগণই গির্জাটির তত্ত্বাবধানে ছিলেন। কলেজের ছাত্ররা হামেশাই এখানে আসত, এই কারণে চার্চটিকে নেটিভ চার্চ আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে রেভারেন্ড লালবিহারী দে এই গির্জার প্রথম বাঙালি যাজক হন। ১৯০১ সালে প্রার্থনা গৃহ নির্মিত হয়। এখানে ৩৫০ জনের বসার ব্যবস্থা আছে। ১৯১০ সালের পূর্ব পর্যন্ত এটি ইউনাইটেড ফ্রি মিশন চার্চ (United Free Mission Church) নামে পরিচিত ছিল। ১৯১০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে চার্চটির নতুন নামকরণের দুটি প্রস্তাব—ডাফ মেমোরিয়াল চার্চ ও ডাফ চার্চ—বিচার-বিবেচনা করা হয়। অবশেষে 'ডাফ চার্চ' নামকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। আজও এই নাম বহাল আছে। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে গির্জার কার্যবিবরণী বাংলায় লেখা শুরু হয়।

বিবাহ নথিভুক্তকরণ (Marriage Registration) যখন বিংশ শতাব্দীতে বাধ্যতামূলক করার ব্যবস্থা হয়েছে, ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় ডাফ সাহেব তাঁর চার্চে প্রথম এই নিয়মের প্রবর্তন করেন। চার্চের পুরানো নথিপত্রে দেখা যায়, এক বাঙালি খ্রিস্টানের ১৪ই নভেম্বর ১৮৪৮ সালের বিবাহটি প্রথম নথিভুক্ত। এই বিবাহের প্রথম সাক্ষী ছিলেন রেভারেন্ড আলেকজান্ডার ডাফ। অন্যান্য সাক্ষীরা হলেন বৈকুণ্ঠনাথ দে, কালিদাস চক্রবর্তী প্রমুখ।

পরবর্তীকালে সেন্ট অ্যান্ড্রুজ গির্জার বাংলা বিভাগ ডাফ চার্চের সঙ্গে মিলিত হয়। ওই চার্চের তিনটি বড় শ্বেতপ্রস্তরফলকে খোদিত বাংলায় লেখায় বাইবেলের অনুশাসন ডাফ গির্জায় লাগানো আছে। বর্তমানে ডাফ চার্চের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছে সেন্ট মার্গারেট স্কুল, বলরাম ঘোষ স্ট্রিটে অবস্থিত ডাফ স্কুল, স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুল ও কলেজ, সেন্ট মার্গারেট স্কুল ভবনে অবস্থিত ডায়োসেশন কে.জি. স্কুল। আর আছে এই চার্চ প্রাঙ্গণে একটি সান্‌ডে স্কুল। খ্রিস্টান ছেলেমেয়েরা এখানে বাইবেলের শিক্ষা গ্রহণ করে।

ডাফ চার্চের পূর্ব পাশ দিয়ে উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত রাস্তাটি রেভারেন্ড আলেকজান্ডার ডাফের

নামে ডাফ স্ট্রিট নামাঙ্কিত হয়েছে। পথটি বিডন স্ট্রিটে হোলি চাইল্ড ইনস্টিটিউটের গা ঘেঁষে দক্ষিণে প্রসারিত হয়ে বিবেকানন্দ রোডে এসে মিশেছে। রাস্তাটি ঊনবিংশ শতাব্দীর আটের দশকে নির্মিত হয়ে থাকবে। ১৮৮৮ সালে Municipal Consolidation Act II B.C. নামে কলিকাতা পৌর আইন গৃহীত হয় । এই আইনে কলিকাতা শহরতলির অনেকগুলি অঞ্চল শহর কলিকাতার অন্তর্ভুক্ত হয়। এর ফলে কলিকাতা পুরসভার ১৮টি ওয়ার্ডের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ২৫টি হয়। তার জন্য শহর কলিকাতার নতুন যে মানচিত্র প্রস্তুত করা হয় তাতে ডাফ স্ট্রিট রাস্তাটি চিহ্নিত আছে। এর পূর্বে বিভার্লি সাহেব ১৮৭৬ সালে কলিকাতার জনগণনার যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিলেন তাতে প্রতিটি ওয়ার্ডভিত্তিক রাস্তার জনগণনার একটি তালিকা দেওয়া আছে। সেই তালিকায় ডাফ স্ট্রিটের কোনও উল্লেখ নেই। সম্ভবত এই রাস্তাটি ১৮৮৮ সালের পূর্বে নির্মিত হয়ে থাকবে। সে সময় পথটি ছিল খুবই সংকীর্ণ এবং মানিকতলা স্ট্রিট পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা মানিকতলা স্পার (পরেই বিবেকানন্দ রোড) নির্মাণের জন্য ৬ জানুয়ারি ১৯১৫ সালে একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা (Scheme No. VII C—Manicktolla Spur) প্রকাশ করেন। এই পরিকল্পনার মধ্যে ডাফ স্ট্রিটের উন্নয়ন অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯২৯ সালে ডাফ স্ট্রিটের উন্নয়ন সম্পন্ন হয়। রাস্তাটি ৪০ ফুট প্রশস্ত হয় এবং এটিকে মানিকতলা স্পার পর্যন্ত প্রসারিত করা হয়। যান চলাচলের জন্য ২৪ ফুট আর দু'দিকে ৮ ফুট করে দুটি ফুটপাতের ব্যবস্থা হয়। কলিকাতা পুরসভা ২রা সেপ্টেম্বর ১৯২৯ সালে কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থার কাছ থেকে রাস্তাটি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গ্রহণ করেন। পরে ৮ই মার্চ ১৯৩৩ সালের পৌর অধিবেশনে ডাফ স্ট্রিটের প্রসারিত অংশের নাম 'ডাফ স্ট্রিট' রাখা হয়। আলেকজান্ডার ডাফ প্রথমে ২২ নং মির্জাপুর স্ট্রিটে থাকতেন, পরে ২ নং কর্নওয়ালিস স্কোয়ারে বসবাস করেন।[১১৫]

মানিকতলা অঞ্চলে সাহাদের প্রতিষ্ঠিত জগজ্জননী মন্দির ৭৭, মানিকতলা স্ট্রিটে অবস্থিত। অনেকটা এলাকা নিয়ে এই মন্দির। মন্দিরের অভ্যন্তরে অষ্টধাতুর দুর্গা প্রতিমা। বাসন্তী পূজায় এই প্রতিমার সাড়ম্বরে পূজা অর্চনা হয়। পূজায় ৬ মণ চালের নৈবেদ্য দেওয়া হয়। নবমী পূজার দিন দরিদ্রনারায়ণ সেবার ব্যবস্থা আছে।

মানিকতলার সাহা পরিবার কলিকাতার প্রাচীন পরিবারগুলির অন্যতম। সাহাদের ব্যবসাসূত্রে আদি বাস ছিল মিরাটে। এঁদেরই পূর্বপুরুষ মিরাট থেকে এসে গোবিন্দপুরে প্রথম বসতি স্থাপন করেন। পরে গুরুপ্রসাদ সাহা মানিকতলায় এসে বসবাস শুরু করেন। মদের আমদানি ব্যবসা করে সাহাদের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে এবং কলিকাতায় বহু জায়গায় প্রচুর ভূসম্পত্তি ক্রয় করেন। ৩ ও ৪ নম্বর রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেসে সাহাদের অফিস ও গুদাম বাড়ি ছিল। রাস্তাটি প্রশস্ত করার সময় কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা এই বাড়ি দুটি অধিগ্রহণ করেন। পরে এই বাড়ি ভেঙে রাস্তা নির্মিত হয়। সে সময় কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে, বিভিন্ন হোটেলে এবং লক্ষ্ণৌতে সাহাদের মদ সরবরাহের একচেটিয়া কারবার ছিল। বর্তমানে এই পরিবারের মুষ্টিমেয় কয়েকজন আজও এই পারিবারিক ব্যবসায় নিয়োজিত আছেন।

গুরুপ্রসাদ সাহার পুত্রদের মধ্যে জনার্দন ও মুকুন্দমুরারী ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে মানিকতলা স্ট্রিটের উপর এই জগজ্জননী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরের নিত্য পূজা ও বাৎসরিক পূজার জন্য তাঁরা অছি পরিষদ গঠন করে দিয়ে যান। সাহাদের কলিকাতার অন্তর্গত অনেকগুলি বৃহৎ ভবন অছি পরিষদের অন্তর্গত। ভবনগুলির আয় থেকে জগজ্জননীর বাৎসরিক ব্যয় নির্বাহ হয়। দুর্ভিক্ষের সময় দরিদ্র জনসাধারণের দুর্দশা লাঘবের জন্য যথাসাধ্য ব্যয় করার ক্ষমতা অছি পরিষদকে দেওয়া আছে। এ ছাড়া প্রতি গ্রীষ্মকালে চাল ও আম বিতরণের ব্যবস্থা ছিল। ১৯৪২ সালে সরকার চালের উপর কড়া নিয়ন্ত্রণ আরোপ করায় চাল বিতরণ বন্ধ হয়ে যায়। সাহা পরিবারের বসত বাড়িতে বহু দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র আহার ও বাসস্থান পেয়ে শিক্ষালাভ করেছে। এই পরিবারের উত্তরপুরুষ শিবলাল সাহা কলিকাতা পশু ক্লেশ নিবারণী সভা ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনকালে এককালীন নগদ অর্থদান করেন।

১৯৩৫ খ্রিঃ (১৩৪১ বঙ্গাব্দে) 'বঙ্গীয় সাহা সমিতি' এই জগজ্জননী মন্দিরে স্থাপিত হয়। শুঁড়ি সম্প্রদায়ের দ্রুত উন্নয়ন, শিক্ষা বিস্তার, স্ত্রীশিক্ষা প্রসার, সমাজের কু-প্রথাগুলি দূরীকরণ, গ্রন্থালয়,

ছাত্রাবাস, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠাই সমিতির মূল উদ্দেশ্য। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে ৫২, ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিটের ভবনটি ৩৫,০০০ টাকায় ক্রয় করা হয়। বঙ্গীয় সাহা সমিতি জগজ্জননীর মন্দির ভবন থেকে নতুন বাড়িতে উঠে আসে। এই বাড়িটি ইন্ডিয়ান মিরর পত্রিকার সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেনের বসত বাড়ির অংশ। পরে বাড়িটি চারতলা করা হয় এবং এখানে একটি ছাত্রাবাস স্থাপন করা হয়। সেটি আজও আছে।

এই শতাব্দীর তিনের দশকে ৩নং ডাফ স্ট্রিটে স্থাপিত হয়েছিল 'জগজ্জননী ক্লাব'। সাংস্কৃতিক অঙ্গ হিসাবে এই ক্লাবকে ঘিরে শুরু হয়েছিল নাটক, যাত্রা ও গানের আসর। সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন খ্যাতনামা অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে। তিনি ক্লাবের আজীবন সদস্য ছিলেন। ক্লাবের গৌরবের ইতিহাসকে উজ্জ্বল করেছে সাঁতারুরা। এই প্রসঙ্গে কমল সাহা, অশোক বিশ্বাস, শৈবালকুমার সাহার নাম উল্লেখ্য। ক্লাবটি আজও তার গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

বর্তমানে জনার্দন ও মুকুন্দমুরারী সাহার উত্তরপুরুষগণ ৭৩, ৭৪/১, ৭৯, ১২৪/১, ১২৫এ, ১২৫বি, ১২৫সি, ১২৫ডি, ১২৬, মানিকতলা স্ট্রিট ও ১, ২, ২এ, ২বি, ৩, ৪, ৫, ডাফ স্ট্রিটের ভবনে বসবাস করেন।

একসময় 'ভারতী বিদ্যালয়' সাহাদের ১২৫এ, মানিকতলা স্ট্রিটের আদি বাড়িতে ছিল। ভারতী বিদ্যালয়ের পূর্বতন নাম ছিল শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা। এটি ডবলু. সি. ব্যানার্জী স্ট্রিটে স্থাপিত হয়েছিল। এর মালিক ছিলেন শিক্ষাবিদ ভবতারণ সরকার। তিনি ১৯২৮ সালে এই পাঠশালাটিকে সাহাদের আদি বাড়িতে তুলে আনেন। নতুন নামকরণ করেন ভারতী বিদ্যালয়। সাহা পরিবার ভবতারণকে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির ব্যাপারে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াতে সাহা পরিবার তাঁদের ৭৪, মানিকতলা স্ট্রিটের একটি বড় বাড়ি ভাড়ার ভিত্তিতে দেন। পরে ভারতী বিদ্যালয়৩৫/২, বিডন স্ট্রিটের বাড়িতে উঠে আসে। ভবতারণের মৃত্যুর পর ভারতী বিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করে 'ভবতারণ সরকার বিদ্যালয়' নামকরণ করা হয়। সাহা পরিবারের চরণবিহারী সাহা ভারতী বিদ্যালয়ের কার্যকরী সমিতির আজীবন সভ্য ছিলেন।

বিনোদ সাহা এই পরিবারের আর এক সদস্য। তাঁর নামে শুঁড়িপাড়া অঞ্চলে একটি রাস্তা আছে। রাস্তাটি বিবেকানন্দ রোড থেকে আরম্ভ হয়ে সোজা দক্ষিণে এগিয়ে চালতাবাগান লেনে এসে পড়েছে। এই রাস্তাটিরও কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা মানিকতলা স্পার (এখন বিবেকানন্দ রোড) নির্মাণের সময় উন্নয়ন ও প্রশস্ত করেন। রাস্তাটির নাম 'বিনোদ সাহা লেন'।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের তিরোধানের পর ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে ভাই প্রসন্নকুমার কেশব অ্যাকাডেমি স্থাপন করেন। কিছুকাল পরে প্রসন্নকুমারের জ্যেষ্ঠ জামাতা মন্মথনাথ দত্ত কেশব অ্যাকাডেমির ভার গ্রহণ করেন। স্বয়ং এই বিদ্যালয়ের রেক্টর হন। মন্মথনাথের মৃত্যুর পর বিদ্যালয়ের অবস্থা সঙ্গিন হয়ে পড়ে। ১৯১৩ সালে ব্রজগোপাল নিয়োগী বিদ্যালয়টি ক্রয় করার উদ্যোগ করেন এবং বিদ্যালয়টি যাতে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর দ্বারা পরিচালিত হয় সেদিকে উদ্যোগী হন। প্রথমে অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা হয় এবং এই উদ্দেশ্যে ৩২৮০ টাকা সংগৃহীত হয়। ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯১৪ সালে বিদ্যালয়টি ক্রয় করা হয়। মোট ব্যয় ৩২৬৩ টাকা তিন আনা তিন পাই। কেশব অ্যাকাডেমি পরিচালনার জন্য ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে Vidhan Educational Society স্থাপিত হয়। এই নতুন সোসাইটি ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর কর্তৃত্বাধীনে ছিল।

কেশব অ্যাকাডেমি প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে ১৪৮নং মানিকতলা স্ট্রিটে (বর্তমানে রামদুলাল সরকার স্ট্রিট) ভাড়া বাড়িতে ছিল। ১৯৫৭ সালে নতুন শিক্ষাব্যবস্থা অনুযায়ী কেশব অ্যাকাডেমি মালটিপারপাস স্কুলে (Multipurpose School) পরিণত হয়। ১৯৬২ সালে Vidhan Educational Society ৮৫,০০০ টাকায় এই ভবন ক্রয় করেন। নিজভবন হওয়ায় কেশব অ্যাকাডেমি অধিকতর প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

একসময় কেশব অ্যাকাডেমি ভবনে প্রাতঃকালীন একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। ১৯৩৩ সালে ডঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ মহারানী সুনীতি দেবীর স্মৃতিতে 'সুনীতি শিক্ষালয়' নামে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়-অনুমান ১৯৩৯ থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত

এটি বন্ধ থাকে। ১৯৪৩ সালে Vidhan Educational Society বালিকা বিদ্যালয়টির স্বত্ব গ্রহণ করেন। প্রথমে প্রাথমিক বিদ্যালয়, পরে উচ্চ বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। দিনে দিনে বালিকা বিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধি হওয়ায় কেশব অ্যাকাডেমি ভবনে স্থানাভাব দেখা যায়। উপযুক্ত গৃহের সন্ধান শুরু হয়। অবশেষে ১৯৬১ সালে সোসাইটি মানিকতলা অঞ্চলে কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থার কাছ থেকে এক খণ্ড জমি ৩৩,০০০ টাকা মূল্যে ক্রয় করেন। জমির পরিমাণ প্রায় এক বিঘার অধিক। জমির ঠিকানা C.I.T. Plot No. 188, Scheme No. VIM।[১১৬] গৃহ নির্মাণের পর বালিকা বিদ্যালয়টি এখানে উঠে আসবে। আজও সে গৃহ নির্মিত হয়নি।

মানিকতলা স্ট্রিটের ঐতিহাসিক নামের অবক্ষয় শুরু হয় এই শতাব্দীর তিনের দশক থেকে। একই দিনে ১৭ই নভেম্বর ১৯৩৯ সালের অধিবেশনে কলিকাতা পুরসভা মানিকতলা স্ট্রিটের বৃহত্তর অংশকে দুটি ভাগে ভাগ করে দুই খ্যাতিমান ব্যক্তির নামে নামকরণ করেন—

| মানিকতলা স্ট্রিটের যে অংশ— | নতুন নাম |
|---|---|
| ১। চিৎপুর রোড থেকে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ পর্যন্ত বিস্তৃত | রমেশ দত্ত স্ট্রিট |
| ২। চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ থেকে কর্নওয়ালিস স্ট্রিট (বিধান সরণি) প্রসারিত অংশ | রামদুলাল সরকার স্ট্রিট |

কর্নওয়ালিস স্ট্রিট থেকে বিবেকানন্দ রোড পর্যন্ত প্রসারিত রাস্তার অংশ যথারীতি মানিকতলা স্ট্রিট নামে বহাল থাকে। তবে ওই নামও বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। সে প্রসঙ্গে পরে আসছি।

প্রথমে রমেশ দত্ত স্ট্রিটের কথা।

ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক, অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ ও সিভিলিয়ান রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯) রামবাগান দত্ত পরিবারের ঈশানচন্দ্র দত্তের দ্বিতীয় পুত্র। এই কীর্তিমান পুরুষের নামে কলিকাতার একটি রাস্তাকে নামাঙ্কিত করার প্রয়াস এই শতাব্দীর তিনের দশকে শুরু হয়। ১৯৩৬ সালে হালসীবাগান রোডের নাম পরিবর্তন করে রমেশ দত্ত রোড করার এক প্রস্তাব পুরসভার বিবেচনার জন্য পেশ করা হয়। প্রস্তাবটি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপিত করা হয়।[১১৭] যে কোনও কারণে হোক প্রস্তাবটি কার্যকর হয়নি।

রমেশচন্দ্র দত্তের পৈতৃক বাড়ি মানিকতলা স্ট্রিটের উপর অবস্থিত। বাড়ির সম্মুখের রাস্তা রমেশচন্দ্রের নামে নামকরণের বিষয়টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু হয় এবং ধীরে ধীরে তা' প্রাধান্য পেতে থাকে। অবশেষে ১৯৩৮ সালে চিৎপুর রোড থেকে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ পর্যন্ত প্রসারিত মানিকতলা স্ট্রিটের এই অংশটুকু রমেশ দত্তের নামে নামকরণের এক প্রস্তাব আসে। রাস্তার এই অংশ প্রায় ১৪০০ ফুট লম্বা, প্রস্থ সর্বত্র একরূপ নয়—কোথাও ১৫ ফুট আবার কোথাও বা ১৬ ফুট, এই রাস্তার ধারে প্রায় ৫০টি বাড়ি আছে। কলিকাতা পুরসভা তাঁদের ১৭ নভেম্বর ১৯৩৯ সালের অধিবেশনে মানিকতলা স্ট্রিটের এই অংশের নাম পরিবর্তন করে 'রমেশ দত্ত স্ট্রিট' নামকরণ করেন।[১১৮] রমেশচন্দ্র স্বয়ং ৮, রাজা গুরুদাস স্ট্রিটের ভবনে বাস করতেন।

সেকালের কলিকাতায় রমেশচন্দ্র একজন নির্ভীক এবং কর্মীপুরুষ ছিলেন। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে সরকারি চাকুরি গ্রহণ করেন। চাকুরিরত অবস্থায় তাঁর নিরপেক্ষ নীতি এবং স্পষ্টবাদিতা ব্রিটিশ সরকারের মনঃপূত হত না। সরকারের অন্যায় নীতি স্পষ্ট ভাষায় সমালোচনা করতেও দ্বিধা করতেন না। নীলকর সাহেবের হাত থেকে দেশীয় কৃষকদের রক্ষার জন্য চাকুরির মায়া না করেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে চাকুরি থেকে স্বেচ্ছায় অবসর নিয়ে বিলাত যাত্রা করেন। পরে ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে ভারতের জাতীয় মহাসভার (Indian National Congress) পঞ্চদশ বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি হয়ে ভারতে ফিরে আসেন। এই অধিবেশনে তিনি সরকারে জনসাধারণের অংশগ্রহণের প্রশ্নটির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর অন্তরে গভীর জাতীয়তাবোধ চিরজাগরূক ছিল। রাজনীতিতে তিনি ছিলেন নরমপন্থী।

পণ্ডিত ও গবেষক রমেশচন্দ্র ইংরেজি ও বাংলায় বহু পুস্তক রচনা করে খ্যাতিলাভ করেছিলেন।

তাঁর রচনাবলী দুই ভাগে ভাগ করা যায়—ভারতবর্ষ বিষয়ক ও সাহিত্য বিষয়ক। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস, দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে লর্ড কার্জনকে লেখা পত্রাবলী, ইংল্যান্ড ও ভারতবর্ষ সম্পর্কে আলোচনা, প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস প্রভৃতি প্রথম ভাগের অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে তাঁর সংস্কৃত কাব্যের ইংরেজি পদ্যানুবাদ, রামায়ণ ও মহাভারতের ইংরেজি পদ্যানুবাদ, হিন্দুশাস্ত্রের বঙ্গানুবাদ এবং সর্বোপরি তাঁর বাংলা উপন্যাসগুলি সমস্তই দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে। বিলাত থেকে ফিরে তিনি ইংরেজিতে 'Arcydae' ছদ্মনামে কবিতা ও প্রবন্ধ লেখেন। এ ছাড়া তাঁর মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত ও জীবন সন্ধ্যা, বঙ্গ বিজেতা প্রভৃতি পুস্তকে তাঁর গভীর স্বদেশপ্রেম ও সাহিত্য প্রতিভার বিকাশ প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। 'সংসার ও সমাজ' নামে সামাজিক উপন্যাসে বিধবাবিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহের সমর্থকরূপে নিজেকে প্রতিভাত করেছেন। রমেশচন্দ্র বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম সভাপতি ছিলেন।

যেদিন মানিকতলা স্ট্রিটের এক অংশ রমেশ দত্তের নামে নামাঙ্কিত হয় ঠিক একই দিনে অর্থাৎ ১৭ই নভেম্বর ১৯৩৯ সালে আরেকটি পৃথক প্রস্তাবে কলিকাতা পুরসভা মানিকতলা স্ট্রিটের আরেক অংশ বাংলা দেশের এক সু-সন্তান, স্বনামধন্য ব্যবসায়ী রামদুলাল দে সরকারের নামে 'রামদুলাল সরকার স্ট্রিট' নামকরণ করেন। মানিকতলা স্ট্রিটের এই অংশটুকু চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ-এর পূর্ব দিক থেকে প্রসারিত হয়ে কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে এসে পড়েছে। এই নামকরণের ফলে মানিকতলা স্ট্রিটের অস্তিত্ব কেবলমাত্র কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের পূর্ব দিক থেকে বিবেকানন্দ রোডের মুখ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রইল।

অতি দরিদ্র পরিবারের সন্তান রামদুলাল দে সরকার (১৭৫২-১৮২৫)। বর্গীর ভয়ে পিতা বলরাম সরকার নিজের গ্রাম ছেড়েছিলেন। পথে দমদমের কাছে রেকজানিতে রামদুলালের জন্ম হয়। বাল্যকালে পিতৃমাতৃহীন হন এবং মাতামহীর আশ্রয়ে লালিতপালিত হন। মাতামহী ছিলেন হাটখোলার মদনমোহন দত্তের বাড়ির রাঁধুনি। মাতামহীর সঙ্গে দত্ত বাড়িতে বাস করার সময় রামদুলাল মদনমোহন দত্তের স্নেহলাভ করেন, এবং সামান্য লেখাপড়া শিখে তাঁর গদিতে ৫ টাকা বেতনের চাকুরিতে নিযুক্ত হন, পরে তা বৃদ্ধি পেয়ে ১০ টাকা হয়। মদনমোহন একদিন ১৪,০০০ টাকা দিয়ে রামদুলালকে ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিটে (বর্তমানে হেমন্ত বসু সরণি) তুলো কোম্পানির নিলাম অফিসে নিলাম ডাকতে পাঠিয়েছিলেন। ঈপ্সিত নিলাম ক্রয় করতে না পেরে ১৪,০০০ টাকায় একখানি ডুবো জাহাজ ক্রয় করেন। ওই ডুবো জাহাজ ১,১৪,০০০ টাকায় পুনরায় বিক্রি করে দিলেন এক ইংরেজ ব্যবসায়ীকে। সমস্ত টাকাই তিনি মালিক মদন দত্তকে ফিরিয়ে দেন। রামদুলালের ব্যবসাবুদ্ধি ও সাধুতায় মুগ্ধ হয়ে মদন দত্ত তাঁকে এক লক্ষ টাকা দান করেন। ওই টাকায় স্বাধীনভাবে বাণিজ্য করে তিনি বিপুল অর্থ উপার্জন করেন এবং বিভিন্ন জনসেবায় কয়েক লক্ষ টাকা দানও করেন।

আমেরিকার সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন রামদুলাল সরকারের জীবনে এক স্মরণীয় ঘটনা। অষ্টাদশ শতকের শেষে বাংলা দেশের সঙ্গে আমেরিকার বহির্বাণিজ্যের যোগাযোগ ঘটে প্রধানত রামদুলালের মাধ্যমে। 'রামদুলাল দে' শীর্ষক ইংরেজি প্রবন্ধে স্যার চারুচন্দ্র ঘোষ আমেরিকায় রামদুলালের ব্যবসার খ্যাতির উপর আলোকপাত করেছেন : "So deep was the respect attached to the very name of Ramdoolal Dey in America that a ship-owner called a vessel after him, which was thrice sent to Calcutta with large consignments. Some of the principal American merchants subscribed for a portrait of George Washington taken from life a few years before his death. This portrait was presented to Ramdoolal Dey a year after George Washington's death, as a mark of the esteem and affection felt by American merchants for Ramdoolal Dey. The portrait is a lifesize one, measuring 9 ft by 6 ft. It has passed through various hands, but it is still to be seen at 12, Wellington square, being the property of Mr. N.C. Mallick"[১১৯] ওয়াশিংটনের শেষজীবনের এই তৈলচিত্রটি শিল্পী গিলবর্ট স্টুয়ার্ট (Gilbort Stuart) কর্তৃক

অঙ্কিত। আমেরিকার আরেক শিল্পরসিক জ্যাক ওয়ারনারের মতে (Jack Warner) এই তৈলচিত্রটি শিল্পী উইস্টানলি (Wystanly) অঙ্কন করেছেন। জ্যাক ওয়ারনার ১৯৮৮ সালে কলিকাতায় এসেছিলেন।

ওয়াশিংটনের মৃত্যুর এক বছর পরে ওই তৈলচিত্রটি মার্কিন জাহাজে ভারতবর্ষে পৌঁছায়। ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে রামদুলালের হাতে এই তৈলচিত্রটি অর্পিত হয়। স্যার চার্লস আলফ্রেড ইলিয়ট বাংলার ছোটলাট (১৮৯০-৯৫) থাকাকালে ওই তৈলচিত্রটি ৮০ হাজার টাকায় কিনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রস্তাব গ্রাহ্য হয়নি।

রামদুলাল তাঁর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দপ্তরে সযত্নে এই তৈলচিত্রটি স্থাপন করেছিলেন। পরবর্তীকালে রামবাগানের দয়ালচাঁদ মিত্র এই চিত্রটি ক্রয় করেন। পরে দয়ালচাঁদের উত্তরাধিকারীগণ এটি পটলডাঙ্গার মল্লিকদের কাছে বিক্রয় করেন। তৈলচিত্রটি হেমচন্দ্র বসু মল্লিকের ১২নং ওয়েলিংটন স্কোয়ারের বাসভবনে ছিল।

১৯৫৯ সালে United States Information Servive-এর ডাঃ ডানকান এমরিচ (Dr. Duncan Emrich) মল্লিকদের বাড়িতে ওই চিত্রটির সন্ধান পান। স্বদেশে ফিরে গিয়ে বন্ধুমহলে এই তৈলচিত্রটির কথা প্রকাশ করেন। ১৯৬৩ সালে এক আমেরিকান শিল্পরসিক Mr. Eric Kanders মল্লিকদের বাসভবন থেকে ৯০ হাজার টাকায় কিনে ১৬২ বছর পরে এই তৈলচিত্রটিকে আমেরিকায় ফিরিয়ে নিয়ে যান। পরবর্তীকালে জর্জ ওয়াশিংটনের এই তৈলচিত্রটি ওয়াশিংটন এবং লী বিশ্ববিদ্যালয়কে উপহার দেওয়া হয়।

আমেরিকার সঙ্গে রামদুলালের সম্পর্ক এইখানেই শেষ নয়। জেমস হোয়াইটহেড (James Whitehead) ওয়াশিংটন ও লী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্প বিষয়ক অধিকর্তা ছিলেন (Director of the Reeves Centre for Research and Exhibition of porcelain and painting)। তিনি এই তৈলচিত্রটি দেখে এবং রামদুলালের কাহিনী শুনে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন এবং আমেরিকায় 'রামদুলাল দে সোসাইটি' স্থাপন করেন। এক বাঙালি ব্যবসায়ীর স্মৃতিরক্ষার্থে পৃথিবীতে এটিই এ ধরনের একমাত্র প্রতিষ্ঠান। আমেরিকার প্রাদেশিক গভর্নরগণ, খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ, আমেরিকার সুপ্রিম কোর্টের বিচারকগণ, ভারতবর্ষে আমেরিকার প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত জন গানথার (John Gunthor) ও তাঁর স্ত্রী এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য।[১২০]

প্রায় দুই শতাব্দী পূর্বে ভারত-মার্কিন ব্যবসার মাধ্যমে রামদুলাল দে সরকার যে যোগাযোগের সেতু নির্মাণ করেছিলেন, দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হলেও আমেরিকাবাসী তাকে বিস্মৃতির গর্ভে নিক্ষেপ করেননি, বরং সেই বরণীয় ভারত সন্তানের নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে পূর্বের সেতুবন্ধনকে আরও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করতে তৎপর হয়েছেন, কলিকাতাবাসীর পক্ষে এটি কম গৌরবের নয়।

অবশেষে মানিকতলা স্ট্রিট নামে যেটুকু অংশ রইল, তারও নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব আসে। ১০ জুন ১৯৬৬ সালের কলিকাতা পুরসভার সাপ্তাহিক অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন তৎকালীন ডেপুটি মেয়র মিহিরলাল গাঙ্গুলি। তিনি তাঁর আসন থেকে ওই দিনের সভায় মানিকতলা স্ট্রিটের বাকি অংশের নাম বদল করে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর নামে 'শিশির ভাদুড়ী পথ' রাখার প্রস্তাব দেন। পুরসভা ওই প্রস্তাব অনুমোদন করেন। পথের নতুন নামকরণ নামের সঙ্গে সু-সাদৃশ্য না হওয়াতে কলিকাতা পুরসভা পুনরায় এটির রূপান্তরে তৎপর হলেন। ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮ সালের অধিবেশনে 'শিশির ভাদুড়ী পথ' এর পরিবর্তে 'শিশির ভাদুড়ী সরণি' করা হয়।

যুগ প্রবর্তক অভিনেতা ও নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী (১৮৮৯-১৯৫৯) মেদিনীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। হাওড়া জেলার রামরাজাতলায় পৈতৃক বাসভূমি। ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ. পাস করে মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে অধ্যাপনা শুরু করেন। অধ্যাপনার ফাঁকে ফাঁকে শৌখিন অভিনয় করতেন। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে বৈকুণ্ঠের খাতা নাটকে শিশিরকুমারের কেদারের ভূমিকা রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল। পরে ম্যাডান থিয়েটারে পেশাদার অভিনেতা হিসাবে যোগদান করেন। ১০ ডিসেম্বর ১৯২১ সালে আলমগীর নাটকের নামভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেই নাট্যপিপাসুদের চিত্ত জয়

করেন। ক্রমে চাণক্য, রঘুবীর চরিত্রে অভিনয় করে অনন্যসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। মতের অমিল হওয়াতে ম্যাডান থিয়েটার ত্যাগ করেন এবং চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশ করেন। শরৎচন্দ্রের আঁধারের আলো, চন্দ্রনাথের চিত্ররূপ দেন, ১৯২৩ সালে পুনরায় নাট্যমঞ্চে আবির্ভূত হন। ওই বছর ইডেন গার্ডেন এক্সজিবিশনে তিনি একটি নাট্যগোষ্ঠী গড়ে তুলে সীতা নাটক মঞ্চস্থ করেন। রামচন্দ্রের ভূমিকায় অভিনয় করে নাট্য জগতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন। এরপর বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে একের পর এক নাটকে অভিনয় করে অসামান্য সাফল্য ও যশ লাভ করেন। এরপর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা সদলবলে আমেরিকা যাত্রা। মঞ্চসজ্জা ও আলোকসম্পাতে বিখ্যাত সতু সেনের সহায়তায় আমেরিকার ভাণ্ডারবিল্ট থিয়েটারে সীতা প্রদর্শিত হয় (১২ জানুয়ারি, ১৯৩১)। প্রশংসা পেলেও অর্থলাভ হয়নি। ছোটদের জন্য নরেন্দ্র দেব রচিত 'ফুলের আয়না' প্রযোজনা করেন (১৯-১-৩৪), এটিই বাংলায় প্রথম কিশোর নাটক। সর্বশেষে শ্রীরঙ্গমে নানান নাটক প্রযোজনা ও অভিনয় করেন, তার মধ্যে বিপ্রদাস, তখৎ-এ-তাউস, বিন্দুর ছেলে ও দুঃখীর ইমান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ১৪ বছর পরে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে অর্থাভাবে শ্রীরঙ্গম বন্ধ হয়ে যায়। এটি বর্তমানে বিশ্বরূপা থিয়েটার। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকার তাঁকে পদ্মভূষণ উপাধি দেন। তিনি তা সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেন। আক্ষেপ করেছিলেন—একটি জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হলে শেষ জীবনে শান্তি পেতেন। শিশিরকুমার অভিনয় বৃত্তি গ্রহণ করায় বহু শিক্ষিত অভিনয় পটু যুবক পেশাদারী অভিনয়বৃত্তি গ্রহণে উৎসাহিত হন। বরানগরে নিজ বাসভবনে তাঁর মৃত্যু হয়।[১২১]

প্রাচীন কলিকাতার ঐতিহ্যমণ্ডিত পথ মানিকতলা স্ট্রিট এইভাবে নতুন নামের নামাবলী গায়ে দিয়ে কলিকাতার বুক থেকে বিস্মৃতির অন্তরালে চলে গেল।

## তথ্যসূত্র


১ আমার জীবন কথা—গৌরহরি ভট্টাচার্য
২ Annual Report of the Calcutta Improvement Trust, 1937-38.
৩ Admn. Report of the Calcutta Corporation 1927-28.
৪ ভারতকোষ—৫ম খণ্ড।
৫ The Proceedings of the meeting of Calcutta Corporation dt. 27.3.31.
৬ A Short History of Calcutta—A.K. Roy.
৭ The Proceedings of the meeting of Cal. Corpn. dt. 27.3.31.
৮ ঘরের কথা ও যুগ সাহিত্য—দীনেশচন্দ্র সেন, পৃ-২৩১
৯ C.M. Gazette dt. 24.12.1932, p. 254.
১০ C.M. Gazette dt. 3.10.1936, p. 791
১১ —ঐ dt. 25.12.1937, p. 791
১২ The Proceedings of the meeting of Calcutta Corporation dt. 22.3.1939.
১৩ C.M. Gazette dt. 27.5.1939, p.42.
১৪ সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান।
১৫ বিনয় সরকারের বৈঠক, পৃঃ ৩০০
১৬ শ্রীঅরবিন্দ অ্যাক্রয়েড ঘোষ—সুকুমার মিত্র, মাসিক বসুমতী, পৌষ, ১৩৫৮
১৭ দিনের পর দিন যে গেল—সুকুমার সেন, পৃঃ ১২০
১৮ তথ্য : মহাবোধি সোসাইটির বৌদ্ধ শ্রমণ মুদসনার সৌজন্যে ও মহাবোধি সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা।
১৯ ভারতকোষ, ৫ম খণ্ড । বাংলা দেশের ইতিহাস (৩য় খণ্ড)—রমেশ মজুমদার, পৃঃ ২০৩
২০ ঠিকানা কলকাতা—সুনীল মুন্সী
২১ শিশির সান্নিধ্যে—রবি মিত্র ও দেব কুমার বসু, বসুমতী, শ্রাবণ, ১৩৯৬
২২ কলিকাতার সংস্কৃতি কেন্দ্র—যোগেশচন্দ্র-বাগল
২৩ বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ—বিনয় ঘোষ
২৪ তথ্য : ইউ. এন. ধর অ্যান্ড সন্স-এর শ্রীরাজেন্দ্র ধরের সৌজন্যে
২৫ আমি সুরেশচন্দ্রকে যেমন জানি—প্রভাত মুখোপাধ্যায়, বসুমতী, আশ্বিন, ১৩৬১
২৬ তথ্য : ইউ. এন. ধর অ্যান্ড সন্স-এর শ্রীরাজেন্দ্র ধরের সৌজন্যে
২৭ A Short History of Calcutta—A. K. Roy, p. 245
২৮ Calcutta Old and New—Cotton
২৯ The Proceedings of the meeting of the Calcutta Corporation. dt. 5.8.1936

৩০ National Magazine, December,1889, p. 455—Sarat Chandra Mitra
৩১ সংবাদপত্রে সেকালের কথা (২য় ভাগ)—ব্রজেন বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৬৫৩
৩২ শব্দবিদ্যার আঁচড়ে কলকাতার স্কেলিটন—সুকুমার সেন
৩৩ Moder n History of the Indian Chiefs etc—Lokenath Ghose, Vol. II
৩৪ তথ্য : বলরাম ঘোষ স্ট্রিটে অবস্থিত ভবতারিণী কালীমন্দিরে শতবর্ষ উৎসবে প্রকাশিত 'শতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি' ও শ্রীহীরেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রদত্ত তথ্য।
৩৫ তথ্য—সমর বসুর সৌজন্যে এবং Annual Report of Calcutta Orphanage, 1975-76
৩৬ ভারতকোষ—৫ম খণ্ড। শ্রীকমলকুমার বসু (প্রাক্তন মেয়র, কলিকাতা পুরসভা) অতিরিক্ত তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন। সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান।
৩৭ সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, সংবাদ প্রভাকর, ৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৬৫।
৩৮ আলেকজান্ডার ডাফ ও অনুগামী কয়েকজন—অলোক রায়। ডাফ হাই স্কুল ফর গার্লস পত্রিকা 'অন্বেষা' (২য় সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৮৩) অবলম্বনে।
৩৯ সংবাদপত্রে সেকালের কথা (২য় ভাগ)—ব্রজেন বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ.৫৪-৫৭।
৪০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ—৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫৪।
অতিরিক্ত তথ্য শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষের সৌজন্যে।
৪১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ তীর্থ পরিক্রমা—নির্মলকুমার রায়, পৃঃ ২৭১।
৪২ ইন্ডিয়া হাউস অলংকরণ—কমল সরকার
৪৩ তথ্য : ডাঃ মিহির মিত্র। বংশ পরিচয়—জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার, ২৬শ খণ্ড
৪৪ তথ্য : ডঃ সুধীন ভট্টাচার্য, সহ সম্পাদক, শ্যামপুকুর পল্লীমঙ্গল সমিতি
৪৫ তথ্য : জ্যোতিবিকাশ মিত্রের সৌজন্যে
৪৬ Calcutta in Urban History—Pradip Sinha, p. 168
৪৭ কলিকাতা সেকালের ও একালের—হরিসাধন মুখোপাধ্যায়। কলিকাতার ইতিবৃত্ত—প্রাণকৃষ্ণ দত্ত। মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের জীবনচরিত (১২৮৬ বঙ্গাব্দ)—বিপিনবিহারী মিত্র
৪৮ রাজা রাধাকান্ত দেবের দ্বিশততম জন্মবার্ষিকী স্মরণিকা, ১৯৮৪—শোভাবাজার রাজবাড়ি থেকে প্রকাশিত
৪৯ দৃশ্যকাব্য পরিচয়—সত্যজীবন মুখোপাধ্যায়
৫০ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ৩য় খণ্ড—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, পৃঃ ৯-১১
৫১ সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান
৫২ তদেব
৫৩ রাজা রাধাকান্ত দেবের দ্বিশততম জন্মবার্ষিকী স্মরণিকা, ১৯৮৪—শোভাবাজার রাজবাড়ি থেকে প্রকাশিত
৫৪ কলিকাতা দর্পণ—রাধারমণ মিত্র, পৃঃ ১১৬
৫৫ The Proceedings of the Meeting of the Calcutta Mpl. Corporation dt. 31.3.1924
৫৬ সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান।
৫৭ তথ্য : অধ্যাপক শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষের সৌজন্যে। সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান।
৫৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ তীর্থ পরিক্রমা—নির্মলকুমার রায়।
৫৯ The Proceedings of the Meeting of the General Committee of Cal. MpL. Corpn. dt. 26.3.1924.
৬০ The Proceedings of the Meeting of the Cal. Municipal Corpn. dt. 29.3.1916.
৬১ সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান। অতিরিক্ত তথ্য শ্রীমতী গৌরীরাণী বসুর সৌজন্যে।
৬২ মন্মথনাথ ঘোষ— জন্মশতবর্ষ স্মরণিকা।
কলিকাতা সেকালের ও একালের—হরিসাধন মুখোপাধ্যায়।
৬৩ A Short History of Calcutta—A.K.Roy.
৬৪ The Proceedings of the meeting of the Cal. Mpl. Corpn. dt. 31.3.1924.
৬৫ Swami Vivekananda in the West— M.L.Burke, Vol-1, Page 21
৬৬ তথ্য : শ্রীসুশান্তকুমার মিত্রের সৌজন্যে।
৬৭ সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান
৬৮ তথ্য : শ্রীরবীন্দ্রনাথ বসুর সৌজন্যে
৬৯ বিবেকানন্দ পরিকর কিরণচন্দ্র দত্ত ও তৎকালীন সমাজ— সনৎ মুখোপাধ্যায় ও মঞ্জু দত্ত, পৃ. ২০৮-২১০।
৭০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা অভিধান—কালীজীবন দেবশর্মা
৭১ The Administration Report of the Calcutta Mpl. Corpn., 1882-83.
৭২ The Proceedings of the meeting of Cal. Mpl. Corpn. dt. 22.9.1915.
৭৩ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা অভিধান—কালীজীবন দেবশর্মা
৭৪ শব্দবিদ্যার আঁচড়ে কলকাতার স্কেলিটন—সুকুমার সেন
৭৫ তথ্য : শ্রীরজনীকান্ত সেন, কোষাধ্যক্ষ, কম্বুলিয়াটোলা দরিদ্র ভাণ্ডার
৭৬ মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ভারতবর্ষ, শ্রাবণ ১৩৪২, পৃ ২৯২-৯৩
৭৭ ভোলা ময়রা— পূর্ণচন্দ্র দে, প্রবাসী, ১৩৩৬ মাঘ।
৭৮ A Forgotten chapter of Bengali Stage— Chandi Ch. Banerjee, Amrita Bazar Patrika dt. 14.9.1975

গিরিশচন্দ্র— অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
দেব পরিবারের বর্ষীয়ান শ্রীনির্মলকৃষ্ণ দেব অতিরিক্ত তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন, বয়স ৯২ বছর।
৭৯ Calcutta Old and New— H.E.A. Cotton, p-293
৮০ কলিকাতা সেকালের ও একালের— হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, প্রসঙ্গ কলিকাতা— নিশীথরঞ্জন রায়, পৃ ৯০
৮১ The Administration Report of the Calcutta Municipal Corpn, 1872
৮২ The Administration Report of the Calcutta Municipal Corpn, 1879
৮৩ The Administration Report of the Calcutta Corpn. 1931-32
৮৪ The Proceedings of the Meeting of the Calcutta Corpn. dt. 26.8.1925
৮৫ The Proceedings of the Meeting of the Calcutta Mpl. Corpn. dt. 16.7.1913
৮৬ The Proceedings of the Meeting of the Calcutta Mpl. Corpn. dt. 24.2.1915
৮৭ The Proceedings of the Meeting of the Calcutta Corpn. dt. 25.9.1946
৮৮ তথ্য : শ্রী রণেন্দ্রচন্দ্র দেবের সৌজন্যে
৮৯ বাংলা দেশের ইতিহাস— রমেশ মজুমদার। বাঙালীর ইতিহাস, আদি পর্ব— নীহাররঞ্জন রায়।
৯০ কলিকাতার ইতিবৃত্ত—প্রাণকৃষ্ণ দত্ত
৯১ The Administration Report of the Calcutta Municipul Corporation for the year 1882-83
৯২ " " " 1883-84
৯৩ " " " " 1884-85
৯৪ আসরের গল্প—দিলীপ মুখোপাধ্যায়, প্রবাসী ১৩৭২, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫২০
৯৫ The Proceedings of the meeting of Calcutta Corporation. dt. 18.2.31
৯৬ Who saved Calcutta from Jap Bombs, Shrish Chandra Goho Syed Keelany, The Nation, Sunday, April 24, 1949.
৯৭ তথ্য : শ্রীশ্যামসুন্দর গোহো (গুহ)-এর সৌজন্যে
৯৮ সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান
৯৯ ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য—দীনেশচন্দ্র সেন, পৃ. ১৪৬
১০০ ভারতকোষ—১ম খণ্ড
১০১ শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা—স্বামী গম্ভীরানন্দ
১০২ History of Freedom Movement in India, Vol. II—R.C. Majumdar.
১০৩ The Proceedings of the meeting of Calcutta Corporation dt. 12.12.24
১০৪ " " " 27.3.31
১০৫ " " " 7.10.36
১০৬ ভারতকোষ—৫ম খণ্ড
১০৭ ভারতকোষ—১ম খণ্ড
১০৮ A Short History of Calcutta.—A.K. Roy, p. 197
১০৯ কলিকাতা সেকালের ও একালের—হরিসাধন মুখোপাধ্যায়
১১০ কলিকাতা দর্পণ—রাধারমণ মিত্র
১১১ The Administration Report 1923-24 of the Calcutta Mpl. Corporation
১১২ কলিকাতার ইতিবৃত্ত—প্রাণকৃষ্ণ দত্ত
১১৩ আশ্রমের রূপ ও বিকাশ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১১শ খণ্ড, রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ. ৪৮২
১১৪ দত্ত পরিবারের ইতিহাস শ্রীপ্রতুলচন্দ্র দত্তের সৌজন্যে প্রাপ্ত
ভারতকোষ—৫ম খণ্ড
সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান
১১৫ The Early History and Growth of Calcutta—Benoy Krishna Dev.
১১৬ সাধন ও সেবা—নিরঞ্জন নিয়োগী
১১৭ Calcutta Municipal Gazettee, May 9, 1936, P. 914
১১৮ The Proceedings of the meeting of Calcutta Corpn. dt. 17.11.39.
১১৯ The Statesman, 26.1.1925
১২০ Two American Admirers of Ramdoolal Dey—Charles Newton : An Economic Times Special Feature, P. 17
১২১ ভারিতকোষ—৫ম খণ্ড। সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান

## ৩৫
## উপসংহার

এই শতাব্দীর চারের দশকের শুরুতে কলিকাতা শহরের উন্নয়নের কর্মধারা হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়। এর অনেকগুলি কারণও ছিল। জাপান ১৯৪১ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সামিল হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি জয় করার জন্য অতি দ্রুতগতিতে ভারতের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে—অবশেষে ব্রহ্মদেশ জয় করে নেয়। ফলে যুদ্ধ ভারতের পূর্ব প্রান্তের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়ায়। সম্ভাব্য জাপানি বিমান আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য কলিকাতা সমেত সমগ্র পূর্বভারতে নিষ্প্রদীপ রজনী শুরু হয়। ফলে রাত্রিতে কলিকাতা পুরসভার পরিষেবার অন্তর্গত যে বিশাল কর্মকাণ্ড সম্পন্ন হত তা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হয়। ১৯৪৩ সালে কলিকাতায় জাপানি বিমান আক্রমণ এবং বোমা পড়ায় শহরবাসী বোমার ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে শহর ছেড়ে পালাতে শুরু করে। কলিকাতা পুরসভার হাজার হাজার ভিন্ন প্রদেশবাসী কর্মী বোমা আতঙ্কে শহর ছেড়ে পালিয়ে যায়। কলিকাতা পৌর কর্তৃপক্ষ পড়ে যান গভীর সঙ্কটে। কলিকাতার নাগরিক জীবন হয়ে পড়ে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। এই অবস্থা চলতে থাকে দিনের পর দিন। এইখানেই শেষ নয়। এই চারের দশক ছিল কলিকাতা তথা ভারত ইতিহাসের এক যুগ সন্ধিক্ষণ। পর পর ঘটনাবলী এমনভাবে সংঘটিত হতে থাকে যাতে ভারতের মুক্তি সংগ্রামকে এক চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হতে তা সাহায্য করে। কলিকাতার বুকেও সেই মুক্তি সংগ্রামের ঢেউ আছড়ে পড়ে। কলিকাতা হয়ে ওঠে উত্তাল ও অগ্নিগর্ভ। এই সব ঘটনাবলী থেকে তৎকালীন কলিকাতার রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার এক সম্যক চিত্র পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে দু'চার কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করায় ভারত আক্রমণের স্পষ্ট আশঙ্কা দেখা দেয়। মিত্রশক্তি বিশেষত ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ অত্যন্ত বিচলিত হয়ে তাঁরা ভারতবাসীর সাহায্য লাভের আশায় তৎপর হন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ইংল্যাণ্ডের চার্চিল সরকারকে এ বিষয়ে সক্রিয় উদ্যোগ নেবার আহ্বান জানান। অস্ট্রেলিয়া পার্লামেন্টও ভারতের স্বাধীনতা-দাবির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করে। মিত্রপক্ষের এই আন্তর্জাতিক চাপে তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল ভারতীয় সমস্যার সমাধানকল্পে তাঁর মন্ত্রিসভার বিশিষ্ট সদস্য স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে কতকগুলি প্রস্তাবসহ ভারতে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। এই মর্মে ১৯৪২ সালের ২১ মার্চ 'ক্রিপস মিশন' ঘোষণা করা হয়। ক্রিপস ২৩ মার্চ ১৯৪২ সালে ভারতে আসেন। ক্রিপস প্রস্তাবের সারমর্ম হল :

১। যুদ্ধ অবসানের পর ভারতে একটি যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা।
২। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন ওই যুক্তরাষ্ট্রকে প্রদান করা হবে।
৩। এরপর গণপরিষদ আহ্বান করে তার ওপর সংবিধান রচনার ভার দেওয়া হবে।
৪। যতদিন না এই নতুন শাসন চালু হয় ততদিন পর্যন্ত ভারতীয় নেতৃবৃন্দ বড়লাটের শাসন পরিষদে অংশগ্রহণ করে দেশ শাসন করবেন।
৫। যদি কোনও প্রদেশ বা দেশীয় রাজ্য প্রস্তাবিত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দিতে না চায়, তা হলে তারা পৃথকভাবে নিজেদের ভবিষ্যত নিজেরাই নিরূপণ করতে পারবে এবং ব্রিটিশ সরকার তা মেনে নেবেন।

শ্রীঅরবিন্দ ক্রিপস দৌত্যকে স্বাগত জানালে ক্রিপস তাঁর শুভেচ্ছা গ্রহণ করেন। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর দূত মাদ্রাজ হাইকোর্টের ব্যবহারজীবী এস. ডোরাইস্বামী আয়ারকে ক্রিপস প্রস্তাব গ্রহণে কংগ্রেসকে সম্মত করানোর জন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু কংগ্রেস ক্রিপস প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন ও "ভারত ছাড়" নীতি গ্রহণ করেন। পাঁচের দশকে কে. এম. মুন্সী লিখেছিলেন যে তাঁরা কেউই সেদিন শ্রীঅরবিন্দের উপদেশের সারবত্তা বুঝতে সক্ষম হয়নি। বুঝলে ভারত বিভাগ, উদ্বাস্তু ও কাশ্মীর সমস্যা কিছুরই উদ্ভব হত না।

ক্রিপস প্রস্তাবের ব্যর্থতার পর কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতি ১৯৪২ সালের ১৪ জুলাই ওয়ার্ধায় 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব অনুমোদন করেন। ৭ই আগস্ট বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত কংগ্রেসের সভায় প্রস্তাবটি পেশ করা হয় এবং ৮ আগস্ট বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়। ১৯৪২ সালের ৯ আগস্ট আন্দোলনের সূচনা হয়। সরকারও এই বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। ৯ আগস্টের ভোরবেলায় গান্ধীজি, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, পণ্ডিত নেহরু, মৌলানা আজাদ, কৃপালনী প্রমুখ নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয় ও কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে বেআইনি ঘোষণা করা হয়। নেতাদের গ্রেপ্তারের সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে সারা ভারতবর্ষ উত্তাল হয়ে ওঠে। দেশের সর্বত্র স্বতঃস্ফূর্তভাবে তীব্র গণ-বিক্ষোভ দেখা দেয়। মহাত্মা গান্ধীর "করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে" (Do or Die) আদর্শে অনুপ্রাণিত অগণিত ভারতবাসী নেতৃহীন অবস্থায় এক শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলেন। অহিংসা আন্দোলন ধীরে ধীরে হিংসার রূপ নেয়। দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে উত্তেজিত জনতা ধ্বংসাত্মক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে। পুলিশের অত্যাচার ও সৈন্যবাহিনীর গুলিবর্ষণে বহু ভারতীয় নারীপুরুষ প্রাণ বিসর্জন দেন। ভারতের অন্যান্য স্থানের মতো কলিকাতাও অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। এখানকার নাগরিক জীবন পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে। আন্দোলন হিংসাত্মক রূপ ধারণ করায় মহাত্মা গান্ধী কারাগারে তিন সপ্তাহের জন্য অনশন শুরু করেন। তাঁর অনশনের ফলে ভারত ছাড় আন্দোলন অনেকটা স্তিমিত হয়ে পড়ে। তা সত্ত্বেও এই আন্দোলন প্রায় দু' বছর স্থায়ী হয়েছিল। ১৯৪৪ সালে ৫ মে গান্ধীজি জেল থেকে মুক্তি পাবার পর এই আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

১৯৪৩ সালে বঙ্গদেশে মন্বন্তর দেখা দেয়। সেই সময় অবিভক্ত বঙ্গে মুসলিম লিগ সরকারি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। লিগ সরকারের অকর্মণ্যতা ও অব্যবস্থায় এবং ইস্পাহানি কোম্পানি কর্তৃক লক্ষ লক্ষ মণ চাল মজুত করায় এই দুর্ভিক্ষ ঘটে। প্রায় চল্লিশ লক্ষ লোক অনাহারে ও অনাহারজনিত অসুখে প্রাণ হারায়। গ্রাম বাংলার লক্ষ লক্ষ লোক খাদ্যের আশায় কলিকাতায় পাড়ি জমায়। কলিকাতায় সে এক ভয়াবহ করুণ অবস্থা। অসংখ্য স্ত্রী-পুরুষ-শিশু কলিকাতার ফুটপাতে প্রাণ হারায়। সে-সময়ের প্রাণহানির সেইসব ভয়াবহ বিবরণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সেকালের সংবাদপত্রের পাতায় পাতায়। এছাড়া বাংলার চিত্রশিল্পী জয়নাল আবেদিন (মন্বন্তর), কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (মন্বন্তর), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (অশনি সংকেত) সরোজ রায়চৌধুরী (কালো ঘোড়া) প্রমুখ মন্বন্তরের যে চিত্র উপহার দিয়েছেন তা ঐতিহাসিক দলিলকেও হার মানায়। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের (১১৭৬ বাংলা, ১৭৭০ ইংরেজি) পর এইরূপ ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ বাংলায় আর কখনও ঘটেনি। গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়াভেল সেই সময় কলিকাতায় খাদ্য রেশনিং প্রথা চালু করেন।

ক্রিপস প্রস্তাব ব্যর্থ হওয়ায় সে সময়ের গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল ভারতের সংবিধান প্রস্তুত হওয়ার পূর্বাবধি শাসনকার্য পরিচালনার জন্য একটি জাতীয় সরকার গঠনের প্রস্তাব দেন। এটি 'ওয়াভেল প্ল্যান' নামে পরিচিত। এই প্রস্তাব রূপায়ণের জন্য সিমলা শহরে সর্বদলীয় একটি সম্মেলন আহ্বান করা হয়। কিন্তু মুসলিম নেতা মহম্মদ আলি জিন্না পাকিস্তান গঠনের জন্য চাপ দিতে থাকায় সিমলা সম্মেলন বিফল হয়।

ভারতের মধ্যে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন যখন উত্তাল হয়ে ওঠে, তখন ভারতের বাইরে সুভাষচন্দ্র বসু আজাদ হিন্দ ফৌজের মাধ্যমে ভারতকে ব্রিটিশ শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্ত করার জন্য এক দুঃসাহসিক সশস্ত্র অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। ৫ ডিসেম্বর ১৯৪০ খ্রিঃ থেকে এলগিন রোডের বাড়িতে অন্তরিন থাকাকালীন অবস্থায় ১৭ জানুয়ারি ১৯৪১ খ্রিঃ তিনি

হঠাৎ অন্তর্ধান করেন। বহু চেষ্টা করেও ব্রিটিশ সরকার তাঁর সন্ধান পাননি।

প্রথমে সুভাষচন্দ্র জার্মানিতে যান। পরে জার্মানির ডুবোজাহাজে তিনি জাপানে আসেন। সেখান থেকে ২ জুলাই ১৯৪৩ খ্রিঃ সিঙ্গাপুরে আসেন। এখানে সুভাষচন্দ্রকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। ৪ জুলাই বিপ্লবী রাসবিহারী বসু আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর হাতে ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের দায়িত্বভার অর্পণ করেন। এই অনুষ্ঠানেই বিশাল জনতা সুভাষচন্দ্রকে 'নেতাজি' উপাধিতে ভূষিত করেন। ২৫ আগস্ট নেতাজি আনুষ্ঠানিকভাবে আজাদ হিন্দ বাহিনীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেই সঙ্গে 'জয় হিন্দ' ধ্বনি তুলে আজাদ হিন্দ বাহিনীর জওয়ানদের আহ্বান জানান 'চলো দিল্লি'। নানান ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ ইংরেজ সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে মণিপুরের রাজধানী ইম্ফল দখল করেন এবং এই শহরে ভারতীয় জাতীয় পতাকা ওড়ানো হয়। তারপর আসামের কোহিমা এবং শিলচর শহরের নিকট বিষেণপুর নামক স্থানটিও আজাদ হিন্দ ফৌজ দখল করেন। পরের ইতিহাস জাপানের পরাজয় এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের পশ্চাদাপসরণ—এ তথ্য তো সকলেরই জানা। আধুনিক কোনও কোনও ঐতিহাসিকের মতে সুভাষচন্দ্র যদি এক বছর পূর্বে অর্থাৎ ১৯৪২ সালে আজাদ হিন্দ ফৌজ নিয়ে ভারতভূমিতে পদার্পণ করতেন তা হলে বোধ হয় ভারতের ইতিহাসের গতি অন্যভাবে প্রবাহিত হত।

১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে আগস্ট মাসের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের স্মৃতি ভারতীয় জনচিত্ত থেকে মুছে যেতে না যেতেই আরও দুটি ঘটনাপ্রবাহ সারা ভারতব্যাপী আন্দোলন সৃষ্টি করেছিল। একটি দিল্লীর লালকেল্লায় নেতাজি সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানী-সদস্যবৃন্দের যুদ্ধ-অপরাধী রূপে বিচার। প্রতিবাদে আই এন এ সপ্তাহ উদযাপিত হল। ১৯৪৫ সালের ১২ নভেম্বর আই এন এ দিবস পালিত হল। শরৎচন্দ্র বসু, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিলেন কলিকাতার দেশপ্রিয় পার্কে। কলিকাতায় ২১ নভেম্বর আজাদ হিন্দ ফৌজের তিন সেনানী ক্যাপ্টেন শাহ নাওয়াজ খাঁন, ধীলন ও সেহ্‌গলের বিচার উপলক্ষ করে ছাত্রদের প্রতিবাদ মিছিল চলল ডালহৌসি স্কোয়ারের দিকে। ধর্মতলায় মিছিলের ওপর গুলি চলল। রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও জনৈক মুসলমান ছাত্র গুলিতে প্রাণ দিলেন। আহতের সংখ্যা ৫২। মিছিল ছত্রভঙ্গ না হয়ে ধর্মতলায় বসে পড়ে। পরদিন সাধারণ ধর্মঘটে কলিকাতা অচল হল। রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড—গাড়ি ও লরি পুড়ল—মনে করিয়ে দিল '৪২ এর রক্তাক্ত দিনগুলিকে। এরপর ১৯৪৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি আজাদ হিন্দ ফৌজের আরেক সেনানী ক্যাপ্টেন রশিদ আলির মুক্তির দাবিতে কলিকাতার বুকে নেমে এল আরও বড় আকারের আরেক ছাত্র বিক্ষোভ। এই আন্দোলন কলিকাতার জনজীবনে প্রচণ্ড আঘাত হেনে তাকে করে দিল স্তব্ধ।

অপর ঘটনাটি ১৯৪৬ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি। ভারতীয় নৌবাহিনীর বিদ্রোহ। বোম্বাই ও কলিকাতার পর অন্যান্য শহর প্রতিবাদে মুখর। আক্রান্ত হয় থানা, ডাকঘর, ট্রাম ডিপো। খাদ্যশস্যের দোকান পোড়ানো হয়। বোম্বাইতে ২২ ফেব্রুয়ারি সাধারণ ধর্মঘট ডাকা হয়। রেল ও রাস্তা রোকো এই আন্দোলনের অঙ্গ ছিল। অন্যান্য জায়গায় হরতাল মিছিল ইত্যাদির মাধ্যমে সহানুভূতি দেখানো হয়। এই নৌবিদ্রোহে সবসুদ্ধ ৭৮টি জাহাজ, ২০টি তীরের ঘাটি, ২০,০০০ এর মতো নাবিক অংশ নিয়েছিলেন। এ ছাড়াও বোম্বাই কলিকাতা, মাদ্রাজ, পুনে, যশোর ও আম্বালার ভারতীয় বিমান বাহিনীর ভারতীয় সৈন্যরা এই ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ২৩ ফেব্রুয়ারি প্যাটেল ও জিন্নার অনুরোধে নাবিকরা আত্মসমর্পণ করেন। দিল্লীর বড়লাটের ও প্রধান সেনাপতির তন্দ্রা গেল টুটে। ভারতের সমস্যা ইংল্যান্ডের দৃষ্টিতে এক নতুন গুরুত্ব নিয়ে দেখা দিল।

এদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবসানের পর ইংল্যান্ডের সাধারণ নির্বাচনে শ্রমিক দল সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করেন এবং ক্লিমেন্ট এট্‌লি প্রধানমন্ত্রী হন। তিনি বুঝেছিলেন যে ভারতে ব্রিটিশ শাসন আর টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। ভারত সমস্যার সমাধানকল্পে ১৯৪৬-এর ৫ জানুয়ারিতে 'ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি ডেলিগেশন' ভারতে আসেন, কিন্তু তা ব্যর্থ হওয়াতে ১৯শে ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬ সালে এট্‌লি 'ক্যাবিনেট মিশনের' কথা ঘোষণা করেন। লর্ড পেথিক লরেন্স, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস ও মিঃ এ.ভি. আলেকজান্ডার এই মন্ত্রী মিশনের সভ্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। মিশন ১৯৪৬ সালের ২৪ মার্চ

ভারতে এসে পৌঁছায়। তারপর দীর্ঘ সাত সপ্তাহ ধরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা ও ভারত সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালান। জিন্না পাকিস্তান দাবি সম্বন্ধে অনড় থাকেন।

১৬ মে ১৯৪৬ খ্রিঃ মিশন তার বিখ্যাত প্রস্তাবটি প্রকাশ করেন। ওই প্রস্তাবে মিশন অবিলম্বে অন্তবর্তী সরকার গঠন ও গণপরিষদ আহ্বানের ব্যবস্থার কথা বলেন। সেই সঙ্গে ভবিষ্যৎ শাসনব্যবস্থা ও সংবিধান রচনা সম্বন্ধে সুচিন্তিত মতামত পেশ করেন। একটি দ্বিস্তর যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনাও মিশন পেশ করেছিলেন। এই পরিকল্পনায় বলা হয় কেবলমাত্র পররাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা ও যোগাযোগ এই তিনটি বিষয়ের শাসনভার কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকবে, অবশিষ্ট বিষয়ের শাসন-ক্ষমতা থাকবে প্রাদেশিক সরকারগুলির হাতে।

মন্ত্রী মিশন কিন্তু দেশ বিভাগের প্রস্তাবে সম্মত হননি। তাঁরা ভারতীয় প্রদেশগুলিকে ক, খ ও গ এই তিনটি বিভাগে বিভক্ত করেন। 'ক' বিভাগে রাখা হয় হিন্দু প্রধান প্রদেশগুলি, 'খ' বিভাগে মুসলমান প্রধান পাঞ্জাব, সিন্ধু, বালুচিস্তান ও সীমান্তপ্রদেশ এবং 'গ' বিভাগে বাংলা ও আসামকে রাখা হয়। প্রস্তাবে আরও বলা হয় যে প্রত্যেক বিভাগের গণপরিষদের সদস্যগণ পৃথকভাবে মিলিত হয়ে তাঁদের ইচ্ছামত আঞ্চলিক সংবিধান রচনা করতে পারবেন এবং আঞ্চলিক সরকারের হাতে প্রাদেশিক শাসন ক্ষমতা যতটা ইচ্ছে ন্যস্ত করতে পারবেন। মিশনের প্রস্তাবে ভারতের ঐক্য বিসর্জন না দিয়ে পাকিস্তান পরিকল্পনা রূপায়ণে যতটা সম্ভব তার ব্যবস্থা রাখা হয়। অন্তর্বর্তীকালের জন্য সর্বদলীয় একটি জাতীয় সরকার গঠনেরও প্রস্তাব রাখা হয় এবং শাসনকার্যের দায়িত্ব ভারতীয় সদস্যদের হাতে অর্পণ করা হবে বলা হয়।

একমাত্র শিখ সম্প্রদায় ছাড়া কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ প্রভৃতি সমস্ত রাজনৈতিক দল প্রথমে এই পরিকল্পনা গ্রহণে সম্মত হন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করা নিয়ে কংগ্রেস ও লিগের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। মুসলিম লিগ অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদানে স্বীকৃত হলেও কংগ্রেস অন্তর্বর্তী সরকারে না আসতে চাওয়ায় লর্ড ওয়াভেল অন্তর্বর্তী সরকার গঠনে স্বীকৃত হলেন না। এদিকে জিন্না মুসলিম লিগকে এককভাবে সরকার গঠন করার সুযোগ দেবার জন্য চাপ দিতে থাকেন। কিন্তু লর্ড ওয়াভেল রাজি না হওয়ায় জিন্নার নেতৃত্বে মুসলিম লিগ মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাবের প্রতি তাঁদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নেন এবং পাকিস্তান দাবি আদায়ের জন্য ১৬ আগস্ট ১৯৪৬ সালে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' (Direct Action Day) পালন করতে ভারতীয় মুসলমানদের প্রতি আহবান জানান।

১৬ আগস্ট ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে সকালবেলাই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নামে কলিকাতা নগরীতে এক ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও গুণ্ডাবাজি শুরু হয়। প্রথম দিনে বহু হিন্দুর প্রাণনাশ হয়, বীভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, হত্যা, লুঠ ও ধর্ষণ চলতে থাকে। দ্বিতীয় দিনে হিন্দুদের পাল্টা আক্রমণে মুসলমানদের অনেকে হতাহত হয়। বাংলায় তখন লিগ নেতা হোসেন শহীদ সুরাবর্দির সরকার দাঙ্গা দমনে ব্যর্থ হন। কলিকাতার পথে পথে তখন বহু মৃতদেহ ইতস্তত পড়ে থাকতে দেখা যায়। এক নারকীয় অবস্থায় কলিকাতা তখন আপ্লুত হয়েছিল। কলিকাতার পরে বিহার, পাঞ্জাব, পূর্ববঙ্গের নোয়াখালিতে এই দাঙ্গা এক ভয়াবহ আকার ধারণ করে। সমগ্র ভারত তখন সাম্প্রদায়িকতার বিষে জর্জরিত হয়ে ওঠে।

ইতিমধ্যে ২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৬ সালে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ গভর্নর জেনারেলের কার্যনির্বাহিক পরিষদের সদস্যপদ গ্রহণ করেন। লর্ড ওয়াভেলের প্রচেষ্টায় শেষ পর্যন্ত মুসলিম লিগ সরকারে যোগ দিতে সম্মত হন। অক্টোবর মাসে লিয়াকৎ আলি খান প্রমুখ পাঁচ জন লিগ সদস্য মন্ত্রিসভায় যোগ দেন।

মন্ত্রিসভায় অংশগ্রহণ করলেও মুসলিম লিগ গণপরিষদে যোগ দিতে অস্বীকৃত হন। এদিকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা ক্রমাগত দেশের নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। অন্তর্বর্তী সরকারের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ক্রমেই বেড়ে যেতে থাকে। ভারতের এই ক্রমাবনতি অবস্থা লক্ষ করে ক্লিমেন্টএট্‌লি এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করলেন। এই ঘোষণায় বলা হয় যে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে জুন মাসের পূর্বেই

ব্রিটিশ সরকার ভারতের দায়িত্বশীল নেতৃবর্গের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে ভারত ত্যাগ করবেন। লর্ড ওয়াভেলের স্থলে লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে এ কাজের দায়িত্ব দিয়ে গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয় করে পাঠান হয়। ১৯৪৭ সালের ২৪ মার্চ মাউন্টব্যাটেন ভারতে আসেন এবং ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রাথমিক আলোচনার সূত্রপাত করেন।

ইতিমধ্যে কলিকাতা এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিতর্কে জড়িয়ে পড়ায় ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়টি জটিল হয়ে পড়ে। মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা পেশ হওয়ার পূর্ব থেকেই যুক্তবঙ্গের কথা ওঠে। স্বাধীন যুক্তবঙ্গের প্রথম প্রস্তাব আসে আবুল হাসেম ও শরৎচন্দ্র বসুর কাছ থেকে। ১৯৪৭ এর জানুয়ারি থেকে বাংলাকে এক সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক হিসাবে গঠন করতে চান শরৎ বসু। দেশ বিভাগে আপত্তি জানান ১৫ই ফেব্রুয়ারির এক প্রতিবেদনে। শরৎ বসুর এই যুক্তবঙ্গের প্রস্তাবে সুরাবর্দি খুশি হয়েছিলেন। তিনি ১৯৪৭ সালের ১৬ এপ্রিল বড়লাটকে যুক্তবঙ্গ প্রস্তাবের যৌক্তিকতা বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন। জিন্নারও এ বিষয়ে সায় ছিল। তিনি মন্তব্য করেছিলেন, "What is the use of Bengal without Calcutta ?"

সুরাবর্দি যুক্তবঙ্গের যে রূপরেখা দিয়েছিলেন সেটি ছিল এইরূপ—মানভূম, সিংভূম, পূর্ণিয়া, সুর্মা উপত্যকা নিয়ে এক বৃহৎ সমৃদ্ধ যুক্তবঙ্গ রাষ্ট্র হবে। কলিকাতা হবে তার রাজধানী। ২০ মে ১৯৪৭, এই মর্মে স্বাধীন বঙ্গভূমি গঠনের দলিল রচিত হয়। স্বাক্ষর করেন শরৎ বসু, আবুল হাসেম প্রমুখ। মুসলিম লিগ ও কংগ্রেসের বিরোধিতা এ প্রস্তাব রূপায়ণে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

আসল বিরোধ বাধে কলিকাতাকে নিয়ে। ছোটলাট বারোজ বাংলাভাগের বিরোধী ছিলেন। তিনি মাউন্টব্যাটেনকে বললেন, কলিকাতাকে মুক্তনগরী ঘোষণা করা হোক। বড়লাট ২৮ এপ্রিল তার উত্তরে লেখেন, "I do not like the idea of a free city. It goes against all the principles on which the rest of the plan is based ...and I do not see how we can enforce it." ছোটলাট বারোজ বড়লাটের মন্তব্যের সারমর্ম না বুঝে কলিকাতাকে দুই বাংলার হাতে দেওয়া হোক এই দাবি জানালেন। তা না হলে পূর্ববঙ্গ এক "rural slum"এ পরিণত হবে—এ সংশয়ও প্রকাশ করেছিলেন ছোটলাট। শেষ পর্যন্ত প্যাটেল, নেহরু, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দের বিরোধিতায় যুক্তবঙ্গের প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়।

ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ১৮ জুলাই ১৯৪৭ সালে মাউন্টব্যাটেন প্রস্তাব অনুসারে ক্লিমেন্ট এট্‌লি "ভারতের স্বাধীনতা আইন" পেশ করলে বিনা বাধায় তা গৃহীত হয়। এই আইন অনুযায়ী ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট থেকে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র বা ডোমিনিয়নের জন্ম হয়। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সমস্ত ক্ষমতার সমাপ্তি ঘটে। সমস্ত ক্ষমতা অতঃপর ভারত ও পাকিস্তানের গণপরিষদ দুটির হাতে ন্যস্ত হয়।

এরপর ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ভারতীয় ও পাকিস্তানি গণপরিষদ দুটির ওপর স্ব স্ব রাষ্ট্রের শাসনাধিকার অর্পিত হয়। মহম্মদ আলি জিন্না সদলবলে করাচি চলে যান এবং সেখানে পাকিস্তান গণপরিষদ বৈঠকে মিলিত হন। জিন্না পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল আর লিয়াকৎ আলি হন প্রধানমন্ত্রী। এদিকে স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী রূপে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু গঠন করেন তাঁর মন্ত্রীসভা। গভর্নর জেনারেল হলেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন।[১]

ফিরে আসি কলিকাতার কথায়। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত বিভাগের ফলে বঙ্গদেশ দুইভাগে বিভক্ত হল। পশ্চিমভাগ পশ্চিমবঙ্গ নামে ভারতের মধ্যে রইল এবং পূর্বভাগ পূর্বপাকিস্তান নামে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। কলিকাতা পশ্চিমবঙ্গের এবং ঢাকা পূর্বপাকিস্তানের রাজধানী হয়। ভারত বিভাগে কলিকাতার রাজনৈতিক গুরুত্ব বিশেষভাবে হ্রাস পায়। ব্রিটিশ আমলে কলিকাতা একদা সারা ভারতের রাজধানী ছিল। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কারণে ভারতের রাজধানী কলিকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত করে কলিকাতাকে কেবলমাত্র বঙ্গদেশের রাজধানী করা হয়। ভারত বিভাগে কলিকাতার সে গৌরবটুকু কেড়ে নিয়ে কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী করা হল। কলিকাতার সৌভাগ্য সূর্য এইভাবে ধীরে ধীরে অস্তমিত হতে থাকে।

স্বাধীনতার উদয়লগ্নের প্রাক্কালে অর্থাৎ ১৩ আগস্ট ১৯৪৭ সালে তৎকালীন মেয়র সুধীরচন্দ্র

রায়চৌধুরীর উদ্যোগে কলিকাতা পুরসভা ডালহৌসি স্কোয়ার ওয়েস্ট, চার্নক প্লেস এবং ক্লাইভ স্ট্রিটের নাম পরিবর্তন করে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর স্মরণে 'নেতাজি সুভাষ রোড' নামাঙ্কিত করেন। মেয়র স্বয়ং সুভাষচন্দ্রের নামাঙ্কিত ফলকটি ওই রাজপথের দেয়ালগাত্রে প্রোথিত করেন।[২]

খণ্ডিত বঙ্গদেশ তথা পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হন বিশিষ্ট গান্ধীবাদী নেতা ও শিক্ষাবিদ ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। ১৯৪৮ সালের গোড়ার দিকে বহুমানভাজন চিকিৎসক এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর পদ অলংকৃত করেন। পশ্চিমবঙ্গে শাসনক্ষমতা গ্রহণ করেই তিনি কলিকাতা পুরসভার পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করেন। এক সময় এই পৌর প্রতিষ্ঠানের অল্ডারম্যান ও মেয়র হয়েছিলেন তিনি। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলার জন্য কলিকাতা পুরসভার দায়িত্ব নিজ হাতে গ্রহণ করেন এবং একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীকে কলিকাতা পুরসভার চূড়ান্ত ক্ষমতা দিয়ে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার নিয়োগ করেন। এরপর পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলিকাতা পুরসভার পরিচালন ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তনে ব্রতী হন। অতঃপর ১৯৫১ সালে রাজ্য সরকার কলিকাতা পুরসভা পরিচালনার জন্য এক নতুন আইন বিধিবদ্ধ করেন। আইনটি ১৯৫২ সালের ১ মে থেকে কার্যকর হয়। সেই সঙ্গে সরকারি নিয়ন্ত্রণের অবসান ঘটে। কলিকাতা পুরসভার শাসনব্যবস্থায় নব দিগন্তের সূচনা হয়।

জোব চার্নকের কলিকাতা পদার্পণের মধ্য দিয়ে পূর্বভারতে যে ব্রিটিশ বাণিজ্যের সূত্রপাত হয়েছিল, নবাব সিরাজদ্দৌলার পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে তা রাজ্যপাটে রূপান্তরিত হয়। মহাকবির কথায়—

"বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী রাজদণ্ডরূপে"

কলিকাতা শহরকে কেন্দ্র করে এই রাজদণ্ড পরিচালিত হয়ে একদা সারা ভারতবর্ষকে ইংরেজের অধীনে নিয়ে আসে। এই শহর থেকে শাসনের সঙ্গে শোষণের বহুমুখী ধারায় ইংল্যান্ড পরিপুষ্ট হওয়ায় ইংরেজদের কাছে এ শহর হয়ে উঠেছিল তাঁদের সৌভাগ্যের দ্যোতক, নয়নের মণি। কাজেই এই শহরকে "Second City of the British Empire" হিসাবে গড়ে তুলতে তাঁরা কার্পণ্য করেননি। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজের শাসনক্ষমতা হস্তান্তরের সঙ্গে সঙ্গে শাসন-শোষণের সেই দীর্ঘ ইতিহাসের পরিসমাপ্তি ঘটে। স্বাধীনতার উষালগ্নে কলিকাতা পা রাখল এক নতুন পথে, শুরু হল তার নতুন ইতিহাসের আরেক পথ পরিক্রমা।

**তথ্যসূত্র**


১ স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস—অমলেশ ত্রিপাঠী
A Study in Indian History—K.L. Gillion
ভারতকোষ—৪র্থ খণ্ড

২ The Proceedings of the Meeting of Calcutta Corporation, dt. 13.8.1947

## পরিশিষ্ট-ক

# বস্তি বাড়ির সারণি

Table XVI—Statement of the Bustees in each Ward or Police Section, with the Male and Female population.

| Ward and Police Section | Name of Bustee | Number of the Premises in Assesssment Books. | Population | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Male | Female | |
| 1. A. | Buddun Singh's Bagan | 208, Upper Chitpore Road | 110 | 99 | 209 |
| | Doorga Churn Mookerjee's | 22, 27, and 30, Doorga Churn Mookerjee's Street. | 228 | 174 | 402 |
| | Bose Bagan | 5, Nobin Sircar's Lane | 93 | 60 | 153 |
| | Baroodkhana | 199, Upper Chitpore Road | 546 | 354 | 900 |
| | Mohunbagan | 1, Furriapooker Street; 47 and 73, Sikdarbagan Street | 122 | 120 | 242 |
| | Hattibagan | 24, Hattibagan Street (Grey Street); 81, 82 and 83, Cornwallis Street. | 471 | 320 | 791 |
| | Buldiahpara | 8 and 9, Shampooker Street | 90 | 84 | 174 |
| | Ooryapara | 65 and 66, Rajah Nobokissen's Street | 359 | 237 | 596 |
| | Sobha Bazar | 155, Upper Chitpore Road | 800 | 338 | 1,138 |
| | Shampooker | 33 and 34, Shampooker Stree | 148 | 104 | 252 |
| | Jhoolunpara | 54, Rajah Rajbullubh's Street; 16, Ramkant Bose's Street | 132 | 159 | 291 |
| | Lall Bagan | 160, Upper Chitpore Road | 458 | 320 | 778 |
| | Telipara | 47, Buloram Ghose's Street | 111 | 108 | 219 |
| | Shampooker Street | 51, Rajah Nobokissen's Street | 142 | 133 | 275 |
| | Kantapooker | 41, Ramkant Bose's Street | 49 | 48 | 97 |
| 2. B. | Golabarry | 243, Upper Chitpore Road | 197 | 40 | 237 |
| | Siddhesurrytolla | 257 and 262, ditto | 254 | 155 | 409 |
| | Thakurpara | 2, Bonomally Sircar's Street | 1,064 | 424 | 1,488 |
| | Goabagan | 1, ditto ditto | 686 | 347 | 1,033 |
| | Shaikbagan | 112, Baniatola Street | 436 | 335 | 771 |
| | Koondoopara | 143, Durmahatta Street | 236 | 74 | 310 |
| | Dhobapara | 34, 36, Sobha Bazar Street | 146 | 155 | 301 |
| | Nathbagan | 11 and 12, Anundo Khan's Lane; 20,Baniatola Street; 9, Bhugwan Banerjee's Lane; 10, 11, 12 and 13, Nathbagan Street. | 520 | 563 | 1,083 |
| | Chaglapara | 297 and 302, Upper Chitpore Road | 139 | 95 | 234 |
| | Muthoor Sen's Phoolbagan | 70-73, Nimtolla Ghat Street and 1, Muthoor Sen's Garden Lane. | 434 | 367 | 801 |
| 3. C. | Maleebagan | 22. Musjeedbaree Street | 101 | 79 | 180 |
| | Katmabagan | 44, ditto ditto | 121 | 45 | 166 |
| | Joy Narain Sircar's Bagan | 31, Durzeepara Street | 113 | 131 | 244 |
| | Dhobapara | 15, Fukeerchand Chuckerbutty's Lane. | 76 | 46 | 122 |
| | Goabagan | 19, Goabagan Street | 382 | 279 | 661 |

| Ward and Police Section | Name of Bustee | Number of the Premises in Assesssment Books. | Population | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Male | Female | |
| | Pearahbagan | 11, Goabagan Street | 105 | 67 | 172 |
| | Sunker Dutt's Bagan | 12, ditto ditto | 243 | 245 | 488 |
| | Rajabagan | 104, Upper Circular Road | 1,762 | 980 | 2,742 |
| | Nundunbagan | 169, ditto ditto | 406 | 286 | 692 |
| | Hulseebagan | 170, ditto ditto | 537 | 320 | 857 |
| 4. D. | Bolai Singh's Bagan, or Amherst Street Gowalapara. | 102, Amherst Street | 238 | 159 | 397 |
| | Chaldabagan or Tantipara | 54 and 55, Sookea's Street | 219 | 227 | 446 |
| | Hareepara | 65 and 66, ditto | 139 | 126 | 265 |
| | Kristobagan | 101, Upper Circular Road | 387 | 345 | 732 |
| | Puteerbagan | 72 and 75, Maniktolla Street | 163 | 185 | 348 |
| | Christianpara | 19, Muddun Mitter's Lane | 26 | 46 | 72 |
| | Badoorbagan | 82 and 83, Upper Circular Road | 779 | 442 | 1,221 |
| | Kaloo Ghose's Bagan | 52, Sookea's Street | 510 | 417 | 927 |
| | Chooterpara | 98, Upper Circular Road | 149 | 124 | 273 |
| | Tikeahpara | 76, Amherst Street | 125 | 49 | 174 |
| | Moulviedangah or Mirzapore bustee | 68, Muchooa Bazar Street | 213 | 141 | 354 |
| 5. E. | Jorabagan | 15 and 16, Jorabagan Street | 1,257 | 1,012 | 2,269 |
| | Nawabputty | 9 and 10, Kalakur Street | 260 | 227 | 487 |
| | Phoolbagan | 82 and 85, Burtolla Street | 193 | 331 | 524 |
| 6. F. | Bysak Digghi or Kollabagan | 121 and 138, Muchooa Bazar Street | 3,005 | 1,071 | 4,076 |
| | Singheebagan | 24, Baranusee Ghose's Street | 626 | 449 | 1,075 |
| | Kally Dutt's para | 66, Simla Street | 265 | 183 | 448 |
| | Gowalapara | 108 and 109, Baranusee Ghose's Street | 185 | 147 | 332 |
| | Bysakbagan | 1, Bysakbagan lane | 127 | 96 | 223 |
| | Lalla Baboo's Phoolbagan | 2, Maniktollah Street | 210 | 182 | 392 |
| | Rambagan or Dompara | 1-5 and 8, Rambagan Lane | 467 | 478 | 945 |
| | Gowalapara | 48 and 49, Maniktolla Street | 148 | 104 | 252 |
| | Ditto | 51, Buloram Dey's Lane | 82 | 82 | 164 |
| 7. G. | Sinduriaputty | 94, Lower Chitpore Road | 287 | 162 | 449 |
| 8. H. | Kollabagan | 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27 and 28, Muchooa Bazar Street. | 1,644 | 866 | 2,510 |
| | Garatolla | 14 and 15, Syed Salik's Lane; 8 and 9 Halliday Street. | 1,607 | 939 | 2,546 |
| | Kollabagan | 3, 4, 5 and 8, Shumboo Chatterjee's Lane; 38, Bhowanichurn Dutt's Lane. | 917 | 857 | 1,774 |
| | Madhub Baboo's Bazar | 44, Colootola Street | 297 | 131 | 428 |
| | Choonagully | 59, 60, 61, Champatolla Lane | 488 | 238 | 726 |
| | Ditto | 80, 81 and 82, Chunam Gully | 865 | 258 | 1,123 |
| | Machooa Bazar | 1, Muchooa Bazar Street | 844 | 557 | 1,401 |
| | Ditto | 14, ditto ditto | 893 | 550 | 1,443 |
| | Fouzdarry Balakhana | 31, Lower Chitpore Road | 125 | 24 | 149 |
| | Hareemeah-ka-para | 1-9, Nemoo Khansamah's Lane and 8 and 22, Nemoo Khansamah's, 1st Lane. | 551 | 327 | 878 |

| Ward and Police Section | Name of Bustee | Number of the Premises in Assesssment Books. | Population | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Male | Female | |
| | Ooryapara | 17-20, Soortibagan Lane | 236 | 147 | 383 |
| | Sankeybhangah or Jelliatola | 10-16, Nilmadhub Sen's Lane and 39, Bhowanichurn Dutt's Lane. | 562 | 418 | 980 |
| 9. I. | Boitakhana or Tewaribagan | 162, Bow Bazar Street | 174 | 96 | 270 |
| | Boitakhana | 167, ditto | 335 | 208 | 543 |
| | Begumtalao | 157 and 158, Bow Bazar Street | 202 | 130 | 332 |
| | Pattooabagan or Roop Baboo's Bagan | 64, Machooa Bazar Road | 573 | 526 | 1,099 |
| | Pattooabagan | 3-19, Pattooabagan Lane | 774 | 542 | 1,316 |
| | Bokoolbagan | 11, Carey's Church Lane. | | | |
| | | 42-45, Amherst Street. | | | |
| | | 93, Old Boitakhana Bazar Road. | 1,116 | 544 | 1,660 |
| | | 58-62, Muchooa Bazar Street | | | |
| 10. J. | Meajan-ka-gully or Mughpara | 21, Bow Bazar Street | 473 | 190 | 663 |
| | Bipareetola | 31, 32, 34, 35 and 37, Imambagh Lane | 796 | 624 | 1,420 |
| | Mundirtalao | 2-9, 12, 15 and 18, Gopimohun Bose's Lane. | 755 | 428 | 1,183 |
| | Moonsheetalao | 21, Gooriamah's Lane | 478 | 438 | 916 |
| | Goomghur Lane | 10-16, Gommghur Lane | 158 | 124 | 282 |
| 11. K. | Keranibagan | 128, Bow Bazar Street | 566 | 447 | 1,013 |
| | Chalooaputty | 106, Serpentine's Lane | 533 | 343 | 876 |
| | Chasadhopapara | 16, Dixon's Lane | 46 | 22 | 68 |
| | Kristo Laha's Lane | 8, Kristo Laha's Lane | 77 | 115 | 192 |
| | Ooryapara | 24, Ooryapara Lane | 126 | 49 | 175 |
| | Nara Girja | 124, Bow Bazar Street | 210 | 130 | 340 |
| | Sankaritola | 14, Sankaritola Lane | 49 | 55 | 104 |
| 12. L. | Nil | Nil | Nil. | Nil. | Nil. |
| 13. M. | Moidaputty or Jaun Bazar | 1-13, Jaun Bazar, 3rd Lane | 713 | 91 | 804 |
| | Bhisteepara | 6-10, ditto, 5th Lane | 198 | 25 | 223 |
| | Joratalao | 31, Joratalao Street and 2, Stewart's Lane | 226 | 29 | 255 |
| | Nanuktalao | 46-49, Colinga Bazar Street and 16-19, Misree Khansamah's Lane. | 213 | 133 | 346 |
| | Chikunpara | 1-10, Kerr's Lane and 1-13, Syud Ismail's Lane. | 292 | 257 | 549 |
| | Dhokuriabagan | 7-8, Dhokuriabagan Lane and 13-97, Umachurn Dass's Lane. | 333 | 154 | 487 |
| 14. N. | Khalasseetola | 106-107, Jaun Bazar Street | 161 | 74 | 235 |
| | Pooa-walla gully | 100, ditto | 101 | 78 | 179 |
| | Gool-walla | 86-88, ditto | 110 | 56 | 166 |
| | Bamunbagan | 46-49, ditto | 823 | 552 | 1,375 |
| | Garwantola | 83-84 and 98-99, Taltolla Lane | 108 | 106 | 214 |
| | Khalasseetola and Garwantola | 39-41, Jaun Bazar Street and 86, Wellesley Street | 375 | 205 | 580 |
| | Jelly-walla | 4-6, Taltolla Lane | 134 | 131 | 265 |
| | Taltolla | 74-77, ditto | 83 | 46 | 129 |

| Ward and Police Section | Name of Bustee | Number of the Premises in Assesssment Books. | Population | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Male | Female | |
| | Pheripara | 1-37, Sarang's Lane | 373 | 198 | 571 |
| | Hareepara | 1-12, Hareepara Lane | 142 | 137 | 279 |
| | Chooterpara | 1 and 9-18, Neogeepooker West Lane | 125 | 119 | 244 |
| | Nawabbagan | 70-78, Jaun Bazar Street | 626 | 417 | 1,043 |
| | Napitbagan | 26-32, Neogeepooker East Lane | 405 | 324 | 729 |
| | Komedanbagan and Haro Lusker's Mat. | 19-45, Imdad Ali's Lane; 1-42, Komedanbagan Lane; 61-86, South Collinga Street. | 953 | 727 | 1,680 |
| | Burtola | 27-30, Hareepara Lane | 132 | 85 | 217 |
| | Niharitola | 12-19 and 46, Imdad Ali's Lane | 161 | 125 | 286 |
| 15. O. | Dalalbagan | 19, South Colinga Street; 69-73 and 1-8, Elliot Road; 1-3, Gholam Sobhan's Lane | 352 | 309 | 661 |
| | Dhobapara | 15-17, South Collinga Street | 135 | 41 | 176 |
| | Bibi Dick ka Hatta | 7-8, ditto | 147 | 139 | 286 |
| | Musjidtalao | 6 and 9-14, ditto | 137 | 99 | 236 |
| | Nazirtalao | 11-14, ditto | 503 | 193 | 696 |
| | Narialbagan | 6, Hill's Lane and 6-8 and 18, Mehndibagan Lane | 179 | 140 | 319 |
| | Pugli Bibi-ka and Ostagartalao | 29-31, Elliot Road | 61 | 35 | 96 |
| | Muddun Baboo-ka-talao | 32, ditto | 67 | 53 | 120 |
| | Mungloo Khansamah's | 20-22, Gorastan Lane | 103 | 52 | 155 |
| | Monowur Khan-ka Bagh | 20-22, Lower Circular Road | 170 | 133 | 303 |
| | Moore Saheb-ka Hatha | 33, Park Street | 120 | 129 | 249 |
| | Lalla bustee | 25-26, Mehndibagan Lane | 44 | 37 | 81 |
| | Duncan's bustee | 13, Wood Street | 229 | 69 | 298 |
| | Short's Bazar | 25, Park Street and 1, Rawdon Street | 667 | 390 | 1,057 |
| | Naya bustee | 23, Theatre Road | 99 | 70 | 169 |
| 16. P. | Choonoo-ka-bustee | 30, ditto | 287 | 110 | 397 |
| | Hills Bazar bustee | 31, ditto | 204 | 71 | 275 |
| 17. Q. | Short's bustee | 3, Moira Street; 8, Loudon Street; and 15, Theatre Road | 227 | 180 | 407 |
| | Dhankheti or Colvin's bustee | 6-9, Theatre Road and 2, Lower Circular Road | 1,237 | 789 | 2,026 |
| 18. R. | Garikhana bustee | 4, St. George's Gate Road | 343 | 165 | 503 |
| | Bazar bustee | 3-4, Bazar Road | 566 | 451 | 1,017 |
| | Bazar and Gowkhana bustee | 5, Bazar Road and 3, Bakery Road | 421 | 318 | 739 |
| | Ordnance Department Khalassees' bustee | 5, Kidderpore Bridge Road | 599 | 302 | 901 |
| | Khalassee bustee | 2, Khalassee Road | 556 | 407 | 963 |

## পরিশিষ্ট-খ

## হাট-বাজারের সারণি

Table XVII.—List of Bazars within the Town of Calcutta.

| Name of Bazar | Situation | Name of owner. | State of bazar | Description of provisions solo. |
|---|---|---|---|---|
| *European Bazars.* | | | | |
| Municipal Market | Lindsay Street | Corporation of the Town of Calcutta | Excellent | All descriptions. |
| Dhurrumtolla Bazar | Chowringhee Road | Ditto ditto | Very good | Ditto, but in small quantities. |
| Tiretta Bazar | Lower Chitpore Road | Ranee of Burdwan | Ditto | All descriptions. |
| Taltolla Bazar | Jaun Bazar Street | Rajah Joteendro Mohun Tagore. | Partly paved with tiles. | Ditto |
| *Native Bazars* | | | | |
| Mullick's Bazar | Lower Circular Road | Sreemutty Rongomoney | Partly paved with tiles. | Fish, fruits, vegetables and grain. |
| Hills' Bazar | Theatre Road | Tarini Churn Bose | Ditto | Very few shops left; the place is nearly deserted. |
| Colinga Bazar | Wellesley Street | Hurronath Mullick | Ditto | Fish, fruits, vegetables and condiments. |
| Grant's Street Bazar | Grant's Street | Sreemutty Soodabee Dassee | Ditto | Fish, fruits and vegetables. |
| Chandney Bazar | Dhurrumtolla Road | Receiver, High Court | Under repair | Meat, dry goods, cloth, wearing apparel, iron mongery, leather goods, braziery and miscellaneous. |
| Bhoobun Paul's Bazar | St. James's Square | Premnath Mullick | Paved throughout with tiles. | Fish, fruits and vegetables. |
| Bow Bazar | Wellington Street | Nundogopal Muttyloll | Paved partly with Chunar stones and accommodation extended. | Ditto Ditto |
| Boitakhana Bazar | Circular Road | Brojonath Coondoo | Broken up | Converted to a gram depot. |
| New Boitakhana Bazar | Old Boitakha Bazar Road | Essan Chunder Chatterjee | Partly paved with tiles. | Fish, fruits, vegetables and poultry |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hurrymohun Dass's Bazar | Amherst Street | Cally Churn Dutt | Brick-on-edge paving | Fish, fruits and vegetables. |
| Madhub Dutt's Bazar | College Street | Sreemutty Luckhimoney Dassee, receiver of the estate of Gooroodass Dutt. | Partly paved with artificial stone. | Ditto, and dry stuffs and condiments. |
| Tictickee Bazar | Muchooa Bazar Street | Susty Churn Daw | Partly paved with tiles. | Fish, fruits and vegetables. |
| Porrah Bazar | Ditto | Preonath Sett | Brick-on-edge paving | Ditto Ditto. |
| Muchooa Bazar | Ditto | Estate of Rajah Sir Radhakant Deb. | Paved throughout with tiles. | Ditto Ditto |
| Keroa Postah Dewan Cassinath's Bazar | Durmahatta Street | Damoodur Doss Burma | Partly paved with patent stone, | Ditto ditto, and condiments and spices of every description in large quantities. |
| Ditto or Strand Road Bazar | Ditto | Mehendro Nath Tagore | New bazar | Fruits and vegetables. |
| Ranee's Postah | Ditto | Ranee of Burdwan | Cutcha floor | Fruits, vegetables and spices. |
| Rajah's Postah | Ditto | Coomar Rajcoomar Roy | Ditto | Fruits, vegetables and dry stuffs. |
| Rajendro Mullik's Bazar | Ditto | Rai Rajendro Mullick | Ditto | Ditto, ditto and gram. |
| Lalla Baboo's Bazar | Chitpore Road | Paikapara estate | Paved with tiles throughout. | Fish, fruits, vegetables, gram and spices. |
| Nooton Bazar | Ditto | Rai Rajendro Mullick | Ditto | Ditto, ditto and cloth. |
| Hudwa or Simla Bazar | Manikotolla Street | Estate of Heeralall Seal | Partly paved with tiles. | Fish, fruits and vegetables. |
| Maniktolla Bazar | Ditto | Estate of Rajah Sir Radhakant Deb. | Paved with tiles throughout. | Ditto, ditto, spices and gram. |
| Hatkhola Bazar | Dunmahatta Street | Estate of Rajah Apurvakrishna | Brick-on-edge flooring. | Insignificant bazar. |
| Sobha Bazar | Chitpore Road | Estate of Rajah Sir Radhakant Deb. | Paved throughout with tiles. | Fish, fruits and vegetables. |
| Moonshee Bazar | Ditto | Estate of Shamchand Mullick | Ditto | In abeyance at present. |
| Shambazar | Upper Circular Road | Estate of Rajah Apurvakrishna. | Ditto | Fish, fruits, vegetables and dry goods. |

## পরিশিষ্ট-গ

# গ্যাসবাতির সারণি

["Roport for the Improvement of Calcutta-1861" পুস্তকে প্রকাশিত কলিকাতার রাস্তায় তেলের ও গ্যাসের আলো পত্তনের দুটি সারণি]

## APPENDIX NO. XII

### Street Lamps lit with Gas

| No. of Gas Lamp | Names of Streets. |
|---|---|
| 4 | In Amratollah Street |
| 2 | In Banks' Hall Street |
| 13 | In Barranussey Ghose's Street |
| 31 | In Bow Bazar Street |
| 56 | In Chowringhee Street |
| 1 | In Ditto Lane |
| 6 | In Ditto, Maidan side |
| 21 | In College Street |
| 7 | In Ditto Square |
| 18 | In Cossitollah Street |
| 11 | In Chitpore Road (Lower) |
| 29 | In Ditto (Upper) |
| 23 | In Clive Street |
| 11 | In Camac Street |
| 4 | In Council House Street |
| 15 | In Collotollah Street |
| 10 | In Cotton Street |
| 3 | In Church Lane |
| 1 | In Clive Row |
| 5 | In Cross Street |
| 3 | In China Bazar Street (New) |
| 5 | In Collah Ghaut |
| 3 | At Cocked Hat |
| 1 | In Circular Road |
| 4 | In Commercial Buildings |
| 13 | In Cornwallis Street |
| 14 | In Ditto Square |
| 8 | In Doomtollah Street |
| 1 | In Dacre's Lane |
| 14 | In Dhurrumtollah Street |
| 8 | In Esplanade Row (East) |
| 13 | In Ditto (West) |
| 6 | In Elliot's Road |
| 9 | In Elysium Row |
| 20 | In Free School Street |
| 2 | In Fancy Lane |
| 3 | In Fairlie Place |

4 In Government Place (North)
3 In Ditto (West)
5 In Ditto (East)
7 In Harrington Street
9 In Hastings' Street
6 In Hare Street
1 In Humayoon Place
1 In Jackson's Ghaut Street
4 In Joratalao Street
6 In Kyd Street
4 In Kamutyan ke Baree Street
3 In Khungraputty Street
1 In Larkin's Lane
4 In Lyon's Range
6 In Loll Bazar
1 In Maxton's Lane
7 In Moorghoelutta Street
5 In Middleton Row
7 In Ditto Street
2 In Meerbhur Ghaut Street
18 In Mirzapore Street
4 In Misson Row
20 In Maidan
7 In Ditto Leading to Baboo's Ghaut
14 In Mooktaram Baboo's Street
10 In Nimtollah Ghaut Street
9 In Old Cout House Street
5 In Old Post Office Street
19 In Park Street
1 In Parsee Church Lane
6 In Pollock Street
8 In Pathooriah Ghaut Street
10 In Russel Street
15 In Radha Bazar & Old China Bazar Street
8 In Royd Street
2 At Scotch Kirk
40 In Strand Road
19 In Ditto from Baboo's Ghaut to Fort Point
6 In Ditto round back of Eden Garden
1 In Ditto from Baboo's Ghaut opposite Engine House
7 In Theatre Road
10 In Tank Square (South)
9 In Ditto (North)
9 In Ditto (West)
13 In Tank Square (East)
3 In Treble Post, South East Treasury
6 In Waterloo Street
29 In Wellesley Street

| | |
|---|---|
| 5 | In wellesley Place |
| 11 | In Wellington Street |
| 8 | In Ditto Square |
| 10 | In Wood Street |
| 6 | In Sudder Street |
| 6 | In Mangoe Lane |
| 7 | In Lindsay Street |
| 3 | In Chowringhee Lane |

**Total** Lamps 848

# তেলের বাতির সারণি

# APPENDIX NO. XIII

## List of Streets lit with Oil

| No. of Oil Lamp | Names of Streets |
|---|---|
| 18 (N) | Circular Road |
| 17 (S) | |
| 6 | Sham Bazar Street |
| 8 | Baug Bazar Street |
| 10 | Raja Nabkissen Street |
| 9 | Doorga Churn Mitter's Street |
| 4 | Raja Gooroodoss Street |
| 17 | Maniktollah Street |
| 14 | Cornwallis Street |
| 7 | Bularam Dey's Street |
| 3 | Barranussey Ghose's Street |
| 4 | Sookeea's Street |
| 2 | Muchooa Bazar East end |
| 15 | Amherst Street |
| 5 | Champatollah Lane |
| 6 | Choona Gullee |
| 27 | Chitpore Road from Nimtollah Street to Baug bazar |
| 5 | Sobha Bazar Street |
| 2 | Rutton Sirkar's Garden Street |
| 2 | Shibtollah Street |
| 5 | Aheereetollah Street |
| 20 | Durmahatta Street N. of Nimtollah |
| 7 | Strand Road N. of Mint |
| 4 | Old Bytakhana Bazar Road |
| 2 | St. James' Street |
| 12 | Hiddaram Banarjee's Street |
| 2 | Wellington Square |
| 21 | Dhurrumtollah East end |
| 2 | Buhoo Bazar Lane |
| 2 | Khyroo Mehter's Lane |
| 10 | Emambaugh Lane |
| 1 | Hospitlal Lane |
| 6 | Chandnee Choke Street |
| 6 | Ranee Moody Gullee |
| 19 | Jaun Bazar Street |
| 4 | Harreepara Lane |
| 4 | European Asylum Lane |
| 4 | Wellesley Square |
| 10 | South Culinga Street |

3 Elliott's Road
10 Park Street E. of Loudon Street
5 Rawdon Street
9 Loudon Street
7 Short's Bazar Street
4 Camac Street S. of Theatre Road
2 Little Russell Street
1 Hanspookar Lane
1 Juggomohan Mallick's Lane
1 Doyhatta Street
2 Moyda Putti Lane
3 Sobharam Bysack's Street
2 Poyratollah Gullee
2 Kalakur Street
2 Kuburdanga Street
2 Shikdarpara Street
4 Durponarain Thakoor's Street
2 Brijo Doolal's Street
1 Prosonnocoomar Tagore's Street
2 Mundul Street
1 Churruckadanga Street
2 Jora Bagan Street
1 Muthoor Sen's Garden Lane
1 Gour Laha's Street
1 Gopeekristo Pal's Lane
2 Brindabun Bysack's Lane
1 Neemoo Gosain's Lane
1 Sunkar Haldar's Lane
1 Babooram Ghose's Lane
5 Beniatollah Street
1 Goluck Dutt's Lane
2 Nather Bagan Street
2 Hurchunder Mullick's Lane
2 Nundoram Sen's Street
3 Bunmalee Sircar's Street
4 Buloram Mozoomdar's Street
2 Koomartolee Street
3 Kasee Miter's Ghat Street
2 Moonshee Sudurrodden's Lane
1 Panchee Dhobanee's Gully
2 Ramtonoo Bose's Lane
3 Chasa Dhobapara Street
1 Jeliatollah Street
3 Simla Street
1 Gourmohun Mookherjee's Street
2 Seit Bagan Gullee
1 Ramchand Ghose's Lane
4 Nyanchund Dutt's Street
2 Kasee Ghose's Lane
1 Krishno Singhee's Lane
1 Darzeepara Street

| No. of Oil Lamp | Names of Streets. |
|---|---|
| 1 | Chidam Moodee's Lane |
| 3 | Hurree Ghose's Street |
| 1 | Ramnarain Bhatacharjee Lane |
| 2 | Guranhatta Street |
| 2 | Fukeerchand Chuckerbutty's Lane |
| 1 | Lal Ostagar's Lane |
| 1 | Ishur Thakoor's Lane |
| 3 | Juggonath Shoorooee's Lane |
| 1 | Ramchand Nundee's Lane |
| 1 | Imam Buksh Thanadar's Lane |
| 1 | Sona Ghazee Lane |
| 2 | Neelmunee Mitter's Street |
| 5 | Musjid Baree Street |
| 2 | Gooloo Ostagur's Lane |
| 6 | Kaleepersad Dutt's Street |
| 1 | Hurremohan Bose's Lane |
| 2 | Rajah Kalee Krishun's Lane |
| 2 | Taruck Chatoorjya's Lane |
| 2 | Balakhana Street |
| 1 | Kumbooliatollah Lane |
| 3 | Sham Pookur Street including Furria Pookur |
| 1 | Teleepara Lane |
| 2 | Bula Ram Ghose's Lane |
| 1 | Krishno Ram Bose's Street |
| 4 | Raja Rajbullub's Street |
| 3 | Ramkanth Bose's Street |
| 1 | Kalee Pursad Chuckerbutty's Street |
| 2 | Bosepara Lane |
| 1 | Santee Ram Ghose's Street |
| 1 | Brindabun Pul's Lane |
| 1 | Hurlall Mitter's Street |
| 1 | Doorga Churn Mookerjee's Street |
| 1 | Fuckeer Chand Mitter's Lane |
| 1 | Jhamapookur Lane |
| 2 | Bechoo Chatterjee's Lane |
| 1 | Gooroopersad Chowdhree's Lane |
| 1 | Sunker Ghose's Lane |
| 1 | Shibnarain Doss' Lane |
| 1 | Rughoonath Chatterjeea's Street |
| 1 | Brindabun Mullick's Lane |
| 1 | Nawabdee Ostagur's Lane |
| 1 | Joogulkishore Doss' Lane |
| 4 | Goa Bagan Street |
| 3 | Hogul Kooria Gullee |
| 1 | Hathee Bagan Street |
| 2 | Shikdar Bagan Street |
| 1 | Swallow Lane |

2 Old Court House Lane
1 Old Court House Corner
1 Radha Bazar Lane
3 Sookeea's Lane
1 David Joseph's Lane
1 Aga Kurbula Mohamed's Street
1 Bonfield's Lane
1 Lucas' Lane
2 Gobind Chand Dhur's Street
1 Roop Chand Roy's Street
1 Monohur Doss' Street
2 Chattawalla Gullee
3 Blackburn's Lane
2 Peter's Lane
2 Tirretta Bazar Street
1 Sreenath Baboo's Lane
1 Damzen's Lane
2 Giree Baboo's Lane
1 Gungadhur Baboo's Lane
3 Rutto Surkar's Lane
3 Dhurrumtollah Lane
2 Tara Chand Dutt's Street
1 Rammohun Ghose's Lane
1 Soortee Bagan Lane
1 Rampursad Saha's Lane
2 Bhowaneechurn Dutt's Lane
1 Sobharam Bysack's Lane
1 Ditto 2nd Lane
2 Medical College Street
3 Nemoo Khansama's Lane
1 Harkata Lane
1 Choonapookur Lane
2 Scott's Lane
1 William's Lane
1 Mirzapore Tank Lane
1 Puttuldanga Street
1 Carey's Church Lane
1 Noor Mohmed Sircar's Lane
1 Okhil Mistree's Lane
1 Anthoney Bagan Lane
2 Gobindchunder Sen's Lane
2 Tamer's Lane
1 Meer Jaffer's Lane
3 Seetaram Ghose's Street
1 Beniatollah Lane
1 Romanath Mozoomdar's Street
2 Puttootollah Lane
3 Punchanundtollah Lane
2 Radhanath Mullick's Lane
1 Chootarpara Lane
2 Sideshurchunder's Lane

2 Banstollah Lane
3 Crooked Lane
.1 Gibson's Lane
2 Grant's Lane
1 Weston's Lane
5 Zig Zag Lane
1 Nunkoo Jemadar's Lane
4 Shibtollah Lane
2 Kenderdine's Lane
3 Gooriama Lane
2 Chandnee Choke 2nd Lane
1 Gopee Mohun Bose's Lane
1 Mulunga Lane
4 Mulunga 1st Lane
3 Mudun Bural's Lane
1 Obhoy Haldar's Lane
2 Bepareetollah Lane
2 Goomghur Lane
1 Punchnundtollah Lane
4 St. James' Square
4 Serpentine Lane
2 Sooree's Tank Path Lane
4 Sakhareetollah Lane
2 Mirzapore Lane
1 Mirzapure 2nd Lane
5 Creek Row
1 Gungaram Palit's Lane
1 Scavenger's Lane
3 Bancharam Unkoor's Lane
1 Thakoor Doss Palit's Lane
1 Huzooree Mul's Tank Lane
2 Fordyee's Lane
1 Dixon's Lane
1 Ram Hurree Mistree's Lane
1 Gowaltolee Lane
3 Neelmonee Haldar's Lane
4 Puthurtollah or Mott's Lane
1 Jan Bazar 1st Lane
2 Ditto 2nd Ditto
1 Ditto 3rd Ditto
4 Ditto 4th Ditto
1 Shib Chunder Dey's Lane
1 Kora Burdaras Street
1 Dhobapara Street
1 Hartford's Lane
1 Dookhooree Bagan Lane
5 Culinga Bazar Street
1 Misree Khansama's Lane
5 Culinga 1st lane
1 Peeroo Khansama's Lane
2 Wellesly 2nd Lane

| | |
|---|---|
| 1 | Wellesly 1st Lane |
| 7 | Moocheepara Lane |
| 1 | Moonshee Deedar Buksh's Lane |
| 2 | Taltollah Bazar Street |
| 1 | Gardner's Lane |
| 2 | Newgee Pookur West Lane |
| 1 | Newgee Pookur East Lane |
| 1 | Moulvee Imdad Alee's Lane |
| 1 | Moulvee Gholam Sobhan's Lane |
| 1 | Gudaee Khansama's Lane |
| 2 | Anee Barber's Lane |
| 1 | Shureef Duftree's Lane |
| 5 | Mehndee Bagan Lane |
| 2 | HIll's Lane |
| 2 | Kerr's Lane |
| 1 | Tottie's Lane |
| 1 | Madge's Lane |
| 4 | Goristán Lane |
| 2 | Moira Street |
| 6 | Hungerford Street |
| 1 | Robinson's Street |
| 1 | Auckland Square |
| 2 | Armenian Street |
| 6 | Burtollah Street |
| 6 | Banstollah Street |
| 1 | Champatollah 2nd Lane |
| 1 | Gopee Dutt's Lane |
| 3 | Hanman Gullee |
| 1 | Hurry Ghose's Lane |
| 4 | Nabootollah Street |
| 2 | Old China Bazar Street |
| 2 | Omratollah Street |
| 3 | Ruttun Surkar's Lane |
| 2 | Rajmohun Ghose's Lane |
| 8 | Theatre Road |
| 1 | Pubree Gulle |
| 1 | Tillock Doctor's Lane |
| Total 805 | |

# পরিশিষ্ট
## মানচিত্র

### পরিশিষ্ট—১

১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের কলিকাতা পুর আইন অনুসারে প্রস্তুত কলিকাতার মানচিত্র।

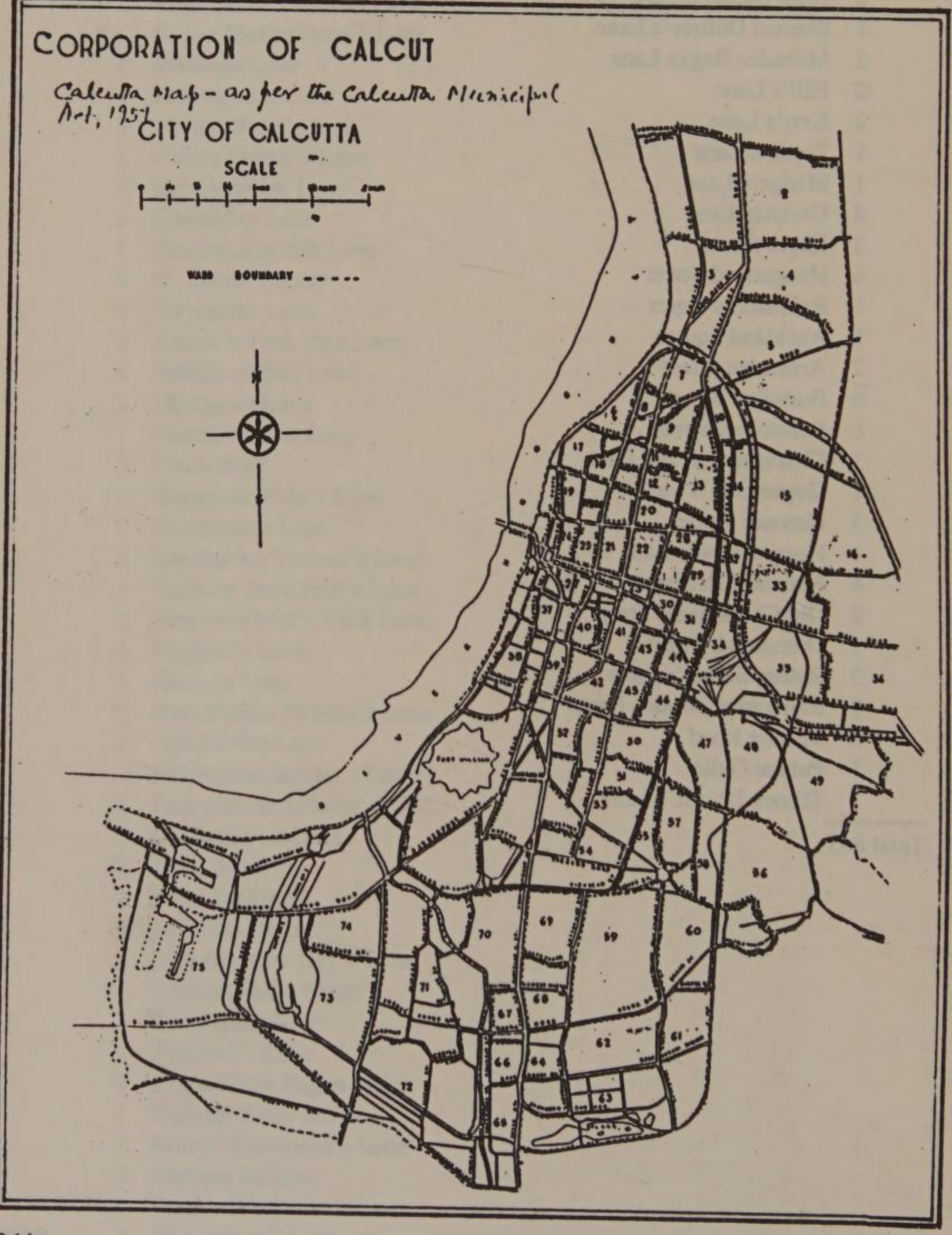

আপজন সাহেবের মানচিত্র (১৭৪২) (Plan of the Territory of Calcutta as marked out in the year 1742—by A, Upjohn)।

## পরিশিষ্ট—৩

মেজর হার্স্ট (Major F. C. Hirst)-এর পুস্তকে (A Brief History of the Large Scale Survey of Calcutta and its neighbourhood, 1903-14) বর্ণিত কলিকাতার মানচিত্র (১৭৫৬-৫৭)।

মার্ক উডের কলিকাতার মানচিত্র (১৭৮৪-৮৫) (Plan of Calcutta—by Lt. Col. Mark Wood—Published by William Baillie)।

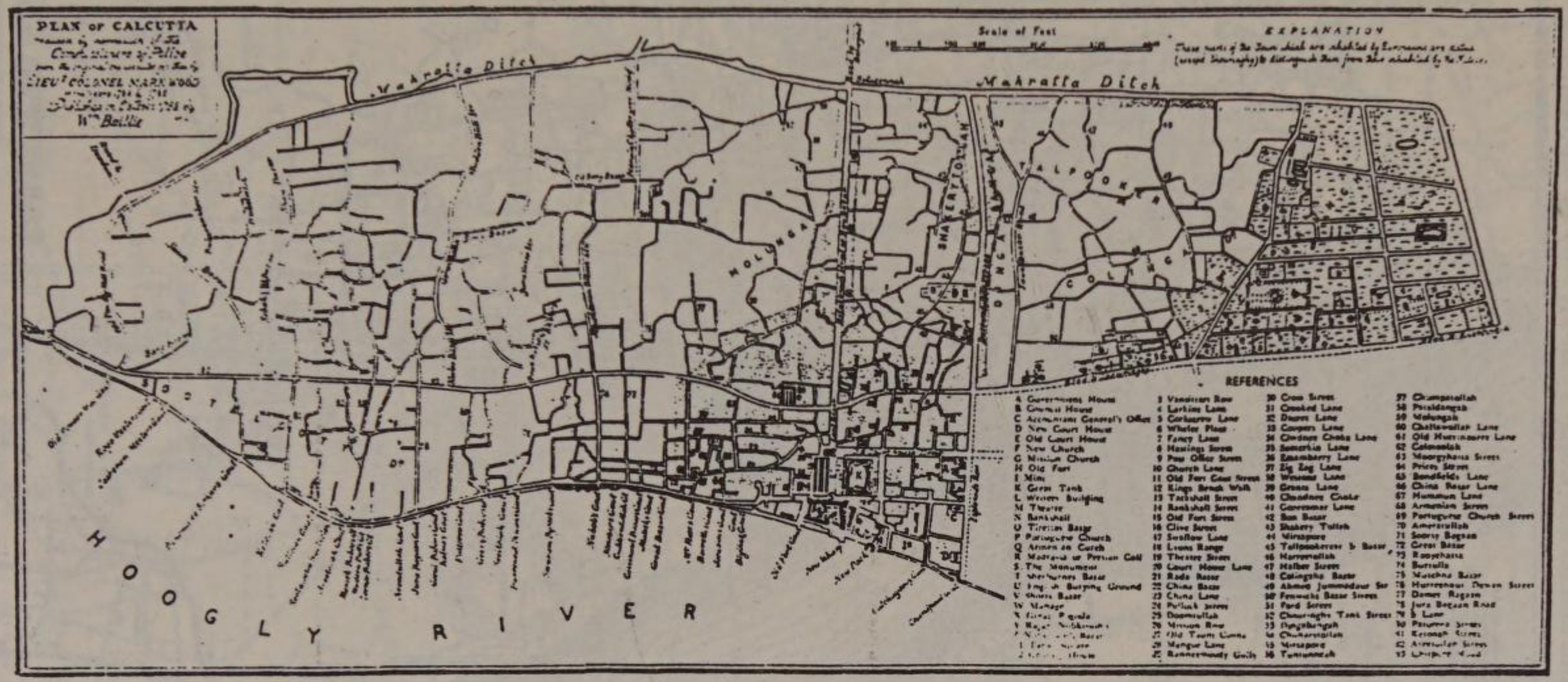

১৭৯২-৯৩'এর জরিপের ভিত্তিতে কলিকাতা ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের আপজন সাহেবের মানচিত্র (Map of Calcutta and its Environs, 1792-93—by A. Upjhon)।

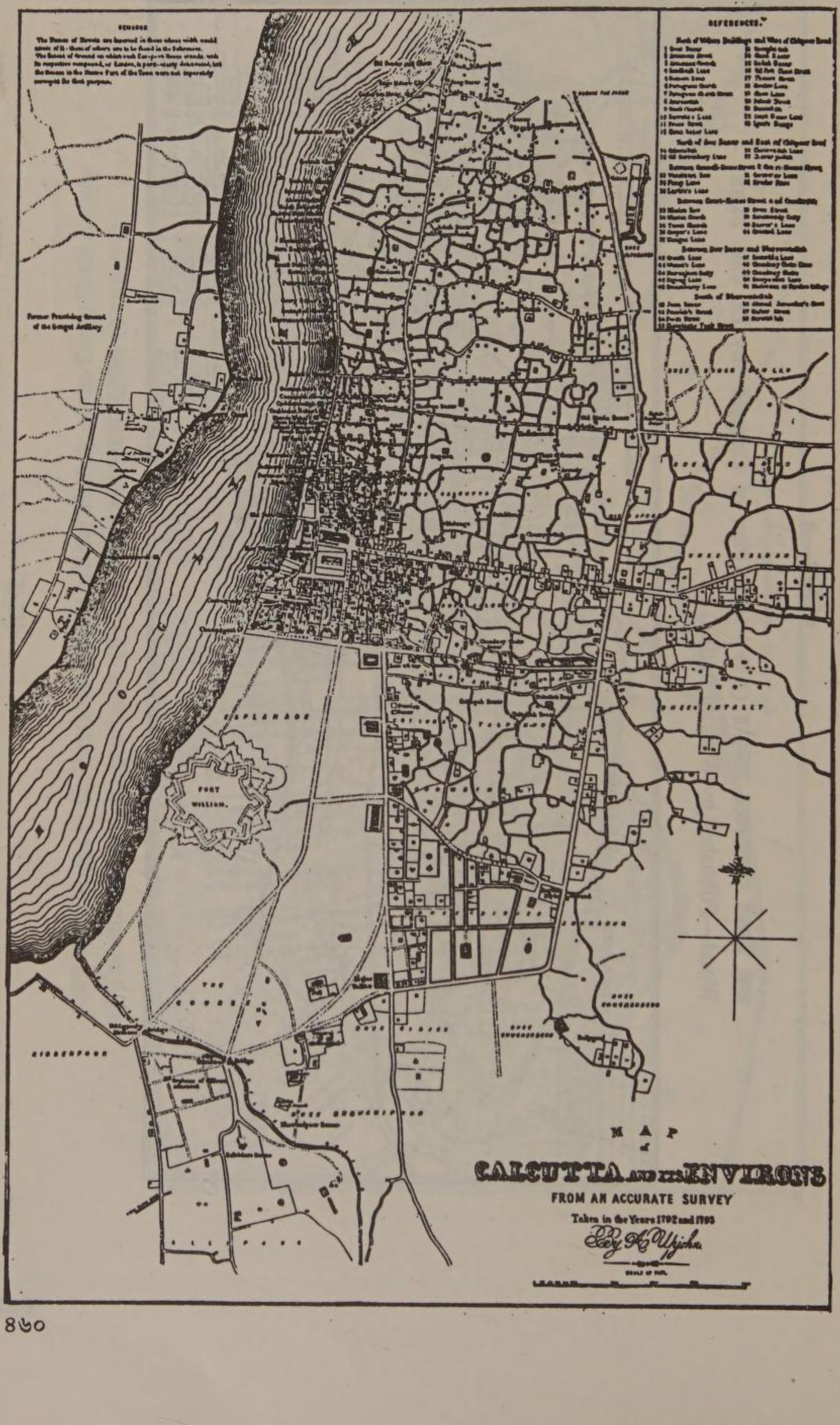

ফিভার হসপিটাল কমিটির অনুরোধে লেঃ অ্যাবারক্রম্বি ও ক্যাপ্টেন ফরবেস অঙ্কিত কলিকাতার মানচিত্র (১৮৩৬) (Plan of Calcutta by Lt. H. Abercrombie & Capt. H. N. Forbes showing suggested layout of roads)।

১৮৭৬ খ্রিঃ বিভার্লি সাহেবের কলিকাতার জনগণনার বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত প্রতিবেদনে সংযোজিত কলিকাতার মানচিত্র (Report on the Census of the town of Calcutta taken on 6th April 1876 by H. Beverley) ।

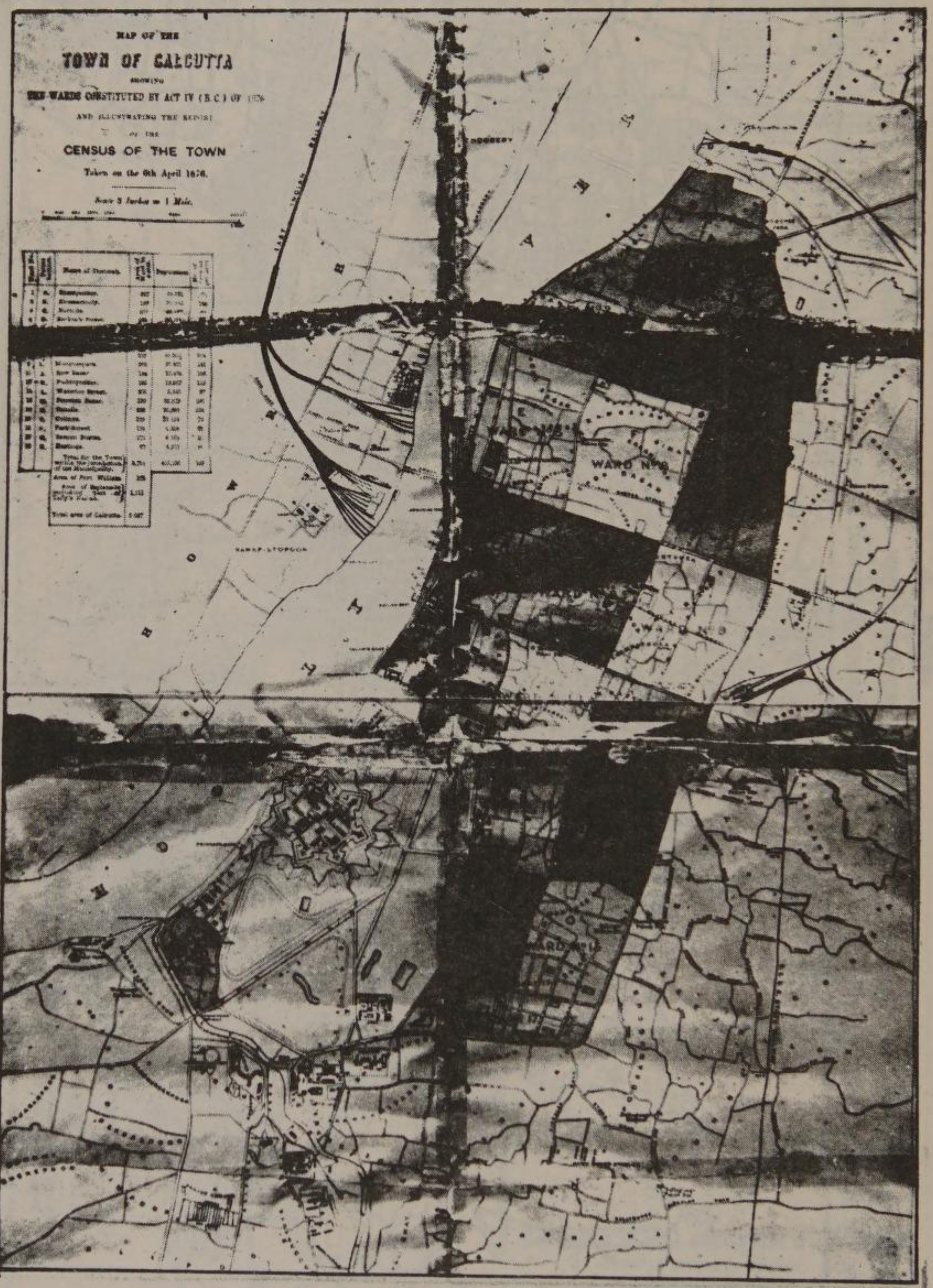

১৮৮৮ খ্রিঃ কলিকাতা পৌর আইনে বর্ণিত সীমানার মধ্যে ওয়ার্ডভিত্তিক কলিকাতার মানচিত্র।

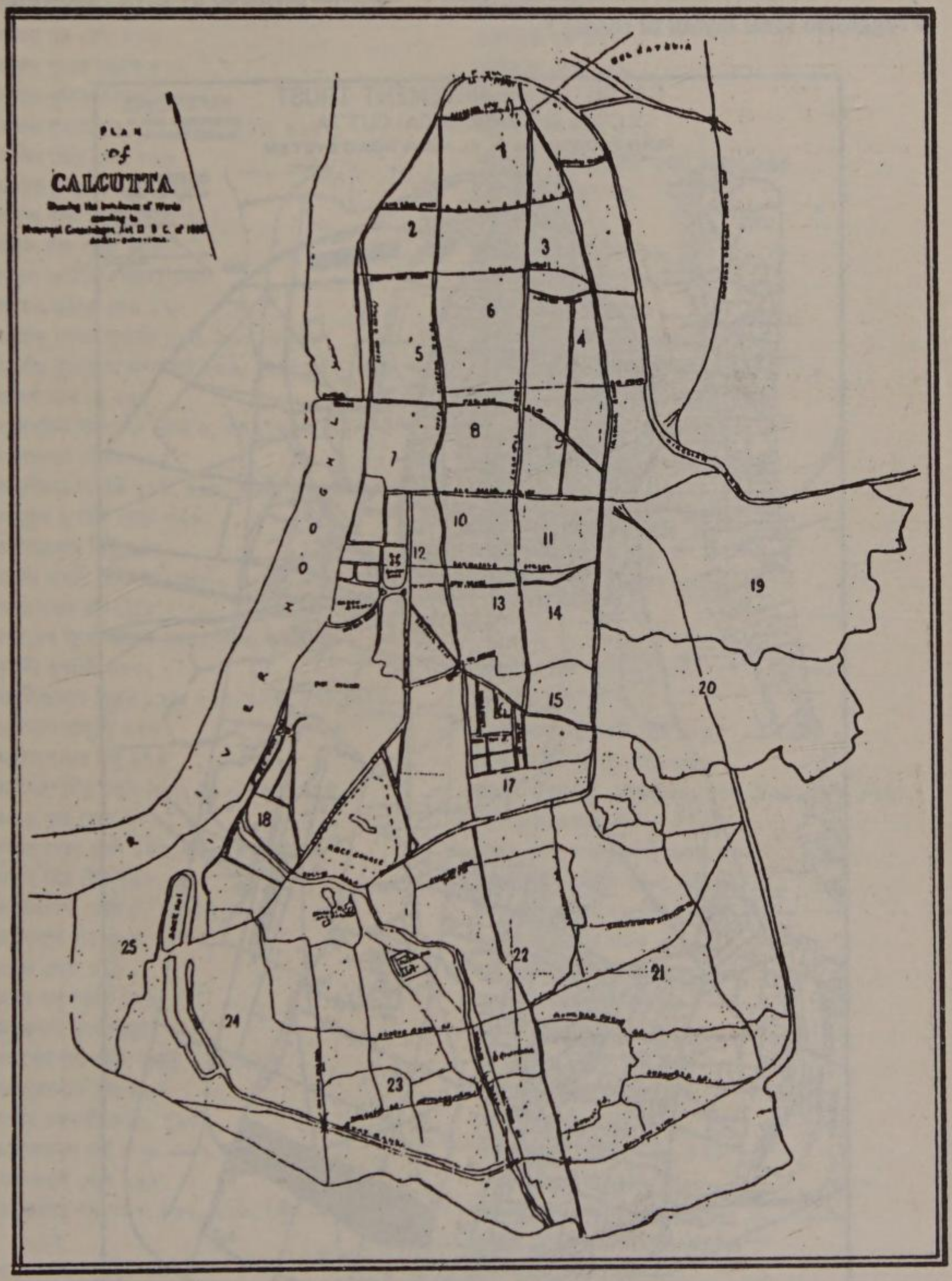

প্রস্তাবিত আদর্শ পথঘাটের বিন্যাসজ্ঞাপক কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা (Calcutta Improvement Trust)-র প্রস্তুত কলিকাতার মানচিত্র (A Key plan of Calcutta prepared by C.I.T. showing a suggested ideal layout of roads) ।

# নির্দেশিকা


অকল্যান্ড স্কোয়ার ৮৬
অক্টারলোনী রোড ৬
অক্ষয় দত্ত লেন ৩০৪
অক্ষয় কুমার বড়াল ৪১২
অক্ষয় কুমার সরকার ৩৪০
অক্ষয় কুমার দত্ত ১২৭, ৪০৫, ৪১৪, ৪১৫
অখিল মিস্ত্রি লেন ১৩৬
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ২৫৩
অতুল কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ৩৬১
অতুল চন্দ্র ঘোষ ৪০৮
অতুল চ্যাটার্জি (স্যার) ৩৬৩
অদ্বৈত মল্লিক লেন ১৭২
অর্ধেন্দু শেখর মুস্তাফি ২৬৫, ৩৯০, ৩৯৫
অর্ধেন্দ্র কুমার গঙ্গোপাধ্যায় ২২৩, ২২৪, ২২৫, ৩৬৩
অনাথ নাথ দে ২৫১
অনাগরিক ধর্মপাল/ রোড ৫, ৩৪২, ৩৪৩, ৩৪৪
অনাথনাথ মল্লিক ৩১২
অনুশীলন সমিতি ১১৫, ১১৬, ১৩০, ২৭৮ ৩৬১
অনুকুল মুখার্জি রোড ৩২৬
অন্নদাপ্রসাদ স্ট্রিট ২৫৯
অন্নদা বাগচী (চিত্রকর) ৩৬০
অন্নদাশঙ্কর রায় ১১৮
অপরেশ মুখোপাধ্যায় ২৬৫, ২৬৬, ৩৯৫, ৪১২
অবনী মুখার্জি ২৯৩
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১১২, ২২৩, ২২৫, ২৭৮, ৩১৪
অবিনাশ গাঙ্গুলি ২২৩
অবিনাশ চন্দ্র বসু ৩৭৫
অবিনাশ মিত্র লেন ২২৫, ২৫১, ২৫২, ২৫৫
অভয় গুহ রোড ৪০৬
অভয় ঘোষ লেন ১২৩, ৩৪৮, ৩৬৬, ৩৮৬
অভয় মিত্র স্ট্রিট ১৫৮
অভেদানন্দ রোড ৫, ১৮১, ২৪৯
অমরনাথ রায় ৩৮৪
অমল হোম ১১৮
অমর বসু সরণি ১৫৬
অমরনাথ মুখোপাধ্যায় ১১২
অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১২১, ১৯৫
অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ২৬৫
অমিয় চক্রবর্তী ৪১৯, ৪২০
অম্বিকাচরণ গুহ ৪০৬, ৪০৭, ৪০৮, ৪১০
অমৃতলাল ঘোষ ১৯৫
অমৃতলাল বসু ১২৭, ১৯৫, ২১৬, ২৬৪, ২৬৫, ২৬৬, ৩৯২
অমৃতলাল বসু স্ট্রিট ৩৯২
অমৃতলাল মিত্র ১১৩, ২৬৪
অমৃতবাজার পত্রিকা ১০১, ২৬১, ২৬৫, ৩৯০
অমূল্যচরণ বিদ্যাবিনোদ ৩৭৭
অমূল্যধন আঢ্য ২৫৭
অরবিন্দ ঘোষ ৩৪০
অরু দত্ত ৪২৪
অরুণচন্দ্র দত্ত ১৭৭
অরুণচন্দ্র সেন ১০৬
অশোক মিত্র ১০৩
অশোকনাথ শাস্ত্রী ৩৭৫
'অসহযোগ আন্দোলন' ১৩০, ২৪৮, ২৬৮
অংশুরানী মিত্র ১০২
অ্যাকোয়াডাক্ট ৭৫
অ্যানিস বারবার লেন ৯৯, ১৫৫
অ্যানি বেসান্ত ৩২১, ৩৪২
অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি ৩৯৩
অ্যান্টি ম্যালেরিয়া সোসাইটি ১২৪
অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি ৩৪১
অ্যামবাসাডার হাউস (লালবাজারে) ৩৭২
অ্যালবার্ট ভিক্টর কুষ্ঠাশ্রম ৩২০
অ্যালবার্ট হল/ইন্‌স্টিটিউট ৩৩৪, ৩৪৬
অ্যাস্‌ক্রফ্‌ট হল ১০৩, ৩৬৫
অ্যাসলি ইডেন ২৭৪, ৪২৫
অ্যাংলো ভার্নাকুলার স্কুল (শ্যামবাজার এ. ভি. স্কুল) ৩৯১

আই. পি. শক ৩৫০
আউট্রাম স্ট্রিট ৭২
আগা মহম্মদ মেহেদী স্ট্রিট ১৭০
আচার্য জগদীশ বসু রোড ৩৩২
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড ১০৩, ১১৭, ১২৪, ১৭৭, ১৭৯, ১৮০, ৩৩২, ৩৬৬
আচার্য সত্যেন বসু সরণি ২৩৭, ২৩৯
আজাদ হিন্দ ফৌজ ৩৬২, ৪০৮
আজাদ হিন্দ বাগ ৭৫, ১৭২
আজীম-উস্‌-সান্‌ ৩০০
আর্ট থিয়েটার ২৬৬
আত্মারাম চট্টোপাধ্যায় ৩৭২
আর্থার গেডিস ২০৯
আদিত্য বসু মল্লিক, ডাঃ ৪০৬
আনন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২৫০
'আনন্দ বাজার' ৩০৭, ৪১০
আনন্দবাজার পত্রিকা ১১৮, ১২১
আনন্দ মোহন বসু ২৬৮
আনন্দমোহন বিশ্বাস ১৬৭
আনন্দ মোহন মল্লিক ১০২, ৩৮৭
আনন্দরাম সেন ১২৬
আনন্দ লেন ১০২, ৩৪৮, ৩৬৫, ৩৭৭, ৩৮৭
আপজন মানচিত্র ৩৮৮
আপজন সাহেব ১০৭, ১১৬, ১১৭, ১৬১, ১৭৪, ২৫৩, ২৬০, ২৭৬, ২৯৩, ২৯৮, ৩৮৯, ৪১৬

আপার চিৎপুর রোড ১১০, ১২১, ১২২, ১৫৮, ২০৬, ৩১২, ৩৬৬, ৩৭২
আপার সারকুলার রোড ৯৮, ১০২, ১০৩, ১৩৪, ১৫৯, ১৬২, ১৭৭, ১৭৯, ১৯০
আপার স্ট্র্যান্ড রোড ১০১, ১৬৮, ১৬৯
আব্দুল গফফর চৌধুরী ১১৮
আব্দুল লতিফ স্ট্রিট ১৭১
আব্দুল হালিম ২৯৯
আমড়াতলা ৯২, ২৬৩
আমহাটি ২৮, ২৫৭
আমহার্স্ট রো ১২৫
আমহার্স্ট স্ট্রিট ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১৩১, ১৩৪, ১৬১, ১৬২, ১৬৪, ১৭৩, ২০২, ২১২, ২৯২
আর্মেনিটোলা ৯২
আর্মেনিয়ান ঘাট ৯৪
আর্মেনিয়ান স্ট্রিট ৩৫
আর্য মিশন স্কুল ২৫১
আর্য সমাজ ২৬১
আরকুলি লেন ২৯, ১৩৪, ২৫৭, ২৯৮, ৩৮৬
আরজবেগি দপ্তর ৩৭২
আর জি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ৩৮৯, ৩৯১
আরপুলি লেন ১৩৪, ২৫৭
আর্‌ল মেয়ো ৯৮
আর সি ম্যাকে ২৫৬
আরাকপুর ১৪৬
আলফ্রেড ক্রফ্‌ট ৩৪৪
আলালের ঘরের দুলাল ১৯৩, ৪০১
আলিমুদ্দিন স্ট্রিট ১৭০
আলিপুর ৮০, ৮৩, ৮৯, ১৪৫, ২৪৯
আলিপুর চিড়িয়াখানা ১৩৩, ৩১২
আলেকজান্ডার ডাফ ১৫৩, ৪১৭, ৪২৬
আলেকজান্ডার ম্যাকেঞ্জি ১৯১, ১৯৪, ১৯৫
আশুতোষ দেব ৩৫৭
আশুতোষ ধর ৩১০
আশুতোষ মিউজিয়াম ২৬৩
আশুতোষ মিত্র ৩৯২
আশুতোষ মুখার্জি, স্যার ১৪৮, ১৯৬, ২৭৯, ৩৪৩
আশুতোষ রায় ৪০৬
আশুতোষ লাইব্রেরী ৩৪৭
আশুতোষ সেন ১১৭
আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে ৩৭৪
আহিরিটোলা ৮৮, ১০৮, ১০৯, ১৬৮, ২৫০
আহিরিটোলা ডালগোলা বস্তি ১০৯, ১১০
আহিরিটোলা বঙ্গ বিদ্যালয় ১০৯
আহিরিটোলা সেকেন্ড লেন ১১০
আহিরিটোলা স্ট্রিট ৩৪, ১০৮, ১০৯, ১১০
আর্ল-অফ-ময়রা ১৯৩

ই. রায়ান, স্যার ৬১
ইউ. কে. দত্ত, ডাঃ ১৬৯
ইউ এন. ধর অ্যান্ড কোং/অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ ৩৪৬, ৩৪৭ ৪৬৬
ইউ. এন. ব্রহ্মচারী ৩৭৫
ইউনাইটেড ফ্রি মিশন চার্চ ৪২৬
ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট ১৫৯
ইউনান সাহেব ৩৩৫
ইউরোপীয়ান অ্যাসাইলাম লেন ৯৯
ইউসুফের পুরানো বইএর দোকান ৩৪৭
ইডেন হসপিটাল ৯৯, ১৩৬, ১৭১, ১৭৬
ইডেন হসপিটাল রোড ১৩৬, ১৮১
ইডেন হসপিটাল লেন ১৩৫
ইডেন হিন্দু হোস্টেল ১৫২
ইন্ডিয়া হাউস ৩৬৩
ইন্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অফ আর্টস্ পত্রিকা ৩৭৭
ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স ১৬১, ২৮০, ২৮১
ইন্ডিয়ান কলেজ দ্য মঁপেলিয়ে ২০৯
ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স ২৭১
ইন্ডিয়ান ফিল্ড ১৪৯
ইন্ডিয়ান মিরর পত্রিকা ১৪৯, ২৬৩, ২৭৯, ৩২৩, ৩৭৪, ৪২৮
ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট ২৬০, ২৬১, ২৬২, ২৬৩, ৪২৮
ইন্ডিয়ান মেয়রস্ কোর্ট ৩৭৩
ইন্দিরা গান্ধী সরণী ৪
ইব্রাহিম খাঁ ১১, ১৪
ইমামবাগ লেন ২০১
ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি ১৮৬
ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল ১২০, ২০৮
ইলবার্ট বিল ১৫৪, ১৫৬
ইলিয়ট রোড ৩৭, ৪৮, ১৪১, ১৫৫
ইলিয়ট লেন ১৩৫
ইলিয়ট হস্টেল ৩৩৯
ইসমাইল মদন লেন ১৭১
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১১, ১৫, ১৮, ২০, ২১, ২৩, ২৫, ৩৭, ৩৯, ৭০, ৯১, ১১৬, ১১৯, ১২২, ১২৪, ১৩২, ১৮১, ১৮৬, ২২৫, ২৫৩, ২৭০, ২৯৩, ৩০০, ৩০২, ৩০৩, ৩৪৮, ৩৭২, ৩৭৩, ৩৭৪
ইস্ট ইয়র্ক দল ১১৯
ইস্ট সুবার্বন মিউনিসিপ্যালিটি ১৪৬
ইস্টার্ন পার্ক ২০৯
ইস্টার্ন রেলপথ ২৩৯
ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৫
ইংলিশম্যান ১১৪, ২৭১
ইয়ংবেঙ্গল ১৯২, ১৯৩
ইয়ংম্যানস ইনস্টিটিউট ১৮৩

ঈগল কোম্পানি ৩১২
ঈশানচন্দ্র দত্ত ৪২৪, ৪২৫, ৪২৯
ঈশান চন্দ্র বসু ২৭৬
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১৮৪, ২৫৪, ৩১৮, ৪১১, ৪১২, ৪১৪
ঈশ্বরচন্দ্র নান ৪১৯
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১২১, ১২৫, ১২৭, ১৫২, ১৯৩, ২১৬, ২১৭, ৩৩৮, ৩৪৫, ৩৬০, ৪১৫, ৪২২

ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র ৩০৫
ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ১২৭

উইনতার নিত্‌জ্‌ ১৭৮
উইলসন সাহেব ২১২, ২২৮
উইলিয়াম উইলসন হান্টার ১৭৭
উইলিয়াম কেরী ৪২২
উইলিয়াম জোনস স্যার, ১৩৩, ২৫৪, ৪৩১
উইলিয়াম বেইলি ৩৪৮
উইলিয়াম মিয়ার, স্যার ৩৬৩
উইস্টানলি ৩০৯
উখরা ২৯১
উড স্ট্রিট ২৬, ৩৭, ৩৮, ৬৫, ৯৯
উডবার্ন পার্ক রোড ১৯০
উত্তমকুমার ২৬৭
উত্তর কলিকাতা কংগ্রেস ১৫৬
উদন্তপুরী ২৩২
উদ্বোধন পত্রিকা ৩৮৬, ৪০৩
উপেন মিত্র ২৬৬
উপেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত ৪২৫
উপেন্দ্র চন্দ্র দেব ৩৯৭, ৩৯৮
উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১১৮
উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩০
উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৩৬২, ৩৯৫
উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ৪১৩
উপেন্দ্র নাথ বসু ৩৩২, ৩৫৫, ৩৯১
উমাকান্ত সেন ১৫৬
উমিচাঁদ ২৮, ৯৩, ১৬১, ৩০০
উমেশ চন্দ্র দত্ত ৪২৩
উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫০, ৩১০
উমেশ চন্দ্র মজুমদার ৩৮২
উলুবেড়িয়া ১১, ১২, ১৪৫
উল্টাডিঙ্গি ২১, ৩১, ৬৫, ১৪৫, ১৪৬, ২০১, ২৩৭, ২৫৮, ২৯৮
উৎকলমনি গোপবন্ধু সরণি ৫
'উৎকেন্দ্র সমিতি' ১৫৯

এইচ. লী ৩৪৪
এইচ এইচ উইলসন ১৭৪
একবালপুর ১৪৫, ১৪৭
এগ্রিকালচারাল অ্যান্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটি ১৮৬
এজরা স্ট্রিট ২৪, ৩৫, ২৮৫
এডওয়ার্ড বেকার, স্যার, ২৪৭
এডওয়ার্ড রেয়ন, স্যার ১৮৬
এডওয়ার্ড হাইড, স্যার ৩২৪
এডুকেশন গেজেট ১৫২
এথেনিয়ান ইন্‌স্টিটিউশন ৩৬৫
এন. সি. দত্ত অ্যান্ড কোং ৩৪৬
এন এন ঘোষ ১৯৫
এন্টালি ৩১, ৩৫, ৮৩, ৮৯, ১৪৫, ১৪৭
এন্টালি বাজার ২, ১৩
এন্টালি পুলিশ হসপিটাল রোড ৮০
এম আবদুল আলি ১১৮
এমারেল্ড থিয়েটার ২৬৪
এল. আর. টোটেনহাম ৩৪৪
এল লিওটার্ড ৩৩৭
এলগিন রোড ৪৩৬
এলাইজা ইম্পে ২৬৯
এলিসিয়াম রো ৬৫
এলিয়ট ড্রিংক ওয়াটার বেথুন ১৭৫
এশিয়াটিক সোসাইটি ১৮৬, ২১৩, ৩৯১
এস ডোরাইস্বামী ৪৩৬
এস নিকলসন ৬১
এসপ্লানেড ২৪, ৩৮, ৬৫, ৮৯, ১৬৮
এসপ্লানেড রো ইস্ট ৫, ৩৬ ১৮৬, ২৪২, ২৪৩, ২৪৪
এস. সি. আড্ডি ৩৪৬

ওগেজ্জ্যোতি মাসিক পত্রিকা ২৮০
ওয়াটগঞ্জ ৭৭, ১৪৬
ওয়াটগঞ্জ পাম্পিং স্টেশন ২৪৬
ওয়াটারলু স্ট্রিট ৪৯, ৯০, ৯২
ওয়ারেন হেস্টিংস ২৬৯, ৩৩৫, ৩৬৮, ৩৭৩, ৪১৪
ওয়ারিশবাগান লেন ১৮৫
'ওয়েলউইসার' পত্রিকা ১৫২
ওয়েলেসলি ৪৮
ওয়েলেসলি কমিটি ৪৫, ৪৮
ওয়েলেসলি প্লেস ৭৫
ওয়েলেসলি মিনিট ৪৪
ওয়েলেসলি রিপোর্ট ৪১
ওয়েলেসলি স্ট্রিট ৫, ৫৭, ১৮৬, ২৬০, ৩৩৮
ওয়েলেসলি স্কোয়ার ৫৭, ৭৫, ৮৬
ওয়েলিংটন স্ট্রিট ৫, ৫৬, ৫৯, ২২৬, ২২৮, ২২৯, ৩৪৬
ওয়েলিংটন স্কোয়ার ৫৬, ৫৭, ৭৫, ৮৬, ২৮০, ৩৩১
ওয়েলিংটন স্কোয়ার ইস্ট ৭২
ওরিয়েন্টাল সেমিনারি ৩১১, ৩৭০, ৩৯৩
ওল্ড অর মিশন চার্চ ২২৮
ওল্ড কোর্ট হাউস ২৪৩
ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট ৪, ২০, ৩৫, ৩৬, ৬৩, ৬৫, ৭২, ৭৫, ৩৬১, ৪৩০
ওল্ড কোর্ট কর্নার ৪, ৩৫
ওল্ড কোর্স ৩৮
ওল্ড চায়না বাজার স্ট্রিট ৮, ৩৫, ৮৫
ওল্ড পাউডার মিল ঘাট ৬৬
ওল্ড পাউডার মিল রোড ৩৪
ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট ২৮২, ৩৯৩
ওল্ড ফোর্ট ঘাট ৬৬
ওল্ড ফোর্ট স্ট্রিট ৩৫
ওল্ড বাবুঘাট ৬৬
ওল্ড বৈঠকখানা বাজার রোড ১৩৪, ১৩৫
ওল্ড মেয়রস কোর্ট ৩৪৮, ৩৭২, ৩৮৮

ঔরঙ্গজেব ১১, ২০

কটন সাহেব ১৬০, ১৬৯, ১৯৫, ৩৫০
কটন স্ট্রিট ৩৫, ২১০, ২১৮, ২১৯
কপিবাগান লেন/বাই লেন ১০৪, ১০৫
কফি হাউস ১৮১, ৩৩৪
কবরখানা ২৩৯
কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন ২৫৮
কবিরাজ ভগবতীপ্রসন্ন সেন ২৫৯
কবিরাজ রমানাথ সেন ২৫৯
কমলকুমার বসু ৩৫৬
কমলকৃষ্ণ দেব ৩০৬
কমল নয়ান রোড ৩০৯
"কমিটি অফ ইয়ংমেন ফর মিউচুয়াল এড্" ৩৪৪
কম্বুলিয়াটোলা ৯২, ৩৮৮
কম্বুলিয়াটোলা দরিদ্রভাণ্ডার ৩৮১
কম্বুলিয়াটোলা লেন ৩৪৮, ৩৫০, ৩৭২
করপোরেশন প্লেস ১৩৮
করপোরেশন স্ট্রিট ১৪০
করিমবক্স খানসামা লেন ১৩৫
করিমবক্স লেন ১৩৫
কর্নওয়ালিস, লর্ড ২৭৪
কর্নওয়ালিস স্কোয়ার ৭৫, ৮৬, ৪২৭
কর্নওয়ালিস স্ট্রিট ৯৩, ৯৮, ৯৯, ১০২, ১০৪, ১১১, ১১২, ১১৭, ১২২, ১২৪, ১২৫, ১৩১, ১৫৬, ১৭৯, ২০৬, ২৯২, ২৯৮, ৩১২, ৩৫৮, ৩৬৪, ৩৭৫, ৩৯২, ৩৯৬, ৪০১, ৪১১, ৪১৩, ৪১৭, ৪১৮, ৪১৯, ৪৩০
কর্নেল অলকট ৩৪৩
কর্নেল হাইড ৭১
কলভিন ঘাট ৯৪
কলাবাগানের দিঘি ১৪৯
কলিকাতা অন্ধ বিদ্যালয় ১৬৩
কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা ১১৭, ১২৪, ১৫৭, ১৬৩, ১৮৩, ২০৩, ২০৪, ২০৫, ২০৭, ২০৯, ২১০, ২৩৪, ২৫২, ২৫৩, ২৬৪, ৩১৩, ৩৩২, ৩৯১, ৩৯২
কলিকাতা করপোরেশন *দেখুন* কলিকাতা পৌরসভা
কলিকাতা কালেকটরেটের ইতিহাস ২৭৪
কলিকাতা ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিটেব্‌ল্ সোসাইটি ১৫৯
কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরি ১৪৯, ১৭৫, ১৮৬
কলিকাতা পিঁজরাপোল সোসাইটি ২১২
কলিকাতা পৌরসভা ৭১, ৭৫, ৮১, ৯৭, ৯৮, ১০২-১০৫, ১১১, ১১২, ১১৪, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২২, ১২৩, ১২৬, ১২৮, ১৩০, ১৩২, ১৪০, ১৪১, ১৪৮, ১৫০-১৫৫, ১৫৭, ১৬০, ১৬৩, ১৬৫, ১৭০, ১৭২, ১৭৩, ১৮৩, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৬, ২০৬, ২০৮, ২০৯, ২৪৫, ২৫০-২৫৯, ২৬১, ২৬৩, ২৭১, ২৭২, ২৭৪, ২৭৯, ২৮০, ২৯২, ২৯৩, ২৯৮, ২৯৯, ৩০৩, ৩০৪, ৩০৫, ৩১৩, ৩৫৮, ৩৬৪, ৩৬৯, ৩৭০, ৩৭২, ৩৭৩, ৩৭৪, ৩৯১, ৪০১, ৪০২
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৫২, ১৫৩, ১৬৬, ১৭৪, ২১৯, ২৩৫, ২৩৬, ২৫২, ২৫৬, ২৯২, ৩৪৫, ৩৪৭, ৩৫৭, ৩৬৬, ৩৭০, ৩৭৪, ৩৭৫, ৩৯১
কলিকাতা মর্টন স্কুল ১২১
কলিকাতা মাদ্রাসা কলেজ ৩৬৮
কলিকাতা মেডিকেল কলেজ ১২১, ১৪১, ১৫৫, ১৫৮
কলিকাতা শেয়ার বাজার ১৬৩
কলিকাতা সুবর্ণবণিক সমাজ ২৩১, ২৩৩, ২৩৪
কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি ২৫৫, ৩৪৬
কলিকাতা হাইকোর্ট ৯৭, ১২০, ১৬০, ১৬৩, ২০৮, ২৩৫, ২৫৭, ৩৭১
কলিঙ্গ ২৯, ৯০, ২৫৭, ২৫৯, ২৬৩
কলিঙ্গ ওয়ার্ড ৯৯
কলিঙ্গ ট্যাঙ্ক ২৬১
কলিঙ্গ বাজার স্ট্রিট ২৫৯, ২৬১
কলিন স্ট্রিট ১৩৯, ২৫৯, ২৬০
কলিম্ব (কলিঙ্গ) গ্রাম ২৫৯
কলুটোলা ৯০, ৯২, ৯৯, ১৩৭, ১৫৭, ১৭০, ২৫৮, ২৭৫, ২৯৪
কলুটোলা স্ট্রিট ৭১, ১৭১, ২০২, ২০৫
কলেজ রো ৩০২, ৩০৩
কলেজ স্কোয়ার (বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট) ৭৫, ৮৬, ১৩০, ১৩৭, ৩৪৭
কলেজ স্ট্রিট ৭৫, ৮৩, ১৩৪, ১৩৬, ১৮১, ২৪১, ২৫৭, ৩৪৬, ৩৪৭
কসাইপাড়া লেন ২০৮
কড়েয়া ১৪৫, ১৪৭
কড়েয়াবাজার ২০৭
কয়লাঘাট ৯৪
'কংকর্ড ক্লাব' ১৭৭
কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘ ১০২
কাঁকুড়গাছি ৩১, ১৪৫, ১৪৬, ৪১৬
কাঁকুড়িয়া ৩১, ১৪৬
কাঁটাপুকুর ১০৪, ১০৫, ১১৯, ২৭৫
কাঁটাপুকুর বাই লেন ১০৬
কাঁটাপুকুর লেন ১০১, ১০৩, ১০৬
কাউন্সিল অফ এডুকেশন ৪২২
কাউন্সিল হাউস স্ট্রিট ২৪৫, ২৭৪
কাটমারবাগান বস্তি ৪০৩
কানসোনা বা কর্ণসুবর্ণ ৩৬৭
কানাইলাল স্ট্রিট ২১৫
কানাইলাল ঠাকুর ৪১২
কানাই শীল স্ট্রীট ১৭১
কান্তিচন্দ্র ঘোষ ১১৮
কান্তিচন্দ্র ব্যানার্জি ১৯৫
কাপালীটোলা লেন ২৭৯
কামারডাঙ্গা ৩১, ১৪৫, ১৪৭
কামেদনবাগান লেন ১৭০
কারবালা ৬৪
কারবালা ট্যাঙ্ক লেন ১৫৩
কারমাইকেল কলেজ ১৬০, ৩৯২

কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ ১৭৬, ২৩৫, ২৯২, ৩৯১, ৪১৩
কারমাইকেল, লর্ড ২৭৯, ৩৪৫, ৩৫৮, ৩৯১
কারলাইন নেফিউ কোম্পানি ২১৪
কার্জন পার্ক ৭৪, ৭৫
কার্জন লর্ড ৪৩০
কার্তিক চট্টোপাধ্যায় ৩৭২
কার্তিকচন্দ্র নান ১৭৬, ১৭৭, ১৭৮, ৪১৯, ৪২১
কার্তিক মল্লিক স্ট্রিট ১৬০
কালাকার স্ট্রিট ২১০, ২১১, ২১৯, ৩০৯, ৩৯২
কালাচাঁদ সান্যাল লেন ১১৯
কালিদাস মল্লিক ট্রাস্ট ফান্ড ২৩৪
কালিমবাজার ২৭৯, ২৯১, ৩৩৮, ৩৭৩
কালীকৃষ্ণ টেগোর স্ট্রিট ২০৭, ৩২১, ৩২২, ৩২৬
কালীকৃষ্ণ দেব, মহারাজা ৩০৬, ৩৭০
কালীকৃষ্ণ ব্যানার্জি রোড ১১০
কালীঘাট ৩২, ১৩৮, ১৪৫, ১৬১, ৩০২, ৩৯৭
কালী টেম্পল রোড ১৯০
কালীতলা লেন ৯৮, ১৫১, ৩৯৭
কালী দত্ত স্ট্রিট ২৫৯
কালীনাথ মিত্র ১২০, ১৫৭, ১৮৩, ১৯৫
কালীপদ ঘোষ (দানাকালী) ৩৫৯, ৩৬০
কালীপ্রসন্ন সিংহ ৭৫, ৭৬, ১২২, ১২৩, ১৯৩, ৩৮৬, ৪১০
কালীবাড়ী লেন ১৫১, ৩৯৭
কালী মির্জা ৩১৫
কালী মিত্র লেন ১২০
কাশী ঘোষ লেন ৩৮০
কাশীপুর ৩১, ৮৩, ৮৯, ১২৩, ১২৬, ১৩৭, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ২০১, ২১১, ৩৩০
কাশীপুর উদ্যানবাটী ৩৬০
কাশীপুর চিৎপুর মিউনিসিপ্যালিটি ১৪৬
কাশীপুর রোড ২০৬
কাশী বসু লেন ২৫১
কাশী মিত্র স্ট্রিট ৯৭
কাশী মিত্র শ্মশানঘাট ৩১২, ৪০৬
কাঁসারিপাড়া ৮৮, ৯২, ২৯৭, ২৯৮
কাঁসারিপাড়ার সঙ ২৯৭
'কায়স্থ কারিকা' গ্রন্থ ১০৬
'কায়স্থ কুলরক্ষিণী সভা' ১০৬
'কায়স্থ' পত্রিকা ৩৭৭, ৩৮৫
কায়স্থপাড়া লেন ১৫৬
কিড স্ট্রিট ৭২
কিরণচন্দ্র দত্ত ২৭৭, ৩৭৭
কিরণশঙ্কর রায় ৩৬২
কিশপুর পাড়া ২৮
কিশোরীচাঁদ মিত্র ৩৫৮, ৪১৫
কিশোরীলাল মুখার্জি স্ট্রিট ৯৮
কিসপুরা ২৫৭
কিংসফোর্ড ১৭৯
কীর্তি মিত্র লেন ১০৪
কুচনান্ ৩১
কুঞ্জবিহারী সেন ২৩৩
কুমারটুলি ২৮, ৮৮, ৯০, ৯১, ৯৬, ৯৭, ১৩৭, ২৫৯
কুমারটুলি স্ট্রিট ২৫৮, ২৫৯
'কুমার সিং হল' ২৬৩
কুমারেশ ঘোষ ৩৪৪
কুমুদকৃষ্ণ মিত্র ২৫৭
কুমুদবন্ধু সেন ৪০৩
কুমোরপাড়া ২৪৯
কুল্‌পী ৩৬৮
কুলিবাজার ৮২, ৮৯
কুলিয়া ৩১
কুষ্টিয়া ৩২, ১৪৭
কৃপানাথ লেন ১১১
কৃপাবিন্দু চক্রবর্তী (ডাঃ) ৪১২
কৃপাশরণ মহাস্থবির ২৭৯, ২৮০
কৃষ্ণকান্ত নন্দী ৩৭৩
কৃষ্ণকুমার মিত্র ৩৪০, ৩৪৩, ৩৪৪
কৃষ্ণচন্দ্র দে ৩০৮, ৪২৮
কৃষ্ণচন্দ্র বসাক ১৩২, ২১৫
কৃষ্ণদাস পাল ১২৭, ১৩৭, ১৫৬, ২৪৯, ২৯৭, ২৯৮
কৃষ্ণরাম বসু স্ট্রিট ৩৪৮, ৩৭৫, ৩৮৮
কৃষ্ণধন বিদ্যারত্ন ৩৬৬
কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রেভারেন্ড ১৭৫, ৩১১, ৩১৭, ৩৭১
কৃষ্ণ সিংহী লেন ১৭৪, ১৭৭
কে. জি. বসু সরণি ২৬৪
কেতুয়া স্ট্রিট ২৩৪
কেদারনাথ খাণ্ডেলওয়ালা ২৭৩
কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৫৯
কেনেথ ম্যাকডোনাল্ড, রেভারেন্ড ১৫৪, ৩১০
কেয়াতলা রোড ২৩৮
কেরানিবাগান ইস্ট লেন ১৬২, ১৬৪, ১৬৬, ১৬৭
কেরানিবাগান ওয়েস্ট লেন ১৬২, ১৬৪, ১৬৭
কেরানিবাগান নর্থ লেন ১৬২, ১৬৬, ১৬৭
কেরানিবাগান মিডল্ লেন ১৬২, ১৬৬, ১৬৭
কেশব একাডেমি ১৬৭, ৪২৮
কেশব সেন স্ট্রিট/লেন ৩৫, ১২৫, ১৩৪
কেশবচন্দ্র সেন ১৪৯, ১৫৪, ২৬১, ২৯৬, ৩২৩, ৪২৮
কৈখালি ১
কৈখালি মৌজা ২
কৈলাসচন্দ্র বসু ৩৬১, ৩৯০, ৩৯১
কৈলাস দাসের লেন ৪০৪
কৈলাস বোস স্ট্রিট ২৯০, ২৯২
কৈলাস মুখার্জি লেন ২৫০
কোর্ট হাউস লেন ৩৫
কোম্পানির ধনাগার বা খাজনাখানা ৩৭২
কোম্পানির বেনিয়ন ও রাজনৈতিক দেওয়ানের দপ্তর ৩৭২
কোরিস চার্চ স্ট্রিট ১৩৪
ক্যাথিড্রাল মিশন কলেজ ১৭২, ২৮৬

ক্যাথিড্রাল মিশন লেন ১৭২, ১৭৩, ১৭৪
ক্যানিং, লর্ড ৮৪, ২২২
ক্যানিং স্ট্রিট ৩৫, ১০২, ২৩৪
ক্যানিংহাম সাহেব ৩৪২, ৩৭১
ক্যানেল স্ট্রিট ১০৪, ১০৫
ক্যান্টন স্ট্রিট ৩৩৫
ক্যাপ্টেন এইচ. এন. ফরবেস ১৬১, ২৯৩
ক্যাপ্টেন টি. প্রিন্সেপ ৩৫০
ক্যাপ্টেন ডি. এল. রিচার্ডসন ৩৯০
ক্যাপ্টেন ফ্র্যাঙ্ক পামার ১৪৯
ক্যাপ্টেন স্ট্র্যাফোর্ড ২২৫
ক্যাবিনেট মিশন ৪৩৭
ক্যামাক স্ট্রিট ৭২, ১৩৯
ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুল ২
ক্যাম্বেল হাসপাতাল ২, ১৭৯
'ক্যালকাটা আরবিট্রারি ক্লাব' ১৫৯
ক্যালকাটা অ্যাকাডেমি ৩৭১
ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট ৩৪৪, ৩৪৫
ক্যালকাটা এরিয়ান স্কুল ৩৬৬
'ক্যালকাটা কোয়াটারলি' ৩৫
'ক্যালকাটা গেজেট' ৭৫, ৩৯০
ক্যালকাটা চ্যারিটেবল সোসাইটি ৪০৫
'ক্যালকাটা জার্নাল অব মেডিসিন ২৮০
ক্যালকাটা থিয়েটার ২৬৯
ক্যালকাটা থিয়েটার গ্রুপ ১৮৩
ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি ১৬৪
'ক্যালকাটা মেডিকেল ক্লাব' ২৯২
'ক্যালকাটা রিভিউ' ২১৮, ৩৫৭
'ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি' ৩৭১
ক্রসস্ট্রিট ৩৫, ২৪২, ৩০৯
ক্রাইস্ট চার্চ ৪২১
ক্রীক রো ২৬১, ২৪০
ক্লাইভ, লর্ড ২৮, ২৬০, ৩৭২
ক্লাইভ ঘাট স্ট্রিট ২৪৩
ক্লাইভ স্ট্রিট ৩৫, ২১০, ২৭০, ৩৩
ক্লাইভ রো ৮৪, ৮৯
ক্লাকর সাহেব ৭১, ৭৬
ক্লিমেন্ট এট্‌লি ৪৩৭, ৪৬৮, ৪৩৯
ক্লোভরিং ২২৯
ক্লেমেন্স দত্ত ৪

খগেন চ্যাটার্জি রোড ১১৬
খগেন্দ্রনাথ মিত্র ২৫২
খিদিরপুর ২৭, ৩৯, ৬৫, ৮৩, ৮৯, ১৪৬, ১৪৭, ৩০২
খিদিরপুর ব্রিজ ৩৮, ৮৯
খিদিরপুর রোড ২, ৪, ৩৬, ৬৫
খিলাফৎ আন্দোলন ২৪৮
খুদিরাম বিশারদ ১৩৪
খেলাতচন্দ্র ঘোষ ৩০৬, ৩০৭
খেলাত ঘোষ লেন ৩০৭
খেলাত বাবু লেন ৩০৭
খেলাত মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউশন ৩০৭
খোজা সারহাদ ১৪
খোংরাপট্টি ১১১
ক্ষত্রিয় সমিতি ১০৭
ক্ষিতিশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ১২৮, ১৩০
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ অ্যাভিনিউ ৪, ২০৬
ক্ষুদিরাম বোস রোড ৬
ক্ষুদিরাম বসু ৪১১
ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী ৩৩৯
ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ২২০, ৩১৮
ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় ২৫০
ক্ষেত্রী মহারাজা ৩৮১

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৫১, ২২৪
গঙ্গা ৭৬
গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ৪০৩
গঙ্গানারায়ণ দত্ত লেন ৩০৪
গঙ্গাপ্রসাদ লেন ২৫৮
গড়পার রোড ২৮৯
গড়িয়াহাট রোড ২৩৫, ২৩৮
গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (গণেন ব্রহ্মচারী) ৩৪৭
গণেশপুর ২৮
গণেশ বেদজ্ঞ (ডাঃ) ৩৮১
গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ ২২৯, ২৩০, ২৩৩
গদাই খানসামা লেন ১০৫
গনপু ৪০১
'গন্ধবণিক মহাসভা' ৩৯৬, ৩৯৮, ৪০৭
গভর্নর ড্রেক ৩৬৮
গভর্নর হেস্টিংস ২৬০
গভর্নমেন্ট প্লেস ইস্ট ২৪৩, ৩৬১
গাঙ্গুলি লেন ২২২, ২২৩
গাজি সোনাউল্লা ৪০০
গার্ডেনরিচ ৮৩, ১৪৬, ৩৩০
গ্লোব নাশরী ৩৮৪
গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী ৩০৮
গিরিবালা সরকার বালিকা বিদ্যালয় ৩৬৫
গিরিশ অ্যাভিনিউ ৯৬, ২০৬, ৩৮৮
গিরিশচন্দ্র ঘোষ ১০৯, ১১৫, ১২৭, ১৮৪, ২০৬, ২২৫, ২৬৪, ২৬৫, ২৭৭, ৩৫৯, ৩৮০, ৩৯০, ৩৯৪
গিরিশচন্দ্র ঘোষ লেন ১২৪
গিরিশচন্দ্র দত্ত ৪২৪
গিরিশচন্দ্র বসাক ৩০৫
গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ৯৮, ১২৭
গিরিশ বিদ্যারত্ন লেন ৯৮
গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২২৪
গিরীন্দ্রশেখর বসু ১৫৯
গিরীন্দ্রনাথ সরকার ১৫, ১৫৪
গিলবার্ট স্টুয়ার্ট ৪৩০
গুণালঙ্কার গ্রন্থাগার ২৮০
গুণালঙ্কার মহাস্থবির ২৮০
গুদসা ৩২, ১১৫, ১৪৭

গুপ্তিপাড়া ৩১৫, ৪১৪
গুরুচরণ লেন ৩৪৮
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১২৭, ৩৪৪, ৩৪৫
গুরুদাস শেঠ ৩০৪
গুরুদাস স্ট্রিট ৭৬, ১২৩
গুলু ওস্তাগর লেন ২৫৫, ৪০১
গোঁসাই দাসগুপ্ত ৪১২
গোকুল বড়াল স্ট্রিট ১৬৪, ২৮১
গোকুল মিত্র ১৬৭
গোপবন্ধু দাস সরণি ৩৫
গোপাল নগর রোড ২৯০
গোপাল মল্লিক লেন ১৭৪
গোপাল মিত্র লেন ১০৫
গোপাল শাস্ত্রী লেন ১৬৬
গোপাল হালদার ২৫০
গোপীকৃষ্ণ পাল লেন ১১০
গোপীনাথ তর্কালঙ্কার ৩৯৩
গোপীমোহন ঠাকুর ১৫১, ২৭০, ২৭১, ৩১৫
গোপীমোহন দত্ত লেন ১০৫
গোপীমোহন দেব ১৭৯, ৩৬৯, ৩৭০
গোপেশ্বর পাল ৯৭
গোবর গুহ ৪০৭, ৪০৮, ৪০৯
গোবরা ৩১, ১৪৫, ১৪৭
গোবিন্দ জীউ ৩০৩
গোবিন্দচন্দ্র দত্ত ৩২৪, ৪২৪
গোবিন্দ দে ৪১৮
গোবিন্দপুর ২৮, ২৯, ৯৭, ১০৭, ১৩২, ১৪৬, ১৮০, ২১২, ২১৩, ২৫৭, ২৯৪, ৩০০, ৩০২, ৩০৩, ৩০৪, ৩৪৭, ৩৫৯, ৩৬৭, ৩৬৮, ৪১৭
গোবিন্দরাম মিত্র ৯৭, ১৫৮, ৩০০, ৩০১
গোবিন্দ সাউ দাতব্য চিকিৎসালয় ৩৬৫
গোরস্থান লেন ১৪১
গোরস্থান স্কোয়ার ৮৬
গোলদিঘি ১৩৮, ৩৪৫
গোষ্ঠবিহারী ধর ৩৮৪
গোয়ালটুলি লেন ৭২
গৌরকিশোর ঘোষ ৩৪৪
গৌরচরণ মল্লিক ৩০৯
গৌরদাস বসাক লেন ২১৩
গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার ১৭৫
গৌরহরি ভট্টাচার্য ৩৩৫
গৌরীনাথ শাস্ত্রী ৩৭৫
গৌরীপুর ২৯১
গৌরীপুরী দেবী ৩৮১
গৌরীবেড়ে ৩১, ১৪৫, ৪১৪
গৌরীবেড়ে লেন ১১৯
গৌরীমা ৩৭৫
গৌরীমাতা উদ্যান ৩৮৮
গৌরীমাতা সরণি ৩৪৮, ৩৮৭
গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য ১০২, ৩৪৪, ৪১২
গ্লাডস্টোন উইনি ২৪৩
গ্যাস স্ট্রিট ১৯০
গ্যালিফ স্ট্রিট ২০৬
গ্রান্ট স্ট্রিট ৭২
গ্রে স্ট্রিট ৩৪, ৭১, ৮০, ১০১, ১০২, ১১০, ১১৬, ১৮৩, ২০৫, ৩৬৬, ৩৬৮, ৩৭০
গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটার ১১৩, ৩৯০, ৩৯১

ঘুঘুডাঙ্গা ৩২, ৬৫, ১৪৫, ১৪৭
ঘোষ স্ট্রিট ৬৪, ১২৪

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ৩০৬
চপলাকান্ত ভট্টাচার্য ৪১০, ৪১১
চার্টার্ড ব্যাঙ্ক বিল্ডিং ২৭১
চাঁদপাল ঘাট ৭৬, ৭৭, ৯৪, ১৬৮, ২৪৮
চাঁপাতলা ৯৩, ২৬৩, ২৮২
চাঁপাতলা ফার্স্ট লেন ২৮২
চাঁপাতলা সেকেন্ড বাই লেন ১৩৫
চালতাবাগান ১৩৬, ২৮৪, ৪২৮
চালতাবাগান লেন ১২৪
চার্চ মিশনারি সোসাইটি কলেজ ২৮৬
চার্নক প্লেস ৩৫, ২৭৪
চার্লস অ্যালেন মার্কেট ৩৯৭, ৪০১
চার্লস বাজার ৯২
চার্লস মেটকাফ ১৮৪, ১৮৫
চারুচন্দ্র ঘোষ ৪৩০
চারুচন্দ্র দত্ত ৪২৪
চারুচন্দ্র বিশ্বাস ১৬৩, ১৬৭
চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২৬৭
চারুচন্দ্র মজুমদার ৩৬০
চারুবালা দেবী ৩০৬
চারুশীলা দেবী ৩৬৪, ৩৭৪
চারু শ্রীমানী ৩৬৪
চাষাধোপাপাড়া স্ট্রিট ৪১০
চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ ১২২, ১২৪, ১৭২, ১৮৪, ২০১, ২০২, ২২৮, ২২৯, ৪০০, ৪২৯, ৪৩০
চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতাল ১৬৩
চিত্তরঞ্জন দাশ ২০৬, ২৬৮, ৩৯৮, ৪১০
চিত্রপুরী (চিৎপুর) ১১৬
চিত্রেশ্বরী মন্দির ১১৬
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ৭৫
চিৎপুর রোড ৭৫, ৭৭, ৮৫, ৯১, ১০০, ১০২, ১০৭, ১০৯, ১১১, ১৫৮, ১৯১, ২০৫, ২০৭, ২০৯, ২১০, ২২৫, ২৪৬, ২৫৩, ৩১৩, ৩২১, ৩২৩, ৩৮৮, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭, ৪০৪, ৪১৪, ৪২৯
চিৎপুর রোড আপার ৩২১
চিৎপুর স্পার ২০৬, ২৬৮
চিন্তামণি দাস লেন ৩৪৭
চিনেপাড়া ৯২
চিনেবাজার ২৭০, ২৭১
চুনামগলি ১৬০, ১৬৭
চুনারীতলা ১৬০

চুনীলাল দেব ৩৯৫
চেতলা ১৪৫
চেতলা সেন্ট্রাল রোড ১৯০
চোরবাগান ৯২, ১৩৩, ১৫০, ১৫২, ১৫৬
চোরবাগান স্ট্রিট/লেন/সেকেন্ড লেন ৯৮, ১৫৬
চৈতন্য শেঠ স্ট্রিট ২১৫
চৌধুরী লেন ৩৪৮, ৩৭৩, ৩৭৪, ৩৭৮, ৩৮৯
চৌরঙ্গী ২১, ২৮, ৭৩, ৭৫, ২০৫, ২০৬, ২৪২, ২৫৭, ২৬০, ২৬৩, ২৬৯, ২৭৪
চৌরঙ্গী প্লেস ২৭৪
চৌরঙ্গী প্রপার্টিস ২৭৫
চৌরঙ্গী রোড ৭২, ১৯৯, ২৪৪

ছকু খানসামা লেন ১৩৫
ছাতাওলা গলি ৩৩৫
ছাতুবাবুর বাজার ২৯৪, ৩০০
ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ৩৩, ৩৯৪
ছুতোরপাড়া ৮৮
ছোট আদালত ১২০
ছোট গামা ৪০৮
ছোট নরেন ৩৬০, ৩৭৭
ছোনে মজুমদার ৩৮২

জগত্তারিণী পদক ৩৯১
জগৎদুর্লভ বসু ৩৭৮
জগদ্দুর্লভ সিংহ ১২৬, ২১৬, ২১৭
জগৎ শেঠ ১৬১
জগদীশচন্দ্র বসু ২২৫, ২৭৮, ৩৪৪
জগদীশনাথ রায় ১০৬, ১১৪, ৩৭৭, ৪৩৮
জগদীশনাথ রায় লেন ১১৪, ১১৫, ১১৬
জগন্নাথ ঘাট ২১৩, ৩৩৩
জগন্নাথ ঘাট রোড ২০৬, ২০৭, ৩২১
জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ৯০, ৩৬৮
জগন্নাথ দত্ত রোড ১৯০
জগন্নাথপ্রসাদ মিত্র ২৫৩
জগন্নাথ সুর লেন ৪০৬
জগমোহন মল্লিক ২১৫, ২১৯, ২২১
জগমোহন মল্লিক লেন ২১৯, ২২১
জগমোহন মল্লিক স্ট্রিট ১৩২
'জঞ্জাল রেল' ৮০
জর্জ টমসন ১৭৫
জন উডবার্ন, স্যার ১৯৬, ২২৪, ৩০৭
জনক রোড ২৩৮
জন ক্লার্ক মার্শম্যান কেরি ২৫৪
জন গানথার ৪৩১
জন গোল্ডস্‌বরো, স্যার ১৩, ৪৪
জন জ্যাকোরিয়া কিয়ারন্যান্ডার ২২৮
জন মার্শাল, স্যার ৩৪২
জনার্দন শেঠ ৩০৩
জলপ্রণালী ৭৫, ১৪৫
জলা কলিঙ্গ ৩১
জয় মিত্র ঘাট লেন ১৬৯
জয় মিত্র স্ট্রিট ২৫৯, ৪১৪
জয়কৃষ্ণ সিংহ ১২২, ১৭৪
জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫২
জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন ৩৭৫
জয়নারায়ণ মল্লিক ৩০৪
জয়রাম ঠাকুর ৩১৪
জয়ন্তকুমার বাগচি ৪০৫
জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী ২৫২
জহর গুহ ৪০৮
জওহরলাল নেহেরু ১৬৫, ২৬২, ৪০৯, ৪৩৭-৪৩৯
জসীমউদ্দিন ১১৮
জাতিমালা কাছারি ৩৭৩
জাতীয় কংগ্রেস ২৩৫, ২৬২, ২৭৮
জাতীয় গ্রন্থাগার ৩৭০
জাতীয় শিক্ষা পরিষদ ২৩৫, ২৯২
জাননগর ১৩৮, ১৪৫
জানবাজার ৩৯
জানবাজার লেন ৮৫
জানবাজার ফার্স্ট লেন ১৩৮
জানবাজার সেকেন্ড লেন ১৩৮
জানবাজার থার্ড লেন ১৩৮, ১৩৯
জানবাজার ফোর্থ লেন ৭২, ৮৫, ১৩৮
জানবাজার ফিফ্‌থ লেন ৮৫, ১৩৮
জানবাজার রোড ১৩৮
জানবাজার স্ট্রিট ১৩৯, ১৫১, ২৬০
জাস্টিসেস অফ পিস্ ৭৮, ৮৬, ৩৭০
জ্যাক ওয়ারলর ৩৪১
জ্যাকসন, এ. আর, ডাঃ ৬১
জি. সি. গলস্টন ২৭২
জি. টি. মার্কাস ১৫০
জিরাট ১৪৫
জীবনভূষণ কাব্যালঙ্কার ১৩৭
জে. পি. গ্রান্ট, স্যার ৬১, ৬৩
জে. বি. ফিয়ার ৩১০
জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন ১৭২, ১৮৪, ৩৫৭, ৩৯০, ৪০৫
জেনানা হোম ৯৮
জেনারেল কমিটি ১৯৫, ১৯৬, ২০৯
জেফারিস ৩৯০
জেমস অগাস্টাস হিকি ১৮৫, ২৬০
জেমস গ্রান্ট, ডাঃ ১৮৬
জেমস রেনল্ড মার্টিন, ডাঃ ৬২
জেমস হোয়াইটহেড ৪৩১
জেলেটোলা ৯২, ২৪৯
জেলেটোলা স্ট্রিট ২০৬
জেলেপাড়া ৮৮, ১৩৭
জোব চার্নক ৯১, ১৩৪, ৩০৪, ৪৪০
জোড়া গির্জা ১৬২
জোড়াপুকুর স্কোয়ার লেন ৩২১

জোড়াবাগান ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৬, ৯৮, ১৩২, ৩০০, ৩০১, ৩০৩, ৩২৬
জোড়াবাগান পার্ক ৩১৯
জোড়াবাগান রোড ৩৪, ৩০০
জোড়াবাগান স্ট্রিট ১৩২
জোড়াবাগান স্কোয়ার ৩০১, ৩০৩
জোড়াসাঁকো ৯০, ৯২, ১০৭, ১২৪, ১২৪, ১৭৯, ২২৩, ২৩৩, ৩০১, ৩০৩, ৩৬৪
জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি ২৭৮
জোড়াসাঁকো স্ট্রিট ৩৫
জ্যাক ওয়ারনার ৪৩১
জ্যাকসন ঘাট স্ট্রিট ৮৫
জ্যাকেরিয়া স্ট্রিট ১৭১, ২৫৫
জ্যোতি বসু ৪১৭
জ্যোতির্বিকাশ মিত্র ৩৬৫, ৩৬৬
জ্যোতির্ময় বসুরায় ৩৪৪
জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ ১৬৫, ৩৪২
জ্যোতিষচন্দ্র মিত্র ১২৮, ১৫৫
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৭৮
জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর ৩১৯

ঝামাপুকুর ৩৫৩, ৩৬৪, ৪০৭, ৪১৪

টগুড, মিস্ ৩৫৭
টমাস উইলিয়াম টিনগেট ১৭৩
টমাস ফ্যানশ মিডিলটন ১৬১
টমাস র‍্যামবোল্ড, স্যার ১৭৪, ১৯২
টমাস লায়ন ৭৪
টাঁকশাল ৯১
টাঁকশাল স্ট্রিট ৩৬, ৩৩৭
টাউন কাউন্সিল ১২৬
টাউন স্কুল ৩৬২, ৩৬৪, ৩৮৩
টাউন হল ৪৭, ৪৮, ৬১
টালা ৩১, ৭৬. ১৪৫, ১৪৬
টালিগঞ্জ ২৩৬, ৩৩০, ৪১৪
টালিগঞ্জ (দুর্গাপুর) ১৪৫, ১৪৬
টালি নালা ২৩, ৮৯
টি. প্রিন্সেপ, ক্যাপ্টেন ৩৫০
টিকটিকি বাজার ২৯৪, ৪১৬
টেকচাঁদ ঠাকুর ১৯৩, ৩৯৮, ৪০১
টেগোর ক্যাসেল ৩১২, ৩১৭
টেম্পল চেম্বার্স ২৮২
টোডরমল ১১৬
ট্রায়াঙ্গুলার স্কোয়ার ৮৬
ট্রেডার্স ব্যুরো ৩৭৯
ট্যাংরা ২১, ৩১, ৬৫, ১৪৫, ১৪৭
ট্যাংকস্কোয়ার ৬৩, ৬৫, ৭৫, ২২৮

ঠনঠনিয়া ২৯, ২০৩, ২৫৭, ২৮৬
ঠনঠনিয়া কালীবাড়ি ১৫১, ১৫৬, ৩৯৭
ঠনঠনিয়া বাজার স্ট্রিট ৬৪, ৬৬
ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১২৬
ঠাকুর রাধাকান্ত লেন ১০৪, ১০৫

ডন সোসাইটি ২৭৮, ২৯২
ডব্লু সি ব্যানার্জি স্ট্রিট ৪২৮
ডব্লু সি ব্ল্যাকওয়ার ২৫৪
ডাঃ আশুতোষ শাস্ত্রী রোড ২৩৯
ডাঃ এম এন চ্যাটার্জি সরণি ৬৪
ডাঃ মার্টিন লুথার কিং সরণি ৫
ডঃ মেঘনাদ সাহা সরণি ২৩৬
ডাঃ ললিত ব্যানার্জি সরণি ১৩৬, ১৮১
ডানকান এমরিচ, ডাঃ ৪৩১
ডানকান বস্তি ৯৯
ডাফ চার্চ ৪১৭, ৪২৬
ডাফ স্কুল ৪২৬
ডাফ স্ট্রিট ১২৫, ৪২৭, ৪২৮
ডাফ হাই স্কুল ফর গার্লস ৩৫৭, ৩৫৮
ডালহৌসি, লর্ড ১৩৫, ১৬৮
ডালহৌসি স্কোয়ার ২৬, ৭৬, ৮৬, ১২৩, ১৯১, ২৭৪, ২৯৯
ডালহৌসি স্কোয়ার ইস্ট ৪, ৬৫, ২১১, ৩৬১
ডালহৌসি স্কোয়ার ওয়েস্ট ৪, ৩৫, ৬৫
ডালহৌসি স্কোয়ার নর্থ ৫, ৬৫, ২১২, ২১৩
ডালহৌসি স্কোয়ার সাউথ ৬৫
ডালিমতলা ৯৮, ২৬৩
ডালিমতলা লেন ১৭০
ডায়টন কলেজ ২৩০
ড্যানহ্যাম মেডিক্যাল কলেজ ২
ডিঙ্গাভাঙ্গা ৩৬, ৩৮, ২৫৭, ২৬৩, ২৮০
ডিঙ্গাভাঙ্গা খাল ৫৬
ডি গুপ্ত ৩৭৫
ডি বি স্মিথ, ডাঃ ৮১
ডি এল রিচার্ডসন, ক্যাপ্টেন ১৭২, ৩৯০
ডিরোজিও ১৭৪, ৩৫৮
ডিস্ট্রিক্ট কমিটি লেন ২৬৪
ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটি ১৫৫, ২৩১, ৩১১
ডিহি উল্টডিঙ্গি ৩১, ৩৯
ডিহি এন্টালি ৩১, ৩৯
ডিহি কলিকাতা ২৮, ২৯, ২৫৭
ডিহি চক্রবেড়িয়া ৩২, ৩৯
ডিহি চিৎপুর ৩১
ডিহি তোপসিয়া ৩১
ডিহি দক্ষিণ পাইকপাড়া ৩১
ডিহি বাহির সিমলা ৩৯
ডিহি বাগজলা ৩১
ডিহি বিরজি ৩৮, ৩৯, ২৫৭
ডিহি ভবানীপুর ৩২, ৩৯
ডিহি শিয়ালদহ ৩১, ৩৯, ২৬৩
ডিহি শ্রীরামপুর ৩১, ৩৩৯
ডিহি শুঁড়া ৩১, ৩৯, ২৬৩
ডিহি সিঁথি ৩১

ডিহি সিমলা ৩১
ডুমতলা ৩৫
ডভিড হেয়ার ১১১, ১৩৬, ১৭২, ১৭৪, ১৭৫, ২৮১, ৩৪৩
ডোমটুলি ৯২
ডোমপাড়া ১৩৭, ৪২৪

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ৪১৫
তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা ৩২৩
তরু দত্ত ৩১৭, ৪২৪
তারক চ্যাটার্জি লেন ২৫৯
তারক প্রামাণিক রোড ১২৪, ২৯৭, ২৯৯
তারাচাঁদ দত্ত স্ট্রিট ২২০, ২২১, ২৩৩
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৩৪
তারাসুন্দরী পার্ক ১১৪
তালতলা ২৮, ৬৬, ৯০, ৯৩, ১৪৫, ১৫১, ২৬৩, ৩১৬
তালতলা অ্যাভিনিউ ২৬৩, ২৬৪
তালতলা পাড়া ২৬২
তালতলা বাজার ৩১৪
তালতলা বাজার স্ট্রিট ৮৫, ২৬৩
তালতলা লেন ২৬৩
তালপুকুর ২৯, ৩৮, ২৫৭, ২৬৩
তালপুকুর বাজার ৩৮
তালপুকুর রোড ২৬৩
তালবাগান লেন ২৬৩
তালুক নপাড়া ৯২
ত্যাওড়ার মাঠ ৩৮৭
তিলজলা ২১, ৩১, ১৪৭
তেলিপাড়া ২৪৯
তেলিপাড়া লেন ৩৯৪
ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী ১৩০
ত্রৈলোক্য নাথ বসু ৩৫৫
তোপসিয়া ২১, ৩১, ১৪৫, ১৪৭
তৌবাজারী ২৫৯

থর্নটন ১৩০
থানা দুর্গ ১৪, ১৭
থিয়েটার রোড ৬, ৩৭, ৬৫, ৭২, ৮০, ১৫০, ২৪৬
থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি ৩৩৪

দক্ষিণদ্বারী ২১, ৩১, ১৪৬
দক্ষিণ পাইকপাড়া ৩৯
দক্ষিণপাড়া ২১
দক্ষিণারঞ্জন বসাক ধর্মশালা ৩০৩
দত্তাবাদ ৩১, ১৪৬
দর্মাহাটা স্ট্রিট ৪, ২০৯, ২১০, ২১১, ২১৪, ২১৫, ২২৫, ২২৬, ৩০৩, ৩১৫, ৩২২, ৩২৫
দরগা রোড ২০৮
দর্জিপাড়া ২৪৯, ২৫০, ২৫৫, ২৫৯, ৩৯৮
দর্জিপাড়া স্ট্রিট ২৪৮, ২৪৯
দর্পনারায়ণ ঠাকুর স্ট্রিট ৮৫, ৩১৩, ৩১৫, ৩২১, ৩২৬
দর্পনারায়ণ মল্লিক ৩০৯
দলন্দা ২১, ২৮, ৩১
দয়াল সোম লেন ২৯৮
দয়েহাটা স্ট্রিট ১২৬, ২১০, ২১১, ২১৫, ২১৬, ২১৭, ২১৮
দাদিরা দালাল, স্যার, ৩৬৩
দ্বারকানাথ ঠাকুর ৬১, ১৬৯, ১৭৫, ১৯২, ৩১১, ৩২২, ৪২২
দ্বারকানাথ দে ৪১৭
দ্বারকানাথ মিত্র ১২৭
দায়ুদ আলি দত্ত সরণি ২৯৪
দি আর্মি স্যানিটারি কমিশন ৭৯
দি ওল্ড কোর্স ৩৬
দি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ম্যাগাজিন ৩৪৫
দি ক্যালকাটা চেম্বার অফ কমার্স ২৭০
দি ক্যালকাটা লাইব্রেরী ২৮৬
দি নিউ প্লে হাউস ২৬৯
দি বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স ২৭০
দি বেঙ্গল বুদ্ধিস্ট অ্যাসোসিয়েশন ২৭৯
দি সেটেলমেন্ট (ডিহি কলিকাতার মধ্যে) ২৫৭
দি সোসাইটি ফর দি হাইয়ার ট্রেনিং অফ ইয়ং মেন্স ১৫০, ৩৪৪
দিগম্বর মিত্র, রাজা ২৯৪, ৩৬৪, ৪১৬
দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৬৬
দ্বিতীয় গোপাল সিংহ ১৩
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ৯, ১৮, ২৬৩, ২৭৩, ৩৮৭, ৪০৯, ৪৩১
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৭৮, ৩১০
দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু ৩৫৬
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ২৬৫, ২৬৬
দীনবন্ধু মিত্র ১১৫, ১২৫, ১২৭, ২৫৮, ৩৭৪, ৩৯১, ৩৯৪, ৪১২
দীনবন্ধু লেন ১২৫
দীনেশচন্দ্র সেন ৩৩৭, ৪১১
দুখীরাম বাবু (স্যার) ৩৮২
দুধুওয়ালা ধর্মশালা লেন ৩৯৬, ৩৯৭
দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় ৩৭২
দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ ১২৭, ১৬৯
দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রিট ৪০০
দুর্গাচরণ লাহা, মহারাজা ৩৬৪
দুর্গাদাস কর ৩৯০
দুর্গা মা ৩৭৫
দুর্গামোহন সাংখ্যবেদান্ততীর্থ ৩৬৬.
দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য ৩০৮
দেবনারায়ণ গুপ্ত ৩০৬
দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ ১৬৭
দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক ২৭৫
দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী ১৯৫
দেবীপ্রসাদ বসু ৩৫৮
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩২২, ৩৭১, ৪১৪, ৪১৫, ৪১৭, ৪২০
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ৩৩১, ৩৩২
দৈবতলা ৩৪

ধর্মতলা ৭৫, ১৫৭
ধর্মতলা গুমটি ৭৪, ৭৫
ধর্মতলা ঘাট ৬১, ৬৩
ধর্মতলা নেটিভ হাসপাতাল ৬২
ধর্মতলা মার্কেট ১৩৯, ১৪০, ১৫৭
ধর্মতলা লেন ১৭০, ১৭১
ধর্মতলা স্ট্রিট ৬, ৭, ৩৬, ৬৩, ৬৫, ৭১, ৭২, ৭৫, ৮৫, ৯৮, ১৫০, ২০২, ২৪২, ২৬০
ধর্মদাস সুর ২৬৫, ৩৯৪
ধলডাঙ্গা ২৮
ধাপা স্কোয়ার মাইল ৮০
ধীরেন্দ্রনাথ সেন ৩৯৬
ধোপাপাড়া লেন ৩২১

নগেন্দ্রনাথ বসু ১০৬, ৩৮৫, ৪১১
নগেন্দ্রনাথ শেঠ ২১৩, ৩০১
নগেন্দ্রনাথ সেন ১৪৯
নটবর দত্ত রো ১৬৫
নটী বিনোদিনী ১১২, ১১৩, ২৬৪, ৩৫৯
নতুন ফোর্ট উইলিয়াম ৩৮
নতুনবাজার ১০৭, ১১১, ১২২
নর্থ সারকুলার রোড ৭২, ১৫৮
নর্থ সুবার্বন মিউনিসিপ্যালিটি ১৪০
ননসেন্স ক্লাব ২৮৭
নন্দকুমার চৌধুরী লেন ৯৯, ২৮৭
নন্দকুমার চৌধুরী সেকেন্ড লেন ২৮৪
নন্দনবাগান ৬৫, ৯৩, ১২৫
নন্দরাম সেন স্ট্রিট ১৫৮
নন্দলাল দেব ৩৯৪
নন্দলাল বসু সরণি ১১২
নন্দলাল বসু লেন ১০৫
নন্দলাল মল্লিক লেন ২২২, ৪২৩
নন্দলাল সিংহ ১১২
নন্দলাল সেন ১৭৭
নবকুমার রাহা লেন ৩৪৮, ৩৮৬
নবগোপাল মিত্র ১২৩, ৩৯০, ৩৯৫
নবগোপাল মুখার্জি লেন ১১১
নবাব আবদুর রহমান স্ট্রিট ৩৩৯
নবাব আবদুল লতিফ স্ট্রিট ১৭১
নবাব আলিবর্দি ২, ২৩, ১০৫, ১১৪
নবাব জাফর আলি খাঁন ৩৩৩
নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ ৩০৪
নবাব মোবারকউদ্দৌল্লা ৪২৫
নবাব লেন ৩৩৩, ২১৩
নবাব সিরাজদ্দৌল্লা ২৫, ২৬, ২৮, ৩৩, ৭৮, ৯৩, ১০৭, ২১৪, ২২৮, ২৫৩, ২৫৬, ২৬৯, ৩৬৮, ৩৭৩
নবাব সিরাজদ্দৌল্লা সরণি ৪৯
নবীনচন্দ্র দেব ৩৯৪
নবীনচন্দ্র বসু ৩৭৯
নবীনচন্দ্র সেন ১২৭ ; ৩৩৭
নবীনচাঁদ বড়াল লেন ২৮৩
নরেন দেব, ৩৯৭, ৩৯৮
নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব ৩৭০, ৩৯৪, ৩৯৫
নরেন্দ্রনাথ দত্ত ১৯৫, ২৯৭, ৪০৩
নরেন্দ্র ভট্টাচার্য ৩০২
নরেন্দ্রনাথ মিত্র ৩৭৭
নরেন্দ্রনাথ সেন ১৯৫, ২৬০, ২৬১, ২৬৭, ২৬৮, ২৭৯, ৩৭৪, ৩৭৫, ৪২৮
নরেন্দ্র সেন স্কোয়ার ১৪৯
নলিন সরকার স্ট্রিট ১০২
নলিনীরঞ্জন সরকার ৩৬২
নলিনী শেঠ রোড ২১১, ২১৫
নিউ আলিপুর ২৫২
নয়নচাঁদ দত্ত স্ট্রিট ১০৩, ১১৬, ২৫১
নয়নচাঁদ মল্লিক ২১৯, ৩০৯
নয়ন সুর লেন ১৬৯
নাওরাং সিং ৪০৭
নাট্য নিকেতন থিয়েটার ১৮২
নাট্যভারতী ১৮৩
নাথেরবাগান লেন ১০৮
নাথেরবাগান স্ট্রিট ১০৮
নারায়ণ আয়েঙ্গার ২৬৮
নারায়ণ চ্যাটার্জি রোড ৩৫
নারায়ণ পণ্ডিত ২৫০
নারায়ণ বিদ্যারত্ন ১৩০
নারায়ণ রায় সরণি ২৯৯
নারায়ণী দেবী ৩৫৪
নারিকেলডাঙ্গা ৩১, ৬৫, ৮৯, ১২৬, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ২৩৭, ২৯৩, ৩০০, ৩৫৩
নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড ৬৪
নারিকেল বাগান ১২৫, ১৩৬
নালন্দা উদ্যান ২৭৯
ন্যায়রত্ন লেন ৩৪৮, ৩৭৫
নিউ কাট ক্যানেল ২৩৭
নিউ চার্চ ২২৮
নিউ চায়না বাজার ২৭২
নিউ চায়না বাজার স্ট্রিট ২০৭, ২৭৪
নিউ জগন্নাথঘাট স্ট্রিট ২০৯
নিউ পার্ক স্ট্রিট ২০৭
নিউ মার্কেট ৮৫, ১৩৮, ১৪০, ১৪৫, ১৫৭, ২৭৪
নিউ সারকুলার রোড ২০৭
নিকারীপাড়া ৯৬
নিখিলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব ৩৯৫
নিজামত আদালত ২৪৯
নিতাইচরণ পাল ৯৭
নিতাই হালদার স্ট্রিট ৩০৫
নিবেদিতা লেন ২৭৬, ২৭৭
নিমচাঁদ শিরোমণি, পণ্ডিত ১৫১
নিমতলা ২৮, ৫৭, ৬৬, ১০৭, ৩০৪
নিমতলা ঘাট ৭৬, ৭৭, ১০৭, ২৪৬
নিমতলা ঘাট স্ট্রিট ৫, ৩৪, ৬৪, ১১০, ২২৬, ৩০০, ৩১৯, ৩২৬

নিমতলা ঘাট স্ট্রিট এক্সটেনশন ৮৪
নির্মল দে ২৩০, ৪১২, ৪১৭, ৪১৮
নির্মলচন্দ্র স্ট্রিট ৪, ৫৯, ২২৬, ২২৯
নির্মলনলিনী মহিলা শিশু শিক্ষাসদন ৩৬৫
নির্মলেন্দু লাহিড়ী ১৮২
নিমাই চরণ মল্লিক ৩০৯
নিমু খানসামা লেন ১৩৪, ১৩৬, ২৫৬
নিরঞ্জন সেন ২৯৯
নিরুপমা দেবী ২৬৭
নিশীথরঞ্জন রায় ৩৯৬
নিহারীটোলা ৯২
নিয়োগীপুকুর ইস্ট লেন ১৬৯
নিয়োগীপুকুর ওয়েস্ট লেন ১৬৯
নীরদ হালদার ৩০২
নীরেন দাশগুপ্ত ৩০২
নীরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র ২৫৭
নীলকান্ত গোস্বামী, পণ্ডিত ২৫৮
নীলরতন সরকার হাসপাতাল ১৭৯
নীলমণি চৌধুরী ৩৭৪, ৩৭৫
নীলমণি ঠাকুর ৩০৩
নীলমণি দত্ত ৪২২
নীলমণি মল্লিক ১৩৩
নীলমণি মিত্র স্ট্রিট ২৫২, ২৫৭
নীলমণি সরকার লেন ৪১২
নীলু দালাল স্ট্রিট ৩৪
নেটিভ ফিমেল স্কুল ১৭৫
নেটিভ হাসপাতাল ৩১৭
নেতাজি সুভাষ রোড ৪, ৩৫, ৪৪০
নেবুতলা ২৮১
নেবুতলা রো ১৬২, ১৬৪, ১৬৫
নেবুতলা স্ট্রিট ১৯১
নেবুবাগান ১৩৬
নেবুবাগান বাই লেন ১০৫
নেবুবাগান লেন ১০৫
নোনাডাঙ্গা ৩২
নোয়াবাদ ৩৪
নৃসিংহ মুখার্জি লেন ২৮৪
ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন ৩৭৭
ন্যাশনাল কংগ্রেস পার্ক ২০৯
ন্যাশনাল থিয়েটার ১১৩, ৩৬৯
ন্যাশনাল লাইব্রেরি ১৮৬
ন্যাশনাল সেমিনারি ৩৬৪
ন্যাশনাল সোসাইটি ৩২৭
ন্যাড়া গির্জা ১৬১
ন্যাড়া গির্জার বাজার ১৬২

পঙ্কজ গুপ্ত ২৫১
পঞ্চান্নগ্রাম ২৯
পঞ্চানন কুশারী ৩১৪
পঞ্চানন ঘোষ লেন ১৭২, ১৭৩
পঞ্চানন রায় ২১৭
পটলডাঙা ৬৪, ৯২, ১৭৩, ২৩৩
পটলডাঙা স্ট্রিট ৩৩৩
পটুয়াটোলা লেন ১৩৭
পণ্ডিতিয়া ৬৫
পদ্মনাথ লেন ৩৪৮, ৩৮০
পদ্মপুকুর ৯০, ৯৩, ১৬১, ৩০০
পরাশর রোড ২৩৮
পরেশচন্দ্র নন্দী ৪১৮
পশুপতিনাথ দেব ২৭৬
পশুপতিনাথ বসু লেন ১০৫
পশ্চিমবাংলা একাডেমি ৩৩৮
পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১২৩, ১৫২
পাইকপাড়া ৪০৭
পার্ক স্ট্রিট ৬, ২৭, ৩৭, ৫৬, ৬৩, ৬৫, ৭২, ৭৫, ৯০, ৯৩, ১৪১, ২০৭, ২৪৪
পার্ক সার্কাস ২০৮, ২৬৩
পার্ক স্ট্রিট এক্সটেনশন ২০৭
পাগলাডাঙা ৩১, ১৪৫, ১৪৭, ৩৩৬
পাটোয়ারবাগান স্ট্রিট ৯৮, ১৩৪
পাটোয়ারি ঘাট ৬৬
পাথুরিয়াঘাটা ২৮, ১০৩, ২২২, ৩০০, ৩০৫, ৩০৭, ৩১১, ৩১৫, ৩২১, ৩২৫, ৩২৬, ৩৬৪, ৩৬৮, ৪১২
পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গ নাট্যশালা ৩২১
পামার্স ব্রিজ পাম্পিং স্টেশন ৩৩১
পারসিভিয়ারেন্স সোসাইটি ২১৮, ২১৯
পার্শী বাগান ১২৫, ১৫৮
পি. মিত্র ১১৫
পিকাসো বীথি ১২৩
পিরু খানসামা ১৩৬
পীতাম্বর দত্ত ৪২২, ৪২৪
পুরণচাঁদ নাহার ২৬১, ২৬৩, ২৬৪
পুরাতন চিনাবাজার স্ট্রিট ১১২
পুরাতন ফোর্ট উইলিয়াম ৩৩, ৪২, ৭৫
পুরাতন সিমলাবাজার ৩৮
পুলিনবিহারী সরকার ১০২
পূর্ণচন্দ্র দে ১০৯
পূর্ণিমা মিলন সভা ২৮৭
পূর্ণশ্রী ১৮০
পেরিন গার্ডেন ৯২
পেয়ারাবাগান লেন ৯৮
পোড়াবাজার ৪১৬
প্রতাপচন্দ্র দে ৪১৮
প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ৩৪৪, ৩৪৫
প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, ডাঃ ৩৬০
প্রতুলচন্দ্র দত্ত ৪২৪
প্রদ্যুম্ন মল্লিক ২২২, ৩১১
প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর, মহারাজা ৩১২, ৩২০
প্রফুল্লকমল ঘোষাল ১২৮, ১৩০
প্রফুল্লচন্দ্র রায় ৩৩৮, ৩৪৪
প্রভাত দত্ত ৩১২
প্রভাতকিরণ বসু ১১২

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৫৯
প্রভাতকুসুম রায়চৌধুরী ১২৮
প্রমথনাথ দত্ত ২৯৩
প্রমথনাথ মল্লিক ৩০১, ৩১২
প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় ৪১০
প্রসন্নকুমার ঘোষ ৪১৪
প্রসন্নকুমার ঠাকুর স্ট্রিট ১৭৫, ৩১৭, ৩১৯, ৩২৬, ৪২২
প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী ১২৭
প্রসন্ননারায়ণ দেব, রাজা ৩৬৫, ৩৬৬
প্রসাদ দাস মল্লিক ১৫৪
প্রাণকৃষ্ণ দত্ত ২৯৩, ৩৫২
প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ৩৬০, ৩৬৪
প্রাণকৃষ্ণ সিংহ ১২২, ১৭৪
প্রাণকৃষ্ণ হালদার ৩৯৪
প্রাণতোষ ঘটক ৩৬২
প্রিন্সিপাল ক্ষুদিরাম বোস রোড ১১৪
প্রিন্সেপ ঘাট ৯৪
প্রিন্সেপ সাহেব ১১৬, ১১৭
প্রিন্সেপ স্ট্রিট ২০১
প্রিমরোজ লেন ১৫৫
প্রিয়মাধব বসুমল্লিক ১১৫
প্রিয় মিত্র ৩৬৫
প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ ৪১১
প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিট ২৮২
প্রেমচাঁদ রায় ৩০১
প্রেসিডেন্সি কলেজ ১২০, ১৭১, ১৭২, ১৭৪, ২১১, ২৩৫, ৩৪৭, ৩৬৩, ৩৭৪, ৩৭৫
প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতাল ২
প্যাট্রিক গেডিস ২০৯
'প্যারাগন' ৩৪৭
প্যারী লেন ১৫৩
প্যারীচরণ লেন ১৫৪
প্যারীচরণ সরকার ১০৩, ১২৭, ১৫২, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৮
প্যারীচরণ সরকার লেন ১৫৪
প্যারীচরণ সরকার রো ১৫৪
প্যারীচরণ সরকার স্ট্রিট ১৫১, ১৫২, ১৫৪
প্যারীচাঁদ মিত্র ১৫১, ১৮৬, ২৫৪, ৩২৪
প্যারীমোহন বাগচি ৪০৪
প্যারীমোহন মুখার্জি ২৫০
প্যারী রো ১৫৪

ফক্স লেন ৯৯
ফকিরচাঁদ মিত্র স্ট্রিট ১২৫, ১২৮
ফটোগ্রাফিক সোসাইটি ৩২০
ফরবেস এইচ, এন., ক্যাপ্টেন ১৬১, ২৯৩
ফরোয়ার্ড পত্রিকা ১২১, ৪১০
ফরোয়ার্ড ব্লক ৩০২, ৩৫১, ৩৫৮, ৩৬১
ফলকিনর, মিস্ ৩৫৭
ফড়িয়াপুকুর স্ট্রিট ৩৪, ১০২, ১০৩, ১০৪, ১১৭, ১১৮, ১১৯
ফারুকশিয়ার ১১, ২০, ২১, ২৩, ২৫
ফায়ার ব্রিগেড ফান্ড ১০০
ফিয়ারস লেন ১৫৯, ১৬০
ফিভার হসপিটাল অ্যান্ড মিউনিসিপ্যাল এনকোয়ারি কমিটি ৬১
ফিভার হসপিটাল কমিটি ১৮, ২৬, ৪০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৬, ৬৮, ৭০, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮২, ২৪১, ২৬১
ফিলিপস্ ফ্র্যান্সিস, স্যার ২৭০, ৩০৫
ফে. মিসেস ২৬৯
ফেনিক বাজার ৩৬, ৩৮, ৯০, ৯৩
ফেনিক বাজার স্ট্রিট ৩৬, ১৩৯, ১৪১
ফেয়ারলি প্লেস ২৪২
ফ্যান্সী লেন ২৪
ফ্রান্সিস এলিস ১৩
ফ্রান্সিস ডি মেলো ২৫৯
ফ্র্যাঙ্ক পামা, ক্যাপ্টেন, ১৪৯
ফ্রি চার্চ ইনস্টিটিউশন ১৫৩
ফ্রি মিশন চার্চ ৪২৬
ফ্রি স্কুল স্ট্রিট ৫৬, ৬৩, ৭২, ৮৫, ২০২
ফুলিয়া ২১, ২৫০
ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ ৩, ১৪, ৫৮, ৫৯, ৬৫, ৬৬, ৭১, ৮২, ৯০, ১৩২, ১৩৮, ১৫৭, ২৯৪
ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ২৪২, ২৫৫
ফ্রেডারিক হ্যালিডে, স্যার ৬১
ফ্রেন্ডস অফ ইণ্ডিয়া ২৫৪
ফোরম্যানের ঘাট ৩৯
ফ্রান্সিস রাসেল, স্যার ১৮

বউবাজার (বৌবাজার দ্র.) ২৮৩
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১০৬, ১১৪, ১১৫, ১২৫, ২৬৭, ৩৪৪, ৩৬৯, ৪১১, ৪১২, ৪১৭
বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট ১১৭, ৩০৯, ৩৩৩, ৩৩৪
বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ২, ২৪৮, ২৬৫, ২৬৬, ২৯২, ৩৪৩
বঙ্গভঙ্গ ও সহবাস সম্মতি বিল আন্দোলন ৩৬৪
বঙ্গবাসী কলেজ ৩০২
বঙ্গ বিদ্যালয় ৩৯১
বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন ১৩২
বঙ্গীয় আইন পরিষদ ২৩৫
বঙ্গীয় ছাত্র পরিষদ ১০১
বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস ২১১
বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ৮১, ২০৮, ২৩১, ২৩৭
বঙ্গীয় ব্যায়াম সমিতি ১৩১
বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভা ২৯২
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ১৮০
বঙ্গীয় বৌদ্ধ সংস্থা ২৬১
বঙ্গীয় মহাকোষ গ্রন্থ ৩৭০
বঙ্গীয় মাদক নিবারণী সমাজ ১৫২
বঙ্গীয় রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি ২১৯
বঙ্গীয় সাহা সমিতি ২৬৩, ৪২৭
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ২৫২, ২৬১, ৩৩০, ৩৩৮, ৩৭৪, ৪৩০

বজবজ রোড ১৯১
বটকৃষ্ণ পাল অ্যাভিনিউ ১১০
বটকৃষ্ণ পাল স্কোয়ার ১১০
বটকৃষ্ণ লেন ১১০
বটতলা ৩৫, ৯০, ৯৩, ২৬৩
বটতলা স্ট্রিট ২১০, ২১৫
বনফিল্ড লেন ২১, ৩৫, ১১১
বনমালী মিত্র ১১৪, ২৫৪
বনমালী সরকার ২৮, ৯৭, ২৫৮
বনমালী সরকার ঘাট ৬৫
বন্ডেল ১৪৫
বন্ডেল উলুবেড়িয়া ১২, ১৪৭
বরদা ঠাকুর লেন ২২২
বরদাপ্রসাদ ঘোষ ৩৪৫
বরদা মিত্র ৩৭৮
বরদা মিত্র লেন ৩৪৮, ৩৭৮
বলরাম ঘোষ স্ট্রিট ৩৪, ৬৫, ১১৬, ১১৭, ১৫০, ৩৪৮, ৩৫৩, ৩৫৮, ৩৬৪, ৩৭৮, ৩৮৮, ৪২৬,
বলরামচন্দ্রের ঘাট ২, ১৯
বলরাম দে স্ট্রিট ১২২, ৩৫০, ৪২৩
বলরাম বসু ৩৭৯
বলরাম মজুমদার স্ট্রিট ১১১
বলরাম মন্দির ৩৯৮
বলাই চাঁদ সিংহ ১২৩
বলাই দত্ত স্ট্রিট ১৭১
বসন্তক পত্রিকা ২৯৭
বসাক দিঘি ১৪৯, ১৫০, ৩০১
বসাক দিঘি লেন ৯৮
বসাক লেন ১৩২, ২১৬
বসাক স্ট্রিট ১৩২, ২১০, ২১২, ২১৫
বসুমতী পত্রিকা ৩৬২
বসুমতী সাহিত্য মন্দির ৩৯৫
বসুবিজ্ঞান মন্দির ২
বড়বাজার ১৬, ১৭, ১৮, ৩৬, ৩৮, ৮৯, ৯০, ৯২, ৯৬, ১১২, ১২৬, ১৬১, ১৯২, ২০২, ২১২, ২১৯, ২৩৩, ২৪৮, ৩০১, ৩০৩, ৩০৫, ৩১৪, ৩২২, ৪০৬
বড়বাজার উন্নয়ন প্রকল্প ২৪৯
বড়বাজার গার্হস্থ্য সাহিত্য সমাজ ১৫৪
বড়বাজার ফ্যামিলি লিটারারি ক্লাব ৩১০
বড়িশা ৩৬৭
বয়কট আন্দোলন ৩৪৩
বয়েজ ওন লাইব্রেরি ১৮৩
বয়েজ ওন হোম ১৭৯
ব্লকম্যান স্ট্রিট ১৮৬
বাঁটরা ৩০২
বাঁশতলা ২১০, ২৬৩
বাঁশতলা স্ট্রিট ২০৬, ২১০, ২১১, ২১২, ২১৫, ৩২২
বাঁশবেড়িয়া ১৪৫, ১৪৯
বাগমারি ২১, ৩১, ৬৫, ১৪৫, ১৪৬, ৪১৬
বাগমারি রোড ২৩৯
বাগবাজার ১, ২, ২৩, ৩৮, ৬৩, ৮০, ৯২, ৯৬, ৯৭, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১১৯, ১৬৭, ৩৫৩, ৩৯০, ৩৯৩
বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটার ৩৯৪
বাগবাজার খাল ২৪৮
বাগবাজার সোস্যাল ইউনিয়ন ২৭৭
বাগবাজার স্ট্রিট ৫, ১৪, ৬৪, ৬৬, ১০১, ১০৪, ২৭৭
বাঘা যতীন ১১৫, ৩৫৪
বাজার কলিকাতা ১৬, ২৯, ২৫৭
বার্ট্রাম স্ট্রিট ২৭৪
বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ৪১৪
বাদা ৩০৫
বাদুড়বাগান ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১৩১, ১৩২, ২৮৪, ৩৫৩
বাদুড়বাগান ফার্স্ট লেন ৯৮
বাদুড়বাগান লেন ১২৬, ১৩০, ১৩২
বাদুড়বাগান রো ১২৬, ১৩১
বাদুড়বাগান সেকেন্ড লেন ৯৮, ১২৬, ১৩০, ১৫৮
বাদুড়বাগান স্ট্রিট ৯৮, ১২৫, ১২৬, ১২৮, ১৩০
বাবুঘাট ৯৪
বাবু তারাপদ মুখার্জি সরণি ৩৬
বাবুরাম ঘোষ লেন ১১০
বাবুরাম শীল লেন ১৬৫
বারপতি বসাক ৩০২, ৩০৪
বারোজ সাহেব ৪৩৯
বাসুদেব বসাক ৩০২
বারানসী ঘোষ লেন ১২২
বারানসী ঘোষ স্ট্রিট ৭৬, ৯৮, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১৩৩, ২৯৮, ৩২১, ৩৫২
বারানসী ঘোষ সেকেন্ড লেন ১২২
বারানসী ঘোষ থার্ড লেন ১২২
বারানসী শেঠ ৩০২
বারিদবরণ মুখার্জী, ডাঃ ৩৩৩, ৩৩৪
বারিং গ্রাউন্ড রোড ৩৭
বারীন্দ্র ঘোষ ১৩০, ৩৬২,
বালক দত্ত লেন ১৫১
বালমুকুন্দ মক্কর রোড ২০৬, ২২০, ২২১
বালাখানা স্ট্রিট ২৫৯, ৩৫০
বালিগঞ্জ ২, ৩৯, ৬৫, ৮৯, ১৪৫, ১৪৭, ২৩৮
বালিগঞ্জ অ্যাভিনিউ ২১৫
বালিগঞ্জ পাম্পিং স্টেশন ৩৩১
বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড ২৫২, ২৯১
বালিগঞ্জ স্টোর রোড ২০৭
বামুন বস্তি ৩৭, ৬৫, ৯০
বাসন্তীদেবী কলেজ ২৫২
বাহির দক্ষিণদ্বারী ২১
বাহির বিরজি ২৮
বাহির মানিকতলা ৮৯
বাহির শ্রীরামপুর ২৮
বাহির শুঁড়া ২১
বাহির সিমলা ১৫, ৩১, ৮৯, ২৯৩
বি কে ইনস্টিটিউশন ১১১

বি কে পাল লেন ১১৫
বিচিত্রা ক্লাব ১১৮
বিচিত্রা নিকেতন থিয়েটার ১২২
বিজন থিয়েটার ১৮০, ১৮২
বিজয়রাম চট্টোপাধ্যায় ৩১৫
বিজয় ভাদুড়ী ১১৯
বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ৩৬১
বিজয়রত্ন সেন ২৫৯
বিজয় সিং নাহার ২৬৩
বিজয় সিংহ ৪১০
বিজ্ঞান কলেজ (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) ২, ১৫৯
বিটোর ৩০২
বিডন উদ্যান (পার্ক) ৮৫, ২৪৯, ৩০০, ৩০৪, ৪২৫
বিডন রো ১১৬, ২৪৮, ২৪৯, ২৫০, ২৫২, ২৫৫, ২৫৬, ৩৭৪, ৪০৮
বিডন স্ট্রিট ৩৪, ৬১, ৬৪, ৭১, ৮৪, ৮৫, ৯৮, ১০১, ১১৩, ১২০, ১২৩, ১৫২, ১৬৪, ১৭৫, ১৭৬, ১৮১, ২০২, ২৪৯, ৩০০, ৩৭৭, ৩৮৬, ৪১৭, ৪১৯, ৪২৩, ৪২৭
বিডন স্কোয়ার ৮৬, ১৫৩
বি থিয়েটার ২৬৪
বিদ্যাসাগর উদ্যান ৫৭, ৭৫, ১৩০, ১৩৯
বিদ্যাসাগর কলেজ ২৫২, ২৮৬, ৩৭৭
বিদ্যাসাগর মন্দিরের ট্রাস্টি ১২৪
বিদ্যাসাগর স্ট্রিট ১২৬, ১২৮, ১৩০, ১৩১
বিদ্যোৎসাহিনী থিয়েটার ১২২
বিদ্যোৎসাহিনী সভা ১২২
বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা ১২২
বিদ্বন্মোদতরঙ্গিনী ৩৭০
বিধবা বিবাহ আন্দোলন ১৫৮, ৩৭১
বিধাননগর রোড ২৩৯
বিধান সরণী ৫, ৫৯, ১৭৯, ৩৩৬, ৩৭৫
বিধানচন্দ্র রায়, ডাঃ ২৭১, ৩৬২, ৪৩৯
বিধান শিশু উদ্যান সরণি ২৩৯
বিনয়কৃষ্ণ দেব ৩৩৮, ৩৫৯, ৩৯০
বিনয় ঘোষ ৫৯, ২১৭, ৩৬৮
বিনয়েন্দ্রনাথ সেন ১৭৭
বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ ২২৮
বিনোদবিহারী ব্যানার্জি ১৯৫
বিনোদবিহারী শেঠ ৩০০
বিনোদিনী দেবী ২৫০
বিনোদ সাহা লেন ৪২৮
বিন্দু পালিত লেন ৪২৩
বিপিন পাল ২৬৮, ২৯২, ৩৩৫, ৩৪৪, ৩৯৭
বিপিন বিহারী গাঙ্গুলি ১৬৫, ৩০২
বিপিন বিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিট ৫, ২৬
বিপিন বিহারী মিত্র ১৬৭
বিপিন বিহারী সরকার ১০২
বিপ্লবী পুলিন দাস স্ট্রিট ১৩০
বিপ্লবী ত্রৈলোক্য মহারাজ সরণি ৪, ২৩৪, ২৭০
বিপ্লবী রাসবিহারী বোস রোড ৫, ৩৫
বিপ্লবী যুগান্তর দল ২৯২
বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী ৩০২
বিপ্লবী শ্রীশচন্দ্র ঘোষ ৩৮৫
বিবেকানন্দ রোড ৫, ১২২, ১২৪, ২০৬, ২৭৭, ২৯৬, ২৯৮, ২৯৯, ৪১৬, ৪১৭, ৪২৭, ৪২৯
বিভার্লি সাহেব ২৬, ৩৬, ৪০, ৪৫, ৪৮, ৫৬, ৫৭, ৭১, ৮৮, ৮৯, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৬, ৩৭৩
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ১৩৭
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১১৮, ৩০৭, ৪৩৬
বিমলকৃষ্ণ বসু ১২০, ১২১, ১২২
বিমলাসুন্দরী ২৫৬
বিমান মুখার্জি ২৫১
বিরজি ২৮
বিশপ হেবার ২২১
বিশপ অ্যান্ডারসন ১০
বিশপ ড্যানিয়েল ২২৮
বিশ্বকোষ লেন ১০৬, ১০৭
বিশ্বনাথ মতিলাল ৪৯
বিশ্বনাথ দত্ত ৪১৬
বিশ্বেশ্বর গাঙ্গুলি ২২২
বিশ্বম্ভর লেন ১৬৯
বিশ্বম্ভর মল্লিক লেন, ২২০
বিশ্বরূপা থিয়েটার ১৮০, ১৮২, ২৬৭, ২৮১
বিশ্বেশ্বরী দেবী ২৯২
বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা ৩৯২
বিশুদ্ধানন্দ বসাক ৩৯৩
বিষ্ণু দে ৩৪৫
বিহারীলাল সরকার ১২৭
বিহারীলাল চক্রবর্তী ২৭৮, ২৭৯
বিহারীলাল চক্রবর্তী স্ট্রিট ২৭৮
বিহারীলাল মিত্র ১৬৭
বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ৩৮৩
বীরেন্দ্রনাথ বসু ৩৩৫
বুদ্ধিস্ট টেম্পল লেন ২৭৯
বুদ্ধু ওস্তাগর লেন ৯৮
বুড়ো শিবের ঘাট ২৫৩
বৃন্দাবন চন্দ্র শেঠ লেন ২১৫
বৃন্দাবন পাল ফার্স্ট লেন ৯৬
বৃন্দাবন বসাক ১৩২, ২১৫
বৃন্দাবন বসু লেন ৪০৬
বৃন্দাবন মল্লিক ৩০২
বেইলি সাহেব ২৭, ২২৮
বেকবাগান ১, ২৩, ২০৭
বেঙ্গল অ্যাকাডেমি ২৩০
বেঙ্গল অ্যাকাডেমি অফ লিটারেচার ৩৩৭
বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (শিবপুর) ১১৫
বেঙ্গল গেজেট ১৮৫, ২৬০
বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স ১৯৪, ২৪৩, ২৪৪, ২৭০, ২৭৫
বেঙ্গল টেম্পারেন্স সোসাইটি ১৮, ৬৪, ১৫৪, ১৫৫
বেঙ্গল থিয়েটার ১১৩, ৩৮৬, ৩৯০

বেঙ্গল থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি ৩২১, ৩৪৩
বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কর্মাস ২২৯
বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট (১৮৭৬) ১৪৫
বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল ২৮১
বেঙ্গল লটারির কমিশনারগণ ৪৭
বেঙ্গল ল্যান্ড হোল্ডারস অ্যাসোসিয়েশন ৩৬৪
বেঙ্গল স্টাডি ২০৯
বেঙ্গল সোসাল সায়েন্সেস অ্যাসোসিয়েশন ১৮৬
বেঙ্গল কেমিক্যাল ১১১, ১৩১, ১৫৯
বেঙ্গল স্পোর্টিং ক্লাব ২৫১
বেঙ্গল হরকরা ১৮৫
বেথুন কাউন্সিল অফ এডুকেশন ১৭৫
বেথুন কলেজ ১৭৫, ২৯৪, ৩৬৯, ৪১৭
বেথুন রো ১৭৪, ১৭৫, ১৭৭, ১৭৯, ৪১৯
বেথুন সোসাইটি ৩৫৭, ৩৭০, ৪০৫
বেথুন স্কুল ১৭৫, ৩৭০
বেদিয়াডাঙা ৩২, ১৪৭
বেনিয়াটোলা স্ট্রিট ৯৮, ১০৮, ১১০, ১১১
বেনিয়াপাড়া অঞ্চল ৯৮
বেনিয়াটোলা বাই লেন ১১০
বেনিয়াপুকুর ৩১, ১৪৫
বেনিভোলেন্ট সোসাইটি ৩১৭
বেন্টিঙ্ক, লর্ড ৩৭০
বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট ৫, ১৮, ৪৯, ৮৫, ১৯১, ২২৬, ২২৯
বেরিয়াল গ্রাউন্ড রোড ৩৭, ৩৮
বেলগাছিয়া ২১, ৩১, ৬৫, ১৪৫, ১৪৬, ২১৮
বেলগাছিয়া ভিলা ২১৮
বেলতলা ৩২, ১৪৯
বেলনস, মিসেস ১৩৪
বেলিয়াঘাটা ৩১, ১৪০, ১৪৫, ১৪৭
বেলী সাহেব ৩০০, ৪১৬
বেলেঘাটা ২৩৭, ৩৭৪
বেলেঘাটা খাল ৪৮
বেলুড় মঠ ১১৩
বেহালা ৩৩০, ৩৬৮
বৈঠকখানা ১৫, ৬৪, ৬৫
বৈঠকখানা অঞ্চল ২৮৫
বৈঠকখানা রোড ৬৫, ৮০, ১৩৪, ১৩৫
বৈদ্যনাথ মুখার্জি ৩২৩
বৈশাখী ১১৭
বৈষ্ণবচরণ বসাক ২১৯
বৈষ্ণবচরণ মল্লিক ১৫৮
বৈষ্ণবচরণ শেঠ ৩০১, ৩০৩, ৩১৪
বৈষ্ণব টেম্পল লেন ৩৩৬
বৈষ্ণব দাস ৩০৩
বৈষ্ণবদাস শেঠ ১৩২, ২১৫
বৈষ্ণব শেঠ স্ট্রিট ৩০৩, ৩২৬
বৈষ্ণব শেঠ সেকেন্ড লেন ২৭৮, ৩০৩
বো স্ট্রিট ২৭৮
বোর্ড অফ ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যান্ড মিউনিসানস্ ৩৬৩
বোর্ড অভ রেভিনিউ ১৪৪
বোষ্টমদাসের ঘাট ৩৯
বোসপাড়া লেন ১০১, ১১৯, ২৭৭, ৩৯৩
বৌবাজার ৩৮, ৪৯, ৬৪, ৬৫, ৭৫, ৯০, ৯২, ১৬১, ১৬২, ১৬৬, ১৬৭, ২০৫, ২৩৩, ২৫৮
বৌবাজার স্ট্রিট ৫, ২৬, ৬৫, ৭৫, ১৩৪, ১৬১, ১৬৪, ১৬৬, ১৬৭, ১৮৪, ২০২, ২০৫
বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা ২৭৯
ব্রহ্মবান্ধব উপ্যাধ্যায় ১৬৭, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৮, ৪০৭, ৪১৭, ৪১৯, ৪২৩
ব্রজকিশোরী সঙ্ঘ ৪১২, ৪১৩
ব্রজকুমার শেঠ লেন ২৭৮, ৩০৩, ৩১৯, ৩২৬
ব্রজনাথ দেব ৩৯৪, ৩৯৫
ব্রজদুলাল স্ট্রিট ২১৮, ৩০৫, ৩২৬
ব্রজরাম গুহ ৪০৬
ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ২৯২
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫৯, ১৭২, ১৭৫
ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র ২৫৬
ব্রাহ্মসমাজ ২৬১
ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ৩১১, ৩২৩, ৩৬৪, ৩৭০
ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান স্ট্রিট ২৪, ৩৬, ৪৯
ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ডেলিগেশন ৪৩৭
ব্রিটিশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন ২৮১
ব্রেব্রোর্ণ, লর্ড ১১৩
ব্রেব্রোর্ণ রোড ৪, ২৩৪
ব্রোকার্স এক্সচেঞ্জ ২৭০
ব্ল্যাকওয়ার উদ্যান ২৫৪, ২৫৫
ব্ল্যাকওয়ার পুষ্করিণী ৮৫
ব্ল্যাকওয়ার লেন ২২৫
ব্ল্যাকওয়ার স্কোয়ার ৮৬, ২৫০, ২৫৪
ব্যাটরা ২১
ব্যাপারীটোলা ৯২, ২২৯
ব্যাপারীটোলা স্ট্রিট ৫৬
ব্যানার্জি পাড়া লেন ৩৭৮

ভগবতী দেবী ২১৭
ভগবতীপ্রসন্ন সেন ২৫৯
ভগবতী সেন লেন ২৫৯
ভবতারণ সরকার ৪২৮
ভবতারণ সরকার বিদ্যালয় ৪২৮
ভবতোষ ঘটক ৪
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৭০
ভবানীচরণ সেন ৩৫৭
ভাগবতচরণ সিংহ ২১৬, ২১৭
ভাগীরথী নদী ২, ৩, ২৫, ২১৩, ২৪৮, ৩০১
ভার্জিনিয়া মেরী মিত্র ১২১
ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট ১৫৪
ভারত-জার্মান পরিকল্পনা (১৯১৫) ১১৫
ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ৪১১
ভারতবর্ষ পত্রিকা ৩৭৭, ৩৮০
ভারত শাসন আইন ৩৬৩
ভারত সেবক সংঘ ১৩০

ভারতী বিদ্যালয় ৪২৮
ভারতীয় সঙ্গীত সমাজ ৩৭০
ভারতীয় পার্লামেন্ট ২৬২
ভারতীয় বিজ্ঞান সভা ২০৭
ভারতীয় রেডক্রশ সোসাইটি ২৯৯
ভারতীয় শিক্ষা পরিষদ ১৬৬
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ৩৫৭
ভারতের জাতীয় মহাসভা ৪২৯
ভারতের স্বাধীনতা আইন ৪৩৯
ভালুকপাড়া লেন ১৭৯
ভাস্কররাম কোলহাতকর ২৩
ভাস্কর মিত্র ২৫১
ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ৪৯
ভিক্টোরিয়া স্কোয়ার ৩৭, ৮৬
ভিভিয়ান বসু ১২০
ভুবনমোহন নিয়োগী ৩৯১
ভুবনমোহন বসু ১২১
ভুবনমোহন সরকার, ডাঃ ১৫৫, ১৫৬
ভুবনেশ্বরী দেবী ৪১৬
ভূদেব মুখোপাধ্যায় ১১৪, ১১৫, ২৫৪
ভূপতিচরণ বসু ৩৩৫
ভূপতি মজুমদার ১১৬
ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ ৩০৭, ৪০৪
ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ডঃ ১২৬, ২৯৪, ৪১৬
ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৬৬
ভূপেন্দ্রনাথ বসু, ডাঃ ৩৪৮
ভূপেন্দ্র বসু অ্যাভিনিউ ৫, ২৬০, ২৭৬, ৩৪৮, ৩৫৬, ৩৭৩, ৩৭৮, ৩৮৮, ৩৯০, ৩৯৪
ভোলা চট্টোপাধ্যায় ৩৪৪
ভোলানাথ পাল লেন ২৯৮
ভোলা ময়রা লেন ৩৪৮, ৩৯৩, ৩৯৪
ভৈরবচন্দ্র সরকার ১৫৫
ভৈরব বিগ্রহ ৩৭৯
ভ্যাগ্রান্ট আইন ১৫৯
ভ্যান্সিটার্ট (গভর্নর) ২৮, ৪৩
ভ্যালেনসিয়া, লর্ড ৪৩

মওলানা আবুল কালাম আজাদ সরণি ২৩৯
মকরন্দ ঘোষ ১১৬, ৩৫২
মজফ্ফর আহমেদ স্ট্রিট ২৬০
মঞ্জুরাট ১৪৫, ১৪৭
মট লেন ৮৫, ২৬০
মডার্ন রিভিউ ১৩১
মণীন্দ্রকৃষ্ণ দেব ৪০৩
মণীন্দ্র গুপ্ত ৪১২
মণীন্দ্রনাথ মল্লিক ৩৮৯
মণ্ডল স্ট্রিট ১৩২, ১০৪, ৩২৬
মণ্ডি বাজার ২০৯
মতিলাল নেহরু ২০৯
মতিলাল দেবী ১৩০
মতিলাল নান ১৫৭, ৪১৯
মতিলাল বসাক লেন ২৩৯
মতিলাল মল্লিক ৩১০, ৩১১
মতি শীল স্ট্রিট ১৫৭
মদন দত্ত লেন ১৪৯
মদন দত্ত স্ট্রিট ৩৪
মদনগোপাল দেব ২৫৭, ২৫৮
মদনগোপাল বসু ৩৭৯
মদনগোপাল লেন ২৫৭
মদন মিত্র লেন ১২৫, ১৭৭
মদন মিত্র থার্ড লেন ১২৫
মদনমোহন ঘোষ ১৪৯
মদনমোহন তর্কালঙ্কার ১৭৫, ৩৫৩
মদনমোহনতলা স্ট্রিট ৩৭২
মদনমোহন দত্ত ২৮, ১০৭, ৪৩০
মদনমোহন বর্মন স্ট্রিট ৫
মদ্যপান নিবারণী সভা ১৫৪
মধু রায় লেন ২৯৬
মধুসূদন গুপ্ত ১৩৪
মধুসূদন পাল ৯৭
মনসূর আলী (নবাব) ৩৭১
মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, মহারাজা ২৫৯, ৩৮৭
মনোমোহন গোস্বামী ৩৯৫
মনোমোহন ঘোষ ২৬১
মনোমোহন থিয়েটার ২৬৫
মনোমোহন পাঁড়ে ৩৯৫, ৪১২
মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৯২
মনোমোহন বসু স্ট্রিট ১৮৩
মনোমোহন মিত্র ২৯৫
মনোরঞ্জন গুপ্ত ১১৬
মনোহর ঘোষ ১১৬, ১১৭
মনোহরপুকুর ১১৬, ১১৭
মনোহরপুকুর রোড ২৩৮
মনোহরপুর ডিহি ৩২, ১৪৫, ১৪৭
মনোহর মিত্র ২৩৮, ২৫৬
মন্মথ নাথ ঘোষ ২৬২, ৩০৭, ৩৭৭, ৩৮০
মন্মথ ভট্টাচার্য স্ট্রিট ৩৪৯, ৩৭৩, ৩৭৫, ৩৮০
মন্মথনাথ মল্লিক ৩১২
মন্মথনাথ মিত্র ১৯৫, ৩৫৪, ৩৬৪
মন্মথনাথ শেঠ ১৩২, ৩০৪
মলঙ্গা ২৯, ৩৮, ৯২, ২৫৭
মলঙ্গা লেন ২২৯, ৩৩৬
মল্লিকঘাট ৬১, ৭৭, ৩১০
মল্লিক লেন ১০২, ৩০৮
মল্লিক স্ট্রিট ৩০৯
মসজিদবাড়ি স্ট্রিট ২৫৯, ৩৯৮, ৪০০-৪০২, ৪০৪-৪০৭, ৪১০-৪১৪
মসজিদ স্কোয়ার ৮৬
মহম্মদ আলী জিন্না ৪৩৬, ৪৩৮, ৪৩৯
মহম্মদ কামবক্স ২০
মহম্মদ রমজান লেন ১০৭
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৪৯, ২২৬, ২৬১

মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড ৪, ২১৩, ২১৪, ২২৫, ২২৬, ৩০৩, ৩০৪, ৩১৩, ৩২৬
মহর্ষি লেন ৩২২
মহাত্মা গান্ধী ৯৭, ১০১, ১১২, ১১৫, ১২১, ১৩০, ১৩২, ২৬৮, ৩৪৪, ৪০২, ৪০৯, ৪৩৬
মহাত্মা গান্ধী রোড ৫, ১৪৮, ১৯২, ২১৯, ২২০, ৩০৯
মহাকালী পাঠশালা ১৬৬, ২৯১
মহাবোধি সোসাইটি ৩৪১
মহারাজা নন্দকুমার ৪২২, ৪২৫
মহারাজ নন্দকুমার রোড ২০৮
মহারানী স্বর্ণময়ী ১২৭
মহারানী হেমন্তকুমারী স্ট্রিট ৩৪৮, ৩৮৭
মহিমেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র ২৫৩
মহেন্দ্রনাথ বসু ১০৫
মহেন্দ্র বসু লেন ৯৬
মহেন্দ্রলাল সরকার, ১২৭, ৩৫১, ২৬২, ২৮০, ৩৫১, ৩৬০, ৩৬৭
মহেন্দ্র সরকার লেন ২৮০
মহেন্দ্র সরকার স্ট্রিট ১৬৪, ২৮৬
মহেন্দ্রনাথ দত্ত ১৭৫, ২৯৪, ২৯৫
মহেন্দ্র শ্রীমানি স্ট্রিট ১২৮, ২৯২
মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ৩৭৭
মহেন্দ্র গোস্বামী গলি ২৯৪
মহেশ ন্যায়রত্ন ২৫৮
ময়দান ২৫, ৩৮, ৮২, ২৬০
ময়দাপট্টি ১৩২, ২১১, ২১৫
ময়দাপট্টি লেন ২১১
ময়দাপট্টি স্ট্রিট ২১০
ময়রাহাটা স্ট্রিট ২১০, ২১১
ময়লাঘাট ৬৬
ময়েরপুর ১৪৫
মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১১৪, ১১৫, ১২২, ১২৫, ১২৭, ২১৮, ২২৮, ৩৬৪, ৪১১
মাউন্টব্যাটেন, লর্ড ৪৩৯
মাকন্দা ২১, ২৮, ২৯
মাখনলাল সেন ৩৪৭
মাতৃজাতিসেবক সমিতি ৪০৬
মাদাম ব্ল্যাভাৎস্‌কি ৩২১, ৩৪৩
মাধবচন্দ্র বসু ১০৫
মাধবচন্দ্র মল্লিক ১৭৬
মাধব শেঠ লেন ১৩২
মাধবানন্দ বসাক ১৬৬
মানিকচাঁদ, মহারাজা ৩০৩
মানিকতলা ৩৬, ১৪৫, ১৪৬, ১৫৯, ১৯১, ২০৮, ২৩৭, ২৯৩, ৩০০, ৩০৪
মানিকপীর ৩০৪, ৪১৫
মানিকতলা মিউনিসিপ্যালিটি ১৪৬
মানিকতলা মেন রোড ২৩৯
মানিকতলা রোড ৬৪
মানিকতলা স্ট্রিট ৬৪, ১২৪, ১৭৭, ২৯৯, ৪১৫, ৪১৭-৪১৯, ৪২২-৪২৭, ৪২৯, ৪৩০, ৪৩২
মানেকজি রুস্তমজি ৪১৬
মারাঠা ডিচ (খাল) ২, ২৪, ২৭, ৩৮, ৭৮, ১১৭, ২৪৮
মার্ক উড ২৬, ২৭, ৩৮, ৬৬, ১০৯, ১১৬, ১১৭, ২৬৩, ২৮০, ২৯৩, ৩৬৬, ৩৮৮, ৪১৬
মার্ক উডের মানচিত্র ৩৫৮
মার্কাস ২৬২
মার্কস এঙ্গেলস বীথি ৪
মার্কাস্ ফান্ড ১৫০
মার্কাস্ লেন ১৫৩
মার্কাস্ স্কোয়ার ১৪৪, ১৫০, ১৫১, ১৯১, ৩০১, ৩৪৫
মার্কেট স্ট্রিট ওয়েস্ট ২৭৪, ২৭৫
মার্কেট স্ট্রিট ২৬১
ম্যাকডোনাল্ড লেন ১৫৪
ম্যাকলিওড স্ট্রিট ১৪১
ম্যাকেঞ্জি আইন ১২০, ১৯৪, ১৯৫, ২৩০, ৩৩০, ৩৬৪
ম্যাঙ্গো লেন ২৪, ৩৫, ৪৯, ৫৬, ২২৬, ২২৯
মার্গারেট এলিজাবেথ নোব্‌ল ২৭৭
মার্চেন্ট অফ ভেনিস ২৬৬
ম্যাডান থিয়েটার ৪৩১, ৪৩২
মার্বেল প্যালেস ১৩৩
মারকুইস লেন ১৩৫, ১৫৬, ১৫৭
মারকুইস স্ট্রিট ২৬১
মার্সডেন স্ট্রিট ৩৩৮
মাল আদালত বা রাজস্ব কোর্ট (২৪ পরগনা) ৩৭২
মালাপাড়া ৩০১, ৩০৫
মাড়োয়ারি অ্যাসোসিয়েশন ২১২
মাড়োয়ারি বিদ্যালয় ২১২
মাড়োয়ারি সরস্বতী উচ্চবিদ্যালয় ৩৯৬
মাড়োয়ারি হাসপাতাল ২০৬, ২১২, ২৯২, ৩৯৭
মিউনিসিপ্যাল অফিস স্ট্রিট ২৭৫
মির্জা গালিব স্ট্রিট ৩৯
মির্জাপুর ২১, ২৮, ২৯, ৫৭, ৬৫, ৯৩, ১২৮, ২৫৭, ২৯৮
মির্জাপুর ট্যাঙ্ক ১৭০
মির্জাপুর মৌজা ৩৩৩
মির্জাপুর স্ট্রিট ৫, ৫৭, ১০৭, ২৮৬, ৩৩৩, ৩৪৭, ৪১৭, ৪২৭
মির্জাপুর স্কোয়ার ৮৬
মির্জা মেহেন্দী লেন ১৫৭
মিডলটন স্ট্রিট ৩৬, ৩৭, ৩৮
মিনার্ভা থিয়েটার ৭৬, ১২৩, ২৬৬, ২৬৭, ৩৯০, ৩৯৫
মিন্টো, লর্ড ৪৭, ১৩৬
মিলন মন্দির ২, ১৮০
মিশন চার্চ ২২৮, ২২৯
মিশন রো ২৪, ৩৬, ২২৬, ২২৮, ২২৯
মিসরী খানসামা লেন ১৩৫, ১৫৬, ১৫৭
মীরজাফর খাঁন ৩, ২৮, ২১৩, ২১৪
মীরজাফর লেন ৩০২, ৩৩৩
মীরবহর ঘাট ৬৬
মীরবহর ঘাট স্ট্রিট ২১০, ২২৫, ৩২২
মীর হাবিব ২৩
মীরা চট্টোপাধ্যায় ৪১০

মুকুন্দরাম শেঠ ২১২, ৩০৩
মুকুল দাস ১৭৭
মুক্তারাম দে ১১৪
মুক্তারাম রায় ১১৪
মুক্তাগাছা (পরগণা) ২৯২, ৩৬৭, ৩৬৮
মুক্তারাম বাবু রো ১৫১, ৩৯৬, ৩৯৭
মুক্তারাম বাবু সেকেন্ড লেন ৩৯৬
মুক্তারাম বাবু থার্ড লেন ৩৯৬
মুক্তারাম বাবু ফোর্থ লেন ৩৯৬, ৩৯৭
মুক্তারামবাবু লেন ৩৯৬
মুক্তারামবাবু স্ট্রিট ৮৪, ৯৮, ১৩৩, ১৫১, ১৫৫, ১৫৬, ৩৯৬, ৩৯৭
মুখার্জিস ম্যাগাজিন ১২৩, ৪২৪
মুচিপাড়া ৯০, ৯৩, ৯৯
মুচিপাড়া লেন ২৮৬
মুজফ্‌ফর আহমেদ স্ট্রিট ১৫৫
মুদিয়ালী ৩২, ১৪৫
মুদিয়ালী রোড ৩৩৯
মুরগিহাটা স্ট্রিট ৩৫, ৮৪
মুন্সী সদরুদ্দীন লেন ১৩৩, ৩৯৬
মূর ও বেটম্যান পরিকল্পনা ৩৩১
মূলাজোড় ২০১, ৩১৬
মৃণালকান্তি ঘোষ ৩৪৭
মৃণালকান্তি বসু ২৬২
মৃণালিনী দেবী ১৩০
মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার ২৫৫
মেকলে, লর্ড ১৪১
মেঘনাথ সাহা, ডাঃ ২২৫, ২৩৬
মেঘনাথ সাহা সরণি ৩৩৯
মেছুয়াবাজার ২৮, ৩৮, ৯২, ৯৮, ১৩৩, ১৩৪, ৩০১, ৩১৪
মেছুয়াবাজার স্ট্রিট ৫, ৬৪, ৬৯, ১১২, ১২৫, ১৩০, ১৩৫, ১৫০, ২০২, ২০৫, ২২০, ২২১, ২৯৪, ৪১৬
মেটকাফ হল ১৮৬, ২৪৫
মেটকাফ টেস্টিমনিয়াল কমিটি ১৮৬
মেটকাফ লেন ১৮৫
মেটকাফ স্ট্রিট ১৮৪, ১৮৫
মেটিয়াবুরুজ ২০১
মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন ১২১, ১৬৭, ২৮৬
মেট্রোপলিটন কলেজ ১৬৬
মেডিকেল কলেজ ১৩৫, ১৬৫, ১৭০, ১৭৪, ১৭৬, ২১৪, ২৮১, ২৯৯, ৩৯৬
মেডিকেল কলেজ স্ট্রিট ৯৯
মেন সিউয়ার রোড ২৩৫
মেরিভিন মারি স্নেল ১৭৮
মেরী ফস্টার, মিসেস/ভবন ৩৪২
মেসমেরিক হাসপাতাল ৩৭০
মেয়রস্ কোর্ট ১৮, ৩৭৩
মেয়ো হাসপাতাল ৯৮, ৩৭০
মোহনটনির ঘাট ৬৬
মোহনবাগান ক্লাব ১০৩
মোহনবাগান ভিলা ১০২, ১০৩, ১০৪
মোহনবাগান রো ১০৪
মোহনবাগান লেন ১০৩, ১০৪
মোহনবাগান ক্লাব ১০৩
মোহনলাল মক্কর ২০৬
মোহনচাঁদ দত্ত ২১৪
মোহিনীমোহন ঠাকুর ৩১৫, ৩২০
মোহিতচন্দ্র সেন ১৭৭, ১৭৮
মৌলভী আবদুল জব্বর ৩৪৪
মৌলভী আবদুল লতিফ লেন ৯৯
মৌলভী আবদুল লতিফ স্ট্রিট ৯৯
মৌলানা আবদুর রেজ্জাক মালিয়াবাদ স্ট্রিট ১৭২
মৌলভী আহমেদ ১০৭, ১৭১
মৌলভী এমজাদ আলি লেন ৯৯
মৌলভী লিয়াকত হোসেন ৩৪১
মৌলভী বাজলার রহমান লেন ৯৯
মৌলভী বাজলার রহমান স্ট্রিট ১৫৫
মৌলভী মহম্মদ মনসুরউদ্দিন ১১৮
মৌলানা সুরাবর্দি ২০৮
মৌলানা সৈয়দ সামশুল হুদা ১৯৫

যজ্ঞেশ্বর দাস ৩৮৬
যতীন্দ্রনাথ বসু ১১৮
যতীন্দ্রমোহন অ্যাভিনিউ ৪, ২৫১, ২৫৩, ২৫৬, ৩২৬, ৩৪৮, ৩৪৯, ৩৫৯, ৩৬৯, ৩৭২, ৩৭৪, ৩৮৮, ৩৯২, ৩৯১, ৩৯৩, ৩৯৮, ৪০০, ৪০৭, ৪১৪
যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, মহারাজা ১২৭, ১৫১, ৩০০, ৩১৭, ৩১৯, ৩৫২, ৪০৫
যতীন্দ্রলোচন মিত্র ১১৫, ১১৬
যতীন্দ্রনাথ সেন ১৫৯, ৩৭৪
যতীন্দ্রমোহন সেন ৩৪৪
যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ১৬৩, ১৬৫, ২০৬
যতীশচন্দ্র ঘোষ ১৬৫
যদুনন্দন গোস্বামী লেন ৩২৮
যদুপণ্ডিত রোড ২০৬
যদুলাল মল্লিক ১০৭, ৩০২, ৩০৪, ৩১১, ৩১৩, ৩১৫, ৩২৬
যদুনাথ সরকার, আচার্য ১৩২, ১৫৯
যদুনাথ সেন ৩৫৩
যমুনালাল বাজাজ স্ট্রিট ৩৯৬
যতীন বাগচি রোড ২৩৮
যতীন্দ্রমোহন টেগোর স্কোয়ার ৩১৯, ৩২৬
যতীন মৈত্র পার্ক ২৫৩
যতীন সেন সরণি ২৩৯
যাদব মুখোপাধ্যায় ১০৯
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ২৩৫, ৪২৭
যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতাল ১৬৩, ১৬৬
যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় ১১৬, ১২১
যাদুবিন্দু শেঠ ১৩২, ৩০৪
যুগলকিশোর দাস লেন ১২৪
যুগান্তর দল ১১৬

যুগান্তর পত্রিকা ১১৫
যোগমায়া দেবী ৩৮৩
যোগেন্দ্র দত্ত লেন ১৭২, ৪২৩
যোগেন্দ্রচন্দ্র দত্ত ৪২৩, ৪২৫
যোগেন্দ্র হোমিওপ্যাথি দাতব্য চিকিৎসালয় ৩৭৯
যোগেন্দ্রনাথ বসু ২৬৫
যোগেন্দ্রনাথ রায় ১০৭
যোগেশচন্দ্র ঘোষ ১৯৫
যোগেশচন্দ্র বাগল ৩৭১
যোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১১৮
যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় ৩৩৮
যোগোদ্যান রোড ২৩৯

রঘুনন্দন সেন ৩১০, ৩২৬
রঘুনাথ বসু ১৭৩
রঘুনাথ সিংহ ১৩
রঘুনন্দন সেন ৩১০, ৩২৬
রঙমহল থিয়েটার ২৬৭
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ৪১২
রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় ১০৬
রঙ্গনা (থিয়েটার) ১৮১, ১৮২
রজনীকান্ত গুপ্ত ৩৩৭
রজনীকান্ত সেন ৩৪১
রজনী পাম দত্ত ৪২৫
রডন স্ট্রিট ৬৫
রডা কোম্পানি ১১৫
রণদাচরণ উকিল ৩৬৩
রতন সরকার লেন ২২৫
রতন সরকার গার্ডেন স্ট্রিট ১১৪, ২১০, ২২২, ২২৫, ২৪৮, ৩৯২
রতন সরকার স্ট্রিট ২১৯
রতনচরণ গুহ ৪০৮
রতন মিস্ত্রি লেন ১০৭
রতু সরকার লেন ১৭০
রত্নধাম ৩৭৫
রত্নমালা (অভিধান) ৩৬২
রথ ঘাট ৬৬
রফি আহ্‌মেদ কিদোয়াই রোড ৫, ১৮৬, ২৬০, ৩৩৮
রফি-উস-সান ২০
রবার্ট টার্নবুল ৩৩৯
রবার্ট ল্যাজেরাম ডি. অলিভিয়েরা ১৬১, ১৬২
রবিনসন স্ট্রিট ৭২
রবিবাসরের বৈঠক ৩৯১
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৭৫, ১০৬, ১১২, ১২৭, ১৩২, ১৬৭, ১৭৭, ১৭৮, ১৭৯, ১৮০, ২০৯, ২৬২, ২৬৬, ২৭৮, ৩১৪, ৩৪৪, ৩৪৫, ৪০৮, ৪১৭, ৪১৯-৪২২, ৪৩১
রবীন্দ্রকৃষ্ণ দেব ৩৭১
রবীন্দ্রকানন ২৪৯, ৩০০
রবীন্দ্রসরণি ১, ৪, ১৮, ১৫৮, ৩১৩, ৩২৬, ৩৬৬, ৩৭২
রবীন্দ্র সরোবর ২৩৭
রবীন্দ্র সেতু (হাওড়া ব্রীজ) ১৪৮

রমজান ওস্তাগর লেন ১০৭
রমাকান্ত রায় ৩৪০
রমানাথ ঘোষ ৩০৭
রমানাথ সাধু লেন ৩৯৬, ৩৯৭
রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ৩৭৫
রমেন মল্লিক ৩১৩
রমেশচন্দ্র দত্ত ১৭৮, ২৯২, ৩৩৭, ৪১৭, ৪২৫, ৪২৯
রমেশচন্দ্র দত্ত স্ট্রিট ৩৫, ৪২৯
রসরাজ অমৃতলাল বসু ৫৯, ৩৯০, ৩৯১
রসময় দত্ত ৬১, ৪১৭, ৪২২-৪২৪
রসা রোড ২৩৫
রসিকলাল ঘোষ লেন ১১১
রহিম খাঁ ১৩, ১৪
রয়াল ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমিশন ৩৫৫
রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি ৩৭১
রয়েল এক্সচেঞ্জ বিল্ডিং ২৭০, ২৭১
রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস ২৬৮, ২৭০, ৩১৬, ৪২৭
রয়েল বোটানিক্যাল গার্ডেন ২৪৬
রাইমণি ১২৬, ২১৬
রাইটার্স বিল্ডিংস ৬৫, ২৪২, ২৫৫, ২৬৯, ২৭৪
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫৯, ২৩২
রাখালচন্দ্র ঘোষ ২৯৫
রাজকুমার মুখোপাধ্যায় ৩৬৬
রাজকৃষ্ণ দেব, রাজা ২৮, ৬৬, ৭৯, ৩৭০
রাজকৃষ্ণ বসাক ২১৮
রাজকৃষ্ণ মিত্র ২৫৬, ২৫৭, ৩৫৮
রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১২৬, ১২৭
রাজচন্দ্র চন্দ্র ১৯৫
রাজচন্দ্র দাস ৬১
রাজনারায়ণ দত্ত ১৭১
রাজনারায়ণ বসু ১২৭, ১৫৯, ২৫৪, ৩১৭, ৩৩৭, ৪০৫
রাজবল্লভ স্ট্রিট ১০৩, ২৭৬
রাজভবন ৪৯
রাজশেখর বসু ১৫৯
রাজা উদমন্ত স্ট্রিট ৪
রাজা কালীকৃষ্ণ লেন ৩৪৮, ৩৭০
রাজা কালীকৃষ্ণ সেকেন্ড লেন ৩৪৮, ৩৭০
রাজা গুরুদাস স্ট্রিট ৪১৭, ৪২৫, ৪২৯
রাজা গোপেন্দ্র স্ট্রিট ৩৪৯
রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট ৯৮
রাজা দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক ২৯৪
রাজ নবকৃষ্ণ স্ট্রিট ১৪, ১৮০, ১৮২, ৩৬৫, ৩৬৬, ৩৭০, ৩৭২
রাজাপাড়া লেন ৯৬
রাজা বসন্ত রায় রোড ২৩৮
রাজাবাগান ৯৩, ১৭৯
রাজাবাগান স্ট্রিট ১১৩, ২৬৪
রাজাবাগান জংশন রোড ১১২, ১১৪
রাজাবাজার ট্রাম ডিপো ১৭৭
রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজ ১৮০
রাজা ব্রজেন্দ্রনারায়ণ স্ট্রিট ২১০

রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রিট ১১০, ১৮০, ১৮২, ১৮৩
রাজা রাজকৃষ্ণ ঘাট ৬৩, ৬৫, ৬৬
রাজা রাজাবল্লভ স্ট্রিট ১০৩, ৩৫৮, ৩৮১
রাজা রামমোহন সরণি ২১২, ৩৩৯
রাজা রামলোচন রোড ৬৪
রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার ৫৭
রাজা সুবোধ মল্লিক উদ্যান ৭৫
রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজা ২৩৭
রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জি রোড ৩৬, ২৩০
রাজেন্দ্রনাথ দত্ত ১২৭, ৩৭১
রাজেন্দ্রনাথ ধর ৩৩৪
রাজেন্দ্রচন্দ্র দেব ৩৯৮
রাধাকান্ত দেব ২৫৫, ২৫৮, ৩৫৪, ৩৫৯, ৩৬৯-৩৭২, ৩৯৪
রাধাকান্ত জীউ ২১৫
রাধাকান্ত জীউ স্ট্রিট ১০৪
রাধাকান্ত ঘোষ ১২২
রাধাকান্ত দেব ফার্স্ট লেন ৩৭২
রাধাকৃষ্ণ শেঠ লেন ৩২৮
রাধাকৃষ্ণ শেঠ স্ট্রিট ৩০৪
রাধাকৃষ্ণ মিত্র ২৫৬, ২৫৭
রাধাগোবিন্দ কর ৩৯২
রাধাগোবিন্দ বসাক ৩৯২
রাধামাধব দত্ত গার্ডেন লেন ২৩৭
রাধাবাজার ২৪, ৩৮, ৩১৪
রাধাচরণ মিত্র ১৫৮
রাধারাণী আঢ্য ৩১১
রাধানাথ মল্লিক লেন ১১৪
রাধানাথ রায় ১১৫
রাধানাথ বসু মল্লিক ১৭৩
রানীমুদি গলি ৩৬, ৪৯, ১৩৯
রামকমল সেন ১৪৯, ১৭৪, ২৫৫
রামকান্ত বসু স্ট্রিট ৯৬, ১০১, ২৭৫
রামকান্ত বসু ফার্স্ট লেন ২৭৫, ২৭৬, ২৭৭
রামকান্ত বসু সেকেন্ড লেন ২৭৫
রামকান্ত মিস্ত্রি লেন ১৩৬, ২৭৭
রামকানাই অধিকারী লেন ১৬৬
রামকুমার রক্ষিত লেন ২১০
রামকৃষ্ণ মিশন ২৭৬, ৩৪৭, ৪০৩, ৪০৬, ৪১৮, ৪২৩
রামকৃষ্ণ বিদ্যামন্দির বেলুড় মঠ ১৬৩
রামকৃষ্ণ-সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয় ২৭৭
রামকৃষ্ণ সারদা মিশন ৩৬১
রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম ৩৫৯
রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন ৩৬১
রামকৃষ্ণ ইনস্টিটিউট অফ কালচার ৩৩৪
রামকৃষ্ণ সমাধি রোড ২৩৯
রামকৃষ্ণ শেঠ ২১৪, ৩০৩
রামগোপাল আইচ ৪১৭
রামগোপাল ঘোষ ৩৯৪
রাম মল্লিক ১৭২
রামচরণ মিত্র ২৮, ১৬৭
রামচাঁদ রায় ১৪
রামচন্দ্র চ্যাটার্জী লেন ১৫৬
রামচন্দ্র ঘোষ লেন ২৫৬,
রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ৪০৮
রামতনু লাহিড়ী ১২৭, ২৫২, ২৫৪
রামদুলাল সরকার স্ট্রিট ১৭৬, ১৯২, ২৯৯, ৪২৯, ৪৩০
রামধন মিত্র লেন ৩৪৮, ৩৬০
রামনারায়ণ ভট্টাচার্য লেন ২৪৯, ২৫০, ২৫৪, ৪০৫, ৪০৬
রামনারায়ণ মতিলাল লেন ১৬৬
রামপ্রসাদ সেন ২৫৩
রামবাজার ১০৭, ৪২২
রামবাগান লেন ৪২২, ৪২৩
রামবাগান ৯২, ১০৭, ১২৬, ৩৫৮, ৪২২
রামমোহন রায়, রাজা ১১১, ১২৫, ১৯২, ৩১৫, ৩২২, ৪১৭
রামমোহন লাইব্রেরি ১৫৯
রামমোহন মল্লিক ৩০৯
রামরতন ব্যানার্জী ১৯৫
রামরতন বসু ৩৫৫
রামলাল শেঠ রোড ৩০৫
রামলোচন ঘোষ ৩০৫, ৩০৭
রামলোচন মল্লিক স্ট্রিট ২২০, ২২১
রাম শেঠ রোড ৩০৪, ৩২৫
রামসন্তোষ ঘোষ ১১৭, ৩১৪
রামসুন্দর দেব ৩৬৮-৩৭০
রামসুন্দর নান ৪১৯
রামহরি মিস্ত্রি লেন ৮৪, ১৩৬
রামনারায়ণ মতিলাল লেন ১৬৬
রামানন্দ চ্যাটার্জী স্ট্রিট ১৩১
রামানন্দ বসু ১০৫
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ১২৭, ২২৫, ৪১১
রালফ শেলডন ১০
রাসবিহারী ঘোষ ২৩৫
রাসবিহারী বসু ৩০০, ৩৬১, ৪৩৭
রাসবিহারী অ্যাভিনিউ ২৩৫, ২৩৬, ২৩৮, ২৫২
রাসবিহারী দত্ত প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরি ২৩৪
রাসমণি অ্যাভেনিউ ৬
রাসেল স্ট্রিট ৩৭, ৩৮, ৭২, ১৫৩, ৩০৯, ২৪৬
রায়বাগান ১২০
রায়দুর্লভ (মহারাজা দুর্লভ রায়) ১০৫
রিচার্ড বারওয়েল ২৭৪
রিজার্ভার রোড সাউথ ২২৫
রিপন আইন কলেজ ২৬২
রিপন স্ট্রিট ৩৬, ১৫৫, ২৬০
রিপন, লর্ড ১২০, ১৫৫, ২০৮
রুইহাটা ৩৫, ২১৫, ২১৬
রুস্তমজি কাওয়াসজি ৬১, ১৫৮, ১৫৯, ৪১৬, ৪২২
রূপচাঁদ মল্লিক ২২১, ২২২

রূপচাঁদ রায় ১২৫
রূপম ২২৪
রেড রোড ৪, ৩৬, ৫৬, ৫৭
রেভারেন্ড লঙ ৩১০
রেবাচাঁদ ১৭৯, ৪২১
রোটারি ক্লাব ৩৬৬
রোদেনস্টাইন, ৩৬৩
রোড টু দি গ্রেট বাজার ৩৫
রোনাল্ডস, লর্ড ২২৮, ৩৪২
রোপ ওয়াক ১৮, ২২৮
র‍্যাক, মিস্ ৩৫১
র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ ৪১১

লটারি কমিটি ৩৭, ৪৪ ৪৫, ৪৭, ৪৮, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬৩, ৬৪, ৭৯, ১১৩, ১১৭, ১২৫, ১৫৬, ১৮৫, ২১৬, ২২৫, ৩০৫, ৩৮৮
লর্ড অকল্যান্ড ৬২, ৬৬, ৬৮, ১৫৯, ১৮৪, ১৮৬, ৪২২
লন্ডন কোম্পানি ১৫
ললিত মোহন দাস লেন ২৭৯
লক্ষ্মী দত্ত লেন ২৭৬, ২৭৭
লক্ষ্মী নারায়ণ ধর ১০৭
লরেন্স রোড ৬
লাউডন স্ট্রিট ৩৭, ৬৩, ৬৫, ৭২, ১৬১, ১৯১, ২০২, ২৪০
লাডলী মোহন মিত্র ১১৫
লাল গির্জা ২২৮
লালদিঘি ৪২, ৬৫, ৭৪, ৭৫, ২৬৯, ৩০২
লালবাজার ২৪, ৬৪, ৭৫, ২৬৯, ৩৭২, ৪০৭
লালবাজার রোড ৬৫
লালবাজার স্ট্রিট ৫, ৬৫
লালবিহারী বসাক ১৯৫, ৩০৩
লালবিহারী দে রেভারেন্ড ৪২৬
লালমাধব মুখার্জি লেন ৩২১
লারকিন লেন ২৪
লালা লাজপত রায় ৩০১
লাহা কলোনি ৩০৫, ৩৮০, ৩৮৬
লায়ন্স সাহেব ২৭৪
লায়ন্স রেঞ্জ ৪, ২৪২, ২৭৪
লিটন, লর্ড ১৫৫, ১৬৩, ৩৭০
লিটল রাসেল স্ট্রিট ১১২, ১৫০
লিন্ডসে স্ট্রিট ৮৫, ১৪০, ২৪২, ২৭৫
লিয়াকত আলি ৪৩৮, ৪৩৯
লী রোড ২২৫
লেক অ্যাভিনিউ ২৩৮
লেক টেরাস ২৩৮
লেক টেম্পল রোড ২৩৮
লেক প্লেস ২৩৮
লেক রোড ২৩৮
লেডি ডাফরিন হাসপাতাল ৩২০
লেনিন সরণি ৬, ২৬৩
লোকনাথ মৈত্র ১৩১
লোহারাম পাল ৯৭
লোয়ার সারকুলার রোড ৬৫, ৮১, ১৬২, ১৬৯, ২০৭

শক সাহেব ৩২, ৪৮, ৮৩, ৮৪, ৯৬, ১১৬, ১১৭, ১২২, ১৬২, ২১৬, ২৫৫, ২৯৩, ৩১৫, ৩৭৩
শক সাহেবের মানচিত্র ৩৫৮
শক স্ট্রিট ৯৬, ৯৭, ৯৮, ২৫৮, ২৫৯
শঙ্কর হালদার লেন ১০৯, ১১০
শঙ্কর হালদার বাই লেন ১০৯, ১১০
শঙ্করীপ্রসাদ বসু ৩৬৯
শঙ্খকার বা শাঁখারি ২৮০
শচীন বন্দ্যোপাধ্যায় (ব্যাণ্ডো) ২৫২
শচীন মিত্র লেন ১০১
শচীন্দ্রনাথ দত্ত ৪০৯
শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ২৬২
শচীন্দ্র মোহন বসু ১২০
শচীন্দ্রনাথ মিত্র ১০২, ৩৪০
শর্ট বাজার স্কোয়ার ৭৫, ৮৬
শমীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৪১৯
শরৎকুমার মিত্র ৩৯২
শরৎকুমারী ৭৬, ১২৩, ৩৮৬
শরৎচন্দ্র গুপ্ত ৪০২
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১১৬, ১১৮, ১৫৯, ২৬৬, ৪৩২
শরৎচন্দ্র বসু ৪০৯, ৪৩৭, ৪৩৯
শরৎচন্দ্র মিত্র ৩৫০
শরৎ চ্যাটার্জী অ্যাভিনিউ ২৩৮
শশীচন্দ্র দত্ত ৪২৪
শশী দে স্ট্রিট ১৬২
শশীভূষণ দত্ত ১৭৫
শশীভূষণ দে স্ট্রিট ৫, ১৬৩, ১৬৪, ২৮০
শশী মাল ২৫০
শশীশেখর বসু ১৫৯
শশী সুর লেন ১১১
শহীদ ক্ষুদিরাম বোস ১১৪
শহীদ সুরাবর্দি ৪৩৮
শাঁখরিটোলা ৩৮, ১৬০, ১৬৫
শাঁখারিটোলা ইস্ট লেন ২৮০
শাঁখারিটোলা পল্লী ২৮০
শাঁখারিটোলা ফার্স্ট লেন ২৮০, ২৮৪
শাঁখারিটোলা লেন ২৮০, ২৮১
শা নগর ১৪৫
শান্তি ইন্‌স্টিটিউট রো ১৬৫
শান্তিরাম ঘোষ স্ট্রিট ১০৬
শান্তিরাম সিংহ ১২২, ১২৫, ১৭৪
শাহনওয়াজ খাঁন ৪৩৭
শাহানগর ৩২
শ্যামচাঁদ বসাক ৩০৪
শ্যামপুকুর ৯০, ৯২, ৯৩, ৯৬, ১১৭, ১২৩, ৩০৪, ৩৪৮, ৩৫৭, ৩৫৯, ৩৬৩, ৩৬৫, ৩৭৩-৩৭৫, ৩৯৪
শ্যামপুকুর দিঘি ৩৫০
শ্যামপুকুর পল্লীমঙ্গল সমিতি ৩৬৫

"শ্যামপুকুর বাটী" ৩৬০
"শ্যামপুকুর বাটী শ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণ সংঘ" ৩৬০
শ্যামপুকুর বিদ্যাসাগর স্কুল ৩৭৭
শ্যামপুকুর লেন ৩৪৮, ৩৮৬
শ্যামপুকুর স্ট্রিট ৩৪, ১০২, ১০৩, ৩৩৭, ৩৪৮, ৩৫৮, ৩৬০-৩৬৬, ৩৯৩
শ্যামবাজার ৩৪, ৩৮, ৬৪, ৯২, ৩৫৭, ৪১২
শ্যামবাজার স্ট্রিট ৩৪, ২০৫, ২৭৬, ৩৪৮, ৩৫৮, ৩৭৩, ৩৭৮, ৩৭৯, ৩৮৮-৩৯২
শ্যামসুন্দর শেঠ ৩০৩
শ্যামাচরণ দে লেন ১৩৭
শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট ১৩৭, ৩৩৪, ৩৪৫
শ্যামাচরণ লাহা ১১৪
শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ৩৪৫, ৩৬৬, ৩৭৫, ৪৩৯
শ্যামা বাই লেন ২১৯
শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন ২৩৯
শিবকৃষ্ণ বাহাদুর ৩৬৯
শিবচন্দ্র মিত্র ২৫৫
শিবচরণ গুহ ৪০৬
শিবতলা ঘাট ৬৬
শিবতলা লেন ১৭২
শিবদাস ভাদুড়ী স্ট্রিট ৩৪, ১০৩, ১১৯
শিবনাথ শাস্ত্রী ১১৩, ১২৭, ৩২৪, ৩৪৪, ৩৭১
শিবনারায়ণ দাস গলি ২৮৮
শিবশঙ্কর মল্লিক লেন ৩৪৮, ৩৭৭
শিল্পী পূর্ণচন্দ্র ঘোষ ১৫৯
শিশিরকুমার ভাদুড়ী ১১৩, ১৮২, ২৬৬, ৩৪৪, ৪৩১, ৪৩২
শিশির ভাদুড়ী সরণি ৩৫, ৪৩১
শিশির মল্লিক ২৬৭
শিয়ালডাঙা ২৭
শিয়ালদহ ২১, ২৮, ৩১, ৬৫, ৮০, ৮৩, ৮৯, ১৩৪, ১৪৫, ১৪৭
শীতলা সমিতি (শ্যামপুকুর) ৩৬৫
শীতলা লেন ১০৯
শীলস্ স্কুল ১৫৮
শুরুরপুর ১৪৫
শুঁড়া ২১, ৩১, ৬৫, ১০৩, ১৪৫, ১৪৬, ৩১৭, ৪১৬
শুঁড়িপাড়া ১৩৭, ৪২৮
শেক্সপীয়ার সরণি ৬, ৩৯০
শেখ করিম বক্স ১৩৫
শেরবার্ন বাজার ৩৮
শৈলেন্দ্রনাথ সরকার ১০৩, ১৪৩, ১৫৪
শৈলেন সরকার ইনস্টিটিউশন ৩৬৬
শোভাবাজার ২৮, ৩৮, ৬৩, ৯৭, ১০৮, ১৭৯, ১৮১, ২৪৯, ২৫৫, ৩০৬, ৩৫৯, ৩৬৭, ৩৬৮, ৩৭১, ৩৭৫, ৩৯০
শোভাবাজার রাজবাড়ি ৩৩৬, ৩৭২
শোভাবাজার স্ট্রিট ৫, ৩৪, ৬৩, ৯১, ৯৩, ৯৮, ১১১, ১৬৯, ৩২২
শোভারাম ঘোষ ৯৩
শোভারাম বসাক ৯৩, ২১৩, ২১৫, ৩০৩, ৩৬৮
শোভারাম বসাক লেন ১০১, ২১৪, ২৭৫
শোভারাম বসাক ফার্স্ট লেন ২১৪
শোভারাম বসাক স্ট্রিট ২১০, ২১৩, ২১৪, ২১৮, ২২২, ২৫৮, ৩২২
শোভা সিংহ ১৩, ১৪
শ্রীঅরবিন্দ ৩৪৪, ৩৬২, ৩৮৫, ৪৩৬
শ্রীঅরবিন্দ সরণি ৫, ৩৪, ১১৬, ১৮৩, ৩৪৮, ৩৬৬
শ্রীকৃষ্ণ ঘোষ ৩৭৯
শ্রীকৃষ্ণ লেন ৩৪৮, ৩৭৮
শ্রীকৃষ্ণ সিংহ ১৭৪, ১৭৫
শ্রীগোপাল মল্লিক লেন ১৭৩, ৩৪১
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস ৩৪৭
শ্রীধর্মরাজিকা বিহার ৩৪১
শ্রীনাথ ঘোষ ১৩৭
শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৩১
শ্রীনারায়ণ দেব ৩৭০
শ্রীমানিবাজার ২৯৭
শ্রীরঙ্গম ১৮২, ২৬৭
শ্রীরামকৃষ্ণ অভেদানন্দ সঙ্ঘ ১৮১
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ১০৬, ৩৫৯
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ১০৬, ১১৩, ২৫৮, ২৬৮, ২৭৭, ২৯৬, ২৯৭, ৩১১, ৩৫৮, ৩৫৯, ৩৬১, ৩৭৭, ৩৮৮, ৩৯৪, ৪১২
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ ১৮০, ১৮১
শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন ২৭৮
শ্রীশচন্দ্র গুহ ৪০৮
শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারী আরোগ্য নিকেতন ৩৬৫
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণ সংঘ ৩৬১
শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম ও বালিকা বিদ্যালয় ৩৮৭, ৩৮৮

ষষ্ঠীধর সেন ৩৯৯

সখানাথ বসু, ডাঃ ৩৬৫
সচ্চিদানন্দ নান ৪২২
সজনীকান্ত দাস ১০২, ১১৭
সঞ্জীবনী পত্রিকা ৩৪৩
সর্ট বাজার স্ট্রিট ৭২
স্টক এক্সচেঞ্জ অ্যাসোসিয়েশন ২৭৩
সতীদাহ নিবারণ আইন ২৫৬
সতীদাহ প্রথা ৩৭০, ৩৭১
সতীশ পাকড়াশি ২৯৯
সতীশ ঘোষ উদ্যান ৩৩৭
সতীশচন্দ্র বসু ১১৫
সতীশচন্দ্র মুখার্জি ২৭৮, ২৯২, ৩৬২
সতু সেন ১০২, ৪৩২
সত্যচরণ গুহ ৪০৬, ৪০৭
সত্যরঞ্জন মিত্র ২৭৩
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৫৪
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ৪০৫, ৪১৪
সত্যেন্দ্রনাথ বসু ৩৫৬

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ২৮২
সত্যেন্দ্রনাথ সেন ৩৭৪
সদর আদালত ২৪৯
সদর স্ট্রিট ৭২, ২৭৪
সর্দার শঙ্কর রোড ২৩৮
সনাতন বসাক ১৮৫
সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা ৩৭০
সন্তোষ কুমার দাস, ডাঃ ৪১০
সন্তোষ কুমার বসু ৩৬১
সন্তোষ কুমার মিত্র ১৬৫
সন্তোষ মল্লিক ৩০৯
সন্তোষবাজার ২০৯, ৩০৯
সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার ১৬২, ১৬৬
সপ্তগ্রাম ২৩৩, ৩০৩, ৩০৫
সবজিবাগান রোড ১৯০
সমর রুদ্র ১৩০
সমরেন্দ্র চন্দ্র দেব ৩৯৮
সমরেন্দ্র নাথ মিত্র ১১৬
সমাচার চন্দ্রিকা ৩৮২
সমাচার দর্পণ ১৮০, ১৮৫, ৩৫৮
সমাজপতি গ্রন্থাগার ৩৮৩
সমাজপতি স্মৃতিসমিতি লাইব্রেরী ৩৬০
সমাজোন্নতি বিধায়িনী সুহৃৎ সমিতি ৪১৫
সম্বাদ ভাস্কর ১৭৫
সম্বাদ সুধাকর ৩০১
সরকার রো ১৫৩
সরকার লেন ৯৮
সরফররাজ খাঁ ২৩
সরস্বতী নদী ৩০২
সরস্বতী বিদ্যালয় ৩৬৫
সরস্বতী স্কুল ২০৩
সর্বমঙ্গলা মন্দির ১১৬
সরোজ মুখার্জি ২৯৯
সরোজ রায়চৌধুরী ৪৩৬
সরোজেন্দ্রনাথ দেব ২৭৩
সলিলকুমার মিত্র ২৬১, ২৬৭
সল্ট কমিশন ১০৭
সংস্কৃত কলেজ ১২৬, ১৩৭, ২৫৬, ২৭৯, ৩৪৪, ৩৪৬, ৩৪৭, ৪২২
সংস্কৃত টোল ৩৬৮
সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটারি ৩৪৬
সংবাদ কৌমুদী ১৮৫
সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় ১২৩
সংবাদ প্রভাকর ১২২, ৩১৮, ৩৫৭, ৪১১
সাউথ এন্ড পার্ক ২৩৮
সাউথ কলিঙ্গ ৬৫
সাউথ কলিঙ্গ স্ট্রিট ৩৬
সাউথ সারকুলার রোড ৭২
সাউথ সুবার্বন মিউনিসিপ্যালিটি ১৪৬
সার্কাস অ্যাভেনিউ ৩৩৯
সাগর দত্ত লেন ২১১, ২১৪
সাগরময় ঘোষ ১০২
সাগরমল নাথনী ২৭৩
সাতকড়ি মালাকার ১৯৬, ৪০৪
সাতকড়ি সেন ৪০৫
সাতগাছিয়া ১২, ২১
সাতপুকুর বাগান ২২২
সাধক রামপ্রসাদ ১১৪, ২৫৪, ২৫৫
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ১৩২
সাধিকা গৌরীমাতা ৩৮৭
সান ইয়াৎ সেন স্ট্রিট ৩৩৫
সাদার্ন অ্যাভিনিউ ২৩৫, ২৩৬, ২৩৮
সারদা (মা) ১১৩, ৩৩৫, ৩৫৯, ৩৬০, ৩৬১, ৩৬২, ৩৮৬, ৩৮৭
সারদাচরণ মিত্র ১১
সারদাচরণ মুখোপাধ্যায় ৩৭৭
সারদাপ্রসাদ বসু ৩৬৬
সারহাদ ২১
সারকারিনা থিয়েটার ১৮০, ১৮২
সারকুলার রোড ১, ৭, ২০, ২৭, ৩৭, ৩৯, ৪৪, ৬৪, ৬৫, ৭১, ৭৮, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৪, ৮৫, ৯৮, ১২৫, ১২৮, ১৩১, ১৮০, ২০৩, ৩০০, ৩৫৩, ৩৫৮
সারকুলার অ্যাভিনিউ ২৮৭
সারকুলার রোড লোয়ার ৫
সারকুলার ক্যানেল ৬৩, ২০৩, ২০৪
সারকুলার লকগেট ১৬৮
সারদাচরণ মিত্র ৩৪২
সারদেশ্বরী আশ্রম ৩৭৫
সারপেনটাইন লেন ১১০, ১৬৪
সালকিয়া দুর্গ ১৭, ২৯
সাহা ইনস্টিটিউশন অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স্ ১৫৯
সাহানগর ১৬৪
সাহারপুর ১৪৭
সাহিত্য পত্রিকা ৩৮০, ৪০০
সাহিত্য পরিষদ ৩৯১
সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ১৫৯, ১৬৬, ২৫২
সাহিত্য পরিষদ স্ট্রিট ১৮৩, ৩৩৬
সার্ভে অফ ইন্ডিয়া ৩৮০
সাপ্তাহিক সংবাদ প্রভাকর ৪১২
সাবর্ণ চৌধুরী ১১, ১৩, ৩৬৭, ৩৭২
স্বদেশি আন্দোলন ২৩৫, ২৪৮
স্বর্ণকুমারী দেবী ৩২২
স্বর্ণলতা স্ট্রিট ১০৬
স্বরাজ্য দল ২১১
স্বাধীনতা আন্দোলন ২৭৮
স্বামী অখণ্ডানন্দ ৩৫৯
স্বামী অভেদানন্দ ১৮১, ১৮২, ২৪৯,২৬৮
স্বামী প্রজ্ঞানন্দ ১৮২
স্বামী প্রেমানন্দ ১১৩
স্বামী বিবেকানন্দ ২০৭, ২৬৫, ২৬৭, ২৬৮, ২৭৭, ২৯৬, ৩৫৯, ৩৬০, ৩৬১, ৩৬৯, ৩৭৭, ৪০২, ৪০৭, ৪১২, ৪১৬, ৪২২

স্বামী ব্রহ্মানন্দ ১১৩, ২৭৭
স্বামী লোকেশ্বরানন্দ ৩১৩
স্বামী সদানন্দ ৪০২, ৪০৩
স্যাডলার কমিশন রিপোর্ট ১৭৯
স্যান্ডেল স্ট্রিট ১৭১
স্যামুয়েল রিড্ ১৭৩, ২৭৭
স্যার হরিরাম গোয়েঙ্কা স্ট্রিট ২১১, ২১২, ৩৯৩
স্টার থিয়েটার ১১৩, ২৬৪, ২৬৫, ২৬৬, ২৬৭, ২৬৮, ৩৯০
স্টার লেন ২৬৪
স্ট্যার্নডেল রোড ১৯০
স্ট্যার্নডেল সাহেব ২৭৪
স্ট্র্যান্ড রোড ৪, ৫৭, ৬৩, ৬৫, ৯৩, ১০৭, ১৮৬, ২০২, ২০৬, ২০৭, ২৩৪, ২৪২
স্ট্র্যান্ড রোড নর্থ ৯৮, ১০৮
স্ট্র্যান্ড রোড সাউথ ৪, ৬৫, ২৪৪
স্ট্র্যান্ড ব্যাঙ্ক ফান্ড ১৬৮
স্ট্র্যান্ড ব্যাঙ্ক রোড ৭৮, ৭৯, ৯১, ৯৬, ১৬৯, ২১০, ২৪১, ২৪৪
সিঁথি ৩১, ১৪৫, ১৪৬
সি. আর উইলসন ২১৯
সি. ডব্লিউ স্মিথ ৬১
সিকদার পাড়া স্ট্রিট ৯৮, ২১০
সিকদারপাড়া বাই লেন ১৩২
সিকদারবাগান ১২৫
সিকদারবাগান স্ট্রিট ৩৪, ৩৫৮, ১০২
সিটি কলেজ ১৩১
সিদ্ধেশ্বরচন্দ্র লেন ১৩৪
সিন্দূর পট্টি ২১৫, ২১৬
সিধু কানু ডহর ১৮৫
সিনাগগ স্ট্রিট ১১১
সিমলা ১, ২৮, ২৯, ৬৪, ৯৪, ১৭৫, ২৫৭, ২৯৪, ২৯৬, ৪১৬
সিমলা লেন ২৯৩, ২৯৮, ২৯৯, ৩৩৬
সিমলা স্ট্রিট ১৫৫, ১৭৫, ২৯৩, ২৮৯, ২৯৯, ৩৩৬, ৪১৭, ৪১৮, ৪২১
সিমলা বাজার ৩৮, ১৭৫, ১৭৬, ২৯৪, ৪১৭
সিমলা ব্যায়াম সমিতি ১৫৬
সিমলা রোড ২৯৩, ২৯৮.
সিমলা সেকেন্ড লেন ২৯৮
সিমুলিয়া গ্রাম ২৫০
সিমুলিয়া ২৯৩, ২৯৪, ২৯৮, ৩৯৬, ৪১৯
সিমসন, ডাঃ ১০১
সিস্টার নিবেদিতা ১১২, ২৫৬, ২৭৬, ৪০২
সিসিল বিডন, স্যার ২৪৯
সিংহী লেন ৯৮
সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ১৭৮
সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট ১৩৭, ১৪৯, ৩৩৩, ৪০০
সীম সাহেব ৫৬, ৬৮, ৮৯, ১১৭, ৩৫১
সুকিয়া রো ২৯২, ২৯৩
সুকিয়াস লেন ২৮৫
সুকিয়া স্ট্রিট ৯০, ৯২, ৯৩, ১২৬, ১২৮, ১৪৪, ১৭২
সুকুমার মিত্র ৩৪০
সুকুমার সেন ১২২, ৩৪১, ৩৫১, ৩৮৮, ৪১৫
সুজেন্দ্র শেঠ লেন ৩০৩, ৩০৪, ৩২০
সুতানুটি ২৯, ২৪৯, ২৫৩, ২৯৪, ৩০০, ৩০১, ৩০৫, ৩৪৭, ৩৫৩, ৩৫৮, ৩৭২, ৪২৪
সুতানুটি তালুক ৯৩, ২৪৮, ২৫৫
সুধারাম চক্রবর্তী ২৭৭
সুধীন দত্ত ৪১১
সুধীরকুমার নান ১৭৭, ১৭৮, ৪১৯, ৪২১
সুধীরচন্দ্র গুহ ৪১০
সুধীর চন্দ্র রায়চৌধুরী ৩৩৯
সুধীর মুখার্জি উদ্যান ২৫১
সুধীর মিত্র ১১৬
সুনীতি কুমার চট্টোপাধায় ১৫৯, ১৬০, ২৯২, ৩৭৫, ৪০৮
সুনীতি শিক্ষালয় ৪২৮
সুপ্রিম কোর্ট ৩৩, ৪৩, ৬১, ১৩৩, ২৪৯
সুফী মোতাহার হোসেন ১১৮
সুবর্ণবণিক চ্যারিটেবল অ্যাসোসিয়েশন ৩১১
সুবর্ণবণিক সমাজ ২৮৪
সুবর্ণবণিক সমাচার ২৩৩
সুরাবর্দি অ্যাভিনিউ ২০৭, ২০৮
সুভাষচন্দ্র বসু ৮১,৮৯, ১৫৪, ১৫৬, ২৬২, ৩০২, ৩৬২, ৩৯৮, ৪০৯, ৪৩৬, ৪৩৭
সুরতিবাগান ৫৭, ৯২
সুরতিবাগান ট্যাঙ্ক ৭৫
সুরবাজার ৬৪
সুরেন সরকার রোড ২৩৯
সুরেন্দ্র উদ্যান্ ৭৪, ৭৫
সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ ১০৯
সুরেন্দ্রনাথ কলেজ ২৬২
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১২০, ১২৭, ১৪৮, ১৫২, ১৫৪, ১৭০, ১৯৩, ২৫০, ২৬২, ২৬৮, ২৯২, ৩০০, ৩৪৪, ৩৬৪, ৩৭০, ৩৯১, ৪২২
সুরেন্দ্রলাল পাইন ১৭৪
সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ সরণী ৩৫, ৪৯
সুরেন্দ্র মোহন ব্যানার্জী রোড ১৫১
সুরেশ দাস ১১৬
সুরেশচন্দ্র মজুমদার ৩৪৭
সুরেশ মিত্র ২৯৬
সুরেশ সমাজপতি ৩৬০, ৩৮২, ৪১১, ৪১২
সুরেশ সরকার, ডাঃ ৩৭৫
সুরেশচন্দ্র মজুমদার ১১৮, ৪১০
সুশীল কুমার দে ২৫১, ৩৭৪
সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী ২৯২
সূর্য সেন স্ট্রিট ৫, ১৭২, ৩১৯
সেক্রেটারিস্ ওয়াক ৫৬
সেন লেন ১০৮
সেন্ট অ্যান গির্জা ১৫, ১৮
সেন্ট অ্যান্ড্রুজ গির্জা ৪২৬
সেন্ট জর্জেস গেট রোড ৪

সেন্ট জন চার্চ ১৩, ৪৭, ২৫৪, ২৭৮
সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ ২৮৩
সেন্ট জেমস উদ্যান ১৬৩
সেন্ট জেমস গির্জা ১৬২, ৩৬৮
সেন্ট জেমস লেন ১৬৫, ১৬৬
সেন্ট জেমস স্ট্রিট ৬৩, ৬৫, ১৬১, ১৬২, ১৬৪, ১৬৫
সেন্ট জেমস স্কোয়ার ১৬২, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৮
সেন্ট পলস্ কলেজ ১৭২
সেন্ট পলস্ মিশন চ্যাপেল ৯৯
সেন্ট মার্গারেট স্কুল ৪২৬
সেন্ট স্টিফেন কলেজ ১০৬
সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ ২০৪, ২০৫, ২৬৫, ৪০৪, ৪১৭
সেন্ট্রাল কলেজ ১১৪
সেন্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুল ৪০৫, ৪১১
সেন্ট্রাল রোড ১৪৮
সেন্সাস রিপোর্ট (শক সাহেব) ৮৩
সেনেট হাউস ১৫১
সেহগল (ক্যাপ্টেন) ৪৩৭
সেরাং লেন ১৬৯
সৈয়দ আমির আলি ২০৭
সৈয়দ নেসার আলি খোন্দকার ৩৮৮
সৈয়দ সুরাবর্দি ৩৯৮
সৈয়দ হোসেনউদ্দীন শাহ ৪১৫
সোনাগাজীর মসজিদ ৪০০, ৪০১
সৌম্যেন সরকার ৪১৪
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ৩৪৪
স্কট থমসন ৭৫
স্কট লেন ৯৯
স্কটিশ চার্চ কলেজ ১০৬, ১৮৪, ৩৫৭, ৪২০
স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুল ৪২৬
স্কটিশ মিশনারি মহিলা শাখা ৩৫৭
'স্টেটসম্যান' পত্রিকা ২২৪, ২৬৫
স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্স্ স্যার ৪৩৫, ৪৩৭

হগ মার্কেট ৩৬, ৮৫, ১৪০, ১৪১, ১৫৭, ২৭৫
হগ স্ট্রিট ২২৪
হনুমানজী লেন ২১০
হরকুমার টেগোর স্কোয়ার ১৫১, ৩১৬, ৩১৭
হরচন্দ্র ঘোষ ১৭৫
হরচন্দ্র দত্ত ৪২৪
হর ঢোল লেন ১১০
হরিপদ দত্ত লেন ২৯৮, ২৯৯
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১২৭, ১৫৯, ২৩২, ৩৫৩
হরলাল মিত্র স্ট্রিট ১০৪
হরি ঘোষ স্ট্রিট ১১১, ১১৪, ১১৫, ১১৯, ১৪৭, ২৫৩, ৩৫২, ৩৫৪, ৪১৩
হরি বর্ধনের গলি ৩০৫
হরিণবাড়ি লেন ৭৫
হরিতকি বাগান ১২৫
হরিতকিবাগান লেন ১২৫
হরিনাথ দে ২৭৯
হরিদাস বসু ৩৬৬
হরিমোহন ঠাকুর লেন ৩১৬, ৩২৬
হরিশ দত্ত ৪২২
হরিশচন্দ্র মিত্র ৪০৫, ৪০৬
হরিশচন্দ্র মুখার্জী রোড ১৯০
হরেন শীল ৩৯৫
হরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ ৩৫
হরুঠাকুর ৩৯৩
হাওড়া ব্রিজ ২১২, ২৩৪
হাওড়া ব্রিজ অ্যাপ্রোচ ২৩৪
হাঁসপুকুর লেন ১৩২
হাজরা রোড ১৯০
হাজি ইসমাইল ১৭০
হাটখোলা ৯১, ১৬০
হার্টলি হাউস ২৬৯
হার্ডিঞ্জ, লর্ড ৩৬৮, ৩৭১
হাতিবাগান স্ট্রিট ১০২
হাতিবাগান ৬৪, ৯৩, ২৬৫, ৩৫৮
হান্টার কমিশন ১৫৬
হার্বার্ট বেকার, স্যার ৩৬৩
হালসিবাগান ২৮, ৩৯, ৯৩, ১১৯, ২৯৯
হাসান সুরাবর্দি, স্যা ২৪৯
হাড়কাটা গলি ২৮৩
হ্যাভেল সাহেব ১১২
হ্যামিল্টন সাহেব ৪১
হ্যারিসন রোড ৫, ৭, ১৩৭, ১৪৮, ১৯১, ১৯২, ২০২, ২০৯, ২১০, ২১১, ২৩৪, ২৪২, ২৪৪, ৩৯৩
হ্যারী লী ২২৫
হ্যারিংটন স্ট্রিট ৩৭, ২২৯
হ্যালিডে পার্ক ১৫০
হিউজেস পরিকল্পনা ২০২
হিজরী ৩৬৮
হিদারাম ব্যানার্জী লেন ২৩৩, ৩৯০
হিন্দু কলেজ ১১৪, ১৩৭, ১৫১, ১৬৯, ১৭১, ১৭৪, ১৭৫, ২৫০, ২৮১, ৩৪৬, ৩৪৭, ৩৭০, ৪২৩, ৪২৪, ৪২৬
হিন্দু চ্যারিটেবল ইনস্টিটিউশন ৩৭১
হিন্দু থিয়েটার ১৭৫, ৩১৭
হিন্দুস্থান পার্ক ২৩৮
হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকা ১২২, ১২৪, ২৯৭, ২৯৮
হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুইটি ফান্ড ২২৯
হিন্দু ফ্রী স্কুল ৩১৭
হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ২৬৩
হিন্দু বেনাভোলেন্ট ইনস্টিটিউশন ৩৫৮, ৩৭০
হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজ ২৩০, ৩৭১
হিন্দু মেলা ১৬৯
হিন্দু সৎকার সমিতি ১৬৩
হিন্দু স্কুল ২১১, ৩১১, ৩৫৮
হীরালাল শীল ১২৬, ১৩৯, ১৫৭
হীরালাল শেঠ ১৩২, ৩০৪
হীরালাল আঢ্য ৩৬৫

হীরাবুলবুল ৩২০
হীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৩০৮
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ৩৪২, ৩৪৩
হুগলি নদী ২, ১২, ১৪, ১৭, ২১, ৪৪, ৫৭, ৬৫, ৭০, ৭৬, ৯৪
হুজুরিমল লেন ১৬১
হুজুরিমল বাই লেন ১৬১
হুজুরিমল ট্যাঙ্ক লেন ১৬১, ২৫৮
হুজুরিমলের ঘাট ২
হেদুয়া (হেদো)৬৪, ১২০, ১৭২, ১৭৫, ২১০, ২৯৪, ৩৪১, ৪২৪
হেনরি উড ৫৭
হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও ১২৯
হেনরি ফারনিন্যান্ড ব্লকম্যান ১৮৬
হেনরি রাসেল, স্যার ২০৯
হেনরি হ্যারিসন, স্যার ১০৫, ১৪৮, ৩১১
হেমচন্দ্র নস্কর রোড ২৮০
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪২
হেমচন্দ্র বসু মল্লিক ৪৩১
হেমচন্দ্র সেন ২৫২
হেমন্ত বসু সরণি ৩৫, ৩৬১
হেমিংওয়ে, মিসেস ৩৫৪
হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ ২৫২, ২৬২
হেমেন্দ্র বিকাশ চৌধুরী ২৮০
হেমেন্দ্র সেন স্ট্রিট ৪১১
হেমেন্দ্রনাথ ঘোষ ২৫২
হেস্টিংস ২৩, ২৮, ৪৩, ৫৭, ৮৯, ৯০, ২৪৮, ৩৭২
হেস্টিংস স্ট্রিট ৫, ৬, ৩৬, ৬৫, ২৪৫, ২৭৪
হেয়ার সাহেব ১৬৯, ১৭১, ৩৫৮
হেয়ার স্কুল ১৫১, ১৫২, ১৭২, ৩৯১
হেয়ার স্ট্রিট ৫৬, ৬৫, ১৮৬
হোগলকুণ্ডি ৯২
হোগলকুড়িয়া ২৮, ২৯, ২৫৭
হোগলকুড়িয়া গলি ১৮৩
হোসেন শাহ ১৭৩
হোয়াইট টাউন ৪১

A. B. Chatterjee 313
A. R. Jackson, Dr. 61
A. Rogers 61
A. M. Dowleans 82
A Sort of Ring 24
A Statute of George iII 39
A Statute of George III 1794 78
A. Upjohn 26, 347
Abercrombie Dick 325
ACT XXIV of 1840 60
ACT XVI of 1847 68
ACT II of 1848 68
ACT XXXIX of 1850 68
ACT X of 1852 68
ACT XII of 1852 68
ACT XIV of 1856 79
ACT XXV of 1856 69
ACT VI of 1863 82
ACT VI (BC) of 1863 249
ACT IX of 1867 74
ACT XI of 1867 249
ACT I of 1870 74
ACT VIII of 1870 84
ACT VI of 1871 84
ACT VIII of 1871 85
ACT I (B.C.) of 1887 144
ACT II (B.C.) of 1888 148
ACT III of 1899 79
ACT of Parliament 33 George III 44
Administration Report (1875 76) 71
Advisory Board of Engineers 7
Age of Consent Bill 364
Ahiritola Diagonal 110
Ahiritola Street widening 110
Alexandar Pedlar 376
Aliverdi Khan 23
Amritalal Basu 265
An Appeal to Countrymen 317
Ancient Ballads and Legends of Hindusthan 424
Ancient Monuments in Bengal 213
Anti-partition Demonstrations 196
Aquaducts 75
Archdeacon Deattry 229
Ashcroft Hall 103
Asley Eden, Sir 136
Auckland, Lord 57
Azim-Us-Shan 15, 20

Baillie 228
Baldwin Lathaum 191
Ball Hill 243
Balustrades 56, 57
Banks Gwyther 244
Bannermanis Government 157
Bannomally Mittre 114
Baretto Lane 35
Baroj Road 235
Barron, Lt. Colonel 104
Beauchamps & Co 173
Bee Bee Hoss Ghat 66
Bengalee 154
Bengal Academy of Literature 337
Bengal Academy of Music 320
Bengali Literature in the Nineteenth Century 374
Beth Tephilla 228
Bhoodeb Mukherjee 114
Bishop Heber's Journal Vol 1 221
Black Town 41, 42
Bolts 21

Bonfield Lane 35
Bose Statistics 180
Bow Bazar Street 163
Boys Own Home 179
Burying Ground Road 37

C. R. Wilson 228
C. W. Smith 61
Calcutta Exchange 47
Calcutta During The Last Century 187
Calcutta Gate 65
Calcutta Improvement Trust 117, 124
Calcutta Medical Aid and Research Society 163
Calcutta University Institute 177
Carl Saft 407
Carnac, Major 33
Cartier 43
Cathedral Misson Lane 172
Census Report (1876) 88
Charls Theo Philes Baron Metcalfe, Sir 184
Chatawala Gullee 335
Chief Agent 13
Chief of the Cossimbazar Factory and Second in the Council of the Bay 11
Chowringhee 50, 57
Chowringhee Gate 65
Chowringhee Theatre 57
Chuckerbutty Faction 171
Civil Jurisdiction 44
Clark 86, 245
Claud Martin 26
Clock Tower 140
Clyde Row 89
Collector of Calcutta 44
Collin Street 260
Commercial Exchange in Calcutta 270
Commissary General and Chief Governor of the Company's Settlement 13
Coolie Bazar 89
Cotton 169
Court of Directors 56
Court of Requests 48
Court of Wards 312
Cross Street 35
Curzon, Lord 196

D.B. Smith, Dr. 81
D.M'farlan 58
Daibatoolah 34
Dane, Martin Boutant de Mevell 228
Darpanarayan Tagore Street 313
David Ewart, Dr. 426
David Hare 324
Deshbandhu Memorial Committee 97
Deshbandhu Village Re-Organisation Fund 97
Dhaldanga 28
Dhapa Lock Pumping Staiton 237
Direct Action Day 43
Dodds 408
Domtooly 91
Dowleans 69
Dr. Doorga Churan Banerjee Street 169

E.D. Kilburn 75
Earl Mayo 98
Ed. Strangler Lewis 408
Eden Gardens, Calcutta 313
Education in India under East India Company 323
Edward Baker, Sir 247
Edward Rayan, Sir 186
Edwin Arnold, Sir 264
Effinghum, Countess 426
Ellias S. Gubboy 85
Emerald Theatre 264
English Company 24
English in Bengal 20
English Settlement 29
Eton 184
European Settlements 41
Evan Cotton, Sir 308

F. C. Hirst 26, 36
Falkiner, Miss 357
Farrukshiyar 20
Fay, Mrs. 269
Federation Hall 2, 380
Fever Hospital and Municipal Enquiry Commitiee 62, 422
Fever Hospital Committee 57, 59, 62, 63
Fort William 21, 89
Fox Lane 99
Francis 43
Francis Gladwin 122
Frant Dvorak 182
Frederick Blick 354
Frederick Halliday, Sir 61
Free Church Orphanage and Zenana Home 98
Free Misson Church 426
Fringe Area Ward 145, 146

G.A. Bushley 49
G.A.D. Anley 136
G.J. Gordon 48
G.T. Marcus 150
General Commitee 112
General Treasury 40

Goranhatta 34
Governor of Hugli 12
Government House 49, 58
Grand Old Man' 105
Great Tank 74

H.Beverley 88, 373
H. E. A. Cotton 352
H.J. Shakespeare 45, 48
H.W. Moreno 268
Halliday Street 69
Hanson 407
Harry Lee 225
Hastings 89
Heath, Capt, 11
Henry campbell 157
Henry Ferninand Blockman 180
Hennry Wood 51
Hickey's Gazette 33
Hindu College 114
Hindu Pioneer 423
H.N. Forbes, Capt. 63, 293
Holy Child Institute 425
Hoogly 57
Hoogly Dock Yard 173
Hospital Gate 65
Hughes, Scheme 202
Hyde, Justice 33

I.P. Schalch 116, 216, 322, 352
Indian Conveyance 97
Indian Mirror 149
Indian Mirror Street 261
Indian National Congress 429
Indian Registration Act 97
India's Struggle For Freedom 262
Institute of Nuclear Physics 236
International Trade 160

J.C. Galstaun 272
J.P. Grant, Sir 61
J.R. Bertram 275
J.R: Martin 43
J.W. Hogg 133
Jack Warner 431
Jafir Khan 21
James Whitehead 431
Jatindra Mohan Tagore, Maharaja 318
Jersey 163
Jimmy Cambell 407
John Beard 14
John Child 11
John Miller 39
Johnnagar 138
John Surmon 20
Johny Essen 407
John Zachariah Kiernander 228
Jurasakoo Street 35
Jugdishnath Roy 114
Junior Member of The Council of Cossimbazar 11
Justices of Peace 39

Khojah Surhaud 20
Kidderpore Bridge 89
Kilburn & Co. 191
K.N. Mitter & Sarvadhikary 120
Kishpoor Para 28
Kuo-Min-Tang 336

L.H. Abercormbie 293
Lanchester 209
Land Acquisition Collector 151
Lelonte de Lisle 424
Lee Road 225
Le Maistre, Justice 207
Legislative Joint Fact Finding Committee 9
London Municipal Bill 144
Liberator of the Indian Press 184
livius 270
Lottery Committee 57

Mackenzie Act 120
Main Sewer Road 235
Mangoe Lane 35
Manicktolla Spur 416
Marhatta Ditch 78
Mark Wood, Lt. Col. 20, 274
Marquis Lane 157
Marquis Street 157
Mass House 13
M.G. Shelton 260
Modern Review 131
Model Village 86
Mooktaram Baboo's Street 396
Muddoosoodan Dutt 114
Mukherjee's Magazine 423
Municipal Consolidation Act 427

Narendranath Sen 149, 261
Narain Chattergeer Road 35
Narman Chevers, Dr. 82
National Council of Education 292
National Magazine 350
Neeloodalal Street 34
New Hogg Street 138
New India 364
Niharitooly 91
Notes on the Industries of the U.P. 364

Obotar Ch. Gangooly 114
Observation 91

Old Court House Street 35
Old Fort William in Bengal (Vol. 1) 228
Old or Mission Church 228
Old Powder Mill Road 34
Omichand 300
Origin of Caste (1899) 312
'Osmyn' 171
Overend 271

P.C. Cowan 244
Pearl Hill 409
Pearson 245
Peary Charan Sirkar 152
P. Roychowdhury 128
P.W. Simms 117, 214, 351
Palisade 24
Pandit Iswar Chandra Vidyasagar 128
"Paris of Bengal" 24
"Parochial Annals" 24
Pathuriaghata Street 313
Peerce 247
Permanent Settlement 39, 98
Peter Sookeas 285
Pilgrim Road 18
Plassey Gate 65
Point "A" 331
Post Master General of Bengal 102
Primrose Lane 155
Price 43
Price's Observations 41
Processed Sedimentation Tank 331
Pratt 244
Prof. Geddes 209
Punchnnuntolla Lane 172
Puranchand Nahar Street 261

R.C. Maccat 256
R.C. Sterndales 274
R.H. Cockerell 61
R.R. Bayan 85
R.R. Bayne 140
Rajunder Nath Mittre 114
Ramdoolal Dey 430
Receiver of the Revenues 14
Red Road 56, 65
Regulating Act, 1773 3
Renascent India 420
"Report for The Improvement of Calcutta" (1861) 199
Report on the Census of Calcutta for the year (1866) 82, 162
Respondentia Road 65
Ripon Lane 157
Ripon Street 157
River Thompson, Sir 119
Road and Street Regulations 9
Road to Chitpore 1
Road to Kalighat 1
Road to Pilgrimage 1
Road to Rusapugla 36
Robert Dorill, Captain 13
Robert Orme 276
Rope Walk 36, 228
Royal Industrial Commission 355

S. Nicolson, Sir 61
S. Thomas, Sir 409
Saha Institue of Nuclear Physics 237
'Sailors' House' 186
Salt Water Lake 62
Saumbazar 34
Schalch, Lt. 57
Sealdanga 27
Second Book of Readings 152
"Second City of the British Empire" 3, 450
Secretary's Walk 56
Serajud Dowlah 26
Shamachurn Law 114
Sheak See 135
Sherayatullah Khan 133
Shortsbazar 75
Silk 244
Simms 56, 94
'Sind Times' 177
Sobahbazar 34
Socialism and the living wage 425
'Sophia' 177, 421
Soshibhusan De Street 163
SriSri Ramkrishna Paramhangsa Dev 361
St. Anne's Church 19
St. James Square 163, 164
Star Theatre 265
Stewart 23
Strand Bank Fund 168
Strand Road 89
Stubbins 245
Surveyor General of India 26

T. Call, Colonel 87
T. Prinsep, Captain 116, 322, 350
'Tagore Castle' 318
Tankshall Street 36
'Temple Chamber' 201
Temple of the Winds 186
The Adequate Building Laws 4
The Administration Report 1858 72
The Administration Report 1867 72
The Army Sanitary Commision 79
The Arnold of the East 152
The Aryan Village in India and Ceylon 160

The Municipal Consolidation Act II BC of 1888 386
The Municipal Report for 1877 79
The New Calcutta Directory, 1856 366
The New Lottery Committee 45
The Official Capital of British India 40
The Old Course 36
The President of the Boards of Police and
The Bengal and Agra Annual Guide & Gazetteer for 1841, Vol.-1 Part III 270
The Bengal Buddhist Association 279
The Bengal Magazine 423
The Building Commission of 1897 191
The Calcutta Electric Lighting Corporation Ltd. 200
The Calcutta Electric Supply Corporation Ltd. 201
The Calcutta Gazette 57, 122
The Calcutta Literary Gazette 423
The Calcutta Market VIII of 1871 140
The Calcutta Municipal Consolidation Act 1876 89
The Calcutta Imrpovement Act, 1911 202
The Calcutta Improvement Trust 332
The Calcutta Orphanage 354
The City and Environs of Calcutta 1852-56 117
The Commander of the Thana Fort 12
The Commissioners for the Bengal Lottery 47
The Committee of the Native Hospital 47
The Company's Principal Agent in Bengal 11
The Concord 177
The Court of Requests 423
The Extinction of Local Self Government 196
The Fever Hospital and Municipal Enquiry Committee 61
The First Federal And Road Act 1960 9
The Governor of Fort William 66
'The International' 425
The Last Local Self Government 196
Conservancy 48
The Prince of Journalists 132
The Second City of the British Empire 10
The Short Act of 1854 68
'The Society for the Higher Training of Young Men' 150
The Sreegopal Basu Mallick Fellowship 174
The Statesman 313, 318
'The Twentieth Century' 178
The Vice President in Council 48
The World Poet of Bengal 178
Thornton, Mrs. 150
Tirettabazar 42
Town Clock 140
Town Improvement Committee 78
Treaties of Modern Physics 237
Town Hall 114
Town Hall Fund 47
Travelion, Sir, 311
Two English Companies 15

V.H. Schalch 82, 96, 162, 362
Valentia, Lord 43
Verelst 43
Vision of Sumerie 425
Vidhan Educational Society 429, 434

W.B. Bayley 71
W.C. Blacquire 254
Warehouse Keeper 14
Wellesley, Lord 40
Wellington Square 430
William Baillie 26
William Clark 70, 76
"Windsor Castle" 318
White Town 41, 42
White & Black Town 43
World Health Organisation 77
Wystanly 431

Zamindar 21
Zamindarry Of English Company 24

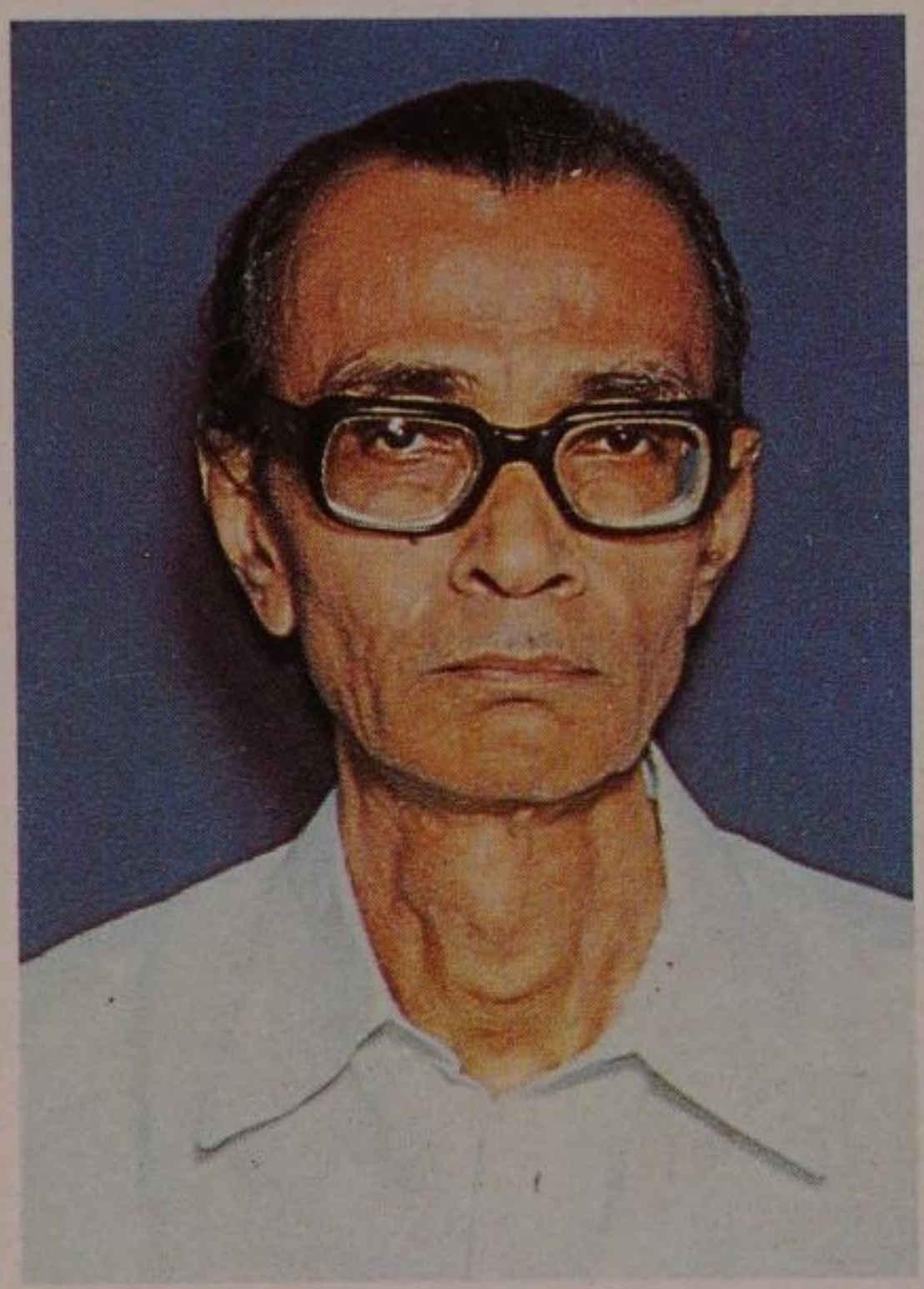

অজিতকুমার বসুর জন্ম ৪ নভেম্বর, ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে।

শিক্ষা : বি. কম, এম. এ। নগর ও পুর প্রশাসন বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা।

কলকাতা পুরনিগমে বিভিন্ন পদে দীর্ঘকাল নিযুক্ত ছিলেন। কখনও ডেপুটি কমিশনারের একান্ত সচিব রূপে কখনও পুর কমিশনারের। পথ নামকরণ উপদেষ্টা পর্ষদের সচিব পদেও বেশ কয়েক বছর আসীন ছিলেন। এই শেষোক্ত পদে থাকাকালীনই কলকাতার গলি আর রাজপথের পত্তন ও উন্নয়নের বিষয়ে বিশেষভাবে উৎসাহী হয়ে ওঠেন এবং এ-বিষয়ে নানান দুষ্প্রাপ্য নথিপত্র দেখতে শুরু করেন। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটির পরিকল্পনা সেই আগ্রহ থেকেই সঞ্জাত ।

এই বিষয় নিয়ে কিছু-কিছু টুকরো লেখা মাসিক গন্ধবণিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

ডঃ সুধীন ভট্টাচার্যের সঙ্গে যুগ্মভাবে রচনা করেছেন একটি গ্রন্থ : "সুতানুটির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও শ্যামপুকুর অঞ্চলের ইতিবৃত্ত।" উত্তর কলকাতার সুতানুটি পরিষদ গ্রন্থটির প্রকাশক।

---

প্রচ্ছদ □ অমিয় ভট্টাচার্য

9 788172 153939